সারা পৃথিবীর
রূপকথা

প্রথম খণ্ড

এশিয়া (ভারত বহির্ভূত)

সম্পাদক
দিব্যজ্যোতি মজুমদার



রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৯০

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২২৪১-৮১২১

প্রচ্ছদ শিল্পী
সোমনাথ ঘোষ

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২২৪১-৬৯৮৯

জে এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
দূরভাষ : ২২৪১-৬৪৭০/২২৪১-৭৫১৯

মুদ্রণ
কালার ইন্ডিয়া
১/১বি, চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কোলকাতা-৭০০ ০১২

রূপকথার রূপকথা

এক বুক রোমাঞ্চ, শঙ্কা ও সাহস নিয়ে যাত্রা করা এক অজানা কল্পলোকের উদ্দেশে— পৃথিবীর প্রতিটি শিশুর তা এক মধুর স্বপ্ন। রাত ঘনিয়ে আসছে ঘরের বাইরে অথচ শিশুর চোখে ঘুম আসছে না, ঠাকুমা, দিদিমা বা মায়ের কোলে মুখ গুঁজে শিশুর তখন একটাই প্রার্থনা, একটা গল্প বলো না—

পৃথিবীর চিরন্তন ঠাকুমা-দিদিমা-মায়েরা জানেন শিশুর চোখে নিদ্রাদেবীকে আহ্বান করার একটাই উপায় গল্পের আবরণে মুড়ে তাকে ক্রমশ নিয়ে যেতে হবে একরাশ উত্তেজনার গভীরে যেখানে সে নিজেই একজন রাজপুত্র হয়ে অতিক্রম করতে থাকবে রোমাঞ্চে শিহরিত এক অন্তহীন পথ, তারপর একসময় উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে পাড়ি দেবে সেই কাঙ্ক্ষিত ঘুমের সাগর।

পৃথিবীর যাবতীয় রূপকথার জন্ম ঠিক এভাবেই। তা সে বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুই হোক, অথবা বরফে-ঢাকা সুদূর গ্রিনল্যান্ডের কোনো এস্কিমো-পরিবারের শিশুই হোক, বা আফ্রিকার ঘন অরণ্যের ছায়ায় লালিত হতে থাকা কোনো শিশু বা ল্যাটিন আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কোনও শিশুই হোক।

অনাদি অতীতকাল থেকে এভাবেই মুখে মুখে লেখা হয়েছে অজস্র রূপকথা, কখনও কোনো গবেষক বা সংগ্রাহকের অতি-উৎসাহে একটি একটি করে খাতার পাতায় জমা হয়েছে তারই এক ভগ্নাংশ, পৃথিবীর যে কোণেই খবর নেওয়া হোক না কেন, সব দেশের ও সব জাতির মানুষের ঘরেই বাস করে এমনই সব চমৎকার রূপকথা। পৃথিবীর নানা প্রান্তে সেই জমা-হওয়া গল্পগুলি একসময় বইয়ের রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছে শিশুর বিস্মিত, বিস্ফারিত চোখের সামনে। পৃথিবীর যাবতীয় জননী কিছুটা হলেও নিষ্কৃতি পেয়েছেন শিশুর এই নিত্যনতুন আবদার থেকে। শিশুও খুঁজে পেয়েছে এমন এক জগৎ যা তার কল্পনায় প্রস্ফুটিত হয় মুহুর্মুহু, তাকে পৌঁছে দেয় এক অনাস্বাদিত কল্পলোকে, এক রূপময় বর্ণময় পৃথিবীতে।

শিশু কিশোর আকাদেমির শুরুর দিনগুলিতে যখন নানা পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত সে সময় আলোচনায় উঠে আসে রূপকথা যেমন শিশুদের অসম্ভব প্রিয়, তেমনই আকর্ষণ করে অধিকাংশ বড়োদেরও কারণ সব বড়োদের মনেও বাস করে একটি শিশুমন। 'সারা পৃথিবীর রূপকথা' খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনার শুরু তখন থেকেই। প্রকাশনা পরিচালক ড. শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজ স্ট্রিট ঘুরে ঘুরে, কখনও ফুটপাথের রেলিংএর পুরোনো বইয়ের দোকান হাতড়ে নিজেই ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে এসেছেন রূপকথার বহু দুষ্প্রাপ্য বই। তারপর প্রথমে প্রকাশনা উপসমিতির সভায়, পরে কর্মসমিতির সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরু করা হয়েছে

কয়েক খণ্ডে বইটির প্রকাশনার কাজ। সারা পৃথিবীর রূপকথা প্রকাশের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ছোটোদের সামনে উন্মোচিত হবে এক বহুবর্ণ পৃথিবী। ছোটোরা এই অভিজ্ঞতাও লাভ করবে বাংলার একটি শিশুর কল্পনার জগতের সঙ্গে বহু দূর দেশের একটি শিশুর কল্পনার কতটা পার্থক্য বা আদৌ কোনও পার্থক্য আছে কি না।

আকাদেমির চেয়ারম্যান সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপদেশে ও নিরন্তর উৎসাহে সম্ভব হচ্ছে একের পর এক বই প্রকাশ। 'সারা পৃথিবীর রূপকথা' খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের রূপরেখা তৈরি করেছিলেন যাঁরা, সেই সম্পাদকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ তাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন ও নানা পরামর্শ দিয়ে সম্ভব করেছেন এই বইয়ের রূপায়ণ। বইটি প্রকাশের প্রারম্ভিক সময়ে সম্পাদক মণ্ডলীর সঙ্গে আমরা এক সভায় মিলিত হয়েছিলাম। সহ-সভাপতি শৈলেন ঘোষ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীননাথ সেন, বিষ্ণু বসু, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় গুহ, এষা দে ও সংস্কৃতি অধিকর্তা অনুপ মতিলাল —তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। প্রখ্যাত গবেষক দিব্যজ্যোতি মজুমদার শুধু সম্পাদনার কাজেই সহায়তা করেননি, মূল্যবান ভূমিকাটি লিখে দিয়েছেন অতি যত্নে যা এই বইয়ের এক সম্পদ। এশিয়ার দেশগুলির পরিচয়পর্বটিও তিনি লিখে দিয়েছেন, সংক্ষেপে হলেও ছোটোদের খুব উপযোগী। শিশুসাহিত্যিক ও সম্পাদক অরুণ চট্টোপাধ্যায় অশেষ পরিশ্রম করে প্রস্তুত করেছেন বইয়ের পাণ্ডুলিপি। প্রুফ দেখার কাজটিও সম্পন্ন করেছেন তিনি। চূড়ান্ত প্রুফ দেখে দিয়েছেন দেবাশিস বসু। বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণের কাজে যথেষ্ট সময় দিয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পী প্রণবেশ মাইতি। অন্যান্য অলংকরণে সাহায্য করেছেন যুধাজিৎ সেনগুপ্ত, কৃষ্ণেন্দু চাকী, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মাজী ও শঙ্কর বসাক। শিল্পীদের অক্লান্ত প্রয়াসে মূর্ত হয়েছে ছোটোদের সেই রোমহর্ষক জগৎ।

প্রচুর সহায়তা পেয়েছি আকাদেমির কর্মীদের কাছ থেকে। বিশেষ করে মধুসূদন মণ্ডল প্রথম থেকে শেষ অবধি বহন করেছেন নানা দায়িত্ব। ছোট্ট অফিস, অপরিসরের মধ্যেও যেভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে এত-এত পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ, প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি কাজ, তার জন্য কর্মীদের অবদান কম নয়। ধন্যবাদ সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কসের কর্ণধার শ্যামল সাউকে ও তাঁর কর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতার জন্য।

প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করতে যত সময় ব্যয়িত হল তার জন্য দায়ী প্রকাশনার কাজে আমাদের অনভিজ্ঞতা। আশা করছি পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশ করতে পারব আরও দ্রুত আরও নিখুঁত করে। এ বইতে যদি কোনো ভুলচুক নজরে পড়ে, কিংবা আরও সুন্দর করে যাতে সম্পাদিত হয় সে বিষয়ে কেউ পরামর্শ দিয়ে যদি সাহায্য করতে চান তাঁদের মতামতও গৃহীত হবে সাদরে। শিশু কিশোর আকাদেমির বয়স এক্ষণে দেড় বছরের সামান্য বেশি। অর্থবলও তেমন নয়, তা সত্ত্বেও আমাদের ইচ্ছে আরও আরও বই প্রকাশ করা যাতে আকাদেমির প্রকাশিতব্য বইগুলি ছোটোদের সামনে খুলে দেয় সেই অনাস্বাদিত পৃথিবী যা তারা স্বপ্ন দেখে, তারা কামনা করে তাদের নিভৃত মুহূর্তে।

ছোটোদের ভালো-লাগা আমাদের কানে পৌঁছোলে সার্থক হবে এই প্রকাশনা।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
সচিব

স্বপ্নপুরীর পথে

'শিশু কিশোর আকাদেমি' শিশুদের স্বপ্নপুরীর ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে গড়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই আকাদেমি ছোটোদের মনের মনোভূমিতে হাজার মণিমুক্তোর চাষ করতে চেয়ে নিয়ে চলেছে একের পর এক বিস্ময়কর পদক্ষেপ, 'সারা পৃথিবীর রূপকথা' তার মধ্যে উজ্জ্বলতম। মাত্র দেড় বছরের এক দামাল শিশু এই আকাদেমি কোন জাদুবলে তার ছোট্ট মুঠিতে ধরতে চেয়েছে সারা পৃথিবীর রূপকথার জগৎকে তা বলতে পারে একমাত্র ছোটোরাই। প্রকাশনার দায়িত্বে থেকে শুধু এটুকুই বলতে পারি 'সারা পৃথিবীর রূপকথা' এই মলাটের ভিতরে ছাপার অক্ষরে ধরা পড়েছে পৃথিবীর সব শিশুদের চিরদিনের চাওয়া সেই স্বপ্নজগৎ, দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে যেখানে রাখা আছে খুশি আর আনন্দের জিয়নকাঠি। এই জিয়নকাঠির স্পর্শে কচি চারাগাছের মতো শিশুদের জীবন ফুলে-ফলে ভরে উঠবে, একঘেয়ে বাস্তবতার জাল ছিঁড়ে আগামী পৃথিবীকে তারা আনন্দের ঠিকানা বলে দিতে পারবে—কেবলমাত্র এই আশা নিয়ে রূপকথার মহাসমুদ্র ছেঁচে আমরা তুলে আনতে চেয়েছি সবচেয়ে উজ্জ্বল রত্নগুলোকে।

'সারা পৃথিবীর রূপকথা' (এশিয়া খণ্ড) প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা বারবার অনুভব করেছি পিঁপড়ের মিছরির পাহাড় বহন করার মতোই এ কাজ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। তবে সেই অনুভূতি আমাদের নিরস্ত করার বদলে আরও শক্তি জুগিয়েছে, ছোটোদের হাতে তাদের স্বপ্নলোকের চাবি তুলে দিতে আমরা হয়েছি দৃঢ়সংকল্প। অবশেষে এই কাজে নিবেদিতপ্রাণ অনেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা পারলাম রূপকথার মিছরি পাহাড়ের অন্তত একটি মিষ্টি টুকরো আমাদের আদরের ছোটোদের হাতে পৌঁছে দিতে। এই সুমিষ্ট স্বাদ তাদের আগামী জীবনকে মধুময় করে তুলুক—সার্থক হোক আমাদের প্রচেষ্টা।

ড. শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশনা পরিচালক

ভূমিকা

রাজপুত্তুর চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাত রাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।

সে হল যে কালের কথা সে কালের আরম্ভও নেই শেষও নেই। শহরে গ্রামে আর-সকলে হাট বাজার করে, ঘর করে, ঝগড়া করে, যে আমাদের চিরকালের রাজপুত্তুর সে রাজ্য ছেড়ে ছেড়ে চলে যায়। কেন যায়?

কুয়োর জল কুয়োতেই থাকে, খাল-বিলের জল খাল-বিলের মধ্যেই শান্ত। কিন্তু গিরিশিখরের জল গিরিশিখরে ধরে না, মেঘের জল মেঘের বাঁধন মানে না। রাজপুত্তুরকে তার রাজ্যটুকুর মধ্যে ঠেঘিয়ে রাখবে কে? তেপান্তর মাঠ দেখে সে ফেরে না, সাত-সমুদ্র তেরো-নদী পার হয়ে যায়।

মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে জন্মায় আর বারে বারে নতুন ক'রে এই পুরাতন কাহিনীটি শোনে। সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো স্থির হয়ে থাকে, ছেলেরা চুপ ক'রে গালে হাত দিয়ে ভাবে, 'আমরা সেই রাজপুত্তুর'।

[রাজপুত্তুর। লিপিকা : রবীন্দ্রনাথ]

মানবসমাজ যেদিন থেকে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করল, সেদিন থেকেই সন্ধের আলো-আঁধারিতে বাড়ির দাওয়ায় বসে ঠাকুমা-দিদিমার কাছ থেকে রূপকথা শুনে আসছে। এই রূপকথা শুনে আসছে পৃথিবীজোড়া সব দেশের সব গোষ্ঠীর শিশু-কিশোরেরা। অফুরন্ত ভাণ্ডার সেই রূপকথার।

কিন্তু সেসব মুখে মুখে রচিত হত, বংশ পরম্পরায় সাধারণত মেয়েরা রূপকথা স্মৃতিতে ধরে রাখত। এগুলো লিখে রাখবার মতো শিক্ষাদীক্ষা তাদের ছিল না। তাই আমরা জানতাম সব দেশে সব ভাষায় রূপকথা আছে। কিন্তু ভাষার কারণে অন্যদের রূপকথার কোনো গল্পই জানা যেত না। লক্ষ লক্ষ রূপকথা এভাবে নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে প্রচারিত হতে পারেনি।

পৃথিবীর রূপকথার এই সংকলনে এশিয়ার চল্লিশটিরও বেশি দেশের রূপকথা রয়েছে। এইসব দেশের নানা বিচিত্র ভাষা, সব ভাষা জেনে এই ধরনের সংকলন করা সম্ভব নয়। অথচ উনিশ শতক থেকেই গোটা বিশ্বে নানান দেশের রূপকথার সংকলন প্রকাশিত হতে থাকে। আড়াইশো-তিনশো বছরের সমুদ্র অভিযানের ইতিহাসের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সেইসব তথ্য।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু হলেও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইউরোপীয় দেশসমূহের অসংখ্য অভিযাত্রী সাগর পেরিয়ে এশিয়া আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পলিনেশিয়া মাইক্রোনেশিয়া মেলানেশিয়া আমেরিকার বিভিন্ন সমুদ্রকূলবর্তী দেশে আসতে শুরু করে। নতুন দেশ 'আবিষ্কারের' আকাঙ্ক্ষা যে একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু সেইসব দেশের সম্পদ লুণ্ঠনই ছিল প্রাথমিক তাগিদ ও মূল লক্ষ্য।

সেইসব দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী উন্নত অস্ত্রসজ্জিত ও বীভৎস নিষ্ঠুর অমানবিক ইউরোপীয়

শক্তির বিরুদ্ধে তেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। আবার প্রথম দিকে এই বিদেশি মানুষদের কৌশল ও ছল-চাতুরিও তারা বুঝে উঠতে পারেননি।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এইসব দেশে ব্যাপক ও বহু কালের জন্য 'স্থায়ী' উপনিবেশ গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে দুই-একটি ব্যতিক্রমী দেশ ছাড়া ইউরোপের বাইরের সব দেশ ইউরোপের উপনিবেশে পরিণত হয়। এই সময়কালেই শাসক প্রভুদের পাশাপাশি এলেন কিছু মানবতাবাদী সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী, খ্রিস্টীয় ধর্মযাজক ও আলোকপ্রাপ্ত উদার প্রশাসক। এই তিন ধরনের মানুষের নিরলস আন্তরিক প্রেরণায় লোকসমাজের হাজার হাজার লোককথা-ছড়া-গান-প্রবাদ-ধাঁধা সংগৃহীত হয়ে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে লাগল। ইউরোপীয় দেশ গ্রেট ব্রিটেন ফ্রান্স স্পেন জার্মানি বেলজিয়াম হল্যান্ড-এর সবচেয়ে বেশি উপনিবেশ ছিল। সেইসব দেশের ইউরোপীয় ভাষায় এসব অনূদিত হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ল। তার পরে সেইসব মৌখিক সাহিত্য মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে সকলের কাছে পৌঁছোল।

আমাদের ভারতবর্ষও পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ধীরে ধীরে ইংল্যান্ডের উপনিবেশে পরিণত হল। উপমহাদেশ সদৃশ পরাধীন ভারতবর্ষে অসংখ্য গোষ্ঠী, শত শত ভাষা, বহু প্রদেশ, বহু আদিবাসী সম্প্রদায়। এক এলাকার মানুষ অন্যের ভাষা বোঝে না। এইসব মানুষের অসংখ্য রূপকথা ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী, ধর্মীয় পুরোহিত ও প্রকাশক সেইসব স্থানীয় ভাষা শিখে তার থেকে অনুবাদ করে প্রকাশ করলেন। অতএব রূপকথার সঙ্গে গোটা ভারতবর্ষ পরিচিত হয়ে বিস্মিত হল।

এইভাবেই বিশ্বের রূপকথা সংগৃহীত হয়েছে। রূপকথার প্রথম খণ্ড সংকলনে এশিয়ার যেসব রূপকথার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হল, সেগুলির সংগ্রহের ইতিহাসও একই।

পৃথিবীর রূপকথার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। এই খণ্ডে এশিয়া মহাদেশের প্রায় সমস্ত দেশের রূপকথা রয়েছে। শুধু ভারতের রূপকথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কেননা, ভারতের রূপকথার একটি আলাদা খন্ড প্রকাশিত হবে।

এশিয়া মহাদেশের মতো এত বৈচিত্র্যপূর্ণ দ্বিতীয় মহাদেশ নেই। বিশাল এই মহাদেশে চল্লিশটির ওপর স্বাধীন রাষ্ট্র রয়েছে। উত্তরে রাশিয়ার সীমান্ত থেকে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে তুরস্ক-সাইপ্রাস থেকে পূর্বে জাপান-তাইওয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিশাল ভূখণ্ডের আয়তন ৪,৪০,০৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার। পূর্ব থেকে পশ্চিমের দূরত্ব ৯,৭০০ এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে ৮,৬৯০ কিলোমিটার।

বৈচিত্র্য শুধু বিশালতায় নয়। দক্ষিণে ও পূর্বে বিশাল উপকূলরেখা। উত্তর ও পশ্চিমে বিশাল এলাকাজুড়ে পর্বতমালা। অনেক দ্বীপময় দেশ, নদীমাতৃক দেশ, প্রায় নদীশূন্য দেশ, মরুময় দেশ, পাহাড়ি দেশ,—সবই রয়েছে এই মহাদেশে। এখানেই রয়েছে পৃথিবীর উচ্চতম দুই পর্বতশৃঙ্গ—এভারেস্ট ও কে2। আর অনেক ভাষা, অনেক সংস্কৃতি, জীবনযাপন পদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাকে এই মহাদেশকে বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর জীবন্ত চলমান জাদুঘর বলে মনে হয়।

খুব স্বাভাবিক কারণেই সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কারণে

রূপকথাও প্রজাপতির বহুবর্ণ ডানার মতোই বর্ণময়। দ্বীপময় দেশগুলির সঙ্গে ডাঙাঘেরা দেশের মানুষের জীবনযাত্রায় অনেক পার্থক্য। অনুর্বর ফসলের জমির দেশ কিংবা বরফঢাকা দেশের সঙ্গে শস্যশ্যামলা দেশের জীবনযাত্রা-পালা পার্বণ-উৎসব-সংস্কৃতির অনেক পার্থক্য। রূপকথার মধ্যে আমরা সেই বৈচিত্র্যকে দেখতে পাব। কিন্তু যে লোকসমাজ এইসব রূপকথা সৃষ্টি করেন, তাদের মানসিকতায় এমন মিল থাকে যে, সব দেশের রূপকথার মধ্যেই এক মানবিক সেতু-রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কাহিনির পার্থক্য থাকলেও শেষ বক্তব্যে আশ্চর্য মিল রয়েছে। মানুষের কল্যাণ হোক, বিপদ থেকে যেন ভালো মানুষ উদ্ধার পায়, দুষ্টু লোক যেন শাস্তি পায়, ভাই-বোন যেন সুখে থাকে, যারা নিষ্ঠুর অত্যাচারী তারা ফলভোগ করবেই, মায়েরা কখনও ছেলের অমঙ্গল চায় না,—এইসব কামনা যেন সব রূপকথার প্রাণ। এখানেই রয়েছে দেশে দেশে রূপকথার মানসিক ও মানবিক সাদৃশ্য।

এই ধরনের গল্পকে আমরা সাধারণত রূপকথা বলি। যেমন ইংল্যান্ডে বলা হয় ফেইরি টেলস। কিন্তু সেগুলো তো সব পরিকথা নয়! আসলে লোককথার কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। লোককথার মধ্যে রয়েছে রূপকথা পশুকথা নীতিকথা পরিকথা কিংবদন্তি ব্রতকথা মিথকথা বা লোকপুরাণ।

এশিয়া মহাদেশের লোককথার এই সংকলনে ব্রতকথা ছাড়া আর সব বিভাগ রয়েছে। ব্রত রয়েছে সব দেশেই, কিন্তু ব্রতকথা একান্তই ভারতীয় সমাজের সৃষ্টি। ভারতের লোককথা খণ্ডে ব্রতকথা থাকবে।

লোককথার এই ভাগগুলির বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে গল্পগুলোর রস অনুভব করা সহজ হবে। কেননা, প্রতিটি ভাগের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, পাত্রপাত্রীর মন-মেজাজ অন্যভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

ক. রূপকথা। আফ্রিকা মহাদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লোককথা হল রূপকথা। আফ্রিকায় সবচেয়ে জনপ্রিয় পশুকথা ও মিথকথা। আধুনিক বিশ্বে উনিশ শতকের প্রথমে লোককথার লিখিত রূপের যে প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয় তা রূপকথার। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে দুই ভাই জেকব ল্যুডউইগ কার্ল গ্রিম ও উইল্‌হেল্‌ম কার্ল গ্রিম জার্মানির কৃষকদের কাছ থেকে রূপকথা শুনে তার সংকলন প্রকাশ করেন।

রূপকথা পশুকথার মতো প্রাচীন না হলেও খুব প্রাচীন। শ্রুতি ও স্মৃতির ওপরে নির্ভর করে মুখে মুখে রূপকথা এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে বয়ে এসেছে। তাই কালে কালে রূপকথা পরিবর্তিত হতে থাকে। যিনি রূপকথা বলছেন তিনি তার মনের মাধুরী মিশিয়ে শোনা রূপকথাকে অন্যভাবে বলতেই পারেন। তাই অকৃত্রিম রূপকথা বলে কিছু হয় না। লোককথার মধ্যে রূপকথাই আকারে দীর্ঘতম। এর কারণ হল, রূপকথার গল্প এমনই যে কথক ইচ্ছে করলে গল্পকে বাড়াতে পারেন। অনেক উপকাহিনি এর মধ্যে যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। যেমন, রাজপুত্র বা নায়ক অনেক বাধা পেরিয়ে পাতালপুরীতে রাজকন্যার সন্ধানে যাচ্ছে, কথক যাত্রাপথের এই বাধাগুলিকে সংখ্যায় বাড়াতে পারেন। কথকের ব্যক্তিগত মানসিকতা রূপকথাকে

দীর্ঘায়িত করতে সাহায্য করে। অবশ্য রূপকথা যে সবসময়েই দীর্ঘ হয় তা কিন্তু নয়।

আফ্রিকার রূপকথায় পাত্রপাত্রীদের নাম জানা যায়। অন্য সব দেশের রূপকথায় কোনো চরিত্রের নাম পাওয়া যায় না। ডালিমকুমার শীত-বসন্ত নীলকমল-লালকমল প্রভৃতি ব্যতিক্রম।....এক যে ছিল রাজা, তার তিন রানি, রাজপুত্র কোটালপুত্র মন্ত্রীপুত্র রাজ্য ছেড়ে অভিযানে গেল, রাজকন্যাকে উদ্ধার করল,—এভাবেই রূপকথা এগিয়ে চলে।

রূপকথার একটি ছাঁচ রয়েছে। এর আরম্ভ ও শেষ প্রায় একই রকমের। রূপকথার শেষে সবসময় মিলন, আনন্দ, ঘরে-ফেরা, উৎসব। বিয়োগান্ত পরিণতি হয় না। রূপকথার মধ্যে সেই সেই সমাজের বাস্তব ছবি ফুটে ওঠে। হয়তো কিছু প্রতীক ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তার খোলস উন্মুক্ত করলেই সমাজের ছবি স্পষ্ট হবে।

লালবিহারী দে-র 'ফোকটেলস অব বেঙ্গল', দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুমা-র ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'চিরদিনের রূপকথা', হানস্ খ্রিস্টিয়ান অ্যান্ডারসেনের রূপকথার বই, শোভনা দেবীর 'ওরিয়েন্টাল পার্লস' রূপকথার অনন্য সংকলন।

খ. পশুকথা। পশুপাখিকে কেন্দ্র করে যেসব কাহিনি গড়ে ওঠে তাকে সাধারণত পশুকথা বলে। কাহিনিতে পশুপাখি থাকলেই কিন্তু তা পশুকথা হবে না। মূল চরিত্র হবে পশুপাখি, যাকে ঘিরে আবর্তিত হবে গল্প।

পশুকথা সবসময় আকারে ছোটো হয়। এইসব পশুপাখি আচরণে পশুপাখি নয়। সকলেই মানুষের মতো কথা বলে, মানুষের মতো আচরণ করে। মানুষের সমাজের আচার-আচরণ-আশা-আকাঙ্ক্ষা-হীনতা-ক্ষুদ্রতা-বীরত্ব-স্বার্থপরতা-ঈর্ষা-বুদ্ধি সবই পশুপাখির মাধ্যমে ও প্রতীকে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

বিশ্বের সব দেশেই পশুকথার সংখ্যা অনেক। এশিয়ার আরব ভূখণ্ডে পশুকথার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। কেননা, সেসব দেশের পশুর সংখ্যাও খুব কম। পণ্ডিতেরা সকলেই একমত, লোককথার মধ্যে পশুকথাই সবচেয়ে প্রাচীন। আদিম সমাজ পশুপাখিকে ঘিরেই প্রথম গল্প সৃষ্টি করেছিল। এরাই ছিল সবচেয়ে পরিচিত প্রতিবেশী। এই সমাজের আচার-আচরণ-নৃত্য ছিল পশুকে ঘিরেই। তারা পশুকে অনুকরণ করত। মানুষের প্রথম বন্ধু কুকুর। পশু ছিল তাদের আরাধ্য দেবতা। বিভিন্ন সমাজে বিচিত্র সব পশুপাখিকে মানুষ পুজো করত। অনেক পশুপাখিই হয়েছে দেবতার বাহন। পশুপুজো আজও লোকাচারে প্রচলিত রয়েছে। প্যাঁচা ঈগল গোরু ভালুক হাতি নেকড়ে বাদুড় সিংহ আজও পবিত্র পশুপাখি বলে স্বীকৃত।

আদিম সমাজ তাদের কৌম ও গোত্রের নাম রেখেছে পশুপাখির নামে। একে টোটেম বিশ্বাস বলে। এই টোটেম আদি পিতা। তাই যে গোষ্ঠীর যে টোটেম, তারা সেই পশুপাখির মাংস খায় না কিংবা আঘাত করে না। সাঁওতাল আদিবাসীদের একটি গোত্র হাঁসদা। হিন্দুদের গোত্রনামও পশু ও গাছ থেকে এসেছে। ভরদ্বাজ—ভরত বা ভারুই পাখি, শাণ্ডিল্য—বেলগাছ, কাশ্যপ—কচ্ছপ ও অগস্ত্য—বকফুল।

মানুষ প্রথম যে ছবি আঁকল গুহায়, তাও হরিণ বাইসন প্রভৃতি পশুর। রাশিচক্রও

গড়ে উঠল প্রাণীকে কেন্দ্র করে,—বৃষ মেষ সিংহ বৃশ্চিক কর্কট মীন মকর।

পশুপাখির এই সার্বিক প্রভাব সেই সমাজে ছিল বলেই তারা অক্লান্তভাবে পশুকথা সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ পশুকথায় কয়েকটি সাদৃশ্য রয়েছে, শেয়াল খুব চালাক, খরগোশ চট্‌পটে ও বুদ্ধিমান, ভালুক-গাধা-হাতি-বাঘ খুব বোকা। পশুকথায় দেখা যায় যে-পশুপাখি খুব ছোটো অসহায় দৈহিক শক্তি কম, শেষ পর্যন্ত তারাই জয়ী হয়। টুনটুনি খরগোশ পিঁপড়ে রবিন ভেড়া শেয়াল কখনও পরাভূত হয়নি পশুকথায়। ভেড়ার একটি পশুকথাই শুধু ব্যতিক্রম।

অধিকাংশ নীতিকথাই পশুকথাকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই', বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র', পিলপের 'নীতিকথা', নারায়ণের 'হিতোপদেশ', গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা', ঈসপের 'নীতিকথা', লা ফঁতেনের 'নীতিকথা' প্রভৃতি পশুকথার অনন্য সংকলন।

গ. নীতিকথা। যেসব গল্পে নীতি-উপদেশ দেওয়া হয় তাদের নীতিকথা বলা হয়। ইংরেজিতে বলা হয় 'ফেব্‌লস্‌'। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মের বইতে নীতিকথা থাকে। মহাভারতে ভীষ্মের পশুকথার মাধ্যমে নীতিকথা ও নিউ টেস্টামেন্টে জিশুখ্রিস্টের 'প্যারব্‌ল' সর্বজনবিদিত।

সমাজের কিছু সচেতন পণ্ডিত মানুষ শিশু-কিশোরদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবার আন্তরিক ইচ্ছায় এইসব নীতিকথা সৃষ্টি করেন। এইসব কাহিনির শেষে একটি উপদেশ থাকে। এঁরা জানতেন, শুধু শুকনো উপদেশ ছোটোরা কেন কেউ শোনে না। তাই তাঁরা গল্পের আশ্রয় নিয়েছেন। এবং শেষে কাহিনির মর্মকথা শুনিয়েছেন।

সিংহ ও খরগোশের গল্প। খরগোশের মতো ছোট্ট পশুর বুদ্ধিতে সিংহ কুয়োয় পড়ে মারা গেল। বলা হল, দৈহিক শক্তিই সব নয়, বুদ্ধি যার বল তার। এমন উদাহরণ ও নীতিশিক্ষা নীতিকথার সব গল্পে ছড়িয়ে আছে।

বিষ্ণু শর্মা নারায়ণ ঈসপ লা ফঁতেন-এর নীতিকথার পৃথিবীজোড়া খ্যাতি।

ঘ. পরিকথা। যেসব গল্পে পরি প্রধান চরিত্র তাকেই পরিকথা বলে। বিশ্বের নানা দেশের লোককথায় পরি চরিত্র রয়েছে, কিন্তু সেসব পরি গল্পে এসেছে সামান্য সময়ের জন্য। এশিয়া মহাদেশের আরব ভূখণ্ডেই পুরোপুরি পরিকথার সন্ধান পাওয়া যায়। এশিয়া মহাদেশের সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, ওমান, ইয়েমেন প্রভৃতি দেশে সত্যিকার পরিকথা পাওয়া যায়।

পরিরা থাকে সাধারণত দূর আকাশে মেঘের রাজ্যে। পরিরা খুব উপকারী, সরলপ্রাণ ও লাজুক। দুষ্টু পরির কথা কোথাও নেই।

পরিরা দূর মেঘের রাজ্য থেকে মাটির পৃথিবীতে আসে নদী-সরোবরে চান করতে। আকাশে তো জলাশয় নেই। পরিদের ডানা থাকে, তারা উড়তে পারে, হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে পারে। পরিদের পোশাক সব সময় সাদা। অনেক পরিকথায় পরির সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের বিয়ের কথাও আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরি আকাশেই ফিরে যায়।

ঙ. কিংবদন্তি। ইংরেজি 'লেজেন্ড' বলতে বাংলায় কিংবদন্তি বোঝায়। কিংবদন্তিতে যে গল্প থাকে মানুষ মনে করে একদিন তা ঘটেছিল। তাদেরই এলাকায় এসব ঘটনা ঘটেছিল। তাই কিংবদন্তির মধ্যে ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

যেমন ধরা যাক একজন বীর মানুষের কথা। এই মানুষটি একদিন তাঁর ত্যাগ-শৌর্য-বুদ্ধিতে বিশেষ সমাজে জীবিত অবস্থাতেই প্রায় দেবতা হয়ে উঠেছেন। তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছুকাল পরে তাঁকে ঘিরে সম্ভব-অসম্ভব গল্প মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকে। কিন্তু বহু পুরুষ-পরম্পরায় আজ আমরা সেই কাহিনির রূপকে যে অবস্থায় পাচ্ছি, তাতে তার মধ্যে ইতিহাসের সূত্র অনুসন্ধান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অনেক ইতিহাসবিদ বলেন, হারকিউলিস প্রমিথিউস কৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কিন্তু কিংবদন্তির মধ্যে তাঁদের যে কাহিনি পাওয়া যায় তার মধ্যে ইতিহাসের সত্য আবিষ্কার প্রায় অসম্ভব।

রাজস্থানের বীরাঙ্গনা, সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিদো-কানহু, মুন্ডা বিদ্রোহের নায়ক বিরসা ভগবান, রঘু ডাকাত,—সকলেই ঐতিহাসিক মহান ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাঁদের ঘিরে যেসব কিংবদন্তি শোনা যায়, সেসব ইতিহাস নয়। প্রাচীনকালে অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ লেখা হয়েছিল যেগুলি নির্ভেজাল কিংবদন্তির সংকলন।

প্রতি সমাজে কিংবদন্তি থাকবেই। গুপ্তধনের সন্ধান, কোনো বীর বা বীরাঙ্গনার করুণ আত্মত্যাগ, ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনো নগরের কথা, অভিশপ্ত প্রাসাদ, ডাকাতকালীর মন্দির, নির্জন ভুতুরে শ্মশান, গভীর হ্রদের তলদেশ, পাহাড়ি গুহা প্রভৃতি বিষয়েই বেশি কিংবদন্তি পাওয়া যায়।

চ. মিথকথা বা লোকপুরাণ। মিথকথার মধ্যে মানবমনের রহস্যঘন রূপটির সন্ধান পাওয়া যায়। যে জনগোষ্ঠী যত প্রাচীন ও পুরোনো মূল্যবোধে অচল রয়েছে তাদের মধ্যে আদিম মিথকথার সন্ধান বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু সব জনগোষ্ঠীতেই মিথকথা অল্প হলেও থাকবেই। তবু অসংখ্য লোকপুরাণ রয়েছে ভারতবর্ষ চিন গ্রিস রোম মিশর মেসোপটেমিয়া ব্যাবিলন অস্ট্রেলিয়া-আফ্রিকা-দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী সমাজ স্ক্যান্ডেনেভীয় সুইডেন নরওয়ে ফিনল্যান্ড দেশের ঐতিহ্যে। প্রাচীনতম পাঁচটি মহাকাব্য গিলগামেশ রামায়ণ মহাভারত ইলিয়ড ও ওডিসি গড়ে উঠেছে অনেক মিথকথার মাধ্যমে।

লোকপুরাণ বা মিথকথাকে বলা হয়, প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগের বিজ্ঞান। সমাজের চারিদিকে, আকাশে, মাটিতে, নদীতে, সমুদ্রে যেসব প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটছে তার উত্তর খোঁজার তাগিদেই প্রথম সৃষ্টি-বিষয়ক মিথকথার সৃষ্টি হয়। বৃষ্টি কেন হয়, বন্যা কেন গ্রাম ভাসায়, আকাশে কেন বজ্র-বিদ্যুৎ, মানুষ জন্মাল কেমন করে, পশু পাখি গাছ গাছালি সূর্য তারা মেঘ পাহাড় রোগ মৃত্যু ব্যাধির সৃষ্টিরহস্য, মানুষ আগুন পেল কেমন করে, শুয়োর কেন মাটি খোঁড়ে, খরগোশের ঠোঁট কেন বিভক্ত, ভালুকের লেজ কেন ছোটো, প্রজাপতির পালকে এত রং কেন, ডিমের মধ্যে থেকে কীভাবে প্রাণ জন্মায়,—এমন হাজারো 'কেন'র উত্তর খুঁজতেই মিথকথার সৃষ্টি

হয়েছে। সেই সমাজ তাদের মতো করেই উত্তর খুঁজছে। হয়তো কোনো যুক্তি নেই, কিন্তু নিজেদের মনগড়া সিদ্ধান্তে তারা খুশি হয়েছে।

মিথকথার মধ্যে অসম্ভব অবাস্তব কল্পনার বাড়াবাড়ি রয়েছে। কিন্তু কাহিনিগুলির বাঁধুনি রহস্য ও সাহিত্যরস সকলকেই বিস্মিত করবে।

আজকের বিশ্বে সব প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলেও অধিকাংশ রহস্যের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ হয়েছে। প্রকৃতি ও প্রাণীজগৎ সম্পর্কে ব্যাপ্ত রহস্যভেদ হয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষ কাহিনির আকর্ষণে মুগ্ধ হয়। মিথকথার অতিপ্রাকৃত ঘটনায় আজ আর অধিকাংশ মানুষ সঙ্গত কারণেই বিশ্বাস করে না, কিন্তু মিথকথা পড়ে যিনি তৃপ্তি পাবেন না তিনি নেহাতই বেরসিক ও সাহিত্যরস-বঞ্চিত।

সবই অবাস্তব, তবু রামচন্দ্রের সমুদ্রে সেতুবন্ধন, ভীমের রাক্ষসবধ, জটায়ুর আত্মোৎসর্গ, স্বর্গ থেকে প্রমিথিউস আগুন এনে মানুষকে দিল, ইউলিসিসের সমুদ্রযাত্রা, ট্রয়ের যুদ্ধ, মোজেসের সত্যানুসন্ধান, সাঁওতাল সমাজের পিলচু হারাম পিলচু বুড়ির পরম্পরা,—এরকম হাজার হাজার মিথকথা মানবসমাজের অনন্য সৃষ্টি হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে।

মিথকথার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক রয়েছে। পুরোনো কালে মানুষ ধর্মীয় ভাবনায় পরম ভক্তিতে মিথকথা শুনত। তারা ভাবত, এসব সত্যিই ঘটেছিল, দেবতা না হলে এমন সব কাণ্ড ঘটাবার ক্ষমতা তো আর কারও থাকতে পারে না।

লোককথার এইসব ভাগগুলির বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে গল্পগুলোর রস পরিপূর্ণভাবে অনুভব করা যাবে।

একই লোককথা বিভিন্ন দেশে প্রায় হুবহু শুনতে পাওয়া যায়। যেমন, সিংহ ও খরগোশের পশুকথা। ছোট্ট খরগোশ কীভাবে অতি শক্তিমান পশুরাজকে বোকা বানিয়ে কুয়োর মধ্যে লাফিয়ে পড়তে প্ররোচিত করল তারই মজার কাহিনি। এই পশুকথা এবং একই সঙ্গে নীতিকথা ভারত তিব্বত গ্রিস আফগানিস্তান লিথুয়ানিয়া উজবেকিস্তান ও ভুটানে পাওয়া গিয়েছে। এরকম অসংখ্য একই লোককথা নানা দেশে শুনতে পাওয়া যায়। 'স্নো হোয়াইট ও সাতজন বামন' রূপকথাটি আফ্রিকার কঙ্গো দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। আফ্রিকার মেয়ের দেহের রং তো বরফশুভ্র হতে পারে না। তাই সে আবলুশ কাঠের মতো কালো, আর সাত বামনের পরিবর্তে সাত ডাকাত। অন্য কোনো পার্থক্য নেই। এই সাদৃশ্য কেমন করে ঘটে?

প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে এক এলাকার লোককথা অন্য এলাকায় ছড়াতে পারে। একসময় উপনিবেশবাদীরা আফ্রিকার উপকূলবর্তী দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভুলিয়ে এবং জোর করে জাহাজে করে চালান দেয় বিভিন্ন দেশে। খনি-বাগিচার জন্য ক্রীতদাস নিয়ে যাওয়া হয়। আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ত্রিনিদাদ লিওনার্ড বারবাডোস ভার্জিন টোবাগো জ্যামাইকা প্রভৃতি এলাকার বৃহৎসংখ্যক মানুষের আদি বাসভূমি আফ্রিকা। এইসব জন্মভূমি-বিচ্ছিন্ন মানুষের মধ্যে লোককথা সংগ্রহ করে দেখা গিয়েছে, কিছু কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও

তারা যেসব লোককথা বলছে সেগুলো আফ্রিকার লোককথা। পাঁচ-ছয় পুরুষ তারা কোনোদিন জন্মভূমি দেখেনি, মাতৃভাষা ভুলে গিয়েছে কিন্তু পুরুষ-পরম্পরায় লোককথা বলে চলেছে।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা উত্তরবঙ্গে চা বাগিচা পত্তনের জন্য সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুরের সাঁওতাল মুন্ডা ওরাঁও আদিবাসীদের ভুলিয়ে ও জোর করে কুলি-কামিন করে নিয়ে গিয়েছিল। বহু বৎসর কেটে গিয়েছে, তাদের লোককথা-সংগীত-পরবের মধ্যে আদি জন্মভূমির কথাই প্রকাশ পায়। লোককথার মধ্যে অধিকাংশ লোককথাই এই তিন আদিবাসী মানুষের আদি বাসভূমির লোককথা।

এই দৃষ্টান্তগুলি প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে, বাধ্যতামূলক জন্মভূমি পরিত্যাগের ফলে ঘটে। কিন্তু এসব সাদৃশ্য তুলনায় অতি সামান্য।

আসলে দেশে দেশে লোককথার সাদৃশ্যের মূল কারণ অন্য। কোনো প্রভাব বা জনবসতির সংযোগের ফলে এসব ঘটে না। খুব বিস্ময়কর এই তত্ত্ব। কিন্তু অস্বীকার করার কোনো পথ নেই। দীর্ঘ গবেষণার পর এইসব তথ্য স্বীকৃত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, এইসব সদৃশ লোককথা নিরপেক্ষভাবে লোকসমাজে সৃষ্টি হয়েছে, কোনো প্রভাবে নয়। মাইগ্রেশান হয়নি। ভারতের ছত্তিশগড়ের আদিবাসীদের পশুকথা পাওয়া গেল দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর আদিবাসীদের মধ্যে। শ্রীলঙ্কার আদিবাসীদের রূপকথা পাওয়া গেল আফ্রিকার তানজানিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে। মেলানেশিয়ার সাণ্টা ইসাবেল দ্বীপের মিথকথা পাওয়া গেল এশিয়ার মঙ্গোলিয়ায়। এরকম হাজার হাজার দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হওয়ার পরেই দেশে দেশে লোককথা যে নিরপেক্ষভাবেই সৃষ্টি হয়েছে সেই বিষয়ে এঁরা নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু কেমন করে অমন সাদৃশ্য দেখা গেল? পৃথিবীতে মানবসমাজের বিকাশ একই সময়ে একইভাবে ঘটেনি। সামাজিক - অর্থনৈতিক অসম বিকাশ হয়েছে। আজও পৃথিবীর অনেক জনগোষ্ঠী প্রস্তর যুগের সংস্কৃতিতে অবস্থান করছে, অনেক গোষ্ঠী খাদ্য-সংগ্রাহক কিংবা যাযাবর পশুশিকারি। অনেক জনগোষ্ঠী এখনও কৃষিকাজ জানে না। কিন্তু অসম বিকাশ সত্ত্বেও মানবসমাজ বিবর্তনের পথে এগিয়ে চলার সময় সর্বজনীন কতকগুলি অভিজ্ঞতা অর্জন করে। খাদ্য-সংগ্রাহক শিকারজীবী কৃষিজীবী—সকলকেই এই স্তরগুলি অতিক্রম করতে হয়। আর এই বিবর্তনের পথে এগোতে এগোতে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, পরিবেশ-সচেতনতা, পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক শৃঙ্খলা, পশুপাখি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ, গাছ-গাছালির গুণাগুণ, আত্মীয় সম্পর্ক— প্রভৃতি বিষয় সংহত হয়ে মৌখিক সাহিত্যে অর্থাৎ লোককথা গান প্রবাদ ছড়া প্রভৃতির মধ্যে রূপলাভ করল। সাহিত্যে যা বলা হল, পৃথিবীজোড়া একই অভিজ্ঞতা বলেই একই ধরনের কাহিনি গড়ে উঠল। পার্থক্য শুধু পাত্রপাত্রীর নামে। আসলে, বিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কহীন অবস্থাতেই এইসব লোককথার সৃষ্টি হয়েছে।

এশিয়ার লোককথার এই সংকলনে এমন অনেক লোককথা রয়েছে যাদের সন্ধান অন্য দেশেও পাওয়া যাবে। তাই কোন দেশের গল্প প্রথম রচিত হয়েছিল তার উৎসসন্ধান অসম্ভব।

লোককথা যেহেতু গ্রামীণ গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের সৃষ্টি তাই প্রতিটি লোককথার মধ্যে সেই

সেই জনগোষ্ঠীর সমাজের কথা থাকবেই। সামাজিক আচার-আচরণ-রীতিনীতি-পরব-জীবনদর্শন-আকাঙ্ক্ষা-ইচ্ছাপূরণের তাগিদ পরিস্ফুট হবেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুই লোককথায় নেই।

লোককথায় আপাতদৃষ্টিতে অনেক অলৌকিক অতিপ্রাকৃত বিষয় নজরে পড়ে। কিন্তু সেগুলি সব প্রতীক ও রূপক। বাস্তব জগতে লোকসমাজ কোনোদিন রাক্ষস-খোক্কস-দৈত্য-দানো দেখেনি। তাহলে লোককথা বিশেষ করে রূপকথা ও মিথকথায় এদের দেখা যায় কেন? আসলে, আমাদের সমাজে দুষ্টু, সংকীর্ণ, আত্মসর্বস্ব, স্বার্থপর, হিংসুটে, অন্যায়কারী, ক্ষতিকারক, অকারণ প্রতিহিংসাপরায়ণ অনেক মানুষ থাকে। সেইসব মানুষকে এইভাবে রূপকে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু এইসব দুষ্টু মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। অধিকাংশই ভালো মানুষ, সৎ মানুষ, বন্ধু মানুষ। তাই লোককথায় এইসব পবিত্র মনের মানুষেরই পরিচয় পাওয়া যায় সর্বত্র। লোককথায় এইসব মানবিক গুণ আরোপিত হয়েছে পশুপাখির চরিত্রে। তারাও মহান প্রতিনিধি।

লোককথাগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়লেই মনে পড়বে, এইসব কাহিনি শুধুমাত্র আনন্দ বা বিনোদনের প্রকাশ নয়, লোককথার মধ্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বেদনাময় সংগ্রামের কথা, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার কথা, রূঢ় বাস্তবতার করুণ কথা লুকিয়ে রয়েছে। দারিদ্র্য, বঞ্চনা, সামাজিক অধিকার, উৎপীড়ন, জীবনযুদ্ধের জ্বালা, নিষ্ঠুরতা, মহান আত্মত্যাগ, পবিত্র মাতৃত্ব, ভাই-বোনের স্নেহের বন্ধন, অত্যাচারীর অমানবিকতা, শিশুশ্রমের কষ্ট, সৎ মায়ের হৃদয়হীনতা, পরোপকার, ভাইদের মধ্যে অপার ভালোবাসা,—অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজের মানুষ জীবনে যে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তা-ই লোককথায় প্রাণমন দিয়ে প্রকাশ করে।

লোককথার মতো এমন আন্তরিক ও বাস্তব সাহিত্যিক সৃষ্টি আর কোথাও নেই। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায় এইসব লোককথায়।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার
সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে

এই সংকলন প্রসঙ্গে কিছু কথা

সুদূর অতীতে কোনও সময়ে কাম্পুচিয়ার এক শিশুকে ঘুমপাড়ানি গল্প বলার অবসরে জন্ম নিয়েছিল চমৎকার একটি রূপকথা—এক রাজপুত্রের গল্প শোনার কাহিনি।

সেই রাজপুত্র ছোটোবেলা থেকেই গল্প শুনতে খুব ভালোবাসত। রাজপুত্রের এক অভিভাবক-প্রতিম রাজকর্মচারী প্রতিদিন রাতে তাকে বানিয়ে বানিয়ে নতুন নতুন গল্প বলত। এভাবেই সে গল্প শুনতে শুনতে একদিন বড়ো হল। তার বিয়ের বয়স হয়েছে তখন। সেই গল্পগুলো তার এতই প্রিয় ছিল যে, সে অন্য কাউকে গল্পগুলো বলত না বা তার সহচরকেও বলতে দিত না। সে জন্যই গল্পগুলো জন্ম নিয়েই মরে যেত, মরে গিয়ে তারা ভূত হয়ে একটা চামড়ার থলিতে ঢুকে পড়ত। ছোট্ট সেই থলিতে কত ভূত আর থাকতে পারে। তবু, কী আর করবে, চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে ঠাসাঠাসি করে ভূতগুলো ওই থলিতেই বন্দি হয়ে রইল। রাগে দুঃখে কষ্টে ভূতরা তখন মরিয়া, ঠিক করল বিয়ের দিন যাত্রাপথে হত্যা করবে নিষ্ঠুর রাজপুত্রকে। আড়াল থেকে সেই রাজকর্মচারী ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ফেলল। তার প্রিয় রাজপুত্রকে রক্ষা করার জন্য বুড়ো মানুষটি এমন সব কাণ্ড করল যাতে স্বয়ং রাজামশাইও খুবই বিরক্ত হলেন। নিজের প্রাণ বাঁচাতে তখন সে সব ঘটনা খুলে বলল সবাইকে। বুড়ো বলল, 'গল্প তো বলার জন্য, শোনার জন্য। সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে রেখে দেবার জন্য নয়।'

এভাবেই তৈরি হয়েছে কত সহস্র গল্প-কাহিনি, দেশে-দেশান্তরে। 'গল্পের ভূত'দের মতো সেই সব গল্প বন্দি হয়ে থাকেনি। ছড়িয়ে পড়েছে মুখে মুখে, পরে কালির আখরে। নানা ভাষায়, নানা ভাবে। সারা পৃথিবী জুড়ে।

রূপকাহিনির এই বিপুল সম্ভার থেকে গল্প সংগ্রহ করে 'সারা পৃথিবীর রূপকথা' প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে শিশু কিশোর আকাদেমি। সেই গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড এই সংকলন—এশিয়ার রূপকথা।

এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। সুবিশাল এই ভূখণ্ডের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু এক-এক অঞ্চলে এক-এক রকম। এখানে বরফে ঢাকা হিমশীতল ভূভাগ তো সেখানে উষ্ম মরুভূমি। কোথাও অতিবর্ষণ তো অন্যখানে জলের জন্য হাহাকার। পাহাড়-পর্বতময় অঞ্চল আছে, আছে ঘন বনাঞ্চল, বিস্তৃত তৃণভূমি, নদীমাতৃক উর্বর কৃষিজমি। এই বিচিত্র পরিবেশে বাস করে বিশাল জনগোষ্ঠী। পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ষাট ভাগ মানুষ। তাদের সামাজিক ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবনযাপন—সব কিছুর মধ্যে আছে আপাত বিভিন্নতা, তবু এই বৈচিত্র্যের মাঝে অঞ্চলভেদে ঐক্যের সন্ধান পেয়েছেন ভূ-বিজ্ঞানী, সমাজ-বিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদরা। সেই সূত্র ধরে অন্যান্য মহাদেশের মতো এশিয়া মহাদেশকেও ভাগ করা হয়েছে—পাঁচটি অঞ্চলে—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া। এই বিন্যাস যে সকলে মেনে নিয়েছেন এমন নয়। মিশরকে এশিয়া মহাদেশের অংশ হিসেবে অনেকে চিহ্নিত করেছেন। এই তালিকায় তা গ্রাহ্য হয়নি। অন্য

দিকে মধ্য এশিয়ার কাজাখস্তান, আজারবাইজান, জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দুটি দেশ তুরস্ক ও সাইপ্রাস—এই দেশগুলোকে কেউ কেউ এশিয়ার নয়, ইয়োরোপের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন।

বর্তমান সংকলনে গৃহীত বিন্যাস-অনুযায়ী গল্পগুলো সাজিয়ে দেওয়া হল। সূচিপত্র ও দেশ-পরিচয় অংশ সে-ভাবেই বিন্যস্ত হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ ব্রুনেই, দীর্ঘ দিন মালয়েশিয়ার সংলগ্ন ছিল। সে কারণে এই দেশের কোনো গল্প চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। একই ভাবে ইন্দোনেশিয়ার অংশ ছিল তিমোর দ্বীপ। স্বাধীন পূর্ব তিমোরের একটি গল্প নির্ণয় করা সহজ হয়েছে সেই গল্পের শুরুর বয়ান থেকে,—'...তখন ইন্দোনেশিয়ার তিমোরে একটা খুব ছোটো দ্বীপ ছিল'।

লোককাহিনির দেশ তিব্বত চিনের অংশ, তবু এই সংকলনে তিব্বতের গল্প আলাদাভাবে সংকলিত হয়েছে। একই গল্প বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভাবে পরিবেশিত হতে দেখা গেছে। একটি নমুনা পাওয়া যাবে চিনা গল্প 'লিয়াং-এর জাদুতুলি' ও তাইওয়ানের গল্প 'তুলির জাদু'তে।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার অনেক দেশ আরব দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। একই কারণে জর্ডন ও বাহারিনের লোককথা বা রূপকথা পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। যেমন, ইয়েমেনের গল্পটির শুরু হয়েছে এই ভাবে—'আরব দেশে এক সুলতান ছিলেন।'

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত। এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে ভারতের রূপকথা নিয়ে। সেজন্য বর্তমান খণ্ডে ভারতের গল্প অন্তর্ভুক্ত করা হল না।

এই সংকলনে এশিয়ার ৪৪টি দেশের ১১৫টি গল্প স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ গল্পই পুনর্মুদ্রিত। ৩৪টি গল্প নতুন, এই সংকলনের জন্যই লেখা হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ ছাড়াও গল্প সংকলিত হয়েছে 'সন্দেশ', 'বার্ষিক শিশুসাথী', 'শিশুমেলা', 'ঝালাপালা', 'রঙবেরঙ' ইত্যাদি পত্রিকা থেকে। কয়েকটি পুরনো গল্প সংগ্রহে সহায়তা করেছেন অশোককুমার মিত্র, রূপক চট্টরাজ ও সুখেন্দু মজুমদার। শিশুসাহিত্য সংসদ থেকেও সহায়তা পাওয়া গেছে। এঁদের সকলের কাছে আমরা ঋণী।

এত বড়ো একটি কাজ করতে গিয়ে ত্রুটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যদি কোনো ভুল পাঠকের নজরে আসে, অনুগ্রহ করে জানাবেন, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

ইন্দোনেশিয়া

পূর্ব তিমোর

সিঙ্গাপুর

মালয়েশিয়া

থাইল্যান্ড

কাম্পুচিয়া

ভিয়েতনাম

মায়ানমার

লাওস

ফিলিপিনস

পূর্ব এশিয়া

চিন

তিব্বত

তাইওয়ান

জাপান

মঙ্গোলিয়া

কোরিয়া

মধ্য এশিয়া

কিরঘিজস্তান

তাজিকিস্তান

কাজাখস্তান

উজবেকিস্তান

তুর্কমেনিস্তান

আজারবাইজান

জর্জিয়া

আর্মেনিয়া

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া

তুরস্ক

সাইপ্রাস

লেবানন

ইজরায়েল

সিরিয়া

ইরাক

ইরান

সৌদি আরব

কুয়েত

কাতার

সংযুক্ত আরব আমিরশাহি

প্যালেস্টাইন

ওমান

ইয়েমেন

দক্ষিণ এশিয়া

আফগানিস্তান

পাকিস্তান

ভুটান

নেপাল

শ্রীলঙ্কা

মালদ্বীপ

বাংলাদেশ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া



ইন্দোনেশিয়া পূর্ব তিমোর সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড
কাম্পুচিয়া ভিয়েতনাম মায়ানমার লাওস ফিলিপিনস

ইন্দোনেশিয়া



বরিঙ্গিন গাছ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জম্বুদ্বীপের পরেই সবচেয়ে সুন্দর দেশ হল যবদ্বীপ—লিখে গেছেন পুরোনো এক যবদ্বীপী কবি। সেই যবদ্বীপের পুরাকালের এক রাজা, তাঁর বড়োরানির ছেলে জমোজাজা। দেবকুমারের মতন দেখতে—ছিপছিপে তালবৃক্ষের মতো গড়ন, হরিণের মতো তুরন্ত, বাঘের সাহস বুকে। আবার এত দয়া এত মায়া শরীরে, যে দেখে সেই ভালোবাসে।

শুধু একজনার সে দু'চক্ষের বিষ। তিনি হলেন রাজার ছোটোরানি দেবী অন্দনা। অন্দনারও একটি ছেলে. কিন্তু জমোজাজা-ই যে বড়ো, বড়ো হলে সেই বসবে সিংহাসনে—এই ভেবে রানির মনটা নিরন্তর জ্বলে পুড়ে যায়।

ভারী রূপ রানি অন্দনার। এত রূপ, রাজা তাঁকে চোখের আড়াল করতে পারেন না। তিনি রাজার সুয়োরানি। মনের মধ্যে ফুঁসে ফুঁসে শেষ অবধি একদিন অন্দনা আর স্থির থাকতে পারলেন না। বসলেন এসে রাজার পায়ের কাছে।

কী হয়েছে, রানি?

রানি কথা কন না।

কী হল রানি তোমার?

মুখ কালো রানির।

চাই কি নতুন মণিমালা, বনের তোতাপাখি?

না মহারাজ, কিচ্ছু চাইনে আমার।

এত কালো কেন তবে মুখ? কীসের দুঃখ এত?

আমার দুঃখু জেনে কী হবে, মহারাজ!

মেটাব দুঃখ।

মেটাবেন?

মেটাব, যদি মেটবার হয় আমার হাতে!

আপনি রাজা। আপনার অসাধ্য কী আছে, মহারাজ!

তাহলে মেটাব তোমার দুঃখ।

সত্যি? তিন সত্যি করুন তা হলে।

সত্যি সত্যি সত্যি—তিন সত্যি করলেন রাজা।

তাহলে বলুন, রাজা হবে রাদেন সমিজান।

ছোটোরানির ছেলে রাদেন সমিজান। রাজা হঠাৎ দেখেন, পড়ন্ত বেলার ছায়া এসে ঢুকছে ঘরের মধ্যে। হঠাৎ যেন কেমন বাক্যহারা হয়ে গেলেন রাজা।

মহারাজা?

সম্বিত ফিরে এল তখুনি। কী বলছ তুমি, রানি? জমোজাজা আমার বড়ো ছেলে, রাজ্যের সবার আদরের। আর এই বংশে চিরদিন সিংহাসন হল বড়োর। কী বলব আমি তাকে? বড়োরানিকে? দেশের লোককে? তারা মানবে বা কেন? না রানি, এ বড়ো অসম্ভব কথা।

রানির মুখটা আরো আঁধার হয়ে উঠল, মহারাজ। সত্যি ভাঙছেন রাজা হয়ে! এই রাজবংশে কেউ কখনো সত্যি ভাঙেনি।

মুখ নিচু করলেন রাজা।

রানি বললেন, জমোজাজাকে ডেকে বলুন, তোমার চারধারে ঘুরছে শত্রুর চর, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না এক মুহূর্ত। যাও, ক-টা দিন চলে যাও এখান ছেড়ে, পাহাড়রাজ্যে। আর প্রজাদের বলুন, জমোজাজা রাজহত্যার ষড়যন্ত্র করছে সিংহাসনের লোভে, খারাপ মানুষের মন্ত্রণায়...

কালো হয়ে এসেছে ঘর-বার—দীপ জ্বলেনি এখনো, দাসদাসী তটস্থ দাঁড়িয়ে দরোজার ও-পিঠে—আর নাই জ্বলল। একসঙ্গে ডুবছে কলশাঁখ আর ফিরতি পাখির শোর—অথই সাঁঝের ঘোরের মধ্যে ডুবছে... রাজার মনে হল, একমুঠোয় পঞ্চাশ তির ধরতে পারত যে হাত—অবশ সেই হাত। পোশাকের মধ্যে গা-টা তাঁর খুব ছোটো আলগা লাগল।

রানি বিলম্ব করলেন না আর। সেই রাতেই রাজার একান্ত ঘরে এসে জড়ো হলেন যত মন্ত্রী, অধ্যক্ষ, সেনাপতি—রাজ্যের যাঁরা প্রধান, অবাক নির্বাক হয়ে শুনলেন ভাবনার অতীত ষড়যন্ত্রের কথা।

আরো গভীর রাতে এল রাজপুত্র জমোজাজা।

কিন্তু বাবা, আমায় কে মারবে এই রাজ্যে? আমি কেন পালাব খরগোশের মতন?

না রে না, ছেলেমানুষ তুই। পণ্ডিত ডেকেও যে শুনোলাম, তোর মায়ের কথায়। শুধু তো চরের খবর নয়, বরিগশাস্ত্রের বিধান। না মেনে পারি! ক-টা দিন তুই চলে যা—চলে যা এখান থেকে—

কিন্তু বাবা,

না না, আর একটা দিনও না।

উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল সবে-বিয়ে-হওয়া বউ জমোজাজার, দেবী কেসুমো। তার দিকে চাইতে পারে না সহজ করে।

কী হয়েছে গো তোমার?

কাল আমায় চলে যেতে হবে, রাজ্য ছেড়ে।

কেন? কুসুমফুলের আভায় কেসুমোর মুখ গাঢ় বর্ণ হয়ে উঠল আরো।

কেন নেই কেসুমো, রাজার আদেশ।

কালই?

কালই। তুমি থেকো এই ঘরে, নয় তো বাবাকে বলে চলে যেয়ো নিজের বাড়ি। যা খুশি।

কেন? কোথায় যাব আমি একা একা? কেসুমো কাঁদতে বসল পা ছড়িয়ে। আর কেসুমোকে কাঁদতে দেখে তারও যেন কান্না পেল। কিন্তু রাজার ছেলের তো কাঁদতে নেই!

কাজেই পালঙ্কের বাজু ধরে দুজনেই বসে রইল দুই পুতুলমূর্তির মতন—আচ্ছন্ন। প্রহণ পুড়তে লাগল, সোনার দীপের ছায়া উড়ে আসতে লাগল তাদের মুখে, কারোর নজর পড়ল না, নিঃশব্দে জমোজাজার শিয়রের জলের ভৃঙ্গারে ঝুঁকে পড়েছে ছায়ামূর্তি। জলে পড়ল তিন ফোঁটা নীলবিন্দু বিষ—তিন রঙিন মাছের মতন ঠেলে চলল তারা জলের তলায়। আবার নীলবর্ণ হয়ে গেল জল আস্তে আস্তে। নিঃসাড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ছায়া দেবী অন্দনা। কিছু নজর পড়ল না। শুধু যখন রাত ফুরোতে যায়—পর্দা ছিঁড়ে ঢুকতে চায় প্রথম পাখির ডাক, কেসুমো উঠে গা থেকে সমস্ত অলংকার খুলে ফেলল। ও কী কেসুমো?—জমোজাজা বলতে চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। শুকনো কাঠ বুক। জলের গেলাস তুলে নিল শিয়র থেকে—ঢকঢক করে ঢালতে লাগল গলায়... আকণ্ঠ জল খেয়েও তৃষ্ণা মেটে না...

ভোরের আভা ফুটতেই জোর করে উঠে পড়ল জমোজাজা। ও কী কেসুমো? তুমি কোথায় যাবে?

বলো তা হলে, কেন যাবে তুমি! আর কি উপায় নেই?

এ হল আদত, কেসুমো। বাবার কথায়—নরকেও যদি যেতে হয়, যেতে হবে।

তা হলে আমারও যেতে হয়। কেসুমো তার ঝলমলে বাসবেশ ছেড়ে পরে নিল অতি সাধারণ পরিধান। আর হঠাৎ, জমোজাজার মাথাটা যেন ঝাঁ ঝাঁ...

তৈরি আমি।

রাজবাড়ির আঙিনার ওদিকে ফুলের বাগ, ফুলবাগের পেছনে ঝিল, ঝিলের ওপারে তেজপাতার বন, বনের মাথায় অরুণসূর্যের মণিমুকুটের আভা। জমোজাজার মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে।

কেন হচ্ছে এমন? মায়া? ঘর ছেড়ে যাবার মনকেমন? আবার তো আসব ক'দিন বাদেই। আসব তো? না আর দেরি না, এটা জেঁকে বসার আগেই—কারোর মুখ দেখতে পাবার আগেই চলে যেতে হবে। ক্রাতোন-প্রাসাদ ছেড়ে পথে বেরিয়ে এল জমোজাজা আর কেসুমো, খালি হাতে। সূর্যের পুরো মুখটা ভেসে ওঠার আগেই ওরা শহর ছাড়িয়ে গেছে।

গরম আছায়া দিন। গাছপালা অবধি ঘামছে। সূর্যের তাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফুটছে জমোজাজার মাথার মধ্যেটা। কেন হচ্ছে এমন? মায়া? ঘর ছেড়ে যাবার মনকেমন? রাস্তা উঠেছে রুক্ষ আগুনপাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঘুরে ঘুরে—শুখা মাঠ তেগালান—হাঁটতে হাঁটতে পা দুটো পাথরভার—ঝাঁ ঝাঁ মাথার মধ্যে—রোদের এক-একটা রশ্মির মধ্যে যেন মুঠো মুঠো সূর্যমুখী তারা...বসব একটু ? না। মাঝপথে বসা নেই। আবার এক বাঁক দু-বাঁক—শালুক-ফোঁড় দেওয়া সবজে জাজিমের মতো তলগ, চোখ জুড়িয়ে যায়। পার হয়ে গেল। রুক্ষ কাঁকর পাথর, ঘুরে ঘুরে উঠেছে পাকদণ্ডী রাস্তা—আর একটা মোড়—তলায় জমাট বেঁধে রয়েছে আগুনপাহাড়ের ছাই ঢালা আঙার সরোবর—শ্লথ শ্লথ হয়ে পার হয়ে গেল—কেসুমো—

কী হল তোমার?

কেসুমো, আর আমার পা চলছে না।

এ তো কেবল মনের তাপ নয়। জ্বর হয়েছে নাকি আমার? কেসুমো, আমার বুক ভার—কেসুমো, আমার চোখ ভার—কেসুমো, আমার মাথা ভার—

এমন করছ কেন গো—কেসুমো এসে হাত ধরল। বিষচোখ পড়েছিল কারো? খেয়েছিলে কিছু অজান্তে?

জানিনে তো। হাঁটু ভেঙে পথের ওপর বসে পড়ল জমোজাজা। ওগো কেসুমো—

এ কী হল। হে ঠাকুর বট: গুরু বটর দেবতা—এ কী হল। তাড়াতাড়ি বসে জমোজাজার মাথাটা কোলে তুলে নিল দি-শেগ্গা রাজকুমারী। একটা মানুষের ছায়া নেই কোথাও। কী করি, হে প্রভু বটর দেবতা—

আকাশ অবধি ছড়ানো উঁচুনিচু পাহাড়িয়া ঢল—ধুলোট ঘাসজঙ্গলের গেরো বাঁধা, অন্তহারা শুখা পথ উড়ে গেছে ওই শূন্য পর্যন্ত—আর দুপুর ধু ধু করে উঠছে বাতাস-হলকায়—

সেই জ্বলন্ত দুপুরবেলায় কেসুমোর কোলে মাথাটি রেখে জমোজাজা অজাগর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল। তার তপ্ত মুখ ছায়া করে রইল কেসুমোর হাতের ছায়া। তার গায়ের জ্বর জুড়িয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে লাগল কেসুমোর নিঃসাড় চোখের জল।

আর তারই মধ্যে, কে জানে কত প্রহর বাদে, আলোর একটা লতার জাল গড়ে উঠল হঠাৎ চোখের সামনে, আর সেই আলোর জাল ফুঁড়ে অপরূপ রূপবান এক।

এ কি মানুষ? কিন্নর? দেবতা? কেসুমোর অসাড় গায়ে রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল সহসা—

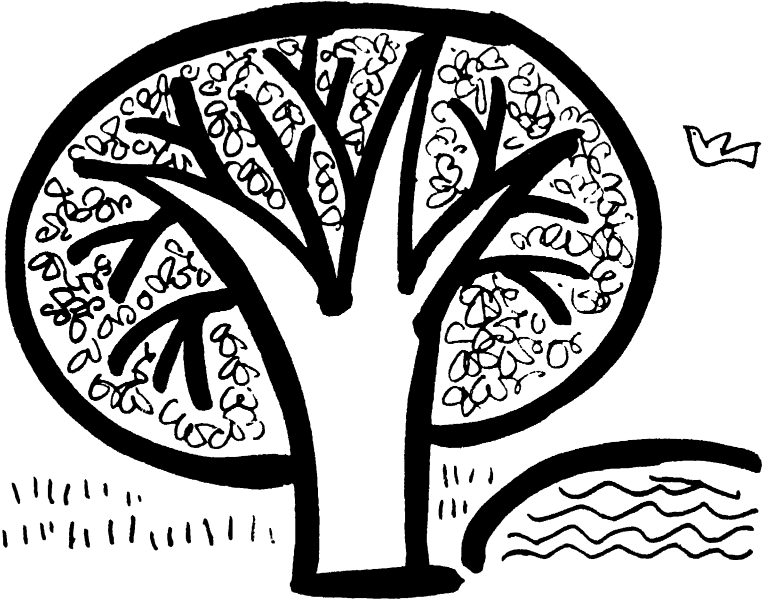
রাজকুমারী, আমি কমজাজা। ডাকছিলে আমায়?

কমজাজা? বটর কমজাজা কন্দর্পদেব? ভালোবাসার দেবতা? রাজকুমারীর চোখ দুটো আশায় জ্বলে উঠল।

কিন্তু রাজকুমারী, আমি তো মরা মানুষ বাঁচাতে পারি না!

চোখের জল, তা ছাড়া আর কী বা বলার আছে কেসুমোর।

তোমার জন্যে তবু আমি চেষ্টা করব, রাজকুমারী। দেবতাদের ডাকো রাজকুমারী, সর্বশরণ



হয়ে ডাকো দেবতাদের, যিনি দেবতা, তাঁকে...

কেসুমো দেখল, তার চোখের সামনে—হঠাৎ আবার উঠে বসেছে জমোজাজা—তার হাত সরিয়ে সোজা দাঁড়াল উঠে—মাথাভরতি চুল উড়ছে বাতাসে—দাঁড়াল শান্ত অস্পর্শ হয়ে—কেসুমো ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল।

আর জড়িয়ে থাকতে থাকতেই সে টের পেল—একটু একটু করে বাড়ছে জমোজাজা...

তার দু-হাতের বেড় আলগা করে গেল খুলে, নাগাল ছাড়িয়ে যাচ্ছে কাঁধ—

রুক্ষ কর্কশ গা—কেসুমোর মাথার ওপর ছাতার মতন ধরা তার হাত দু'টোয় গজিয়ে উঠল বিন্দু বিন্দু সবুজ অঙ্কুর—ভয় পেয়ে কেসুমো পিছিয়ে এল হাত ছেড়ে। একটু একটু করে বাড়ছে তখনো—

আস্তে আস্তে তার হাতদুটোর এধার-ওধার দিয়ে ফুঁড়ে উঠল আরো অনেক হাত—মাথা ছাপিয়ে গেল পাহাড়উঁচু— এক পা এক পা পিছোতে পিছোতে হঠাৎ দেখে বিশাল মহীরুহ—এই মোটা গুঁড়ি, হাজার ডালপাতাঝুরির জঙ্গল গায়ে জড়িয়ে আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে—

কেসুমো পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে, শুনতে লাগল দৈববাণীর মতো কমজাজার কণ্ঠ : এই গাছ জীবনহীন নয়, রাজকুমারী। পবিত্র পুণ্যবন্ত এই গাছ—বরিঙ্গিন গাছ। কষ্ট পেয়ো না, রাজকুমারী। সারা যবদ্বীপ ছড়িয়ে যাবে এই গাছের বীজ—পোড়া-শুখা পথের ওপর, ছোটো গাঁয়ের কিনারায়। ছোটো পাখি ঘর বাঁধবে এসে সুখে। এই গাছের নীচে লোকেরা পড়বে গ্রামদেবতার দেল—ঝাঁঝ বাজবে সন্ধেবেলায়, দীপ জ্বলবে। ছোটো ছেলের হুটোপুটিতে সারা দুপুর হাসবে ফুলবে বাতাস-দোলা গাছের পাতা—কষ্ট পেয়ো না, শোনো রাজকুমারী—

কেসুমো আরো সজাগ হয়ে কান পাতল—

জমজাজার নয়, যেন গাছেরই কথা—রিন্ রিন্ রিন্ রিন্—কী বাজছে কথা গাছের পাতায়? শুনতে... শুনতে... শুনতে... ভাসতে লাগল কেসুমো অতল মধুর শব্দের ঢেউয়ে ঢেউয়ে—ডুবতে লাগল, অকূল নীল ঢেউ, ছল্ ছল্ ছল্ ছল্ সুরে তার ওপর দিয়ে নীচ দিয়ে বইতে লাগল অফুরন্ত নীল ঢেউ...

কেসুমো গা এলিয়ে শুয়ে রইল বরিঙ্গিন গাছের পায়ের গোড়ায়—ঠান্ডা রুপোলি একদিঘি জল হয়ে। এদিকে জমোজাজা চলে যাবার পর রাজ্য থমথম। ভণ্ড মন্ত্রীপার্ষদেরা জানুক যা, দেশের লোকে তা কি মানে! তাদের সবার প্রিয় রাজপুত্র জমোজাজা। আর, সবার চেয়ে দুরন্ত হয়ে উঠেছে ছোটো রাজপুত্র, রাদেন সমিজান।

দশ বছরের ছেলে। সে কিছুতে বুঝে উঠতে পারছে না, কেন তাকে ঘিরে এত লোকজন—খালি তাকে আগলাচ্ছে। কোথায় গেল দাদা, জমোজাজা? জোড়া কবুতর পুষল তারা—খবর দেবে নেবে বলে, ধনুকতির বানিয়ে দিল—নিজে মুখে কথা দিয়েছে, তাকে নিয়ে যাবে এ বার মৃগয়ায়। নাকি চলে গিয়েছে পাহাড়রাজ্যে। সে আবার কোন্ রাজ্য!

খালি আগলাচ্ছে এসে মা। বলে যাচ্ছে থেকে থেকে, এধার সেধার ছুটোছুটি করিসনে বাবা। তুই রাজা হবি, মানিক আমার। তার আর কাজ নেই তো, সে ওই হুতুমমুখ করে ভারী ভারী পাথর গাঁথা পাগড়ি-সরোঙ বেঁধে দিনরাত গুজগুজ করবে বুড়ো বুড়ো লোকগুলোর সঙ্গে। কখন সবার চোখ এড়িয়ে দাদাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে সমিজান, কেউ টেরও পেল না।

সারাদিন সারারাত না-জানা পথ, না-জানা বন, উঁচুনিচু পাহাড়িয়া ঢেউ ডিঙিয়ে চলেছে সমিজান। গাছের আড়াল বাঁকের আড়াল দৌড়ে আসে—দা-দা—গেল কোথায় দাদা? কিছুতেই যখন আর পায় না, ভাবল, অনেক তো পারেন ওই যিনি আকাশের পর থাকেন—ওই ঠাকুর, যদি আমায় পাখি করে দেন তো উড়ে দেখি রাজ্যটা। দেখি কোথায় যেতে পারে দাদাটা আমাব চোখ এড়িয়ে। আর ভেবেছে কী, আকাশের দেবতা করে দিলেন তাকে সুন্দর ছোটো পাখি। খুশি ঝিলিয়ে উড়ল পাখি আকাশে...

দক্ষিণে, উত্তরে সাগরকূলের তালসুপুরির শিয়র ধরে, টিলাপাহাড়ের আলসে ঘেঁষে উড়ে চলল—উড়ে চলল পাখি। তারপর একদিন বসল এসে বরিঙ্গিন গাছের ডালে। গাছতলায় রুপোলি জলের এক দিঘি। কিন্তু তার দাদা কোথায়?

পাখি চিৎকার করে উঠল—কাকা-গা-তোৎ—গ-তোৎ—সুলিঙ-বাঁশির সুরে পাখি চিৎকার করে উঠল—দাদা কই গো, দা-দা কই গো...

বরিঙ্গিন গাছের পাতায় রিন্ রিন্ রিন্ রিন্ করে মর্মর বেজে উঠল। দিঘির জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল গাছের পাতা—এঁকে বেঁকে নেচে দুলে ভাসতে লাগল মরাই হাঁসের সার। দিঘির পাড়ে পাড়ে নাগসরি আর করবীর আর পুড়ক ফুলের পাপড়ি উড়তে লাগল মজার খেলার ঝোঁকে।

আর সেই পাখি! কী বুঝল সেই জানে। সারাদিন ধরে সে শুধু ডাকছে—কাকা-গা-তোৎ—কা কা-গা-তোৎ—তারপর সাঁঝ এসে আবছায়া ডালপালা ঢেলে তাকে লুকিয়ে ফেলল।

ছবি। কৃষ্ণেন্দু চাকী



সোনার প্রজাপতি

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

অনেকদিন আগে ইন্দোনেশিয়ার এক রাজ্যে কেমরাং মেলাতি নামে এক রাজকন্যা একটা ভারী সুন্দর প্রাসাদে বাস করত। মেলাতি ছিল অপূর্ব সুন্দরী। ওর সৌন্দর্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশবিদেশে। ফলে অনেক দেশের রাজপুত্রেরাই মেলাতিকে বিয়ে করার জন্য উৎসুক ছিল। মেলাতি কিন্তু মনস্থির করতে পারেনি কাকে বিয়ে করবে। তবে বিয়ে তো একদিন হবেই—বিয়ের পোশাকও চাই। জানালার ধারে বসে মেলাতি তাই ওর বিয়ের পোশাকের জন্য রেশম বুনত। সেকালের নিয়মই ছিল এই। বিয়ের কনেকেই বিয়ের পোশাকের কাপড় বুনতে হত।

সেই জানালার পাশ দিয়েই বয়ে যেত সে দেশের নদী। নদীর ওপারে রামধনু রঙের প্রাসাদে বাস করতেন বরুণরাজা বানজীর। পৃথিবীর সব নদ-নদী-সমুদ্র এই বরুণরাজার হুকুমের দাস। রাজার চোখ থেকে যদি কখনো জল বেরুত অমনি পৃথিবীর সব নদ-নদীতে জল বেড়ে ফেঁপে উঠত।

বরুণরাজা বানজীব তাঁর নিজের প্রাসাদের জানালায় বসে দেখতেন রাজকন্যা মেলাতি আপন মনে বসে বিয়ের পোশাক বুনছে। রাজকন্যা কিন্তু কখনো ওদিকে তাকায়নি—তাই সে

বরুণরাজাকে দেখতে পায়নি। রাজা বানজীর কিন্তু মেলাতিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ওঁর খুব ইচ্ছে হল মেলাতিকে বিয়ে করার। কিন্তু হায়, মেলাতি কখনো ভুলেও ওদিকে তাকায় না।

অগত্যা বরুণরাজা একদিন একটা সোনার রঙের প্রজাপতির রূপ ধরে উড়ে চলে এলেন মেলাতির কাছে। প্রজাপতিটি এসে বসল মেলাতির হাতের ওপর। ওর সোনারঙের ডানার কারুকার্য দেখে মেলাতি অবাক হয়ে বলল, "বাঃ কী সুন্দর!"

ক'দিন পরে মেলাতি আবার রেশম বুনতে বসেছে, এমন সময় সোনারঙের প্রজাপতিটি আবার উড়ে এল। এবার এসে প্রজাপতিটি মেলাতির কানের ওপর বসে ফিসফিস করে বলল, "কন্যে, তোমার বিয়ের পোশাকের রেশম তাড়াতাড়ি বুনে নাও, তোমার বর শিগগিরই আসবে।"

মেলাতি বলে উঠল, "কই, কোথায় আমার বর, কে সে?"

প্রজাপতিটি ততক্ষণে উড়ে গেছে, মেলাতির কথা শুনতে পায়নি।

কথাটা কিন্তু শুনতে পেয়েছিল আরেকজন, সে হচ্ছে নাসীমন—রাজকন্যার ধাইয়ের ছেলে। মেলাতির কথা শুনে সে তার নিজের মা-র কাছে গিয়ে সব বলল। আর বলল, "মা, তুমি গিয়ে রাজকন্যাকে বলো আমিই তার বর।"

এই নাসীমন লোকটা ছিল খুব লোভী আর দুষ্টু। তাহলে কী হবে, ওর মায়ের কাছে ও একেবারে নয়নের মণি।

ছেলের কথা শুনে ধাই মেলাতির কাছে গিয়ে বলল, "বাছা, আমার ছেলে নাসীমনই তোমার বর। তাকেই বিয়ে করতে হবে তোমায়।"

ঠিক এ সময়ই সোনার প্রজাপতি আবার উড়ে এসেছে। ধাইয়ের কথাটা শুনতে পেয়ে প্রজাপতি মেলাতির কানে কানে বলল, "কন্যে, তুমি এই দুষ্টু লোকটাকে কক্ষনো বিয়ে কোরো না। তোমার বর ও নয়।"

মেলাতি ধাইকে বলল, "ধাই মা, তোমার ছেলে আমার বর হতে পারে না।"

"না, না—আমার ছেলেকেই তুমি বিয়ে করো মেলাতি। আমি স্বপ্নে দেখেছি ওকে বিয়ে না করলে বিপদ ঘটবে। তুমি আর আমি দুজনেই মারা যাব।"

মেলাতি একটু ভয় পেয়ে গেল। অথচ নাসীমনকে বিয়ে করার একটুও ইচ্ছে নেই। তাই ও ধাইকে বলল, "ভেবে দেখতে সাতদিন সময় দাও ধাই মা। আর তোমার ছেলেকে বলো এই সাত দিন ও এই নদীর পাড়ে অপেক্ষা করুক। সাতদিন পরে আমার জবাব সেখানে পাঠাব।"

মেলাতির উত্তর শুনে তো নাসীমন খুব খুশি। এক ঝুড়ি খাবার নিয়ে এসে ও নদীর ধারে একটা জায়গায় বসে রইল।

এখন হয়েছে কী, সেদিনই বরুণরাজা ঠিক করলেন যে মেলাতির জন্য কিছু উপহার পাঠাবেন। তাই ছোট্ট একটা বাক্সে অনেক সুন্দর সুন্দর গয়না ভর্তি করে ওঁর দূত কাককে

ডেকে পাঠালেন। তখনকার দিনে কাকগুলো হত ধপধপে সাদা। কাককে ডেকে ওর কাছে গয়নার বাক্সোটা দিলেন বরুণরাজা। আর দিলেন একটা চিঠি— যে চিঠিতে তিনি মেলাতির রূপগুণের অজস্র প্রশংসা করে তাকে রানি করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন।

কাককে ডেকে বরুণরাজা বললেন, "ওহে, এই বাক্সো আর চিঠিটা নিয়ে তুমি এক্ষুনি উড়ে যাও রাজকন্যা মেলাতির কাছে। তাকে গিয়ে বলো, বরুণরাজা ওর জন্যে উপহার পাঠিয়েছেন। কিন্তু খবরদার, জিনিসগুলো হারিয়ে ফেলো না যেন।"

কাক চিঠি আর গয়নার বাক্সো নিয়ে উড়ে এপারে এল। তখন নদীর ধারে বসে নাসীমন ওর খাবারের ঝুড়িটা সবেমাত্র খুলেছে। সেই কাকটা ছিল ভীষণ পেটুক। অত খাবারদাবার দেখে লোভ সামলাতে না-পেরে ও নীচে নেমে এসে বলল, "মশাই, আপনার এই চমৎকার খাবারগুলোর একটুখানি আমায় দেবেন?"

নাসীমনও তেমনি লোভী। ও বলল, "তুমি কে হে? কোথা থেকে আসছ? মিছিমিছি তোমাকে আমার খাবারের ভাগ দিতে যাব কেন?"

কাক বেশ ভারিক্কি চালে জবাব দিল, "আমি বরুণরাজার দূত রাজকন্যা মেলাতির জন্য উপহার আর চিঠি নিয়ে যাচ্ছি।"

কথাটা শুনে নাসীমন তক্ষুনি বিনয়ের ভান করে বলল, "তাই নাকি? তা মেলাতি তো আমাদের দেশেরই রাজকন্যা। তার জন্যে যখন উপহার নিয়ে যাচ্ছ তখন তো তুমি আমাদেরও বন্ধু। এসো, যা ইচ্ছে নিয়ে খাও। কিন্তু আগে হাতের বোঝাগুলো নামিয়ে রাখো এখানে।"

কাক খুশিমনে গয়নার বাক্সো আর চিঠি একপাশে রেখে খাবারের ঝুড়ির দিকে মন দিল। খাওয়ায় ও এমনি মত্ত রইল যে, আর কোনোদিকে তাকালও না।

এদিকে নাসীমন কী করল জানো? প্রথমেই বরুণরাজার দেওয়া গয়নার বাক্সো খুলে ও সব গয়না সরিয়ে ফেলে বাক্সে গোটাকয়েক আরশোলা, মাকড়শা আর বিছে ভর্তি করে দিল। তারপর বরুণরাজার লেখা চিঠি ছিঁড়ে ফেলে অন্য আরেকটা চিঠি লিখে দিল—অবশ্য বরুণরাজারই নামে। তাতে লিখল, মেলাতি তুমি একেবারে হতকুৎসিত। তাই তোমার জন্য গোটাকয়েক উপহার পাঠাচ্ছি— যা তোমার মতোই বিচ্ছিরি।

এদিকে কাক তো খেয়েই চলেছে। খাওয়ার শেষে ঢেঁকুর তুলে ও একটা ঝরনায় গেল জল খেতে। ঝরনাটা কুলুকুলু গানের সঙ্গে বলতে লাগল, "কাক, তুমি বরুণরাজার কথা শুনলে না কেন? কেন তুমি থামলে? বরুণরাজার উপহার নিয়ে আগে মেলাতির কাছে গেলে না কেন?"

কিন্তু কাক ঝরনার কথায় কানই দিল না, এমনকি হাওয়াও যখন ওর কানে কানে বলল, "কাক, তোমার অতি লোভের ফল কী হয় দেখো।"

কাক সে কথাও না-শোনার ভান করল।

এদিকে রাজকন্যা মেলাতি স্বপ্নে দেখেছিল যে, তার ভাবী বরের কাছ থেকে সেদিন উপহার আসবে। খুব আশা নিয়ে সে জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় বরুণরাজার দূত সেই



বাক্সো আর চিঠি নিয়ে এল। রাজকন্যা আনন্দে অধীর। চিঠিখানা তাড়াতাড়ি খুলে পড়তে শুরু করল। কিন্তু সেটা তো বরুণরাজার চিঠি নয়, নাসীমনের কীর্তি। সেই চিঠি পড়ে তো রাজকন্যা খুব রেগে গেল। উপহারের বাক্সো না-খুলেই বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেলাতি। আর বাক্সোটা থেকে সব আরশোলা, বিছে আর মাকড়শা বেরিয়ে বাগানে কিলবিল করতে লাগল।

মনের দুঃখে মেলাতি এবার কাঁদতে শুরু করল।

মেলাতির দুঃখ দেখে কিন্তু নাসীমনের খুব ফুর্তি। ও ভাবল, এবার নিশ্চয়ই রাজকুমারী তাকেই বিয়ে করবে।

সেদিন বিকেলে বরুণরাজা আবার সোনারঙের প্রজাপতির রূপ ধরে রাজকন্যার ঘরে এলেন। মেলাতি তখনও বসে বসে কাঁদছে। প্রজাপতিটি মেলাতির কানে কানে বলল, "কন্যে, তুমি তোমার বরের উপহার দেওয়া গয়নাগুলো পরোনি কেন? সাজোনি কেন তুমি?"

প্রজাপতির কথা শুনে মেলাতি তো রেগে টং। হাতের পাখা ছুড়ে মারল প্রজাপতিটাকে।

প্রজাপতিবেশী বরুণরাজা ভাবলেন মেলাতি নিশ্চয়ই ওঁর সঙ্গে ঠাট্টা করছে। তাই আবার রাজকন্যার কানে কানে বললেন, "কন্যে, তোমার বিয়ের পোশাক তাড়াতাড়ি তৈরি করে নাও—কাল তোমার বর আসবে। বর এসে তোমায় নিয়ে যাবে রামধনুরঙা প্রাসাদে, উপহার দেবে মসলিনের কাপড়—যা চাঁদের আলোর মতো উজ্জ্বল আর নরম—দেবে মণি মুক্তোর গয়না আর তা তোমার গায়ে তারার মতো ঝকঝক করবে।"

মেলাতি তো এসব কথা শুনে আরো রেগে গেল। ওকে হতকুৎসিত বলে লেখা-চিঠিটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। তাই ও সখীদের ডেকে বলল, "তোমরা এই প্রজাপতিটাকে বিদেয় করো দেখি! আর জানালা বন্ধ করে রাখো যেন এই বিচ্ছিরি প্রজাপতিটা আর কখনো আমার ঘরে না আসে।"

রাজকন্যার এই কথা শুনে বরুণরাজা এবার রেগে গেলেন। "বটে, আমাকে হেনস্থা করা! দেখাচ্ছি মজা"—এই বলে বন্যায় চারদিক ডুবিয়ে দিলেন। মেলাতির প্রাসাদও সেই বন্যায় মোচার খোলার মতো ভাসতে ভাসতে চলল। বেচারি মেলাতি তখন নিজের ঘরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে "বাঁচাও, বাঁচাও" বলে চিৎকার করছে। কিন্তু ওর কান্নায় বরুণরাজার মন একটুও গলল না—এতই রেগে গিয়েছিলেন তিনি।

সেই ডুবুডুবু প্রাসাদে ভেসে চলছিল নাসীমন আর তার মা, সেই ধাই। সেই ধাইটিও কেঁদে কেঁদে বিলাপ করে বলছিল, "হায়রে, কী কুক্ষণেই না বরুণরাজার চিঠি বদলে দিয়েছিল নাসীমন! আর কেনই-বা গয়নার বদলে বিছে আর আরশোলা ভরে দিয়েছিল। কী দুর্মতিই না হয়েছিল আমাদের! এখন বরুণরাজার কোপ থেকে কী করে বাঁচি!"

ধাইয়ের বিলাপ শুনে বরুণরাজা বুঝতে পারলেন যে, ধাই আর নাসীমনই সব কিছুর জন্য দায়ী। মেলাতির কোনো দোষ নেই। তিনি তক্ষুনি হাত বাড়িয়ে জল থেকে মেলাতি আর তার সাথীদের টেনে তুললেন। ধাই আর নাসীমনকে তুললেন না অবশ্য। বরঞ্চ বিরাট একটা ঢেউ এসে ওদের অনেক দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। দুষ্টুমির উচিত সাজা পেল ওরা।

এরপর বরুণরাজা ডাকলেন কাককে। কাক তো তখন ভয়ে কাঁপছে। ভয়ে ভয়ে ও নিজের দোষ স্বীকার করল। বরুণরাজা ওকে প্রাণে মারলেন না অবশ্য। কিন্তু সেদিন থেকেই কাকটির সাদা রং হয়ে গেল কুচকুচে কালো। আর দিব্যি কথা বলতে পারত যে কাক, তার কথা একদম বন্ধ হয়ে গেল। অতিকষ্টে—কাকটি শুধু বলতে পারল "কঃ"। শুধু তাই নয়, এরপর থেকে পৃথিবীর সব কাকই হয়ে গেল কালো, আর কঃ কঃ বলে কর্কশ আওয়াজ করতে লাগল।

দোষীদের শাস্তি দিয়ে বরুণরাজা এবার মেলাতির রাজ্য থেকে বন্যাব জল সরিয়ে দিলেন। সব কিছু হয়ে গেল শুকনো। আবার বন্যার পর পলিমাটি পড়ায় অনেক ফসল হল। চারদিকে রাজ্যের সবাই আনন্দে মেতে উঠল।

বরুণরাজা এরপর মেলাতির কাছে এসে তাকে বিয়ে করতে চাইলেন। বললেন যে, সোনার প্রজাপতির রূপ ধরে তিনিই মেলাতির কাছে আসতেন। ততদিনে মেলাতিও জেনে গেছে যে, নাসীমনের মতলবেই বরুণরাজার উপহার খোয়া গিয়েছিল। কাজেই বরুণরাজার ওপর তার আর রাগ রইল না। তার ওপর বরুণরাজা দেখতে যেমন সুন্দর, তার রাজ্যও তেমনি বিরাট। সুন্দরী মেলাতি খুশিমনেই বিয়েতে রাজি হল। তারপর খুব ধুমধাম করে ওদের বিয়ে হয়ে গেল।

ছবি। কৃষ্ণেন্দু চাকী

পূর্ব তিমোর



বাঁদর এল কোথা থেকে

সৈয়দ রেজাউল করিম

আজকালের কথা নয়, সে অনেক দিন আগের কথা। তখন তিমোর-এ একটা খুব ছোটো দ্বীপ ছিল। সেই দ্বীপের নাম রোচি। সেখানে বাস করত এক বুড়ি ও তার নাতনি। নাতনির নাম ছিল কপিলা। দিদা তাকে আদর করে কপি বলে ডাকত।

বুড়ির অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। মাথা গোঁজার জন্য ছোটো একটা চৌকোনা কুঁড়েঘর ছিল। আর ছিল একফালি জমি। সেখানে দিদা আর নাতনি শাকসবজির চাষ করত। তা দিয়ে তাদের দুবেলা ভাত জুটত না। বাধ্য হয়ে বুড়ি চলে যেত সমুদ্রে মাছ ধরতে। আর ঘরে তখন থাকত নাতনি। সে ঘরদোর ঝাড়পোছ করত, রান্নাবান্না করত। দুপুর নাগাদ মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরত দিদা। তারপর মাছ রান্না হত। তাই খেয়ে কোনোরকমে দিন কাটত তাদের।

সেদিন মাছ ধরতে যাবার আগে কপিলাকে ডেকে দিদা বলল, ''আজ আর বেশি কিছু রাঁধতে হবে না। একটা দানা চাল রান্না করলেই চলবে।''

বুড়িদিদা চলে যাবার পর টনক নড়ল কপিলার। তাকে কী বলে গেল দিদিমা? সে-কথার কোনো মানে খুঁজে পেল না সে। ভেবে উঠতে পারল না, একটা দানা রান্না করার কথা কেন বলে গেল দিদিমা! একটা দানায় কি পেট ভরবে দু'জনের? অনেক ভাবনাচিন্তা করে অবশেষে

দু'মুঠো চাল নিয়ে রাঁধতে বসল সে।

গনগনে আগুনে টগবগ করে ফুটে উঠল জল, ফেঁপে ফুলে উঠল চাল। উথলে-ওঠা মাড় ঠেলে ফেলে দিল হাঁড়ির ঢাকনা। হাঁড়ির গা বেয়ে অঝোরে গড়িয়ে পড়তে থাকল মাড়ভাত। এমনভাবে মাড়ভাত পড়তে কখনো দেখেনি কপিলা, দেখে তার কান্না পেল। মনে মনে ভাবতে থাকল, কী করে সে এটা বন্ধ করবে। সেই মুহূর্তে কোনো উপায় খুঁজে পেল না সে। ভয়ে সে ঘরের মধ্যে ছোটাছুটি করতে থাকল।

হাঁড়ি থেকে তখনও মাড়ভাত উথলে পড়ছিল। পড়তে পড়তে ভরে গেল সারাটা ঘর। একসময় ঘর ছাপিয়ে উঠোনে গিয়ে পড়ল, উঠোন থেকে রাস্তায় নদীর মতো বয়ে চলল সে-ধারা।

উপায় না-দেখে কপিলা ছুট দিল সমুদ্রের দিকে। যেদিকে তার দিদিমা মাছ ধরতে গেছে। মাড়ের ধারাও পিছু নিল কপিলার।

দিদিমা তখন মাছ ধরে বাড়ি ফিরছিল। পথে দেখা কপিলার সঙ্গে। কপিলা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল সব কথা। পিছনে যে ভাতের মাড় তাড়া করে আসছে তাও দেখাল সে।

দিদিমার খুব রাগ হল। চিৎকার করে উঠল, ''অবাধ্য মেয়ে কোথাকার। তোকে একটা দানা....'' সাপের মতো ফুঁসতে থাকল দিদিমা।



পথের মাঝে একটা কাঠের চেলা পড়েছিল। হাতে তুলে নিল সেটা।, কোনো কিছু না-ভেবেই কপিলার পিঠে বসিয়ে দিল সজোরে। মারের চোটে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল কপিলা। তারপর ম্যাজিকের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল কপিলা। দিদিমা দেখতে পেল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাঁদর।

বাঁদরটা হাততালি দিয়ে নাচতে থাকল। একসময় সে গাছের ডালে চড়ে বসল। তারপর মুখ ভেংচে বলল, "এখন থেকে তুমি একাই থাকো দিদিমা, আমি আর তোমার সঙ্গে যাব না। তোমার জন্য রান্নাবান্না করে দেব না। তুমি নিজের হাতে সব করবে। কেউ তোমাকে ভালোবাসবে না।"

কপিলার দিদা এখন আর নেই। কিন্তু রোচি দ্বীপের লোকজনেরা আজও মনে রেখেছে সে কাহিনি। ভুলেও তারা তাদের ছেলেপুলেদের মারধোর করে না কখনোও। কে জানে, মার খেয়ে তাদের ছেলেমেয়েরা যদি বাঁদর হয়ে যায়।

ছবি। কৃষ্ণেন্দু চাকী



লালপাহাড়

দেবব্রত মল্লিক

সিঙ্গাপুরের ছোটো একটি দ্বীপ। এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রয়েছে এক ছোটো পাহাড়। লোকেরা বলে লালপাহাড়। ওই পাহাড়ের কাছে গিয়ে যদি আদ্যিকালের বুড়োকে জিজ্ঞেস করো পাহাড়টা লাল কেন? সে তখন বলতে শুরু করবে :

অনেক অনেক বছর আগে একসময় দেশের চারদিকে সমুদ্রে তলোয়ারমাছ ছিল প্রচুর। জলের দিকে তাকালেই দেখা যেত মাছগুলো গিজগিজ করছে। বড়ো বড়ো ঢেউ এলে তারা ভেসে আসত। মানুষেরা এই মাছগুলোকে ভয় পেত। কেউ ভয়ে জলে নামত না। এমন কি জলের ধার দিয়ে হাঁটতেও সাহস করত না। সেই সময় জেলেদের রুজিরোজগার একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জাল দিয়ে মাছ ধরতে গেলে জাল কেটে দিত। নষ্ট করে ফেলত নৌকো।

এইভাবেই চলছিল। সিঙ্গাপুরের রাজা মহাচিন্তায় পড়লেন। তিনি ভাবতে শুরু করলেন তলোয়ারমাছের উপদ্রব থেকে কীভাবে রেহাই পাওয়া যায়। অনেক ভাবনাচিন্তার পর, সৈন্যদের আদেশ দিলেন, যে অঞ্চলে তলোয়ারমাছের উপদ্রব সেই সেই অঞ্চলে সমুদ্রের তীর ধরে তারা সারবেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে মাছগুলো যখন এগিয়ে আসবে ঠিক সেই সেই সময়ে তাদের গেঁথে ফেলবে বর্শা দিয়ে।

রাজার আদেশ, অতএব তা অন্যথা হওয়ার নয়। সৈন্যরা সারবেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল সমুদ্রের তীরবরাবর। তাদের প্রত্যেকের এক হাতে বর্শা এবং অন্য হাতে ঢাল। তারা জোয়ারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। আর মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিল কীভাবে তারা তলোয়ারমাছকে আক্রমণ শানাবে।

তারপর সেই সময় এসে হাজির হল। জোয়ার এল সমুদ্রে। সৈন্যরা সব প্রস্তুত। কিন্তু হলে কী হবে, সৈন্যরা আক্রমণ করার সুযোগই পেল না। মুহূর্তের মধ্যে তলোয়ারমাছ সৈন্যদের আক্রমণ করে বসল। তাদের লম্বা লম্বা ছুঁচোলো ঠোঁট দিয়ে সৈন্যদের এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিল। অনেক সৈন্য মারা গেল। তার চেয়ে বেশি আহত হল। রাজা সেই জায়গায় আর একদল জোয়ানকে দাঁড়াতে বললেন। কিন্তু মাছেরা সেই জোয়ানদেরও আঘাত করে ধরাশায়ী করে ফেলল।

এইভাবে বারবার একই ঘটনা ঘটতে থাকল।



একটা ছেলে দূরে দাঁড়িয়ে থেকে এই ঘটনা দেখছিল এতক্ষণ। দেখে ছেলেটা বিমূঢ় আর বিহ্বল হয়ে পড়ল। ভাবল এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। শেষে সে রাজার কাছে ছুটে গিয়ে বলল, করছেন কী মহারাজ? এত এত সৈন্যকে আপনি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন?

রাজা বললেন, আমি তো চেষ্টা করছি। আর কী করব বলো?

ছেলেটি বলল, আপনি যদি সৈন্যদের বদলে সমুদ্রের তীরজুড়ে কলাগাছ বসানোর ব্যবস্থা করেন, তাহলে দেখবেন মাছগুলো জব্দ হয়ে যাবে। একদম কাবু হয়ে পড়বে। তাহলে মানুষ আর মারা পড়বে না।

এই প্রস্তাব শুনে রাজা ছেলেটার ওপর খুব খুশি হলেন। ওর বুদ্ধির তারিফ না-করে পারলেন না। রাজা তক্ষুনি তাঁর লোকজনকে কলাগাছ এনে সমুদ্রের তীরজুড়ে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন।

সৈনিকরা সে কাজ খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলল। কারণ কাছেই ছিল মস্ত এক কলাবাগান।

তারপর একসময় আবার সমুদ্র ফুলে উঠল।

তলোয়ারমাছে সমুদ্রের জল হয়ে উঠল সাদা। তাদের সংখ্যা গুনে শেষ করা যায় না। ঢেউ এসে কলাগাছে আছড়ে পড়ছে। তার সঙ্গে আসতে লাগল তলোয়ারমাছের ঝাঁক। মাছগুলোর ঠোঁট লম্বা লম্বা। ছুঁচোলো। তাঁদের ছুঁচোলো ঠোঁট কলাগাছের নরম গায়ে এসে বিঁধছিল এবং আটকে যাচ্ছিল। তারপর ঢেউ নেমে গেলে হাজার হাজার তলোয়ারমাছ অসহায়ভাবে কলাগাছে ঝুলে ঝুলে তড়পাচ্ছিল। অন্যকিছু করতে পারছিল না। কারণ সেগুলো আটকা পড়ে গেছে।

সৈন্যরা তখন সহজেই লম্বা ধারালো ছুরি দিয়ে সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। এই একই ঘটনা বারবার ঘটতে লাগল। শেষপর্যন্ত সমুদ্রের জলে আর-একটাও তলোয়ার মাছ রইল না।

রাজা এভাবে একে-একে তলোয়ারমাছ শেষ হয়ে যেতে দেখে খুব খুশি হলেন। মনে মনে খুব তারিফ করলেন ছেলেটির। দারুণ বুদ্ধি!

কিন্তু পরে যখন একা একা ভাবতে লাগলেন খুবই অস্বস্তি হতে লাগল। যদিও তেমন কিছু নয়। তবুও তিনি নিজের মনে বলে উঠলেন, এই ছেলে যখন বড়ো হবে, সর্বনাশ! ওই রকম বুদ্ধিমান ছেলে তাঁর সিংহাসনের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

এই কথা যত তিনি ভাবেন তাঁর ভয়ও তত বাড়ে। শেষে একা একা ভেবে উঠতে না-পেরে সেনাপতিকে ডাকলেন। বললেন তাঁর ভয়ংকর দুশ্চিন্তার কথা।

সেনাপতি রাজার দুশ্চিন্তার কথা বুঝলেন। তারপর তিনি আর দেরি না-করে সেই ছেলের একটা কিছু ব্যবস্থা করার জন্য তৈরি হলেন।

ছেলেটি থাকত একটা ছোটো পাহাড়ের ওপর। সেখানে গাছপালায় ঘেরা ওর ছোটো কুটির। একাই থাকত সেখানে। সেই রাতেই সেনাপতি চারজন সৈন্যকে সেখানে পাঠালেন। সৈন্যরা এসে দেখে ছেলেটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে কুটিরের মধ্যে। হঠাৎ করে তারা ঘরে ঢুকে মেরে ফেলল ছেলেটিকে। তার রক্ত পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। রক্ত যে যে জায়গা দিয়ে যেমনভাবে গড়াল, পাহাড়ের মাটিও তেমনি রক্তের মতো লাল হয়ে উঠল।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত ওই ছোটো পাহাড়টির মাটি লাল।

লোকেরা নাম দিয়েছে লালপাহাড়।

ছবি। শঙ্কর বসাক



মিনা-লিনা দ্বীপ

অপূর্ব দত্ত

ছোটো-বড়ো চুয়ান্নটি দ্বীপ নিয়ে গড়া ছবির মতো দেশ সিঙ্গাপুর। তারই একটা দ্বীপে অনেককাল আগে বাস করত এক বৃদ্ধা ও তার দুই মেয়ে। স্বামীহারা বৃদ্ধাকে সংসার প্রতিপালনের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করতে হত।

দুই বোনের একজনের নাম মিনা, আরেকজন লিনা। আস্তে আস্তে মেয়েরা যখন বড়ো হল বৃদ্ধা ভাবল, এবারে ওদের বিয়ে-থা দিয়ে দেবে যাতে ওরা সুখে ঘর-সংসার করতে পারে। মিনা আর লিনা দুজনে দুজনকে এতটাই ভালোবাসত যে, ওদেরকে কোনোভাবেই আলাদা করা যেত না। বিয়ের খবর শুনে ওরা খুব বিমর্ষ হয়ে মার কাছে আবদার জানাল যে, ওরা বিয়ে করতে রাজি আছে একটা শর্তে, যদি ওদের স্বামীরাও দুই ভাই হয়।

দিন আসে, দিন যায়। দেখতে দেখতে সময় বয়ে গেল। বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কত লোক এল গেল, কিন্তু দুই ভাইয়ের দেখা আর পাওয়া গেল না। কিছুদিন পর বৃদ্ধা মারা গেলে মিনা-লিনার কাকা তাদের দেখাশোনার ভার নিল।

একদিন লিনা গেছে পাশের গ্রাম থেকে জল আনতে। সেখানে 'ওরাং লৌত' নামে ডাকাত ও জলদস্যু শ্রেণির কিছু মানুষ লিনাকে দেখতে পেল। ওদের সর্দারটা ছিল বেশ

হাট্টা-কাট্টা জোয়ান। লিনার অপরূপ সৌন্দর্যের মুগ্ধতায় পাগল হয়ে সর্দার হাসতে হাসতে তার কাছে নিজেকে নিবেদন করল।

ভয়ংকর চেহারার সর্দারকে এগিয়ে আসতে দেখে লিনা যেই তার নিজের গ্রামের দিকে দৌড়োতে লাগল, সর্দার হুকুম দিল— 'মেয়েটাকে অনুসরণ করে খুঁজে বের করো।'

সর্দার এবং অন্যান্য ডাকাত-জলদস্যুরা লিনাকে খুঁজতে খুঁজতে তার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল। লিনার কাকা দরজা খুলেই বীভৎস চেহারার একঝাঁক ডাকাতকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল।



'এই যে বুড়ো, আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। আমি ওরাং লৌতদের সর্দার। তোমার মেয়েকে আমি সোনাদানা আর ঐশ্বর্যে মুড়ে রাখতে পারি, তা জানো? ভালো চাও তো আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও। আমার কথা যে উপেক্ষা করে, তাকে আমি মোটেই ছেড়ে কথা বলি না।'

কাকা বলল, 'দয়া করে আমার কথা শুনুন, সর্দার। এরা দুজন তো আমার মেয়ে নয়, সুতরাং এদের ব্যাপারে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারব না।'

—'ওসব ফালতু কথা আমরা শুনতে চাই না। মেয়েটাকে নিতে কাল আবার আমরা আসব।'

সর্দার ও তার দলবল হাত নাড়তে নাড়তে চোখের আড়ালে চলে গেল।

কাকা বুঝতে পারছিল যে, সর্দারের গ্রাস থেকে কিছুতেই লিনাকে রক্ষা করা যাবে না। মেয়েদুটো কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে কাকার কাছে মিনতি জানাল। সারারাত ওরা জেগে প্রার্থনা করল, যদি অলৌকিক কিছু একটা ঘটে যায়। রাত শেষ হয়ে সকাল হল। সূর্য উঠল। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

কিছুক্ষণের মধ্যে দলবল নিয়ে সর্দার হাজির হল। লিনা মিনা একে অন্যকে আঁকড়ে বসে রইল। ডাকাতরা জোর করে লিনাকে ছিনিয়ে নিয়ে সর্দারের কাছে আসা মাত্রই সর্দার লিনাকে কাঁধে ফেলে একটা ছোটো নৌকোয় উঠে পড়ল। সারা গাঁয়ের লোক বেরিয়ে এসে এই দৃশ্য দেখল, কিন্তু ওদের থামানোর জন্যে কেউই কিছু করল না।

হঠাৎ দাপিয়ে ঝড় উঠল। সর্দারের লোকজন যখন লিনাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল, তখন ধ্বস্তাধ্বস্তিতে মিনার শরীরেও কিছুটা আঘাত লাগে। তা সত্ত্বেও মিনা ছুটতে ছুটতে সর্দারের কাছে গিয়ে তার বোনকে ছেড়ে দেবার জন্যে প্রাণপণ আকুতি জানাতে লাগল। লিনাকে নিয়ে সর্দারের নৌকো তখন সমুদ্রের অনেকটা ভেতরে চলে গেছে, মিনাও নৌকোর কাছে পৌঁছোবার জন্যে মরিয়া হয়ে সমুদ্রের জল কেটে এগোতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা মস্তবড়ো ঢেউ এসে মিনার শরীরটাকে লুকিয়ে ফেলল।

বোনকে সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে লিনাও জলদস্যুদের কবল থেকে কোনোমতে নিজেকে মুক্ত করে মিনাকে খোঁজার জন্যে জলে ঝাঁপ দিল।

ঝড়ের দাপট ক্রমশই বাড়তে শুরু করল। সেই ভয়ংকর বজ্রপাত আর বিদ্যুতের ঝলকানি দেখে ভয় পেয়ে গাঁয়ের লোকজন যে যার ঘরে ঢুকে পড়ল। পরের দিনও ঝড়-বৃষ্টি থামার লক্ষণ দেখা গেল না। একসময় চারদিক শান্ত হয়ে এল, ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেল। গাঁয়ের লোকজন আবার বাইরে বেরিয়ে এল। লিনা আর মিনা যেখানটায় ডুবে গিয়েছিল বলে ওদের ধারণা হল সেদিকে চোখ রাখতেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ওরা দেখতে পেল সেখানে নতুন দ্বীপ জেগে উঠেছে।

সেদিন থেকে এই কথা লোকের মুখে মুখে প্রচলিত আছে যে, বছরের এই বিশেষ দিনটায় মিনা আর লিনা দুটো দ্বীপে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং সেদিন অবশ্যই প্রবল বেগে ঝড় ওঠে।

ছবি। শঙ্কর বসাক



মোরগ-লড়াই

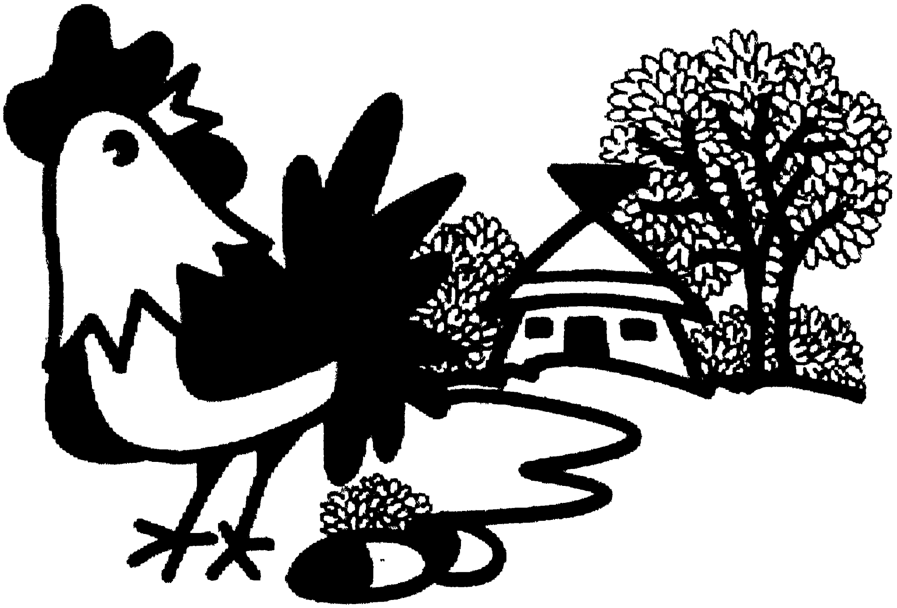
মানসী দাশগুপ্ত

সে অনেকদিন আগের কথা। বানতেন রাজ্যের রাজার ছিল একটিমাত্র ছেলে। ছেলে তো নয়, চক্ষের মণি! গলার ধুকধুকি! মাটিতে একদণ্ড নামালে তার ননির অঙ্গে ব্যথা লাগবে বলে রাজা অস্থির হয়ে যান। কিন্তু এই সাধের ছেলে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজার সুখশান্তি নষ্ট হয়ে যাবার জোগাড়। কেন? আর কেন, ছেলে বাপের কথা কানেও তোলে না, বাপকে মান্যও করে না, কেবল দৌরাত্ম্য করে করে বেড়ায়। পৃথিবীতে একটিমাত্র কাজ সে শিখেছে, তা হচ্ছে মোরগ-লড়াইয়ের খেলা। ওই তার খেলা, তার সাধ আহ্লাদ, তার কাজ। মোরগ-লড়াই ছাড়া অন্য কোনো কাজে তার মন টানে, এমন সাধ্য কার? সে আর কিছু করবেও না, শিখবেও না, ভাববেও না। তার যত মন ওই মোরগ-লড়াইয়ে। শেষ পর্যন্ত এই বিগড়ে-যাওয়া ছেলেকে নিয়ে দিশেহারা রাজা ঠিক করলেন, তাকে রাজ্য-টাজ্য দেবেন না। ছেলেকে রাজ্য থেকে নির্বাসন দিলেন রাজা।

রাজপুত্তুর বাপের প্রাসাদ ছেড়ে তো বেরোল। হাঁটছে তো হাঁটছেই! যেতে যেতে এক গহন বনে পৌঁছে গেল রাজপুত্র। খুব ক্লান্ত, রাত্তিরটা কোথায় কাটাবে ভাবছে, এমন সময় তার নজরে এল অরণ্যের মাঝখানে ডাল-পাতায় ছাওয়া একটি কুটির, দিব্যি ছিমছাম।

কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে রাজকুমার ভাবছে, কে এমন জায়গায় থাকতে পারে? এমন সময়ে কুটিরের দরজায় দেখা গেল খুব সুন্দর একটি মেয়েকে। রাজকুমার তার কাছে আসতে মেয়ে বলল, এ কুটিরে সে থাকে একা। বাবা-মা দুই-ই তাকে একা রেখে মরে গেছে, তাই সে আর কী করবে? ওখানে থাকে আর নিজেই নিজের দেখাশোনা করে। এর পরে সেই গভীর বনের মধ্যে রাজকুমার আর সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পরে বনের কুটিরে বউ নিয়ে তো রাজপুত্তুর সুখে আছেন। দিন যায়, সপ্তাহ যায়; মাস যায়। তারপরে বউয়ের ছেলে হতে যখন আর দু মাসও বাকি নেই, সংবাদ এল রাজার মৃত্যু হয়েছে। খবর শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রাজপুত্তুর। এবার রাজা হবে কে? তারই



তো হবার কথা, কেননা, রাজার তো আর কোনো ছেলে নেই।

রাজপুত্তুর দেশের দিকে রওনা দিল। তাই না দেখে বউ কাঁদতে আরম্ভ করল। কিন্তু রাজকুমার তাকে নিয়ে রাজ্যে ফিরবে না। বউ বেচারা খানিক রেগেমেগে ঝগড়া করল, তাতেও কোনো কাজ হল না। কান্না, মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি কিছুতেই কিছু হল না। ওই অরণ্যে তাকে ফেলে রেখে রাজপুত্তুর রাজ্যে ফিরে গেল।

অল্পদিন পরে, কুঁড়েঘরখানির সামনে বসে বউ আপনমনে নিজের ভাগ্যের কথা, ভবিষ্যতের কথা, আকাশ-পাতাল ভাবছে, মাথার ওপর দিয়ে একটা ঈগলপাখি উড়ে গেল। পাখির

ঠোঁটে চেপে ধরা রয়েছে এতটুকু একটি মোরগছানা। ঠিক বউটির মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে ঈগল ঠোঁটদুটি ফাঁক করল, আর মোরগছানা টুক করে এসে পড়ল বউয়ের পায়ের কাছে। ছানাটার লাগলে কী হবে, মরেনি। বউ তো তাড়াতাড়ি ছানাটাকে তুলে নিয়ে শুশ্রূষা করতে লাগল।

এর দু'চারদিন বাদেই বউয়ের খুব সুন্দর, মোটাসোটা ছেলে হল, তার নাম হল পানজি কেলারাস। এ নাম কিন্তু বউ দেয়নি তার ছেলেকে, এ নাম দিল ওই বাচ্চা মোরগটা। হল কী, বাচ্চা মোরগ তো চিরকাল বাচ্চা থাকে না, বউয়ের সেবাযত্নে সে ধর-ধর করতে করতে বড়ো হয়ে উঠেছিল। ছেলে যতদিনে আট-ন বছরের ছেলে হয়ে উঠেছে, মোরগ ততদিনে একেবারে দারুণ ঝুঁটিওয়ালা লড়িয়ে মোরগ হয়ে বসে আছে। ছেলে মায়ের কাছে জানতে চায়, "মাগো, আমার বাবা কোথায়?"

মা বলেন, "এইটি জেনে রাখো বাছা, বাপ নাই তোমার।"

ছেলেও এরপরে আর একটি কথাও জানতে চায় না, মা-ও টুঁ-শব্দ উচ্চারণ করেন না।

কিন্তু মোরগ ছড়া কেটে হেঁকে ওঠে:

"কঁককো-কঁকর-কো,
কঁককো-কোঁকর-কো
মৈ তুমহারা হো,
পানজি কেলারাস নাম
তোর মা তো থাকেন বনের কুঁড়েয়
বাপ প্রাসাদেতে নিদ যান।"

এমনি করে মোরগের ছড়ায় ছেলের নাম হয়ে গেল পানজি কেলারাস।

এদিকে সেই যে রাজপুত্তুর বউকে বনে ফেলে রেখে বাপের রাজ্য বুঝে নিতে গিয়েছিল, তার সাধ অপূর্ণ থাকেনি। দেশে ফেরার পর এখন তিনি রাজামশাই। মৃত পিতার সিংহাসনে রাজামশাই বসেছেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রজাবর্গ সব বুঝে গিয়েছে, নতুন রাজামশাই মোরগ-লড়াই ছাড়া আর কিছু জানেন না। প্রাসাদের বাগানে এখন মোরগ-লড়াইয়ের মুক্তাঙ্গন, প্রত্যহ সেখানে লড়াই দেখা আর দেখানো চলে। রাজ্যের আর সব কাজকর্ম ভাবনাচিন্তা শিকেয় তোলা আছে।

গভীর অরণ্যে পানজি কেলারাসের কানেও এই রাজামশায়ের খ্যাতি পৌঁছোল, প্রত্যহ রাজামশাই লড়িয়ে মোরগ নামান। পানজি কেলারাস ঠিক করল, তার নিজের পোষা মোরগটাকে নিয়ে প্রাসাদে যাবে আর রাজামশাইয়ের মোরগের সঙ্গে লড়াইয়ে নামাবে।

প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে সে দেখে, গোটা চত্বর লোকে লোকারণ্য, সবাই বাজি ধরছে। সে তখন মানুষজনকে ঠেলেঠুলে দাঁড়াল গিয়ে একেবারে মাঝখানে, আর বলতে লাগল, তার মোরগ রাজার মোরগের সঙ্গে লড়তে চায়। একেবারে একটা ঢোক গেলা নেই, ভয়-ভাবনা

নেই, লোকেরা শুনে ভিরমি খায়। প্রথমেই রাজার মোরগের ঝুঁটি ধরে টান? বলে কী ছেলে! এ-সব ভেবে তারা ভালো করে চেয়ে দেখল মোরগ হাতে ছেলেটাকে। মোরগটা সত্যিই তাক লাগানোর মতো, এ-কথাটা তাদের মানতে হল।

খেলা শুরু হওয়ার আগেই দু'পক্ষেই প্রচুর বাজি ধরাধরি হল। কিন্তু খেলা শুরু হয়েছে কি হয়নি, একটি ঠোক্করে রাজার মোরগ কাত। হেরে গিয়ে রাজার মোরগ পড়ে গেল। পানজি কেলারাসের মোরগ গলা ছেড়ে হাঁক দিল :

"কঁকর...কঁকর কোঁ।
মৈ কিসিকা হো।
পানজি কেলারাসের।
তার মায়ের কুঁড়ে পাতাঘাসের
বাপ ঘুমোয় প্রাসাদে।"

উপস্থিত লোকজন একেবারে হাঁ। তাদের বিস্ময় কাটবার আগেই পানজি কেলারাস তার মোরগকে বগলে চেপে বনবাসিনী মায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত। শুধু তো মোরগ নয়, টাকাও এনেছে সে একথলি। তার মা চমকে উঠল। টাকা বটে তো? এত টাকা?

"কোথায় পেলি এত টাকা?" জানতে চাইল মা।

যেন প্রত্যহ সে থলেভর্তি টাকা এনে মাকে দিয়েই থাকে, এমনি সুরে পানজি কেলারাস জবাব দিল, "ওই টাকাটা? ও তো রাজার মোরগের সঙ্গে আমাদের মোরগটাকে লড়িয়ে দিয়ে জিতেছি। কিছু ভেবো না, মা। পরশুদিন গিয়ে আবার জিতে আসব।"

দ্বিতীয়বার প্রাসাদে গিয়ে পানজি কেলারাস প্রথমবারের চেয়েও বেশি ভিড় পেল। এক আশ্চর্য মোরগ আর খুদে-মোরগওয়ালার গল্প মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল এই দু'দিনে। সবাই এসেছিল দলে দলে তাদেরই দেখতে। রাজামশাই উপস্থিত হয়ে দেখলেন, সমস্ত মনোযোগ ওই পানজি কেলারাস ছোকরার ওপর। দেখে তিনি বিরক্ত হলেন। গোমড়ামুখে বললেন, "ওহে ও ছেলে, এই একথলি স্বর্ণমুদ্রা রইল আমার বাজি, তুমি জিতলে এই পুরো থলি তোমার। হারলে তুমি কী দেবে?"

পানজি কেলারাস সোজা উত্তর দিল, "আমার এই মাথা। আমার মোরগ যদি হারে, আপনি আমার মাথা কেটে নেবেন।"

জনতা স্তম্ভিত! রাজামশাই অবাক! তাঁর বড্ড কৌতূহল হচ্ছে, কে এই আশ্চর্য ছেলেটা। মুখখানা কেমন যেন চেনা-চেনা। কে হতে পারে ছেলেটা?

যাই হোক, রাজামশাই তো তাঁর শ্রেষ্ঠ মোরগটিকে আনতে বললেন। এ-মোরগের জুড়ি নেই। কিন্তু, কী কান্ড। ঠিক আগের বারের মতোই একটি ঠোক্কর খেতে না-খেতে রাজার মোরগ কাত্। রাজামশাই এবং তাঁর রাজত্বের অহংকার ভূলুণ্ঠিত। আর লড়াই করেন কোন্ মুখে? ওদিকে পানজি কেলারাসের মোরগ হেঁকে উঠেছে :

"কঁকর....কঁকর কোঁ...
মৈ কিসিকা হো?
পানজি কেলারাসের।
তার মায়ের কুঁড়ে পাতাঘাসের
বাপ ঘুমোয় প্রাসাদে।"

আগের বারের মতোই রাজামশাই এবং উপস্থিত সকলে হতবাক।

পানজি কেলারাসের লক্ষ নেই এ-সব দিকে। মোরগটিকে তুলে বগলে চেপে সে গিয়ে উপস্থিত মায়ের কাছে। মা বুকে টেনে নিয়েছে তাকে। দু'জনের কেউই নজর করেনি যে, রাজামশাই স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন সেখানে।

আসলে হয়েছে কি, রাজামশাই আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারেননি। ছেলেটা কে, কোথায় থাকে—বের করার জন্যে তিনি তার পিছু নিয়েছিলেন।

রাজামশাই দেখলেন, তাঁর সেই বনে ফেলে যাওয়া বউই পানজি কেলারাসকে বুকে টেনে নিয়ে সোহাগ করছে। আবেগ চেপে রাখতে না পেরে তিনি ছুটে গিয়ে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, "ও বউ, বউরানি, এই দেখ, আমিও ফিরে এসেছি তোমার কাছে। আমায় মাপ করবে?"

এই মাপ চাওয়া-চাওয়ি দেখে পানজি কেলারাস অবাক হয়ে গেল। রাজামশাই থতমত খেয়ে পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "বউরানি, এই ছেলেটি কে?"

বউ বলল, "প্রভু, এটি তোমারই পুত্র।"

রাজা তখন মহাসমাদরে ছেলে আর বউকে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। বনবাসিনী বউকে রানির আসনে বসালেন রাজা। খুব সুখে দিন কাটতে লাগল সবার।

অনেকদিন পরে রাজামশাই গত হলে তাঁর আসনে বসল পানজি কেলারাস।

ছবি। শঙ্কর বসাক



বাঘে-মানুষে

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

এক ছিল বাঘ।

তার যেমন চেহারা, তেমনি গায়ে জোর। তার হাঁক-ডাক আর লম্ফ-ঝম্ফ দেখে জঙ্গলের সব জন্তুরা ভয় পেত। আর ভয়ে সবাই তাকে খুব মেনে চলত। সত্যিই সে ছিল বনের রাজা।

তার মতন শিকার করবার ক্ষমতাও সে-বনে কারও ছিল না। মাঝারি জন্তুদের তো কথাই নেই। বড়ো বড়ো হাতিও তার হাতে রেহাই পেত না। এক লাফে তার শুঁড়ের ডগায় উঠে সজোরে থাবা বসিয়ে দিত হাতির মাথায়। আর সে-হাতিকে তখন বাঁচায় সাধ্য কার? সেই এক থাবার চোটেই হাতি ঘুরে পড়ে যেত। এমনি জোর ছিল বাঘের গায়ে।

কিন্তু বনের পশুর চেয়ে মানুষের ওপর তার লোভটা ছিল বেশি। মানুষের গন্ধ পেলে সে আর সব শিকার হাতছাড়া করত। মাঝে মাঝে মানুষের রক্ত না পেলে তার চলত না। সে অনেক কষ্ট স্বীকার করত সেজন্যে।

বনের মধ্যে কিংবা বনের ধারে লোকজন বড়ো-একটা কেউ যেত না। তাই মানুষের রক্তের আশায় বাঘকে প্রায়ই আসতে হত এদিকে —মানে, লোকালয়ের দিকে। বনের

কাছাকাছি গ্রামগুলোতে রাত্তিরে সুবিধে পেলেই সে হানা দিত।

এমনি করে ভালোমন্দ খেয়ে তার দিন একরকম চলে যাচ্ছিল। এমন সময় এক কাণ্ড হল। একদিন মহা বিপদে পড়ল সে। এমন বিপদে সে কখনও পড়েনি।

হল কী, সেদিন রাতে মানুষের গন্ধে গন্ধে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে পড়েছিল। এ একটা নতুন গ্রাম, এখানে সে আগে আসেনি কখনও। তার ওপর ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। চোখ জ্বেলেও বেশি দূর দেখা যায় না। আর এখানকার রাস্তাঘাট সব যেন কেমন বিদ্‌ঘুটে। পায়ে পায়ে কেবল হোঁচট খেতে হয়।

কোথা থেকে কী হল কে জানে। অন্ধকারে বাঘ তো কিছুই ঠাওর করতে পারেনি। এটা একটা প্রকাণ্ড খাঁচা নাকি? রাস্তার ধারে কেনই যে পাতা ছিল, কে বলবে। তারই সর্বনাশের জন্যে বুঝি। কিন্তু কেউ তো তাকে এ গ্রামে চিনত না? হয়তো অন্য কারও জন্যে এটা খাটানো ছিল। কিংবা হয়তো কারও জন্যেই পাতা হয়নি। এমনি রাস্তার ধারে পড়ে ছিল। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে বাঘ তারই মধ্যে ঢুকেছিল, কিছু না বুঝে। তারপরই দরজাটা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যায়। আর সেই বাঁশের খাঁচায় আটকে গেল বাঘ।

ছটফট করতে করতে এদিকে ওদিকে সে ধাক্কাধাক্কি করতে লাগল। কিন্তু খাঁচার কোনো দিকই খুলতে পারলে না, ভাঙতেও পারলে না। ধস্তাধস্তি করতে করতে কখন রাত কেটে গেল। ফরসা হল আকাশ আর চারিদিক।

তখন দিনের আলোয় বাঘ নিজের অবস্থাটা আরও ভালো করে বুঝতে পারলে। এ একটা অচেনা গ্রাম। এখানকার একটা রাস্তার ধারে একটা মজবুত বাঁশের তৈরি খাঁচা। তার একদিকে দরজা, সেটাও বন্ধ। আর তার মধ্যে সে আটকে পড়েছে। রাত্তিরে বোধহয় তার দরজাটা খোলা ছিল। সে অন্ধকারে বুঝতে না পেরে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারপর বন্ধ হয়ে যায় দরজা।

এখন খাঁচার মধ্যে বন্দি হয়ে বাঘ বসে বসে ভাবতে লাগল, কী করে এই খাঁচা থেকে বেরোনো যেতে পারে? নিজের গায়ের জোরে তো হবে না। সারারাত সে চেষ্টা করে দেখেছে। নিজের বুদ্ধির জোরেও কিছু করা যাবে না। যদি অন্য কেউ দয়া করে খাঁচার দরজা খুলে দেয়, তবেই বেরিয়ে প্রাণটা বাঁচে। না হলে আরো কটা দিন যদি এমনিভাবে থাকতে হয়, তাহলে অনাহারেই মারা যেতে হবে।

এই সব ভেবে বাঘ অপেক্ষা করতে লাগল, সামনে কাউকে দেখতে পেলেই বলবে বলে।

কিন্তু তখন সবে ভোর হয়েছে। আর এ জায়গাটাও গ্রামের খুব ভেতরে নয়। বোধহয় একটু বাইরের দিকে। লোক চলাচল তখনও আরম্ভ হয়নি। তাই সে খানিকক্ষণ কারও দেখা পেলে না।

তারপর বেলা যত বাড়তে লাগল, কিছু কিছু লোককে বাঘ সেখান দিয়ে যাতায়াত করতে দেখলে।

যাকে সেখান দিয়ে যেতে দেখে, তাকেই ডেকে ডেকে বলে, 'ও ভাই শুনছ, এই খাঁচার

দরজাটা একবার খুলে দেবে?'

কিন্তু কেউ তার কথায় কান দেয় না। কেউ হয়তো তার কাকুতিমিনতি শুনে আসে। তবে বাঘের ভীষণ চেহারা দেখে শেষ পর্যন্ত রাজি হয় না খাঁচার দরজা খুলে দিতে। বলে, 'না বাবা, কাজ নেই আমার। ছাড়া পেলে তুমি আমাকেই আগে খাবে?'

বাঘ অনুনয় করে বলে, 'না ভাই, না। আমায় বিশ্বাস করো। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। খাঁচা খুলে দিলেই আমি বনে চলে যাব। আমায় বিশ্বাস করো, ভাই।'

কিন্তু কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। এদিকে বেলা বাড়তে থাকে আর সেই সঙ্গে ঝাঁ ঝাঁ রোদ। তার ওপর কাল সারা রাত পেটে কিছু পড়েনি। খিদের জ্বালায়, রোদের তাপে সে যেন জ্বলতে লাগল। আর ছটফট করতে লাগল খাঁচার এদিক থেকে ওদিকে।

তাছাড়া আর এক ফ্যাসাদ। ছোটো ছেলেদের খাঁচার দিকে নজর পড়লেই তারা হই হই করে ছুটে আসে। খাঁচার মধ্যে কেউ ঢিল ছোড়ে, কেউ আবার বাখারি এনে খোঁচা দেয়। বাঘ গাঁক গাঁক করে তাদের দিকে তেড়ে যায়, ভয় দেখায় খাঁচার ধারে এসে। কিন্তু তারা তাতে মোটেই ভয় পায় না। জানে তো যে বাঘ খাঁচার মধ্যে আছে। কী করবে তাদের? বরং আরও মজা পায় তারা। বাঘকে আরো নাস্তানাবুদ করে। তারপর আর যখন ভালো লাগে না, খেলতে চলে যায়।

এমনি করে সারা সকালটা বাঘের কষ্টেই কাটল। দুপুর গেল গড়িয়ে। কেউ খাঁচার দরজা খুলে দিলে না। খিদে-তেষ্টায় নিস্তেজ হয়ে বাঘ বসে রইল রাস্তার দিকে চেয়ে। যে লোক সেখান দিয়ে আসে-যায় বাঘ তাকেই একবার করে বলে, 'ও ভাই, শুনছ, এই খাঁচার দরজাটা খুলে দাও না।'

তারপর একজনকে দেখে বাঘের মনে হল, এ লোকটি বেশ ভালো মানুষ। হাসিমুখে সে একলা রাস্তা দিয়ে আসছিল।

খাঁচার সামনে দিয়ে যাবার সময় তাকে বাঘ ডাকলে। বললে, 'দয়া করে আমার খাঁচার দরজাটা খুলে দাও না ভাই। কাল রাত থেকে এখানে আটকে পড়ে আছি। দোহাই তোমার, আমার প্রাণ বাঁচাও।'

শুনে লোকটি খাঁচার সামনে এসে দাঁড়ালে। আর বাঘকে বললে, 'বড়োই বিপদে পড়েছ দেখছি। তা তোমার প্রাণ বাঁচাতে পারি। কিন্তু ছাড়া পেলে তুমি কী করবে, তাই ভাবছি। আমার ঘাড় মটকাবে না তো?'

বাঘ তার কথায় খানিকটা ভরসা পেয়ে মিনতি করে বললে, 'না ভাই, না, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি ছাড়া পেলেই বনে চলে যাব। সেখানে আমার বাচ্চারা আমার জন্যে পথ চেয়ে রয়েছে। আমি গিয়ে তাদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করব। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কোনো ক্ষতি করব না।'

তখন লোকটা বললে, 'দেখো, নিজের মুখে যে-কথা এখন স্বীকার করলে, তা যেন মনে থাকে। তোমার কথার ওপর নির্ভর করে খাঁচা খুলছি।'

এই বলে সে খাঁচার দরজা খুলে দিলে। আর বাঘ সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে বেরিয়ে এসে ধরল তাকে।

লোকটি দেখলে সর্বনাশ! ছাড়া পেতে না পেতেই কথার খেলাপ? একে এখন আর কিছু বলাই বৃথা। কিন্তু মুখে কোনো ভয়ের ভাব না দেখিয়ে বললে, 'আচ্ছা, একটা কথা শোনো। আমাকে না হয় একটু পরেই মেরো। আমি তো তোমার সঙ্গেই থাকব। এখন একবার আইনটা জেনে নিলে হয় না? আমি তোমার উপকার করলুম, আর আগে তুমি আমায় কথা দিয়েছিলে যে আমার কোনো ক্ষতি করবে না। এখন এ-বিষয়ে আইন কী আছে পাঁচজনের কাছে জেনে নেওয়া যাক। তারপর যা খুশি তাই কোরো।



বাঘ বললে, 'বেশ, তাই হবে। কিন্তু মানুষের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করা চলবে না। অন্য সবাইকে বলতে হবে। অন্য সকলের মত আমি মেনে নেব। কিন্তু মানুষের কথা শুনব না।'

শুনে লোকটি বললে, 'আচ্ছা, আমি তাতেই রাজি আছি। এখন চলো, পাঁচজনের মত নেওয়া যাক। কেউ ভালো করলে তার বদলে মন্দ করা যায় কি না এ-বিষয়ে কে কী বলে শোনা যাক, চলো।'

এই স্থির হবার পর তারা দু'জন তখনই চলল।

চলতে চলতে লোকটি প্রথমে জিজ্ঞেস করলে রাস্তাকে।

'রাস্তা, রাস্তা, তোমাকে একটা আইনের কথা জিজ্ঞেস করি। বলো তো, এ-বিষয়ে তোমার মত কী?'

রাস্তা জিজ্ঞেস করলে, 'কোন বিষয়ে, শুনি?'

লোকটি বললে, 'কথাটা হচ্ছে এই, কেউ কারোর উপকার করলে তার বদলে তার ক্ষতি করা উচিত, না, শুধু ভালো করা উচিত?'

শুনে রাস্তা বললে, 'এই কথা? তা আমার দিকে চেয়ে দেখো, তাহলেই এর উত্তর পাবে। আমি মানুষের কত উপকার করি। কিন্তু মানুষ আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করে চেয়ে দেখছ তো? আমার সর্বাঙ্গ নোংরা করে রাখে, ভেঙেচুরে গর্ত করে দেয়। ভালো করার বদলে তারা আমার মন্দ করে।'

বাঘ তখন লোকটির দিকে চেয়ে বললে, 'দেখলে তো? আইনটা কী? ভালোর বদলে কী করা হয়ে থাকে!'

লোকটি বললে, 'আচ্ছা, ওই গাছকে এবার বলি। দেখি গাছের কী মত। গাছটির তো অনেক বয়েস হয়েছে। মনে হয় জ্ঞানী।'

এই বলে সে প্রকাণ্ড গাছটির নীচে গিয়ে বললে, 'গাছ, গাছ, তোমাকে একটা আইনের কথা জিজ্ঞেস করি। বলো তো, এ-বিষয়ে তোমার মত কী?'

ঝাঁকড়া মাথা দুলিয়ে গাছ জিজ্ঞেস করলে, 'কোন বিষয়ে, শুনি?'

'কথাটা হচ্ছে এই—কারো ভালো করলে তার বদলে কি তার মন্দ করা উচিত, না, শুধু ভালো করা উচিত?'

গাছ বললে, 'এই কথা? তা মত আমার জানাচ্ছি। কিন্তু সে কি তোমার পছন্দ হবে? তবে জিজ্ঞেস করলে যখন, বলি শোন। আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো। আমি মানুষের কত উপকার করি। যে আমার কাছে চায় তাকেই আমি ফল দিই, ছায়া দিই। আশ্রয় দিই রোদে, জলে, ঝড়ে। কিন্তু মানুষরা আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করে? তারা কেউ কেটে নেয় আমার সব ডাল। তারপর আমার যখন আরো বয়েস হবে, আমার গোড়াটা পর্যন্ত কেটে ফেলে বিক্রি করে দেবে। যেমন অন্য সব বুড়ো গাছকে তারা করে। তা আমাদের এই তো আইন। আমরা মানুষের ভালো করলেও তার বদলে মানুষেরা আমাদের শুধু মন্দ করে।'

বাঘ তখন লোকটির দিকে চেয়ে বললে, 'দেখলে তো আইনটা কী? ভালোর বদলে কী করা হয়ে থাকে। দু'জনের কথা তো শুনলে? আর কাকে জিজ্ঞেস করতে চাও, বলো। আর একজনকে জিজ্ঞেস করতে পারবে। তার বেশি আর না। উঃ! আমার বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

শুনে লোকটির বুক ধড়ফড় করে উঠল। সে কোনোরকমে বললে, 'আচ্ছা, বেশ। আর একজনকেই জিজ্ঞেস করব। তারপর তুমি যা বলবে, তাই হবে।'

এই বলে বাঘের সঙ্গে আবার সে এগিয়ে চলল। আর মনে মনে ভাবতে লাগল, কী আশ্চর্য! যাকে জিজ্ঞেস করি, সে-ই দেয় উলটো জবাব! আমার দেখছি বরাতটাই খারাপ। ভালো করতে গেলুম, হল মন্দ। আবার যাকেই জিজ্ঞেস করি, বলে কি না ভালোর বদলে জগতে মন্দই করা হয়ে থাকে। এই হল সংসারের আইন! এমন উলটো আইন হলে কি সংসার চলতে পারে? এখন কাকে জিজ্ঞেস করি? সে আবার কী বলে বসবে, কে জানে! আর বাঘটাই বা কতক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকবে, কে বলতে পারে? উঃ, কী বিপদেই না পড়লুম। হায়, হায়, কেন ওই সর্বনেশে জন্তুর কথায় ভুলে তাকে বাঁচাতে গেলুম খাঁচা থেকে?

এমনি নানান কথা ভাবতে ভাবতে সে বাঘের সঙ্গে পথ চলছিল। এমন সময় দেখে, এক হরিণ আসছে।

তখন লোকটি এগিয়ে গিয়ে হরিণকে বললে, 'হরিণ, হরিণ, তোমাকে একটা আইনের কথা জিজ্ঞেস করি। বল তো, এ-বিষয়ে তোমার মত কী?'

হরিণ চমৎকার চোখ দু'টি মেলে একবার তার দিকে, আর একবার বাঘের দিকে চেয়ে বললে, 'কোন্ বিষয়ে, শুনি?'

'কথাটা হচ্ছে এই—কারো ভালো করলে তার বদলে ভালো করা উচিত, না, শুধু মন্দ করা উচিত?'

একটু ভেবে হরিণ বললে, 'এক কথায় প্রশ্ন করলে বটে, কিন্তু এখনই উত্তর দেওয়া শক্ত। আমায় তোমাদের ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নিতে হবে। তারপর আমার মত জানাব। তোমাদের দু'জনের মধ্যে বোধহয় এই নিয়ে তর্ক হয়েছে। তা বাঘের এ-বিষয়ে কী মত?'

লোকটি বললে, 'বাঘের মত হল, ভালো করলে তার বদলে মন্দ করা উচিত। কেমন বাঘ মশাই, তাই না?'

বাঘ কটমট করে চেয়ে বললে, 'শুধু আমারই মত নয়, যারা জ্ঞানী, যাদের বয়েস হয়েছে আর বিবেচনা করবার ক্ষমতা আছে—তাদের সকলেরই এই মত! শুনলে না,—গাছ, রাস্তা সবাই এ-বিষয়ে কী বললে?'

হরিণ তাড়াতাড়ি বাঘকে বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি। আমারও মতটা ওই রকম দাঁড়াবে। তবে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ওই গাছ, রাস্তা ওদের চেয়ে কম। তাই আমি তোমাদের তর্কটা গোড়া থেকেই শুনতে চাই। কী থেকে, আর কেনই-বা তোমাদের এই তর্ক আরম্ভ হল তা জানতে পারলে আমার বোঝবার পক্ষে বড়োই সুবিধে হয়। কী হয়েছিল, একটু বলো তো শুনি।'

তখন লোকটি সেই খাঁচার দরজা খোলা থেকে আরম্ভ করে যা যা হয়েছিল, সব বললে। তবে বাঘের ওপর রাগ একটুও জানাল না কিংবা তার দোষও দেখালে না কিছু। বাঘের আর রাগের কোনো কারণ রইল না।

হরিণ সব মন দিয়ে শুনলে।

তারপর বাঘকে বললে, 'এখন একবার সেই খাঁচার কাছে গিয়ে সেখানটা ভালো করে

দেখে নিই। তারপরেই বলে দেব আমার মতামত। আমাকে একবার সেখানে নিয়ে চলো।'

বাঘ বললে, 'তা যাচ্ছি। কিন্তু সেখানে গিয়ে বেশি দেরি করা চলবে না, বলে দিচ্ছি। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে।'

এই বলে বাঘ, মানুষ আর হরিণ তিনজনে সেই খাঁচার সামনে গেল।

হরিণ বাঘকে বললে, 'এই খাঁচার মধ্যে তুমি তাহলে ছিলে? এইখান থেকেই তোমাদের দু'জনের তর্কটা আরম্ভ হয়েছিল, কেমন? আচ্ছা, তুমি খাঁচার ভেতর কোনখানে ছিলে একবার দেখাও তো। আমি ওপর থেকে দেখে নিই।'

এই বলে হরিণ খাঁচার ওপর উঠে বসল। আর বাঘ তার কথা মতন গিয়ে ঢুকল খাঁচার মধ্যে।

অমনি সঙ্গে সঙ্গে হরিণ ঝুপ করে খাঁচার দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

বাঘ হেঁকে বলে উঠলে, 'ও কী করলে, ও কী করলে?'

হরিণ বললে, 'ঠিক করেছি। যা উচিত তাই করেছি।'

তখন বাঘ রেগে লম্ফ-ঝম্ফ করতে লাগল—খাঁচাটার দরজার দিকে, ওপর দিকে। বিকট মুখ করে গাঁক গাঁক করতে লাগল।

হরিণ খাঁচার ওপর থেকে নেমে এসে বললে, 'শয়তান কোথাকার! এবার কেমন জব্দ হয়েছিস। তোর সঙ্গে এমনি ব্যবহারই করা উচিত। তোর ভালো করলে তুই তার বদলে মন্দ করতে চাস? এ বেচারি তোর প্রাণ বাঁচিয়েছিল, তুই তাকে খেতে চাইলি ছাড়া পেয়ে, তোর পাপের শাস্তি এবার ভোগ কর।'

এই বলে হরিণ লোকটিকে বললে, 'লোকজন ডেকে এনে শয়তানটাকে এখানেই শেষ করো।'

তখন লোকটি গিয়ে গ্রামের সবাইকে ডেকে আনলে। তারপর সকলে মিলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেললে বাঘটাকে।

ছবি। শঙ্কর বসাক



বোকা কুমির আর হরিণ

সুখেন্দু মজুমদার

বনে বনে ঘুরে হরিণ খুব ক্লান্ত। পিপাসা পেয়েছে তার, জল পায় কোথায়? কোথায় জল? পাশেই ছিল নদী। হরিণ চলল নদীর কাছে জল খেতে। যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল সে। কেন দাঁড়াল? হরিণ জানে নদীতে কুমির আছে। পাড়ের কাছাকাছি লুকিয়ে চুরিয়ে আছে জলের তলায়। যেই নামবে জল খেতে, কুমির অমনি... কুমির কী করবে শুনি?

কী আর করবে। খপাৎ করে পা-টা ধরে নিয়ে যাবে জলের তলায় আর তারপর খেয়ে ফেলবে।

হরিণ জল খাবে কী করে?

হরিণ মনে মনে একটা মতলব আঁটল। সে চেঁচিয়ে বলল, দেখি তো নদীর জলটা কি সত্যি সত্যি গরম? আমি বরং আগে-ভাগে পা ডুবিয়ে দেখে নিতে চাই। তারপর খেতে হয় খাব।

কী করল হরিণ?

যেটা বলল সেটা না করে মুখে করে একটা লাঠি নিয়ে তার অন্য প্রান্তটা জলের মধ্যে

রাখল।

যেই না রাখা, খপাৎ করে লাঠিটা কুমির নিয়ে গেল একেবারে জলের তলায়।

হি হি করে হেসে উঠল হরিণ। আর হাসতে হাসতে সে বলল, কী বোকা কুমির, কোনটা লাঠি আর কোনটা যে সত্যিকারের পা সেটাও চেনে না।

হাসতে হাসতে হরিণ চলে গেল খানিক দূরে। নদীতে গিয়ে মজা করে জল খেয়ে ফিরে গেল বনে।

আর কোনওদিন জল খেতে আসেনি?

জল না খেলে কেউ কি বাঁচে? আবার আরেকদিন হরিণ এসেছে জল খেতে। এসে দেখে কী, নদীতে একটা কাঠের বড়ো টুকরো ভাসছে। হরিণ জানে কুমির যখন জলে ভাসে তখন তাকে ঠিক কাঠের টুকরোর মতো দেখায়। মনে মনে আবার মতলব আঁটল হরিণ। আরও জোরে চেঁচিয়ে বলল, কাঠের টুকরোটা সত্যি যদি কুমির হয় তবে আমার সঙ্গে কথা বলবে না। কুমির না হয়ে আর সত্যি যদি কাঠের টুকরোই হয় তবে আমার সঙ্গে খোশগল্প জুড়ে দেবে।

তারপর?

তারপর আর কী। হরিণের কথা যেই শেষ হয়েছে অমনি সে শুনতে পেল একটা কর্কশ আওয়াজ। জলের তলায় মুখ রেখে কুমির বলল, বিশ্বাস করো, আমি সত্যি কাঠের টুকরো।

কাঠের টুকরো আবার কথা বলতে পারে নাকি? সেটা কখনো হয়! তাই তো হরিণ হি



হি করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে ভাবল, বোকা কুমির এটাও জানে না। তারপর হরিণ ফিরে গেল বনে।

একবার। দু'বার। আর কি হরিণ এসেছিল কুমিরের কাছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ আরও একদিন এসেছিল। কেন জানো?

নদীর এ-পারে থাকতে তার আর ইচ্ছে করছিল না। নদীর ও-পারে নাকি প্রচুর রসালো ফলমূল আর কচি কচি পাতা আছে। হরিণের খুব ইচ্ছে সে-সব খাওয়ার। কিন্তু নদী পেরোবে কী করে? নদী পেরোবার আগেই কুমির যদি খেয়ে ফেলে!

এবারও হরিণের মাথায় এল একটা দুর্দান্ত মতলব। যেই না আসা হরিণ চেঁচিয়ে উঠল, ওহে কুমির ভায়া...

তক্ষুনি জলের নীচ থেকে গর্জন করে উঠল কুমির, আরে আরে হরিণভায়া যে। আমার সকালের ভোজনের জন্য বুঝি তুমি এসেছ?

না না কুমিরভায়া। আজকে আমি অন্য একটা কাজ নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে। বলল হরিণ।

অন্য কাজ?

সেটাই তো বলছি। হরিণ বলল, রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন। এই নদীতে কত কুমির থাকে আজই গুনে তাঁকে বলতে হবে।

রাজা বলেছেন? খানিকটা ভয় পেয়েই কুমির বলল, আমাদের কী করতে হবে শুনি।

তেমন কিছুই না। তোমরা সব কুমির নদীর এ-পার থেকে ও-পার পর্যন্ত সার দিয়ে ভেসে থাকো। আমি এক দুই তিন চার করে পর পর সব গুনে নেব।

কুমির চলে গেল তার পরিবারের লোকজনদের খবর দিতে। তারপর একে একে পাড়াপড়শি বন্ধুবান্ধব যারা ছিল সবাইকে খবর দিয়ে জড়ো করে সার দিয়ে ভেসে থাকতে বলল।

সবাই হাজির। হরিণ বলল, এবার গোনা শুরু।

হরিণ একটা করে কুমিরের পিঠে লাফায় আর বলে, এক, তার পরেরটার পিঠে উঠে বলল, দুই। এমনি করে তিন...চার...পাঁচ। যতক্ষণ না হরিণ নদীর ও-পাড়ে নামল।

গোনা থামতেই কুমির চিৎকার করে উঠল, গোনা শেষ হয়েছে?

হরিণ বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা সত্যি সত্যি অনেক। কিন্তু...

কিন্তু কী? কুমির বলল।

আসলে তোমরা একেবারে বোকার হদ্দ। কথাগুলো বলে গান গাইতে গাইতে হরিণ চলল নতুন বনের খোঁজে। যে বন সুস্বাদু ফলমূল আর কচিপাতায় সবুজে সবুজ।

ছবি। অরুণ চট্টোপাধ্যায়



কাচের হিরে

মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যাংককে নাই চামনান নামে একজন বিখ্যাত রত্নব্যবসায়ী ছিল। সে যে-কোনও মূল্যবান পাথর দেখলেই বুঝতে পারত সেটার দাম কত এবং বহু হিরা, চুনি, পান্না ক্রেতার কাছে বিক্রিও করেছে। সেই সময় ক্রুয়াডি নামে এক চতুর লোক ছিল। সে অন্য লোককে বোকা বানিয়ে টাকা রোজগার করত। চামনানের সঙ্গে ছোটোবেলা থেকে তার বন্ধুত্ব। বড়ো হবার পরও মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ হত।

একদিন ক্রুয়াডি একটি কাচের ছিপি দেখতে পেল। সে খুব যত্ন করে সেই কাচের ছিপিটিকে হিরের মতো করে কেটে পালিশ করল। সূর্যের আলোর সামনে ধরলে সেটা খুব জ্বলতে লাগল। এবার ক্রুয়াডি সেটি নিয়ে চামনানের কাছে গেল।

সে নাই চামনানকে বলল, আমার মা আমাকে একটা দামি পাথর দিয়েছে, আমি সেটা বিক্রি করতে চাই। দাম এক হাজার টাকা।

নাই চামনান একবার সেটির দিকে দেখেই বলল, তুমি ভীষণ বোকা, এটা রত্নই নয়, পুরানো পেতলের ছিপি। কেউ এটা কিনবে না। আমি তোমাকে এর জন্য এক পয়সাও দেব না। এই কথা শুনে ক্রুয়াডির মুখটি এমন করুণ হয়ে উঠল যে চামনানের দুঃখ হল এবং

বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল,তোমার ওই জিনিসটি আমার দোকানে রেখে যেতে পার। যদি কারোর পছন্দ হয় সে কিনতে পারবে।

এরপর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে; দুজনের আর দেখা হয়নি। চামনান একেবারে ভুলেই গেছে তার দোকানে রাখা কাচের ছিপিটির কথা।

একদিন এক ধনী ব্যক্তি তার দোকানে এল। সে বলল, লাওসের রাজপথে একটি মূল্যবান



রত্ন খুঁজছে। নাই চামনান এই ধরনের একজন বড়ো ক্রেতা পেয়ে ভীষণ খুশি হল। সে তার দোকানের সব থেকে দামি চুনি, পান্না, নীলা, হিরা এক এক করে দেখাল। কিন্তু তার কোনোটাই পছন্দ হল না, প্রত্যেকটাতেই কিছু না কিছু খুঁত খুঁজে পেল।

শেষে ক্লান্ত হয়ে চামনান সেই কাচের ছিপিটা বার করে দেখাল। আশ্চর্য, লোকটি তা দেখেই বলল, এই তো আসল রত্ন, আমি তো এরই খোঁজ করছিলাম। এর দাম কত?

নাই চামনান বুঝল যে লোকটি একেবারেই বোকা। সেজন্য সে মনে মনে স্থির করল যে

দাম খুব বেশি বলবে। তাই সে বলল, এত সুন্দর রত্নের জন্য তোমাকে দুহাজার টাকা দিতে হবে।

লোকটি বলল, দাম খুবই সস্তা। আমি রাজকুমারের কাছ থেকে টাকা এনে আগামী সপ্তাহে নিয়ে যাব। তুমি অনুগ্রহ করে এটি কারুর কাছে বিক্রি কোরো না।

দুদিন পরে ক্রুয়াডি এসে বলল, আমার রত্নটা দাও, লাওস থেকে একজন রাজকুমার এই শহরে এসেছে, আমি তার কাছে ওটা বিক্রি করব।

নাই চামনান তাড়াতাড়ি বলল, বন্ধু, তুমি এসেছ ভালো হয়েছে, আমি ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করব, কারণ তোমার ওই রত্নটি আমি কিনতে চাই। প্রথমে বুঝিনি, পরে জিনিসটি ভালো করে দেখে বুঝেছিলাম যে এটি খুবই মূল্যবান হিরা। ক্রুয়াডি বলল, আমি এটা তোমাকে কেন বিক্রি করব? রাজপুত্রকে বিক্রি করলে অনেক বেশি দাম পাব।

চামনান বললে, বন্ধু, কেন তুমি এটা লাওসের রাজকুমারকে দেবে, আমি তোমাকে বেশি দামই দেব। এটা আমি আমার নিজের জন্য চাইছি। আমি তোমাকে দেড় হাজার টাকা দেব।

ক্রুয়াডি কিছু সময় ভাবল তারপর রাজি হল। বোতলের ছিপিটি নাই চামনানকে বিক্রি করে চলে গেল। রত্নব্যবসায়ী ভাবল, আমি লাওসের রাজকুমারের কাছে পাব দু হাজার টাকা, তাহলে থাকছে পাঁচশো টাকা। একটা কাচের টুকরোর দাম তো বেশ ভালোই পাচ্ছি। সে মনে মনে খুশি হল।

নাই চামনান ক্রুয়াডিকে দেড় হাজার টাকা গুনে দিল। সে চলে গেল। চামনান লাওসের সেই লোকটির প্রতীক্ষা করতে লাগল। দেখতে দেখতে এক, দুই, তিন সপ্তাহ চলে গেল, কেউ এল না। এরপর বহুদিন চলে গেছে, লাওসের লোকটি আর আসেনি এবং অন্য কেউই সেই কাচটি কেনেনি।

ছবি। শঙ্কর বসাক



মহাবীর তিনমার

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চাষিবাসি লোক, বনের ধার দিয়ে বিনি মাগনায় জুটিয়ে নিয়েছে অনেকখানি ডবকা পতিত জমি, হাতে হাতে ওকড়া-জংলা সাফা করে নেবার জন্যে চালা বেঁধে এল বনের ধারে। কুড়ুল কুপিয়ে বেড়াচ্ছে গাছগাছালির মধ্যে চার হাতে—চাষা আর চাষানি--ঘোরে ঘোরে চাষা ঢুকে গেছে খানিকটা জঙ্গলে, এমন সময়—

ও মা গো—

দুলতে দুলতে চলছে কষ্টিবর্ণ এক ভাল্লুক

ও মা—

চিল্লাস শুনে ভাল্লুকের চোখ পড়ল এদিকমুখো, আর সঙ্গে সঙ্গে ঠকঠক ঠকঠক—ভয়ংকর কাঁপুনি এসে গেল চাষার সর্বশরীরে...সম্বিতটুকুনি সামলে, কোনোমতে পিছ ফিরে—ছুট ছুট ছুট...ঘরে ঢুকে আগল আটকে দোর ঠেসে দাঁড়িয়ে তারপর কাঁপতে লাগল।

চাষা তো ঢুকল ঘরে, কিন্তু চাষানি? তারও আঁধার দিচ্ছে চোখে-কানে—কিন্তু আর কোনো উপায় না পেয়ে রুখে দাঁড়াল সে কুড়ুলখানা চেপে—তারপর কিছু আর না ভেবে

না চেয়ে দম আটকে প্রাণপণ বসিয়ে দিল কুড়ুলখানা ভাল্লুকের গায়। যা হয় হোক! চাইবার শক্তিও আর নেই—দরদর ঘামতে ঘামতে বসে পড়ল চাষানি।

এক দণ্ড পর একটু চেয়েছে, দেখে এককাতে পড়ে আছে ভাল্লুক, নড়ছে না। আধাদ্বিধায় উঠে, আরেকটুক্ষণ চেয়ে—শেষে বল এল তার বুকে! না, মরেই গেছে বোধ হয়। একটু স্বস্তি হল। ঘরমুখো হল চাষানি।

ফিরে দেখে ভেতর দিয়ে আগড় আটকানো। দোর খোলো—

ও মা গো—ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে চাষার কাঁপুনি দুগুণ হয়ে উঠল। আর সন্দেহ নেই—ভাল্লুকে খাওয়া বউ তার ভূত হয়ে ফিরে এসেছে।

দোরের বেড়ায় ঝাঁকি দিল চাষানি—

আঁ আঁ—

দোর খোলো—

সাহস এনে চাষা বলল—যা যা, চলে যা এখান থেকে—

দোর খোলো গো—

আর তো রক্ষে নেই! ভাল্লুকের পেট থেকে ভূত হয়ে বেরিয়ে এসেছে সাক্ষাৎ—দোহাই দোহাই ভূত!—কাকুতি করতে লাগল চাষা—দোহাই ভূত, লক্ষ্মী ভূত—চলে যাও—চলে যাও—ভুজ্যি দিয়ে আসব তোমায়—

আঃ মুশকিল! দোর খোলো না! ভূত নই গো, আমি চাষানি।

কেন আমায় ভয় দেখাচ্ছ মিছিমিছি, দোহাই তোমার—যাও, যাও—চাষানির যে কত সময় লাগল চাষাকে বুঝ করাতে, বুঝতেই পার।

যাই হোক, শেষ অবধি চাষা যখন বেরিয়ে এসে দেখে জলজিয়ন্ত তার বউ, আর প্রলয় ভাল্লুকটা পড়ে আছে এককাতে, একটু লজ্জা হল তার। মারলে কে ওটাকে?

কে মারবে?

একা মারলে তুমি?

না গো না, বন থেকে দশটা লোক বেরিয়ে মেরে রেখে গেল।

একটু লজ্জা লাগল চাষার। এখন তা হলে চারধারে চাউর করতে ছোটো কীর্তিকাহিনি—

কোথাও যাব না গো আমি। যাব একবার শুধু রাজার কাছে—

রাজার কাছে?

গিয়ে বলব, এই দেখুন মহারাজ কুড়ুল—এর এক ঘায় আমি ভাল্লুক মেরেছি।

চাষার চিন্তা হল। দেশে ভাল্লুকের বড়ো উপদ্রব—রাজা ভারী ইনাম দেন যদি শোনেন কেউ ভাল্লুক মেরেছে। বলল চাষানিকে—গিয়ে বলবে, কুড়ুল দিয়ে ভাল্লুক মেরেছি?

মেরেছি, তা বলব না?

আরো চিন্তা হল চাষার। সভাসুদ্ধ লোক, তার মধ্যে বলবি গিয়ে কি না কুড়ুল দিয়ে মেরে ফেলেছিস? আর, কী ভাববে সব!

কী ভাববে? ভাববে খুব বীরের কাজ করেছি, মেয়েমানুষ হয়েও অনেক টিকল পাব ইনাম।

ইশ, ইশ। চাষার মাথাটা যেন চিড়বিড়িয়ে উঠল। শোন চাষানি। বড়ো বড়ো সব মানুষ—তার মধ্যে বলবি গিয়ে কি, না—কুড়ুল মেরে মেরে ফেলেছি! সবাই ছি ছি করবে বউ। মেয়েমানুষে করেছে খুন? প্রাণীহত্যে মেয়েমানুষের হাতে? সভার লোকজন উঠে যাবে সভা থেকে, রাজা মুখ ফিরিয়ে সিংহাসন ছেড়ে ঘরে ঢুকে যাবেন। কেউ চাইবে না তোর দিকে, মুখ নামিয়ে নেবে, ঘেন্নায়।

কেন?

—কেন? মেয়েমানুষ কুড়ুল মেরে জীবঘাতী হয়, শুনেছিস কখনো?

তা হলে?

তাহলে আর কী? আমিই যাই রাজবাড়ি—গিয়ে বলি, মহারাজ, ভাল্লুক মেরেছি কুড়ুলের এক ঘায়ে। রাজার মন পড়লে, চাই কি সেনাপতিই করে দেবেন হয়তো। তোকে আর জঙ্গলে কুড়ুল কুপিয়ে, কাদাজলে ধান বুনে, পা ফুলিয়ে ঢেঁকি কুটে মরতে হবে না। আমাদের সব দুঃখু ঘুচে যাবে রে চাষানি।

সেই ভালো, দুজনেই একসঙ্গে হাঁটা দিল রাজবাড়ির মুখে। হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে রাজার পুরী—দুয়োরির দয়াতে শেষ অবধি রাজার সভায়....

এখন, রাজার মনটা ছিল এমনি, প্রতিটি জিনিস যাচিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তাঁর মুখ খুলত না। কাজেই, যতক্ষণে চাষা তার ঘটনার ব্যাখা দিয়েছে রাজার লোক ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে অকুস্থানে। চাষা-চাষানি মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে—এ কী, মহারাজ যে কথাই কন না! তবে যে লোকে বলে, অনেক পায়-থোয় ভাল্লুক মারলে?

ভেতর ভেতর লোক ফিরে এল। সিংহাসনের পাশে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে এল, হ্যাঁ মহারাজ। মস্ত ভাল্লুক, এখনো পাজরায় গিঁথে রয়েছে কুড়ুলখানা।

রাজা বসলেন নড়েচড়ে। অন্দর থেকে লোকে বয়ে নিয়েলো ডালা ভরতি চুড়ো করা ছাঙ-টিকল। নতুন ঝকমকে ফানুম-ফাহুম এল চাষা-চাষানির। তাই শুধু নয়। থাকবার ঠাঁই ঠিক হল তাদের রাজধানি-শহরে। দুসিৎ-দরবারে দাঁড়িয়ে রাজা পড়লেন জয়পত্র : আজ থেকে উপাধি হল তোমার হন মী, মহাবীর ভাল্লুকমার। ফ্রা হন মী, আজ থেকে রাজসভার মহাবীরদের তুমি একজন।

জয় বাবা ফ্রা ফুম! জয় বাবা ফ্রা ইন। ভাগ্য খুলে গেল চাষার।

কিন্তু সুখের দিন ছটফটিয়ে কাটে।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই খবর এল রাজবাড়ির পাতাল ইঁদারাতে বাসা পেতেছে কালখরিষ সাপ। লোকজন দাসীমালি কারোর পা ওঠে না আর ওদিকে যেতে। রাজপুরীতে বিভীষিকা। উঠতে বসতে সর্বক্ষণ এক আলোচনা।

আর কার কী জানি না, কিন্তু শুনে অবধি হন মী-র আমাদের মাথা ভার, গাঁটে গাঁটে

হাড়মড়মড়ি শীত। গা কাঁপে চলতে ফিরতে।

হল কী?

আর হল। কিছু হবার আগেই রাজবাড়ি থেকে তলব এসে হাজির—মহাবীর ভালুকমার! কি না তুমি থাকতে রাজপুরীর পাতালইঁদারায় বাসা করেছে কালখরিষ ছঙ রা-আঙ?

না না তা কী করে হয়! কিন্তু নিজেকে সামলাবে কি, তার আগেই তাকে সব টানতে টানতে এনে ফেলেছে সোজা সেই পাতালইঁদারার পাশে।

কী ভাবে কী হবে কিচ্ছু মাথায় নেই। কিন্তু চালাৎ মানুষ—যা দেখাবার তা তো দেখাতেই হয়। এ দিক গিয়ে ও দিক গিয়ে ইঁদারার পাড়ে উঠে উবু হয়ে—উলটিপালটি উদ্‌ব্যস্ততা শুরু করে দিল হন মী। আর তারই ফাঁকে হঠাৎ ঝলক দিয়ে উঠল কালখরিষের চ্যাটা ছাতার পারা ফণাটা, জ্বলছে! কে জানে পেছল ছিল কিনা পাড়ের পাষাণ, বলা নেই কওয়া নেই হিঁ-ই-ইঁ-ইঁ-ইঁ।

টাল সামলাতে না পেরে উপুড় হয়ে পড়ল হন মী ইঁদারার মধ্যে...হিঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ—প্রাণের ভয়ে হাতে যা পায় বজ্রমুঠোয় আঁকড়ে ধরতে চায়—আর ধরবি তো ধর—

সেই আচমকা বজ্রমুঠির মধ্যে কালখরিষের গলা পিষে গেল....একটু সম্বিত ফিরলে হন মী দেখে ঘটে গিয়েছে কী। জয় বাবা ফ্রা ফুম! আর তো দ্বিধা নেই! উঁচুতে চেয়ে চিল্লিয়ে উঠল হন মী—দেখছ কী সব হাঁ করে! দড়িটা নাবাও এই বার, উঠি?

দড়ি বেয়ে মহানাগকে মুঠোপাকে চেপে ধরে উঠে এলেন মহাবীর হন মী। প্রবল শোরগোল। চারপাশের ভিড় থেকে জয়ধ্বনি উঠল—ছাই-য়োঃ! ছুটে এলেন রাজা। ভেতর থেকে লোক বয়ে নিয়েলো ডালা ভর্তি চুড়ো করা মণিমুক্তো। অবেলায় দুসিৎ-দরবার ডেকে রাজা পড়লেন হন মী-র নতুন উপাধি। ফ্রা হন মী, আজ থেকে উপাধি তোমার হন মী ছঙ রা-আঙ—মহাবীর ভালুকমার খরিষমার—

সুখের দিন ছটফটিয়ে কাটে। একটু হাঁপ যায়নি ভালো করে, পাশের গাঁ থেকে এক দঙ্গল লোক এসে হাজির—ভাসা-হাট লণ্ডভণ্ড, আমাদের নৌকোবাড়ি ছত্রখান—মহারাজ, অজগর কুমির এসেছে গাঁয়ের নদীতে। দিনদুপুরে ছেলে বুড়ো যাকে পাচ্ছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মহারাজ, বাঁচান আমাদের।

তার আর কী। এই তো আছেন মহাবীর হন মী ছঙ রা-আঙ!

হন মী-র সঙ্গে চলল এবারে আরো দশ দশ বীর—ধনুকতির বাজবন্দুকধারী। রাজা বললেন গাঁয়ের মোড়লকে—জবরসবর ডিঙি-নাও সাজিয়ে রেখো বাপু! কুমির যদি মাঝনদীতে পালায়, টেনে নিয়াসতে হবে তো! কুমিরমারীর দল রওনা হয়ে গেল।

শহর রইল পিছে—ক্রমে এসে পড়ল নদী, কথায় কথায়—নদী বলতে না বলতে—ওটা কী? সেগুন-গুঁড়ি?—গুঁড়ি তো নয়, ডুমো ডুমো ছোরা গাঁথা দু পাটি দাঁত ছরকুটে আরো খানিকটা জেগে উঠল অজগর কুমিরের খাঁজকাটা বিভীষণ মাথা—বিশ গজ দূর হবে কি সন্দেহ। হন মী ততক্ষণে দলের মোটামুটি মাঝখানটায় জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু হলে কী

হয়, পা থেকে মাথা অবধি তার সেই হাড়মড়মড়ি শীত—ঠকঠক ঠকঠক—কিছুতে নিবারণ হয় না.....

ভাগ্যে সবার চোখ তখন একদৃষ্টি কুমিরটার ওপর! ধনুকে তির জুতে, তবকে বারুদ ঠেসে, চোখ-হাত সমান করে সব তৈরি। নির্ভুল তাগ। দশ দশটা মৃত্যুবাণ এক সাথে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে গেল অজগর জানোয়ারটাকে। নদীর জল লাল হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে জলের ওপর ভেসে উঠল বিশাল-দেহ কুমির....

হন মী ততক্ষণে ফিরে এসেছে নিজের মধ্যে নিজে। মারল কে?

কার এত বড়ো সাহস? গর্জন করে উঠল হন মী। কার ওপরে রাজার আদেশ কুমির মারবার—তোমাদের? না আমার?

স্বীকার করতে হল সবাইকে, রাজার আদেশ হন মী-রই ওপর।

তা হলে তৈরি হও। জানো তো রাজার আদেশ অমান্য করবার শাস্তি? একটাই শাস্তি....

অতএব সেই দণ্ডেই সবাইকে একমত হতে হল। কুমির মারার ব্যাপারে পেছনেই ছিল তারা বরাবর, যা করার করেছে হন মী।

শুধু একমত নয়, রাজাকে তারাই গিয়ে জানান দিয়ে এল। অত ঝুঁকি নেয় লোকে? কেবল রাজার হুকুম ছিল না বলেই না আগ বাড়িয়ে যেতে তারা ভরসা পায়নি! ক্রমে ক্রমে নিজেদেরও তাদের মনে হতে লাগল, তাই তো, এই রকমই যেন ঘটেছিল!

ভালুকমার খরিষমার বীরের উপাধি এবারে আরেকটুখানি লম্বা হল : হন মী ছঙ রা-আঙ ওয়াঙ ছোরাকে। ফ্রা ভালুকমার খরিষমার কুমিরমার বীর।

হন মী-র যশ ছড়াতে লাগল হু হু করে—রাজ্য থেকে রাজ্যে—হন-মীর নামে ভক্তিতে ভয়ে লোক তটস্থ, ছেলেপুলেরা হন মী-র গল্প না বললে খেতে চায় না, হন মী-র নাম বললে ঘুমিয়ে পড়ে। সব বলতে লাগল, শুধু কি গায়ের জোর শাকুনবিদ্যে জানা আছে হন মী-র। তা না হলে হয়? ও হল আসলে যাকে বলে ধুরন্ধর মও দূ—অর্থাৎ শাকুনবিদ্যের গণৎকার।

তাই না কী?

তা না তো কী! এ তো সবাই জানে—ও অদেখা দেখতে পায়, অজানা জানতে পায়। এ কী আর যাই তাই—শুধু তরোয়াল ঘুরিয়ে বীরত্ব?

দূরদেশি এক রাজপুত্র অভীপ্সে পাঠালেন রাজার কাছে—আপনার রাজ্যে আছেন শুনেছি মহাগুণী গণৎকার, ইচ্ছে হয় একবার দেখতে পাই তাঁর শক্তি।

তলব গেল হন মী-র কাছে।

মহারাজ?

রাজা বললেন বিনতি করে, তোমায় আর কী বলব হন মী, দেখো যেন রাজার মুখ থাকে, রাজ্যের মান বাড়ে।

কোনোমতে অন্তরকাঁপুনি সামলে ঢোক গিলে হন মী বলল, নির্ভয়ে থাকুন মহারাজ।

বলে তো এল, কিন্তু নাওয়া-খাওয়া-নিদ্রা—সব উঠে গেল হন মী-র : বাঁচাও বাবা

ইষ্টদেব কোয়ান, বাঁচাও বাবা পাঁচ রক্ষেদেব, এ যাত্রা বাঁচিয়ে দাও বাবা—দিনরাত ঘুরপাক খাচ্ছে রাস্তায়, অশান্তিতে। শেষে একদিন খবর এল, রাজপুত্রের মকরমুখো বজরা দেখা দিয়েছে নদীর বাঁকে। ঘোরে ঘোরে সে দিকেই হাঁটতে লাগল হন মী।

এখন, আগেই জানো, চাষিবাসি হলেও হন মী আসলে—যাকে বলে চালাৎ মানুষ—রাজপুত্রের সাজানোগোজানো বজরাটা চোখে পড়া অবধি ভাবছে কী করা। সাতপাঁচ ভেবে ভাবল যাক গে, দেখাই যাক। বজরা কাছাকাছি আসতে টুপ করে জলে নেমে পড়ল হন মী। একটু ডুবে আড়াল আড়াল সাঁতরে চলছে নৌকোর পাশ পাশ, হঠাৎ শোনে রাজপুত্রের গলা। বজরার ছ্যাদরালো কাঁদার নীচে নিরাপদ হয়ে কান খাড়া করল হন মী। শুনল রাজপুত্র বলছেন একজনকে, দেখে রাখো, তোমার জিম্মায় রইল ঝাঁপিগুনো। এক নম্বর ঝাঁপি—এটার মধ্যে আছে খালি রুপো। এই দু নম্বর—এটায় খালি সোনা। আর এই তিন—এটায় রেখেছি—কী রেখেছি বলো তো?—হা হা হা হা—এটায় ভর্তি করে রেখেছি জোনাকবাতি পোকা। কী, বলতে পারবে মনে হচ্ছে? হা হা হা হা—রাখো, তোমার কাছে সাবধানে—

হন মী ডুব-সাঁতারে ততক্ষণে পাড়ে ফিরে এসেছে।

পরদিন সকাল না হতে রাজসভা গমগম, ভেঙে পড়েছে রাজ্যের লোক। উঁচু সিংহাসনে রাজা, তাঁর পাশে মন্ত্রী-যন্ত্রী-সেনাপতিরা। সামনে দুটো আঁকাচোঁকা বেদি—একটিতে বসে আছেন ফারাড রাজপুত্র—সভাসুদ্ধু সবাইকে মাথা নুয়ে নমস্কার করে তাঁর সামনের বেদিতে এসে বসলেন মহাবীর তিনমার হন মী।

রাজপুত্র বললেন, ফ্রা হন মী, শুনতে পেয়েছিলুম মহাগুণী গণৎকার আপনি, দেখা পেয়ে একটি ইচ্ছে আজ আমার পূরণ হল।

হন মী একটু হাসলেন।

এখন একটু যদি দেখতে পাই আপনার বিদ্যে, সারা রাজ্যসুদ্ধু আমরা গুরু বলে নজর দিয়ে যাই। বলে, রাজপুত্র তিনটে ঝাঁপি বের করে রাখলেন সামনে। এই এক নম্বর, এই দুই, এই তিন নম্বর। ফ্রা হন মী, বলতে পারেন কোনটেতে এর কী?

রাজপুত্র কি হাসছেন না কি ভেতর ভেতর? হন মী বললেন, কই রাখুন দেখি আপনার এক নম্বর ঝাঁপি।

সামনে এগিয়ে দিলেন রাজপুত্র আলাদা করে। আর হন মী, নিরীক্ষণ করে দেখেন ঝকমক ঝাঁপি, ছিদ্রটুকু দেখা যায় না বাইরে থেকে। একটু চেয়ে, বলে উঠলেন গুরুগম্ভীর গলায়—রাজপুত্র, আপনার এই ঝাঁপিতে দেখছি রুপো।

সভা নির্বাক। রাজপুত্র মাথা নিচু করলেন।

এই বার দু নম্বর।

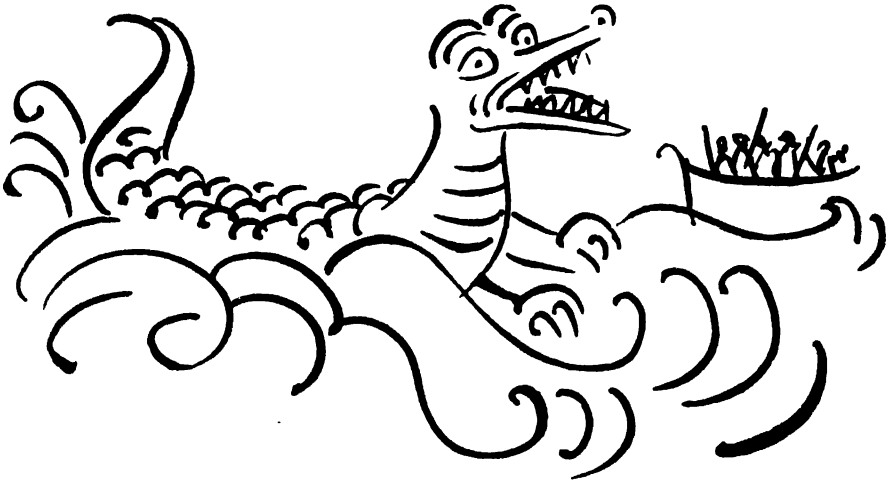
হন মী দেখতে লাগলেন নিরীক্ষণ করে। তারপর বলে উঠলেন গুরুগম্ভীর গলায় রাজপুত্র, সোনা আপনার এই ঝাঁপিতে।

রাজপুত্র মাথা নিচু করলেন।

এই বার শেষ ঝাঁপি। রাজপুত্র রাখলেন সামনে। হন মী দেখতে লাগলেন—চারিদিক ঝাঁপির, ওপর-নীচ; রাজপুত্রের মুখের দিকে, রাজসিংহাসনের দু ধারের ব্যজনীয়াদের—কী যেন, কী যেন, কিছুতেই মনে আসে না—মাথা ঝাঁ ঝাঁ।

সভায় একটা কুটো পড়লে আওয়াজ শোনা যায়। হাজার জোড়া চোখে অধীর হয়ে অধীর হয়ে চেচিয়ে, শেষ অবধি কি...

এ-দিক ও-দিক এ-পাশ ও-পাশ ঘন ঘন চোখদুটো ঘোরাচ্ছেন হন মী, উঃ! কী যেন হল! ঝাঁকালেন মাথা একবার দু বার—আর এমনি সময় হঠাৎ চোখে পড়ল বেদিআসনের নীচে হিরের দীপের সলতে সবটুকু ঘি শুষে ফেলে দপদপ দপদপ করে খুলছে আর বুজছে।



নিমিষে মনে পড়ে গেল। বজ্রগম্ভীর গলায় সভার শেষ অবধি শুনিয়ে হন মী বলে উঠলেন, রাজপুত্র, আপনার এই তিন নম্বর ঝাঁপি ভর্তি করে রেখেছেন একগাদা জোনাকবাতি পোকা।

সারা সভার চেপে রাখা দম বেরিয়ে এল এক নিশ্বাসে। রাজপুত্র নিজের গলার রতনমালা খুলে রাখলেন হন মী-র পায়ের গোড়ায়। সারা সভার গগনছোঁয়া জয় উঠল—ছাই-য়োঃ—জয় তিনমার বীর হন মী ছুঙ রা-আঙ ওয়াঙ ছোরাকে কি জয়! রাজা নেমে এসে হন মীকে বুকে জড়িয়ে নিলেন তাড়াতাড়ি।

মাসভর মহোচ্ছব রাজ্য জুড়ে। হন মী এখন রাজার সবচেয়ে আপনার জন—মন্ত্রী বললে মন্ত্রী, গুরু বললে গুরু। হন মী-র ওপর কারো কথা নেই—দিগ্বিজয়ী অদুলদেৎ হন মী—তাকে নিয়ে গান বাঁধা হল পালা বাঁধা হল দেশে। ছেলেপুলেরা স্বপ্ন দেখে হঠাৎ তারা হন মী-র মতন বীর হয়ে উঠেছে, দেবরাজা ফ্রা ইনের বরে...

কিন্তু ওই যে বলে না, সুখের দিন ছটফটিয়ে যায়...

হঠাৎ খবর এল, দেশ মাতোয়ারা উৎসবে, এই ফাঁকে রাজধানী শহর ঘিরে লাখো সৈন্য নিয়ে যে থানা পেতেছে শত্রুরাজ্যের রাজা।

এখন উপায়?

কী উপায়? ফটক ভেঙে ঢুকল সকল শত্রু! আর এদিককার সৈন্যসাবুদ—বাবুরা ছুটি পেয়ে দেশে গেছেন, ...সব গা-ছ্যাঁকছ্যাঁকে জ্বর—কাতরাতে কাতরাতে মুখ বাড়াচ্ছে জানলা দিয়ে। কে বাঁচায় এখন? মহাবীর হন মী ছঙ রা-আঙ ওয়াঙ ছোরাকে?

মহারাজ?

না বাবা আর সুখে দরকার নেই। চাষিবাসি লোক— সেই খুব! না বাবা আর এখানে না। রাত্রিবেলার অন্ধকারে কাকপক্ষীকে জানতে না দিয়ে নিঃসাড়ায় হন মী চলল রাজ্য ছেড়ে। যদ্দুর পারে পেরিয়ে যেতে হবে আঁধার থাকতে থাকতে, নইলে আর রক্ষে নেই। রাস্তা ফুরিয়ে জলা, জলাঘাসের বন--হুড়পাড়িয়ে তার ওপরেই হাঁটছে—উপায় নেই। দূরে দূরে ছনমন করে জ্বলছে জোনাক পোকা। জোনাকবাতি পোকা! অতি দুঃখেও হাসি পেল হন মী-র। যত কাছে আসে, দেখে পোকা তো নয়। এ যে লণ্ঠন! এতগুনো লণ্ঠন আবার জ্বালল কারা মাঠের মধ্যে? আড়ে আড়ে যায়—পেরিয়ে যেতে হবে পা চালিয়ে। ও মা লণ্ঠনের পাশে পাশে দেখি ছাউনি—একগাদা লোক বসে আবার আলোআঁধারিতে...দেখতে পায়নি তো? মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল হন মী-র কাছে।

এ তো তবে শত্রুর ছাউনি! ধরা পড়ে যাবে এখ্‌খুনি—এতগুনো লোকের চোখ এড়ানো যায়? প্রাণের দায়ে পেছনের ডালপালা ভর্তি গাছটাতেই উঠে পড়ল হন মী—নিঃশব্দে। বেশি উঠতে বুক কাঁপে, কাছাকাছিই একটা ডালের ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঘাপটি দিয়ে বসল গিয়ে টিপে টিপে।

নীচের কথাবার্তা কানে আসছে একটু একটু— পরিষ্কার কথা—আরে ভাই, রাজ্য তো লুটেপুটে নেবো, কিন্তু বিপদ হয়েছে ওই যে একটা।

কী আবার বিপদ?

আরে ভাই, একটা দানো পুষেছে রাজা। সে নাকি শূন্যে ঘুরে বেড়ায়, যখন তখন অদৃশ্য হয়ে যায়, যুদ্ধ করে গাছপালা ভেঙে—আবার গাছের ডালটাল ভেঙে নিলে সেগুনোই নাকি তার হাতে সব পটাপট বর্শা-বল্লম হয়ে যায়—

হন মী শুনতে লাগল।

আরে ভাই, রাজার হুকুম হল যুদ্ধটুদ্ধ সব পরে, আগে যে করে পার পাকড়াও ওই ব্যাটাকে— বেঁধে এনে খাঁচায় পুরে—দেখেছিস তো কী জবর খাঁচাখানা বানিয়েছে?—খাঁচায় পুরে আটকে, তারপর যা করবার। রাজা বলেছে ঝাঁকে ঝাঁকে মশার মতন গিয়ে ছেঁকে ধরবি ব্যাটাকে, যেন গলতে না পারে।

একজন দাঁড়াল উঠে—ব্যাটাকে একবার হাতে পাই তো আর কিছু নয় ভাই, গুনে গুনে

নারকোল ভাঙি মাথায়।

তার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, ডালে ছিল কী একটা রাক্ষুসে পাখি—হঠাৎ পা পড়াতে খ্যাঁক করে বসিয়ে দিয়েছে ঠোঁটের ঠোক্কর—হন মী-র পিঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে আঁ আঁ আঁ আঁ—বিশাল চিৎকার দিয়ে মোটা মোটা ডালপাল ভেঙে ঝটপট ঝটপট করে সবসুদ্ধ হন মী—পড়বি তো পড় এক্কেবারে সেই দলের মধ্যিখানে।

আরে চোখের নিমিষে কোত্থেকে কী—তুমুল হট্টগোল—শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে—মেরে ফেললে রে, মেরে ফেললে রে—হন মী—হন মী—উড়ে আসছে হন মী—আর সেই শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে লোক জিনিসপত্র অস্ত্রশস্ত্র তাঁবু-কানাত ছিঁড়ে ছড়িয়ে পাকিয়ে লণ্ডভণ্ড করে ঊর্ধ্বশ্বাসে—পালা পালা পালা—ছুটতে লাগল যে যে দিক পারে—

সোনার ছাউনিতে রাজা—হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে উঠে চোখ রগড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা লম্বা ছায়া পড়ল যেন—ওরে বাবা রে—আর কথা নেই, সৈন্যদের চাইতেও আপ্রাণ—ছুট ছুট ছুট—

ভোর হবার আগঅবধি কেউ দম নিতে দাঁড়াল না একবার।

আর হন মী? তার জ্ঞান ফিরল যখন, ভোর হয়ে এসেছে। চোখ খুলে চারদিক তাকিয়ে দেখে লণ্ডভণ্ড বিরাট একটা ধ্বংসস্তূপ। তার নিজেরও সারা গা জুড়ে ডালপালার জঙ্গল। কী যেন হয়েছিল? একটুক্ষণের মধ্যেই খেয়াল হল সব। আর তখন স্বস্তি করে উঠে যতগুনো পারল ভালো ভালো অস্ত্রটস্ত্র পাঁজা করে মোট বেঁধে বগলদাবায় চেপে ঠান্ডা ঠান্ডা পায়ে ফিরে চলল রাজধানীতে।

অত ভোরে বাইরে থেকে তাকে আসতে দেখে ফটকের পাহারাদার তো থ। এত ভোরে বাইরে থেকে! খুলল ফটক। ভেতরে সারবন্দি সৈন্যসামন্ত সাজিয়ে সেনাপতি, মন্ত্রীরা, এমন কি রাজা—

মহারাজ, আপনি কেন সাত সকালে? রাজ্যে আর কি লোক নেই? সবাইকে পেরিয়ে রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল হন মী।

এ কী ব্যাপার হন মী, তুমি বাইরের থেকে—রাজার আর সঙ্গে সঙ্গে সবার উৎকণ্ঠা।

এত শঙ্কা কীসের মহারাজ! আমায়ই তো বলেছিলেন কাল।

তবে কী।

এই যে—অস্ত্রটস্ত্রের মোটটা রাজার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল হন মী। হ্যাঁ মহারাজ, রাত থাকতেই গিয়ে সব ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দিয়েলাম। ওই যে বলে না, শত্রুকে বেশি বাড় বাড়তে দেয়া ভালো নয়। এই কটা তরোয়াল-টরোয়াল ওদের নিয়েলাম সঙ্গে করে। জিনিসপত্তর—লোক পাঠান, গিয়ে বেঁধেছেঁদে নিয়ে আসুক সব।

আমি যাই মহারাজ। রাতে ঘুমটা ভালো হয়নি...

হন মী চলে গেল। রাজা আশ্চর্য অবাক চেয়ে তার পেছনে।

দরবারে ডাক পড়ল তার পরদিনই।

বলুন মহারাজ, আবার এল কেউ?

না না, আর কে আসবে!

তা হলে?

আসল কথা কী জানো, বড্ড বড়ো আমার এই রাজ্যটা—বলি বলি করে রাজা বলেই ফেললেন কথাটা সঙ্কোচ ভেঙে—এর আধ্যেকটা যদি তুমি নাও তো বড্ড নিশ্চিন্ত হই...

কী আর করা! হন মী আর তার বউ গিয়ে উঠল নতুন রাজপুরীতে। আর তার গল্পগাথা গেল এ দেশে সে দেশে, যতদূর চোখ যায়—সর্বত্র।

ছবি। কৃষ্ণেন্দু চাকী



ছোট্ট সাদা বেড়াল

সুব্রত নিয়োগী

শ্যামদেশের উত্তর দিকে মুয়াং নামে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে। শ্যামদেশ জান তো? যার নাম এখন হয়েছে থাইল্যান্ড। মুয়াং গ্রামে একটা ছোট্ট ছেলে ছিল। লেখাপড়ায় সে বেশ ভালো। তার একটা ছোট্ট সাদা বেড়াল ছিল। ফুটফুটে নীল চোখ। লেজটা ছিল বেশ রোমশ। গলায় হাত বোলালে বেড়ালটা গর্ গর্ আওয়াজ করত। এত সুন্দর দেখতে ছিল বেড়ালটা যে, সবাই ওকে রাজকুমারী বলত। সে এমন ধীর পায়ে অহংকারী ভঙ্গিতে হাঁটত, যেন সে সত্যি সত্যিই একটা রাজকুমারী। মুয়াং গ্রামের প্রতিটি লোক ওকে চিনত রাজকুমারী বলেই। ধূসর রঙের গায়ের লোমগুলি সে সব সময় নিজের জিভ দিয়ে চাটত। এত পরিষ্কার বেড়াল সচরাচর দেখা যায় না। রাজকুমারীর মতোই সে কেতাদুরস্ত থাকত। সেই ছোট্ট ছেলের বাড়ির সবাই ওকে দারুণ ভালোবাসত। নাম দিয়েছিল সি সোয়ার্দ।

একবার সে-দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। খরায় চারিদিকের শস্য একেবারে সাফ। গ্রামের সব লোক মিলে ঠিক করল, বৃষ্টি না হলে এবার সি সোয়ার্দ নামের ছোট্ট বেড়ালটাকে বৃষ্টির রানি করবে। না হলে শস্যের অভাবে সব মানুষ মারা যাবে। নদীর জল শুকিয়ে যাবে।

অনেক দিন ওখানে এমন খরা হয়নি।

সেই গ্রীষ্মে প্রায় তিন মাস বৃষ্টি ছিল না। শুকনো খটখটে দিন। নদীর জল শুকিয়ে গেছে একেবারে। মাঠের ঘাস শুকিয়ে হলুদ। গোরু-ছাগল গরমে প্রায় মারা যেতে লাগল। লোকজন তাদের অবশিষ্ট গোরু-ছাগল অনেক দূরে উত্তর দিকের মুন নদীর ধারে নিয়ে যায়। যাতে মারা না যায়। সেই বর্ষায় চাষ না হলে প্রাণে মারা যাবে সবাই। অনেক পরিবার তো চাষের আশায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে যায় নতুন জায়গার খোঁজে।

প্রতিদিন হাজার হাজার গ্রামবাসী বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধদেবের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে লাগল। গ্রামের কৃষকদের কাছে তখন একটাই মন্ত্র—বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি।

গ্রামের পুরোনো লোকেরা বলতে লাগল, বৃষ্টি-উৎসব করা দরকার। প্রাচীনকাল থেকে শ্যামদেশে বৃষ্টি-উৎসব চালু আছে। সেই উৎসবের নাম নাংমাউ। সেই উৎসবের প্রথা হল, বেড়ালদের রানিকে উৎসব-প্রাঙ্গণে নিয়ে আসতে হবে। তবেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামবে।

বুড়োদের কথা শুনে গ্রামের যুবকদের সি সোয়ার্দ নামের সেই ছোট্ট বেড়ালটির কথা মনে হল।

সমুদ্র আর বৃষ্টির দেবতা বরুণ সেই বেড়ালের শরীরে ঢুকে প্রার্থনায় বশ হয়ে বৃষ্টি আনেন। সারা চরাচর বৃষ্টিতে ভরে যায়।

মুয়াং গ্রামের লোকেরা সি সোয়ার্দ নামের রাজকুমারী বেড়ালের মালিক সেই ছোট্ট ছেলেটার কাছে গিয়ে উৎসবের জন্য বেড়ালটিকে দিতে বলল। বলল, তার সাহায্য ছাড়া কিছুতেই এ গ্রামে বৃষ্টি আসবে না। বরুণদেবকে তুষ্ট করতে পারলে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি আসবে। দেশ আবার শস্যশ্যামলা হয়ে যাবে।

ছেলেটা তো কিছুতেই বেড়ালটা দেবে না। সে ভেবেছিল, চিনারা যেমন নানা উৎসবে মুরগি বলি দেয়, তেমনিভাবে তার সি সোয়ার্দকে বলি দেওয়া হবে।

ছেলেটার বাবাও বলল, বেড়ালটাকে কিছুতেই বলি দেওয়া হবে না। সি সোয়ার্দকে সবাই ভালোবাসে। ও দেখতে সুন্দর বলে ওকে গ্রামের লোকেরা নাংমাউ উৎসবে সেরা বেড়ালের সম্মান দেবে। বেড়াল রানি হিসেবে পূজিত হবে। আমাদের পরিবারের পক্ষে এ বড়ো সম্মানের। উৎসব শেষ হলেই আমরা রাজকুমারীকে ফেরত নিয়ে আসব। রাজকুমারী রানি হতে চলেছে, এ তো গর্বের ব্যাপার।

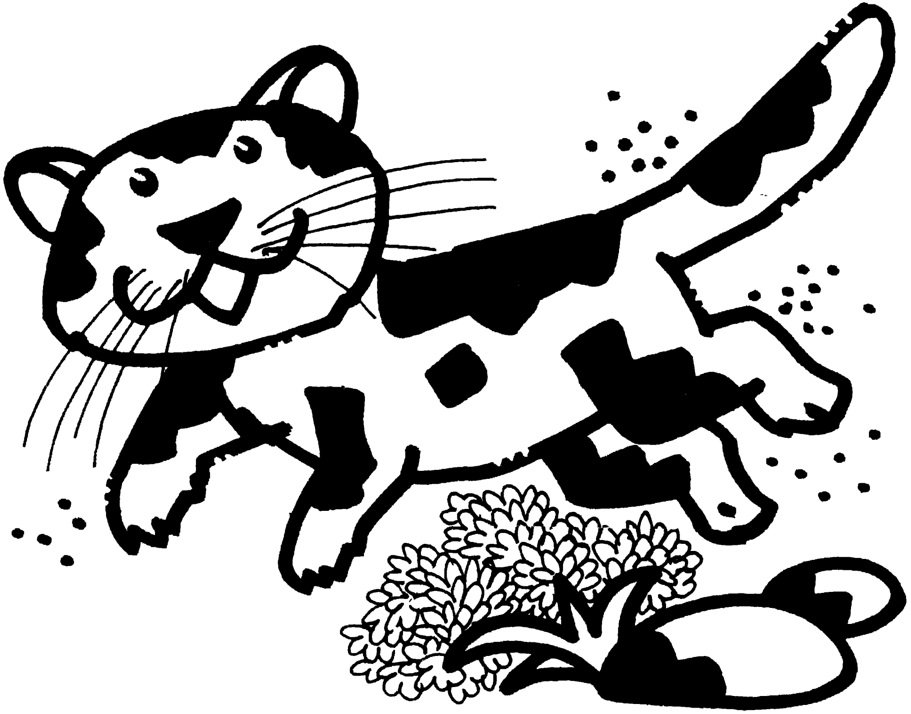
শেষ পর্যন্ত শ্যামদেশের মুয়াং গ্রামের ছোট্ট ছেলেটি রাজি হয়। সেদিন সন্ধ্যায় বেড়ালটা চলে যায় উৎসবের মাঠে।

পরের দিন ভোর থেকে সারা গ্রামে সাজ সাজ রব। ভিড় ভেঙে পড়েছে উৎসবের মাঠে। মেয়েরা নীল নীল স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজ পরেছে। ছেলেরা পরেছে সাদা প্যান্ট আর ছোটো ছোটো কুই হেং শার্ট। বাচ্চারা চকচকে জামা-কাপড় পরে এসে হাজির হয়েছে বৃষ্টি-উৎসবে।

ছোট্ট দুর্গের মতো একটা বাঁশের খাঁচা তৈরি করা হয়েছে। সারা খাঁচা ফুল আর লতা-পাতায় সাজানো। তার মাঝখানে চুপচাপ বসে আছে সি সোয়ার্দ নামের বেড়ালটি। গলায়

মালা পরেছে। মাথায় রেশমি রুমাল। একটু যেন মনমরা। মেয়েরা ওর গায়ে সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। সি সোয়ার্দের এ সব ভালো লাগছিল না। কিছুটা উত্তেজনায় ছটফট করছিল সে। রাগে গর্ গর্ করছিল। খাঁচার বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছে সে। চারিদিক থেকে ভেসে আসছে মানুষের চিৎকার। সি সোয়ার্দ ধীরে ধীরে কেমন শান্ত হয়ে গেল। রানির মতোই অভিজাত তার ভঙ্গিমা। এক সময় খাঁচার মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ল। লাল আলখাল্লা পরা বৌদ্ধ পুরোহিতরা এসে বৃষ্টিরানির গায়ে পবিত্র জল ছেটাল। কিছুতেই রাজকুমারীর ঘুম ভাঙল না।

সবাই মিলে খাঁচাটাকে বুদ্ধমন্দিরে নিয়ে যায়। বুদ্ধদেবের সামনে ঘুমন্ত সি সোয়ার্দ। নারী-পুরুষ সবাই মাথা নিচু করে প্রার্থনা করতে লাগল। অবিরাম ছিটানো জল পড়তে লাগল



রাজকুমারীর গায়ে। খাঁচার সামনে মোমবাতি জ্বেলে দেওয়া হল। প্রার্থনা সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নাচতে লাগল রাজকুমারী সি সোয়ার্দের সামনে। সে গানের ভাষা ছিল— রানিমা, আমাদের বৃষ্টি দাও। বৃষ্টি দাও।

সি সোয়ার্দ তখনও ঘুমিয়ে আছে। ঘুমন্ত রানিমাকে নিয়ে মিছিল শুরু হল। মিছিলের

সামনে ড্রাম বাজাতে বাজাতে দুটো লোক যাচ্ছে। ড্রাম বাদকের পেছনে এক ঝাঁক মেয়ে নাচের পোশাক পরে নাচতে নাচতে চলেছে। যেন বৃষ্টিররানির জন্যই তাদের এই আবেদন। সমস্ত মিছিলের লোক গলা ফাটিয়ে নাংমাউ গাইছে। বৃষ্টির রানিকে তুষ্ট করার জন্য কেউ কেউ খাবার ছুঁড়ে দিচ্ছে খাঁচার ভেতরে।

সি সোয়ার্দ ঘুমিয়েই আছে। যেন কোনো আওয়াজ, কোনো প্রার্থনাই তার কানে পৌঁছচ্ছে না। এমন সময় কে যেন প্রবল শব্দে বাজি ফাটায়। সেই বাজির শব্দে হঠাৎই ঘুম ভেঙে যায় রাজকুমারীর।

সি সোয়ার্দ উঠে দাঁড়ায়। অবাক চোখে চারিদিকে দেখতে থাকে। তার নীল দুই চোখ বাজি ফাটানো ছেলেটাকে খুঁজতে থাকে যেন। তার সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য সে যেন কিছুটা বিরক্ত। তার মখমলের মতো রোমশ শরীর ভিজে একেবারে চুপচুপে। রাগে ফুঁসে চিৎকার করতে থাকে সে। প্রাণপণে চেষ্টা করে খাঁচার ভেতর থেকে বের হবার জন্য। জনসাধারণ চিৎকার করতে থাকে, রানি মাইকি জয়!

জয়োল্লাস থামতেই বৃষ্টিরানিও চিৎকার থামায়। রানির সারা শরীর ভিজে গিয়ে লোমগুলি গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে। ভয়ে কাঁপছে সে।

মিছিলের সমস্ত লোক চুপ হয়ে গেছে এবার। ড্রামবাদক দুজনও ড্রাম পিটোচ্ছে না আর।

খাঁচাটা আবার মন্দির থেকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। একা চেঁচিয়ে চলেছে গ্রামের সবার প্রিয় বেড়াল সি সোয়ার্দ। তার মেজাজ চটে গেছে যেন।

সেই ছোট্ট ছেলেটা, যে এই বেড়ালের মালিক, সে সর্বক্ষণ খাঁচার সঙ্গে সঙ্গে ছিল. সমস্ত লোক মন্দিরে বৃষ্টির জন্য শেষ প্রার্থনা জানাতে গেলে একা সি সোয়ার্দকে পেয়ে যায় সে। শেষ মানুষটি মন্দিরে গেলে খাঁচার দরজা খুলে চুপি চুপি বেড়ালটাকে নিয়ে পালিয়ে আসে।

সেদিন রাত্রে ঠিক নটার সময় চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। সি সোয়ার্দ সেই ছোট্ট ছেলেটার কোলের কাছে শুয়ে আছে। এখন কেমন শান্ত দেখাচ্ছে বেড়ালটাকে। যেন সারাদিন কী ঘটেছে, তার কিছুই মনে নেই। আস্তে আস্তে ছেলেটার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে সে। ছেলেটার বাবা-মা তখনও মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে ফেরেনি। ধীরে ধীরে বেড়ালের সঙ্গে সঙ্গে সেও গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে।

প্রায় রাত এগারোটা নাগাদ বাড়ির সবাই ফিরে আসে। তখনও বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই। কেউ কেউ এসে দেখে যায়, সি সোয়ার্দ তার মালিকের সঙ্গে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। তারা চলে যায়।

তখন প্রায় রাত তিনটে। অন্ধকার সবে ফিকে হতে শুরু হয়েছে। তখনই ঝড় আরম্ভ হয় প্রবল বেগে। সমুদ্রে প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। মুন নদীর জল ফেঁপে ফুলে ওঠে। তীব্র বাতাসের শব্দে চারদিক ভরে যায়। পাহাড়ের ওপার থেকে যেন এক বিশাল রাক্ষস প্রবল

বেগে ধেয়ে আসে মুয়াং গ্রামের দিকে। প্রথমে এক ফোঁটা। পরে আর একটা। ক্রমশ আরো, অজস্র। সারা গ্রাম জলে ভরে যায়।

গ্রামের সমস্ত মানুষ ঘুম ভেঙে উঠে পড়ে। বৃষ্টিতে সেই সকালে তারা ভিজতে থাকে। ভিজতেই থাকে। আনন্দে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অবিরাম ধারায় বৃষ্টির দানা মাথা থেকে গাল পেরিয়ে সারা শরীর ভিজিয়ে দেয় সবার।

কৃষকরা দ্রুত তাদের চাষের জমিতে চলে যায় চাষ করার জন্য।

তিন দিন তিন রাত্রি ধরে সেই বৃষ্টি চলে। মনে হচ্ছিল, যেন বৃষ্টি আর কোনোদিনই থামবে না। কৃষকদের শস্য বেঁচে গেল এবার। গৃহস্থরা তাদের গোরু-ছাগল আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল গ্রামে। আবার চাষবাস শুরু হল প্রবল বেগে।

এদিকে যার জন্য বৃষ্টি নেমে এল, তার যেন এসবে ভ্রুক্ষেপ নেই। বাহাত্তর ঘণ্টা নির্বিঘ্নে ঘুমাল সে। কৃষকদের পরিবারের মানুষজন তাকে আবার দেখতে এল। চাষিবউ সি সোয়ার্দকে শুকনো মাছ আর মাংসের টুকরো খেতে দিল বৃষ্টির আনন্দে।

সেই বছর সবাই ভাবল, সি সোয়ার্দ তাদের চাষের ফসল আর পরিবারকে রক্ষা করেছে। বৃষ্টি না হলে তাদের যে কী দুর্দশাই না হত।

শ্যামদেশের সেই মেনি বেড়ালটা সে দিন থেকে বীরাঙ্গনা হয়ে গেল। মানুষের প্রয়োজনে একটা ছোট্ট বেড়াল কাজে লাগল।

ছবি। শঙ্কর বসাক



দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

এক ছিল কামার।

তার ছোট্ট একটি কামারশালা ছিল। যে কুঁড়েঘরখানিতে সে থাকত, তার সামনের দিকেই তৈরি করে নিয়েছিল এই কামারশালা। ছোটো হলেও এ সবই তার নিজের জায়গা।

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এই কামারশালায় বসে বসে কামার কাজ করত। দুপুরে একবার শুধু খেয়ে আসত ঘর থেকে।

আর কোনো লোককে সে কাজে সাহায্য করবার জন্যে রাখেনি। নিজেই সব করত সারাদিন ধরে। কখনো শোনা যেত তার হাতুড়ি পেটার ঠকাঠক শব্দ। কখনো তার হাপর চালাবার ভস্ ভস্ একটানা আওয়াজ। দিনের পর দিন শোনা যেত।

যেমন কামারশালায়, তেমনি ঘরেও কামার ছিল একা। সংসারে তার আপনার বলতে আর কেউ ছিল না। তাই রোজগার বেশি না হলেও দিন চলে যেত একরকম করে। অবস্থা তার ভালোও নয়, মন্দও নয়। এইভাবে আর দশজনের মতন দিন কাটত।

কামারের কিন্তু মনে সুখ ছিল না। কারণ কিছুতেই সে সন্তুষ্ট হতে পারত না নিজের

অবস্থায়। কামারশালার কাজ কোনোরকমে চালাত বটে, কিন্তু মন তার সদাই অশান্তিতে ভরা থাকত। একটা না একটা নালিশ তার অন্তরে ছিলই। আর সে-সব নালিশ সে বসে বসে জানাত নিজেকেই।

এক-এক দিন এক-একটা অসুবিধের কথা নিয়ে সে আপন মনে বকবক করত। তার মতন অবস্থায় থেকে কোনো সুখ নেই, কিছুই তার ভালো লাগে না, সে ছাড়া জগতের আর সবাই সুখে আছে এই ছিল তার বদ্ধ ধারণা। আর এই নিয়েই নিত্য তার মনের জ্বালা ফুটে বেরুত। তার কামারশালার আগুনের মতন নিজের জ্বালায় নিজেই সে জ্বলত প্রতিদিন।

তার কামারশালার কাছেই থাকত এক বুড়ো। সে বড়ো অদ্ভুত লোক। তার কত বয়স, কী সে করে এসব কিছুই জানা যেত না। সে সবাইকে চিনত বটে, কিন্তু কেউ চিনত না তাকে। সবাই তাকে জানত একজন জ্ঞানী লোক বলে, এই পর্যন্ত। তার যে কী আশ্চর্য ক্ষমতা তা কেউ ভাবতেও পারত না।

সেই বুড়ো যদি ইচ্ছে করত, তার মুখের প্রতিটি কথা ফলে যেত অক্ষরে অক্ষরে। সে যা উচ্চারণ করত, তা-ই সত্যি হত। যে-কোনো লোককে দিয়ে যা খুশি করাতে পারত বুড়ো। তবে তার এই অসাধারণ শক্তির কথা সেখানকার কেউ জানত না।

সে রোজ লক্ষ করত, কামারশালায় কাজ করতে করতে কামার গজগজ করছে আপন মনে। কেবলই ভাগ্যকে দোষ দিচ্ছে আর হা-হুতাশ করছে।

দিনের পর দিন এমনি শুনতে শুনতে বুড়ো একদিন গিয়ে হাজির হল কামারশালার সামনে।

সেদিনও হাপরের ধারে বসে কামার আপন মনে বকবক করছিল, 'উঃ, কি সাংঘাতিক গরম। আর তো সহ্য হয় না। এই গরমে খাটতে খাটতে প্রাণ বেরিয়ে গেল। মরে গেলুম। কী বরাত আমার! আমার চেয়ে কষ্টে আর কেউ নেই।'

বলতে বলতে তার চোখ পড়ল ওদিকের পাহাড়টার ওপর। অমনি সে বলে উঠল, 'ওই যে পাহাড়ের ওপরকার পাথর, ওটাও আমার চেয়ে অনেক আরামে আছে! ওখানে নিশ্চয় বেশ ঠান্ডা। আর মনে হয় গাছপালারও বেশ ছায়া আছে ওখানটায়?

বুড়ো এতক্ষণ ধরে তার রকম-সকম দেখছিল আর কথাগুলো শুনছিল।

এবার কামারকে জিজ্ঞেস করলে, 'পাহাড়ের ওপরকার ওই পাথরটা খুব সুখে আছে বলে তোমার মনে হয়?'

কামার বললে, 'নিশ্চয়। অন্তত আমার চেয়ে তো বটেই।'

তখন বুড়ো বললে, 'আচ্ছা, তুমি যদি ওই পাথর হয়ে যাও তাহলে সন্তুষ্ট হবে তো? আর তোমার কোনো নালিশ থাকবে না?'

কামার বলে উঠল, 'ওঃ, সে আর বলতে! আমি দিব্যি শান্তিতে থাকব পাহাড়ের ওপরে।'

বুড়ো বললে, 'বেশ। তুমি আজ থেকে ওই পাহাড়ের পাথরই হও।'

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কামার হয়ে গেল পাহাড়ের ওপরকার একটা পাথর।

সেই উঁচুতে উঠে গিয়ে সেদিন থেকে সে বাস করতে লাগল।

সেখানটা সত্যিই সুন্দর। চারিদিকে চমৎকার দৃশ্য। নিরিবিলি আর ঘন গাছের ছায়া। ঝিরঝিরে ঠান্ডা হাওয়া। তার ওপর কোনো খাটুনিই এখানে নেই।

তাই তার দিন বেশ আরামেই কাটতে লাগল।

কিন্তু দিন কয়েক পরে এক পাথুরে এল সেখানে। পাহাড়ে পাহাড়ে পাথর কেটে নিয়ে আসাই তার কাজ। এখন এই পাহাড়ের এদিকটায় সে পাথর কাটতে আরম্ভ করলে।

কাটতে কাটতে সে কামার যেখানে পাথর হয়ে ছিল, সেই পাথরে সজোরে এক ঘা বসিয়ে দিলে।

যন্ত্রণায় সে চিৎকার করে উঠল, 'উঃ, কী ভয়ানক লাগছে। প্রাণ যে বেরিয়ে গেল। ও পাথুরে, দোহাই তোমার। আমায় দয়া করে ছেড়ে দাও। ওরে বাবা, আমি আর পাথর হয়ে থাকতে চাই না। ও বুড়ো, তুমি কোথায় আছ? এখানে এসে আমায় বাঁচাও।'

বুড়ো ঠুক ঠুক করে এসে বললে, 'কী হল?'

'আমার প্রাণ যায়। আমি আর পাথর হয়ে থাকতে চাই না।'

'তাহলে তুমি কী চাও?'

'আমি পাথুরে হতে চাই। পাথুরে হতে পারলেই বেঁচে যাব আমি। তখন বেশ মজায় শুধু পাথর কেটে কেটে বেড়াব। আর আমায় কেউ মারতে বা কাটতে পারবে না।'

বুড়ো বললে, 'বেশ। তুমি আজ থেকে তাহলে পাথুরে হও।'

আর সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে গেল এক পাথুরে।

তারপর থেকে তার কাজ হল পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরা। কোথায় ভালো পাথর আছে ঘুরে ঘুরে তার খোঁজ করা। আর পাহাড়ে পাহাড়ে সেই সব পাথর কেটে কেটে বেড়ানো।

এমনি করে তার কিছুদিন কাটল। মাত্র কটা দিন। তারপরই সে ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে উঠল। কাজটা বড়োই কষ্টকর মনে হতে লাগল তার। কোনোরকমে আর কয়েকটা দিন এইরকম খেটে বেড়াল বটে, কিন্তু শেষে আর তার শরীরে পোষাল না। সর্বাঙ্গ ব্যথা হয়ে উঠল। ফোসকা পড়তে লাগল হাতে পায়ে। পাহাড়ে পাহাড়ে পাথর কেটে বেড়াবার আর তার ক্ষমতা রইল না।

এবার তার মনে হল, পাথুরের চেয়ে কষ্টের কাজ আর কিছু হতে পারে না। তবে বাইরে থেকে বুঝতে পারা যায় না, এই যা।

তখন আবার সে মনের দুঃখে বুড়োকে ডাকতে লাগল।

বুড়ো ঠুক ঠুক করে এসে বললে, 'কী হল?'

'আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি আর এত খাটতে পারছি না। পাথুরে হয়ে থাকতে আর চাই না আমি। আমার একটা উপায় করে দাও।'

'কী চাও তুমি?'

'আমি সূর্য হয়ে ওই আকাশে থাকতে চাই। তাহলে বেশ চমৎকার হয়। আকাশের সূর্য হলে আর আমায় এত খাটতে হবে না।'

বুড়ো বললে, 'বেশ। তুমি তাহলে আজ থেকে আকাশের সূর্য হও।'

আর সঙ্গে সঙ্গে সে আকাশের সূর্য হয়ে গেল।

কিন্তু এ তো আর সেই পাহাড়ের পাথর কিংবা সেই পাথুরে হওয়া নয়। আগের দুবার তবু দিনকতক লেগেছিল তার শিক্ষা হতে।

এবার প্রথম দিনেই তার আক্কেল হয়ে গেল। সূর্য এক বিরাট জ্বলন্ত পিণ্ড। একথা সে আগে ভাবতেও পারেনি। এখন ভীষণ তাপে সে নিজেই একেবারে অস্থির হয়ে উঠল। এ এক অসহ্য অবস্থা আর এখনি এর বিহিত না করলেই নয়।

আবার সে বুড়োকে মনে মনে ডাকতে লাগল।

বুড়ো ঠুক ঠুক করে এসে বললে, 'কী হল?'

ছটফট করতে করতে সে বললে, 'উঃ, এ কী সাংঘাতিক গরম। এ তো আগুন। আমি একেবারে ঝলসে যাচ্ছি। আমি আর সূর্য হয়ে থাকতে চাই না।'

বুড়ো জিজ্ঞেস করলে, 'তবে কী চাও?'

'আমি রাতের আকাশে চাঁদ হয়ে থাকতে চাই। সে বেশ ভালো হবে। চাঁদ নিশ্চয়ই খুব ঠান্ডা। আমি এবার আরামে থাকব। আমার আর কোনো কষ্ট থাকবে না।'

বুড়ো বললে, 'বেশ। আজ থেকে তাহলে তুমি চাঁদ হও।'

আর সঙ্গে সঙ্গে সে চাঁদ হয়ে আকাশের একদিকে চলে গেল।

কিন্তু চাঁদ হয়ে সে দেখলে, বাইরে থেকে যা ভেবেছিল ভেতরে মোটেই তা নয়। এখানে আর এক রকমের বিপদ। এমন দুর্দশার কথা সে কখনো ধারণাও করতে পারেনি।

এখানেও দারুণ গরম। চাঁদ হয়েও সূর্যের মতন গরম সহ্য করতে হচ্ছে। সূর্যের ওই প্রচণ্ড আলো পড়ে গা পুড়ে যাচ্ছে যেন। তাই এখানেও এত জ্বালা। এ-অবস্থায় প্রাণ বাঁচবে কী করে?

তখন সে আবার বুড়োকে ডাকতে লাগল।

বুড়ো ঠুক ঠুক করে এসে বললে, 'কী হল?'

'আমার আর কাজ নেই চাঁদ হয়ে। এখানেও যে এমন গরমের জ্বালা আমি কী করে জানব? চাঁদ হবার সাধ আমার মিটে গেছে।'

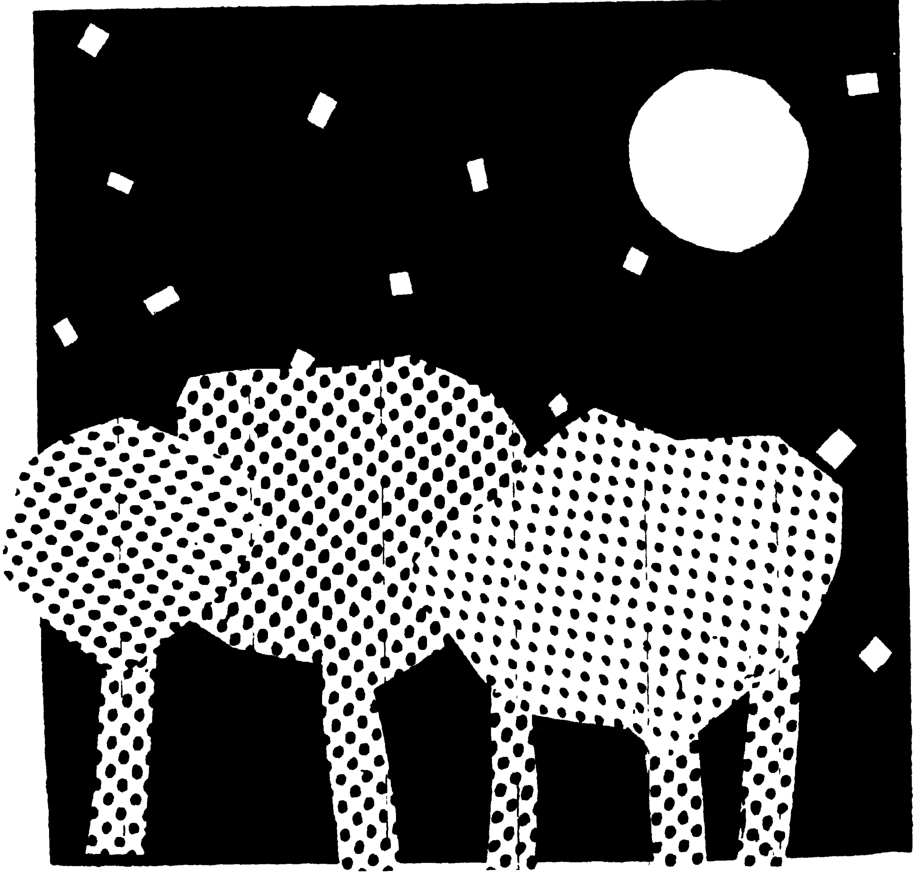
'আবার তুমি কী চাও?'

'আগেকার মতন আমার সেই কামার হওয়াই ভালো দেখছি।'

শুনে বুড়ো মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলে, 'তাই নাকি? কামার হওয়া ভালো? কামার হয়ে তুমি তাহলে সন্তুষ্ট থাকবে?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

তখন বুড়ো মাথা নেড়ে বলতে লাগল, 'না বাপু, না। তুমি সন্তুষ্ট থাকবে না কামার হয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে থাকার ধাতই তোমার নয়। কামার তো তুমি বহুদিন ধরেই ছিলে। মনে নেই, তখন ঘ্যানর ঘ্যানর করে সারাদিন কী রকম নালিশ জানাতে? একটা দিনের জন্যেও কখনো সন্তুষ্ট হয়েছিলে? তোমার সেই অবস্থায় তোমারই কথামতন কামার থেকে তোমায় পাহাড়ের



পাথর করে দিলুম। কিন্তু তাতে তুমি সুখী হলে না। তখন তোমার কথামতন তোমায় করলুম পাথুরে। তাতেও তুমি সুখ পেলে না। আবার তোমার কথামতন করলুম সূর্য। কিন্তু তাতেও তুমি সন্তুষ্ট হলে না। তারপর চাইলে চাঁদ হতে। তাও তোমায় করে দিলুম। কিন্তু তাতেও তুমি শান্তি পেলে না। এখন আবার বলছ—সেই কামার হওয়াই ভালো! দেখো বাপু, স্পষ্টই বলছি, আমি তোমার কথা আর বিশ্বাস করি না। তোমার বায়না আমি অনেক শুনেছি। আর কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি চাঁদ হতে চেয়েছিলে চাঁদ হয়েই থাকো। এই তোমার উপযুক্ত।' বলে, বুড়ো ঠুক ঠুক করে চলে গেল।

আর সেই থেকে কামার চাঁদের ফাঁদে আটকে আছে আকাশে।

ছবি। প্রণবেশ মাইতি



গল্পের বাঘ

রূপক চট্টরাজ

সে অনেককাল আগের কথা। কোনো এক বিত্তশালী রাজ্যে খুব ধনী এক রাজা বাস করতেন। তাঁর রাজত্বে তখন কোনো অভাব ছিল না। তাঁর ছিল সুন্দরী এক রানি। রানির ছিল যেমন রূপ তেমনি গুণ।

রাজ্যের চারপাশে পাহারা দেওয়ার জন্যে রাজামশাই চারজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। বাইরের শত্রুপক্ষ যেন রাজ্যের ভেতরে হামলা করতে না-পারে সে-ব্যাপারে তাঁরা সবসময় নজরদারি করতেন। সৈন্যসামন্ত নিয়ে সবসময় মোতায়েন থাকতেন।

আর রাজামশাইয়ের কাছে থাকতেন এক রাজজ্যোতিষী। তিনি রাজামশাইকে সুপরামর্শ দিতেন। আর ছিল রাজামশাইয়ের একদল বিশ্বস্ত কর্মচারী। এঁরা সকলেই রাজামশাইয়ের সমস্ত কাজকর্মে খুবই আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করতেন। সেজন্যে রাজ্যে না ছিল দুঃখ, না ছিল বিশৃঙ্খলা।

রাজামশাইয়ের সবই ছিল, কিন্তু ছিল না জানা সেই বিদ্যা, যার সাহায্যে রাজামশাই আগেই জানতে পারবেন যে যুদ্ধে তাঁর জয় হবে, না পরাজয় হবে। শুধুমাত্র এই অজ্ঞতার জন্যে রাজামশাই মনে মনে খুবই দুশ্চিন্তায় ভুগতেন। কী করে তাঁর রাজত্বের সীমা তিনি

বাড়াবেন এ ব্যাপারে ভেবে কূলকিনারা পেতেন না। এইরকম সাত-পাঁচ ভেবে ভেবেই রাজামশাই ভীষণ অস্থির হয়ে পড়লেন।

এইভাবে দিন চলে যায়। বছরের পর বছর কাটে।

কালধর্মে রাজামশাই যখন বুড়ো হলেন তখন তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল যদি কোনো শত্রুসৈন্য তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে বসে তাহলে তো তিনি আর পেরে উঠবেন না।

তাই একদিন খুব সকালবেলায় রাজামশাই রানিমাকে সঙ্গে নিয়ে রাজদরবারে এলেন। রাজজ্যোতিষী, পারিষদবর্গ, চার প্রধানমন্ত্রী সকলে নত হয়ে রাজামশাই ও রানিমাকে অভিবাদন জানালেন। রাজামশাই পারিষদবর্গকে বললেন, 'আপনারা সকলে শুনুন, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। চলুন আমরা সকলে তক্ষশিলায় গিয়ে বিখ্যাত জাদুকর তিসাবামোক্ষর কাছে জাদুবিদ্যা অনুশীলন করি। যদি আমরা জাদুবিদ্যা ভালোভাবে আয়ত্ব করতে পারি তাহলে খুব সহজে আমরা শত্রুনিধন করতে পারব। আমাদের তখন আর যুদ্ধে জয়পরাজয়ের ভাবনাচিন্তা থাকবে না।'

রাজামশাইয়ের এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মতি জানালেন।

একদিন সকালে রাজামশাই, রানিমা, রাজজ্যোতিষী ও চার প্রধানমন্ত্রী তক্ষশিলার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে রাজামশাই বিখ্যাত জাদুকর তিসাবামোক্ষর খোঁজ করলেন। সন্ধান পেয়ে রাজামশাই তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন তাঁদেরকে জাদুবিদ্যা শেখান।

রাজামশাইয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে জাদুকর তাঁদেরকে জাদুবিদ্যা শেখাতে লাগলেন। এইভাবে তাঁরা ক্রমে ক্রমে শিখে ফেললেন, ভোজবাজির মাধ্যমে কেমন করে পশুপাখি বা কোনো প্রাণীর রূপধারণ করতে পারবেন।

শিক্ষা শেষ করে রাজামশাই খুশি মনে এবার নিজের রাজ্যে ফেরার কথা ভাবলেন। ফেরার সময় তিনি আবার রানিমা, রাজজ্যোতিষী ও চার প্রধানমন্ত্রীকে সঙ্গে নিলেন।

তক্ষশিলা থেকে তাঁরা রাজ্যে ফেরার সময় তিন দিন কেটে গেল। তাঁরা এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে যা খাবার ছিল তা শেষ হয়ে এসেছে। খিদের জ্বালায় গাছের ফলমূল যে যা পেলেন তাই খেতে লাগলেন। এসব দেখে রাজামশাই ভেবেই আকুল। ভাবলেন তিনি ও তাঁর দলবল খিদের জ্বালায় মারা যাবেন।

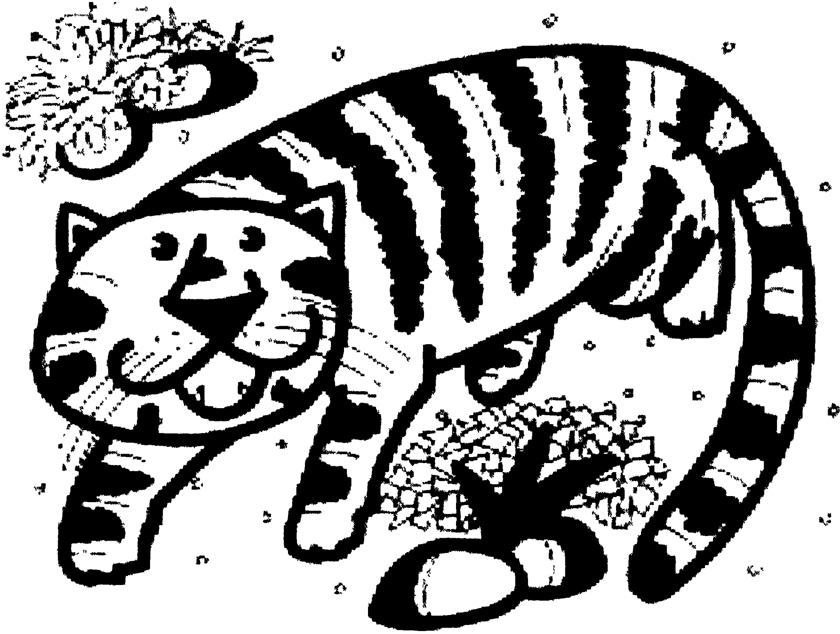
সেজন্য তিনি অনুচরদের ডেকে বললেন, 'দেখুন, মনে হচ্ছে আমাদের শেষের দিন ঘনিয়ে এসেছে। খাদ্য ছাড়া তো আর প্রাণধারণ করা যায় না। তাই আপনাদের ডেকেছি। এখন আপনারা বুদ্ধি দিন, আমাদের এই অবস্থায় কী করা কর্তব্য।'

রাজজ্যেতিষী এ কথা শুনে রাজামশাইকে বললেন, 'মহারাজ, এই অবস্থায় আমরা তো আমাদের অধীত জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করতে পারি। তাই বলি কী, মন্ত্রবলে আমরা সকলে বাঘ হয়ে যাই। তাহলে আর আমাদের কোনো চিন্তা থাকবে না। এই বিশাল বনজঙ্গলে বহু পশুপাখি ঘোরাফেরা করছে। আমরা সহজেই এখানকার পশুপাখি শিকার করে খেতে পারব।

মহারাজ, আপনি একবার ভেবে দেখুন। আমরা আমাদের রাজত্বে প্রবেশ না-করা পর্যন্ত বাঘ হয়েই থাকি না কেন! নিজেদের রাজ্যে ফেরার মুখে আমরা না-হয় ফের মানুষ হয়ে যাব।'

রাজজ্যোতিষীর এমন সুন্দর পরামর্শে সকলের খুব আনন্দ হল। রাজামশাই বললেন, 'শুনুন শুনুন আপনাদের কিন্তু একটা ব্যাপার আগে ঠিক করে নিতে হবে। আপনারা একে-একে এসে বলুন দেখি বাঘের কোন কোন অঙ্গপ্রতঙ্গ আপনারা হতে চান!' এ কথা বলেই রাজামশাই প্রথমে রানিমাকে ডাকলেন।

রানিমা রাজামশাইয়ের কথার জবাবে প্রথমেই বেছে নিলেন বাঘের মূল দেহখানি। এমন সুন্দর মখমলের মতন মসৃণ দেহ ধারণ করা একমাত্র রানিমারই সাজে। তাই এ ব্যাপারে কারো কোনো কিছু বলার রইল না।



এরপর রাজজ্যোতিষীর পালা। তিনি বললেন, তিনি বিশালদেহী বাঘের দীর্ঘ লেজ হতে চান। যাতে তিনি সারাদিন মনের আনন্দে মৃদুমন্দ বাতাসে এদিক-ওদিক লেজ দুলিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা উপভোগ করতে পারেন।

রাজামশাই, রাজজ্যোতিষীর ইচ্ছেতে সম্মতি জানালেন। এরপর ডাকলেন তাঁর চার প্রধানমন্ত্রীকে।

'আপনারাই হচ্ছেন আমার রাজ্যের মূলস্তম্ভ। আপনারা একসঙ্গে এসে বেছে নিন।'

প্রধামন্ত্রীরা এসে রাজামশাইকে বললেন, 'আমরা চারজনই ওই বিশালদেহী বাঘের চারটে

পা হতে চাই। এতে আমরা বাঘদেহেরও মূলস্তম্ভ হলাম আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চারটে একইরকম হওয়াতে কারো কোনো আপত্তিও থাকবে না।'

রাজামশাই চার প্রধানমন্ত্রীর কথায় খুব খুশি হলেন। বললেন, 'এখন তো শুধু পড়ে থাকল বিশালদেহী বাঘের মাথা। তাহলে তো আমাকে ওই মাথাটাই নিতে হচ্ছে।'

তাই তিনি নিলেন বাঘের মাথা।

এবারে এইসব ইচ্ছের কথা ভেবে ভেবেই তাঁরা সকলে জাদুবিদ্যার মন্ত্র-উচ্চারণ করতে শুরু করলেন।

আর কী আশ্চর্যের কথা, কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনে দাঁড়িয়ে এক বিশালদেহী বাঘ। রাজামশাই, রাজজ্যোতিষী, রানিমা, চার প্রধানমন্ত্রী সকলেই নিমেষে উধাও হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। সেই বিশালদেহী বাঘ খিদের জ্বালায় তর্জনগর্জন শুরু করে দিল বনজঙ্গলের মধ্যে। তিরবেগে ছুটে গেল কিছুদূর। তারপর দিল এক বিশাল লাফ। বনের পশুপাখি শিকার করে খেতে লাগল। মনের সুখে দিন কাটাতে লাগল।

কয়েকটা দিন কাটার পর সেই বাঘ মনের আনন্দে বনজঙ্গলে শিকার ধরে খেতে খেতে নিজের রাজ্যে ফেরার কথা বেমালুম ভুলে গেল। তাই রাজামশাই, রানিমা, রাজজ্যোতিষী, চার প্রধানমন্ত্রী সকলেই বাঘ হয়েই রইলেন।

এই হল গল্পের বাঘের জন্মকথা।

ছবি। শঙ্কর বসাক



কেমন বিচার

অপূর্বকুমার কুণ্ডু

এক জমিদারের ছিল পরমা সুন্দরী এক কন্যা। সে ছিল জমিদার আর জমিদার গিন্নির প্রাণ। কন্যা যেমন রূপবতী, তেমনই গুণবতী।

তা এই কন্যাকে বিয়ে করবে বলে এক যুবক এসে দাঁড়াল জমিদারের সামনে। অচেনা যুবককে দেখে জমিদার অবাক। কোনোদিন তাকে দেখেননি। কী চায়!

জমিদার যুবককে শুধোন, 'কী চাও বাপু?'

যুবক ঘাবড়ে না গিয়ে বলে, 'আমি আপনার কন্যাকে বিয়ে করতে চাই।'

জমিদারের চোখ দুটো গোল-গোল হয়ে যায়। মনে মনে ভাবেন, বলে কী এই অচেনা অজানা ছোকরা! আমি জমিদার। আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে কিনা বলে, আমার মেয়েকে বিয়ে করবে। এটা সাহস না দুঃসাহস? খানিক চুপ করে থাকেন। তারপর মনে মনে ফন্দি এঁটে জমিদার বলেন, 'বেশ তো! আমার মেয়েকে বিয়ে করবে, ভালো কথা। তোমাকে বলে রাখি, আমার একটা শর্ত আছে।'

যুবক বলে, 'কী শর্ত বলুন।'

'সে বড়ো কঠিন ব্যাপার।' জমিদার বলেন, 'সেই শর্ত যদি পূরণ না হয়, তাহলে কিন্তু তোমার প্রাণটাও যাবে।'

'আগে বলুন শুনি। তারপর না-হয় ভাবা যাবে।'

'তা হলে শোনো।' বলেই জমিদার বলতে শুরু করেন, 'তুমি কি জানো, আমার জমিদারির পশ্চিম দিকে একটা সরোবর আছে। সেই সরোবরের জল বারোমাস বরফের মতো ঠান্ডা।'

যুবক বলে, 'জানি। তাই লোকে সরোবরটাকে শীতল সরোবর বলে।'



'বেশ। তাহলে সেই শীতল সরোবরে তিনদিন তিনরাত তোমাকে গলা পর্যন্ত ডুবে থাকতে হবে। পা কিন্তু মাটিতে ঠেকাতে পারবে না। এই শর্ত পূরণ করে যদি আমার সামনে এসে দাঁড়াও, তা হলেই আমার কন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে। কবে যাব শীতল সরোবরে?' যুবক বলে।

'দেরি করে লাভ কী? আগামীকাল সূর্য ওঠার মুহূর্ত থেকে শুরু হোক।'

সূর্য তখনও ওঠেনি। যুবক এসে দাঁড়ায় শীতল সরোবরের ধারে। সঙ্গে কজন জমিদারের পাহারাদার।

ধীরে ধীরে যুবক শীতল সরোবরে নেমে পড়ে। জমিদারের পাহারাদাররা চেয়ে থাকে তার দিকে।

সময় পার হতে থাকে।

পূর্বের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ে। তারপর রাত ফুরিয়ে আবার সূর্য ওঠে।

এভাবেই দু-দিন দু-রাত পার হয়।

জমিদারের পাহারাদারদের একজন এসে জমিদারকে বলে, 'হুজুর, ও তো দু-দিন দু-রাত দিব্যি পার করে দিল। আর একদিন একরাত বাকি। ওকে দেখে মনে হচ্ছে ও অনায়াসে আরও একদিন একরাত শীতল সরোবরে কাটিয়ে দেবে।'

জমিদারের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। তাই তো। যুবক যদি কথামতো শর্তপূরণ করে তাহলে তাঁকেও কথা রাখতে হবে। ভাবতে থাকেন কী করা যায়।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা মতলব ঠিক করেন। মুচকি হেসে আপন মনে বলেন, তোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না কচু। কী করে তোকে তাড়াব দেখিস।

রাত্রি নেমে আসে। যুবক ভাবে, আর আজকের রাত। তা হলেই শর্ত পূরণ হবে। জমিদারের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

আকাশে অগুনতি তারা। সে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ দেখে কিছুদূরে পাহাড়ের চূড়ায় আগুন জ্বলে ওঠে। সে আগুন দেখে মনে মনে ইচ্ছে হয় তার ঠান্ডায় জমে যাওয়ার হাত-পাগুলো সেঁকে নেবার। তারপর ভাবে, না। আর তো আজকের রাত। ওটুকু কষ্ট তাকে করতেই হবে। না হলে জমিদারকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হবে না। আর প্রাণটাও যাবে। এই ভেবে সে আগুনের দিকে চেয়ে থাকে।

রাত ফুরোয়। পুবদিকে সূর্য ওঠে। আর শীতল সরোবর ছেড়ে উঠে আসে যুবকটি। খানিকক্ষণ মাটিতে শুয়ে থাকে। তারপর উঠে পাহারাদারদের বলে, 'যাও, তোমাদের মনিবকে গিয়ে বলো, আমি আসছি।'

জমিদার বিচলিত হয়ে পায়চারি করছেন। এমন সময় যুবক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি শর্ত পূরণ করেছি। এবার আপনি আপনার কথা রাখুন।'

জমিদার বললেন, 'তিনদিন তিনরাত শীতল সরোবরে ছিলে, বাইরে থেকে কোনো তাপ পাওনি? কোনো তাপ শীতল সরোবরের জল গরম করেনি?'

'তা আপনার পাহারাদারদের কাছে শুনে দেখুন।' যুবক বলে।

'আমি কারও কাছে শুনতে চাই না। গতরাতে পাহাড়চূড়ায় আগুন দেখেছ?'

'হ্যাঁ। হঠাৎ পাহাড়চুড়োয় আগুন জ্বলে উঠতে দেখেছি।'

'তাহলে আর বলছি কী! সে আগুনের তাপ তুমি দেখেছ। আগুনের ছায়া শীতল সরোবরের জলে পড়েছিল। তাতেই তো তোমার শর্তভঙ্গ হয়েছে। দূর হও তুমি। তবে তোমাকে প্রাণদণ্ড থেকে রেহাই দিলাম। এই অনেক।' বলেই জমিদার ভেতরে চলে যান।

যুবকটি আর কী করে, কাঁদতে কাঁদতে বিচারকের বাড়ি গিয়ে সব ঘটনা বলল। বিচারক

জমিদারকে ডেকে পাঠালেন। জমিদার আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বিস্তর উপঢৌকন নিয়ে জমিদার বিচারকের বাড়ি হাজির হলেন। তাই দেখে বিচারক করলেন কী, সমস্ত দোষ যুবকের উপর চাপালেন। যুবককে ডেকে বললেন, 'তোমার সাহস তো বড়ো কম নয়। কোন সাহসে তুমি জমিদারের নামে আমার কাছে নালিশ করতে এলে। আগুন সব সময় তাপ দেয় তুমি জানো না? আশেপাশেও তাপ ছড়ায় সে কথা ভুলে গেলে?'

বিচারকের কথা শুনে যুবক অবাক। একবার জমিদারের মুখের দিকে একবার বিচারকের মুখের দিকে তাকায়। জমিদার মিটি মিটি হাসছেন। বিচারক গম্ভীর হয়ে আবারও বললেন, 'তুমি মিথ্যে নালিশ করছ জমিদারের নামে। তাই তোমাকে জরিমানা দিতে হবে।'

যুবক কোনো কথা বলে না। রাগে-দুঃখে কাঁদতে থাকে। বলে, 'বলুন কী জরিমানা দিতে হবে।'

'তোমাকে একটা ভোজ দিতে হবে। তুমি জমিদারের নামে মিথ্যে নালিশ করেছ, আর বিচার করেছি আমি। তাই জমিদার আর আমাকে পেটপুরে খাওয়াতে হবে। যাও এবার। বাড়ি গিয়ে সে ব্যবস্থা করো।'

কী আর করবে, যুবক কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির পথ ধরে। হঠাৎ পথের মধ্যে শশকের সঙ্গে দেখা। সে খুব বিচক্ষণ। বিচারবুদ্ধিও খুব প্রখর। যুবককে কাঁদতে দেখে শশক বলল, 'কী হল, তুমি কাঁদতে-কাঁদতে কোথায় চললে?'

'যাব আর কোথায়। বাড়ি যাচ্ছি।' তারপর যুবক শশককে সব কথা খুলে বলল। বিচারক কেমন জমিদারের পক্ষ নিয়ে জরিমানা করেছে, তাও বলল।

সব শুনে শশক বলল, 'এই ব্যাপার। কোনো চিন্তা নেই। তুমি বাড়ি গিয়ে সব ব্যবস্থা করো। আমি আছি। তবে হ্যাঁ, কোনো রান্নায় নুন দেবে না। একটা নুনের পাত্র একটু দূরে রাখবে। আর আমাকেও ডাকবে। কেমন?'

যুবক সব আয়োজন করে শশকের কথামতো। তারপর বিচারক আর জমিদারকে নিমন্ত্রণ করল। সেই সঙ্গে খবর দেয় শশককে।

জমিদার আর বিচারক খেতে বসলেন। বেশ বেলাও হয়েছে। সেই সঙ্গে রান্নার গন্ধ খিদে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

খাবার মুখে তুলে জমিদার বলেন, 'এটা কী হয়েছে!'

যুবক হাত জোড় করে বলে, 'কেন? সব তো ঠিক ঠিক আছে।'

বিচারক অবাক হয়ে বলেন, 'কেন কী হল!'

'খাবারটা মুখে তুলে দেখুন!' জমিদার বলেন।

কিছু দূরে শশক একটা আসনে বসে মুচকি মুচকি হাসছে।

বিচারক খাবার তুলে বললেন, 'এমন বিস্বাদ কেন? খাবারে নুন দাওনি?'

শশক আসন ছেড়ে এগিয়ে এল দুজনের সামনে। বলে, 'কেন, নুন ছাড়া খাবার হবে কেন? ওই তো নুনের পাত্র।'

'নুনের পাত্রে নুন থাকলেই হবে? খাবারে দিতে হবে না।?' বিচারক বলেন।

'শশক তখন হেসে বলল, 'কেন? খাবারের কাছাকাছি নুন থাকলেই তো হয়!'

'এ কথার অর্থ!' একসঙ্গে দুজনে বলে ওঠেন।

শশক আবার হেসে উঠল, বলল, 'খুব সোজা। দূরে পাহাড়ের মাথায় মশাল জ্বাললে যদি আপনার শীতল সরোবরের জল গরম হয়, তাহলে খাবারের এত কাছাকাছি নুনের পাত্র রাখলে খাবার কেন নোন্‌তা হবে না? কী জমিদারমশাই, ঠিক বলছি না, আপনার বিচারক কী বলেন?'

বিচারক বুঝতে পারেন, শশক তাঁকে আচ্ছা জব্দ করেছে।

শশক আরও বলল, 'উপঢৌকন পেয়ে যুবককে ন্যায্য বিচার না দিয়ে জরিমানা করলেন। এবার আপনার ফাঁদে আপনি পড়েছেন। এখন সব ব্যঞ্জন আপনাদের খেতে হবে। নুনের পাত্র সামনেই আছে। নিন, খাওয়া শেষ করুন।'

'এই খাবার খাওয়া সম্ভব নয়।' বিচারক বলেন।

'তা হলে জমিদারমশাইয়ের সঙ্গে যে শর্ত হয়েছিল যুবকের তা পূরণ করতে বলুন।'

কী আর করা যায়। জমিদার বাধ্য হলেন যুবকের সঙ্গে তার কন্যার বিয়ে দিতে। সেই বিয়ের আসরে শশক উপস্থিত হয়ে যুবককে বলল, 'কোনো ভয় নেই। বিপদে পড়লে আমার কাছে আসবে। আমরা উপঢৌকন নিয়ে বিচার করি না।'

যুবক ঘাড় কাত করে হাসতে থাকে।

ছবি। সুব্রত মাজী



গল্পের ভূত

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী শাশ্বতী রায়চৌধুরী

কাম্পুচিয়ায় এক রাজপুত্র ছিল। সে গল্প শুনতে খুব ভালোবাসত। সেই ছোট্টবেলা যখন প্রথম কথা বলতে শিখেছে, তখন থেকে একটাই মাত্র আবদার তার, তা হল গল্প শোনার। রাজপ্রাসাদের এক বুড়োচাকর নানান দেশের প্রচুর গল্প জানত। আর বলতেও পারত খুব ভালো। রাজা তাকে ঠিক করে দিলেন রাজপুত্রকে গল্প শোনানোর জন্য। রোজ রাতে ঘুমোতে যাবার আগে রাজপুত্র একটা করে গল্প শুনত। এই করতে করতে রাজপুত্র বড়ো হল। যখন বিয়ের বয়স হয়ে গেল, তখনও গল্প শোনার নেশা কমল না।

রাজপুত্র এমন হিংসুটে ছিল যে ওর শোনা গল্পগুলো কাউকে বলত না। এমনকি বন্ধুরা শুনতে চাইলেও এড়িয়ে যেত। এখন হয়েছে কী, ওগুলো সব ছিল আসলে জাদুগল্প। প্রত্যেকটা গল্পের প্রাণ ছিল। কিন্তু একটা গল্প বলা হয়ে গেলেই সেটা মরে ভূত হয়ে যেত। আর ভূতটা গিয়ে ঢুকত রাজপুত্রের পাশে-ঝোলানো একটা চামড়ার থলের মধ্যে। ভূতগুলোর ওখান থেকে বেরোনোর উপায় ছিল না। একমাত্র রাজপুত্র যদি অন্য কাউকে গল্পগুলো বলত, তবেই ওরা আবার প্রাণ ফিরে পেত। রাজপুত্র এসবের কিছুই জানত না। তাই বছরের-পর-

বছর ধরে গল্প-ভূতগুলো থলের মধ্যে গিয়ে বন্দি হচ্ছিল। প্রথম প্রথম ওদের খারাপ লাগত না। চামড়ার থলের সোঁদা সোঁদা গন্ধের মধ্যে বসে সুখ-দুঃখের কথা বলে সময় কেটে যেত। কিন্তু আস্তে আস্তে ভূতের ভিড় বাড়তে লাগল। ওইটুকু ছোট্ট থলের মধ্যে চাপাচাপি গাদাগাদি করে থাকতে হত। হাতপা নাড়ারও জায়গা নেই। শোওয়া তো দূরের কথা। তাই ভূতগুলো ক্রমশ খেপে উঠতে লাগল। সবসময় ওরা জল্পনাকল্পনা করত কী করে রাজপুত্রের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। কারণ ওদের এই প্রাণান্তকর অবস্থার জন্য তো রাজপুত্রই দায়ী।

একদিন পাশের রাজ্যের এক সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে ঠিক হল। রাজা বিশাল উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। রাজ্যের রাজপথগুলো সুন্দর করে সাজানো হল। জায়গায় জায়গায় তোরণ তৈরি করা হল। ঠিক হল যে রাজ্যের একপ্রান্তে অবস্থিত এক মন্দিরে গিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। এসব শুনে ভূতেরা আলোচনা করে ঠিক করল যে বিয়ের দিনই রাজপুত্রের ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে, কারণ ওই দিনটাই ওকে জব্দ করার পক্ষে সবথেকে উপযুক্ত।

বিয়ের দিন সকাল থেকেই রাজপ্রাসাদ সরগরম। লোকজন, দাসদাসী, আত্মীয়স্বজন সবাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। রাজপুত্রের বিয়ে বলে কথা! ওদিকে থলের মধ্যে গল্প-ভূতেরা বসে নানারকম ষড়যন্ত্র করছে।

এক ভূত বলল, 'অত দূর মন্দিরে বিয়ে করতে যাবার জন্যে চলতে চলতে রাজপুত্র নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর ওর খুব জলতেষ্টাও পাবে। তাই আমি একটা সুন্দর কারুকাজ-করা সোনার ঘড়া হয়ে পথের ধারে পড়ে থাকব। ওটা দেখতে পেয়ে রাজপুত্র ওর লোকদের আদেশ দেবে ঘড়াটাতে জল ভরে আনার জন্য। আর যে-মুহূর্তে রাজপুত্র জল খাবার জন্য ঘড়াটা মুখের কাছে তুলবে অমনি আমি একটা ধারালো চকচকে তলোয়ার হয়ে ওকে আক্রমণ করব।'

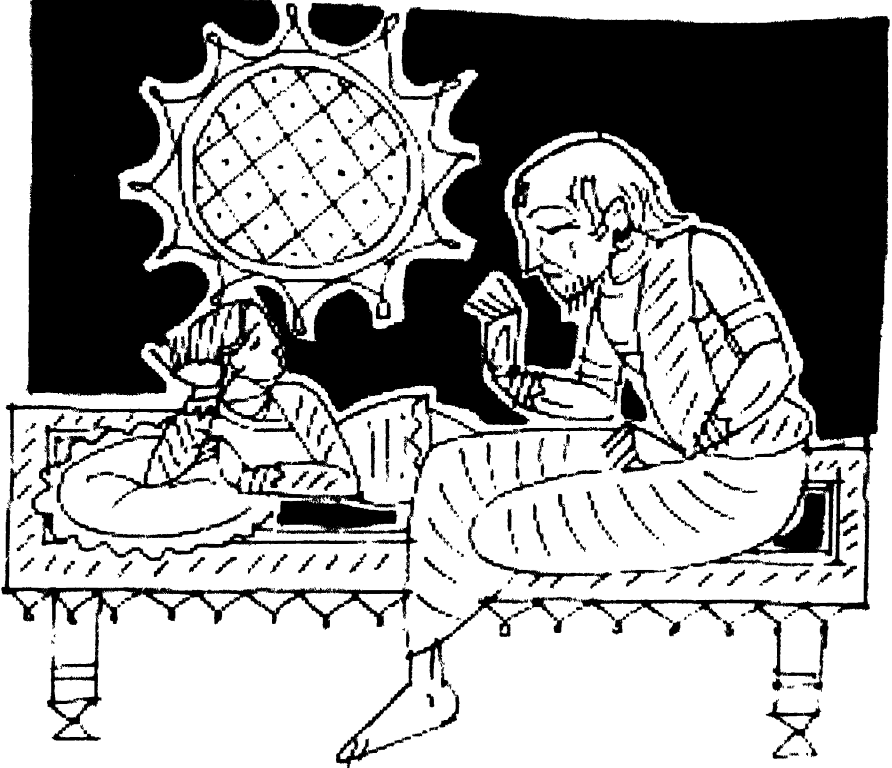
'এটা খুব ভালো বুদ্ধি'—এবার একটা ডিগডিগে রোগা ভূত বলল, 'শুনে আমার মাথায়ও একটা মতলব এসেছে। মন্দিরে যাবার পথে একটা বড়ো আঙুরখেত আছে, তোমরা সবাই লক্ষ করেছ নিশ্চয়ই। আমি একথোকা পাকা রসালো আঙুর হয়ে ঠিক রাস্তার ধারের একটা গাছে ঝুলে থাকব। অত ভালো আঙুর দেখে রাজপুত্র খেতে চাইবেই আর যখনই খাওয়ার জন্য আঙুরের থোকা রাজপুত্র মুখের কাছে তুলবে অমনি আমি একটা বিষাক্ত কাঁকড়াবিছে হয়ে ওর গলায় কামড়ে দেব।'

'বাঃ, বাঃ, খুব ভালো বুদ্ধি বের করেছ ভায়া'—বেশ ওস্তাদগোছের এক বুড়ো-ভূত রোগা-ভূতটার পিঠ চাপড়ে দিল।

'এবার আমার বুদ্ধিটা শোনো। তোমরা সবাই জানো যে, বিয়ের অনুষ্ঠানে একটা নিয়ম আছে যে, মন্দিরের সিঁড়িতে ওঠার সময় রাজপুত্রকে একটা চালের বস্তার ওপর পা ফেলে উঠতে হবে। আমি করব কী, বেশ কয়েকটা ধারালো কাচের টুকরো হয়ে ওই বস্তার মধ্যে

লুকিয়ে থাকব। তাহলে ওর ওপরে দাঁড়ালেই রাজপুত্রের পা কেটে রক্তারক্তি হবে। কী ভালো বুদ্ধি নয়?'—নিজের বুদ্ধিতে নিজেই মুগ্ধ হয়ে বুড়ো সাদা লম্বা দাড়ি নেড়ে উঠল।

সবশেষে একটা কুচকুচে কালো হাড়গিলে ভূত থলের তলা থেকে গলা বাড়িয়ে বলে উঠল, 'তোমাদের সবার বুদ্ধিই বেশ ভালো, তবে আমার মাথাতেও একটা ফন্দি এসেছে। আমি একটা বিষাক্ত সাপ হয়ে রাজপুত্রের বিছানায় লুকিয়ে থাকব। রাজপুত্র ও তার নতুন বউ ঘুমিয়ে পড়ামাত্রই বেরিয়ে এসে আমি ছোবল মারব। বাছাধন যাবে কোথায়? তোমাদের মতলবগুলোতে যদি কাজ না-ও হয় আমার হাত থেকে ওর রক্ষে নেই।'



কখন কীভাবে কাজ শুরু করা যায় এসব নিয়ে আলোচনা করতে করতে ভূতেরা এতই উত্তেজিত হয়ে উঠল যে জানতেও পারল না কখন ওদের ফিশফিশানি আস্তে আস্তে প্রবল চ্যাচামেচিতে পরিণত হয়েছে। আর এ-ও জানতে পারল না যে, রাজপুত্রের বুড়োচাকর এসে ওদের সব ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা শুনে নিয়েছে, সব শুনে ও ঠিক করল, যে করেই হোক রাজপুত্রকে বাঁচাতে হবে।

মন্দিরে যাবার পথে রাজপুত্রের সত্যিই খুব জলতেষ্টা পেল। আর তক্ষুনি পথের পাশে একটা সোনার ঘড়া দেখতে পেয়ে রাজপুত্র তাতে জল ভরে আনার জন্য হুকুম দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুড়োচাকর এগিয়ে এসে বলল, 'না, রাজপুত্রের এখন কিছুতেই জল খাওয়া চলবে না। জল পড়ে তোমার অত সুন্দর পোশাক নষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া এখন দাঁড়াবার মতো সময়ও নেই।'

রাজঅতিথিরা চাকরের এরকম দুঃসাহসে অবাক হয়ে গেলেও রাজপুত্র সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ তখন তা-ই হবে।'—আসলে ছোটোবেলা থেকে ওর কোলেপিঠে চড়ে মানুষ হয়েছে বলে রাজপুত্র সবসময় ওকে মেনে চলত।

আর-একটু এগোতেই এক আঙুরখেত পড়ল। একদম পথের পাশেই একটা গাছে ঝুলে আছে একথোকা লোভনীয় আঙুর, দেখেই রাজপুত্র বলে উঠল, 'বাঃ কী সুন্দর আঙুর! অ্যাই কে আছ—ওই আঙুরের থোকাটা পেড়ে নিয়ে এসো তো!'

'না এখন নয়।'—বুড়োচাকর আবার বলে উঠল, 'আঙুরের রস লেগে জামাকাপড় একদম খারাপ হয়ে যাবে। আর আমাদের হাতে একদম সময়ও নেই।'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে এবারও রাজপুত্র বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ। আঙুর পরেই খাওয়া যাবে।'

একটু পরেই বিয়ের শোভাযাত্রা মন্দিরে পৌঁছোল। প্রথম সিঁড়িতে একটা চালের বস্তা রাখা হল। তার ওপরে পা দিয়ে রাজপুত্রকে মন্দিরে উঠতে হবে। কিন্তু রাজপুত্র পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বুড়োচাকর দৌড়ে এসে এমন এক ধাক্কা দিল যে রাজপুত্রের পা বস্তার ওপর পড়লই না। এমন অশুভ ঘটনায় অন্যান্য সবাই রেগে একেবারে আগুন। বারবার চাকরের এরকম দুঃসাহসে অবাক হয়ে সবাই এক-এক রকম মন্তব্য করতে লাগল। এবার এর একটা বিহিত হওয়া উচিত। কিন্তু রাজপুত্র সঙ্গে সঙ্গে ওকে ক্ষমা করে দিয়ে বলল, 'না, না আজকের দিনে ওকে কেউ কিছু বোলো না। সেই ছোটোবেলা থেকে আমি বলতে গেলে ওর কাছেই মানুষ। সবরকম বিপদে-আপদে আমাকে আগলে রেখেছে। যতই হোক, এখন ওর বয়েসও হয়েছে। ওর সব দোষ ধরলে চলবে কেন?'

এসব গোলমালে চালের বস্তার কথা কারো আর মনেই রইল না। বিয়ের বাকি অনুষ্ঠান কোনোরকম গণ্ডগোল ছাড়া বেশ ভালোভাবেই মিটে গেল।

রাতে সব অতিথি বিদায় নেবার পর রাজপুত্র আর নতুন বউকে ফুল দিয়ে সাজানো একটা সুন্দর ঘরে শুতে পাঠানো হল। কিন্তু ওরা যেই ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকতে যাবে কোত্থেকে বুড়োচাকর এসে ওদেরকে ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ল। ওর হাতে একটা খোলা তলোয়ার। সেটা দিয়ে বিছানার ওপর কোপের-পর-কোপ মারতে লাগল।

রাজপুত্র এবার একটু রেগে গিয়েই বলল, 'তুমি কী শুরু করেছ বলো তো! আজ সকাল থেকে তোমায় অনেকবার ক্ষমা করে দিয়েছি। কিন্তু তোমার ব্যাপারস্যাপার আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার হল কী!'

কোনো কথা না-বলে ও বিছানার চাদরটা একটানে সরিয়ে দিতেই দেখা গেল একটা বড়ো কালো সাপ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে।

বুড়ো চাকর তারপর রাজপুত্রকে সব কথা খুলে বলল।

আরও বলল, 'ওরা তোমার ওপর কেন খেপে গিয়েছিল জানো তো? তুমি ওই গল্পগুলো কাউকে না-বলে ওদেরকে বন্দি করে রেখেছিলে। গল্প হল বলার জন্য। গল্প এভাবেই বেঁচে থাকে। আর কাউকে না-বলে খালি নিজের কাছেই লুকিয়ে রাখলে এ দশাই হয়।'

ছবি। সুব্রত মাজী



রাজার বিড়াল

দক্ষিণারঞ্জন বসু

রাজমহিষী নয়, রাজদরবার নয়, এমনকি রাজ্যের কল্যাণ চিন্তারও সময় নেই রাজার। সব রকমের চিন্তা-ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে ধবধবে সাদা বিড়ালটিকে নিয়ে দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই লে রাজার পরম আনন্দ। এ ভাবেই দিনের পর দিন কেটে আসছে তাঁর। এ নিয়ে রাজ্যময় ফিসফিস শুরু হয়ে গেছে এবং রাজার এই ঔদাসীন্যের ফলে রাজকার্যে যে একটা অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে সে কথা জানাজানি হতেও আর বাকি নেই।

না, এমনি ধারা আর চলতে পারে না। একটা বিড়ালের জন্যে একটা গোটা দেশ শেষ পর্যন্ত একেবারে গোল্লায় যাবে, তা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। —রাজ-বয়স্য ত্রাঙ কুইন মনে মনে সংকল্প করেন এর একটা বিহিত করার জন্যে।

বিড়ালটাকে যেমন করেই হোক সরিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু রাজপ্রাসাদের হাজার পাহারাদারের চোখ এড়িয়ে কী করে রাজার বিড়ালকে সরানো, সেই হল আসল চিন্তা। তবে ত্রাঙ কুইনের অসাধ্য কোনও কাজ থাকতে পারে পনেরো শতকে লে রাজার রাজত্বকালে কেউ তা বিশ্বাসই করত না। প্রাসাদ-পাহারাদারদের কয়েকজনকে হাত করে নিয়ে বিড়ালটাকে



কোন অবসরে যে ত্রাঙ বার করে নিয়ে গেছেন তার বিন্দুবিসর্গও টের পাননি লে রাজা বা তাঁর কোনো লোকজন।

পরদিন ভোর হতেই রাজ-বিড়াল চুরির কাহিনি নিয়ে সারা রাজধানী জুড়ে নানা রকমের জল্পনা-কল্পনা। সকলের মুখেই প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন —কার ঘাড়ে কটা মাথা যে প্রাসাদ থেকে রাজার বিড়ালটাকে এমনি বেমালুম সরিয়ে ফেলে চুপ করে থাকতে পারে।

এদিকে প্রিয় বিড়ালটিকে হারিয়ে দুঃখে বেদনায় একেবারে ভেঙে পড়েছেন লে রাজা। তাঁর এ অবস্থা দেখে রাজকর্মচারীদেরও দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেছে প্রথম থেকেই। রাজা নিজেও তাঁর অতি বিশ্বস্ত লোকজনদের এদিক ওদিক পাঠিয়ে দিয়েছেন, যেখান থেকে হোক যেমন করে হোক বিড়ালটিকে খুঁজে বার করে আনবার জন্যে।

কিন্তু সকলের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় কথাবার্তা বলাও বন্ধ করে দিয়েছেন লে।

রাজ-বয়স্য ত্রাঙ কুইন দেখলেন এও তো আর এক বিপদ। রাজ্য-শাসনে তো আরও বেশি বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে রাজা যদি এমনি নির্বাক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন।

এ অবস্থারও যা হোক করে একটা প্রতিকার করতেই হবে। এ সম্বন্ধে নানা উপায়ের কথাই ভেবে চলেছেন ত্রাঙ কুইন। এদিকে রাজার বিড়ালকে নিজের বাড়িতে নিয়ে লুকিয়ে রেখে তার খাবার অভ্যাসটাকে পুরোপুরি পালটে দিয়েছেন তিনি—আমিষভোজী বিড়ালটাকে একদম নিরামিষাশী করে ফেলেছেন।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে যায় ত্রাঙ কুইনের মাথায়। কথায় কথায় রাজার কাছে তিনি একটি প্রস্তাব পেশ করেন। বলেন, যা হবার তো হয়েছেই। তবু বিড়ালটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে। তবে যতদিন না তাকে পাওয়া যাচ্ছে ততদিন এমন সব কাজে রাজা-মশাইকে মনোনিবেশ করতে হবে যাতে তাঁর প্রিয় বিড়ালটির হারানোর কথা মোটেই তাঁর মনে না পড়তে পারে।

লে রাজা বললেন, রাজকার্য ছাড়া রাজার আর কী কাজই থাকতে পারে!

হ্যাঁ, সেসব কাজেই এখন আপনাকে খুব বেশি করে মন দিতে হবে। তাতেই আপনার সব দুঃখ আপনি ভুলে থাকতে পারবেন। —ত্রাঙ কুইন সুযোগ বুঝেই এ উত্তর দেন।

কিন্তু কাজে ডুবে থাকলেই কি দুঃখ ভুলে থাকা যাবে ত্রাঙ? —দুঃখ-কাতর কণ্ঠেই প্রশ্ন তোলেন রাজা।

পুরোপুরি ভুলতে না পারলেও তাতে যে অনেকটা শান্তি পাবেন সে কথা জোর করেই বলতে পারি, রাজামশাই। তাছাড়া আপনি যদি অনুমতি করেন তা হলে আজই রাজ্যের সব গণককে ডেকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। তারা গুনে-বেছে বিড়ালটার যদি একটা হদিস করতে পারে তো কথাই নেই, আর না পারলেও আপনি তো নিজের মনকে এই বলে প্রবোধ দিতে পারবেন যে, আপনার হারানো বিড়ালটিকে খুঁজে বার করার জন্য কোনোরকম চেষ্টারই আপনি ত্রুটি করেননি।

বেশ বেশ, সে-ই ভালো। তাই করুন তা হলে। — ত্রাঙ কুইনের প্রস্তাবে খুশি হয়েই সম্মতি দেন লে রাজা।

দিনের পর দিন রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে দলে দলে সব গণকরা আসতে থাকেন রাজধানীতে। বিড়ালের সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে এক এক করে তাঁরা বিদায় নিয়েও যান রাজধানী থেকে।

এদিকে কয়দিন ধরে রাজা স্বয়ং শাসনকার্যে মনোনিবেশ করায় রাজ্যে বেশ শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। নানাদিক থেকেই ভালো ভালো সব খবর আসছে রাজার কানে। লে'র আনন্দের সীমা নেই তাতে।

তবে রাজদরবারে সব চেয়ে আনন্দের খবর নিয়ে আসেন সেই বৃদ্ধ গণক যাকে রাজা একবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন তাঁর ভুল গণনার জন্যে। ত্রাঙ কুইনই তাঁকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাজার কাছে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে দেখামাত্রই চমকে উঠেছেন লে রাজা।

আপনি হঠাৎ রাজদরবারে!

নিজের জন্যে কোনো প্রার্থনা নিয়ে আসিনি, রাজামশাই! কাল রাতে স্বপ্নে আপনার প্রিয় বিড়ালটির সন্ধান পেলাম। সে খবরই আপনাকে জানাবার জন্যে ছুটে এসেছি। প্রাসাদে কি আর সহজে আসবার জো আছে, রাজামশাই? বিড়ালের কথা অনেক করে বুঝিয়ে বলায় আপনার পাইক-বরকন্দাজরা আমায় পথ ছেড়ে দিয়েছে।

বেশ কথা, এবার বলুন কোথায় আমার বিড়াল। — রাজা আর কথা বাড়াতে না দিয়ে সরাসরি তাঁর বিড়ালের সন্ধানই পেতে চান।

কিন্তু বৃদ্ধ গণকের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব। তিনি আসল কথা বলবার আগে একবার তাকান রাজার দিকে আবার পরক্ষণেই চোখ ফিরিয়ে নেন ত্রাঙ কুইনের দিকে। দরবারে রাজার পাশেই যে রাজ-বয়স্য ত্রাঙ কুইন এবং তাঁর সম্পর্কেই তো গণৎকারের যা কিছু বক্তব্য! যাই হোক, দু-একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে সংকোচ কাটিয়ে ওঠার ভাব দেখিয়ে বৃদ্ধ বলতে শুরু করলেন তাঁর কথা।

শুনুন তাহলে রাজামশাই। কথাটা অপ্রীতিকর। তা হলেও রাজার স্বার্থের বিষয় বলেই আমি অসংকোচে সব বলছি। আপনার বিড়ালটি আপনার বয়স্য ত্রাঙ কুইনের বাড়িতে বেশ বহাল তবিয়তে আছে, তার জন্যে আপনার কোনোই চিন্তার কারণ নেই। এ আমার স্বপ্নের কথা বলে যদি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে না হয় তা হলে হুজুর নিজে একবার যথাস্থানে গিয়ে আমার কথা যাচাই করে আসতে পারেন।

আমার বাড়িতে রাজার বিড়াল? সে আবার কী কথা! —লাফিয়ে উঠে প্রতিবাদ জানান ত্রাঙ কুইন। মিথ্যা গণনার জন্যে দণ্ডপ্রাপ্ত বৃদ্ধ গণৎকার রাজাকে খুশি করবার উদ্দেশ্যে আবার মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন এবং এ জন্যে তাঁর কঠোরতম সাজা হওয়া উচিত,—রেগে মেগে ত্রাঙ কুইন এ নিবেদনই করেন রাজদরবারে।

বেশ তো, এ নিয়ে রাগারাগির কোনো দরকার নেই! আপনার বাড়িতে কোনো বিড়াল আছে কি না আগে তাই বলুন।

হ্যাঁ আছে, একটি মাত্র বিড়াল আছে আমার বাড়িতে। — উত্তর দেন ত্রাঙ কুইন।

সেই বিড়ালটিকে এখনই এনে উপস্থিত করা হোক এই দরবারে। — রাজাদেশ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাইক-পেয়াদা বেরিয়ে যায় সে আদেশ পালনে। কোথাও মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাঁরা বিড়ালটিকে নিয়ে আসে ত্রাঙ কুইনের বাড়ি থেকে আর লে রাজাও অমনি আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন, পেয়েছি, অ্যাদ্দিন পর আমি আবার আমার বিড়ালকে ফিরে পেয়েছি। — বলেই আপন গলা থেকে এক ছড়া মুক্তোর মালা খুলে নিয়ে পুরস্কৃত করেন বৃদ্ধ গণৎকারকে।

এ হল আপনার চোখের ভুল রাজামশাই। দরিদ্র গণককে আপনি প্রচুর পুরস্কার দিয়েছেন সে বিষয়ে আমার বলার কিছু নেই। দীন-দুঃখীর দুর্দশা মোচনই তো রাজার প্রধান কাজ। কিন্তু যে কারণে এই পুরস্কার সে কারণটাই যে মিথ্যে। আমার সাদা ধবধবে বিড়ালটিকে

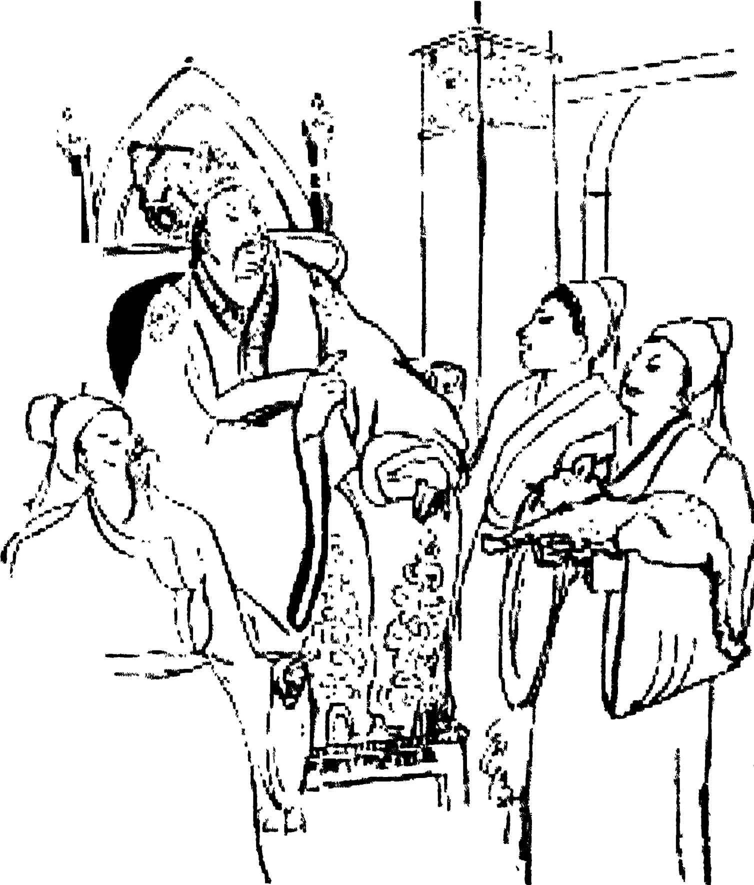
দেখামাত্রই আপনার মনে হয়েছে ওটি আপনার বিড়াল। কিন্তু তা যে ঠিক নয়, তা প্রমাণ করতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে না যদি আপনার কোনো অমত না থাকে।

বেশ, করুন প্রমাণ। কী করতে চান বলুন? — লে রাজা দ্বিধাহীন চিত্তেই আহ্বান জানান তাঁর বয়স্যকে। এ যে তাঁরই বিড়াল সে বিষয়ে যে রাজার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আপনি রাজা, আপনারই দরবারে এতগুলো লোকের সামনে আপনার ভুল ধরা পড়বে সে জন্যেই একটু সংকোচ বোধ করছি, রাজামশাই।

এসব ভণিতা রাখুন এখন। আমার বিড়াল আমি দেখেই চিনতে পেরেছি। আপনি বলছেন এ বিড়াল আমার নয়, আপনার। তা যদি প্রমাণিত হয় তা হলে আপনার বিড়াল আপনি নিয়ে নেবেন, তাতে আমার লজ্জারও কিছু নেই, আপত্তিরও কিছু থাকবে না।

তাই হোক তা হলে। —এই বলে ত্রাঙ কুইন উঠে দাঁড়ান আসন থেকে এবং রাজদরবারে



তাঁর বক্তব্য নিবেদন করেন। তিনি বলেন—রাজার বিড়াল মাছ-মাংস খেয়ে বড়ো হয়েছে তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না।

ঠিক ঠিক! এ একেবারে নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। ....দরবারের মধ্য থেকে কে একজন চেঁচিয়ে বলে ওঠেন। রাজাও ঘাড় নেড়ে সায় দেন সে কথায়।

আমি গরিব মানুষ। মাছ-মাংসের ধার ধারি না, নিরামিষভোজী। আমার বিড়ালও নিরামিষ খেতেই অভ্যস্ত। মাছ-মাংসের ধারে-পাশেও সে হাঁটে না। সেটাই পরীক্ষা করে দেখা হোক। তা হলেই এ কার বিড়াল প্রমাণ হয়ে যাবে। — এটুকু বলেই ত্রাঙ কুইন পুনরায় তাঁর আসন গ্রহণ করেন, কিন্তু তখনও পর্যন্ত লে রাজা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত এই ভেবে যে এ বিড়াল তাঁর না হয়েই পারে না।

যাই হোক ত্রাঙ কুইনের ইচ্ছানুসারে পরীক্ষার সব ব্যবস্থা হল। রাজাদেশে দরবারেরই একধারে এক বাটি মাংস-ভাত এবং তারই অদূরে আর একটি বাটিতে করে তরকারি-ভাত সাজিয়ে রাখা হল। তারপর বিড়ালটিকে এনে ছেড়ে দেওয়া হল ওই দুটি খাবারের বাটির ঠিক মাঝখানে।

আশ্চর্যের কথা বিড়ালটি মাংস-ভাতের বাটির দিকে একটিবারও না তাকিয়ে সোজাসুজি অপর বাটিটির কাছে গিয়ে নিঃশেষে সমস্ত তরকারি-মাখা ভাতটা খেয়ে নিয়ে পরম আনন্দে নিজের পা চাটতে লাগল।

রাজা দরবার ভেঙে দিলেন। তাঁর আর বলার কিছুই নেই।

এরপর থেকে লে রাজা তাঁর বিড়ালের কথা আর মনেই আনতেন না। রাজ্যশাসনের কাজ সেই থেকে তাঁকে নেশার মতো পেয়ে বসল।

ছবি। মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়



হাতি আর বাঘ

সুধীর করণ

এক হাতি আর এক বাঘের খুব বন্ধুত্ব ছিল। দুজনেই গভীর বনের মধ্যে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াত। ঘুরতে ঘুরতে একদিন এক বানরকে দেখতে পেল ওরা। যে-সে বানর নয়, চশমাধারী বানর। ওর চোখের চারদিকে ঘন কালো গোলাকার দাগ, দেখতে ঠিক চশমার মতো। আর লেজটা তো হাত চারেক লম্বা। এক বড়ো আর ঝাঁকড়া গাছের ডালে বসে এদিক ওদিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছিল সে।

হাতি বলল, 'বন্ধু, ওই দেখ বাঁদর বসে আছে। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চেঁচিয়ে বনের শান্তি নষ্ট করতে ওস্তাদ। একটা বাজি রেখে মজা করা যাক্, এসো। আমি যদি ওকে গাছ থেকে ফেলতে পারি তা হলে আমি তোমাকে খাব, আর তুমি যদি পার, তুমি আমাকে খাবে। কেমন রাজি তো?

বাঘ তো অবাক। হাতি আবার বাঘের মাংস খায় নাকি? বাঘই তো হাতির মাংস ভালোবাসে। নেহাত বন্ধু বলেই হাতিকে কিছু বলে না; নইলে—

যাই হোক, বাঘ বলল, 'খুব রাজি আমি।'

হাতি বলল, 'বেশ; তা হলে আমিই চেষ্টা করি।'

বাঘ বলল 'হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিই করো।'

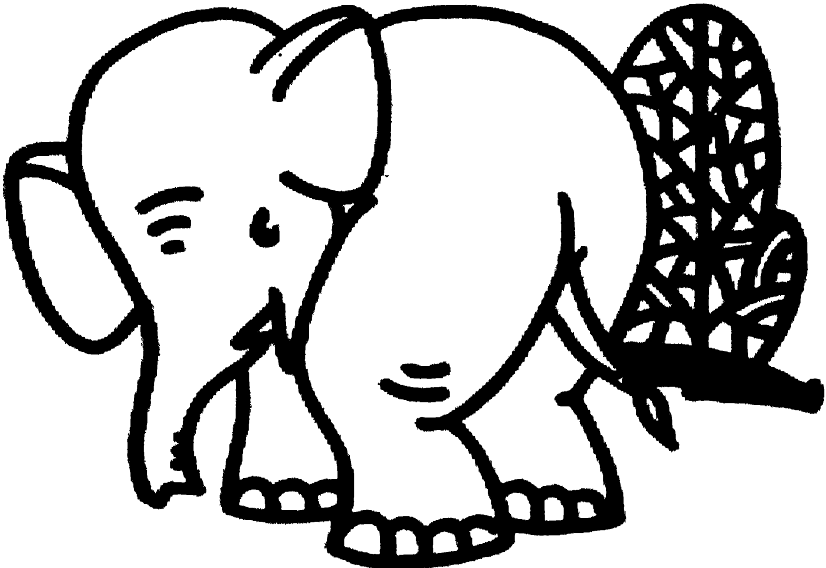
হাতি তখন এমন এক ডাক ছাড়ল যে সারা বন থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠল। বনের অন্য প্রাণীরা যে যেদিকে পারল ঝোপে ঝাড়ে আশ্রয় নিল। আর চশমাধারী বানর গাছ থেকে পড়তে পড়তে আর একটা ডাল ধরে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু ভয়ে এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। হাতি যত ডাক ছাড়ে, বাঁদর তত গাছময় লাফালাফি করতে থাকে। ওকে কিছুতেই গাছ থেকে ফেলতে না পেরে হাতি তো চুপসে গেল প্রায়।

বাঘ বলল, 'ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন বন্ধু, আর একবার চেষ্টা করে দেখো; কপাল ফিরতেও পারে।'

হাতি বলল, 'না ভাই, বৃথা চেষ্টা করে লাভ নেই। এ-বারে তোমার পালা। ওকে তুমি ফেলতে পারলে তুমিই আমাকে খেয়ো।'

গাছের দিকে লাফ মারবার মতো ভঙ্গি করে বাঘ বলল, 'হুউম্‌।' তারপর সে হুউম্‌ শব্দটা এত জোরে এবং এতক্ষণ ধরে গুম্‌ গুম্‌ করতে লাগল যে গাছের পাতাগুলোও ভয় পেয়ে খসে খসে পড়ে আর কী। বাঁদরের হাত পা অসাড় হয়ে গেল সেই শব্দ শুনে। সে গাছের ডাল ধরে রাখতে পারল না। পাকা ফলটির মতো যেন বোঁটা থেকে খসে পড়ল—ঝুপ করে একেবারে বাঘের পায়ের তলায়।

বাঘ বলল, 'তা হলে বন্ধু, এ বারে তো তোমাকে খেতেই হচ্ছে। বাজি যখন হেরেছ, আর বাজির কথাটা তুমিই যখন প্রথম তুলেছিল, তখন—'



হাতি বলল, 'তা ভাই হেরেছি যখন বাজিতে তখন তো তোমাকে আর না বলতে পারি না।' তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তবে ভাই যদি দিন সাতেক সময় দাও তা হলে গিন্নি আর ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে আসি।'

বাঘ বলল, 'ঠিক আছে। সাতদিনের সময় তোমাকে দিচ্ছি।'

হাতি হাপুস হুপুস করে কাঁদতে কাঁদতে আর আর্তনাদ করতে করতে বাড়ি চলে গেল।

হাতি-গিন্নি আর তার ছেলেমেয়েরা দূর থেকেই কান্নার শব্দ শুনতে পেল। বলল, 'কী হল রে কর্তার? কর্তার কান্না বলে মনে হয় না?'

বাচ্চারা কান পেতে শুনল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, এ তো বাবারই গলা। হল কী?'

দেখতে দেখতে হাতিও হাজির হল। ওরা সবাই ঘিরে ধরল ওকে। গিন্নি বলে, 'হ্যাঁ গো, কী হল তোমার? কাঁদছ কেন? মাথা খাও—ওগো, তাড়াতাড়ি বলে ফেল না।'

বাচ্চারা বলল, 'কী হল বাবা? কেউ মেরেছে?'

হাতি তো কান্নায় আরো ভেঙে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল সব কথা। বলে আর কাঁদে।

ওরা শুনে আরো কাঁদে।

সাতদিন সাতরাত ধরে বাড়িশুদ্ধু সবাই শুধু কাঁদছে তো কাঁদছেই। আহার নিদ্রা সব বন্ধ।

বনের মুষিক-হরিণ শুনতে পেল বোকা হাতির এই বিপদের কথা। কিন্তু বোকা হোক সোকা হোক বিপদে যখন পড়েছে তখন তো তাকে উদ্ধার করতেই হয়। বনের সকলের আপদ-বিপদের বন্ধু এই মুষিক-হরিণ, — সে-কথা কে না জানে।

হোক না চেহারাটা ছোট্ট মুখটা ইঁদুরের মতো, ছোট ছোট কান। সামনের পা দুটো যদিও বা হরিণের মতো, পেছনের পা দুটো আবার আলাদা রকমের। দাঁত তো বেশ ধারালো। কিন্তু চোখ দুটো ভারী সুন্দর। ফলে সেই ছোট্ট প্রাণীটিকে দেখলেই মায়া পড়ে যায়, ভালো লেগে যায়। বনের সবাই ওকে বনের মন্ত্রীমশাই বলে ডাকে। মন্ত্রণা দিতে, বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হলে, ডাকো মূষিক-হরিণকে। কোনো বিপদই ওর বুদ্ধির কাছে কিছু নয়। বনের রাজা বাঘ আর জলের কুমিরকে তো নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দেয় বনমন্ত্রী। এই বনমন্ত্রী নিজেই হাজির হল হাতির কাছে। বলল, 'কী হয়েছে হাতিভাই? এমনতর কান্না তো কোনও দিন শুনিনি আমি। বন যে ভেঙে যাচ্ছে একেবারে।'

হাতি বলল, 'শুধু শুধু কী কেউ কাঁদে ভাই। প্রাণের দায়ে কাঁদছি।'

হরিণ বলল, 'ব্যাপারটা না হয় খুলেই বলো।'

হাতি নাকের জল চোখের জল ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'বলছি ভাই, বলছি সব কথা।' বলে— আগাগোড়া সব কাহিনি খুলে বলল।

হরিণ বলল 'হুম। ব্যাপারটা সত্যি গুরুতর।'

হাতি বলল, 'তোমার দাসানুদাস হয়ে থাকব ভাই—বাড়িশুদ্ধ সবাই তোমার চাকর হয়ে থাকব, বংশানুক্রমে আমরা তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকব, — যদি বাঁচিয়ে দিতে পার।' বলেই

হাতি আবার কাঁদতে লাগল।

হরিণ বলল, 'ঠিক আছে, চুপ করো একটু। বরং যা বলি তাই করো। এক ভাঁড় খেজুর গুড় নিয়ে এসো। বেশ পাতলা থাকে যেন।'

হাতি আর কোনো কথা না বলে ছুটল বন পেরিয়ে গাঁয়ের দিকে। গিয়ে এক গুড়ওয়ালার বাড়িতে ঢুকে পড়ল। গুড়ওয়ালা প্রাণের ভয়ে পড়ি কি মরি কোথায় পালিয়ে গেল।

এক ভাঁড় গুড় শুঁড়ে তুলে নিয়ে এল হাতি।

হরিণ বলল, 'বাঃ, এনে ফেলেছ দেখছি। কবে তোমার মেয়াদ শেষ হচ্ছে?'

হাতি বলল, 'কাল।'

হরিণ বলল, 'বেশ, কাল সকালেই আসব আবার। তোমার সঙ্গে আমিও যাব।'

পরের দিন সকালে হরিণ লাফাতে লাফাতে এসে হাজির। এসে বলল, 'এবারে ওই গুড়ের ভাঁড়টা পিঠের ওপর ঢেলে দাও দেখি।'

হাতি সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করল। তার গা-ময় লাল চিটচিটে, পাতলা খেজুর গুড়—ধারা বেয়ে নামতে লাগল। পিঠ থেকে, দুপাশ বেয়ে পেটের দিকে—যেন রক্তের ধারা।

হরিণ বলল, 'আমি তোমার পিঠের উপর বসে ওই গুড় চাটতে থাকব। যখনই মুখ ঠেকাব, তখনই এমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠবে যেন তোমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে ব্যথায়। বুঝতে পারছ, —খুব জোরে একেবারে মরণ যাতনা পাচ্ছ যেন, তেমনি ভাব দেখাবে।'

হাতি মাথা নেড়ে বলল. 'বুঝতে পেরেছি।'

হরিণ ওর পিঠে লাফিয়ে উঠে বসল, 'চলো এবারে বাঘের কাছে।'

তারপর সারা পথ ধরে হাতির সে কী আর্তনাদ। সামনের দু'পা তুলে, শুঁড় আকাশের দিকে তুলে বিরাট দুটো গজদন্ত সামনে বর্শার মতো উন্মুখ করে গা ঝাড়া দিয়ে সে যেন হরিণকে ফেলে দিতে চাইল আর কী, আর ওই অবস্থাতেই বাঘের কাছে হাজির হল।

বাঘকে একটু দূর থেকে দেখেই হরিণ চেঁচিয়ে উঠল, 'না—। এই বেঢপ হাতির রক্তমাংস দিন দিন আর কত খাওয়া যায়। —যদি এই নাদুসনুদুস মোটকা হোঁত্কা বাঘটাকে একবার ধরতে পারি, তা হলে মনের সুখে ভোজনটি সেরে নিই।'

যেই না শোনা, বাঘ আর দাঁড়াবার সাহস পর্যন্ত পেল না, প্রাণপণে দৌড়ে পালাতে লাগল। পথে কালামুখো এক বাঁদরের সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'বলি—এমন হাঁপাচ্ছ কেন? জিভ যে ঝুলে পড়েছে একেবারে ; কী হল কী? —এত চ্যাঁচামেচি হচ্ছে কীসের ?'

বাঘ বলল, 'ওঃ—খুব বেঁচে গেছি। —আমার বন্ধু হাতিকে একটা কী যেন খুবলে খুবলে খাচ্ছে, ওঃ পিঠ থেকে গলগল করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। হাতি বেচারা বাঁচবার জন্য চ্যাঁচাচ্ছে—শুধু কী তাই—যেই আমাকে দেখা, সেই বিদঘুটে জীবটা বলছে, —হাতি খেয়ে অরুচি ধরে গেল, পাই যদি বাঘটাকে, তা হলে মনের সুখে খাই। ওরে বাবা—'

কালামুখো বলল, 'কী প্রাণী ওটা?'

বাঘ বলল, 'কী জানি বাবা, আমি জানি না।'

কালামুখো কিছুক্ষণ ভাবল নিজের মতো করে। বলল, 'আমাদের বনমন্ত্রী নয় তো?'

বাঘ বলল, 'দূর দূর, ওকে আমি ভয় করি নাকি? তা ছাড়া বাঘের মাংস আবার হরিণে খায় কবে?'

কালামুখো বলল, 'চলো আমার সঙ্গে, ভালো করে একবার পরখ করে দেখা যাক।'

দুজনেই চলল। কালামুখো উৎসাহের আতিশয্যে হন্‌হন্ করে এগিয়ে গেল, বাঘ ভয়ে ভয়ে ওর পেছন পেছন—বরং একটু তফাত্ রেখেই চলতে লাগল।

ওদের দেখে, হাতির পিঠ থেকে হরিণ চেঁচিয়ে উঠল, 'এসো এসো কালামুখো দাদা। কিন্তু লোকটা তো সুবিধের নও তুমি। কথা দিয়ে গেলে, —দুটো বাঘকে যে-কোনো উপায়ে হোক ধরে আনবে, কিন্তু এখন দেখছি একটাব বেশি আনতেই পারনি। ও এক-আধটা বাঘ আমি চাই না।'

শুনে বাঘ আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে আবার ছুট—খানাখন্দ ডিঙিয়ে-ঝোপঝাড় মাড়িয়ে। যেতে যেতে বলে গেল, 'কালামুখোকে বিশ্বাস করে প্রাণটা গিয়েছিল আর কী। ইশ্—কেমন ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে একেবারে ধরিয়ে দিতে গিয়েছিল। ভাগ্যি ভালো যে একটা দেখে ওই বিদঘুটে আমাকে ছেড়ে দিল, দুটি থাকলে নেহাত প্রাণটি যেত।' একটু চেঁচিয়ে বলল, 'তবে মনে রেখো কালামুখো, আজ থেকে তোমার সঙ্গে চিরদিনের বিবাদ ; মাটিতে যেখানেই পাব তোমাকে—তোমার মুন্ডু চিবিয়ে খাব। আমাকে ঠকানোর ফল তুমি পাবে—পাবে—পাবে।'

বলে বাঘ উধাও। কালামুখোও এক লাফে গাছের মগডালে। আর হাতির পিঠে চেপে হরিণ চলল—হাতি-গিন্নির কাছে। —বাহবা নিতে।

ছবি। শঙ্কর বসাক



জিয়ন লতা

দীননাথ সেন

লতাটাকে প্রথম পায় এক বাঘিনি।
লতাটার নাম কী ? নাম কী ?
জিয়ন লতা।

লতাটা কোথায়? কোথায়?

পাহাড়ের গায়ে বনে।

কোন্ পাহাড়?

টনকিন পাহাড়।

এই পাহাড়ের কোলে আছে ইউনি গাঁ। ভারী সুন্দর। ছবির মতো। উঁচু উঁচু গাছের সারি। সবুজ ঘাসে ভরা। চুয়ো এই গাঁয়েরই এক বুড়ির ছেলে। গরিব বুড়ি। ছেলেটি ছাড়া বুড়ির আর কেউ নেই।

তুই কী ছেলে বল তো বাবা। দেখছিস আমি বুড়ি হয়েছি। কাজকর্ম করতে পারছি না। সবার ছেলেরা কাজ করে। রোজগার করে মা-বাবাকে খাওয়ায়। আর তুই? কোনো কাজ করার নাম নেই। সারাদিন কুঁড়েমি করে কাটাস। আমি আর কত পারি বল্?

বললে কী হবে। চুয়ো চুপচাপ। বসেই থাকে শুধু।

যা না বাছা। কিছু একটা দেখ্ না।

চুয়ো জবাব দেয় না।

কুঁড়ের বাদশা চুয়ো একেবারেই যে কিছু করে না, তা নয়।

সে বনেবনে ঘোরে।

সে ঝোপ থেকে খরগোশ ধরে।

সে তির ছুড়ে পাখি শিকার করে।

এই চুয়ো একদিন বনের পথে যাচ্ছে। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। পায়ে পায়ে অনেক দূর চলে এল। গভীর বন। চুয়ো থামে না, এগিয়ে যায়।

চুয়ো বনের পথে।

মাথার উপর সূর্য মাঝ-আকাশে। ঠা ঠা রোদ। ঘেমেনেয়ে একসা হয় চুয়ো। ভারী পিপাসা পেল তার।

ওই যে সামনে ঝরনা। চুয়ো আঁজলা ভরে জল খায়।

আঃ। প্রাণটা জুড়োল।

আরে! ওটা কী? বেড়াল নাকি?

হ্যাঁ। বেড়ালই তো। বেড়ালটাও জল খাচ্ছে।

চুয়ো ওর কাছে যায়।

কী সুন্দর বেড়ালটা। সারা গায়ে ডোরাকাটা। নরম নরম লোম। তুলতুলে। এমন বেড়াল চুয়ো কখনও দেখেনি আর। চুকচুক করে জল খাচ্ছে। বুনো বেড়ালই হবে।

চুয়ো মনে মনে ভাবে—একে বাড়ি নিয়ে যাই যদি? যাবে তো? চুয়ো পা টিপে টিপে বেড়ালটার কাছে যায়। তার গায়েপিঠে হাত বুলিয়ে দেয়।

বেড়ালটা ছুটে পালাল না। তাকে দেখে কুঁইকুঁই করে উঠল। চুয়ো বেড়ালটাকে আদর করে কোলে তুলে নেয়।

এমন সময়—

হালুম! হালুম!

চুয়ো চমকে উঠে সামনের ঘন ঝোপটার দিকে তাকায়। লম্বা লম্বা ঘাসগুলো নড়ে ওঠে। তারপর বেরিয়ে এল একটা বাঘ। বাঘ আর তার একটা বাচ্চা। বাচ্চাটা দেখতে চুয়োর কোলের বেড়ালটার মতো।

সর্বনাশ। তবে তো এটা বেড়ালের বাচ্চা নয়, এ যে বাঘের বাচ্চা। ভীষণ ঘাবড়ে যায় চুয়ো। সে কি তবে একটা বাঘের ছানা কোলে তুলে নিয়েছে? এক্ষুনি হয়তো বাঘটা লাফিয়ে দেবে ঘাড় মটকে তার। তাহলে চুয়ো কী করবে এখন ?

বাচ্চাটা খুব জোরে ছুড়ে ফেলে দিল সে।

তারপর কী হল?

বাচ্চাটা মরে গেল?

মরে তো যাবেই জানা কথা।

চুয়ো আর এদিক ওদিক তাকায় না। ছুটে গিয়ে একটা উঁচু গাছের মগডালের উপর চড়ে বসল।

সারা গা তার ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। প্রাণপণে ডাল আঁকড়ে ধরে সে।

তারপর কাঁপুনি একটু থামলে নীচের দিকে সাহস করে তাকাল চুয়ো। যা ভেবেছে তাই। বাচ্চাটা গিয়ে পড়েছে একটা পাথরের উপর। পাথরে ঠুকে গিয়ে মাথাটা চৌচির। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বাচ্চার কচি শরীরটা কাঁপছে। একসময় কাঁপুনি থামল। বাচ্চাটা মরে গেল যে।

বুকটা ধড়াস করে উঠল চুয়োর। বাচ্চাটা সে তবে আছড়ে মেরে ফেলল? মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল তার।

ওদিকে বাচ্চার শোকে বাঘিনি দিশেহারা। পাগলের মতো ছটফট করছে। তার হুংকারে সারা বন কাঁপতে থাকে।

সে বাচ্চাটার কাছে গেল। শুঁকে শুঁকে দেখল সারা গা। মুখটা আকাশের দিকে তুলে কী যেন ভাবল।

সে কি চুয়োর দিকে তাকাচ্ছে?

চুয়োকে কি দেখতে পেয়েছে বাঘিনী?

চুয়ো ভেবে কুলকিনারা পায় না। তাহলে তার কী হবে?

চুয়ো এসব কথা ভাবছে আর ওদিকে বাঘিনি ঢুকে গেছে বনে। বাঘিনি কি চলে গেল বাচ্চাকে ছেড়ে?

না। একটু পরে দিল এক লাফ। আবার ফিরে এল। সে মুখ করে নিয়ে এসেছে একটি লতা। মুখ দিয়ে ছিঁড়ছে তার পাতাডাঁটা। দাঁতে কেটে থেঁতো করল সেগুলো। তারপর সেই থেঁতলানো রস মরা বাচ্চাটার সারা গায়ে মাখিয়ে দিতে থাকে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সব দেখতে থাকে চুয়ো। ও কি, বাঘিনিটা এসব কী করছে?

এরপর দারুণ এক কাণ্ড ঘটল।

কী কাণ্ড?

একটু পরে প্রাণ ফিরে এল বাচ্চাটার।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি। বাচ্চাটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। ঠিক একেবারে আগের মতো। চুয়োর চোখ তো ছানাবড়া। ওই তো কিছু লতাপাতার রস। তাতেই একেবারে মরা জীব প্রাণ ফিরে পেল। কী আশ্চর্য। স্বপ্ন দেখছে না তো সে। নাঃ। এ তো স্বপ্ন নয়, সত্যি। বাচ্চাটা মিটমিট করে তাকাচ্ছে। মা বাঘিনির মুখে যেন একগাল হাসি। চুয়োর ডোরাকাটা বেড়ালছানা ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের বুকে। তারপর ধীরে ধীরে ঢুকে যেতে থাকে বনের মধ্যে। বাঘিনি

আগে আগে। বাচ্চা দুটো পেছন পেছন।

চুয়ো তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। অনেকটা সময় কেটে যায়। বাঘিনিকে আর দেখাই গেল না। এবার চুয়ো নেমে আসে। এক পা-এক পা করে এগিয়ে যায় ওই পাথরটার কাছে যেখানে মারা গিয়েছিল সেই বাচ্চাটা।

এখনও পড়ে আছে সেই লতাপাতার টুকরো। চুয়ো হাতে নিয়ে দেখতে থাকে ওগুলো। ভাবল, এগুলো নিয়ে যাই বাড়িতে।

মাটিতে লাগিয়ে দেব। দেখি যদি শেকড় গজায়, নতুন লতা ওঠে। এই ভেবে সে ওগুলো নিয়ে রওনা হল বাড়িমুখো। এত বড়ো বন। পেরোতে গোটা বিকেল লেগে গেল।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় চুয়ো গাঁয়ে এসে পৌঁছোল। সূর্য সবে ডুবছে। আলোর ছটা মিলিয়ে গেছে। তবে আঁধার নামেনি এখনও। দিন শেষ কিন্তু রাত শুরু হয়নি।

চুয়ো হঠাৎ দেখে একটা কুকুর শুয়ে আছে। সে কুকুরটা নেড়েচেড়ে দেখল। নাঃ। মরে পড়ে আছে।

চুয়োর হাতে ধরা আছে লতাটা। লতার দিকে তাকিয়ে চুয়ো ভাবল, দেখাই যাক না।

চুয়ো তারপর কী করল?

চুয়ো তার হাতের লতা থেকে দু-চারটে পাতা ছিঁড়ে নিল। তরপর বেশ করে চটকাল। তারপর রসটা নিয়ে মরা কুকুরটার গায়ে-মাথায় মাখিয়ে দিল বেশ করে।

তারপর? কুকুর বেঁচে উঠল?

হ্যাঁ। আড়মোড়া দিয়ে কুকুরটা চোখ মেলল। তারপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ডেকে উঠল— ঘেউ ঘেউ ঘেউ।

চুয়ো এই অবাক কাণ্ড দেখে চোখ কপালে তুলল। কুকুরটা ল্যাজ নাড়তে নাড়তে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

চুয়ো কুকুরটাকে আদর করছে। এমন সময় কে যেন আড়াল থেকে বলে উঠল।

চুয়ো—

চুয়ো কান খাড়া করে শুনতে থাকে—

চুয়ো, আমি বনদেবতা। মন দিয়ে শোনো আমার কথা। বন থেকে ওই যে লতা তুমি তুলে এনেছ—ওই লতাটির নাম জিয়ন লতা। ওই লতার রসে মরা জীব বেঁচে ওঠে। এমনই গুণ লতাটার। মরা জীবকে বাঁচিয়ে তুলে তোমার অনেক আয় হবে। অভাব ঘুচে যাবে তোমার। মস্তবড়ো ধনী হয়ে যাবে। নামডাক হবে খুব। কিন্তু একটা কথা ভুলবে না। লতাটি মাটিতে পুঁতে রাখবে। দু-বেলা জল দেবে। যত্ন করে লতাটি বাঁচিয়ে রাখবে। জিয়ন লতার গোড়ায় রোজ প্রদীপ জ্বালাবে, ধূপ দেবে। মাছের আঁশটাশ কিছু ফেলবে না লতার উপর। ময়লা আবর্জনা ফেলবে না। যদি কোনোদিন এসব কর তাহলে—

তাহলে কী হবে?

তাহলে লতাটি ডানা মেলে উড়ে যাবে আকাশে। তোমার ঘোর অমঙ্গল হবে। কথাটা অবশ্যই মনে রাখবে, একদিনের জন্যও ভুলবে না।



চুয়ো কান পেতে সব কথা শুনল।

বনদেবতা আবার বলল, আমার কথাগুলো শুনলে তো?

শুনলাম বনদেবতা, শুনে নিলাম।

মনে থাকবে তো সব কথা?

মনে থাকবে বনদেবতা, মনে থাকবে। আপনার কথা আমি মেনে চলব।

চুয়ো বনদেবতার উদ্দেশে কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানাল। তারপর কথাগুলো মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

চুয়োকে দেখে মা বলল, এতক্ষণে এলি বাবা?

এই দেখো মা, কী এনেছি।

এ আবার কী, এ তো দেখছি লতাপাতা। এগুলো আবার কী আনলি?

চুপ করো মা চুপ করো। এগুলো যা তা লতাপাতা নয়। এ লতার সাংঘাতিক গুণ।

অ্যাঁ?

হ্যাঁ, মা। এ হল মরা-জিয়ানো লতা। এ পাতার রসে মরা পশুপাখি বেঁচে ওঠে।

বলিস কী চুয়ো? তোর কি মাথাটা বিগড়ে গেল? মরলে কেউ আর বেঁচে ওঠে নাকি? যা, এগুলো ফেলে দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আয়।

ফেলে দেব? বল কী মা? এ লতা আমাদের কপাল ফিরিয়ে দেবে।

তুই আর বাজে বকিস না বাছা।

বাজে নয় মা, বাজে নয়। দেখবে, তুমি দেখবে।

মায়ের কথায় কান দিল না চুয়ো। মা কী বুঝবে এর? মা কি কোনোদিন দেখেছে এ জিনিস?

চুয়ো উঠোনের কোণটা ভালো করে ঝাঁট দিয়ে নিল। মাটি খুঁড়ে লতাটা পুঁতে দিল। তার চারিদিকে মাটি দিয়ে বেশ করে জল ছিটিয়ে দিল।

চুয়ো এখন থেকে আর বেশি বাইরে যায় না। গেলেও কোথাও বেশি সময় থাকে না। তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। দু-বেলা সে লতাটির গোড়ায় জল দেয়। লতার কাছে আগাছা উঠতে দেয় না। কোনো রকম ময়লা, জঞ্জাল জমতে দেয় না।

জল, আলো, হাওয়া পেয়ে লতাটি বাড়তে থাকে। চুয়ো ওটির দিকে তাকিয়ে থাকে। যাক। লতাটি বেঁচে উঠেছে।

লতাটি বাড়ছে। কিছুদিনের মধ্যে লতাটি কচিকচি পাতায় ভরে গেল।

চুয়োর খালি মনে হয় বনদেবতা আড়াল থেকে সব দেখছে। সে লতার গোড়ায় জল দিচ্ছে কি না, তার যত্ন করছে কি না, সবসময় দেখছে।

লতার কথা জানে চুয়ো আর তার মা। কাউকে বলে না ওরা। একদিন পাড়ার একজনের মোরগ মরে গেল।

অমন নাদুসনুদুস মোরগটা তার মরে গেছে। লোকটি ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে।

চুয়ো যাচ্ছিল সেখান দিয়ে।

কী হয়েছে?

দেখ্ না চুয়ো, আমার সাধের মোরগটা মরে গেল। আহা রে!

দাঁড়াও। তোমার মোরগ বাঁচিয়ে দিচ্ছি।

অ্যাঁ। বলিস কী? মরা মোরগ বাঁচিয়ে দিবি?

দেখোই না।

চুয়ো তার পাতার রস দিয়ে বাঁচিয়ে তুলল মোরগটাকে।

দুদিন পরে দূরে ও পাহাড়ে একজনের গোরু মরল। চুয়ো গিয়ে সেটাকেও বাঁচিয়ে তুলল।

চুয়োর খুব নামডাক হয়ে গেল। অনেক পয়সা আয় করতে লাগল সে।

চুয়ো মরা বাঁচাতে পারে। বিরাট ধনী হয়ে গেছে চুয়ো। এ খবর আর এক গাঁয়ের জমিদারের কানে গিয়ে পৌঁছোল। জমিদার খোঁজখবর নিয়ে জানল খবরটা সত্যি। তারপর একদিন অনেক ধুমধাম করে জমিদারের মেয়ের সঙ্গে চুয়োর বিয়ে হয়ে গেল।

চুয়োর দিনগুলি ভালোই কাটছে। তাদের সুখী সংসার।

কিছুদিন পর চুয়োর মা মারা যায়।

সংসারের সব ভার এখন চুয়োর বউয়ের উপর।

চুয়ো বউকে বলে, দেখো, রোজ তুমি লতাটির গোড়ায় জল দেবে। সাঁঝের বেলায় তার গোড়ায় ধূপদীপ দেবে।

বউ বলে ঠিক আছে।

আর দেখো, কখনও লতার উপর কোনো রকম ময়লা ফেলো না। মাছের আঁশটাঁশ ফেলো না, খবরদার। তাহলে কিন্তু আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। মনে থাকে যেন।

মনে থাকবে।

সেই থেকে চুয়োর বউ লতার যত্ন করে।

রোজ জল দেয়। রোজ সাঁঝে ধূপদীপ জ্বালায়। কখনও গোড়ায় ময়লা ফেলে না। কিন্তু জমিদারের মেয়ে তো। অত কাজ রোজ রোজ ভালো লাগে না তার। সারাদিন সংসারের খাটাখাটুনি। তার উপর আবার লতাটার কাজ।

আমি আর পারিনে বাপু।

না পারলে হবে কী করে। দেখছই তো। সারাদিন এখানে ওখানে ছুটোছুটি করতে হয় আমাকে। আমার তো এখন একফোঁটাও সময় নেই। তুমিও যদি—

সে যা হয় হোকগে।

ছি ছি! ওকথা বোলো না। লতার অযত্ন হলে আমাদের ভীষণ খারাপ হবে।

সে তুমি বোঝো।

দেখো বউ, ভালো হবে না বলছি।

বউ মুখে কিছু বলল না। তবে মুখ ভার করে থাকল। নিজের মনে গজগজ করতে থাকে। আমার হয়েছে যত জ্বালা।

রাঁধোবাড়ো। কাপড় কাচো। ধোয়ামোছা করো। এটা করো সেটা করো। আমাকে পেয়েছ কী। আমি দাসী না বাঁদি?

তারপর নিজেই বলে, দেখো, একদিন ময়লাটয়লা সব ফেলব ওই লতার উপর। শুকিয়ে যাক। মরে যাক। আপদ চুকবে।

সত্যি সত্যি একদিন—

কী হল একদিন? চুয়োর বউ কী করল?

একদিন রেগেমেগে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে না চুয়োর বউ। সে দৌড়ে ঢুকল রান্নাঘরে। নিয়ে এল এক বালতি ময়লা। ময়লাগুলো হুড়হুড় করে ঢেলে দিল লতার উপর।

সর্বনাশ! সেকি!

তারপর? লতাটা মরে গেল?

না। লতাটা অমনি নড়তে থাকল। বড়ো মোটা লতা। শিকড় ছড়িয়ে গেছে অনেক দূর। মাটিতে ফাট ধরল।

শেকড়গুলো পট্‌পট্‌ করে ছিঁড়ে যেতে লাগল।

ঠিক এসময় বাইরে থেকে এসে ঢুকল চুয়ো।

সে তো এই কাণ্ড দেখে কপাল চাপড়াতে লাগল।

বউকে বলল, হায়! হায়! এ কী করলে তুমি? আমাদের যে সব যাবে। ওই দেখো, লতাটা মাটি ছেড়ে উপরে উঠছে। বনদেবতার কথা ফলেছে। লতাটা আমাদের কাছে আর থাকবে না। হায়। হায়!

চুয়ো পাগলের মতো ছুটে গিয়ে লতাটাকে জড়িয়ে ধরে। লতাটাকে টেনে ধরে মাটিতে নামিয়ে আনতে চায়।

তারপর?

লতা আর নামে না। উঠেছে তো উঠছেই।

আর চুয়ো?

চুয়ো লতাকে ছাড়ে না।

লতা তাকে নিয়েই শূন্যে উঠতে থাকে।

তারপর আকাশে মিলিয়ে যায় লতা আর চুয়ো।

আর ফেরে না।

চুয়োর বউ রোজ তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

কোনোদিন যদি মাটিতে নেমে আসে চুয়ো আর জিয়ন লতা।

ছবি। সমীর সরকার



দেবব্রত মল্লিক

উত্তর ভিয়েতনামের এক রাজ্য। এই রাজ্যের রাজা হাং ভুওঙের। এখানে পাহাড়ি অঞ্চলের সীমান্তে একটা গ্রাম আছে। সেখানে কাও পরিবারের দুই ভাই বাস করত। বড়ো ভাইয়ের নাম কাও তান। কাও লাঙ ছোটো ভাইয়ের নাম। তাদের দুজনকে দেখতে প্রায় একই রকম। দুজনেই খুব সুন্দর। আবার স্বভাবও ছিল তাদের ভারী মিষ্টি। পরিশ্রমের ব্যাপারে তারা কোনও রা করতে জানত না।

এই ছোট্ট গ্রামের পাশেই ছিল আর একটি গ্রাম। এখানে বাস করত লুউ পরিবার। সেই পরিবারে যুয়ান ফু নামে একটি মেয়ে ছিল। তার বয়স সেই সময় ষোলো। সে দেখতে ছিল খুব সুন্দরী। আর স্বভাবে ভীষণ বিনয়ী। তার ব্যবহারের তুলনা ছিল না। ছোটো ভাই কাও লাঙ তাকে ভালোবাসল। অনেক যুবকের কাছে ফু ছিল চোখের মণি। কিন্তু সে কারও দিকে তাকাত না। তবে মনে মনে ফু কাও লাঙকে পছন্দ করত।

একদিন কাও লাঙ তার মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাল, সে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু কোন মেয়েকে—সে ব্যাপারে কিছু জানাল না। মা তার ছোটো ছেলের কথা শুনলেন। একটু চুপ করে থেকে জানালেন, যতদিন তার বড়ো ভাইয়ের ব্যবস্থা না হয় ততদিন তাকে অপেক্ষা

করে থাকতে হবে। কারণ সেটাই হচ্ছে তাদের বংশের নিয়ম।

কাও লাঙ অত্যন্ত অনুগত পুত্র। মা'র কথা সে অমান্য করতে পারে না। তার বড়ো ভাইও মায়ের সুসন্তান। সেও মায়ের আদেশ অনুযায়ী একটি সুশ্রী গুণবতী কন্যার খোঁজ করতে লাগল।

অনেক খোঁজার পর শেষে সে যাকে পছন্দ করল, সে আর কেউ নয়, সেই সুন্দরী রূপসি যুয়ান ফু। কাও লাঙ দাদার এই পছন্দ দেখে একদম হতাশ। কিন্তু একটা কথাও বলতে পারল না। তার হৃদয় দুঃখে ভেঙে গেল। তবু তার মুখ দিয়ে কোনো কথা সরল না। কেন না দাদাকে সে ভীষণ ভালোবাসে।

একদিন শুভ সময় দেখে দাদা কাও তান আর মা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যুয়ান ফু-দের বাড়ি গেল। যুয়ান ফু এই প্রস্তাবে রাজি। সে সম্মতি জানাল। বুঝতেই পারল না যাকে ও সম্মতি জানাল সে কাও লাঙ নয়। সে কাও তান। ওর দাদা। কেন না দু-ভাই দেখতে প্রায় একই রকম। তা ছাড়া কাও লাঙের সঙ্গে তার কোনোদিন কথাবার্তাই হয়নি। শেষে একদিন শুভক্ষণ দেখে কাও তানের সঙ্গে যুয়ান ফু'র বিয়ে হয়ে গেল। বাদ্যি বাজল, আলো জ্বলল মহা ধুমধাম। কিন্তু সবার আড়ালে একজনের মনে ভীষণ কষ্ট। ভীষণ দুঃখ। কাও লাঙ সে কথা কাউকে বোঝাতে পারে না। কাউকে বলতেও পারে না। এদিকে যুয়ান ফু তার ভুল বুঝতে পারল। নিজের ভাগ্যকে সে মেনে নিল। এই ভাগ্য নিয়েই সে খুশি হওয়ার চেষ্টা করল। যতই হোক, তার স্বামীও কাও লাঙের মতোই সমান সুপুরুষ। সেও দারুণ পরিশ্রমী। তাব স্বভাব এবং গুণের তুলনা হয় না।

দিন যায়। একে একে যুয়ান ফু সংসারের সব কাজ শাশুড়ির হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে নিল। রান্না-বান্না, ঘরদোর গোছানো, পরিষ্কার করা, সমস্ত কাজ হাসি মুখে করতে থাকল। প্রত্যেক দিন দু'ভাই মোষগুলোকে নিয়ে খেতে কাজ করতে যায়। সমস্ত দিন ওরা মাঠে থেকে কাজ করে। দিনের শেষে বড়ো ভাই কাও তান লাঙল-মই নিয়ে বাড়ি ফেরে আর কাও লাঙ মোষগুলোকে নিয়ে ধীরে ধীরে পেছন পেছন আসতে থাকে। বাড়ি ফিরে প্রথমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। তারপর সবাই মিলে এক সঙ্গে খেতে বসে। খেতে খেতে গল্প হয়। মজার মজার কথা হয়। সমস্ত বাড়িটায় তখন আনন্দের জোয়ার বইতে থাকে।

একদিন সন্ধ্যায় যুয়ান ফু বাড়ির সব কাজ শেষ করে বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। তাকিয়ে ছিল রাস্তার দিকে কখন ওরা বাড়ি ফেরে। ঘটনাক্রমে সেদিন ছোট ভাই কাও লাঙ লাঙল-মই নিয়ে আসছিল আগে আগে আর কাও তান মোষ নিয়ে আসছিল পিছু পিছু। দূর থেকে যুয়ান ফু-র কাও লাঙকে তার স্বামী বলে মনে হল। তাই সে ছুটে এসে তার হাত ধরল।

কাও লাঙ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল যুয়ান ফু ভুল করেছে। সে ভেবেছে আমিই বোধ হয় দাদা। তাই কাউ লাঙ যুয়ান ফু'র ভুল ভাঙানোর জন্য বলে উঠল, এই যে বউদি।

এই কথা শোনামাত্র যুয়ান ফু লজ্জায় মরে গেল। বুঝল এ তার স্বামী নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য,



এ ঘটনা কাউ তান দেখে ফেলেছে পেছন থেকে। সে বিস্ময়ে বিমূঢ়। মনে ভীষণ আঘাত পেল। সে বউকে কোনো কথা বলল না। বাড়ির ভেতর চলে গেল।

সেদিন থেকেই বাড়ির আবহাওয়া পালটে গেল। আগের মতো রইল না। কেমন যেন দম বন্ধ করা পরিবেশ। কারো সঙ্গে কারো কথা নেই। সবাই কেমন যেন হাসতে ভুলে গেছে। সবাই মনে মনে গুমড়ে মরছে। হঠাৎই বাড়ির মধ্যটা কেমন পালটে গেল। সংসারে শান্তি বলে আর কিছু রইল না।

কাও লাঙ ভাবল সব দোষই তার। ওর জন্যই এমন ঘটনা ঘটল। সংসারের এই অশান্তির মূলে সে। তাই সে ঠিক করল, এখানে সে আর থাকবে না। বেরিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও। তাহলে সংসারে আবার শান্তি ফিরে আসবে। সবকিছু পালটে গিয়ে আবার আগের মতো অবস্থায় ফিরে আসবে সংসার।

একদিন কাও লাঙ বেরিয়ে পড়ল, কেউ জানতে পারল না কোথায় সে গেল। সে নিজেও জানে না কোথায় সে যাচ্ছে। গ্রীষ্মকাল গেল, হেমন্ত ঋতু এল। তারপর শীত গেল। বসন্ত এল। সে শুধু যেতেই থাকে। পাহাড় পেরিয়ে নদী গ্রাম ছাড়িয়ে সে শুধু চলতেই থাকে।

এক সন্ধ্যায় এক ছোটো নদীর ধারে সে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে লুটিয়ে পড়ল। তখন তার শরীরে কোনো শক্তি নেই। নড়ার ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলেছে। তার দেহ ক্রমে ক্রমে নিঃসাড় হয়ে আসছে। একবার চোখ খুলে সে আকাশের দিকে তাকাল। চারদিকে আলো ঝলমল করছে। তার মাথার ওপর দিয়ে একটা সবুজ পাখি উড়ে চলে গেল পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে। সেখানেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। ঠিক তারপরই একটা কাণ্ড হল। তার অকৃত্রিম ভালোবাসা আর অত্মোৎসর্গের জন্য তার দেহ শুভ্র শুদ্ধ একখণ্ড চুনাপাথরে পরিবর্তিত হয়ে গেল। সেই প্রস্তরখণ্ডের পাশ দিয়ে একটি নদী কাও লাঙের করুণ ভাগ্যের জন্য বিলাপ করতে করতে বয়ে যেতে থাকল।

এদিকে বাড়িতে দাদা কাও তান ভাইয়ের পথ চেয়ে বসে রয়েছে। মনে মনে ভীষণ অনুতপ্ত। কেবলই মনে হতে থাকে কেন এমন হল। ভাইকে কেন সে চলে যেতে দিল, সে কথা ভেবে সে দুঃখে অনুতাপে ভেঙে পড়ল। শেষে একদিন সেও তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল পেরিয়ে সে হেঁটে চলেছে। যদি কোনোও ভাবে ভাইয়ের দেখা পায়। এই কথা ভাবতে ভাবতে সে এক নদীর ধারে শুভ্র চুনাপাথরের স্তূপের কাছে এসে দাঁড়াল। তার দেহ শ্রান্ত ক্লান্ত। এবং এমনই অবসন্ন যে দেহ লুটিয়ে পড়ল। শেষে কাও তান মারা গেল। এবারও এক কাণ্ড হল। তার এই আত্মোৎসর্গের জন্য সে এক ফলন্ত, দীর্ঘ সুপারি গাছে পরিণত হল।

বাড়িতে এখন যুয়ান ফু এবং শাশুড়ি। শুধু দুটি প্রাণী। স্বামী কাও তান বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর যুয়ান ফু বুক বেঁধে অপেক্ষা করতে থাকে। ভাবে এই বুঝি সে ফিরে আসে। এক এক করে হেমন্ত পার হয়ে গেল। কই স্বামী দেওর কেউই ফিরে আসে না? তখন শোকে দুঃখে মরিয়া হয়ে উঠল যুয়ান ফু। শেষে একদিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তারপর একদিন সকালে শাশুড়ির অনুমতি নিয়ে সেও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

রোদ বৃষ্টি কোনও কিছুই সে গ্রাহ্য করল না। যুয়ান ফু এগিয়ে যেতে থাকল পথের পর পথ, মাঠের পর মাঠ পার হয়ে যেতে থাকল। শেষে তার ভাগ্যও তাকে সেখানেই নিয়ে এল— যেখানে সাদা পাথরের স্তূপের পাশে সুপারি গাছটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে আসামাত্র তার শরীরের সব ক্ষমতা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। হঠাৎ করেই যুয়ান ফু নিথর। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। মারা গেল সে। এবার আবার আর এক কাণ্ড হল। যুয়ান ফু লতানো এক পানগাছে পরিণত হল। পানের লতা সুপরি গাছকে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠে তার কণ্ঠলগ্ন হল। এভাবে যুয়ান ফু'র স্বামীর সঙ্গে মিলন হল আবার।

চুনাপাথরের পাশ দিয়ে নদী বয়ে যেতে থাকে। তার ঢেউয়ে কুলকুল শব্দ। একটু ভালো করে কান পাতলে শোনা যাবে একটা শোকগাথার গান হয়ে চলেছে। গ্রামবাসীরা সে কাহিনি শুনেছে নদীর কাছে। তারা এই তিনজনের স্মৃতিতে এক সৌধ নির্মাণ করল।

কিছুকাল পর রাজা হাং ভুওঙ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনিও শুনলেন সেই কাহিনি। দু'ভাই আর যুয়ান ফু'র ভালোবাসার কাহিনি তাঁকে অভিভূত করে দিল। রাজা গাছ থেকে

একটা পান ও সুপারি তুলে মুখে দিয়ে চিবোতে লাগলেন। পান সুপারি মিশে একটা সুন্দর গন্ধ হল। তিনি একটু পরে সাদা পাথরের ওপর যেই একটু পিক ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গাটা টকটকে লাল রং হয়ে গেল। অদ্ভুত সুন্দর সে রং। এটা নিশ্চয়ই ভালোবাসার রং।

রাজা আদেশ দিলেন এখন থেকে বিবাহ কিংবা শুভ অনুষ্ঠানে যেন পান-সুপারি খাওয়া হয়। রাজার এই আদেশ সেইদিন থেকে পালিত হয়ে আসছে।

ছবি। শঙ্কর বসাক



মিথ্যে কথা বলতে বলতে

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

সে এক দেশ ছিল যেখানে পাহাড় বেয়ে নেমে আসত ঝরনার জল। সবুজ গালিচা-পাতা সমতল ভূমিতে এখানে-সেখানে ছিল ভুঁইফোড় বনজঙ্গল। সেখানে শীতল বাতাস খেলা করত পাখিদের সঙ্গে, দিনরাত। বিস্তীর্ণ তটরেখা বরাবর সমুদ্রের উথাল-পাথার ঢেউ আছড়ে পড়ত অবিরাম। আর ঝোড়ো বাউল বাতাস বনভূমিতে বৃষ্টির মেঘ নিয়ে আসত।

সেই দেশে অনেক অনেক দিন আগে বাপ-মা হারা এক ছেলে ছিল। চাষার ঘরের ছেলে, চাষ-আবাদে মন নেই। লেখাপড়া শিকেয় তুলে কেবল দুষ্টুমি আর অকাজ কুকাজ। তবু কাকা-কাকিমার অভাবের সংসারে বেশ আদরেই সে বড়ো হয়ে উঠেছিল।

অকম্মার ঢেঁকি হলে কী হবে, তার অলস মাথায় নানা রকম ফন্দিফিকির খেলা করত। কাকা-কাকিমাদের তো বটেই পড়শিদেরও ভড়কে দিয়ে তার সে কী আমোদ!

একদিন এক অলস সকালে সে করল কী, অনেকটা পথ মাড়িয়ে এক ছুটে সে চলে গেল তাদের চাষের জমিতে। কাকা তখন জলাজমিতে আগাছা তুলছিল। একটুও না ঘাবড়ে সে চটপট বলে ফেলল, কাকা, কাকা—ও কাকা, সর্বনাশ হয়েছে। কাকিমা মাচা থেকে পড়ে

গেছে — সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড! হাড়গোড় ভেঙে গেছে বোধহয়, এখনই বাড়ি চলো।' বলেই সে বাড়ির দিকে দৌড় দিল।

ভাইপোর কথা শুনে চাষবাস তার মাথায় উঠল। গামছা বাঁধা ছিল মাথায়, সেটা খুলে কোমরে জড়িয়ে নিল সে। তারপর হন্‌হন্‌ চলল ঘরপানে।

ওদিকে তার জোয়ান ভাইপো অনেক আগেই বাড়িতে পৌঁছে গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলল কাকিকে, 'এ কী কাণ্ড, তুমি এখনো হেঁশেলে? ওদিকে জমিতে দেখে এলুম কাকা গড়াগড়ি খাচ্ছে আর ছটফট করছে। একটা গাট্টাগোট্টা ষাঁড় তাকে গুঁতিয়ে দিয়েছে, সে খবর রাখো?'

এ-কথা শুনে উনুনে চাপানো ভাতের হাড়ির কথা ভুলে কাকিমা হন্তদন্ত হয়ে ছুটল জমির দিকে। ছুটতে ছুটতে কিছুটা দূরে এসেই সে থমকে দাঁড়াল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। ওই তো ওই তো চাষিও ছুটে আসছে ইদিক পানে। মুখোমুখি হল দুজনে। কী আশ্চর্য, ওরা দুজনেই তো বেশ সুস্থই, কারোর শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্নমাত্র নেই।

এবার তারা ভাইপোর চালাকি বুঝতে পারল। আর-একবার ছোঁড়াটার কারসাজিতে ঠকে গেছে ভেবে দুজনেই খুব রেগে গেল। না, আর নয়, হতচ্ছাড়াটাকে এবার উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

ঘরে ফিরে ওরা ভাইপোকে আতিপাতি খুঁজতে লাগল। অবশেষে তাকে পাওয়া গেল ঘরের এক আঁধার কোণে। তারপর দুজনে মিলে ওকে একটা খাঁচায় বন্দি করে ফেলল।

যখন দিনের আলো মুছে দিয়ে আঁধার নেমে এল তখন খাঁচাসুদ্ধ হতচ্ছাড়াটাকে ওরা দুজনে বয়ে নিয়ে এল নীল নির্জন নদীর তীরে। কাকা বলল, 'এবার তোকে ছুড়ে ফেলে দেব। যত তোর চালাকি আর ফন্দিফিকির সব এবার জলের অতলে ডুবে যাবে। আর কোনোদিন পড়শিদের নালিশ শুনতে হবে না আমাদের।'

অনুনয় বিনয় করে সে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'দোহাই তোমাদের, এই বাপ-মা মরা ছেলেটাকে মেরে ফেল না। এই দিব্যি করে বলছি, আর কক্‌খনো এমন কাজ করব না।'

কাকা বলল, 'তোর ছলনায় আর ভুলছি না রে পাজি ছুঁচো। তোকে নদীর জলে....।'

কথা শেষ করতে দিল না ভাইপো, বলল, 'তাহলে আর কী, ফেলেই দাও আমায় এই নদীর জলে। তবে শেষবারের মতো আমার একটা ইচ্ছা পূরণ করতে দাও।'

কাকি বলল, 'কী তোর ইচ্ছে বল তাড়াতাড়ি হতচ্ছাড়া বেহায়া।'

চোখের জল মুছতে মুছতে সে বলল, 'এই যে আমি মিছেকথা বলে মানুষ ঠকাই, এসবই একটা বইয়ে লেখা আছে। আমার ঘরের পুব-কোণের কুলুঙ্গিতে সেই বইটা লুকিয়ে রেখেছি। দয়া করে যদি ওটা এনে দাও তো বইটা নিয়েই মরতে পারি।'

কী আর করা যাবে, বইটা আনতে দুজনেই চলল ঘর-পানে। একটু পরে একটা লোক লাঠি ঠুকে ঠুকে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে চোখে দেখতে পায় না। ভাইপো তাকে ডেকে বলল, 'ওহে দাদা, এদিকে একটু আসবেন। কয়েকজন দুষ্টু লোক আমাকে একটা খাঁচায় পুরে

ফেলে গেছে। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। আপনি যদি দয়া করে আমাকে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেন তো আমার প্রাণটা বাঁচে। প্রতিদানে আমিও আপনাকে চোখের আলো ফিরে পেতে সাহায্য করব।' এই বলে সে হাত দিয়ে খাঁচার গায়ে চাপড় মারতে থাকল।

সেই শব্দ শুনে শুনে লোকটা খাঁচার কাছে এসে হাত দিয়ে পরখ করতে করতে খাঁচার দরজার হুড়কোটা খুঁজে পেল। সেটা খুলে দিতেই সে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এক ছুটে অদূরে গজিয়ে ওঠা বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আর সেই লোকটি? সে আর কী করবে, ঠকে গেছে বুঝতে পেরে সে আবার তার পথ ধরল।

ওদিকে ঘরে এসে কাকা আর কাকিমা দুজনে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনো বই পেল না। আবার তারা ঠকে গেছে! একটুও দেরি না করে পড়ি-কী-মরি ছুটল ওরা নদীর কিনারে। সেখানে এসে দেখে খাঁচায় কেউ নেই। রাগে দুখে শূন্য খাঁচাটা নদীর জলে ঠেলে ফেলে দিয়ে ওরা ঘরে ফিরে গেল।

আর হতচ্ছাড়া ভাইপো?

বনের মাঝে ইদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। তারপর একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। এখন তো আর বাড়ি ফিরে যাওয়া যায় না। কোন সাহসে সে বাড়ি ফিরে যাবে? গেলেই তো কাকা-কাকিমার লাথিঝ্যাঁটা খেতে হবে। পড়শিদের বাড়ির দরজাও তে তার জন্য বন্ধ। এমন সব আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে সে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

পাখিদের কিচির মিচির ডাকে ঘুম যখন ভাঙল তার তখন গাছগাছালির ফাঁকফোকর দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে এখানে ওখানে। এদিক সেদিক তাকিয়ে হঠাৎ সে দেখল, অদূরে আগাছার জঙ্গলে কী যেন একটা পড়ে আছে। সূর্যের আলোতে সেটা চকচক করছে। তখনি সেখানে ছুট্টে গেল সে, গিয়ে দেখল একটা পিতলের ঘড়া পড়ে আছে। আগাছা সরিয়ে ঘড়াটা তুলে এনে সে অবাক হয়ে দেখল, তার মধ্যে সোনার মোহর ভরতি।

এবার তাহলে ঘরে ফিরে যেতে কোনো ভয় নেই। এত এত মোহর পেয়ে কাকা-কাকিমা খুউব খুশি হবে নিশ্চয়। সোনার মোহর ভরতি ঘড়াটা কাঁধে চাপিয়ে তখনই সে বাড়ি ফিরে এল। বন্ধ দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে কাকা-কাকিমাকে ডাকতে শুরু করল।

'ও কাকা, ও কাকি— কোথায় গেলে তোমরা, দেখ দেখ কী এনেছি তোমাদের জন্য।'

ঘরের মধ্যে তখন কাকা-কাকি সবে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরুবার তোড়জোড় শুরু করেছিল। ভাইপোর হাঁকডাক শুনে ওরা চমকে উঠল। ওর দুঃসাহসের বহর দেখে অবাক হল দু'জনে। হতচ্ছাড়াটা নিশ্চয় নতুন কোনো মতলব এঁটে বাড়ি ফিরেছে। তবু দেখাই যাক না কী এনেছে সে— একথা ভাবতে ভাবতে কাকি দোরের আগল খুলে দিতেই ভাইপো হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল। আর ঘরে ঢুকেই ভারী ঘড়াটা ধুপ করে মেঝেতে রেখে সে দাঁত

বের করে হিহি হাসতে লেগেছে। তখনই ঘড়াটা উপুড় করল, —ঝন্ ঝন্ করে মোহরগুলো মেঝেতে পড়ছে আর গড়িয়ে যাচ্ছে, পড়ছে আর গড়িয়ে যাচ্ছে। কাকা-কাকিমার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

এখন আর ওদের দুঃখ নেই।

গরিব চাষির ঘর সুখে আনন্দে ভরে উঠল। এবার হতচ্ছাড়াটার বিয়ে দিলে মন্দ হয় না, বিয়ে করে ওর অলক্ষুনে স্বভাবটা যদি পালটায় —এমন সব সাতপাঁচ ভাবনা এল কাকা-কাকির মনে। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। একদিন গাঁয়েরই এক সুন্দরপানা মেয়ের সঙ্গে ধুমধাম করে ভাইপোর বিয়ে হয়ে গেল।

বেশ ভালোভাবেই চলছিল সব কিছু।

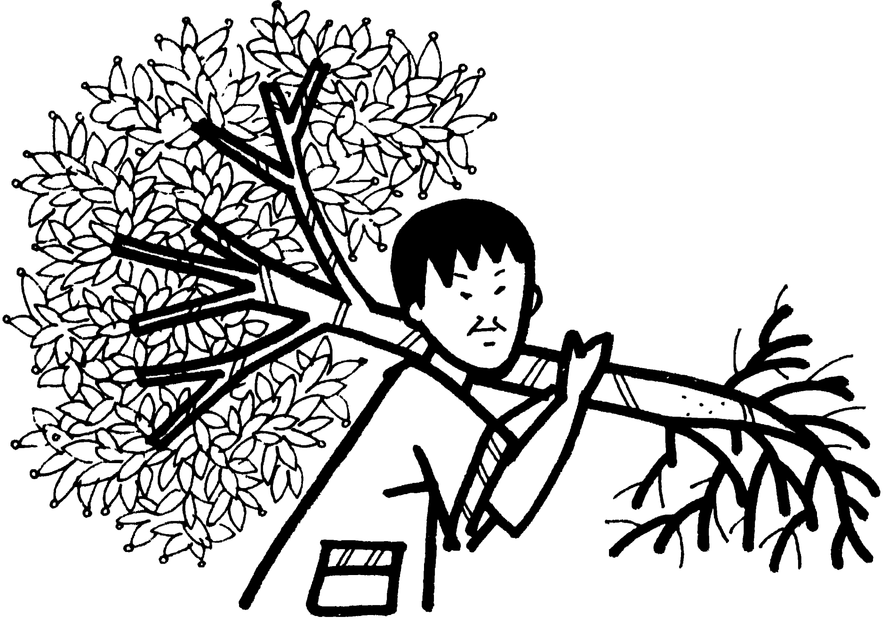
এমন সুখের দিনে হঠাৎ একদিন কাকা মারা গেল। দুদিন যেতে না যেতে কাকার দুঃখে কাকিমাও চলে গেল। এখন বউকে নিয়ে সে দিন কাটাতে লাগল। কোনো কাজকম্ম করে না, জমিজিরেতে চাষবাস হয় না। আগাছায় ভরে গেছে জমি। বসে বসে ভালোমন্দ খেতে খেতে একদিন সোনাদানাও ফুরিয়ে এল। কথায় আছে স্বভাব যায় না ম'লে। আবার সে ঘরের বাইরে বের হল, ছলচাতুরিতে মন দিল।

একদিন এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে সে এক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছে। তখন সেখানে একটা গাছের নীচে বেড়ালের মতো ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা বাচ্চা খেলা করছিল। সে বাচ্চাগুলোর কাছে গেল, ওদের ধরতে যেতেই একটা বাচ্চা ওর হাতে আঁচড়ে দিতে থাবা তুলল। তাই না দেখে সে এক-একটা বাচ্চা ধরে আর তার পায়ের থাবাগুলো দুমড়ে মুচড়ে দিতে থাকল। ব্যথায় যন্ত্রণায় ওরা কান্নাকাটি শুরু করে দিল। ঠিক তখনই পাশের ঝোপের ভিতর থেকে দিকবিদিক কাঁপিয়ে উঠল বাঘের গর্জন। চমকে উঠল সে। তাহলে এগুলো বেড়ালের নয়, বাঘের বাচ্চা। ভয়ে আতঙ্কে তখনি সে চটপট আর-একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। সে দেখল, ভয়ংকর এক বাঘিনি বন কাঁপিয়ে মাটি দাপিয়ে ছুটে এল বাচ্চাদের কাছে। ওদের খুব আদর করল। তারপর পাশের একটা ছোট্ট গাছ থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে মুখে পুরে দিল। চিবিয়ে চিবিয়ে সেগুলো নরম করে একে-একে ওদের মচকে যাওয়া পায়ে লাগিয়ে দিল।

কী আশ্চর্য, একটু সময় যেতে না যেতেই বাচ্চাগুলোর কান্না থেমে গেল। আবার ওরা দৌড়ঝাপ শুরু করে দিয়েছে। বাঘিনি তখন বাচ্চাদের নিয়ে বনের গভীরে চলে গেল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন সে। সে ভাবল, 'ওই গাছের পাতায় এমন কোনো গুণ আছে যাতে ভাঙা হাড় জোড়া লাগে। এমন গাছ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভালো। একটুও সময় নষ্ট না করে সে একটা শুকনো ডাল জোগাড় করল। ওটা দিয়ে গাছটির গোড়ার চারপাশের মাটি আলগা করে শেকড়সুদ্ধ গাছটি উপড়ে ফেলল। গাছটিকে কাঁধে চাপিয়ে বীরের মতন বাড়ি ফিরে এল সে।

বাড়িতে এসে প্রথমেই সে উঠোনের পুব কোণে এক চিলতে জমি পরিষ্কার করে



গাছটিকে যত্ন করে পুতে দিল। তারপর পরিষ্কার জল এনে আলগা মাটিতে, গাছটির ঝিমিয়ে পড়া শাখাপ্রশাখায় ছিটিয়ে দিল।

তার কাণ্ড দেখে বউ অবাক হয়ে চেয়ে রইল সেদিকে। চাষার ছেলে হয়েও যে কোনো দিন চাষের জমিমুখো হয়নি, সে কি না এমন যত্ন করে একটা গাছ লাগাচ্ছে! বউয়ের অবাক-মুখের পানে চোখ পড়তেই এক গাল হেসে সে বলল, 'কী গো বউ, অবাক হলে যে বড়ো! ভাবছ, কী এমন গাছ যে আমি এত যত্ন করে লাগাচ্ছি! আরে এটা হল গিয়ে দৈব-গাছ। এগাছের পাতা থেঁতো করে লাগালে ভাঙা হাড় জোড়া লাগে। মরা মানুষ বেঁচে ওঠে। বুঝলে হে গিন্নি।'

বউ বলল, 'তাই নাকি! কোথায় পেলে গো দৈব-গাছ?'

বিরক্ত হয়ে বলল সে, 'তোমার অতশত জানবার দরকার কী শুনি। তার চেয়ে যা বলি মন দিয়ে শোনো, এই পবিত্র গাছ নোংরা পোশাকে ছোঁবে না। এর গোড়ায় নোংরা কিছু ফেলবে না।'

'ফেললে কী হবে?' সরল মনে প্রশ্ন করে বউ।

বউয়ের কথা শুনে ধমক দিয়ে উঠল সে, 'আবার বেয়াড়া প্রশ্ন?' তারপর একটু ভেবে বলল, 'তা যখন জানতে চাইছ তখন বলি শোনো, নোংরা কিছুর ছোঁয়া লাগলে গাছটা শোঁ

শোঁ করে আকাশে উবে যাবে।'

মিথ্যে কথা বলা যার রক্তে মিশে গেছে, তার কথা বউ বিশ্বাস করল না। অবশ্য মুখে কিছু বললও না। তবে তার পর থেকে ভুল করেও সে গাছটির কাছে যায় না। কোনো কথা জিজ্ঞাসাও করে না।

দিন যায়, রাত যায়। আবার দিন আসে। এমনি করে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। হতচ্ছাড়াটার গাছটিই ধ্যান-জ্ঞান, সব সময় একই চিন্তা—শুধু গাছ আর গাছ। বউয়ের দিকে তার একটুও মন নেই। তার গাছ নিয়ে এই আদিখ্যেতা দেখে বউ মনে মনে খুব দুঃখ পায়, একটু একটু রাগ জমতে থাকে তার বুকে। এক দিন এ-নিয়ে তাদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেধে গেল। এক সময় নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারল না বউ, চকিতে সে এক ঝুড়ি জঞ্জাল এনে ফেলে দিল গাছটার গোড়ায়।

আর তখনই, কী আশ্চর্য, শাখা-প্রশাখায় বড়ো হয়ে ওঠা গাছটি কেমন যেন নড়েচড়ে উঠল। তারপর আকাশপানে উঠতে লাগল। একটু পরেই শেকড়সুদ্ধ গাছটা আকাশে উড়ান দিল দেখে ওরা দুজনেই অবাক হয়ে গেল। এত দিন বানিয়ে বানিয়ে কত গল্পই না বলেছে সে। এবার সত্যি সত্যি তার কথামতো গাছটা ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে। ঠিকমতো কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে দৌড়ে গিয়ে গাছটার শিকড়গুলো দু'হাতে জাপটে ধরল।

বউ সেদিকপানে হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখছে, আর গাছটা হতচ্ছাড়াটাকে নিয়ে চাঁদের দেশে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। তুলোর মেঘের ভেলায় উড়তে উড়তে হাওয়ার দোলায় ভাসতে ভাসতে গাছ আর সে চাঁদের বুকে পৌঁছে গেল।

জ্যোৎস্নারাতে এখনও চাঁদের বুকে আলোছায়ায় দেখা যায় সেই হতচ্ছাড়াটাকে, যে গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে আনমনে। ওর বউ কবেই মরে গেছে, আছে সেই দেশ, সেই দেশের সরল মানুষ। যারা আজও পুন্যিমের রাতে চেয়ে থাকে চাঁদের দিকে, যেন দেখতে পায় ওই হতভাগা ছেলেটাকে, যে গাছটিতে হেলান দিয়ে বসে আছে একই ভাবে।

ছবি। শঙ্কর বসাক



মনোজিৎ বসু

এক বিলের ধারে বিরাট একটা গাছ। সেই গাছে একসময় একটা বক বাসা বেঁধেছিল। সে ছিল ভারী চতুর। তার মুখের ভাব দেখে মনে হত, সে বড়ো সরল, কখনও কারো অপকার করে না। অথচ পেটে পেটে তার শয়তানি। সুযোগ পেলেই অপরের ক্ষতি করে নিজের কাজ হাসিল করে।

বিলের জলে ছোটো ছোটো মাছেরা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। কখনও লাফায়, কখনও বা সাঁতার কাটে। গাছের ডালে বসে সেই বক তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। আর মনে মনে মতলব আঁটে, কী করে একে-একে তাদের সাবাড় করা যায়। ফাঁক পেলে লাফিয়ে-ওঠা একটা মাছকে ধরে গিলে ফেলা এমন কিছু শক্ত নয়। কিন্তু, তাতে করে অন্য মাছেরা পাবে ভয়। সাবধান হয়ে যাবে তারা, বিলের ধার ঘেঁষে কেউ আর চলাফেরাই করবে না তাহলে। একে-একে সব মাছ দিয়ে পেটপুজো করার ফন্দিটা তাহলে যাবে ভেস্তে।

অতএব, অন্য উপায় দেখতে হবে। গাছের ডালে বসে বকবাবাজি তাই মাছেদের ওপর নজর রাখে, আর মনে মনে ফন্দি আঁটে। এই করেই দিনের-পর-দিন কাটে।

তারপর হঠাৎ একদিন...

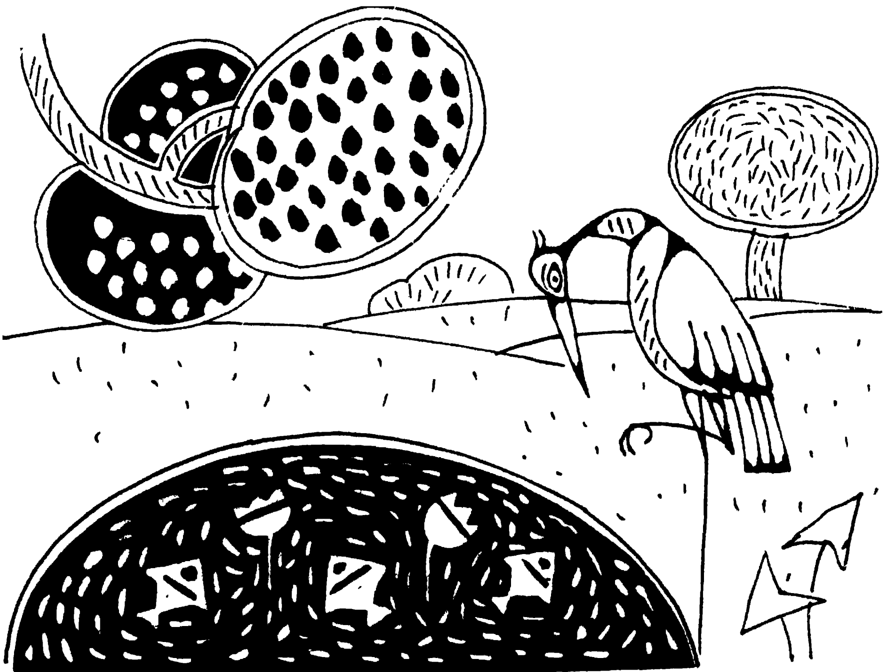
রুপোলি রঙের ছোট্ট এক সরলপুঁটি মাছ লাফ দিয়ে বিলের একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। সেইখানে জলে এক ঠ্যাং রেখে, অন্য ঠ্যাং পেটের কাছে লুকিয়ে, উদাসভাবে দাঁড়িয়ে ছিল বক। সরলপুঁটি তার দিকে তাকিয়ে বললে :

উদাস কেন দেখি?
মুখে তোমার নেইকো হাসি,
কাণ্ড বলো এ কী!

বক তখন সরলপুঁটির দিকে তাকিয়ে, গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, এই তোমাদের জন্যই মনটা আমার এমন উদাস। তোমাদের ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়েই মনে বড়ো কষ্ট পাচ্ছি।

---কেন, কেন? আমাদের কথা ভাবতে গিয়ে তোমার কষ্ট হচ্ছে কেন? সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে পুঁটিমাছ।

বক তখন বলে, তাহলে বলি শোনো। সামনেই গ্রীষ্মকাল। গণকঠাকুর বলে বেড়াচ্ছেন, এবার নাকি দারুণ গরম পড়বে। ভয়ংকর রকমের খরা দেখা দেবে এই রাজ্যজুড়ে। তোমাদের এই বিলটা তো তেমন গভীর নয়। কাজেই, খরা হলে এই বিলে জল যাবে শুকিয়ে। তখন তোমাদের অবস্থাটা যে কী হবে,—সেই কথা ভাবতে গিয়েই শিউরে উঠছি। উঃ, সে কী ভীষণ অবস্থা হবে তোমাদের। বিলের জল শুকিয়ে গেলে, তোমরাও যে শুকিয়ে মরবে।



সরলপুঁটি এবারে যেন ভয় পেলে। সে তাই উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে, বাবাজি! তাহলে উপায়? শুনেছি, পাখিদের মধ্যে তোমরাই একমাত্র ধার্মিক। কী করলে ভবিষ্যতের সেই বিপদের থেকে আমরা বাঁচতে পারি, তার একটা উপায় বাতলাও, ধার্মিকবাবা।

বক বুঝল, ওষুধ ধরেছে! কিন্তু মুখে বিন্দুমাত্র স্বস্তির ভাব না দেখিয়ে সে বললে, আরে, ক-দিন ধরে আহারনিদ্রা ত্যাগ করে তো সেই উপায়টাই খুঁজে বেড়াচ্ছি। শেষটায়...

কী শেষটায়? সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে পুঁটিমাছ।

বক তখন বললে, শেষটায়, এই খানিক আগে, মনে পড়ে গেল ঝিলমিল হ্রদের কথা। পাহাড়ে-ঘেরা বিরাট হ্রদ, গভীরও অনেক। সে হ্রদের জল কখনও শুকোয় না। হাজার গরম পড়ুক, হাজার খরা হোক, ঝিলমিলের জল সর্বক্ষণ ঝিলমিলই করে। আহা, কী রূপ তার! বিশ্বাস না-হয় তো নিজের চোখেই একবার দেখে আসতে পারো।

সরলপুঁটির মনটা ভারী সরল। বকের কথা আগাগোড়াই সে সত্যি বলে ধরে নিয়েছে। কাজেই, আসন্ন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সে বললে, বেশ তো, দেখেই আসা যাক একবার। কিন্তু, যাব কী করে?

বক বললে, তার জন্যে আবার ভাবনা! বলি আমি রয়েছি কী করতে? আমিই তোমাকে ঠোঁটে করে উড়িয়ে নিয়ে যাব সেখানে। তুমি নিজের চোখে দেখে এসে আর সবাইকে ব্যাপারটা খুলে বলতে পারবে। তারপর, সকলে রাজি হয়ে গেলে, আমিই এক এক করে তোমাদের পরিবারের সবাইকে, মায় তোমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সমেত সকলকে, ঝিলমিলের জলে ছেড়ে দিয়ে আসব। পরের উপকার করাই তো আমার ধর্ম।

সরলপুঁটি সোৎসাহে বললে : বেশ, তাহলে আর দেরি না-করে এখুনি বেরিয়ে পড়া যাক।

বকবাবাজির ঠোঁটের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে ছোট্ট সেই পুঁটিমাছটি তখন ঝিলমিলের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

না, বাবাজি মিথ্যে বলেনি। ঝিলমিল হ্রদ দেখে বেজায় খুশি হল সরলপুঁটি। যেমন বিরাট, তেমনি গভীর সেই হ্রদ। চারদিকের পাহাড়ের দৃশ্যটাও বড়ো সুন্দর।

বক বললে, কি গো, বিশ্বাস হল তো এবার?

বাঃ, আমি কী আর অবিশ্বাস করেছি তোমাকে?—জবাব দিলে সরলপুঁটি। সে বললে, না বাবাজি, সময় থাকতেই আমাদের সকলকে চলে আসতে হবে এখানে। চলো, ফেরা যাক এবার। বিলে ফিরে গিয়ে, আজই সবাইকে ব্যাপারটা আমার বুঝিয়ে বলতে হবে। তারপর, কাল থেকেই বাসাবদল।

হাঁচবার ভান করে, বকবাবাজি তখন মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে, মনে মনে খুব একচোট হেসে নিলে। আর, প্রকাশ্যে দিলে ভেজাল একটা হাঁচি।

সরলপুঁটি বললে, ফেরার সময় হাঁচি। দাঁড়াও বাবা, খানিকক্ষণ সবুর করো।

বিলে ফিরে এসে, সরলপুঁটি তড়িঘড়ি সব ব্যাপারটাই আর সব মাছকে বুঝিয়ে বললে।

তার কথা শুনে, সকলেই গেল খুব ঘাবড়ে। ভবিষ্যতের সেই খরার হাত থেকে বাঁচবার জন্য মৎস্য-পরিবারের ছোটোবড়ো পুঁটি, চাঁদা, খলসে, মৌরলা, পারসে, তপসে ইত্যাদি সব মাছই তখন ঝিলমিল হ্রদে আস্তানা বদল করবার জন্য উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করল।

পরদিন সকাল বেলায়, সরলপুঁটি বিলের ধার ঘেঁষে লাফ মারতেই, বকবাবাজি এসে দাঁড়াল কাছে। পুঁটিমাছের মুখে সব শুনে, মনে মনে আশ্বস্ত হল সে। বুঝল, তাকে কেউই বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি। কাজেই, তার মতলবটা যে এবার সফল হবে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না তার।

তখন যে কী হল, সে তো তোমরা বুঝতেই পারছ! ঝিলমিল হ্রদে পার না-করে, সব মাছকেই নিজের পেটে একে-একে পার করল বকবাবাজি।

গাছের তলায় ধীরে ধীরে জমে উঠল মাছের কাঁটার বিরাট এক পাহাড়।

ধূর্ত বক এইভাবে বিলের ছোটো ছোটো মাছগুলো সাবাড় করেও কিন্তু ক্ষান্ত হল না। এবারে তার নজর গিয়ে পড়ল কাঁকড়ার ওপর। মনে মনে ভাবল :

কায়দা করে মাছ খেয়েছি,
এবার খাব কাঁকড়াও।
বিলের ধারে এলেই তাদের
করব আমি পাকড়াও।।

কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবার পর, একদিন সকালবেলায় বিলের বড়ো একটা কাঁকড়ার দেখা পেল মাছখেকো সেই বক। জলের ধার ঘেঁষে চলতে গিয়ে যেই-না তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে, বকবাবাজি তক্ষুনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে :

কাঁকড়া, তোমার জন্যে আমার
দুঃখ হচ্ছে ভারী,
একলা হেথায় থাকতে নারো
বুঝতে সেটা পারি।
মাছগুলো সব সঙ্গী ছিল,
তাদের কাছে পেলে
আবার তুমি মনের সুখে
ঘুরবে হেসে খেলে।।

কাঁকড়া জবাব দিলে, সত্যিকথা বলেছ, বকবাবাজি। একলা থাকতে আর ভালো লাগছে না। মাছেরা যেখানে গেছে, আমিও যেতে চাই সেখানে। তুমি আমায় একটু সাহায্য করবে?

বক তখন সাগ্রহে বললে, সে-কথা আর বলতে! তোমাদের সাহায্য করবার জন্যেই তো রয়েছি এখানে। চলো, এখুনি তোমাকে ঠোঁটে করে নিয়ে যাই ঝিলমিল হ্রদে।

কাঁকড়া একটু যেন কী ভেবে বললে, না, ঠোঁটে করে নিয়ে যেতে পারবে না তুমি। একেই তো বেশ বড়ো আমি, তার ওপর গা আমার পিছল। ঠোঁটে করে নিয়ে গেলে, পিছলে হয়তো

পড়েই যাব। উঁচু থেকে পড়ে গেলে আর দেখতে হবে না। তার চেয়ে আমি বরং তোমার গলায় ঝুলে যাই। এসো, গলাটা বাড়িয়ে দাও, আমায় তুলে নাও।

সঙ্গে সঙ্গে বক রাজি হয়ে গেল। কাঁকড়াটা তার লম্বা লম্বা দাঁড়াদুটো দিয়ে বকের গলাটা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল। বক চলল উড়ে।

তারপর সে যখন তার গাছের বাসায় গিয়ে হাজির, কাঁকড়ার তো চক্ষুস্থির! গাছের তলায় মাছের কাঁটার পাহাড়। বুদ্ধিমান কাঁকড়ার বুঝতে কিছু বাকি রইল না আর। এক এক করে বকই তবে মাছ করেছে আহার।

বককে সে জিজ্ঞাসা করলে, ও বকবাবাজি, এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে?

বক বললে, কেন, বুঝতে পারছ না? এবার তোমার পালা। মাছগুলোকে ভুলিয়ে এনে, যেমন করে তাদের এক এক করে খেয়েছি, এবারে তোমাকেও তেমনি করে খাব। হেঁঃ, হেঁঃ, হেঁ...

কাঁকড়া তখন ভয় পেয়েছে, এমনি ভাব দেখিয়ে বলে উঠল, না-না, রসিকতা করছ তুমি। আমাকে কি তুমি খেতে পারো? কত ভালোবাসো আমাকে!

তারপরেই সে দাঁড়াদুটো দিয়ে বকের গলাটা জোরসে জাপটে ধরল।

বক এজন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে ভেবেছিল, দুনিয়াতে সে-ই একমাত্র চালাক, আর সবাই বোকা। এদিকে কাঁকড়ার জাপটে ধরার চোটে তো তার গলায় ফাঁস লাগবার দশা! দমবন্ধ হবার জোগাড়। সে তখন মিনতি করে বলে উঠল :

ঘাট হয়েছে, ঘাট হয়েছে,
দম আটকে মরি।
লক্ষ্মীটি ভাই, দাও ছেড়ে দাও
তোমার পায়ে পড়ি।।

কাঁকড়া কিন্তু সে-কথায় কান দিলে না। বকের ঘাড়টা সে দিলে মটকে। তারপর, দাঁড়া দিয়ে তার নাড়িভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিয়ে, গাছের গা বেয়ে নীচে নেমে এসে, বিলের দিকে চলে গেল।

লোকে বলে, জলের বড়ো কাঁকড়াকে দেখতে পেলে বকেরা নাকি আজও তাদের দিকে এগোতে সাহস পায় না।

ছবি। সুব্রত মাজী



চার শিকারি

সুধীর করণ

বার্মা মুলুকের চার শিকারি। একসঙ্গেই থাকত, একসঙ্গেই শিকার করত বনপাহাড়ে। একদিন রাতের খাবার খেতে বসেছে ওরা। বন থেকে ভেঙে-আনা মৌচাক থেকে অনেক মধু পেয়েছিল সেদিন। তাই রুটির সঙ্গে মধু—এই ছিল তাদের রাতের খাবার। খেতে খেতে একজন বলল, খুব সাবধান ভাই, একটি ফোঁটা মধুও যেন মাটিতে না-পড়ে। পড়লেই সর্বনাশ।

—সে কী হে?

—কেন, সেই প্রবাদ কি জানো না? 'একটি ফোঁটা মধুর তরে, রাজাপ্রজা সবাই মরে।'

—সে কী হে?

—শোনো তবে, খেতে খেতেই বলছি। খুব ছোট্ট কাহিনি, কিন্তু তার মধ্যেই সর্বনাশ, রাজানাশ।

—বলো ভাই, আমরা খেতে খেতেই শুনি।

—শোনো তবে সেই কাহিনি। একটি ফোঁটা মধুর তরে—

—আসল ব্যাপারটা খুলেই বলো না হে! শুধু বারবার একই কথা বলছ কেন?

—বলছি কী আর সাধে। একটি ফোঁটা মধুও ফেলো না মাটিতে।

—বলি, কারণ একটা কিছু বলবে তো?

—বলছি, বলছি, সেই কথাই তো বলছি। এই বলে লোকটি মধুর বাটিতে রুটি ডুবিয়ে, খুব সাবধানে রুটি খেতে লাগল—যাতে একটি ফোঁটা মধুও মাটিতে না-পড়ে।

বাকি তিন শিকারিও খুব সাবধানে খেতে লাগল, ভয় পেয়ে। অন্য শিকারি তখন শুরু করল তার কাহিনি—

একদিন এক রাজা একফোঁটা মধু ফেলে দিয়েছিলেন রাজবাড়ির উঠোনে। ফেলে দিয়েছিলেন না কী করে পড়ে গিয়েছিল কে জানে। মধুর গন্ধ পেয়েই একটি মাছি ভনভন করে উড়ে এসে বসে পড়ল মধুর ওপর। কোথায় ওঁত পেতে বসেছিল টিকটিকি। মাছিটাকে গব্‌গব্‌ করে গিলে ফেলল সে। কাছেই একটা বেড়াল চোখ বন্ধ করে ঘুমোচ্ছিল বোধ হয়। টিকটিকির পায়ের শব্দে ওর ঘুম গেল ভেঙে। সঙ্গে সঙ্গে একলাফে টিকটিকির ঘাড়ে পড়ে থাবার একঘায়েই ওটাকে মেরে ফেলল সে।

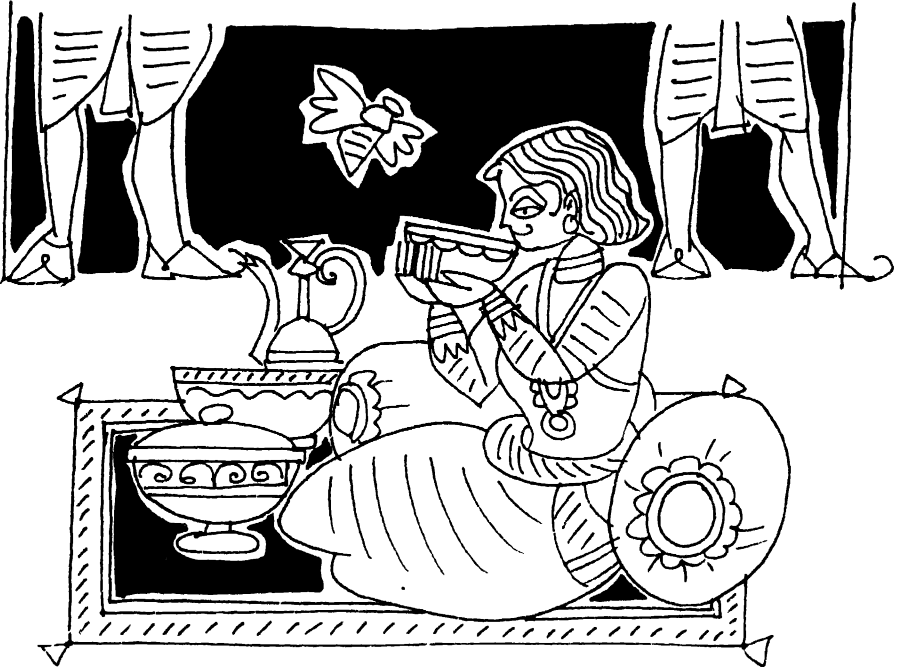
ঠিক সেই সময় রাজবাড়ির দারোয়ান তার পোষা কুকুরটাকে নিয়ে সেইদিকেই যাচ্ছিল। বেড়াল দেখলেই কুকুরদের রাগ বেড়ে যায়। তার ওপর দারোয়ানের কুকুর আবার হেঁজিপেজি নেড়িকুত্তা নয়, খাস পাহাড়ি কুকুর। দারুণ রাগী। বিড়ালকে দেখেই ঘ্যাঁক করে তেড়ে গেল। বিড়াল তো প্রাণভয়ে দৌড়। উঠোন পেরিয়ে একেবারে সদর দরজায়। কিন্তু কুকুরের সঙ্গে পারবে কেন? বিড়াল এমন একটা জায়গাও পেল না যে, লাফ দিয়ে উঠে পড়ে প্রাণ বাঁচায়। কিছু ভাববার আগেই পাহাড়ি কুকুর ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিড়ালটার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলল।

বাকি তিন শিকারি তখন খাওয়া বন্ধ করে চোখ বড়ো বড়ো করে শুনছিল। লোকটা গল্প বলতে বলতে, অতি সাবধানে আর-এক কামড় রুটি খেল। তারপর বলল—

ওদিকে বিড়ালটাও ছিল একজনের পোষা বিড়াল। সে তার পোষা বিড়ালের ওই অবস্থা দেখে, লাঠির একঘায়ে পাহাড়ি কুকুরটার মাথা ফাটিয়ে দিলে। কুকুরের মালিক সেই দারোযান ছুটতে ছুটতে এসে পড়েছিল ততক্ষণে। ওর কোমরে ছিল ভোজালি। ব্যস—ওর কুকুরের মাথা ফাটাতে দেখে, সে ভোজালির এককোপে লোকটার মুন্ডু ফেলে দিল ধড় থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। একজন তেড়ে গেল দারোয়ানের দিকে। আর একদল লাঠি সড়কি রামদা নিয়ে বাঁচাতে এল দারোয়ানকে। ধুন্ধুমার কাণ্ড। মারমার শব্দ। তারপর—দু-দলে জোর দাঙ্গা। দু-দলেই মরতে লাগল। চারদিকে—লাশ পড়ল। যারা মরেনি, আধমরা,—তাদের চিৎকারে রাজবাড়ি ভরে গেল।

শুনেই, রাজা তার একদল সেনা নিয়ে ছুটে এল দাঙ্গা থামাতে। কিন্তু মারামারি তখন তুঙ্গে। রাজা এসেছে না কে এসেছে, কে কার খবর রাখে। ভিড়ের মধ্যে কে একজন, ভোজালির এককোপে রাজার মুন্ডুও মাটিতে ফেলে দিলে।



ব্যস! অমনি একদল জোর গলায় চেঁচিয়ে বলল, এ হচ্ছে ষড়যন্ত্র। রাজাকে মেরে ফেলার জন্যই কুকুরবেড়ালের মারামারি লাগানো হয়েছে। যারা রাজাকে মেরেছে, তাদের খতম কর—খতম কর—

তারপর গোটারাজ্যে জোর লড়াই। ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই! দোরদালান ভেঙে লোপাট। যে যাকে পারছে, মারছে। যাকে বলে নির্বিচারে হত্যা। ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি, জোয়ানমদ্দ সবাই খুন হতে লাগল। দেশজুড়ে গৃহযুদ্ধ। এরই মধ্যে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানিও সমানে চলতে লাগল। রাজা না-থাকলে যা হয়। একেবারে অরাজক অবস্থা।

ফল হল এই। প্রতিবেশী এক রাজা দেখলেন, দেশ-দখলের এই তো সুযোগ। সেই রাজা তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশ অধিকার করে নিলেন।

তাহলেই বোঝো,—'একটি ফোঁটা মধুর তরে—
রাজা-প্রজা সবাই মরে।'

গল্প শুনে বাকি তিনজন শিকারি ভয়ে জুজু। ওদের খাওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গেল। কে জানে বাবা, যদি একফোঁটা মধু মাটিতে পড়েই যায়। তাহলে! শিকারি তখন বুঝতে পারল যে, বাকি তিনজন দারুণ ভয় পেয়েছে। সে নিজেও খুব ভয় পেয়েছে—এমনি ভাব দেখিয়ে, খুব সাবধানে মধুতে রুটি ছুঁইয়ে, আর-এক গ্রাস চিবুতে লাগল।

তারপর বলল, তোমরা দেখছি, শুধু রুটিই চিবুচ্ছ। তা-ও ভালো, কিন্তু মনে রেখো 'এক

ফোঁটা মধুর তরে, রাজাপ্রজা সবাই মরে।'

বলেই চলল, মৌচাক ভাঙতে যাওয়াও বিপদের কারণ হল হে! আমরা এই যে মৌচাক ভেঙেছি—কখন কী হয় কে জানে!

একজন সাহস করে বলল, কী সব যে বলো না তুমি—কোনো মানে হয়?

শিকারি বলল, শোনো তবে, বলি—

একজন চাষি, প্রায়ই মৌচাক ভাঙতে চলে বনবাদাড়ে। একবার হঠাৎ নজরে পড়ল, লম্বা একটা গাছের অনেক উঁচু ডালে মৌচাকের মতো কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে। সেদিন ঘুরে ঘুরে হয়রান, সারাটা দিন কেটেছে মৌচাকের সন্ধানে, কিন্তু কোথাও তা পায়নি, তাই গাছে উঠতে লাগল সে। গিয়ে দেখে কোথায় মৌচাক! মগডালে একটা বাঁদর বসে আছে। চাষি তো রেগে আগুন। সব পণ্ডশ্রম! ভাবল—এ বাঁদরের মাংসই ঝল্‌সে খাওয়া যাবে। যেই না ভাবা অমনি চলল বাঁদর ধরতে। লোকটার মনের ভাব বুঝতে পেরে, সরু সরু ডাল ধরে বাঁদর, আরও ওপরের দিকে উঠতে লাগল। লোকটাও সরু ডাল ধরে উঠতে গেল। কিন্তু সরু ডাল ভার সইবে কেন? লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

বাকি তিনজন শিকারি, মধুর বাটিতে তখন আর হাতও দিচ্ছে না, পাছে দু-এক ফোঁটা মধু মাটিতে পড়ে। ওরা একসঙ্গে বলে উঠল,—তারপর?

ওই শিকারি বলল, তারপর সেই বাঁদর গাছ থেকে তরতর করে নেমে এল নীচে। লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে দেখে ওর মনে দয়া হল। ঠেলেঠুলে লোকটাকে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসাল। তারপর ছুটে গেল একটা পুকুরে। একটা নারকোলের মালায় জল নিয়ে এসে লোকটার চোখেমুখে ছিটোতে লাগল।

একসময় জ্ঞান ফিরে পেল লোকটা। বাঁদরটাকে কাছে পেয়ে খপ করে ধরে ফেলল সে, আর গলা টিপে মারল।

শিকারি বলল, তার ফলটাও কী হল শোনোই না।

বাড়ি ফিরে মরা বাঁদরটাকে ছুড়ে দিয়ে ওর বউকে বলল, নাও রাঁধো গে যাও, দারুণ খিদে পেয়েছে।

ওর বউ তো মানুষের মতো দেখতে ওই জন্তুটাকে দেখে বলল, ওটা আবার কী?

লোকটা দেমাকে ডগমগ হয়ে বলল, কী করে বাঁদরটাকে ধরেছে। বলল, বোকা বাঁদর পুকুর থেকে জল এনে ওর মুখেচোখে দেবার সময়, খপ করে ওকে ধরেছে, তারপর গলা টিপে—শুনতে শুনতে ওর বউ রেগে ফেটে পড়ল একেবারে। চেঁচিয়ে হাট বসিয়ে দিল যেন। বলল, তুমি একটি আস্ত শয়তান, তুমি মানুষ নও, পিশাচ! যে তোমার প্রাণ বাঁচাল, তাকেই মেরে ফেললে। বদমাশ! এই বাঁদরটা তোমার চেয়ে অনেক মহৎ। তুমি পাপী। তুমি মরে আস্তাকুঁড়ের কুকুর হয়ে জন্মাবে—এই রইল তোমার সংসার। তোমার মুখদর্শনও পাপ। কোনদিন আমাকেও তুমি গলা টিপে মেরে ফেলবে।

এই বলে, ওর স্ত্রী সেই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, আর ফেরেনি। সন্ন্যাসিনী হয়ে এক মঠে গিয়ে থাকতে লাগল।

লোকটা কিন্তু দিব্যি বানরের মাংস রান্না করে খেল। খেয়েই পেটের অসুখ। সেই অসুখেই মরল শেষে চাষি।

বাকি তিন শিকারি বলল, ঠিক হয়েছে। যেমন কর্ম তেমনি ফল।

যে গল্প বলছিল, সেই শিকারি বলল, তারপর লোকটা সত্যি আস্তাকুঁড়ের কুকুর হয়ে জন্মাল। ওকে কেউ চিনতে না-পারলেও, ওর সন্ন্যাসিনী বউ ওকে চিনতে পারত। দেখলেই মেরে দুর দুর করে তাড়িয়ে দিত।

ওরা বলল, এর সঙ্গে সম্পর্কটা কী?

শিকারি বলল,—আরে, মধু নয়, মৌচাক। মধু হলে তো রাজাপ্রজা সবাই মরে। মৌচাক ভাঙতে গেলেও নিস্তার নেই। যারা সত্যি সত্যি মৌচাক ভেঙে মধু খায়, তাদের ভাগ্যে কি জানি কী আছে। আমরা তো মৌচাকও ভেঙেছি—মধুও খাচ্ছি।

গল্প শুনতে শুনতে একজনের বাটি থেকে কয়েকফোঁটা মধু মাটিতে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ওই শিকারি, 'ওরে বাপরে, কী সর্বনাশ হল রে' বলে ছুটে পালাতে গেল।

বাকি তিনজনেও ভয়ে ভোঁ-দৌড়। কোথায় যে রাতের অন্ধকারে পালাল কে জানে। যে শিকারি গল্প বলছিল, সে একটু পরেই ফিরে চারবাটি মধুতে রুটি ডুবিয়ে খেয়ে ফেলল। তারপর তার সে কী হাসি।

রাতের অন্ধকারও যেন ভেঙে খানখান হয়ে গেল।

ছবি। সুব্রত মাজী



সোনালি খরগোশ ও সোনালি বাঘ

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

সোনালি খরগোশ একদিন সোনালি বাঘের কাছে গিয়ে বলল, 'চলো, কাল সকালে আমরা মাঠে যাই। ধান কাটা হয়েছে। জমি থেকে ধানসুদ্ধ খড় জোগাড় করতে হবে।' সোনালি বাঘ বড়ো ভালোমানুষ। সে খুব খুশি। তাহলে খরগোশ তার বন্ধু হল, কাল থেকে খুব ভাব জমে উঠবে। বাঘের প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল।

পরের-দিন পুব আকাশ লাল হতেই বাঘ তৈরি হয়ে নিল। সঙ্গে নিল কিছুটা ভাত আর কিছু রান্না-করা মাংস। তাড়াতাড়ি সে এসে গেল খরগোশের বাড়িতে। তারপর দুজনে একসঙ্গে রওনা দিল মাঠের দিকে। খরগোশও সঙ্গে নিয়েছে একটা পুঁটলি, কিন্তু তার ভেতরে রয়েছে কিছুটা বালি আর একতাল গোবর।

ভোরের মিষ্টি রোদ্দুরে বাঘ মাঠে নেমে ধানসুদ্ধ খড় জোগাড় করতে লাগল। কিন্তু খরগোশ দিব্বি খড়ের ওপর শুয়ে রইল, তার কোনো তাড়া নেই।

হঠাৎ খড়ের বিছানা থেকে উঠে বসে খরগোশ বলল, 'বাঘ. আগে আমরা খেয়েদেয়ে নি, পরে কাজ করব।'

বাঘ পরিশ্রমী প্রাণী। সে বোঝে আগে কাজ, কাজ ফেলে রাখতে নেই। তাই সে কাজ করতে করতে বলল, 'আগে কিছুটা কাজ করি, পরে খাওয়া যাবে।'

খরগোশ চোখ নাচিয়ে বলল, 'তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো। কিন্তু এটা মনে রেখো, জ্ঞানীগুণীরা বলেছেন যে আগে খায় সে মাংসভাত পায়, আর যে পরে আসে সে পায় গোবর আর বালি।'

কথা শেষ করেই খরগোশ লাফিয়ে চলল জমির পাশে যেখানে তাদের খাবারের পুঁটলি রয়েছে। দূরে মাঠে বাঘ নিচু হয়ে কাজ করছে, খরগোশ মজা করে তার সবটুকু মাংসভাত খেয়ে ফেলল। খাওয়াদাওয়া শেষ করে সে চলে গেল এক বিরাট গাছের তলায় আর ঝিরঝিরে হাওয়ায় গাছের ছায়ায় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

মাথার ওপরে প্রচণ্ড রোদ্দুর। ঘামে নেয়ে গিয়েছে বাঘ। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। অনেকক্ষণ কাজ করে অনেক ধান সে জোগাড় করেছে। কাজেই ভীষণ খিদেও পেয়েছে তার। সে এগিয়ে গেল খাবারের পুঁটলির দিকে। গিয়ে দেখে তার পুঁটলি নেই, পড়ে রয়েছে শুধু খরগোশেরটা। ক্লান্তিতে চিৎকার করে বাঘ বলল, 'তুমি কি আমার মাংসভাত খেয়ে নিয়েছ?'

অবাক হয়ে অদ্ভুত গলায় খরগোশ বলল, 'তা কী করে হবে? আমি মোটেই তোমার জিনিস কিছু খাইনি। কিন্তু আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি, কী হয়েছে তা আমি জানি। জ্ঞানীগুণীর কথা কি আর মিথ্যে হয়? একেবারে হাতেনাতে ফলে গিয়েছে। তুমি দেরি করলে আর তাই তোমার খাবার হয়ে গেল গোবর আর বালি। আমি আগেই বলেছিলাম। বলো, বলেছিলাম কি না?'

সরল বাঘ খরগোশের কথাই মেনে নিল। পেট কেমন করছে, তবু সত্যি ব্যাপারটা সে অস্বীকার করবে কেমন করে?

আবার মাঠে নামল বাঘ। সারা বিকেল সে একমনে কাজ করে চলল। খরগোশ কিন্তু তেমনি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে রইল।

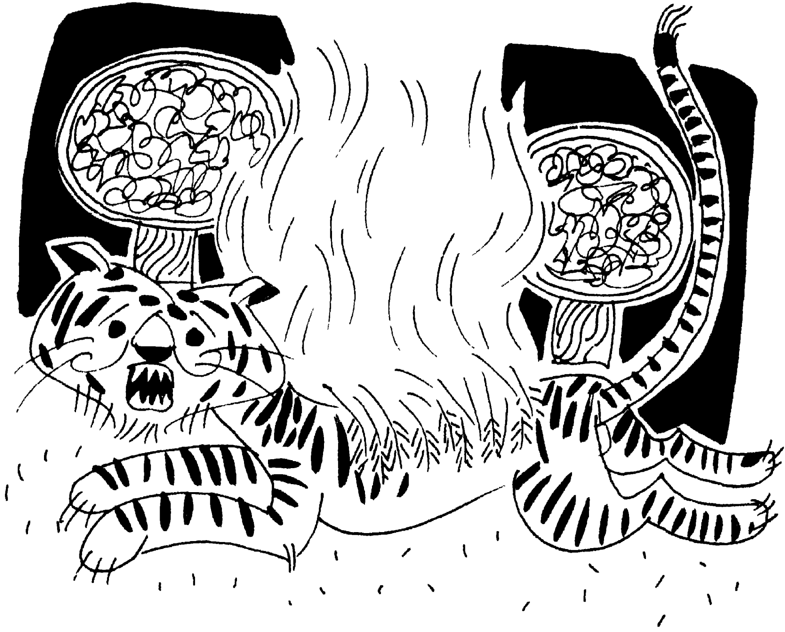
রোদ্দুর কমে এল, সূর্য ডুবুডুবু হল, সন্ধ্যা নেমে এল। বাঘ অনেক ধানসুদ্ধ খড় জড়ো করেছে। খাটুনিতে পা কাঁপছে, কোমর ধরে গিয়েছে, ঘুমে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসছে, তবু আবার আনন্দও হচ্ছে। ফসলের আনন্দ, এরচেয়ে বড়ো আনন্দ আর কী আছে?

খরগোশ কিন্তু একগুচ্ছ ফসলও তোলেনি। বাঘ ধানসুদ্ধ খড়ের আঁটি পিঠে ফেলে রওনা দিল বাড়ির পথে।

খরগোশ বলল, 'বাঘ, দেখো ভাই, আমার কেমন জ্বর জ্বর করছে, গা পুড়ে যাচ্ছে। আমি হাঁটতেই পারছি না। আমিটা যে কী বোকা। সারাদিন রোদ্দুরে ঘুমিয়ে আমার এই দশা হল।'

ভালোমানুষ বাঘ খরগোশকে বলল, 'তাতে কী হয়েছে? তুমি আমার পিঠে উঠে খড়ের ওপর বসে পড়ো। আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

কিছুদূর পথ চলার পরে খরগোশ তার লুকিয়ে-রাখা চকমকির বাক্সো বের করে খড়ে



আগুন ধরিয়ে দিল। বাঘের যেন কেমন সন্দেহ হল। সে হাঁটতে হাঁটতেই বলল, 'কিরকম যেন চটপট আওয়াজ হচ্ছে খরগোশ?'

'আর বলো কেন বাঘ! তুমি তো আওয়াজ শুনছ? আমার দাঁতগুলো যে এদিকে কিড়মিড় করছে, আর জ্বরে আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে।' খরগোশ কাঁপা গলায় বলল।

দেখতে দেখতে রোদে-পোড়া শুকনো খড়ে আগুন ধরে উঠল। আগুন ভালোভাবে ধরতেই এক লাফে পিঠ থেকে নেমে খরগোশ পথের পাশে এক ঝোপে ঢুকে পড়ল। বাঘ কিছু বোঝার আগেই তার পিঠের চামড়া ভীষণভাবে পুড়ে গেল, জ্বালা করতে লাগল। ছোটো বড়ো ফোসকায় ভরে গেল তার সারাটা পিঠ।

ফসল পুড়ে গেল। মনের দুঃখে বাঘ পথ হেঁটে চলেছে। হঠাৎ দেখতে পেল পথের পাশে বোকা বোকা চোখে খরগোশ বসে আছে।

হুংকার ছেড়ে বাঘ বলল, 'ওরে শয়তান বিশ্বাসঘাতক শত্রু, আমার পিঠে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তুই দৌড়ে পালিয়েছিস্। আর এখন দিব্যি বসে আছিস্। আমি তোর এই কাজের উচিত শাস্তি দেব। তোকে আমি মেরেই ফেলব।'

মাথা নাড়িয়ে খরগোশ বলল, 'সে কী কথা? এর আগে আমি তোমাকে কোনোদিন

দেখিনি, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়ই ছিল না। আমি কী করে তোমার ক্ষতি করলাম? কিছু যে বুঝতেই পারছি না! তবে আমার মনে হচ্ছে, তুমি ভুল করে আমাকে বক্‌ছো। অবশ্য এরজন্য তোমাকে ভাই দোষ দিতে পারি না! আমার অনেক ভাই বোন ভাইপো বোনঝি আছে যারা অবিকল আমার মতো দেখতে। ভুল তো তোমার হতেই পারে। কিন্তু বন্ধু, তোমার পিঠে এত ফোসকা পড়ল কেমন করে?'

মনমরা হয়ে বাঘ বলল কেমন করে দুষ্টু খরগোশ তার এই দশা করল। খরগোশ খুব আস্তে আস্তে বলল, 'ছিঃ ছিঃ, এমন কাজও করে? যাকগে, যা হবার হয়েছে। তবে আমি তোমার আরামের ব্যবস্থা জানি। তুমি পুরু বাকলের একটা গাছের গুঁড়িতে জোরে জোরে পিঠ ঘষতে থাকো, দেখো কেমন আরাম পাবে। এরচেয়ে ভালো ওষুধ আর নেই।'

ভালোমানুষ বাঘ, সে বিশ্বাস করতেই শিখেছে। খুঁজে-পেতে সে মোটা গুঁড়ির একটা গাছ পেল, তার বাকল এবড়োখেবড়ো কিন্তু খুব পুরু। জোরে জোরে ঘষতেই ফোসকাগুলো গেল ফেটে, ঝরঝর করে পিঠ থেকে রক্ত গড়াতে লাগল। ব্যথায় বাঘের চোখমুখ কুঁকড়ে গেল। ভীষণ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বাঘ এগিয়ে চলল তার বাড়ির দিকে।

পথের পাশে বাঘ দেখতে পেল বোকা বোকা মুখ করে বসে আছে সেই খরগোশ। চোখ-ভরতি জল নিয়ে বাঘ বলল, 'ওরে শয়তান বিশ্বাসঘাতক খরগোশ! তুই আমার এমন করলি? তোকে দেখাচ্ছি মজা। তোকে আমি মেরেই ফেলব।'

ভান করে অবাক হয়ে খরগোশ বলল, 'সে কী কথা? তোমায় তো কোনোদিন দেখেছি বলে আমার মনে হচ্ছে না। তোমার ক্ষতি আমি কেমন করে করব? বুঝেছি, তোমারই বা দোষ কী, ভুল তো হতেই পারে। আমার অনেক ভাই বোন ভাইপো বোনঝি যে আমারই মতো দেখতে। তুমি বোধহয় গুলিয়ে ফেলেছ। যাক্‌গে।'

বাঘ কাঁচুমাচু হয়ে ক্ষমা চাইল। আহা ভালোমানুষ সরল বাঘ!

খরগোশ বলল, 'যা হোক, যা হবার হয়েছে। কিন্তু তোমার পিঠ গড়িয়ে রক্ত পড়ছে কেন ভাই?'

বাঘ তাকে সব বলল, কেমন করে খরগোশ তার এই সর্বনাশ করল। গাছের গুঁড়িতে ফোসকাগুলো ঘষতেই যে তার এমন হল।

খরগোশ দুষ্টুমি-ভরা চোখে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ছিঃ ছিঃ, এমন কাজও করতে আছে! চিন্তা কোরো না, এর খুব ভালো ওষুধও আছে। বন্ধু, তুমি এক কাজ করো। নদীর পাশে যে বালি রয়েছে তাতে যদি চেপে চেপে তুমি গড়াগড়ি দাও, তবে খুব আরাম পাবে।'

ভালোমানুষ বাঘ বিশ্বাস করল, কেন-না বিশ্বাস করতেই সে শিখেছে। নদীর কিনারে গিয়ে সে চিত হয়ে বালির ওপর শুয়ে পড়ল। চেপে চেপে গড়াগড়ি দিল। বালিগুলো তার ফেটে-যাওয়া নরম ফোসকার মধ্যে ঢুকে গেল, দগদগে ঘায়ে বালির ঘষা লাগায় সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। ব্যথায় গড়াগড়ি যেতে লাগল, তাতে ব্যথা আরও বেড়ে গেল।

কী আর করে! খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাঘ চলে, পিঠ টানটান করে সে আর হাঁটতে পারছিল

না। কিন্তু কিছু দূর যেতেই দেখে, বোকা বোকা চোখে পথের ধারে সেই খরগোশ বসে আছে। মরিয়া হয়ে বাঘ বলল, 'ওরে খরগোশ, এবার তুই আর রেহাই পাবি না। তোকে আমি এবার ঠিক মেরে ফেলব।'

যেন আকাশ থেকে পড়ল এমন ভাব করে খরগোশ বলল, 'আমি তোমায় চিনি না, আগে কোনোদিন দেখিওনি। আমার মতো দেখতে আমার অনেক আত্মীয় শরিক রয়েছে, বোধহয় তুমি ভুল করে গুলিয়ে ফেলেছ। আমি তো কিছুই জানি না। কিন্তু সে যাকগে। বন্ধু, তোমার পিঠে এমন ভয়ানক ঘা হল কেমন করে? ইশ্, একেবারে সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে ওগুলো। তবে তোমার ভাগ্য খুব ভালো, আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি একটা কুয়োর খোঁজ জানি, সে কুয়োর কাছে তুমি যা চাইবে, যা ইচ্ছা করবে তাই পাবে। সে কুয়ো ইচ্ছাপূরণ-কুয়ো। তুমি তার কাছে গিয়ে বলো, তোমার ঘা এখুনি সেরে যাবে।'

ভালোমানুষ বাঘ, ব্যথায় সে কষ্ট পাচ্ছে। সে অনুরোধ করল খরগোশকে, 'ভাই তুমি সত্যি খুব ভালো। কিন্তু আমি তো সে-কুয়ো চিনি না! তুমি আমায় নিয়ে যাবে ভাই?'

'আমার পেছনে পেছনে এসো।' বাঁকা চোখে খরগোশ বলল।

খরগোশ বাঘকে একটু দূরের একটা কুয়োর পাশে নিয়ে গেল। 'বাঘ, তুমি কুয়োর মধ্যে তাকাও, নীচে তাকিয়ে তুমি তোমার ঘা সারাবার ইচ্ছে জানাও। খুব মন দিয়ে তাকিয়ে তবেই বর চাইবে।' খরগোশ তাকে আদেশের সুরে বলল।

আহা! ভালোমানুষ বাঘ! বাঘ মন দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে সেই কুয়োর মধ্যে। এইবার তার ইচ্ছেটা সে জানাবে। হঠাৎ আচমকা পেছন থেকে ধাক্কা মারল সেই খরগোশ। অন্যমনস্ক ছিল সোনালি বাঘ, তার মন ছিল কুয়োর মধ্যে। প্রচণ্ড শব্দ হল, ছিট্‌কে পড়ল কিছু জল, বাঘ ডুবে গেল। বাঁচবার চেষ্টা করল অল্পক্ষণ, তারপর কুয়োর ভেতর থেকে আর কোনো শব্দ বেরুল না।

সোনালি খরগোশ এই রকমই। আগে অনেক কষ্ট দিল, ভীষণ যন্ত্রণা দিল—শেষকালে ভালোমানুষ সরল বিশ্বাসী সোনালি বাঘকে সে মেরে ফেলল। এরা এমনই হয়।

ছবি। সুব্রত মাজী



এক যে কুমির, এক যে শেয়াল

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

এক যে ছিল কুমির। বাস করত এক নদীতে। নদীর পাড়ের কাছাকাছি অল্পসল্প জলে ঘুরেফিরে বেড়াতে ভালোবাসত সে। সেই নদীর কিনারায় ছিল একটি পাথর। তারই নীচে থাকত ছোট্ট এক কাঁকড়া।

কাঁকড়া আর কুমিরের মধ্যে ছিল দারুণ বন্ধুত্ব। দুজনে মুখোমুখি বসে অনেকদিন গল্প আর গল্পে দিব্যি সময় কাটিয়ে দিত।

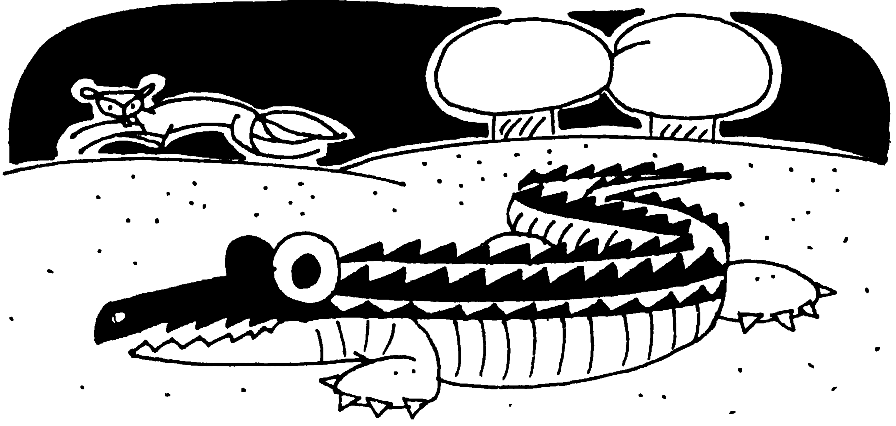
বেজায় খিদে পাওয়াতে কুমির একদিন নদীর কিনারায় সেই পাথরের কাছাকাছি কাঁকড়ার ঘরের দোরগোড়ায় এসে হাঁক পাড়ল, কাঁকড়াভাই, বাড়ি আছো?

—কে? কাঁকড়া মুখ বাড়িয়ে জবাব দিল।

তারপর কাঁকড়া কুমিরকে দেখতে পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বলল, বলো কী খবর?

কুমির চারপাশ দেখে নিয়ে একটু নিচু গলায় কাঁকড়াকে বলল, শোনো ভাই কাঁকড়া ছোট্ট বন্ধু আমার, একটা কাজ করতে হবে। যাও, একবারটি শেয়ালকে জল খাবার জন্যে ডেকে আনো। সে যখন মনের সুখে জল খেতে থাকবে, সেই সুযোগে আমি ওকে খেয়ে ফেলব।



শেয়ালের কথা শুনে কাঁকড়া চুপচাপ বসে রইল। কোনো কথা বলল না। নড়লও না।

কাঁকড়ার মধ্যে কোনোও ভাবান্তর না-দেখে কুমির বলে উঠল, কী হে ভায়া, চুপচাপ বসে রইলে যে? তোমাকে যা করতে বললাম, করলে না যে!

কুমিরের মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁকড়া জবাব দিল, গিয়ে কোনো লাভ হবে না। আমি বললেও শেয়াল জল খেতে আসবে না। শেয়াল ভালো করেই জানে যে, তুমি এই নদীতে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকো। কখনও মড়ার মতো ভেসে থাকো। সুতরাং শেয়াল আমার কথায় মোটেও বিশ্বাস করবে না। সে বড়ো বেশি চালাক।

নদীর ধারে সবুজ গাছপালার ভেতরে ছিল একটা সুন্দর ফুলের গাছ। সবসময় ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে থাকত গাছটা। গাছের চারপাশও ঝরে-পড়া ফুলে ভরতি হয়ে থাকত সবসময়। মনে হত, যেন ফুলের বিছানা কেউ সাজিয়ে রেখেছে। অনেক ভেবেচিন্তে কুমির বলল, তাহলে এক কাজ করা যেতে পারে।

—কী? কাঁকড়া জিজ্ঞাসা করল।

কুমির বলল, শোনো, আমি নদীর পাড়ে এসে মরার ভান করে শুয়ে থাকব। তুমি ওই ফুল এনে আমার সারা শরীর ঢেকে ফেলবে। কেউ মরে গেলে যেমন করে ফুল দেওয়া হয়ে থাকে আর কি! আমার এমন দশা দেখতে পেলে, শেয়াল পরম নিশ্চিন্তে ঠিকই জল খেতে আসবে।

যেমন কথা, তেমন কাজ। পরিকল্পনাটা কাঁকড়ারও মনে ধরল। নদীর পাড়ের ফুলগাছটার কাছাকাছি কুমির মড়ার মতো পড়ে রইল। একটা একটা করে ফুল এনে কাঁকড়াও ঢেকে ফেলল কুমিরের প্রায় সারা শরীর। তারপর সে চলল শেয়ালের সন্ধানে।

শেয়ালের সঙ্গে দেখা হতেই কাঁকড়া বলল, কী শেয়ালদাদা, নদীতে জল খেতে যাবে না?

অনেকদিন তো তুমি জলটল খেতে যাচ্ছ না। নদীর জলটা কিন্তু আজকাল আরও বেশি পরিষ্কার।

—যাবো কী করে। শয়তান কুমিরটা তো ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। তেষ্টা থাকলেও জল খাবার উপায় কোথায়? শেয়াল উত্তর দেয়।

—আর ভাবনা নেই। এবার নিশ্চিন্তে যেতে পারবে।

—কেন, কেন? শেয়াল জানতে চেষ্টা করে।

কাঁকড়া এবার জবাব দেয়, ও আপদ বিদায় হয়েছে। ফুলগাছটার তলায় গিয়ে দেখবে চলো কুমিরটা কেমন মরে পড়ে আছে। ফুল দিয়ে সাজিয়ে এইমাত্র আমি আমার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে এলাম। শত হলেও বহুদিন তো পাশাপাশি ছিলাম আমরা।

কাঁকড়ার কথায় শেয়াল এল কুমিরকে দেখতে।

চুপচাপ শুয়ে ছিল কুমির। সারা শরীর তার ফুলে ফুলে ঢাকা।

শেয়াল খুব ভালো করে দেখল সবকিছু। তারপর কাঁকড়াকে বলল, কুমিরভায়া বেঁচে নেই, সত্যিই খুব দুঃখের কথা। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার খুব অবাক লাগছে। জানলে, আমাদের দেশে কুমির যখন মারা যায়, তখন কিন্তু তারা লেজ ধীরে ধীরে নাড়তে থাকে।

শেয়ালের কথা কানে যেতেই কুমির হঠাৎ তার লেজ নাড়তে শুরু করে। তা দেখেই শেয়াল সেখান থেকে দে ছুট!

—নদীতে আর জল খেয়ে কাজ নেই।

কথাগুলি ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েই বনের আড়ালে মিলিয়ে যায় শেয়াল।

ছবি। সুব্রত মাজী



সোনালি কচ্ছপের গল্প

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বুড়ো আর বুড়ি। সেই নদীর ধারে ডালপাতার ঝুপড়ি-বাঁধা ঘর। কেউ নেই তিন কুলে। বুড়ো সারাদিন বসে বাগান কুপোয়, নয় তো কাঁড়বাঁশ কাঁধে ফেলে বনে বেরোয় খরগোশ শিকার করতে। আর বুড়ি, ঘরের কাজ সেরে বসে বসে কাটনা কাটে : ঘ্যাঁঘোর চরকা ঘ্যাঁঘোর। কোনোদিন বা মন লাগলে খালুই পেতে মাছ ধরতে নামে নদীতে। যত কথা ছিল দুজনার, সব লক্ষবার করে বলা হয়ে গিয়েছে। কাজেই কারোর মুখে আর কথা নেই।

একদিন, তড়পা বর্ষা হয়ে গেছে—জলে তখনো তার সবজে ঝলস, বুড়ি জাল পেতে বসে আছে নদীতে। সময় যাচ্ছে। মাছ আর পড়ে না। তিরতির তিরতির ঢেউ, আনমনে চেয়ে বসে আছে। হঠাৎ জালটা যেন খলবল করে উঠল। বুড়ি তাড়াতাড়ি তুলে দেখে এতটুকুনি কচ্ছপ একটা। ছোট্ট। দেখতে ভারী চকমকে। কী ভেবে জলে ছেড়ে দিল বুড়ি কাচ্ছপটাকে। আরেকটু উজিয়ে গিয়ে বসল আবার জাল পেতে। সময় যাচ্ছে। তিরতির তিরতির ঢেউ। জালটা খলবল করে উঠল আবার। তাড়াতাড়ি তুলে দেখে আবার সেই কচ্ছপ। বুড়ি মাঝনদীতে ছুঁড়ে দিল কচ্ছপটাকে। তাবপর বেশ খানিকটা গিয়ে জাল

ফেলল এবারে।

কিন্তু বার বার তিন বার। আবার সেই কচ্ছপ। এবারে অধৈর্য হয়ে একেবারে পেছনবাগে ওকড়াজঙলার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলার জন্যে যেই তুলেছে কচ্ছপটাকে, হঠাৎ শোনে কে যেন আবছাগলায় তাকে ডাকছে—ও মা, ও মা—

এ দিক ও দিক চায়—কই, কেউ তো নেই! মনের দিশা, আর কী! নাগাল পার করে ফেলতে হবে এবারে। আচ্ছা বিঘ্ন! কিন্তু আবার হঠাৎ সেই আবছা গলা—ও মা, ও মা—যেন খুব কাছ থেকে ডাকছে কেউ। কোথায়? আবার সেই ডাক। অবাক! ও মা, এ যে তারই হাত থেকে বেরোচ্ছে গলা! ভয় পেয়ে বুড়ি কচ্ছপ-টচ্ছপ জালটাল সবসুদ্ধু ফেলে চমকে উঠে সাত পা পিছিয়ে গেল।

মাটিতে পড়ে কচ্ছপটা মুখ উঁচু করে বলল, ভয় পেয়ো না, ও মা!

ভয় পাব না? বলে কী! চোখদুটো ঠেলে আসছে বুড়ির।

ঘরে নিয়ে চল না আমায়, ও মা—

একটু যেন নিডর লাগছে। ঝকমকে ডুরি কাটা ভারী সুন্দর ছোট্ট কচ্ছপটা। কে জানে, হয়তো ভগবানের দান। বুড়ি একটু হাঁফ কাটিয়ে নিয়ে মুখ খুলল, কোথায় রাখব তোমায় বাছা ঘরে!

পায়ের ওপর উঠে আসছে যেন। যাক গে। কত্তা যদি রাজি হন, চল।

কত্তাকে কিছু বলতে হল না তেমন। বাব্বা, একটা সঙ্গী হল যা হোক। ভালো হল, ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন।

কাজেই বুড়োবুড়ির ঘরে একটু নতুন সাড়া পড়ল।

কচ্ছপ বুড়িকে ডাকে মা, কত্তাকে ডাকে বাবা। তাকে নিয়ে সারাদিন আবার গল্পসল্প হাসিখুশি—সরগরম। আর ক্রমে বুড়োবুড়ি দুজনেই টের পেল ও শুধু কথাকওয়া কচ্ছপ নয়, বুদ্ধিসুদ্ধিও ওর ঠিক জ্ঞানবন্ত মানুষের। আরো অবাক! আগে থেকেই কী করে যেন বুঝতে পারে ও ভবিষ্যৎ—নিশ্চয় শাপভ্রষ্ট দেবতাটেবতা কেউ—আহা, ভগবানের দয়া হল অ্যাদ্দিনে বুড়োবুড়ির ওপর...

বছর ঘুরে যায়। একদিন সকালে বুড়ো ধনুক বাঁধতে বসেছে বনে যাবার মানস করে, কচ্ছপ গম্ভীর হয়ে এসে বলল, এখন আর বেরোনো নয়, বাবা।

কেন রে?

একটা আঁটোসাঁটো শক্তসমথ ভেলা গড়ো দিকি গাছ ফেঁড়ে!

কেন?

প্রলয় বান আসছে বাবা, কেউ বাঁচবে না।

সে কী!

হ্যাঁ বাবা, সাত দিনের মধ্যে দেশ ভেসে যাবে প্লাবনে, এখখুনি তৈরি না হলে উপায় নেই।

বুড়ো আর বাক্য ব্যয় না করে বসে পড়ল গাছ কেটে ভেলা গড়তে। চওড়া গাছের গুঁড়ি, শক্ত বনের লতা—তিন-চার দিনের মাথায়ই তৈরি হয়ে উঠল সুন্দর ভেলা একখানা—কাঁচা বাঁশের রেলিং। আর, সাত দিন পুরতে পেল না, ছোট্ট একখানা কালামুখো মেঘ হঠাৎ শাঁ শাঁ করে উঠে এল সূর্য আড়াল করে—দেখতে দেখতে সারা আকাশ নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠল জমাট কালোয়—ওলোপালোট হাওয়ার সোয়ার হয়ে এল তীব্র-বর্ষার ধারা, উপকরণ হয়ে ঝরতে লাগল ক্ষান্তিহীন... ফুলে ফেঁপে উঠল নদীর জল, ঢুকে এল ডাঙা ছাপিয়ে—দেশ ভাসিয়ে—হিংস্র আনন্দে ছড়িয়ে পড়তে লাগল...

ভেলায় বসে অসহায় হয়ে দেখতে লাগল তিন জনে, বুড়ো বুড়ি আর কচ্ছপ—শুধু জল আর জল, আর জলের তোড়ে ভেসে চলেছে তাদের ভেলা জানে না কোথায়। মাঝে মাঝে দেখা যায় হাঙাভাঙা ঘরদুয়োর গাছপালা আনুষমানুষ পশুপাখি ভেসে যাচ্ছে—ভেলা চলে দ্রুত পাশ কাটিয়ে। হঠাৎ ত্রস্ত হয়ে উঠল কচ্ছপ : মনে হচ্ছে ভেলার বাঁধন আলগা হয়ে গেছে বাবা, যাচ্ছি আমি—ভেলার নীচে সাঁতরে বাঁধ ঠিক করছি গিয়ে। ওপরে সাবধান। কচ্ছপ লাফিয়ে নেমে গেল ভেলার তলায়।

আবার জল আর জল। ভেলার ওপর নিষ্পলক বুড়োবুড়ি, নীচে সামালদার কচ্ছপ। ভেলা চলেছে জলের তোড়ে কে জানে কোথায়—

এমনি সময়, বুড়ো দেখে ভাঙা গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে মস্ত একটা বাঘ—ভেলা দেখে প্রাণপণ ভেসে আসছে তাদের দিকে। জলে একেবারে চুপসে গেছে। তবু, বাঘ তো বটে! বিরাট বাঘ! বুক কেঁপে ওঠে। যদি উঠে পড়ে—বুড়োবুড়ি আকুল হয়ে উঠল। কিন্তু বাঘটা ভেলায় না উঠে খালি কাকুতি করতে লাগল, ও ভালোমানুষের ছেলে, একটু উঠতে দাও না গো একটা ধারে। কোনোদিন তোমাদের উপকার ভুলব না।

কিন্তু যতই হোক, বাঘ যে! কী করে।

উঠুক না—

বুড়ো চেয়ে দেখে কিনার দিয়ে মাথা জাগিয়েছে কচ্ছপ। উঠবে?

ওঠো এসে।

খানিক না যেতে আবার এক কালকেউটে সাপ। জলের মধ্যেই কুণ্ডলি হয়ে উঠছে এক একবার, আবার বেড় ভেঙে ঢেউয়ের ওপর জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে ফণা। কী ফণা! লকলক করে বেরিয়ে আসছে জিভ—ইস্পাতের দাঁতালো চাবুক যেন। উঠে আসবে না কি? হাতপা সেঁধিয়ে যেতে লাগল বুড়োবুড়ির। কিন্তু না, ভেলার পাশ পাশ আপ্রাণ সাঁতরে সাঁতরে কাকুতি করতে লাগল সাপটা, উঠতে দাও না গো একটা ধারে, ও মা, লক্ষ্মী মা—

কালসাপকে ঠাঁই দেব? জেনেশুনে? দেখে ভেলার কিনার দিয়ে মাথা জাগিয়েছে কচ্ছপ : উঠুক না একটা কোণে—

উঠবে?

ওঠো এসে।

ভীষণ-ভয়ংকর দুই সঙ্গী পাশে নিয়ে প্রাণটুকু হাতে অসাড়ে বসে রইল বুড়োবুড়ি। জল

জল জল, কিছুতে আর কাটে না সময়। হঠাৎ শোনে মানুষের গলা—বাঁচাও—-বাঁচাও—এক চমকায় ঘোর ভেঙে গেল। দেখে একেবারে সামনে একজন যুববয়েসি আকুলিবিকুলি করছে ভাসার চেষ্টায়, কোনোমতে হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইছে ভেলার কিনারা—

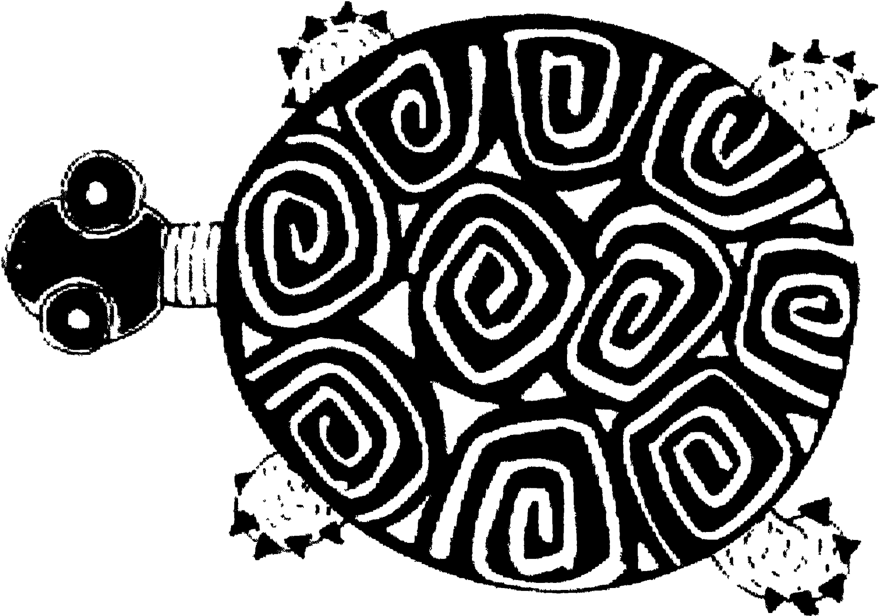
কী করা—চঞ্চল হয়ে উঠল বুড়োবুড়ি—

কী আর করা, একটা মানুষ মরবে চোখের ওপর! —বুড়োবুড়ি দুজনে মিলে জাপটে তুলল তাকে।

পুরো সাত দিন সাত রাত্তির—ও এর দিকে এ ওর দিকে চেয়ে, কারো মুখে শব্দ নেই। তারপর ঝড়বাতাস জিরেন পড়ল, বৃষ্টি থামল, আঁধা কাটতে লাগল আকাশে, জল নামতে শুরু করল জমির থেকে। অবশেষে, চমকা ধাক্কা দিয়ে ভেলাটাও একদিন কাদাজমির খাঁজে গেল আটকে।

নদী ছোটো হয়ে গেছে। যতদূর দেখা যায় ধু ধু করছে নরম ডাঙা। এখান সেখানে জমে আছে কাঠকুটো ভাঙা, মরা জন্তুজানোয়ার। বাঘ, সাপ, তারপর যুবোবয়েসি লোকটি—একে একে নেমে গেল ভেলা থেকে—যাই তা হলে আমরা! বার বার বলেও ফুরোয় না কৃতজ্ঞতা : যদি কখনো কাজে লাগি, দেখো ঠিক আবার দেখা হবে। চলে গেল যে যার মতো। তারপর, সবাই চলে যাবার পর, বুড়োবুড়ি নামল ভেলা থেকে—কচ্ছপকে নিয়ে হাঁটা দিল, যদি ফের পুরোনো ডেরার হদিস মেলে।

গন্ধ শুঁকে চলে। একদিন মনে হল হঠাৎ, এই তো সেই ঠাঁই! জলে লেপাপোঁছা, তবু মন



বলে কথা... সেইখানেই আবার নতুন করে বাঁধল বুড়ো। বেঁকারি-বেড়া দেয়া খেত, ডালপাতার কুঁড়ে। দিন না যেতে আবার রৌদ্র হেসে পড়ল উঠোনে।

এ দিকে বাঘও ফিরেছে তার পুরোনো বনে। হঠাৎ একদিন শোনে বনের মধ্যে কীসের যেন সোর। আবার কী হল? গা ঢেকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখে সাজ-পরা হাতিঘোড়ার শোভাযাত্রা চলেছে বনের পথে—তাঁবু পড়ল ঝালর দেয়া—রাঁধাবাড়ার ধোঁয়া আর গন্ধ আসে গাছপালার ফাঁক দিয়ে, লোকলশকর ঘুরছে ফিরছে, ব্যস্তসমস্ত—

ব্যাপার কী? বাঘ আড়ি পেতে শোনে, রাজকন্যা চলেছেন পাশের রাজ্যের রানির নেমন্তন্নে! লোকলশকর ফিসফিসিয়ে কানাকানি করে—রাজকন্যার সঙ্গে চলেছে চুন্নিপান্না বসানো সোনার পেঁটরায় ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন।

খুব কি দামি জিনিস নাকি? তাঁবুর চার দুয়োরে থানা পেতে চার দল সৈন্য, মাছি গলতে পায় না। বাঘ ভাবল, জীবনদাতার ঋণ শুধতে হয় তো এমনি জিনিস দিয়ে। রাত যখন অঘোর, পেটকোঁচড়ে থাবা গুটিয়ে মাছির চেয়েও নিঃসাড়ায় বাঘ গিয়ে ঢুকল তাঁবুর মধ্যে। তাঁবুর ভেতরে তাঁবু—মাঝমহল। হিরের দীপ শিয়রে জ্বেলে দুধের ফেনার মতো বিছানায় ঘুমিয়ে আছে পরমাসুন্দরী কন্যা, আর তার মাথার কোনায় জ্বলছে এতটুকু বিঘতপ্রমাণ এক বাক্সো।

চুরি ধরা পড়ল কাকভোরে। তাঁবু তোলপাড়, তল্লাট তোলপাড়—লতায়পাতায় বন তোলপাড়। চোর ধরা পড়ল না। রাজকন্যা থমথমিয়ে ফিরে গেলেন নিজের পুরী। রাজা ঢেঁড়া দিলেন দেশে-দেশান্তরে—যে খোঁজ আনবে বাক্সের, তার হবে সোনার ঘর। ততক্ষণে রুদ্ধশ্বাস ছুটে বাঘ সোজা হাজির বুড়োবুড়ির ঘরে—

প্রাণ দিয়েছ, তা তো শোধবার নয়। ধরো, এই বাক্সোটুকু এনেছি তোমাদের জন্যে।

সে তো শুধু বাক্সো নয়, তার মধ্যে বুদ্ধভগবানের স্মরণচিহ্ন। হাতে ধরা মাত্র বুড়োর প্রাণটা যেন শীতল হয়ে গেল। কিন্তু কিছু বলার আগেই দেখে বাঘ চলে গেছে।

ক'দিন পরে এল যুববয়েসি লোকটি। এখন তো আর দুঃখবিপাক নেই, চোখে পড়ে চেহারাটি তার ভারী ভালো। বলল, জীবন বাঁচিয়েছ আমার, ভাবলাম যাই দেখা করে যাই।

এসো বাবা এসো। ভারী খুশি, খুশিতে কী করে, কী না করে—

ভেতরে ঢুকতেই দেখে সে সোনার বাক্সো—মাটির ঘরে প্রদীপের মতন জ্বলছে...

এমন জিনিস কোত্থেকে পাওয়া গেল?

বুড়োবুড়ি শতউচ্ছ্বাসে বলতে বসল বাঘের আশ্চর্য কথা।

বাঘ দিয়ে গেছে সোনার বাক্সো?

সে আর কথা বাড়াল না। কোথাও চাইল না। সোজা উঠল গিয়ে রাজধানী শহর. সোজা রাজার সভায়।

চোর ধরা পড়ল সহজেই—বমাল। রাজ্যের লোকের চোখের ওপর দিয়ে হাতেপায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে বুড়োবুড়িকে নিয়ে যাওয়া হল রাজার কাছে। থাকো শুধু সাতটা দিনের মনে—আলোহাওয়াবন্ধ লোহার কারাগারে। এত বড়ো চুরির দণ্ড জীবন-দণ্ড। স্থির হল সাত

দিন গেলেই সেই প্রাণদণ্ড হবে বুড়োবুড়ির।

এ দিকে পরদিন বুড়োবুড়ি কুঁড়েয় দেখা করতে গেছে বিষরাজ কালকেউটে। গিয়ে দেখে ঘরদোর হা হা করছে খোলা, দোর-গোড়ায় থুম্ হয়ে বসে ছোট্ট সোনালি কচ্ছপটা—

ব্যাপার কী?

আর ব্যাপার! কচ্ছপ কাঁদছে। আগেই কেন ভাবিনি—অবুদ্ধির দান নেয়া আর বুদ্ধিমন্তের উপকার করা—সে তো এই রকমই হয়।

এখন উপায়?

আমি জানি না কিচ্ছু! —কচ্ছপ কাঁদতে লাগল।

সাপ আর কিছু বলল না। নিমিষে হাওয়ার বেগে উড়ে চলল রাজার পুরী, এ মহল ও মহল পার হয়ে সটান রাজকুমারীর ঘরের মধ্যে। মাঝরাত্তিরে ঘুমে অঘোর রাজার মেয়ে—সাপরাজ নিঃসাড়ায় পিঁপড়েকামড়ের মতন একটুখানি দাঁত দিল রাজকুমারীর ঘুমন্ত চোখের দুটো পাতার ওপরে। প্রাণে মরল না রাজকন্যা, কিন্তু চোখদুটো তার অন্ধ হয়ে গেল।

তারপরে ঘটনা ঘটল এইরকম। রাজকন্যা সকালবেলায় জেগে দেখেন চারধার অন্ধকার। হাতড়াতে লাগলেন—চিৎকার—চিৎকার—কান্নাকাটি। ছুটে এল যে যেখানে দাসীবাঁদিরা। তখুনি। খবর গেল রাজার কাছে। রাজা ছুটে এলেন। সারা রাজ্যের ওঝাপুরুত বদ্যিভিষক্ ছুটে এল ভিড় করে। মানুষে যা পারে সব করা হল ওষুধবিষুধ। রাজকন্যার দৃষ্টি ফিরল না। দু দিন তিন দিন পাঁচ দিন গেল, রাজা রাজ্যজুড়ে ঢেঁড়া দিলেন—রাজকন্যার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবে যে, অর্ধেক রাজত্ব তার।

আর সাপরাজা? সাত দিনের দিন—শেষ দিন যে দিন বুড়োবুড়ির জীবনে, লোহার কারাঘরের সুতোর রন্ধ্র খুঁজে ঢুকল সে ঊষারাতে। বুড়োবুড়ির সাড় করে বলল সব—শোনো গো শোনো, এই হল বৃত্তান্ত। আর শোনো, এই রইল বিষনাশা ওষুধ।

আর কী হবে ওষুধে? কী করে দেব, কখন বা দেব ওষুধ?

এখুনি রক্ষীকে বলে খবর পাঠাও রাজার কাছে—এখখুনি, বলো—আমি ফিরিয়ে দেব রাজকন্যার চোখের নজর।

চোখ ছলছলিয়ে উঠল বুড়োবুড়ির। বিষকেউটে কালসাপ। কী বলবে তাকে? বলার আগেই দেখে সাপ চলে গেছে।

বুড়োবুড়ির রাজত্বে মন্ত্রী হল গিয়ে কচ্ছপ। ঝকমকে জামাজোড়া পরা সেই ছোট্ট কচ্ছপ। ছোটো হলে কী হয়, কথা বলে ঠিক মানুষের গলাতে। আর তার চেয়ে জ্ঞানবুদ্ধি কোথাও কোনো রাজ্যের কোনো মানুষের যে থাকতে পারে তা বিশ্বাসই হয় না বুড়োবুড়ির।

ছবি। সুব্রত মাজী



থাও খামের কেরামতি

দেবব্রত মল্লিক

ছেলেটির নাম থাও খাম। তখন তার বয়স দশ। তার কেউ ছিল না। না বাবা না মা। এই দুনিয়ায় কেউ আপন ছিল না তার। তার দুটো পা-ই ছিল খোঁড়া। সে হাঁটতে পারত না। লোকে দয়া করে যা দিত তা খেয়ে তার কোনো রকম চলত। হাঁটতে না পারার জন্য এক জায়গায় বসেই তাকে কাটাতে হত। তার খেলারও কিছু ছিল না। সে সারাক্ষণ বসে বসে একটা কাজই করত। তর্জনীর ডগায় ঢিল নিয়ে একটা কিছুকে নিশানা করে ছুঁড়ে মারত। ওটাই ছিল তার খেলা। এতেই সে আনন্দ পেত। এইভাবে সে সারাদিন একের পর এক ছুড়তেই থাকত। এইভাবে ঢিল মারতে মারতে তার হাতের টিপ একদম অব্যর্থ হয়ে উঠল। খুব কমই তার লক্ষ্য ব্যর্থ হত।

থাও খামের এই খেলা দেখতে ছেলেমেয়েরা খুব মজা পায়। তাই তারা ঢিল জোগাড় করে হাতের কাছে এনে দেয়। তারপর থাও খামের ঢিল ছোড়া দেখে খুব উপভোগ করে। কী সুন্দর অব্যর্থ তার লক্ষ্য! ছেলেরা থাও খামকে একটা চার চাকার ছোটো ঠেলাগাড়ি গড়ে দিয়েছিল। ওই গাড়িতে বসিয়ে তারা তাকে তাদের সঙ্গে নানা জায়গায় নিয়ে যায়।

এভাবে ক্রমাগত ঢিল ছোড়ার অভ্যাস করতে করতে থাও খামের হাতের টিপ আরো

নিপুণ হয়ে উঠল। এইভাবেই চলছিল। তারপর একদিন ভারী মজার কাণ্ড হল। একদিন এক বটগাছের নীচে এসে হাজির হল ছেলের দল। সঙ্গে থাও খাম। ওর ছোড়ার জন্য ঢিল জড়ো করা আছে। সবাই ওকে ঘিরে বসে আছে। মজার খেলা দেখার জন্য।

থাও খাম তার মাথার ওপরে বটের বড়ো বড়ো পাতা তাক করে ঢিল ছুড়তে লাগল। ছেলেরা হা করে তাই দেখছে। শেষে দ্যাখে, ঢিল মেরে মেরে পাতা কেটে কেটে সে হাতির এক মূর্তিই গড়ে তুলেছে। তারপর সে এক ভেড়া গড়ে তুলল। দেখতে দেখতে এক মেষ গড়ে তুলল।

তখন পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো পড়ে গাছের তলায় মাটিতে ওইসব জন্তুর বিরাট বিরাট ছায়া গড়ে উঠেছে। বাতাস বইছিল সেই সময়। পাতা নড়ছে। তাতে মনে হতে লাগল, জীবজন্তুগুলো জীবন্ত। তারা লাফাচ্ছে। ছেলেরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল, হাততালি দিতে লাগল। থাও খামের মনেও ভারী আনন্দ। এইটি হয়ে উঠল তাদের ভারী প্রিয় খেলা। বার বার তারা এই খেলা খেলে মজা করতে লাগল।

একদিন তারা মনের আনন্দে খেলছিল। হঠাৎ কোথা থেকে এক শোভাযাত্রা এসে হাজির। শোভাযাত্রার মাঝখানে রয়েছেন রাজা। রাজা এই শহরে বেড়াতে এসেছিলেন। রাজার প্রহরীদের দেখে ছেলেরা ভয় পেয়ে যে যেদিকে পারল দৌড়ে লুকিয়ে পড়ল। থাও খাম একা পড়ে রইল গাছের আড়ালে। গাছের নীচে ছায়ায় পৌঁছে রাজা দেখলেন, বড়ো ঠান্ডা আর তাজা বাতাস বইছে। তিনি বিশ্রামের জন্য থামলেন। গাছের নীচে তাকিয়ে দেখেন, মাটিতে সব জন্তুর ছায়া। পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে। থাও খামের তৈরি হাতি ভেড়া ও মেষগুলো দুলছে সেই আলোতে।

রাজা প্রহরীদের আদেশ দিলেন, যে এ কাজ করেছে তাকে খুঁজে আনার জন্য। ছেলের দল পালিয়ে গেছে সেখান থেকে। শুধু পড়ে আছে থাও খাম। কারণ সে বেচারা নড়তে চড়তে পারে না। প্রহরীরা তাকে রাজার কাছে ধরে নিয়ে এল। থাও খাম রাজাকে সব খুলে বলল, কেমন করে সে জন্তুদের ছবি গড়েছে।

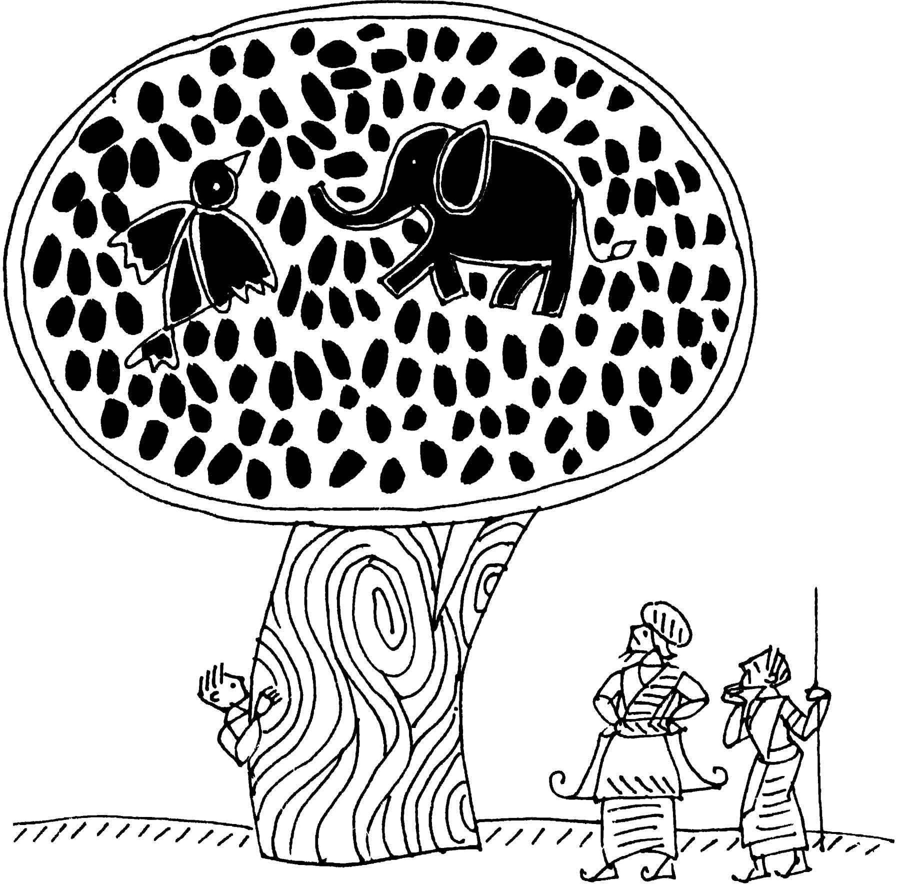
রাজা বললেন, বেশ এখন আমাকে করে দেখাও।

থাও খাম অমনি কয়েকটি ঢিল নিয়ে ওপরে এক এক করে ছুড়তে লাগল। রাজা দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তিনি অবাক। একটা পাতায় একটি ছোটো পাখি হয়ে গেল। থাও খামের অসাধারণ নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হলেন। এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, এই যে খোকা, শোনো, আমার সঙ্গে প্রাসাদে এসো। তোমাকে দিয়ে আমি কিছু কাজ করিয়ে নেব।

অতএব থাও খামকে হাতির পিঠে চড়িয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হল।

পরের দিন রাজদরবারে ছিল মন্ত্রীদের সভা। রাজা তাঁর ভৃত্যদের আদেশ করলেন সিংহাসনের পেছনে কয়েকটি পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্য। পর্দায় একটা ফুটো করা হল। তার পেছনে বসিয়ে রাখা হল থাও খামকে।

রাজা থাও খামকে বললেন, তোমার ঠিক সামনে একজন লোক বসে থাকবে। ওই



লোকটি কথা বলার জন্য যেই মুখ খুলবে, এমনি তুমি তার মুখে পর্দার ফুটো দিয়ে একটি করে কাদার নাড়ু টুক করে ছুড়ে মারবে। বুঝলে?

থাও খাম রাজার কথা শুনে অবাক! রাজা তাকে এমন অদ্ভুত ব্যাপার করতে বলছেন কেন?

রাজা তখন চোখ নাচিয়ে বললেন, কী অবাক লাগছে? তাহলে বলি শোন। এই মন্ত্রী বড্ড বেশি কথা বলে। সে আর কাউকে বলতে দেয় না। আমি দেখতে চাই, এটা বন্ধ করা যায় কি না।

কিছুক্ষণ পর সব মন্ত্রী এসে আসন গ্রহণ করলেন। সভা শুরু হল। সেই বাক্যবাগীশ মন্ত্রী তো আর জানেন না, আজ তার ভাগ্যে কী আছে! তিনি তার অভ্যাসমতো কথা বলতে শুরু করে দিলেন। যেই তিনি মুখ খুলেছেন, থাও খাম একটা কাদার নাড়ু টুপ করে তাঁর মুখে

ছুড়ে মারল। মন্ত্রী ভাবলেন, নিশ্চয়ই পোকাটোকা হবে। তিনি থু থু করে সেটা ফেলে দিতে চাইলেন। কিন্তু রাজা রয়েছেন সামনে। কেমন করে তা করা যায়। চুপচাপ সেটি তাঁকে গিলে ফেলতে হল।

যতবার তিনি মুখ খুললেন, ততবার ওই একই কাণ্ড ঘটল। সুতরাং তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। তখন রাজা অন্যান্য মন্ত্রীদের বলতে বললেন। অন্য মন্ত্রীরা অবশেষে বলার সুযোগ পেয়ে আজ খুব খুশি। কারণ, তাঁদেরও অনেক জরুরি বিষয় বলার ছিল।

সভা শেষে রাজা বাক্যবাগীশ মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, আজ তোমার কী হল? তুমি যে কিছুই বললে না?

উত্তরে মন্ত্রী বললেন, আমার অনেক কিছু বলার ছিল মহারাজ। কিন্তু যখনই আমি বলতে চেষ্টা করি, প্রত্যেকবার কী রকম এক পোকা উড়ে এসে আমার মুখের ভেতর ঢুকে পড়ে, তাই আমি কিছু বলতে পারিনি।

রাজা তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে দেখে খুশি হলেন। বললেন, ভারী অদ্ভুত তো? যাকগে, সামনে মন্ত্রীপরিষদের আর এক সভা রয়েছে। দয়া করে মনে রেখো, অন্য মন্ত্রীরা যেমন আজ তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে পেরেছেন, সেদিনও যেন তাই পান। আশা করি, তুমি বুঝতে পেরেছ, আমাকে বলার জন্য তাঁদেরও অনেক জরুরি সব কথা থাকে।

মন্ত্রী ভীষণ লজ্জা পেলেন। তাড়াতাড়ি মুখ ধোয়ার জন্য বেরিয়ে গেলেন। এরপর থেকে বাক্যবাগীশ মন্ত্রী সভায় এসে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করেননি। তিনি অন্য মন্ত্রীদের মন্তব্য ও প্রস্তাব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তাঁর পালা এলেই নিজের বক্তব্য বলতেন। ফলে, তাঁকে নিয়ে আর রাজার কোনো ঝামেলা রইল না।

থাও খামকে রাজা থাকতে দিলেন রাজপ্রাসাদে। সেদিন থেকে তার আর থাকা খাওয়ার কোনো অসুবিধা রইল না।

ছবি। সুব্রত মাজী



অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী শাশ্বতী রায়চৌধুরী

জঙ্গলে বুনো এক পেয়ারা গাছের তলায় একটা লোক থাকত। তাকে সবাই আলসেমশাই বলে ডাকত। সবাই এ নামে ডাকত কারণ সে ভীষণ অলস ছিল; জীবনে একটা দিনও কোনো কাজ করেনি। এমনকি খাবার জোগাড়ের জন্যও সে চাষবাস বা শিকার করত না। তার একটাই কাজ ছিল। সারাদিন পেয়ারাগাছের তলায় বসে থাকা আর অপেক্ষা করা কখন গাছ থেকে ফল ওর মুখে এসে পড়ে। লোকে ওকে গালাগাল করত, ইঁট পাটকেল ছুড়ত। কিন্তু তাতে তার কিছু এসে যেত না। আত্মরক্ষার জন্য যেটুকু কাজ করতে হয় সেটুকু পরিশ্রমও করতে চাইত না।

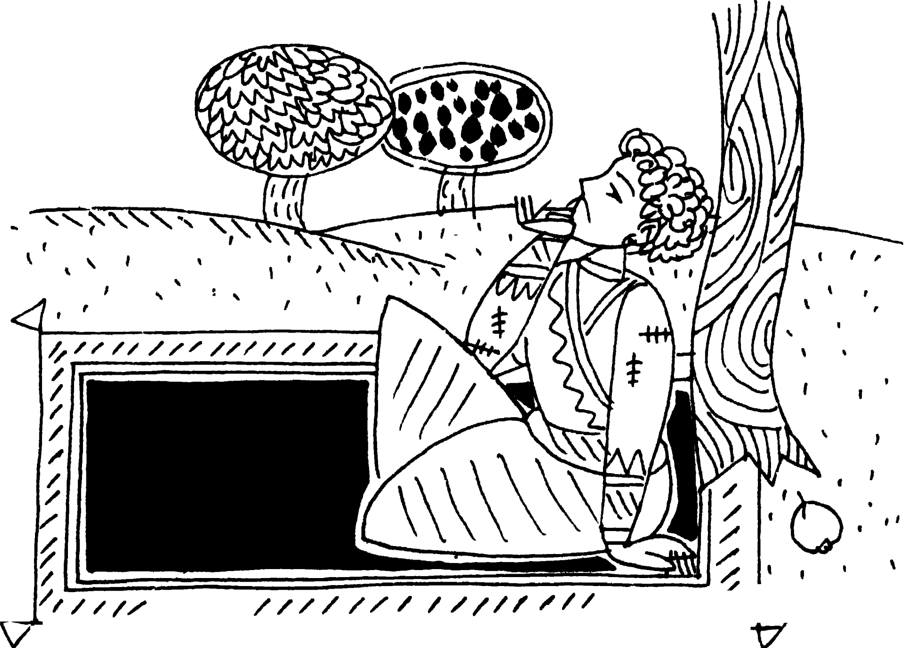
একদিন দারুণ ঝড়ে ওই গাছের কিছু পেয়ারা বাতাসে উড়ে দূরে গিয়ে পড়ল। রাজার ভাগনি তখন জলের ধারে বসে ছিল। বাতাসে উড়ে আসা একটা পেয়ারা ও তুলে নিয়ে খেল। এত ভালো কোনও ফল সে আগে খায়নি। সে প্রতিজ্ঞা করল এই পেয়ারাগাছ যার তাকে বিয়ে করবে। সে রাজাকে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা জানাল। রাজা আশ্বাস দিলেন যে ওই পেয়ারাগাছ যার তাকে খুঁজে বার করবেনই। তিনি ওই দেশে যাদের যাদের পেয়ারাগাছ আছে তাদের প্রত্যেককে গাছের একটা করে পেয়ারা নিয়ে রাজদরবারে আসতে আদেশ

দিলেন। রাজার ভাগনি সবার আনা পেয়ারা খেয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কারুর পেয়ারাই সেদিনকার সেই বাতাসে উড়ে আসা পেয়ারার মতো সুস্বাদু বলে মনে হল না। রাজা আর কারও পেয়ারাগাছ আছে কি না খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে আর একটামাত্র পেয়ারা-গাছ আছে। তবে সে গাছের মালিক এতই অলস যে রাজার ভাগনির সঙ্গে বিয়ে হতে পারে জেনেও রাজদরবারে পেয়ারা নিয়ে আসেনি।

রাজার ভাগনি একথা শুনে ঠিক করল যে সে নিজেই ওই পেয়ারাগাছের মালিকের সঙ্গে দেখা করে পেয়ারা খেয়ে আসবে। ওই গাছের পেয়ারা খেয়েই ও বুঝতে পারল যে এই সেই পেয়ারা। ও রাজাকে গিয়ে জানাল যে প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ও আলসেমশাইকে বিয়ে করবে। রাজা কী আর করেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আলসেমশাইয়ের সঙ্গে ভাগনির বিয়ে দিলেন। তবে রাজা তাঁর ভাগনিকে ওর প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করলেন, আর প্রাসাদেও থাকতে দিলেন না।

আলসেমশাই রাজার ভাগনিকে বিয়ে করে গাছের তলায় বেশ সুখে-শান্তিতে বাস করতে থাকল। আলসেমশাইকে ওর স্ত্রী খুবই ভালোবাসত। যা কাজের দরকার পড়ত তা ওর স্ত্রীই করে দিত।

কিন্তু হঠাৎ করে একদিন ওদের জীবনে দুর্ভাগ্য নেমে এল। পেয়ারাগাছে পেয়ারা হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আর ওর স্ত্রীও খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। আলসেমশাই ওর স্ত্রীকে খুব



ভালোবাসত। এর আগে কেউ কোনোদিন আলসেমশাইয়ের সঙ্গে এত ভালো ব্যবহার করেনি, বা এত যত্ন করেনি। বাধ্য হয়ে আলসেমশাই বউকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কাজ করতে শুরু করল। সে চারদিকে আরও পেয়ারাগাছ পুঁতল। সে সব গাছের পেয়ারা খেয়ে আর ওর সেবাযত্নে ওর বউ সুস্থ হয়ে উঠল।

আলসেমশাই যে কাজ করা শুরু করেছে এ খবরটা রাজার কাছেও পৌঁছোল। তাছাড়া ও যেভাবে রাজার ভাগনিকে সুস্থ করে তুলেছে, সে খবরে রাজা খুশি হয়ে ওদের প্রাসাদে ডেকে আনলেন।

প্রাসাদে আসলেমশাই খুব আরামে থাকতে শুরু করল। আগের মতোই কোনও কাজ করতে হত না। সে শুধু মনে মনে ভাবত যখন আমি গরিব আর অলস ছিলাম তখন সবাই আমাকে গালাগাল দিত। আর এখন আমি ধনী হওয়ার পর আমার আলস্য দেখেও তারা আমাকে শ্রদ্ধা করে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে, এর কোনও মাথা-মুন্ডু খুঁজে না পেয়ে ও খালি হাসত।

ছবি। সুব্রত মাজী

ফিলিপিনস্



কেশবতী কন্যা

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

ওই যে আমাদের গাঁয়ের পাশে যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, ওই যে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া জলরাশির ধারা দেখতে পাচ্ছ, কী মনে হয় তোমাদের? পাহাড় থেকে যে জলধারা নামছে, তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখো। মনে হবে, এক কেশবতী কন্যা পেছন দিয়ে বসে রয়েছে খাড়া উঁচু পাহাড়ের ধারে, আর তার লম্বা সাদা কেশরাশি পাহাড় বেয়ে নামছে। আমরা একে বলি, কেশবতীর ধারা, কেশবতী জলপ্রপাত। কেন বলি তাই শোনো।

অনেক অনেক কাল আগে আমাদের গাঁয়ে কিংবা ওই পাহাড়ে কোনো জল ছিল না। জলের কোনো উৎস নেই, কোনো ধারা নেই। আকাশের জল ছিল একমাত্র ভরসা। বৃষ্টির সময়ে গাঁয়ের লোকেরা জল ধরে রাখত। সেই জল খেত, সেই জলেই হত চাষবাস। আর যে বছরে হত খরা, বৃষ্টির নামগন্ধ নেই, সে বছরে অনেক দূর থেকে, পাহাড়ের ওপাশ থেকে জল বয়ে আনতে হত। ওখানে আছে একটা ছোটো নদী। কিন্তু সে জলে তেষ্টা মিটত। চাষবাস হত। অতদূর থেকে অত জল আনবে কে? ফসল হত না, বড়োই কষ্ট ছিল।

এই পাহাড়ি গাঁয়ে থাকত এক মেয়ে। খুব গরিব ঘরের মেয়ে। তার মেঘবরণ চুল,

দাঁড়কাকের বুকের পালকের মতো রং সে চুলের। এই কেশবতী কন্যার চুল পিঠ ছাড়িয়ে কোমর ছাড়িয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢেউ খেলত। কী যে তার নাম ছিল গাঁয়ের লোক ভুলে গিয়েছিল। তাকে ডাকত কেশবতী কন্যা বলে। সবাই তাকে ভালোবাসত। কেন-না, এমন হৃদয় আর কারও ছিল না। বড়ো ভালো সেই মেয়ে।

মেয়ের কেউ নেই, আছে এক বুড়ি মা। সে বিছানায় শুয়ে থাকে। সে অসুস্থ। তার সেবা করে মেয়ে। এতেই তার আনন্দ। মেয়ের ছিল একপাল শুয়োর। তা থেকেই মা-মেয়ের কষ্টের সংসার চলে যেত। কোনোরকমে। খরার সময় মেয়ে ভোর রাতে উঠে চলে যেত ওই দূরের ছোটো নদীতে। জল আনতে। তারপরে যেত পাহাড়ে। সেখানে বুনো ফল, কচু, রসাল গাছের গোড়া নিয়ে আসত। শুয়োরদের জন্য। মেয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শুধু খেটেই চলত। খুব কষ্ট মেয়ের। সংসারে কাজের লোক সে একা।

এমনি একদিনের কথা। ঝুড়ি হাতে চলেছে পাহাড়ে ফলমূল খুঁজতে। হঠাৎ পাহাড়ের একজায়গায় দেখল, একটা সুন্দর ওলকপি ফলে রয়েছে। ভালোই হল, রান্না করে মাকে দেব, নিজেও খাব। এই ভেবে সে ওলকপির কাছে গেল। পাতাগুলো আশ্চর্য সবুজ, পাতাগুলো খুব পুষ্ট।

ঝুড়ি নামিয়ে রেখে দু-হাতে জোরে টান দিল। গোড়া বেশ শক্ত। উঠে এল ওলকপি। ওলকপির নীচের অংশ বেশ বড়ো, লাল রঙের আর সুন্দর গোল। একটা ছোটো গর্ত হল পাহাড়ি কাঁকুরে মাটিতে। অবাককাণ্ড! সেই গর্ত থেকে ঝরনার জলের মতো জল বেরোচ্ছে। উপচে পড়ছে গর্ত। ভিজে যাচ্ছে আশপাশের মাটি। হঠাৎ, 'হুস' করে শব্দ হল। ওলকপি তার হাত থেকে লাফিয়ে পড়ল। আবার গর্তে বসে পড়ল। জল বন্ধ হয়ে গেল। মেয়ে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে। আনন্দে, ভয়ে, বিস্ময়ে।

খুব তেষ্টা পেয়েছে কেশবতী কন্যার। সে আবার তুলে আনল ওলকপি। আবার গর্ত ছাপিয়ে জল পড়তে লাগল। নিচু হয়ে মুখ কাছে আনল। প্রাণভরে জল খেল। ঠান্ডা বরফের মতো জল, ফলের রসের মতো মিষ্টি জল। গর্ত থেকে মুখ সরিয়ে আনবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের হাত থেকে ওলকপি লাফিয়ে পড়ল। ঠিক গর্তে। জলের ধারা বন্ধ হল।

বুনো লতাপাতার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়ে। অবাক চোখে পাহাড়ের চারপাশ দেখছে। পাহাড়কে আজ অনেক বেশি ভালো লাগছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এল। মেয়েকে যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল। মেয়ে এসে পড়ল একটা গুহার সামনে। আর দমকা হাওয়া নেই।

এদিক-ওদিক চাইতেই মেয়ে দেখল, সামনে একটা পাহাড়ের ওপরে বসে রয়েছে একজন লোক। তার সারাদেহ কটা রঙের লোমে ভরতি। লোমশ মানুষ। মেয়ের দিকে চেয়ে বলল, 'ও তুমি, তাহলে তুমিই আমার গোপন ঝরনার কথা জেনে ফেলেছ। শোনো, এ কথা তুমি কাউকে বলবে না। একজনকেও নয়। তুমি যদি বলো কিংবা কেউ যদি আমার ঝরনার জল নিতে আসে, আমি তোমাকে জ্যান্ত মেরে ফেলব। মনে রেখো আমার কথাগুলো। আমি এই পাহাড়ের দেবতা। ভুললে বিপদ।'

আর-একটা দমকা হাওয়া এল। মেয়ে ছিটকে এসে পড়ল পাহাড়ের নীচে। পাহাড়ের

নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়ে। আর দমকা হাওয়া নেই। সে আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে এল।

মেয়ে মাকে কিছুই বলল না। সেই কোন ভোররাতে চলে যায় দূরের নদীতে, জল আনতে। সারাদিন খাটে। কিন্তু, এরকম তো আগেও ছিল। তবু ঝরনার গোপন খবর জানার পর থেকে মেয়ে যেন আরও চুপচাপ হয়ে গিয়েছে।

এবারে প্রচণ্ড খরা। এককোঁটা বৃষ্টি নেই। আকাশে মাঝেমধ্যে মেঘ দেখা দেয়। সবাই চেয়ে থাকে ওপরপানে। না, বৃষ্টি হল না। মেঘ কোথায় উড়ে গেল। চাষের মাঠ ফুটিফাটা হয়ে গিয়েছে। মাটি আর পাথরে কোনো তফাত নেই। লাঙল দেওয়া যায় না মাটিতে। গ্রামবাসীর সে কী কষ্ট। জলের ধারা কোথায় আছে মেয়ে জানে। অথচ বলতে পারছে না। বললেই মৃত্যু। সব মানুষ, কচি-বুড়ো সবাই হাঁপাচ্ছে, জলের জন্য হাহাকার করছে। অতদূর থেকে কি নিত্যি নিত্যি এতদিন ধরে জল বয়ে আনা যায়? হায়! মেয়ে যদি জলের কথা বলতে পারত। কোনো পরিশ্রম নেই। পাহাড়ের ওপরে ওই ওলকপি সরিয়ে ফেল, গর্তটা গাঁইতি দিয়ে আরও বড়ো করো, উপচে পড়বে জল। মিষ্টি শীতল জল। ভাবে আর শিউরে ওঠে। মনে পড়ে সেই ভয়ানক মানুষটির কথা, লোমশ লোকটির কথা। সে নিজের মনেই চেপে থাকে। গুমরে মরে নিজের মনেই।

মনে মনে খুব দুঃখ পেতে লাগল কেশবতী কন্যা। এক চিন্তা সবসময়। তার খিদে চলে গেল, রাতে চোখের পাতা এক হয় না। শুধুই দুশ্চিন্তা। আস্তে আস্তে মেয়ে হয়ে উঠল এক নির্বাক প্রাণী। কোনো কথা বলে না। শুধু কাজ করে। কী যেন ভাবে। চোখে ছিল তার স্নিগ্ধ দীপ্তি, কোথায় গেল সেই উজ্জ্বলতা। প্রাণহীন চোখদুটোয় কোনো ভাষা নেই। গালদুটিতে ছিল গোলাপি ফুলের আভা। কোথায় গেল সেই আভা। আর আশ্চর্য! মেঘবরণ লম্বা চুল আস্তে আস্তে কেমন জট পাকিয়ে গেল, উশকো-খুশকো চুলে আর চেনাই যায় না কেশবতী কন্যাকে।

মা শুয়ে থাকলেও এসব বুঝতে পারে। একদিন মেয়ের রোগা রোগা হাতখানি ধরে মা করুণ গলায় বলল, 'বাছা, তোর কীসের কষ্ট? কী হয়েছে তোর? এত কাহিল হয়ে পড়ছিস্ কেন মা?'

মেয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল, চোখে আতঙ্ক, বুকের মধ্যে কেমন যেন করছে। কিছু বলতে পারলে সে হালকা হত। কিন্তু না, সে পারল না। কিছুই বলল না মাকে।

দিন চলে যায়, মাস বয়ে যায়। কারও জন্য তারা বসে থাকে না। কেশবতী কন্যার ঘন চুলের রাশির রং একেবারে পালটে গেল। বরফের মতো সাদা হয়ে গেল। চুলে পড়ে না চিরুনি, হাত পড়ে না মাথায়। পিঠ ছাপিয়ে সাদা রঙের কেশরাশি আলুলায়িত থাকে। কী ছিরি হয়েছে সে সুন্দর চুলের! লম্বা সাদা ঝোপ।

গাঁয়ের লোক মেয়েকে দেখে আড়ালে বলে, 'অবাককাণ্ড! একরত্তি মেয়ে, এই তো কচি বয়েস, কিন্তু মেয়ের চুল এমনধারা সাদা হয়ে গেল কেমন করে? এমন কাণ্ড দেখিনি কখনও।' মেয়েকে তারা খুব ভালোবাসে বলে আরও বেশি দুঃখ করে। মেয়ের কোনো খেয়াল নেই।

মেয়ে নিজের বাড়ির বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। উদাস চোখে পাহাড়ের দিকে কিংবা মেঘের চলার পথে তাকিয়ে থাকে। কখনও পথিকের হেঁটে যাওয়া দেখে। গাঁয়ের কোনো চেনা মানুষকে দেখে মেয়ে বিড়বিড় করে বলে,—দূরের ওই উঁচু পাহাড়ে...কিন্তু কথাটা শেষ করে না। জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরে, এত জোরে চেপে ধরে ঠোঁট যেন মনে হয় দাঁতের চাপে রক্ত ছুটে বেরুবে। রক্ত টলটল করে সুন্দর ঠোঁটে। গাঁয়ের মানুষ আধখানা কথা বহুবার শুনেছে। থেমে গিয়েছে পুরো কথা শোনার জন্য। আজও তা শুনতে পায়নি।

এমনি একদিনের কথা। মেয়ে উদাস চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেড়ার ধারে। কতশত ভাবছে মেয়ে। এমন সময় সামনের পায়ে-চলা পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একজন বুড়োমতন লোক। তার সব দাড়ি পাকা। হাওয়ায় দুলছে। তার হাতে জলের একটা পাত্র। ওই দূরের ঝরনা থেকে সে জল বয়ে আনছে। আহা! বুড়োমানুষ। তার পা কাঁপছে। অত দূরের পথে হাঁটা কি সহজ। হঠাৎ বুড়ো একটা পাথরে হোঁচট খেল। টাল সামলাতে পারল না। হুমড়ি খেয়ে পথে পড়ে গেল। ছিটকে গেল জলের পাত্র। জল গেল গড়িয়ে। পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ উঠে গিয়েছে, পাথরে লেগে কপাল ফেটেছে। রক্ত বেরুচ্ছে গলগল করে। মাথা নিচু করে বুড়ো ওঠবার চেষ্টা করছে।

আঁতকে উঠল কেশবতী কন্যা। ছুটে গেল বুড়োর কাছে। তার পোশাকের ধার থেকে ছিঁড়ে ফেলল একটুকরো কাপড়। নিচু হয়ে বসে পড়ল মেয়ে। আদরেযত্নে বুড়োকে বসিয়ে বেঁধে দিল তার আঘাতের জায়গাদুটো। রক্ত বন্ধ হল। বুড়ো গোঙাচ্ছে, চোখ ভিজে উঠেছে, যন্ত্রণায় মুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। মেয়ে করুণ চোখে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে রইল। বুড়োর গোটা মুখ বয়সের ভারে কুঁচকে গিয়েছে। যন্ত্রণায় কুঁচকে-যাওয়া চামড়া কাঁপছে। বুড়ো চোখ বন্ধ করে রয়েছে।

মনে মনে কেশবতী কন্যা বলল, 'আমি এত ভিতু? এত স্বার্থপর? নিজের কথাই শুধু চিন্তা করছি। আমার এত মৃত্যুভয়? ছিঃ ছিঃ! মাঠ শুকিয়ে গিয়েছে, ফসল জ্বলে গিয়েছে। খাওয়ার জল পর্যন্ত নেই। জলের হাহাকার। মানুষের এত কষ্ট। অথচ আমি জানি...। গাঁয়ের লোকের তো এত কষ্ট হবার কথা নয়। আমি তো উপায় জানি। আমার জন্যই এই বুড়ো মানুষের পা ভেঙেছে, কপাল ফেটেছে। ভিতু, ভিতু কোথাকার!'

এবার বোধহয় পাগল হয়ে যাবে মেয়ে। আর সহ্য করতে পারছে না, কথা চেপে রাখতে পারছে না। বুক বুঝি ফেটে যাবে। গলা শুকিয়ে উঠেছে। নাঃ, অনেক হয়েছে, আর না।

মেয়ে বুড়োর রক্তমাখা কপালে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'বাবা, দূরের ওই উঁচু পাহাড়ে একটা ঝরনা রয়েছে। ঝরনার মুখে বসানো রয়েছে একটা ওলকপি। ঝরনার মুখ থেকে ওলকপিটা তুলে নেবে। টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে। দূরে ফেলে দেবে। গাঁইতি চালিয়ে ঝরনার মুখের গর্তটা অনেক বড়ো করে দেবে। পাহাড়ের কোল ছাপিয়ে, পাহাড়ের গা বেয়ে জলের ধারা নামবে। অফুরন্ত জল। ঠান্ডা মিষ্টি জল। এ গল্পকথা নয়, সত্যি। আমি নিজে চোখে ঝরনার ধারা দেখেছি। আঃ, কী শান্তি।'

বুড়ো যেন কিছু বলবে। কিন্তু তাকিয়ে দেখে মেয়ে আর বসে নেই। পথ দিয়ে সামনে

হেঁটে চলেছে। পেছনে দুলছে লম্বা চুলের রাশি, বরফের মতো সাদা।

হঠাৎ মেয়ে দৌড়োতে লাগল। ছুটে গেল গাঁয়ের ভেতরে। চিৎকার করে বলল, 'সবাই বেরিয়ে এসো। সবাই। ওই দূরের পাহাড়ে একটা ঝরনা আছে। আমি জেনে এসেছি। সবাই এসো।'

গাঁয়ের মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। মেয়ের চারপাশে এসে দাঁড়াল। অনেকদিন পরে তারা কেশবতী কন্যার কথা শুনল। অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে মেয়ের দিকে। কারও মুখে কথা নেই। এ মেয়েকে তারা অবিশ্বাস করতে পারে না। এ কী কথা শোনাচ্ছে মেয়ে?

মেয়ে সব খুলে বলল। ডাগর চোখে সে চেয়ে রয়েছে গাঁয়ের মানুষের দিকে। মেয়ে বলল ঝরনার কথা, কেমন করে খুঁজে পেয়েছে সেই ঝরনা, কী করতে হবে তাদের। সব বলল। শুধু পাহাড়ের দেবতার সেই ভয়ানক কথার কিছুই জানাল না। দেবতার কথাও বলল না। মেয়েকে তারা সবাই খুব ভালোবাসে। অবিশ্বাস করবে কেন তার কথা? তারা মেয়ের পিছু পিছু চলল।

মেয়ে চলেছে এগিয়ে। পেছনে হাওয়ায় দুলছে কেশরাশি। অনেকের হাতে গাঁইতি, কারও হাতে ধারালো ছুরি। সামনে বেঁকে তারা পাহাড়ে উঠছে, মেয়ে পথ দেখিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পৌঁছে গেল গুপ্ত ঝরনার কাছে। নিচু হয়ে ঝরনার মুখ থেকে তুলে নিল সেই ওলকপিটা। দূরে ফেলে দিল। বলল, 'টুকরো টুকরো করে কেটে ফেল ওটাকে।'

একসঙ্গে কয়েকটা ছুরির আঘাত পড়ল ছোটো ওলকপির ওপরে। শত-টুকরো হয়ে গেল ওলকপি। ছোটো গর্ত থেকে জল উপচে পড়ছে। ঝিরিঝিরি জল। ভিজে উঠেছে পাশের পাহাড়ি মাটি।

কেশবতী কন্যা শান্ত মিষ্টি গলায় বলল, 'দেরি নয়, গর্তের মুখ বড়ো করতে হবে। গাঁইতি নাও। খুব তাড়াতাড়ি। যত বড়ো পারবে তত বড়ো করবে। তাড়াতাড়ি। নইলে...।' ঠোঁট কামড়ে ধরল মেয়ে।

অতশত দেখার সময় নেই। মনও নেই। অনেক গাঁইতি পড়ল গর্তের মুখে। মাটি উঠছে, নুড়ি উঠছে, জলের ধারা নামছে। ভীষণ শব্দ করে জল বেরুচ্ছে। পায়ের পাতা ডুবল, জল উঠছে, হাঁটু ডুবছে। জলের ধারা পাহাড়ের কোল ছাপিয়ে, গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে নীচে, গাঁয়ের দিকে, গাঁয়ের পাশ দিয়ে। ছোটো নদী বয়ে চলেছে গাঁয়ের পাশ দিয়ে। অফুরন্ত জলের উৎস, অফুরন্ত জলের ধারা। আনন্দে নাচছে গাঁয়ের মানুষজন, তারা জল ছিটিয়ে সবাইকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। আঃ, কী শান্তি!

হঠাৎ পাহাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে গেল একটা দমকা হাওয়া। এত লোকের চোখের সামনে থেকে নিমেষে মিলিয়ে গেল কেশবতী কন্যা। শুধু একজন নেই। সবাই আছে। কিন্তু এসব দেখার সময় নেই তাদের। তারা জানতেই পারল না, কেশবতী কন্যা এখন আর তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে নেই।

হঠাৎ একজন বলে উঠল, 'আরে! কেশবতী কন্যা কোথায়? সে কোথায় গেল?'

অন্য একজন বলল, 'সে বোধহয় বাড়িতে গিয়েছে। সবার আগেই চলে গিয়েছে। বুড়ি

মা একা রয়েছে।'

সবাই মেনে নিল তার যুক্তি। পাহাড় থেকে নেমে এল তারা। সবাই যেন অন্য মানুষ। নতুন শক্তি তাদের দেহে, মনে।

কিন্তু কেশবতী কন্যা তো আর তার বাড়িতে যায়নি। দমকা হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে সেই ভয়াবহ গুহার সামনে। পাহাড়ের দেবতা বসে রয়েছে। পাথরের ওপরে। চোখ জ্বলছে।

হুংকার ছাড়ল পাহাড়ের দেবতা, 'আমি নিষেধ করেছিলাম তোমাকে। ঝরনার কথা কাউকে বলবে না। সবাইকে বলে দিলে। তাদের নিয়ে এলে পাহাড়ি ঝরনার কাছে। তারা টুকরো টুকরো করে ফেলল আমার জাদু ওলকপি। তারা গাঁইতি চালিয়ে আমার গুপ্ত ঝরনার মুখ বড়ো করে ফেলল। আমি নিষেধ করেছিলাম। এবার আমি তোমায় জ্যান্ত মেরে ফেলব।' দেবতা দাঁতে দাঁত ঘষল।

কেশবতী কন্যার আলুলায়িত কেশরাশি পিঠের ওপরে হাওয়ায় দুলছে। মিষ্টি সুরে শান্ত গলায় মেয়ে বলল, 'গাঁয়ের মানুষজনের দুঃখ ঘুচেছে। আমি হাসিমুখে মরতে পারব। আনন্দে মরব। কোনো ভয় নেই আমার। আমি তৈরি।'

পাহাড়ের ভয়ানক দেবতা আকাশ ফাটিয়ে হেসে উঠল। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে সে হাসি হাজার হাসি হয়ে ফেটে পড়ল। 'তোমাকে মরতে হবে। কিন্তু অত সহজে তোমাকে মারব না। যন্ত্রণায় ছটফট করে কান্নায় ভেঙে পড়ে তিলে তিলে তোমায় মরতে হবে।'

মেয়ে শান্ত চোখে চেয়ে রইল। মেঘের লুকোচুরি খেলা চলেছে। মেয়েকে ছুঁয়ে মেঘেরা পাহাড়ের পাশ দিয়ে ভেসে চলেছে। মেয়ের ঠোঁটের কোণে পবিত্র হাসি।

হঠাৎ দেবতা হুংকার দিয়ে উঠল, 'ওই নীচে মসৃণ পাথরের ওপরে তোমাকে শুইয়ে দেব। ওই পাথরে, যার ওপরে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ি ঝরনার জল। তোমার শয়তানিতে ছোট্ট ঝরনা জলপ্রপাত হয়েছে। তার নীচে তোমায় শুইয়ে দেব। জলের আঘাতে দেহ ওলট-পালট হয়ে যাবে, হৃদয় ফাটবে, দম বন্ধ হয়ে আসবে। যন্ত্রণা, ভীষণ যন্ত্রণা। তিলে তিলে মৃত্যু। নিষেধ না-মানার প্রতিফল।' দাঁতে দাঁত ঘষছে দেবতা।

সাদা মেঘের মধ্যে দাঁড়িয়ে মেয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'গাঁয়ের মানুষদের ভালোর জন্য আমি ওই পাথরের ওপরে শুয়ে পড়তে একটুও ভয় পাই না। আমার দেহে জলের ধারা আঘাত করুক। কিন্তু হে পাহাড়ের দেবতা, তোমায় প্রণাম জানিয়ে আমি একটা ছোট্ট ভিক্ষা চাই। ভিক্ষা দেবে?' মেয়ের হাসিমুখে মুক্তো ঝরছে।

'কী তোমার ভিক্ষা? আগে শুনি।'

মেয়ে চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমার কেউ নেই। রয়েছে এক বুড়ি মা। কোনো কাজ মা করতে পারে না। অনেক বয়েস। আর রয়েছে শুয়োরের কয়েকটা ছোট্ট ছানা। তারাও নিজেরা খেতে পারে না। হায়! দেবতা, মরবার আগে একবার আমায় বাড়ি যেতে দাও। ওদের ভার একজনের ওপরে দিয়েই আমি ফিরে আসব। আমি কখনও মিছে

কথা বলি না। দোহাই তোমার, একবার বাড়ি যেতে দাও।' মেয়ে কাঁদছে।

'বেশ, তুমি যেতে পারো। কিন্তু একটা শর্তে। যদি তুমি ফিরে না-এসে কোথাও পালিয়ে যাও, তাহলে, তাহলে আমি ঝরনার মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেব। আর, আর গাঁয়ের সব মানুষকে পাথরে পিষে মেরে ফেলব। মনে থাকবে?' অল্প থেমে দেবতা কথাগুলো বলল। দু-চোখে তার আগুন ঝরছে।

মেয়ে আস্তে আস্তে পাহাড়ি পথে হেঁটে চলল। পেছনে দেবতা বসে রইল। হঠাৎ দেবতা বলল, 'দাঁড়াও। ফিরে যখন আসবে তখন আমার কাছে আসবার দরকার নেই। সোজা মসৃণ পাথরের ওপরে চলে যাবে, শুয়ে পড়বে। জলের ভীষণ ধারার নীচে শুয়ে পড়বে। আমি সব



জানতে পারব।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মেয়ে হেঁটে চলল। পাহাড়ি পথে মেয়ে নেমে আসছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এল। মেয়েকে উড়িয়ে নিয়ে পাহাড়ের নীচে পায়েচলা পথে নামিয়ে দিল। দমকা হাওয়া মিলিয়ে গেল। আঃ, কী শান্তি। সাদা জলের ধারা ফেনা তুলে নীচে আছড়ে পড়ছে। অফুরন্ত জলের ধারা। জলের ধারা শুকনো জমির ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। কত ফসল ফলবে এবার। মেয়ে খুশির হাওয়া বইয়ে পালকের মতো ভেসে চলল। গাঁয়ের পথে, বাড়ির পথে।

বাড়িতে পৌঁছে গেল কেশবতী কন্যা। কিন্তু ঘরে ঢুকেই সে কেমন দমে গেল। মাকে সত্যি কথা বলবে কেমন করে? এ কথা শুনেই মা যদি...। মেয়ের বুক কেঁপে উঠল।

মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে মেয়ে বলল, 'মা, আমাদের গাঁয়ের পাশ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে, খেতে খেতে ফসল ফলানো অফুরন্ত জল। সব জল আসছে পাহাড়ি ঝরনা থেকে। আর-কোনো ভাবনা নেই। জলের ভাবনা নেই।'

মা চেয়ে আছে মেয়ের দিকে। শুকনো মুখেও হাসি। মেয়ে আবার বলল, 'মা, আমি তো পাহাড়ে যেতাম ফল কুড়োতে, সেখানে পাশের গাঁয়ের কয়েকজন মেয়ে আমার সই হয়েছে। নতুন সই। ওরা আমায় নেমন্তন্ন করেছে। ওদের সঙ্গে কয়েকদিন থাকব, খেলব, আনন্দ করব। এই ক-দিন পাশের বাড়ির খুড়িমা তোমাকেও দেখবে, শুয়োরের ছানাদেরও দেখবে। ভাবনা নেই। আমি যাব?'

মায়ের মুখে কী সুন্দর হাসি। মেয়ে আবার আগের মতো আবদার করছে, মুখে খই ফুটছে, এই তো আমার সেই মেয়ে। মা তক্ষুনি রাজি হল। মেয়ে পাশের বাড়ির খুড়িমার সঙ্গে দেখা করে এল। মায়ের আর ছানাদের কোনো অযত্ন হবে না। খুড়িমা রাজি।

মেয়ে ফিরে এল মায়ের কাছে। বলল, 'মা, আমায় বোধহয় ওরা সহজে ছাড়বে না। দিন পনেরো থাকতে হবে। কেমন? তুমি যেতে দেবে?'

'সে কী কথা? তুই যাবি বেড়াতে, আর আমি মত দেব না? খুব আনন্দ কর ওখানে গিয়ে। অনেক কষ্ট তোর। বাছা, কিছু ভাবিস না। পাশের বাড়ির বউ খুব ভালো।'

কেশবতী কন্যা মায়ের হাতদুটো চেপে ধরল, কপালে চুমো দিল। মেয়ের চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। মুখ ফিরিয়ে নিল মেয়ে। শুয়োরের ছানাদের কাছে গেল। তাদের কোলে তুলে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল। ছানাদের দেহ ভিজে গেল। দোরের কাছে এসে মেয়ে বলল, 'মা আমি যাচ্ছি।' আর কিছু বলতে পারল না। ছুটে চলল পাহাড়ি জলপ্রপাতের দিকে। পেছনে দুলছে মেয়ের সাদা আলুলায়িত চুলের রাশি।

পথের মধ্যে রয়েছে এক বিশাল বটগাছ। চারিদিকে ঝুরি নেমেছে। বটগাছের ঘন ছায়ার তলা দিয়ে যাবার সময় মেয়ে গাছের গুঁড়ি ছুঁয়ে বলল, 'বটগাছ, আজ থেকে আমি আর তোমার কাছে আসব না। আসতে পারব না। তোমার ঘন ছায়ায় আর কোনোদিন জিরোতে আসব না। দেহ শান্ত করতে আর আসব না। শেষ বিদায়।'

হঠাৎ মোটা বটগাছের ওপাশ থেকে একজন বুড়ো মেয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। তার

মাথাভরতি চুল সবুজ, বুকের ওপরে দোলানো দাড়ি সবুজ, তার দেহের পোশাক সবুজ। যেন একজন সবুজ মানুষ মেয়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

মিষ্টি হাসি হেসে সবুজ বুড়ো বলল, 'কেশবতী কন্যা, তুমি কোথায় চলেছ?'

দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল, মেয়ে কোনো কথা না-বলে আস্তে করে মাথা নোয়াল।

সবুজ বুড়ো হাসল। মাথা নেড়ে বলল, 'তোমার সব কথা আমি জানি। মেয়ে, তোমার যে কী বিপদ তাও আমি জানি। আমার কাছে কোনো কথাই লুকোনো থাকে না। তোমার এমন মন, সবার জন্য তুমি চিন্তা করো। বড়ো ভালো মেয়ে তুমি। তোমায় আমি বাঁচাব। বাঁচাবই। নইলে বেঁচে থেকে লাভ কী? আমি পাথর কুঁদে একটি মেয়ের মূর্তি গড়েছি, তোমার মতো দেখতে। যেন তোমারই মূর্তি। পাথরের বুকে সে চোখ মেলে রয়েছে। গাছের এপাশে এসে দেখো।'

গাছের ওপাশে গেল মেয়ে। পাথরের মূর্তি দেখে চমকে উঠল। সবুজ বুড়ো কি আগে তাকে দেখেছে? সে তো কখনও তাকে আগে দেখেনি? নিখুঁত মূর্তি, তারই মূর্তি। কত বড়ো শিল্পী এই সবুজ বুড়ো। শুধু মূর্তির মাথায় তার মতো চুল নেই। আর সব একরকম। মেয়ে তাকিয়ে রয়েছে, পলক পড়ছে না চোখে।

বুড়ো মিষ্টি গলায় বলল, 'পাহাড়ের দেবতা তোমাকে ওই জলধারার নীচে শুয়ে পড়তে আদেশ দিয়েছে। তাকে অমান্য করতে পারবে না। কিন্তু ওই আছড়ে-পড়া জলের নীচে শুয়ে পড়লে তোমার কি হবে তা তুমি জানো? হ্যাঁ, তুমি ঠিকই জানো। পাথর ছাড়া ও আঘাত কেউ সইতে পারে না। পাথরও কেঁপে ওঠে, ক্ষয়ে যায়। আর তুমি তো একরত্তি মেয়ে। আমি পাথরের মূর্তিটাকে বয়ে নিয়ে যাব জলধারার নীচে। তোমার হয়ে পাথরমেয়ে সেখানে শুয়ে থাকবে। আঘাত লাগবে তার দেহে, তোমার দেহে আঘাত লাগতে দেব না। কিন্তু পাথরমেয়ের তোমার মতো চুল নেই। একটু কষ্ট করতে হবে। ব্যথা পাবে, কিন্তু উপায় নেই। তোমার চুলগুলো ছিঁড়ে আমি পাথরমেয়ের মাথায় লাগিয়ে দেব। সে হবে কেশবতী কন্যা, ঠিক তোমার মতো। পাহাড়দেবতা দেখতে পেলেও আর-কোনো সন্দেহ করবে না। ভাববে, তুমিই শুয়ে রয়েছ। নইলে...।'

বুড়ো চুপ করে গেল। মেয়ে নিঃশব্দে মাথা এগিয়ে দিল বুড়োর কাছে। বুড়ো পাথরে বসে মেয়ের মাথা কোলে নিয়ে কেশরাশি ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। উঃ, কী অসহ্য যন্ত্রণা। চোখ ভরে এল জলে। একটুও শব্দ করল না মেয়ে। আশ্চর্য সহ্যের ক্ষমতা।

মেয়ের চুলগুলো পাথরের মূর্তির মাথায় স্পর্শ করামাত্র সেগুলো পাথরমেয়ের মাথায় বসে গেল। পাথরমেয়ের সত্যিকারের চুল। এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছে। সাদা চুলের গোছায় মূর্তির রূপ আরও বেড়ে গেল। সত্যিকারের কেশবতী কন্যা যেন। আর কেশবতী কন্যা দাঁড়িয়ে রয়েছে মূর্তির সামনে,—তার মাথায় কোনো চুল নেই। মেয়ের কান্না পেল।

বুড়োর মুখে হাসি নেই। আকাশের কালো মেঘ সবুজ বুড়োর মুখে। কাঁপা গলায় বলল, 'মেয়ে, এবার তুমি ঘরে যাও। আর কোনো ভয় নেই। গাঁয়ে এখন অনেক জল, ফসলের জমি নরম হয়েছে, চাষ কর, পরিশ্রম কর। সবাই মিলে ফসল ফলাও। তুমি, তোমরা সুখে

জীবন কাটাও। ফলে ফুলে শস্যে তোমাদের জীবন ভরে উঠুক।'

সবুজ বুড়ো চোখ নামিয়ে নিল। মেয়ের দিকে আর চেয়ে দেখল না। ভারী পাথরের মূর্তিটা অনেক কষ্টে কাঁধে তুলে নিল। পাহাড়ি পথে এগিয়ে চলল। পাথর পেরিয়ে যাচ্ছে, বুড়ো কাঁপছে, মূর্তি হেলে পড়ছে। বুড়ো এগিয়ে চলল। পৌঁছোল আছড়ে-পড়া জলধারার নীচে। শুইয়ে দিল পাথরমেয়েকে। আছড়ে পড়ল জল, সাদা ফেনায় ভরা জলরাশি। মেয়ের মাথার সাদা চুল ওলট-পালট খাচ্ছে, এধার-ওধার করছে, ভেসে উঠছে, লেপটে যাচ্ছে মেয়ের দেহে। জল পাথরের দেহ ছুঁয়ে বয়ে চলেছে আরও নীচে, ফসলের জমির দিকে।

মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বটগাছের নীচে। সে বাড়ির পথে যায়নি। সব দেখেছে। বুক ভেসে যাচ্ছে। না, তার কেশরাশি গিয়েছে বলে নয়। তাকে বাঁচাবার জন্য সবুজ বুড়ো যে কষ্ট করেছে, তাই দেখে মেয়ে কাঁদছে। আহা, কত ছেলেবেলায় বাবাকে হারিয়েছে সে!

কেশবতী কন্যার মাথা চুলকোচ্ছে। চিড়বিড় করছে। মাথায় হাত দিল সে। খোঁচা খোঁচা চুল। জমি থেকে ধান কেটে নিলে যেমন থাকে। এ কী! চুল বেড়ে যাচ্ছে। মাথায় আর খোঁচা খোঁচা লাগছে না। নরম হয়ে আসছে চুলের রাশি। ছেলেদের মাথার মতো চুল। আরও বড়ো হচ্ছে আরও বড়ো। কাঁধ ছাড়াল, বুক ছাড়াল, কোমর পেরিয়ে গেল, চুলের রাশি মাটি ছুঁয়ে গেল। থেমে গেল বড়ো হওয়া। কেশবতী কন্যা দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ি হাওয়ায় কেশরাশি উড়ছে। হাতের মুঠোয় চুলের রাশি সামনে তুলে ধরল। চোখের সামনে। দাঁড়কাকের গলার পালকের মতো কালো কেশ। লাফিয়ে উঠল আনন্দে। নাচের ছন্দে ঘুরে গেল মেয়ে। দু-হাত দুপাশে ছড়িয়ে আনন্দে নাচছে কেশবতী কন্যা। সহজ আনন্দে বনের প্রাণী মুক্ত হাওয়ায় নাচছে।

থেমে গেল মেয়ে। তাকিয়ে রইল পাহাড়ি পথে। অনেকক্ষণ। পথের দিকে চেয়ে রয়েছে। কিন্তু সবুজ বুড়ো কই ফিরছে না তো? অনেক সময় বয়ে গেল।

হঠাৎ বটগাছের ডালপালা কেঁপে উঠল, পাতাগুলো কেঁপে উঠল। সেই কাঁপা-কাঁপা পাতার মাঝখান থেকে ভেসে এল কার কণ্ঠস্বর? সে বলছে, 'ওগো, কেশবতী কন্যা, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। পাহাড়ের দেবতাকে আমরা সত্যি সত্যি বোকা বানিয়েছি। ভয় নেই, বাড়ি ফিরে যাও। সুখে থাকো, ভালো থাকো।'

উঁচু পাহাড় থেকে জলধারা আছড়ে পড়ছে নীচে, পাথরের ওপরে। মেয়ে সেদিকে চেয়ে রইল। নীচে পাহাড়ের কোলজুড়ে সবুজ ফসলের খেত, মাঠের পারে হাসিহাসি মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাঁয়ের কিষাণেরা, তাদের পাশে উচ্ছল ছেলেমেয়ে আর ডাগর চোখ-মেলা বধূরা। সবুজ পাতায় ভরা বিরাট বটগাছ, নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়ে। বনের হরিণের মতো চমকে উঠে পাহাড়ি হাওয়ায় চুল ভাসিয়ে গানের ছন্দে মেয়ে নেমে আসছে পাহাড়ি পথে। মেয়ে হাওয়ায় ভেসে আসছে, মেয়ে চলেছে গাঁয়ের পথে। সবুজ ফসলের ওপর দিয়ে জলের ধারার মতো আসছে কেশবতী কন্যা।

ছবি। প্রণবেশ মাইতি



বিকাশ বসু

একবার এক রূপসি মুরগিকে দেখে বাজপাখির ইচ্ছে হল তাকে বিয়ে করে। রূপসি সেই মুরগি বলল, তা কেমন করে হবে, আমি কী তোমার মতো আকাশে উড়তে পারি?

বাজপাখি বলল, সে আমি শিখিয়ে দেব।

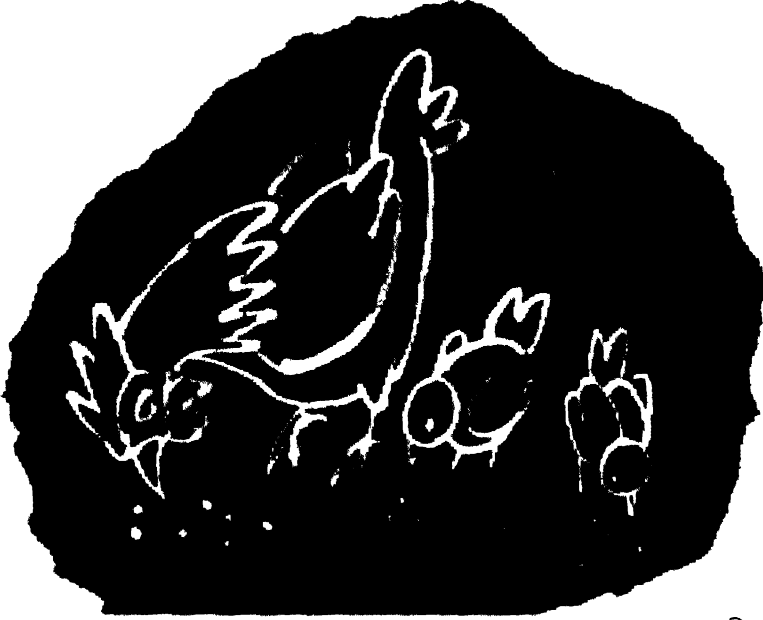
মুরগি বলল, যদ্দিন না তোমার মতো উড়তে পারছি তদ্দিন—

বাজপাখি বলল, তদ্দিন, এই নাও ধরো আংটি। কি, কথা দিলে, আমায় বিয়ে করবে?

মুরগি বলল, দিলুম। শুধু কথা দেওয়া নয়, বাজপাখির দেওয়া সেই আংটি পেয়ে তার এমনি গর্ব হল যে সে আংটি গলায় বেঁধে দেমাকি পা ফেলে পাড়া বেড়াতে লাগল। তাই দেখে মোরগ বলল, এ কী কাণ্ড, তুমি না আমাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছ। শিগগির খুলে ফেলো ওই হতচ্ছাড়া আংটি।

মোরগ নিজেই মুরগির গলা থেকে সেই আংটি ছিঁড়ে ফেলে দিল গভীর বনের মধ্যে।

পরের দিন বাজপাখি আবার আকাশ থেকে নেমে এল মুরগির জন্যে নতুন উপহার নিয়ে। কিন্তু নতুন উপহার দেবে কী, আগের উপহারটাই বেপাত্তা। তার খুব রাগ হল।



এদিকে মুরগি সত্য ঘটনা চাপা দিয়ে বানিয়ে বানিয়ে বলল, ব্যাপার কী জানো, ভীষণ এক সাপ আমাকে এইস্যা তাড়া করেছিল, আমি তো প্রাণ নিয়ে বেঁচেছি, কিন্তু আংটিটা বাঁচাতে পারিনি; ছুটতে গিয়ে তোমার দেওয়া আংটিটা কোথায় যে ছিটকে পড়ল। দেখছ তো সকাল থেকে আঁতিপাঁতি করে খুঁজছি হারানো সেই আংটি।

কিন্তু কথায় বলে বাজপাখির চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। সে বলল, উঁহু, মনে হচ্ছে ব্যাপার তা নয়। সত্যি কথা বলে ফেলো। মুরগি বলল, তুমি ঠিকই ধরেছ।

তারপর সব কথা শুনে বাজপাখি বলল, যুক্তি যদি মানো, তাহলে বলি—মোরগকে যখন আগেই কথা দেওয়া আছে তখন তাকেই তোমার বিয়ে করা উচিত। কিন্তু দেখো তুমি আমাকে ঠকিয়েছ, তার শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। ওই যে তুমি মাটি আঁচড়ে আংটি খোঁজার ভান করছিলে, ওই কাজই তোমাকে করে যেতে হবে। আর একটা কথা, তোমাকে আর মোরগকে ছেড়ে দিলেও, তোমাদের বাচ্চাদের আমি ছাড়ব না।

সেই থেকে মুরগির স্বভাব মাটি আঁচড়ে উলটে-পালটে দেখা। তাকে দেখলেই মনে হয় কী যেন খুঁজে চলেছে। আর মুরগির বাচ্চাদের ওপর বাজপাখির বড়ো লোভ, সুযোগ পেলে ছোঁ মারবেই।

ছবি। সুব্রত মাজী



পথে হল দেরি

সুখেন্দু মজুমদার

লোকটা পথ হারিয়ে ফেলল।
পথ মানে বাড়ি ফেরার রাস্তা।
কেমন করে তবে বাড়ি ফিরবে?

কে বলে দেবে?

কেউ নেই ধারেকাছে।

তবে?

লোকটা এবার সত্যি চিন্তায় পড়ে গেল।

পথের পাশে ছিল একটা গাছ। সেই গাছে ঘোড়াটা বেঁধে রেখে ভাবতে শুরু করল।

এদিক দেখে। সেদিক দেখে।

কোন দিকে গেলে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছোতে পারবে, সেটাও বুঝতে পারে কই? ঘোড়াটা ধুঁকছে। ওর পিঠের বোঝাটাও আজ বেজায় ভারী।

হবেই বা না কেন?

সেই সকাল থেকে একটার-পর আর-একটা গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছে। এ-বাড়ি থেকে সে-

বাড়ি। ঘুরে ঘুরে কী করত লোকটা?

বাড়ি বাড়ি ঘুরে সে নারকোল কিনত। কারণ লোকটা ছিল ব্যবসায়ী। নারকোল কিনত, তারপর সেই নারকোল ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে ফিরে আসত বাড়িতে।

কোথায় থাকত সে?

সেটাও একটা গ্রাম। নদীর পাড় বরাবর। কিছুদিন আগেও বেশ সুন্দর ছিল গ্রামটা। গত কয়েকবছর কী যে হয়ে গেল। বর্ষা এলে নদীর জল কুলকুল করে ঢুকে পড়ে গ্রামের ভিতর। ঘরবাড়ি তছনছ। সে নয় হল। চাষবাস গেল নষ্ট হয়ে। নদীর নোনা জলে মাটিও হারাল তার গুণ। চাষ-আবাদ হয় না সেই গ্রামে। গ্রামে নেমে এল অভাব।

লোকটার ভারী অভাব। চাষ-আবাদ নেই। এখন সে নারকোল কেনাবেচা করে। এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে ঘুরে নারকোল কেনে। তারপর নৌকো চেপে সেই নারকোল শহরে বেচতে যায়।

রোজই কী এমনি করে পথ হারায় লোকটা?

তা হবে কেন?

আসলে আজকে বেশি করে নারকোল কিনেছে সে। অনেক গ্রামে যেতে হয়েছে তাকে। তাতেই সে হারিয়ে ফেলেছে পথ।

হঠাৎই ছেলেটার সঙ্গে তার দেখা। কোথায় যাচ্ছিল সে? ছেলেটা ফিরছিল তার গ্রামে। শহর থেকে। নৌকোর ঘাটে নেমে হাঁটতে হাঁটতে।

ছেলেটাকে দেখে সেই লোকটা দারুণ খুশি। মনে মনে ভাবল। কী ভাবল? ছেলেটা নিশ্চয়ই তার বাড়ি ফেরার পথটা বলে দিতে পারবে।

শুধুই কি তাই?

কোন পথে গেলে তাড়াতাড়ি হবে। তাও। কাছাকাছি আসতেই লোকটা জানতে চাইল। কোন পথে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছোতে পারবে সে।

প্রশ্নটা শুনে ছেলেটা নারকোলের বোঝাসহ ঘোড়াটার দিকে তাকাল।

তারপর লোকটাকে বলল।

কী বলল? তুমি যদি আস্তে আস্তে যাও তবে এই পথে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছোতে পারবে। আর—

আর কী?

তাড়াতাড়ি যদি যাও তবে এই পথে পৌঁছোতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

উত্তর শুনে লোকটা অবাক। এ আবার কেমন কথা। এমন অদ্ভুত কথা সে হেসে উড়িয়ে দিল।

তারপর?

তারপর দেখিয়ে দেওয়া পথ ধরে ঘোড়া নিয়ে চলল। টগবগ টগবগ। কয়েক পা এগিয়েছে ঘোড়া। একটু তাড়াতাড়ি। অমনি ঘোড়ার পিঠ থেকে গোটাকতক নারকোল গড়িয়ে পড়ল পথে।

কী করল তখন?

ঘোড়াটাকে থামিয়ে একটা একটা করে নারকোল কুড়িয়ে নিয়ে আবার রাখল ঘোড়াটার পিঠে। এতকিছু করতে করতে কেটে গেল কিছু সময়।

তারপর কী করল লোকটা?

সময় নষ্ট হয়েছে খানিক। তবে তো দেরি হয়ে যাবে বাড়ি পৌঁছোতে। তাই আরও তাড়াতাড়ি ঘোড়া নিয়ে এগুতে থাকল।

টগবগ টগবগ। টগবগ টগবগ।

আরও খানিকটা পথ এগুতেই আবার গড়িয়ে পড়ল ঘোড়ার পিঠের নারকোল।

এবার অনেকগুলো। গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল এদিক-সেদিক।

ঘোড়াটা থামিয়ে আবার নারকোল কুড়োতে শুরু করল লোকটা। একটা দুটো তিনটে।

সবগুলো কুড়ানো হয়েছে? কোথায় আর হল। আবার কুড়োতে থাকে। চার পাঁচ ছয়।

শেষ হয়নি?

না না। তখনও কুড়োয় নারকোল। সাত আট নয়।

আবার চলতে শুরু করে। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। রাত হয়ে এল বলে।

টগবগ টগবগ। টগবগ টগবগ। টগবগ টগবগ।

গড়িয়ে পড়ে নারকোল। লোকটা কুড়িয়ে নেয়।

এমনি করতে করতে লোকটা কখন পৌঁছোল বাড়িতে? সে তো আর-এক গল্প। ভাগ্যিস আকাশে চাঁদের আলো ছিল।

আর লোকটা?

ঘোড়ার পিঠে নারকোলের বোঝা নিয়ে বাড়ি পৌঁছোল। তখন চাঁদ প্রায় ডুবুডুবু।



ছবি। প্রণবেশ মাইতি



সারস কেন শিংওলা হরিণের পিঠে চড়ে

কল্পনা ভট্টাচার্য

গোরুমোষ এমনকি লম্বা শিংওলা হরিণটাও মাঠে চরে বেড়াচ্ছিল তখন—আর মনের আনন্দে সবুজ কচিকচি ঘাস খাচ্ছিল। এমন সময় তাদের পাশে লম্বা পা ফেলে এসে দাঁড়াল এক পাখি। পশুরা দেখল পাখিটা অন্য পাখিদের চেয়ে আকারে বড়ো, সরু সরু পা আর গায়ের পালক দুধসাদা।

পাখিটা উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল পশুদের খাওয়া। ওকে ওইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে পশুরা খাওয়া বন্ধ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই, তোর নাম কী রে? এখানে কী করতে এসেছিস?'

ওদের প্রশ্নে পাখিটা ধীর গলায় বলল, 'আমার নাম সারস।'

নাম শুনে গোরু, মোষ এ-ওর মুখের দিকে চাইল, না—এমন নামের পাখির কথা আগে কোনোদিন শোনেইনি। একটু দূরের লম্বা শিংওলা হরিণটাও ঘাসপাতা খাওয়া বন্ধ রেখে সারসকে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, 'আমাদের এখানে কী চাই তোর?'

সারস এবারেও তেমন শান্তভাবে বলল, 'তোমাদের বন্ধুত্ব।'

সারসের কথা শুনে সব পশুরা একসঙ্গে হেসে হেঁকে উঠল, 'বটে—বটে, তোমার সঙ্গে

বন্ধুত্ব করে আমাদের কী লাভ তা জানতে পারি কি?'

সারস বলল, 'এই তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, তোমরা যখন খাচ্ছিলে তখন দুষ্টু মাছিরা তোমাদের কাটাছেঁড়া জায়গায় বসে ভনভন করে কতই না বিরক্ত করছিল। তোমরা



লেজ নেড়ে, কান নেড়ে, শিং নেড়ে অনেক কষ্টে ওদের সামলাচ্ছিলে। ওরা কিন্তু উড়ে গিয়েও আবার ফিরে এসে তোমাদের বিরক্ত করছিল।'

শিংওলা হরিণ শিং বাঁকিয়ে বলল, 'বিরক্ত আমরা হচ্ছিলাম ঠিকই—কিন্তু তাতে তোমার

কী করার আছে বাপু?'

'তোমাদের যাতে খেতে সুবিধে হয় তার জন্য আমি ডানা নেড়ে মশামাছি তাড়িয়ে দেব—আর তার বদলে তোমরা মাটির তলা থেকে আমার জন্য খুঁচিয়ে তুলে দেবে পোকামাকড়।'

পশুরা বুঝল, কথাটা মন্দ বলেনি সারস। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে অনায়াসে আরামে খেতে পারব। আর তারপর এইভাবেই চলছিল বেশ। পশুরা যখন ঘাসপাতা খায় তখন ওদের পেছনে থেকে ডানা ঝাপটায়, মাছিমশা তাড়ায় সারস, আর পশুরাও মাটি খুঁচিয়ে পোকামাকড় তুলে সারসকে খেতে দেয়।

হঠাৎ একদিন কে বড়ো আর কে ছোটো এই নিয়ে শিংওলা হরিণের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া লাগল সারসের। শিংওলা হরিণ তো রেগে গিয়ে তার বাঁকানো শিং বাগিয়ে তেড়ে গেল। তখন অন্য পশুরা কোনোরকম ওকে শান্ত করে বলল, 'দেখো, তোমরা এত ঝগড়া মারামারি না-করে বরং কোনো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও।'

শিংওলা হরিণ বলল, 'ঠিক আছে—শুরু হোক প্রতিযোগিতা। সারস গিয়ে এক্ষুনি ওই নদীর জলটা যতটা পারে পান করুক পেট ভরে। তারপর আমিও পান করব। যে বেশিক্ষণ জল পান করবে সেই জিতবে।'

শিংওলা হরিণের কথা শুনে সারস বলল, 'এ কেমন কথা। ওর পেট আমার চাইতে বড়ো তাই ও অবশ্যই বেশি জল পান করবে। আর তা ছাড়া এ প্রতিযোগিতার বিচারকই বা কারা!'

ঠিক হয় সেদিন নয়, পরের দিনই শুরু হবে জলপান করার প্রতিযোগিতা। আর বিচারক থাকবে পাখি, পোকা আর পশুরা। পশুরা চলে যাওয়ার পর সারস গিয়ে উড়ে বসল সেই বাঁশঝাড়টার নীচে যার পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে কুলকুল করে সেই নদীটা।

সারস সারাদিন ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল নদীকে। সন্ধের আগে গিয়ে পাখি আর পতঙ্গদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এল পরের দিনের বিচারসভায় আসতে।

পরের দিন মাঠজুড়ে পশু আর পাখি-পতঙ্গদের ভিড়, এক সারিতে বসেছে পাখি আর পতঙ্গদের দল, অন্য সারিতে পশুর দল।

শিংঅলা হরিণ বলল, 'এসো, এবার শুরু করা যাক জলপান করার প্রতিযোগিতা।'

সারস বলল, 'শিংওলা হরিণই আগে শুরু করুক।'

শিংওলা হরিণ তখন শিং নেড়ে নেড়ে বলল, 'আমি যদি প্রথম শুরু করি তবে এতটা জলপান করব যে পরে হয়তো বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না সারসের জন্য।'

পশুরা তখন বলল, 'তাহলে তুমিই প্রথম শুরু করো। এই প্রতিযোগিতায় যে হারবে, সে অন্যের দাসত্ব করবে।'

শুরু হল জলপান করার প্রতিযোগিতা। শিংওলা হরিণ তক্ষুনি নদীর পাড়ে গিয়ে মুখ ঢুকিয়ে জলপান করতে লাগল। অনেক, অ-নে-কক্ষণ ধরে জলপান করেই চলল। ওর জলপান করা দেখে সবাই অবাক। শিংওলা হরিণ এত জলপান করতে পারে? শেষে অনেকক্ষণ পরে সে জলপান শেষ করে জল ছিটিয়ে সাঁতার দিতে থাকল। এরপর শুরু হবে সারসের পালা। শিংওলা হরিণ স্নান করতে করতে বলল, 'সারস জলপান শুরু করুক।'

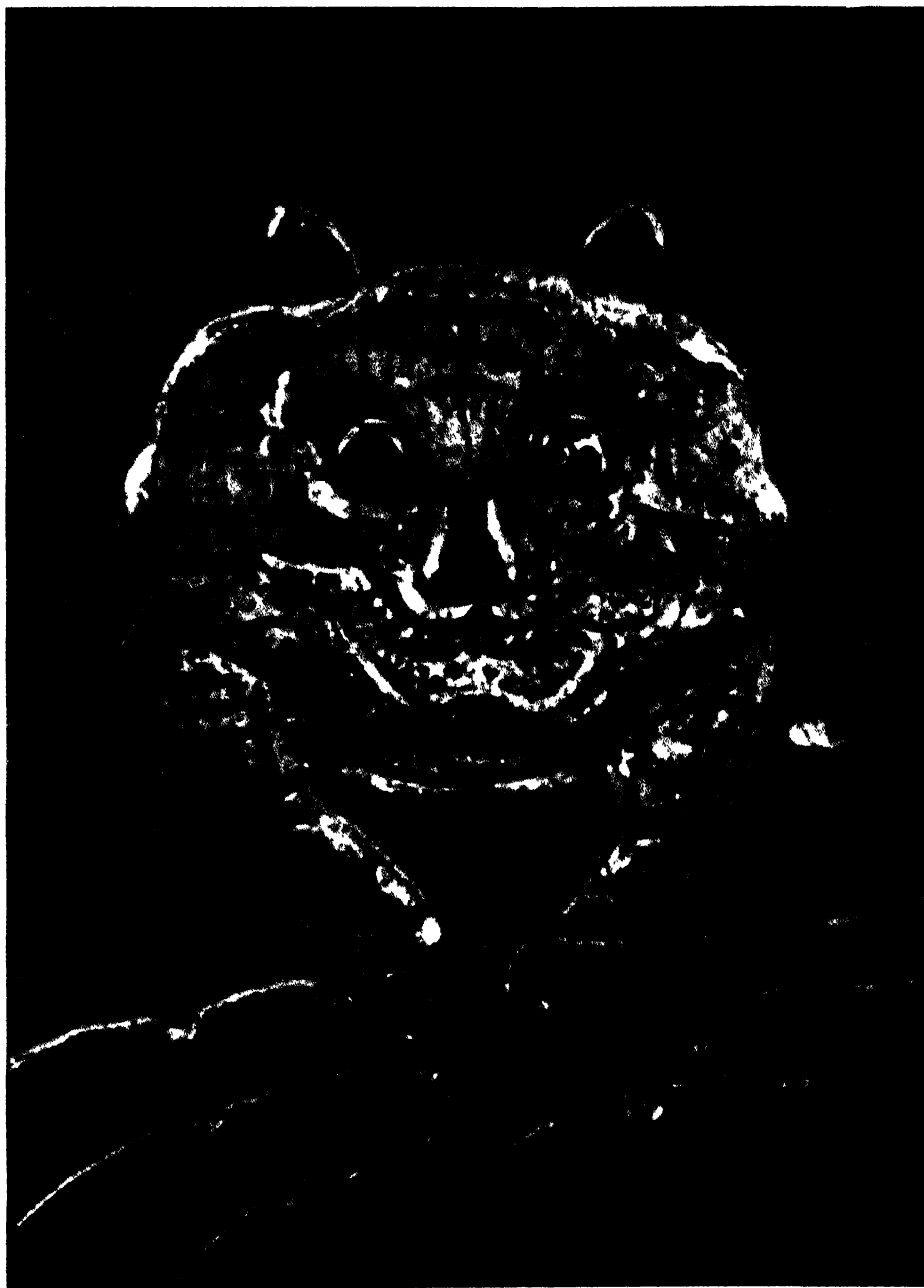
সারস তখন বলল, 'বিচারকগণ আমাকে কিছুটা সময় দিন। আমি আমার এই সুন্দর পালকগুলো একটু ঝেড়ে নিই।'

আসলে সারস আগের দিন নদী দেখার সময় লক্ষ করেছিল নদীর জোয়ারভাটা। সে অপেক্ষা করছিল ভাটার মুহূর্ত। কিছুক্ষণ পরে ভাটার সময়ে সারস নদীর জলে ঠোঁট ডোবাল। পশুপাখি পতঙ্গ সব্বাই সে দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল। সারস এতটা জলপান করল যে নদীর তলদেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। আসলে জল তখন ভাটার টানে সরে যাচ্ছিল। এমন অবাক-করা কাণ্ড দেখে পশুরা আর পাখিরা সবাই একবাক্যে সারসকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করল। আর সেই থেকে এখনও দেখা যায় পশুদের সাথে সারসকে পাশে পাশে হাঁটতে আর শিংওলা হরিণের পিঠে চেপে সারসকে বেড়াতে। কারণ সেদিন থেকেই যে শিংওলা হরিণ সারসের কাছে দাসত্ব মেনে নিয়েছিল।

অনেক অনেক দিন আগে পৃথিবীর বয়স যখন তরুণ তখন সে সময়ে একজন জ্ঞানীমানুষ যিনি নিজে পশু আর পাখিদের ভাষা বুঝতে পারতেন তিনি শুনিয়েছিলেন এই গল্পটা।

ছবি। প্রণবেশ মাইতি

পূর্ব এশিয়া



চিন তিব্বত তাইওয়ান জাপান মঙ্গোলিয়া কোরিয়া



সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এক সাধু। সাধু তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়ান। ঘুরতে ঘুরতে বন-পাহাড় পার হয়ে একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি এলেন এক গ্রামে। গ্রামে ঢুকেই সরাই। সাধু ভাবলেন, এখনি রাত হবে—রাত্রে আর ঘোরা নয়....এইখানে পড়েই রাতটুক কাটিয়ে দেবেন।

সরাইয়ের সামনে সরাইওয়ালা দাঁড়িয়ে ডিমওয়ালার কাছে ডিম কিনছে....সাধু বললেন সরাইওয়ালাকে, তোমার সরাইয়ের রোয়াকে যদি রাত্রে আমি থাকি, তাহলে তোমার কোনো অসুবিধা কি হবে, বাপু?

সাধুকে দেখে সরাইওয়ালা বললে, সে কী ঠাকুর, আপনি সাধু-মানুষ—বাইরে রোয়াকে কেন থাকবেন! আপনাকে আলাদা ঘর দেব—সেই ঘরে আপনি থাকবেন।

সাধু বললেন, না। আমি সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ....আমি কোনো ঘরে থাকতে পারি না। বাইরের এই রোয়াকেই আমি থাকব।

সরাইওয়ালা বললে, না না, এতে আবার আমার অসুবিধা কী হবে! আপনি স্বচ্ছন্দে রোয়াকে থাকতে পারেন!

সরাইওয়ালার কথা শুনে সাধু তাঁর মাদুর বার করে রোয়াকে পাতলেন, কাঁধের ঝুলি

নামিয়ে মাদুরের পাশে রাখলেন, রেখে মাদুরে বসলেন। সরাইওয়ালা ডিম কিনে ডিমওয়ালাকে ডিমের দাম দিয়ে সরাইয়ে ঢুকল।

সরাইয়ে এক-একজন করে খদ্দের আসছে...সাধুর দিকে তারা ফিরেও তাকায় না—তারা সরাইয়ে ঢুকছে।

রাত হল....সাধু মাদুরে বসে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন...আকাশে চাঁদ...একরাশ নক্ষত্র—সাধু আকাশের দিকে চেয়ে আছেন।

একজন দিন-মজুর এসে রোয়াকের নীচে বসল। সাধু দেখলেন, দেখে বললেন, ধুলোয় বসল কেন বাবা? উঠে আমার মাদুরে বসো....আমার পাশে....

মজুর বসল মাদুরে সাধুর পাশে! —বসে দুজনে গল্প.....

সাধু বললেন, কী কাজ করো তুমি?

মজুর বললে, পাঁচজনের খেতে কোদাল চালিয়ে মাটি কোপাই....গাছপালা কাটি...তাতেই যা রোজগার হয়।

সাধু বললেন, তোমার বাড়ি কোথায়?

—আমার বাড়ি বহু দূরে ওদিকে। তাকে বাড়ি বলে না ঠাকুর....গর্ত!

সাধু বললেন, বাড়িতে তোমার কে আছে?

—কে আবার থাকবে, ঠাকুর! দুঃখী মানুষ... আমার কেউ নেই। যে-কষ্টে দিন চলে! একে বাঁচা চলে না গো! ....শ্যাল-কুকুরও আমার চেয়ে আরামে থাকে।

মজুর তার দুঃখের কথা বলতে লাগল। তার কত সাধ, বড়োলোক হবে....বড়ো বাড়ি হবে। বিয়ে করে বাড়িতে আনবে পরমাসুন্দরী বউ—বাড়িতে থাকবে দাস-দাসী দারোয়ান লোকজন—ঘোড়াশালে থাকবে তেজী ঘোড়া! সে হবে রাজার সেনাপতি, না মন্ত্রী—আর কিছু না! পরের খেতে মাটি কেটে, পরের বাড়ির জঞ্জাল সাফ করে দিন কাটছে। না হল বিয়ে..না হল বাড়ি...না ঘোড়া...না কিছু....বাঁচতে তার মোটে ইচ্ছা করে না। কেবলই ভাবে, যদি মরতে পারে তো এ-জন্মের মতো বেঁচে যায়—পরের জন্মে মন্ত্রী হয়ে....

বলতে বলতে মজুরের দুঃখ একেবারে উথলে উঠল!

সাধু বললেন, যদি রাজার মন্ত্রী হতে পার, তা হলে বাঁচতে চাইবে?

—ওঃ! মজুর বললে, তা হলে কী আর মরতে চাই, ঠাকুর! আপনার কাছ থেকে চেয়েচিন্তে একটা মাদুলি নিলে হয়তো একশো বছর বাঁচতে পারি।

—বটে! সাধু বললেন, রাত হয়েছে....সারাদিন খেটে কাজ করছ। আবার কাল সকাল হলেই তো খাটতে হবে। ঘুমোও....

সাধুর কথা শেষ হতে-না-হতে ঘুমে মজুরের চোখ ঢুলে এল। সে ঘন ঘন হাই তুলছে!

সাধু বললেন, শোও....আমার মাদুরের একদিকেই শোও। আর এই নাও বালিশ...আমি দিচ্ছি—বালিশে মাথা রেখে ঘুমোও।

ঝুলির ভিতর থেকে সাধু দিলেন বড়ো একটা বালিশ—চিনে মাটির তৈরি বালিশ....ঝকঝক



করছে গা....চাঁদের আলো পড়ে। বালিশটা দেখতে যেন একটা মোটা নল।

বালিশটা মাদুরে রেখে মজুর দেখে নল-বালিশের দুমুখ খোলা....এত বড়ো বড়ো ফাঁদল। বালিশে মাথা রেখে মজুর শুয়ে পড়ল....শুয়ে দুচোখ বুজল।

একটু পরে কী তার মনে হল। মাথা তুলে নল-বালিশের ফাঁদলে ঢুকল...ঢুকে তার ভিতর দিয়ে চলছে, চলছে। ....চলেছে হামা দিয়ে.....

যেতে যেতে বেরুলো ওদিককার ফাঁদল দিয়ে! যেমন বেরুনো...দেখে, তার বাড়ির সামনে এসেছে! বাড়ির সামনেটুকু শুধু চিনল—তার সে বাড়ির উপর উঠেছে সাতমহল পুরী। পুরীর দোরে সেপাই-সান্ত্রী। তাকে দেখে সেপাই-সান্ত্রীরা মাথা নুইয়ে সেলাম করল। মজুর ঢুকল পুরীর মধ্যে, পুরীর মধ্যে ঢুকেই দেখে, এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা। এ আবার কে?

কন্যা বললে, বা! চিনতে পারছ না। তোমার বউ আমি।

সত্যি! মজুর খুব খুশি! ....বউয়ের সঙ্গে মজুর উঠল সাত-তলার ঘরে। সাজানো ঘর—পালঙ্কে নরম বিছানা। মজুর শুয়ে পড়ল বিছানায়....শোবামাত্র ঘুম!

সকালে ঘুম ভাঙ্গতে লোকজন বললে, রাজার কাছ থেকে তলব এসেছে!

মজুর চমকে উঠল! রাজার তলব! .....মজুর চলল রাজপুরীতে রাজার সভায়। রাজা বললেন, আজ থেকে তুমি হলে আমার মন্ত্রী....আমার মন্ত্রিত্ব করবে।

মজুর হল রাজ্যের মন্ত্রী। তার যেমন মান, তেমনি সুখ-ঐশ্বর্য.....

দিন যায়...মাস যায়....বছর যায়....মন্ত্রী হয়ে মজুর খুব সুখে আছে! যেমনটি চেয়েছিল...আঃ!

তারপর হঠাৎ রাজ্যে গোলমাল! শত্রুর সঙ্গে কারা চক্রান্ত করেছে—রাজাকে মেরে সিংহাসন নেবে তারা!

সে-দলে মজুর-মন্ত্রী নাকি সর্দার! চক্রান্ত ধরা পড়েছে। প্রমাণও পাওয়া গেছে। রাজা হুকুম দিলেন, মশানে নিয়ে গিয়ে এই মন্ত্রীটার গর্দান কাটো।

জহ্লাদ চলল মন্ত্রীকে নিয়ে মশানে—হাঁড়িকাঠে তার ঘাড় গুঁজে দিয়ে দিল এক কোপ।

—ওঃ! বলে চেঁচিয়ে উঠল মজুর-মন্ত্রী।

সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে! উঠে সে বসল....বসে ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে চোখ পড়ল সাধুর দিকে।

দেখে, সাধু হাসছেন! মজুর চেয়ে চারদিকে দেখে, সরাইয়ের রোয়াক—সাধুর মাদুরে সে বসে সাধুর পাশে....আর ওই সেই চিনা-মাটির বালিশ। এতক্ষণ তাহলে ....স্বপ্ন দেখছিল?

সাধু বললেন, কী গো বাপু, মন্ত্রী হতে চাও? মন্ত্রী হলে বিপদ কত, বুঝলে!

দু-হাত জোড় করে মজুর বললে, না ঠাকুর, মন্ত্রী হলে কী যে হতে পারে....খুব বুঝেছি! মন্ত্রী হতে যে চায় সে মন্ত্রী হোক। আমি এমনি মজুরই থাকি যেন।....

ছবি। প্রণবেশ মাইতি



খুরমা-কুশি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

অনেক, অনেক, অনেক দিন আগের কথা।

পাহাড়তলির গাঁয়ে থাকত এক গেরস্থ। দুজনের সংসার। সে আর তার বউ। তাদের বড়ো সাধ ছিল একটি সন্তানের।

প্রায়ই তারা বলত, 'একটা সন্তান থাকলে আমাদের জীবনটা কী সুখেরই না হত। হোক্ গে না যেমনতেমন। খেজুরের বিচির মতন এই-টুকুনি।'

লোকে বলে, কিছুদিন পরে তাদের সেই ইচ্ছেটাই একদিন ফলে গেল। তার বউয়ের কোলে এল ফুটফুটে এক ছেলে। খেজুরের বিচি যত বড়োটা হয়, ঠিক ততটাই। নইলে গল্পটাই যে মাঠে মারা যায়।

খুশিতে ডগমগ হয়ে বাপ-মা তার নাম রাখল—'খুরমা-কুশি'।

বছর যায়। দু-বছর যায়, তারপর আরও আরও বছর। ছেলের কোনো বাড়বৃদ্ধি নেই। যে-কে সেই।

বাপ একদিন ছেলেকে ডেকে বলল, 'সবেধন নীলমণি আমার, তোমাকে নিয়ে আমার অহেতুক আনন্দ। কী লাভ আমার তোমার মতন ছেলেকে মানুষ করে?'

মা বলল, 'বাপ আমার, তুমি তো যে-কে সেই রয়ে গেলে। এক চুলও বাড়লে না। তোমার কথা ভেবে ভেবে রাতে আমার ঘুম নেই—'

শুনে খুরমা-কুশি জবাব দিল, 'শোনো বলি মা আমার, বাপ আমার! আমাকে নিয়ে মিছিমিছি তোমরা ভাবছ। কেবল আকার দিয়ে কেন তোমরা আমাকে বিচার করছ? কারো চেয়ে আমি কম যাই না।'

খরমা-কুশি ভূতের মতো খাটতে পারে। একটা দিনও শুয়ে-বসে কাটায় না। রোগবালাই নেই, শক্তপোক্ত শরীর। জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সব কাজেই সে দক্ষ। গাধা চরানো থেকে জমিতে হাল দেওয়া—কোনো কাজই তার অজানা নয়। আর কারো মুরোদে নেই অত জ্বালানি কাঠ জোগাড় করার। পারবে কেউ ওর মতন লাফিয়ে মগডালে উঠতে? ভয়ে হাতপা সেঁধিয়ে যাবে। সাধে কী আর পাড়াপড়শিরা খুরমা-কুশির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়! নিজেদের ছেলেমেয়েদের তো তারা হরবখত এই বলে গঞ্জনা দেয়, 'ওই অতটুকুনি খুরমা-কুশি অসুরের মতো খাটে। ওকে দেখেও তোদের লজ্জা হয় না?' শুনে খুরমা-কুশির বাপমা-র বুক দশহাত হয়।

খুরমা-কুশি শুধু যে গায়ে-গতরে খাটতে পারে, তাই নয়—ওর মাথাও খুব সাফ। একবার এমন খরা হল যে, সারা গাঁয়ে সে-বছর একটি দানাও ফসল ফলেনি। লোকের পেটে অন্ন নেই। খাঁ খাঁ করছে ধানের গোলা। এমন সময় শহর থেকে জমিদারের পাইক পেয়াদারা এসে হামলে পড়ল বছরকার খাজনা আদায় করতে।

ভাঁড়ার তো খালি। প্রজারা দেবে কোথা থেকে?

এসে গেল হাকিমের ফরমান। খাজনা না দিলে ক্রোক হবে গেরস্থর খাটালের সব বলদ আর গাধা।

চাষিদের তো মাথায় হাত। সামনের মরশুমে জমিতে লাঙল টানার কী উপায় হবে?

খুরমা-কুশি তাদের অভয় দিয়ে বলল, 'কিচ্ছু ভেব না। আমি একটা মতলব ভেঁজেছি।'

গাঁয়ের কিছু লোক শুনে ঠোঁট ওলটাল। তারা বিড়বিড় করে বলল, 'হুঃ, ছোটো মুখে বড়ো কথা।'

খুরমা-কুশি বুঝল ওদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। শুধু বলল, 'আরে বাপু, দেখই না কী হয়। একটু সবুর করো।' এই বলে, যেই না সন্ধে হওয়া, অমনি সে এক ছুটে গিয়ে হাজির হল সরকারি খোঁয়াড়ে। তারপর এক লাফে বেড়া টপকে সোজা ভেতরে। পাহারাদাররা ঘুমনো পর্যন্ত এককোণে সে ঘাপটি মেরে পড়ে রইল। ওরা ঘুমে এলিয়ে পড়তেই খুরমা-কুশি চট করে একটা গাধার বাঁধন খুলে দিয়ে খপ করে তার পিঠে চড়ে বসল। তারপর গাধার কানের কাছে মুখ এনে পেল্লায় এক হাঁক ছাড়ল।

আচমকা সেই আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল পাহারাদার লোকগুলোর। সঙ্গে সঙ্গে 'চোর! চোর' বলে শুরু হল তাদের হাঁকডাক। ঢালতরোয়াল বর্শাবল্লম নিয়ে গোটা আড়গড়া হন্যে হয়ে খুঁজেও চোরের কোনো টিকি দেখতে পেল না। হাল ছেড়ে দিয়ে যখন তারা ফিরে গিয়ে

ফের ঘুমিয়ে পড়ার জোগাড়যন্ত্র করছে, ঠিক সেই সময় আবার সেই চিৎকার। তড়াক করে উঠে পড়ে আবার সেই তন্ন তন্ন করে খোঁজা। চোর যে অধরা সেই অধরাই থেকে গেল। একবার ঘুমোতে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শুনে তেড়ে যায়—এইভাবে পাহারাদাররা বার বার নাস্তানাবুদ হতে থাকে। শেষকালে যখন রাত গড়িয়ে দুপুর হয়, তখন হয়রানের একশেষ হয়ে ওদের সর্দার ফরমান দেয়—

'যতসব ভুতুড়ে কাণ্ড। মাথা থেকে তাড়াও ওসব। এসো, এবার আমরা চোখকান বুজে শুয়ে পড়ি।' এই বলে ক্লান্ত শরীরে টিপ করে তারা শুল আর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল। খুরমা-কুশি তখন মওকা বুঝে গাধার কান থেকে নেমে এসে খোঁয়াড়ের দরজা হাট করে খুলে দিল। তারপর গাধাগুলোকে সার বেঁধে বার করে এনে হ্যাট হ্যাট করে ফিরিয়ে নিয়ে চলল গাঁয়ে।



গাঁয়ের লোকের এই আস্পর্ধা দেখে হাকিমের রাগ হওয়ারই কথা। এর শোধ না তুলে সে ছাড়বে না। রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গে চাষিদের পিছমোড়া করে বেঁধে আনতে পাইক বরকন্দাজের দল নিয়ে হাকিম গাঁয়ে গিয়ে হাজির। জমায়েত চাষিদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে খুরমা-কুশি নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'আস্তাবল থেকে ওদের বের করে এনেছি এই শর্মা। কী করবেন আপনারা?'

হাকিম গর্জে উঠলেন 'এক্ষুনি বেঁধে ফ্যালো ওটাকে। হাঁ করে দেখছ কী?'

সেপাইশাস্ত্রীরা তক্ষুনি রে রে করে শেকল আর হাতকড়া নিয়ে খুরমা-কুশির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু ওকে কাবু করা কি অতই সহজ? যতবারই ওকে বাঁধতে যায়, শেকলের ফাঁক গলে খুরমা-কুশি বেরিয়ে এসে ওদের বুড়ো আঙুল দেখায়। সেপাইরা নাকের জলে চোখের জলে হয়। কিছুই করতে পারে না। হাকিমের মাথায় তখন এক বুদ্ধি খেলে। সেপাইদের ওপর হুকুম হয়, 'ওকে টাকার থলিতে পুরে ফেলে সদরের কাছারিতে নিয়ে চলো।'

ব্যস্, এরপর হাকিম তার এজলাসে গ্যাঁট হয়ে বসে টেবিল দাবড়ে বললেন, 'ব্যাটাকে এবার পেঁদিয়ে লাশ করো।'

কিন্তু হাকিম তো বলেই খালাস। এদিকে সেপাইদের নাকানি চোবানির একশেষ। লাঠি ওর গায়েই লাগে না। তার আগেই ফুড়ুত করে ও সরে যায়। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে হাকিম হাঁক পাড়েন, 'নিয়ে এসো আরো লোক লশকর, আরো লাঠিসোঁটা।'

একথা কানে যেতেই খুরমা-কুশি নড়াচড়া বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর এক লাফে সটান হাকিমের দাড়ি ধরে ঝুলে পড়ে দোল খেতে লাগল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে হাকিম ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন, 'মেরে তাড়াও ওকে। মেরে তাড়াও।'

সেপাইরা সঙ্গে সঙ্গে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে এল। তারপর ধপাধপ মুষলধারে লাঠির বাড়ি। এদের এমনই হাতের টিপ যে, লাঠির বাড়িতে হাকিমের একটা দাঁতও আর আস্ত রইল না। ঘরসুদ্ধু লোক ভয়ে কাঠ হয়ে হাকিমকে আগলাতে ছুটল।

আর সেই ফাঁকে খুরমা-কুশি আনন্দে আটখানা হয়ে দে-দৌড়...দে-দৌড়।

ছবি। প্রণবেশ মাইতি



জাদুর নাসপাতি

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

অনেকদিন আগেকার কথা। চিনদেশের এক গ্রামে বাস করত এক চাষি। কিন্তু, চাষি হলে কী হয়, ও গরিব ছিল না মোটেই। বরঞ্চ বেশ বড়োলোকই বলা যেত ওকে। চাষের জমি তো ছিলই ওর, তার ওপর ছিল দুটো বড়ো বড়ো নাসপাতির বাগান। তাতে ফলও হত প্রচুর আর সেই ফলগুলো ছিল খুব মিষ্টি আর রসালো। তাই বাজারে ওর নাসপাতির চাহিদা ছিল খুব। ফলে চাষি ওর নাসপাতি বেশ চড়া দামেই বিক্রি করত।

কিন্তু পয়সা থাকলে কী হবে, ওর মনটা ছিল ভারী ছোটো। কারুকে একটা পয়সাও দান করতে মন করত না ওর।

একদিন চাষি এক ঠেলাগাড়ি ভর্তি করে নাসপাতি নিয়ে বাজারে এসেছে। ইচ্ছে বেশি দামে বিক্রি করবে। ফলের গাড়িটা বাজারের মাঝখানে রেখে ও হাঁক ছাড়ল, 'নাসপাতি চাই! নাসপাতি! চিনির মতো মিষ্টি নাসপাতি নেবেন, আসুন।'

কিন্তু অন্য খদ্দের আসার আগেই এসে উপস্থিত এক সন্ন্যাসী। বলল 'চাষি ভাই, আমি গরিব সন্ন্যাসী, পয়সা দিয়ে খাবার ক্ষমতা নেই, আমায় একটা নাসপাতি অমনি দেবে?'

চাষি রেগে বলল, 'আহা, আবদার দেখ না! আমি খেটেখুটে নাসপাতি ফলালাম এখন

তোমাকে দিই বিনে পয়সায়। যাও, যাও, এখানে কিছু হবে না।'

ততক্ষণে অন্য অনেক খদ্দের এসে গেছে বাজারে। সবাই চাষিকে বলল, 'আহা, গরিব সন্ন্যাসী চাইছে, দিয়ে দাও না একটা নাসপাতি। তোমার তো গাড়ি ভর্তি নাসপাতি রয়েছে। একটা দিলে কিছু কমে যাবে না।'

চাষি রাজি তো হলই না, উপরন্তু সন্ন্যাসীকে গালমন্দ করতে লাগল। 'এ কেমন সন্ন্যাসী', বলল ও, 'যে চেয়েচিন্তে খেতে চায়?'

কিন্তু সন্ন্যাসী ওর গালমন্দ গায়ে না মেখে নাসপাতির দিকে চেয়ে এক ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

ভিড়ের মধ্যে একজন বলে উঠল 'ওই যে, নীচের দিকে দেখা যাচ্ছে একটা নাসপাতি, মনে হচ্ছে বেশ নরম হয়ে গেছে, বেশিদিন টিকবে না। ওটাই না হয় দিয়ে দাও সন্ন্যাসী ঠাকুরকে।'

চাষি রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি উপদেশ দেবার কে হে বাপু, যাও নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও। আমি খেটে নাসপাতি ফলিয়েছি কি দান খয়রাত করার জন্যে?'

এরপর বাজারের সবাই দুটো দলে ভাগ হয়ে তর্ক করতে লাগল। একদল বলল চাষিটার মন বড্ড ছোটো, একটাও নাসপাতি দান করতে পারে না ও? অন্য দল বলল, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে ফল ফলিয়েছে চাষি তা দান করবে কেন?

এই তর্ক কতক্ষণ চলত ঠিক নেই। অবশেষে এক ভদ্রলোক চাষিকে একটা টাকা দিয়ে বললেন 'এই তর্কের শেষ হবে না। তা, এই নাও, একটা নাসপাতির দাম। এবার সন্ন্যাসী ঠাকুরকে একটা নাসপাতি দাও। তাতে আপত্তি নেই তো?'

চাষি বলল, 'তোমার টাকা, তুমি ছড়াবে, ফেলবে, যা খুশি করবে। আমি বলার কে?' এই বলে একটা নাসপাতি তুলে সন্ন্যাসীকে দিল ও।

নাসপাতিটা নিয়ে সন্ন্যাসী যে ভদ্রলোক তার দাম দিয়েছিল তাকে বলল, 'ধন্যবাদ'। তারপর অন্য সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন সামান্য একটা নাসপাতির জন্য অত লোভ করলাম কেন? আসলে আমার অবাক লাগছিল এই চাষির রকমসকম দেখে। এক গাড়ি ভর্তি নাসপাতি ওর, অথচ বিনে পয়সায় কারুকে একটা নাসপাতিও দেবে না ও। মনে হয় কারুকে কিছু দেবার বা সবার সঙ্গে সব কিছু ভাগ করে নেবার আনন্দ ওর জানা নেই। আমি এক গরিব সন্ন্যাসী। ঘরবাড়ি টাকাপয়সা কিছুই নেই। তবু, আমার যা আছে সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই আমি। এই ধরুন নাসপাতির কথা। আমার এক গাছ ভর্তি পাকা নাসপাতি রয়েছে—যা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে খেতে চাই। একটু অপেক্ষা করুন আপনারা।'

ভিড়ের মধ্যে একজন বলল, 'ঠাকুর, আপনার গাছভরতি নাসপাতি আছে বলছেন, তবে নাসপাতি চাইছিলেন কেন?'

সন্ন্যাসী বললে, 'দাঁড়ান, গাছটা লাগাই, তবে তো হবে নাসপাতি!'

সন্ন্যাসীর কথা শুনে ব্যঙ্গের হাসি হাসল চাষি। বলল, 'হুঃ, উনি গাছ লাগাবেন, সে গাছ বড়ো হবে, তাতে ফল ফলবে, তবে সে নাসপাতি খাবেন আপনারা। ততদিনে বুড়ো হয়ে যাবেন যে সবাই।'

ব্যাপারটা হাসার মতোই বটে, তবু সবাই ভাবল, 'সন্ন্যাসী কী করে দেখাই যাক্ না।'

সবাই জড়ো হল সন্ন্যাসীর চারপাশে। ফলের গাড়িটা একটু দূরে সরিয়ে রেখে সেই চাষিও যোগ দিল সবার সঙ্গে।

এদিকে সন্ন্যাসী কী করল জানো? চট করে হাতের নাসপাতিটা খেয়ে ফেলল বিচিগুলো বাদে। তারপর মাটিতে একটা গর্ত করে নাসপাতির বিচি পুঁতে বলল, 'একটু জল লাগবে এখানে। একটু জল দিতে পারেন কেউ?'



ভিড়ের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'ঠাকুরের রকমসকম দ্যাখো। মনে হচ্ছে সত্যিই গাছ বেরুবে ওই বিচি থেকে। হাঃ হাঃ।'

একটি ছোটো ছেলে ছুটে এক ঘটি জল নিয়ে এল। সন্ন্যাসী মাটিতে পোঁতা বিচিতে ঘটি থেকে কিছুটা জল ছিটিয়ে দিয়ে চোখ বুজে কী সব মন্ত্র আওড়াতে লাগল।

হঠাৎ সবাই দেখল ভিজে মাটি ঠেলে বেরুচ্ছে সবুজ একটুখানি অঙ্কুর। তারপর সবার অবাক হয়ে যাওয়া চোখের সামনে মাটি ফুঁড়ে বেরুলো দুটো ছোটো পাতা আর একটুখানি ডাল। সবাই তো বিস্ময়ে থ। সন্ন্যাসী কি জাদু জানে?

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই দুটো পাতা ও একটি ডাল তরতর করে বেড়ে উঠল এবং একটু পরই সবাই দেখল তাদের চোখের সামনে বড়োসড়ো এক নাসপাতি গাছ। আর শুধু গাছ নয়, তা ফুলে ফুলে সাদা। আবার কয়েক মুহূর্ত পরই দেখা গেল নাসপাতির ফুলগুলো সব ঝরে পড়েছে আর গাছ ভর্তি ছোটো ছোটো নাসপাতি। তারপর সেই ছোটো ছোটো নাসপাতির বড়ো হয়ে যাওয়া তো চোখের পলকের ব্যাপার। এসব দেখে সবাই এত অবাক হয়ে গেল যে হাততালি দিয়ে সাধুবাদ জানাতেও ভুলে গেল।

সন্ন্যাসী হেসে বলল, 'আমার গাছের নাসপাতি বড়ো হয়ে গিয়েছে। এবার এগুলো খাওয়া যেতে পারে।'

এই বলে সন্ন্যাসী গাছ থেকে পেড়ে সবাইকে নাসপাতি দিতে লাগল এক-একটা করে। সবাই তো খুব খুশি। মহা আনন্দে নাসপাতি খেতে লাগল সবাই। ক্রমে একটা বাদে সব নাসপাতিই বিলিয়ে দেওয়া হয়ে গেল। সন্ন্যাসী তখন শেষ নাসপাতিটা সেই চাষিকে দিয়ে বলল, 'তুমিও নেবে নাকি একটা? নাও না, খেয়ে দ্যাখো।'

বিনে পয়সার কোনো জিনিসেই আপত্তি নেই চাষির। নাসপাতিটা নিয়ে তক্ষুনি খেতে শুরু করল ও।

'নাসপাতি খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন আর এই গাছটার কোনো দরকার নেই', এই বলে সন্ন্যাসী তার ঝোলা থেকে একটা কাটারি বার করে ঘ্যাচ করে গাছটা কেটে ফেলল। তারপর কাটা গাছটা কাঁধের ওপর ফেলে বলল, 'আচ্ছা, এবার তবে আসি'। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল।

সবাই বলতে লাগল, 'সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই জাদু জানে।' কেউ কেউ বলল 'কোথায় থাকে জেনে নিলে হত, কে জানে, কখন কী দরকার পড়ে!'

সেই চাষির ততক্ষণে খেয়াল হয়েছে যে সন্ন্যাসী যখন সবাইকে বিনি পয়সায় নাসপাতি খাইয়েছে তখন হয়তো অনেকে ওর নাসপাতি অত চড়া দামে না কিনতেও পারে। মনে মনে সন্ন্যাসীকে গাল পাড়ল ও। কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে। তাই ও এগিয়ে গেল ওর নাসপাতির গাড়ির দিকে।

কিন্তু গাড়ির কাছে এসে তো ওর চক্ষু চড়কগাছ। ওর গাড়ি ফাঁকা। একটাও নাসপাতি নেই তাতে। তার ওপর ঠেলাগাড়ির হাতলও খানিকটা নেই।

কী হয়েছে বুঝতে সময় লাগল না চাষির। সন্ন্যাসী জাদু জানে ঠিকই। জাদুবলেই চাষির গাড়ির নাসপাতিগুলো সন্ন্যাসীর নাসপাতি গাছে গিয়ে ফলেছে। আর চাষির নাসপাতিগুলোই মহানন্দে সবাইকে বিলিয়েছে সন্ন্যাসী। 'মজা দেখাচ্ছি সন্ন্যাসীকে' বলে ছুটে গেল বটে চাষি কিন্তু ততক্ষণে সন্ন্যাসী চলে গিয়েছে। কোন্ দিকে, কেউ খেয়াল করেনি।

বাজারের অন্য সবাই যখন চাষির ফাঁকা গাড়ি দেখল এবং ব্যাপার বুঝতে পারল, তখন সবাই বলতে লাগল, 'উচিত শিক্ষা হয়েছে চাষির। একটা নাসপাতি বিনে পয়সায় দিতে ওর বুক ফেটে যাচ্ছিল এখন গাড়ি ভর্তি নাসপাতি দিতে হল বিনে পয়সায়। হাঃ, হাঃ, হাঃ—'

এরপর সেই সন্ন্যাসীকে সেদেশে আর কেউ দেখতে পায়নি। চাষি সন্ন্যাসীর ওপর রেগেছিল খুবই কিন্তু ওর শিক্ষাও হল খানিকটা। স্বভাবটা একেবারে বদলাতে না পারলেও এরপর থেকে কেউ চাইলে দু-একটা নাসপাতি প্রায়ই দান করে ফেলত ও।

ছবি। প্রণবেশ মাইতি



ছোট্ট চাচাতাতুতু ও বিশাল রূপসি পাখি

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

ছোট্ট চাচাতাতুতু পাখি। যেমন ছোট্ট দেহ, তেমনি দেখতে কদাকার। সব পাখির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ দেখতে তাকে। তার বাসার কাছেই থাকে সবচেয়ে বড়ো আর সুন্দরী এক বিশাল রূপসি পাখি।

অনেককাল আগে সেই ছোট্ট চাচাতাতুতু পাখি বড়ো বড়ো ঘন সবুজ ঘাসের বাসায় তিনটে ডিম পেড়েছিল। কাছেই এক সরু গর্তের মধ্যে থাকত এক ছাতারে পাখি। যখন চাচাতাতুতু বাইরে খাবার খুঁজতে যেত, তখন ছাতারে হাওয়ার বেগে এসে তার ডিমগুলোকে খেয়ে যেত। এমনি করে সে দুটো ডিম খেয়ে ফেলল। বেচারি চাচাতাতুতু ভীষণ কষ্ট পেল। কষ্টে তার চোখ ঝাপসা হয়ে এল, কষ্টে তার দম বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু এত ছোট্ট পাখি, সে কি-ই বা করতে পারে? উড়ে গেল বিশাল রূপসি পাখির কাছে, তার কাছে সে নালিশ জানাল।

কেঁদে কেঁদে চাচাতাতুতু বলল, 'রূপসি পাখি, তুমি তো পাখিদের রানি। তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমার কষ্ট দেখ। একটা দুষ্টু ছাতারে পাখি আমার তিনটে ডিমের মধ্যে দুটোই খেয়ে ফেলেছে। কী সুন্দর ফুটফুটে দুটো বাচ্চাই না হত! দুটো বাচ্চা না ফুটতেই সে

মেরে ফেলল। তোমার কাছে এসেছি, তুমি এর বিচার করো, তাকে শাস্তি দাও, তুমি প্রতিশোধ নাও।'

বুড়ো আঙুলের চেয়ে ছোট্ট একটা পাখির কথা শুনতে রূপসি পাখির বয়েই গিয়েছে। খেঁকিয়ে উঠে রাগী গলায় রূপসি পাখি বলল, 'তুমি জান না আমি কেমন সবসময় ব্যস্ত থাকি? আর তা ছাড়া তোমার ওই ছোটো ব্যাপারে আমি যাব তোমাকে সাহায্য করতে! তোমার স্পর্ধা তো কম নয়? যাইহোক, মায়ের কর্তব্য হল তার বাচ্চাদের রক্ষা করা, অন্য কেউ কেন সে কাজ করতে যাবে? এটা শুধু তোমারই কাজ, তুমিই তোমার বাচ্চাদের রক্ষা করবে।'

রূপসি পাখি কিছু করবে না শুনে ছোট্ট চাচাতাতুতু আরও ভয় পেয়ে গেল। আর কার কাছেই-বা সে যাবে? তাই ভয়ে ভয়ে আবার বলল, 'আমি তোমার কাছেই এসেছিলাম, কেন-না তুমিই তো আমাদের রানি। আমার ওপরে তুমি এমন নির্দয় হয়ো না, আর কখনও ভেব না যে সামান্য একটা ছোটো ব্যাপারে আমি এমন শোরগোল তুলেছি। এটা ছোটো ব্যাপার ঠিকই, কিন্তু ঠিক সময়ে যদি তার দিকে নজর দেওয়া না হয়, একদিন তার থেকেই বিরাট বিপদ-আপদ নেমে আসতে পারে। আজ যেটাকে তুচ্ছ মনে হচ্ছে, কালকে সেটা একেবারে তুচ্ছ নাও থাকতে পারে। এমনটা যদি ঘটে তবে আমায় তখন দোষ দিয়ো না। আমার কথা তখন যেন মনে থাকে।'

রূপসি পাখি তবু তার কথায় কান দিল না। একবার জোরে হেসে গুনগুন করে গান করতে লাগল সে।

চাচাতাতুতুর কথা কি রূপসি পাখি শুনতে পেল না? নাকি সে গ্রাহ্যই করছে না? আরও ভয় পেয়ে ছোট্ট পাখি বলল, 'তুমি হাসছ কেন? তুমি গান গাইছ কেন? আমার কথা ভালোভাবে শুনে রাখো, যখন একটা ছোট্ট ব্যাপার থেকে ভীষণ ব্যাপার ঘটে যাবে তখন আর আমাকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ হবে না। বুঝলে?'

তবু রূপসি পাখি তার দিকে চোখ ফেরাল না। সে গান গাইছে তেমনিভাবে। মনের দুঃখে অসহায় চাচাতাতুতু ফিরে এল তার নিজের বাসায়। কেউ তাকে সাহায্য করবে না, নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। কী আর করবে সে? দুঃখে ঘেন্নায় সে একটা চোখা লম্বা ঘাস তুলে নিল আর তাই দিয়ে তৈরি করল একটা সরু তির। তির নিয়ে উড়ে গেল পাশের এক গাছে, ডালে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। ছোট্ট দুটো চোখ বড়ো বড়ো করে খুলে রাখল, খুঁজতে লাগল লোভী ছাতারে পাখিকে।

ঠিক তাই। ছাতারে আসছে তার শেষ ডিমটাকে খেতে, তার সুন্দর বাচ্চাকে ফুটবার আগেই শেষ করে দিতে। এই ভাবনায় চাচাতাতুতু এমন উত্তেজিত আর সাহসী হয়ে উঠল যে ছাতারে পাখি কিছু বোঝায় আগেই তিরবেগে উড়ে গিয়ে সেই ছুঁচলো তির ঢুকিয়ে দিল তার লোভী চোখে। চোখের ব্যাথায় ছাতারে কোঁ কোঁ আওয়াজ ছাড়ছে, চারিদিকে পাঁইপাঁই ঘুরছে, বন্ধ চোখে এখানে-ওখানে ধাক্কা খাচ্ছে।

লাফাতে-লাফাতে গড়াতে গড়াতে উড়ে-উড়ে ছাতারে পাখি কোঁকাচ্ছে আর এগোচ্ছে। হঠাৎ এক সিংহের নাকের মধ্যে সে আচমকা ঢুকে গেল। সিংহ তখন তীরে শুয়ে মাথাটা বালিতে রেখে চোখ বুজে আরাম করছিল। হঠাৎ নাকের সুড়সুড়িতে তার ঘুম গেল ভেঙে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সিংহ লাফিয়ে পড়ল জলে।

জলে তখন আরামে চরে বেড়াচ্ছে এক বিরাট সাপ, দুপাশে তার ডানা, চোখে আগুন জ্বলছে। হঠাৎ তার সামনে সে দেখতে পেল সেই সিংহকে, মনে হল সিংহ যেন তার দিকেই ছুটে আসছে। সিংহ যদি তাকে মেরে ফেলে? এই চিন্তা করেই জল ছেড়ে এদিক-ওদিক কী রয়েছে সেসব না দেখেই সে উড়ে চলল।

ভয় পেয়ে পালানো, তাই চোখ যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। উড়তে গিয়ে তার ডানার আঘাতে রূপসি পাখির বাসা গেল ভেঙে, মাটিতে পড়ে গেল রূপসি পাখির সুন্দর ডিম। বাচ্চা ফোটার আগেই ডিম গেল ভেঙে।

ভীষণ খেপে গেল রূপসি পাখি, দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে তার। রুক্ষ গলায় সে বলে উঠল, 'তুমি হলে ড্রাগন, আর আমি হলাম রূপসি পাখি। চিরকাল তুমি থাক জলে, আর আমি থাকি ডাঙায়। তোমার সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া-বিবাদ নেই। তুমি জান না যে, আমরা রূপসি পাখিরা বছরে মাত্র একবার একটা করে ডিম পাড়ি, সারা বছরে আমাদের একটাই বাচ্চা হয়? জলের বাসা ছেড়ে তোমার উড়ে আসার কী দরকার ছিল? তুমি আমার বাসা ভাঙলে, তুমি আমার একমাত্র ডিমকে ভেঙে ফেললে। আমি এখন কী করি? হায়! হায়! এ আমার কী হল?'

জলের প্রাণী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'রূপসি পাখি, দোহাই তোমার, তুমি আমাকে দোষ দিয়ো না। আমার কোনো দোষ নেই। আমি যখন আনন্দে আস্তে আস্তে সাঁতার দিচ্ছিলাম, তখন একটা সিংহ আচমকা জলের মধ্যে ঢুকে পড়ে আর আমাকে খেতে তেড়ে আসে। তখন আমি কী করি? ভয়ে জল ছেড়ে আকাশে উড়ে পড়েছি। ভয়ে আমি হঠাৎ না দেখতে পেয়ে তোমরা বাসা ভেঙেছি, ডিম ভেঙেছি। কিন্তু ভাই, ইচ্ছে করে ভাঙিনি, দেখতে না পেয়ে এমন ঘটে গেল। তাই এটা সিংহের দোষ। সে আমায় খেতে না এলে তো আর আমি অমন করে উড়তাম না? তুমি ভাই সিংহকেই দোষ দাও। সেই তো দোষী।'

রূপসি পাখি তাই সিংহের কাছে গেল।

সিংহ বলল, 'রূপসি পাখি, তোমার তো খুব বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। তাই আমাকে দোষ দিয়ো না। আমি দোষী নই। আমি গরম বালির ওপরে শান্তিতে ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ কোথা থেকে এক দুষ্টু ছাতারে পাখি সোজা আমার নাকের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমার এমন ব্যথা লাগল, এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তাই আমার দোষ কোথায়? এ তো ছাতারের দোষ। তুমি বরং তাকে দোষী কর। তাকেই জিজ্ঞেস কর।'

রূপসি পাখি তাই ছাতারে পাখির কাছে গেল।

খুব ভক্তি দেখিয়ে মাথা নুইয়ে ছাতারে পাখি বলল, 'রূপসি পাখি, আমার কিচ্ছু দোষ



নেই, আমি কিচ্ছু করিনি। সব দোষ ওই চাচাতাতুতুর। আমি ফুরফুর করে ঘাসে ঘাসে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ হতচ্ছাড়া চাচাতাতুতু আমার চোখে একটা ছুঁচলো তির ঢুকিয়ে দেয়। আমার এমন ব্যথা লাগল, আমি এমন হকচকিয়ে গেলাম যে পালাতে গিয়ে ভুল করে সিংহের নাকে ঢুকে গিয়েছি। ইচ্ছে করে ঢুকিনি। তাই সব দোষ ওই ছোট্ট চাচাতাতুতুর, আমার নয়। তুমি বরং তার কাছে যাও।'

কী আর করে রূপসি পাখি। ছোট্ট চাচাতাতুতুর কাছে তাকে যেতেই হল শেষকালে।

গম্ভীর হয়ে ভারী গলায় চাচাতাতুতু বলল, 'রূপসি পাখি, আমি তোমায় আগেই বলেছিলাম। কিন্তু সেদিন তুমি আমার কথায় কান দাওনি। কেন-না, আমি একটা ছোট্ট পাখি, আমার ছোটো ছোটো পালক, আমার দেহে শক্তি নেই, আমাকে দেখতেও খুব খারাপ, বলার মতো আমার কিছুই নেই। তোমার কাছে নালিশ জানাতে গিয়েছিলাম। তুমি তখন ভাবলে, আমার মতো ছোট্ট পাখির কাছ থেকে তোমার কোনো বিপদ হবে না। ভাবলে, আমার দুঃখ-কষ্ট কিছুই না, খুব সামান্য ব্যাপার, ওতে কান দেবার কী আছে! আমাকে তুমি উপদেশ দিলে, বাচ্চাদের দেখাশোনা মায়েদেরই করা উচিত। তোমাকে বিরক্ত করতেও বারণ করলে। এখন

কেমন মনে হচ্ছে? তুমি তোমার নিজের বাচ্চাকে দেখাশোনা করতে পারনি। তা না করে এখন সবাইকে বকে বকে দোষ দিয়ে বেড়াচ্ছ। যখন ছাতারে আমার ডিম খেয়েছিল তখন সেটা তো সামান্য ব্যাপারই। আর জলের প্রাণী যখন তোমার বাসা ভেঙে ডিম ভাঙল তখন কেন সেটা সামান্য ব্যাপার হবে না? আমি ঘাসের বাসায় তিন তিনটে ডিম পেড়েছিলাম। তাদের রেখে রোজ আমাকে খাবার খুঁজতে যেতে হত। আর তুমি পেড়েছ গাছের উঁচু ডালে, একটা মাত্র ডিম। নিচু জায়গায় তিনটে ডিম সামলানো কত কঠিন। আর উঁচু ডালে একটা ডিম পাহারা দেওয়া কত সহজ। তা-ই তুমি পারলে না? একটা ডিমও ভালোভাবে দেখেশুনে তুমি বাঁচাতে পারলে না? আমি তোমায় আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, যদি খুব সামান্য একটা ব্যাপারের সমাধান তক্ষুনি না করে ফেলো তবে তাই থেকে বিরাট কিছু ঘটে যেতে পারে। তখন বলেছিলাম, এরকম ঘটলে আমায় কিন্তু দোষ দিয়ো না। তা হলে এখন তুমি বড়ো মুখ করে আমায় কেন দোষ দিতে এসেছ? আমি তো দোষী নই!'

চাচাতাতুতু পাখির কথায় রূপসি পাখি খুব লজ্জা পেল আর মনমরা হয়ে মাথা নিচু করে উড়ে চলল তার বাসার দিকে।

ছবি। প্রণবেশ মাইতি



খরগোশের কান কেন লম্বা চোখ কেন লাল

পরিতোষ সরকার

একদা বহুযুগ আগে খরগোশের চোখ ছিল নীল আর তার কান ছিল ছোটো। পরবর্তী কালে তার কান কেন লম্বা হল, কেন তার চোখ হল ফ্যাকাশে-লাল সে কাহিনিই আজ তোমাদের শোনাব।

অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক পাহাড়ের নীচে গর্তের মধ্যে বাস করত এক বুড়ি মা-খরগোশ ও তার ছোট্ট ছেলে। ছোট্ট বাচ্চা খরগোশের গায়ের রং ছিল দুধের মতো ধবধবে সাদা। যত বড়ো হতে থাকে ততই সে তার মায়ের চেয়েও শক্তিমান হতে থাকে। কিন্তু শক্তিশালী হলে হবে কী যত তার বয়স বাড়তে থাকে ততই সে কুঁড়ে আর বদমেজাজি হয়ে উঠতে থাকে। বয়স বাড়লেও সে মায়ের কোলের শিশুর মতোই আচরণ করতে থাকে। কাজকর্মে মনোযোগ নেই। এমনকি খাবারের খোঁজেও সে বের হত না। মাকে বলত, 'মা আমি এখনও তো অনেক ছোটো—না মা?'

তার বুড়ি মা খাবার জোগাড় করে আনে।

মা খাবার নিয়ে এলে প্রথম দিকে সে নিজের পছন্দমতো খাবারগুলো মার কাছ থেকে চেয়ে নিত। কিন্তু ক্রমশ তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে মায়ের হাত থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে খেত।

সে আরও সুন্দর বাড়িতে থাকার জন্য মায়ের কাছে বায়না ধরত। ছেলের বায়নায় মার মন খারাপ হয়ে যায়। ভালো সুন্দর বাড়ি কোথায় পাবে?

একদিন রাত্রিবেলা বিনা কারণে মায়ের উপর রাগ দেখিয়ে বলে, 'আমার গায়ের লোম কি সাদা নয়? কেন আমাকে নোংরা বিছানায় শুতে দাও?'

মা আর কী করে, ছেলেকে খুশি করার জন্য সাদা ধবধবে বিছানার ব্যবস্থা করল। ছেলে সেই বিছানায় শুতে গেল।

মা-খরগোশ একদিন খাবারের খোঁজে পাহাড়ের গভীর বনে গেল। আর তার অলস ছেলে অন্যান্য দিনের মতোই বাড়িতে শুয়ে রইল। এ দিকে মা-খরগোশ প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পড়ে গেল। বৃষ্টির জলে ভিজে স্নান করে একেবারে চুপসে গেল। ফলে সারাদিন দুর্যোগ মাথায় নিয়ে সে কোনো খাবার জোগাড় করতে পারল না। অনেক রাতে হতাশ মনে সে বাড়ি ফিরল। ছেলেটি অধৈর্য হয়ে মায়ের জন্য দরজার সামনে অপেক্ষা করে বসে ছিল। সে যখন দেখল তার মা খালি হাতে খাবার না নিয়েই ফিরছে, তখন সে রাগে ফেটে পড়ল, মাকে গালাগালি দিতে শুরু করল।

'এতক্ষণে বুঝি তোমার ফেরার সময় হল? আমি তো ভাবছিলাম তুমি বুঝি মারাই গেছ। সারাদিন বাইরে কাটিয়ে দিলে। আমার জন্য খাবার আনতে পারলে না!'

ছেলের কথা শুনে মার খুব কষ্ট হল। ছেলেকে বলল, 'তুমি যথেষ্ট বড়ো হয়েছ। তোমার খাবার তোমার নিজেরই সংগ্রহ করে আনা উচিত। সব সময় আমার উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। আমার বয়স হয়েছে।'

আদুরে ছেলে মায়ের এই কথাগুলো সহ্য করতে পারল না। কিছুক্ষণ গুম মেরে রইল। তারপর প্রচণ্ড ক্ষোভে মাকে বলল, 'ঠিক আছে। এখন থেকে আমরা কেউ কারও উপর নির্ভর করব না।'

মা-খরগোশ সত্যি সত্যি ছেলেকে খুবই ভালোবাসত। ছেলের রাগ দেখে তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'আমার কথায় রাগ কোরো না বাছা। সত্যিই আমি আজ ঝড়বৃষ্টিতে পড়েছিলাম। সেজন্যে খাবার জোগাড় করতে পারিনি। দ্যাখো গিয়ে ভাঁড়ার ঘরে এখনও অর্ধেক মুলো রাখা আছে। ওটা তুমি খেয়ে নাও।'

কী আর করা। সেদিন বাধ্য হয়ে অর্ধেক মুলো খেয়েই থাকতে হল। কিন্তু রাতে শোবার পর ক্রমশ খিদে বাড়তে থাকে—কিছুতেই ঘুম আসছে না। বিছানার ওপর এপাশ ওপাশ করতে থাকে। হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগে—'মা কেন মনে করে আমি খাবার জোগাড় করতে পারব না। মা তো নিজেও আজ কোনো খাবার জোগাড় করতে পারেনি।'

কখন ভোর হয়ে গেছে। বিছানা ছেড়ে মাকে সে জিজ্ঞেস করল, 'মা আজ আমি নিজেই যাব খাবার আনতে।' এ কথা বলেই বাড়ির বাইরে পা বাড়াল। তার বৃদ্ধা মা চিন্তান্বিত হয়ে ভাবল তার আদুরে ছেলে তো একলা কোনোদিন বাড়ির বাইরে যায়নি। তাই বলল, 'আমার সঙ্গে চল।'



অবাধ্য ছেলে বুক ফুলিয়ে বলল, 'শোনো মা, আজ থেকে কেউ কারোর উপর নির্ভর করব না।'

এই বলে ছেলে বাইরে বেরিয়ে গেল। এক গাছ থেকে অন্য গাছ, এক গর্ত থেকে অন্য গর্ত, এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে দৌড়োদৌড়ি করে তার হাত-পা কেটে গেল। সারা গায়ে কাদামাটি মাখামাখি। তবুও সে একটুও খাবার সংগ্রহ করতে পারল না। সে ভাবল, 'কোথায় গেল সব তাজা তাজা মিষ্টি ফল আর সবজি? আমি কেন সে সব খুঁজে পাচ্ছি না, মা তো সব খুঁজে নিয়ে আসত।' এসব ভাবতে ভাবতেই চলতে থাকে খাবারের খোঁজ। কিন্তু বৃথাই চেষ্টা। সে এক টুকরো খাবারও সংগ্রহ করতে পারল না। হতাশ হয়ে পড়ল সে। ঘুরতে ঘুরতে প্রচণ্ড খিদেও পেয়েছিল তার। তারপর একটা গাছের নীচে এসে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর ঘুমে তার নাক ডাকতে শুরু করল।

হঠাৎ এক ভয়ংকর গর্জনে তার সুখনিদ্রা ভেঙে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে বিরাট এক নেকড়েবাঘ তার দিকেই তেড়ে আসছে। প্রাণের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চোঁ চাঁ দৌড় দিল সে। নেকড়েবাঘ তার পেছন পেছন তাড়া করল। বরাতজোরে ছেলে-খরগোশের পায়ে ছিল বিদ্যুৎগতি। ছুটতে ছুটতে সামনের পাহাড়ের নীচে একটা গর্ত দেখতে পেয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। নেকড়েও সেখানে এসে পৌঁছোল। কিন্তু মোটাসোটা শরীর নিয়ে সে গর্তে ঢুকতে পারল না। গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে আঁচড়ে-কামড়ে দাঁত কড়মড় করতে লাগল। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হল না। শেষে খরগোশের আশা ছেড়ে দিয়ে বিষণ্ন মনে সে চলে গেল।

খরগোশের বাচ্চা গর্তের ভেতর কিছুক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করল। তারপর যখন নিশ্চিন্ত হল যে নেকড়েবাঘ চলে গেছে, তখন ভয়ে ভয়ে সে গর্ত থেকে বের হল। বের হয়েই আবার খাবারের সন্ধানে গেল। পেটে তখন খিদের আগুন জ্বলছে।

হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলে-খরগোশ একটা পুকুরের সামনে এসে হাজির হল। পুকুরে মোষেরা স্নান করায় জল একেবারে কাদা হয়ে গেছে। তেষ্টা পেয়েছে খুব, তাই সে বাধ্য হয়ে সেই পুকুরেই জল পান করার জন্য গেল। পুকুরের কাদা জলে ছিল মস্ত বড়ো জোঁক। ছেলে-খরগোশ কোনোদিন জোঁক দেখেনি। যেই জলে মুখ দিয়েছে অমনি একটা জোঁক তার নাক কামড়ে ধরল। নাকের ব্যথায় পুকুরের পাড়ে ছোটাছুটি করতে করতে দিল পরপর কয়েকটি হাঁচি। তাতেও জোঁক ছাড়ে না। মরিয়া হয়ে নাক চুলকোতে থাকল। অনেক কসরত করার পর জোঁক ছাড়াতে পারল। নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল, ব্যথায় নাক টনটন করতে লাগল।

ছেলে-খরগোশ তারপর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলতে শুরু করল। খিদেয় তার মাথা ঘুরছে। হঠাৎই যেতে যেতে দেখতে পেল একটি ছোটো গাছে প্রচুর বৈঁচি ফল পেকে রয়েছে। কয়েকটি পাখি আর কাঠবিড়ালি সেই পাকা ফল খাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করছে। খরগোশ বাচ্চা তো মহাখুশি। সে এগিয়ে গিয়ে পাখি আর কাঠবিড়ালিদের তাড়িয়ে দিয়ে মনের আনন্দে ইচ্ছেমতো বৈঁচিফল খেতে শুরু করল। রসালো মিঠে বৈঁচিফল পেয়ে গপাগপ খেতে থাকল। তার খাওয়া যেন আর শেষ হয় না। সব ক্লান্তিও ভুলে গেল। ভুলে গেল পায়ের ক্ষতের কথা, নেকড়ের কথা, এমনকি জোঁকের কথা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, মায়ের কথাও মন থেকে মুছে গেল। মনে মনে ভাবল, 'আ! কী সুন্দর জায়গা। এখানেই থেকে যাব।' পেটপুরে খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

সূর্য অস্ত গেল। দিগন্তে অন্ধকার নেমে এল। আজই প্রথম বাচ্চা-খরগোশ বাড়ির বাইরে রাত কাটাবে। রাত যত বাড়ছে ক্রমে ক্রমে ঠান্ডা বাতাসের প্রকোপও বাড়ছে। ঠান্ডা বাতাসে তার আরামের ঘুম ভেঙে গেল। হাত-পা জমে আসছে। ভয় পেয়ে সে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

যখন সে বাড়িতে পৌঁছোল তখন গভীর রাত। মা-খরগোশ ঘরবার করছিল। ছেলেকে দেখে মার মনে দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে যায়। আনন্দে এগিয়ে এসে ছেলের হাত ধরে বলল,

'বাছা, এতক্ষণে এলি? আজ কিছু কি খাবার সংগ্রহ করতে পেরেছিস?'

ছেলে দেমাক দেখিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই।'

মা তবুও জিজ্ঞেস করল, 'কোনো অঘটন ঘটেনি তো?'

ছেলে মিছেকথা বলল, 'না।'

মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়, বলল, 'তোর নাকে রক্ত কেন? আঘাত পেয়েছিলি কি?'

মায়ের প্রশ্ন শুনে ছেলে রাগে ফেটে পড়ে, 'আঘাত পাই বা না-পাই তাতে তোমার কী? বলেছি তো, আজ থেকে কেউ কারোর উপর নির্ভর করব না।'

ছেলের বদমেজাজের কথা মার জানাই ছিল। তাই আর কোনো কথা না বাড়িয়ে ছেলেকে শুতে যেতে বলল।

পরের দিন যথারীতি মা-খরগোশ প্রতিদিনের মতো খাবার সংগ্রহ করতে বের হল। কিন্তু ছেলে কুঁড়ের বাদশার মতো বিছানায় শুয়ে রইল। দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর সে বিছানা ছেড়ে খাবারের খোঁজে বাড়ির বাইরে বের হল। পথে হাঁটতে হাঁটতে আগের দিনের বৈঁচি ফলের কথা মনে পড়ল। ভাবল অন্য কোথাও গেলে হয়তো বৈঁচি ফলের চেয়েও ভালো খাবার পাওয়া যাবে। ভাবতে-ভাবতে চলতে-চলতে বাচ্চা-খরগোশ এক তরমুজ-খেতে এসে পৌঁছোল। পাকা তরমুজের গন্ধে ছেলে-খরগোশের মুখ দিয়ে লালা ঝরতে থাকল।

সে চারদিক দেখে নিল ধারেকাছে কোথাও কেউ আছে কি না। তারপর গুটি গুটি পায়ে সে তরমুজ-খেতে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই হাভাতের মতো একটা একটা করে তরমুজ খেতে লাগল। পেট ভরে তো খেলই—তারপরও কয়েকটি তরমুজ কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে খুবই গর্ব করে মাকে জানাল, এসব তরমুজ সে বহুদূরের পাহাড় থেকে এনেছে।

ছেলের কথা শুনে মা আর কোনো প্রশ্ন করল না।

বাচ্চা-খরগোশ সারাটা দিন মনের সুখে বাড়িতে বসে তরমুজ খেয়েই কাটাল। তরমুজগুলো বিশাল বড়ো সাইজের। আর কী মিষ্টি সুস্বাদু! তরমুজ শেষ হলে সে আবার তরমুজ-খেতের দিকে পা বাড়াল।

খেতের কাছে এসে ধারেকাছে কাউকে না দেখে লাফ দিয়ে খেতে ঢুকে পড়ল। মনের আনন্দে তখন সে তরমুজ খেতে লাগল।

ঠিক তখনই খেতের মালিক এসে হাজির। খরগোশকে তরমুজ খেতে দেখে রাগে ক্ষোভে চুপি চুপি এক-পা এক-পা করে এগিয়ে গিয়ে বাঁশ দিয়ে তার মাথা লক্ষ্য করে মেরেছিল—সামান্যের জন্য তা ফসকে গেল। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা—এই কথা মনে করে খরগোশ প্রাণের ভয়ে চোঁ চাঁ দৌড় দিয়েছে। এক দৌড়ে সে বাড়ির এক কোনায় এসে লুকিয়ে রইল। মাকে সে এর বিন্দুবিসর্গ জানতে দিল না। খেতের মালিকের কথাটি ছেলে-খরগোশের কানে বাজতে লাগল কেবল—ব্যাটা ছিঁচকে চোর। তোকে এবার মারতে পারলাম না। এর পরের বার তোকে জ্যান্ত ধরব।

তরমুজ-খেতের মালিক বাড়ি ফিরে এক হাঁড়ি আঠালো চাল এমনভাবে সেদ্ধ করল যাতে তা নরম ও খুব আঠা-আঠা হয়। পরে তা মণ্ড পাকিয়ে কয়েকটি কাকতাড়ুয়া বানিয়ে তরমুজের খেতে দাঁড় করিয়ে দিল।

মিষ্টি সুস্বাদু তরমুজ খেয়ে ছেলে-খরগোশের লোভ বেড়ে গেছে। পরের দিন আবার চুরি করে তরমুজ খাওয়ার জন্য ওই খেতে গিয়ে হাজির। সেখানে কাকতাড়ুযা দেখে প্রথমে ভয়ে পিছিয়ে গেল। কিছুটা দূরে গিয়ে সে পিছন ফিরে পরখ করে দেখল, ওই মানুষটা তো একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে সাহস করে একমুঠো মাটি কাকতাড়ুয়ার দিকে ছুড়ে মারল। কিন্তু তবুও মানুষটি নড়ে না কেন? তখন সে খুশি হয়ে ভাবল ও নিশ্চয়ই একটি বোকাসোকা মানুষ। ওকে ধোঁকা দেওয়া সহজ হবে। ছেলে-খরগোশ আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়ে খুব নরম সুরে বলল, 'খুড়ো সুপ্রভাত।'

তবুও কোনো সাড়া নেই। সে আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলল, 'ওহে খুড়ো সুপ্রভাত।'

তবু কোনো জবাব নেই।

এবার সে রেগে গেল। তার গলার স্বর উঁচুতে নিয়ে বলল, 'ওহে তুমি কি আমার কথার কোনো জবাব দেবে না? কথার জবাব না দিলে আমি তোমাকে মারব এক ঘুসি।' এই বলে সে কাকতাড়ুয়াকে মারল জোরসে এক ঘুসি। ঘুসি মারার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত আঠালো মণ্ডের মধ্যে আটকে গেল।

ওঃ বেশ ঘুসি মেরেছি। ভাবতে ভাবতে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

ছেলে-খরগোশ চিৎকার করে উঠল, 'বাঃ! তুমি আমাকে ছাড়বে না!'

মূর্খ ছেলে-খরগোশ ভাবল, কাকতাড়ুয়া ইচ্ছে করেই তার হাত টেনে ধরেছে। তখন সে অন্য হাত দিয়ে মারল আর এক ঘুষি। সে হাতও গেল চালের মণ্ডে আটকে। কাকতাড়ুয়া সে-রকমই স্থির দাঁড়িয়ে। খরগোশ রেগে বলল, 'হতভাগা, বোবা তোকে লাথি মেরে মেরে, মেরে ফেলব।'

রাগে অন্ধ হয়ে কাকাতাড়ুয়াকে লাথি মারতে থাকল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার পা দুটিও আটকে গেল কাকতাড়ুয়ার শরীরে।

রাগে ক্ষোভে সে কাকতাড়ুয়াকে কামড়াতে শুরু করল।

'এই বোকা তুই আমার সঙ্গে লড়তে চাস?' এ কথা বলে সে আরও রেগে গিয়ে কাকতাড়ুয়াকে ফেলে দেবার জন্য সমস্ত শক্তি দিয়ে মারল এক ধাক্কা। কী ভয়ংকর কাণ্ড! ধাক্কার ঠেলায় এ বার খরগোশের নিজের শরীরটাই গেল কাকতাড়ুয়ার সঙ্গে আটকে। তখন ছেলে-খরগোশ ঘাবড়ে গেল। নিজেকে ছাড়াবার জন্য লড়াই করতে করতে তার চোখে রক্ত জমে গেল।

এমন সময় খেতের মালিক তরমুজ-খেতে এসে দেখল বাচ্চা-খরগোশ কাকতাড়ুয়ার

গায়ে আটকে রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে সে হাসিতে ফেটে পড়ল। 'হা! হা! হা! খুদে জন্তু, এবার আমি তোকে জ্যান্ত ধরব। মজা দেখাব।'

এবার ছেলে-খরগোশ সব বুঝতে পারল। যে মানুষটি খেতে দাঁড়িয়েছিল সে আসলে ছিল একটা পুতুল। সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আফশোশ করতে লাগল। বলল, 'আমার দয়ালু খুড়ো, এবারটি আমায় ক্ষমা করে ছেড়ে দিন, আমি আর কখনো তরমুজ চুরি করতে আসব না।'

বাচ্চা-খরগোশের করুণ অবস্থা দেখে চাষির করুণা হল। দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিতে চাইল। কিন্তু খরগোশের সারা শরীর হাত-পা ও মাথা সবই আঠায় আটকে গিয়েছিল। কেবল কানদুটি রেহাই পেয়েছিল। তাই চাষি গায়ের জোরে খরগোশের কান টানতে শুরু করল। এত জোরে টানাটানির জন্য খরগোশের কান ক্রমশ লম্বা হয়ে গেল। এর পর থেকে খরগোশের কান লম্বা হয়েই থাকল।

চাষি খরগোশের গা ধুয়ে মুছে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তার চোখ থেকে রক্তের দাগ মুছে যায়নি। ফলে খরগোশের লম্বা কান আর লাল-গোলাপি রঙের চোখ সারা জীবনের জন্য রয়ে গেল।

ছবি। প্রণবেশ মাইতি



লিয়াং-এর জাদুতুলি

অশোককুমার মিত্র

অনেক অনেকদিন আগেকার কথা। এক গাঁয়ে লিয়াং বলে এক ছেলে ছিল। সে যখন একেবারে ছেলেমানুষ তখনই তার বাপ-মা দুজনেই মরে গিয়েছিলেন। তাকে দেখাশোনার কেউ ছিল না। সে কী আর করে? সেই ছেলেবেলা থেকেই বেচারি জঙ্গলে কাঠ-কুটো কুড়িয়ে হাটে বেচে খাবার জোটায়। তবে লিয়াং ছিল ভারী বুদ্ধিমান ছেলে। চটপট কাজকর্ম সেরে ফেলত। অবসর সময়ে সে ভাবত ছবি আঁকার কথা। ছবি আঁকা শেখার সাধ তার অনেকদিনের। কিন্তু সে সাধ মেটবার নয়। বেচারি এত গরিব যে একটা তুলিও কিনতে পারে না।

একদিন জঙ্গল থেকে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরছিল লিয়াং। ঘরে ফেরার পথে পড়ে এক ইশকুল। লিয়াং দেখে সেই ইশকুলের মাস্টারমশাই ইজেলের বুকে একটি ছবি আঁকছেন। তুলির টানে টানে কী চমৎকার রেখা ফুটে উঠেছে। ছবি আঁকা দেখতে দেখতে কখন যে সে মনের ভুলে ইশকুলের ঘরে ঢুকে পড়েছে তা তার মনেও পড়ে না।

তাকে দেখে মাস্টারমশাই আঁকা থামিয়ে ওর দিকে ফিরে বললেন, কী ব্যাপার? এখানে তোর কী চাই?

আপনি কী সুন্দর ছবি আঁকছেন, দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। আমার কতদিনের সাধ—ছবি আঁকা শিখব। আপনি আমায় একখানা তুলি দেবেন?

কী? কী বললি তুই? ভিখিরির ছেলে তুই ছবি আঁকবি? অ্যাঁ, তোর সাহস তো কম নয়! ঘাড় ধরে মাস্টারমশাই লিয়াংকে ঘর থেকে দূর করে তাড়িয়ে দিলেন।

লিয়াং শুকনো মুখে ফিরে গেল, কিন্তু দমে গেল না। আমি গরিব বলে কি ছবি আঁকতে পারব না? নিশ্চয় পারব।—

মনে মনে এ-কথা ভেবে সে ঠিকই করে ফেলল যে এবার থেকে রোজকার জরুরি কাজ শেষ করে যতটুকু সময় পাবে ততটুকুই ছবি আঁকা অভ্যাস করবে। পাহাড়ে কাঠ কুড়োনোর পালা ফুরোলে সে ছবি আঁকত। তুলি নেই তো কী হয়েছে? গাছের সরু ডাল ভেঙে বালির ওপরে পাখির ছবি আঁকত সে। নদীর কূলে উলুখাগড়া কাটতে গিয়ে নদীর জলে আঙুল ডুবিয়ে পাথরের গায়ে আঁকত মাছের ছবি। আর গুহায় ফিরে সাত রাজ্যের ছবি এঁকে ভরিয়ে ফেলত তার গুহার চার দেওয়াল।

এমনি করে কেটে যাচ্ছিল দিন। একটি মুহূর্তও সে নষ্ট করত না, সুযোগ পেলেই ছবি আঁকার অভ্যাস ঝালিয়ে নিত। আঁকতে আঁকতে ছবি আঁকায় সে পটু হয়ে উঠল। তার আঁকা ছবি দেখলে এখন জীবন্ত মনে হয়। মনে হয় যেন পাখিটা এখুনি ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাবে, কী মাছটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ল্যাজ নেড়ে সাঁতার কাটবে।

একদিন হয়েছে কী—এক পাহাড়ের চুড়োয় লিয়াং এক মুরগির ছবি এঁকে রেখেছে। সত্যিকারের মুরগি ভেবে এক বাজপাখি ছোঁ মেরে তাকে তুলে নিতে গিয়ে ঠোঁটে পাথরের ঠোক্কর লেগে রক্তারক্তি কাণ্ড। আরেকবার সে পাথরের গায়ে এক নেকড়ের ছবি এঁকেছে—তা দেখে গোরু-ভেড়ার পাল লেজ তুলে দে দৌড়, দে দৌড়।

কিন্তু এত সুন্দর ছবি আঁকলে কী হয়, বেচারির আজও একটা সত্যিকারের তুলি জোটেনি। প্রতি মুহূর্তে সে ভাবে—হায় রে, যদি একটা তুলি জুটে যেত।

একরাতে বাড়িতে ফিরেই লিয়াং ঘরের মেঝেয় শুয়ে পড়ল। সারাদিন যা ধকল গেছে, ক্লান্তিতে তার দু চোখে সাত রাজ্যের ঘুম নেমেছে।

এমনি সময়ে এক বুড়ো সেখানে এসে হাজির। মাথা-ভরা সাদা চুলের ঢেউ। বুক পর্যন্ত তার সাদা দাড়ি নেমে এসেছে। তার হাতে চমৎকার এক তুলি। তার বাঁটে সোনালি নকশা-কাটা, আলো পড়লে ঝকঝক করে ওঠে। বুড়ো এসে লিয়াং-এর হাতে তুলিটা তুলে দিয়ে বলল, বাপু হে, এই নাও তোমার তুলি। শোন, এটা কিন্তু জাদু-তুলি, সাবধানে ব্যবহার কোরো।

লিয়াং তুলিটা হাতে নিল। সেটা বেশ ভারী। সোনার নকশার মাঝে নানা রত্ন গাঁথা আছে। ওঃ! কী চমৎকার তুলি এটা, কী বলে যে তোমায় ধন্যবাদ দেব— বলে সে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু তার মুখের কথা ফুরোবার আগেই বুড়ো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তার আর হদিস পাওয়া গেল না। ধন্দে পড়ে গেল লিয়াং—বুড়ো কি সত্যিই এসেছিল? নাকি

পুরোটাই স্বপ্ন? ভাবতে গিয়ে দেখে হাতে তার সেই তুলিটা রয়েছে, তার বাঁটে সোনার নকশা-কাটা, মাঝে নানা রত্ন গাঁথা। অবাক হয়ে গেল লিয়াং।

জাদু-তুলি দিয়ে একটা পাখি আঁকল লিয়াং। আঁকা শেষ হতেই পাখিটা ঝটপট ডানা মেলে আকাশে উড়ল। উড়ে উড়ে মিষ্টি সুরে গান গাইতে শুরু করল। তারপরে সে আঁকল একটা মাছ। আঁকা শেষ হতেই মাছটা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপরে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে জলের ভিতর নানা কসরত দেখাতে লাগল। জাদু-তুলির কাণ্ড দেখে লিয়াং থ—অবাক হয়ে সে জলে মাছের খেলা দেখতে লাগল।

এবারে একটা কাজ করল লিয়াং। গাঁয়ের গরিব মানুষ, যাদের দেখার কেউ নেই তাদের জন্যে রোজই গোপনে কাউকে খুরপি, কাউকে কোদাল, আবার কাউকে লাঙল এঁকে দিতে লাগল। সে সব পেয়ে তারা জমিতে চাষ শুরু করল। তাদের একটা হিল্লে হয়ে গেল।

কিন্তু কোনো গোপন কথাই শেষ পর্যন্ত গোপনে থাকে না। এখানেও তাই হল—প্রথমে গাঁয়ের লোকেরা জানল, ক্রমে গাঁয়ের জমিদারবাবুর কানে জাদু তুলির খবর পৌঁছোল। তিনি তাঁর দুই জবরদস্ত সাগরেদকে পাঠালেন লিয়াংকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে। তাকে দিয়ে ক'খানা মনের মতো ছবি আঁকাতে চান তিনি।

লিয়াং ছোটো ছেলে বটে, কিন্তু তার সাহস ছিল ভারী। জমিদারবাবু তাকে ছবি আঁকার হুকুম দিলে সে তা আঁকল না। তাকে তখন অনেক আদর করে ছবি আঁকতে বললেন, তাও সে আঁকল না। তখন তাকে নানারকম ভয় দেখাতে লাগলেন, তাও সে আঁকল না। যখন লিয়াং রাজি হল না তখন ভীষণ রেগে জমিদারবাবু তাকে গোয়ালঘরে আটকে রাখলেন। ঠান্ডা মেঝেতে সে শুয়ে রইল, এক দানা খাবার পেল না, এক ফোঁটা জলও পেল না সে।

তিনদিন পরেই সে-শহরে তুষার পড়া শুরু হল, ওঃ কী ভয়ংকর রকম তুষার পড়ল সেবার। তুষারের চাদরে চারিদিক ঢাকা পড়ে গেল। হাড়-হিমে হাত-পা জমে যেতে লাগল। শাল-দোশালা গায়ে জমিদারবাবু ভাবলেন, ছোঁড়াটা বোধহয় টেঁসে গেছে। না খাওয়ার ধাক্কা যদি-বা সামলাতে পারে—এই হাড় হিম করা ঠান্ডা সামলাবে কী করে? স্যাঁতসেঁতে ভিজে অন্ধকার মেঝেয় শুধু পাতলা সুতোর জামায় এই ঠান্ডায় নিশ্চয় অক্কা পেয়েছে ওটা। যাক, দেখে আসা যাক, ভেবে তিনি গোয়ালের দিকে পা বাড়ালেন।

গোয়ালের কাছে পৌঁছে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। গোয়ালে আলোর রোশনি, বাতাসে খাবারের সুগন্ধ ভেসে আসছে। ভাঙা দেয়ালে চোখ রেখে দেখেন কী—সেখানে মস্ত এক উনুন জ্বলছে, চারিদিকে বেশ গরম। ঘরের মাঝখানে রয়েছে বাহারি জাপানি লণ্ঠন। তার আলো ঠিকরোচ্ছে আর লিয়াং পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে নানা রকমের কেক খাচ্ছে। অমন কেক জমিদারবাবুই কখনো খাননি। সেই খাবারের সুগন্ধ বাতাসে ভাসছে।

জমিদারবাবু চমকে উঠলেন, কোত্থেকে এই উনুন এল? আর এমনধারা কেক? নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁর। ঠিক তখনই মনে পড়ল লিয়াং-এর জাদু-তুলির কথা। তা হলে—তা হলে ও সত্যিই এসব এঁকে জোগাড় করেছে? একথা মনে হতেই রাগে

তাঁর সারা শরীর জ্বলে উঠল। তিনি সাগরেদদের হুকুম দিলেন, এবারে ছোঁড়াটাকে ধরে একেবারে মেরে ফেল।

যতক্ষণে সাগরেদরা এসে হাজির হল ততক্ষণে লিয়াং সেখান থেকে সটকে পড়েছে। কোথায়? কোথায়? গোয়ালঘরের দরজায় তো তালাবন্ধ। তা হলে?

তারা খুঁজে দেখে ঘরের মাঝখানে একটা আঁকা সিঁড়ি ঝুলছে। তা হলে এই সিঁড়ি বেয়েই লিয়াং পালিয়েছে? ওরাও চটপট সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। আর তিন ধাপ উঠতে-না-উঠতেই কুমড়োর মতো গড়িয়ে পড়ল নীচে। উঠে দেখে সিঁড়িখানা উধাও, কেউ যেন যত্ন করে তা মুছে দিয়েছে।

জমিদারের ফাটক থেকে বেরিয়ে এসে লিয়াং বুঝল যে, এ গাঁয়ে সে আর নিরাপদ নয়। যে বন্ধু তাকে আশ্রয় দেবে তাকেই ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে। জমিদার তাকে ছাড়বেন না। তাই সে ঠিক করল—দূরে কোথাও চলে যাবে সে, কোনো অচেনা দেশে। মনে মনে ঠিক করেই



সে বন্ধুদের বাড়ির দিকে হাত নেড়ে নেড়ে বলল, বিদায়, বিদায়।

তারপর এক আরবি ঘোড়া এঁকে তার পরে চড়ে দুরন্ত বেগে ঘোড়া ছোটাল। বাঁধা সড়ক ধরে ঘোড়া ছুটল টগবগ.....টগবগ.....

রাতের আঁধার কেটে আকাশে একটা ভোরের আলো ফুটছে, লিয়াং তখনও গাঁয়ের সীমা পেরোয়নি, এমনি সময়ে সে শুনতে পেল পিছনে কীসের যেন হইহল্লা উঠেছে। সেদিক পানে চেয়ে তার মাথায় হাত। আরে, জমিদারবাবু তার দলবল নিয়ে তাকে ধাওয়া করেছে। জমিদারের হাতে খোলা তরোয়াল—মশালের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। একবার ধরতে পারলেই তার মুন্ডুখানা ঘচাং ফু হয়ে যাবে।

ভয়ে লিয়াং জোরে ঘোড়া ছোটাল। কিন্তু আরো জোরকদমে দৌড়োচ্ছে জমিদারের ঘোড়া—তাকে ধরে ফেলে আর কী। এবারে লিয়াং তার জাদু-তুলিখানা বের করে একটা ধনুক আঁকল, আর তির। ধনুকের জ্যা টেনে তিরখানা তার মাঝখানে বসিয়ে ছেড়ে দিল। অমনি তির ছুটল সোজা জমিদারের দিকে। তিরের ঘায়ে জমিদার ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়লেন মাটিতে। সবাই যখন জমিদারবাবুকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর সেই ফাঁকে ঘোড়া হাঁকিয়ে লিয়াং পিঠটান দিল।

ঘোড়া ছুটতে লাগল। দিন পেরিয়ে রাত এল, রাত পেরিয়ে দিন। না থেমে ঘোড়া ছুটে চলল টগবগ টগবগ। কদিন পরে সে এসে হাজির হল এক নগরে। বেশ ভালো লেগে গেল জায়গাটা। ঠিক করল এখানেই থেকে যাবে সে। তাদের গাঁ থেকে অনেক দূরে নগর— এখানে কেউ চেনে না তাকে...... কোনো ভয় নেই আর। সেই নগরেই থেকে গেল সে।

এখন কিছু করার নেই তার। তাই সে বাজারে বসে ছবি আঁকে, আর তা সেখানে বসে বেচে। এভাবেই দিন কাটে। খুশিতে, আনন্দে। তবে এখন সে ভারী হুঁশিয়ার—জাদু-তুলির পরিচয় সে আর কিছুতেই কাউকে জানতে দেবে না। তাই সে কোনো ছবি পুরো আঁকে না। পাখি আঁকলে তার ঠোঁট বাকি রাখে। জানোয়ারের ছবিতে হয়তো একখানা পা বাদ রাখে সে। কারণ সে জানে ছবিটা পুরো আঁকা হলেই সেটা জীবন্ত হয়ে উঠবে, তা হলে লিয়াং-এর পরিচয় আর গোপন থাকবে না।

তা, একদিন হয়েছে কী—লিয়াং একটা সারসের ছবি এঁকেছিল, তার চোখ আঁকেনি। এক পা তুলে সারসটা দাঁড়িয়ে আছে। একটা মাছি নাকের কাছে উড়ছিল লিয়াংয়ের। তাকে তাড়াতে গিয়ে যেই সে হাতটা নেড়েছে ওমনি হাতের তুলি থেকে ক'ফোঁটা রং ছিটকে পড়েছে সারসের চোখে। চোখ আঁকা হতেই ডানা মেলে সারস সবার মাথার ওপর দিয়ে আকাশে উড়ে গেল। নগরের মধ্যিখানে এমন আজব কাণ্ড! সব্বাই অবাক। এমন আজব কথা শোনাতে কেউ কেউ রাজবাড়ি ছুটল। আর তা শুনে রাজামশাই তাজ্জব বনে গেলেন। তখুনি তিনি পেয়াদাকে হুকুম দিলেন লিয়াংকে রাজসভায় হাজির করতে। পেয়াদা এল। এমনটা যে হবে তা জানত লিয়াং। কিন্তু যাবার ইচ্ছে তার একদম ছিল না। তবু যেতে হল তাকে। রাজামশাই ছিলেন ভারী অত্যাচারী, প্রজাদের পীড়ন করতেন খুব। এসব কথা

লিয়াং শুনেছিল, তাই সে রাজাকে ঘৃণা করত। বদলোকের সাধ পূরণ করতে চায় না লিয়াং। তবু তাকে যেতে হল।

পেয়াদা তাকে সোজা রাজদরবারে এনে হাজির করল। রাজামশাই তড়বড় করে সিংহাসন ছেড়ে নীচে নেমে এলেন।

হ্যাঁরে, তোর ছবি নাকি সব জ্যান্ত হয়ে যায়। তা একটা ফিনিক্সের ছবি আঁক দিকি। বুঝি, তোর মুরোদ কত?

লিয়াং মনে মনে ঠিকই করেছিল, এমন লোভী লোকের কথা সে শুনবে না, কিছুতেই না। তাই রাজার হুকুমকে কলা দেখিয়ে সে ফিনিক্স পাখি না এঁকে আঁকল এক দাঁড়কাক। সে কাক চারিদিকে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে নোংরা ছড়াতে লাগল। সারা প্রাসাদ নোংরায় ভরে গেল, দুর্গন্ধে তিষ্ঠনো দায়। রাজামশাই রেগে টং। পেয়াদাদের হুকুম দিলেন, এখুনি ওর জাদু-তুলি কেড়ে নে, আর ওকে ফাটকে পুরে রাখ।

পেয়াদারা ছুটে এসে তার জাদু-তুলিখানা কেড়ে নিল আর ওকে ফাটকে বন্দি করল। তুলিখানা এবার এল রাজামশাইয়ের হাতে।

এখন তুলি দিয়ে কী করেন রাজামশাই? তিনি এক পাহাড় আঁকলেন, সোনার পাহাড়। তারপরে দেখে ভাবলেন, একখানা পাহাড় বড়ো কম হয়ে গেল। তিনি আরেকখানা আঁকলেন। তারপরে আরেকখানা, তারপর আরেকখানা..... এমনি করে অনেকগুলো পাহাড় হল। সোনার পাথরে, আলো পড়ে ঝলমল করে উঠতে লাগল। আঁকা শেষ হলে খুশি হয়ে তিনি তুলি মুছে যেই আরাম করে বসলেন, অমনি কী হল বলো তো? ঠিক তখনই সব পাহাড়ের সোনা বদলে হল পাথরের স্তূপ। পাহাড়ের মাথার দিকটা ভারী ছিল বলে তা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। পড়ল একেবারে রাজামশায়ের পায়ের ওপরে।

এমন জবর সাজা পেয়েও রাজার কিন্তু শিক্ষা হল না। তিনি পাহাড় বোঝাই সোনা যখন পেলেন না, তখন আঁকলেন সোনার ইট। ইটখানা এঁকে তুষ্ট হলেন না, মাপে বড়ো ছোটো হয়েছে সেটা। তা মুছে আরো বড়ো একটা ইট আঁকলেন, পরে তা মুছে আরো বড়ো ইট আঁকলেন। তা মুছে আরো বড়ো, আরো বড়ো, আরো বড়ো প্রকাণ্ড এক ইট আঁকলেন। আঁকা শেষ হলে খুশি হয়ে তিনি তুলি মুছে যেই আরাম করে বসলেন, অমনি কী হল বলো তো? ঠিক তখনই সমস্ত ইটখানা হয়ে গেল বিশাল এক অজগর। সে মস্ত হাঁ করে গিলে খাবে বলে রাজামশাইয়ের দিকে ধেয়ে এল। তা দেখে রাজামশাই ভয়ে মূর্চ্ছা গেলেন।

জাদু-তুলির ছবি এঁকে তিনি যখন বারেবারেই নাকাল হচ্ছেন, তখন কী আর করেন, নানা মিষ্টি কথায় লিয়াংকে তুষ্ট করতে চাইলেন। বললেন, এই নাও তোমার তুলি। তুমি একজন শিল্পী—ছবি তো তুমিই আঁকবে। আমি তোমায় অনেক ধন-দৌলত দেব, রাজকুমারীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। তুমি এ রাজ্যে মহাসুখে থাকবে।

লিয়াং তখন মনে-মনে এক ফন্দি এঁটে ফেলেছে। সে রাজামশাইয়ের সকল কথায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

তুলি ফেরত দিয়ে তিনি বললেন, তুমি একটা পাহাড় আঁকো; না থাক—বলতে বলতে কথা ফিরিয়ে নিলেন তিনি। ভরসা নেই, কে না জানে পাহাড়ে জঙ্গল থাকে, জঙ্গলে জানোয়ার থাকে....অজগরও থাকে।—পাহাড় দরকার নেই তুমি বরং একখানা গাছ আঁকো—সোনার গাছ।

আগেই বলেছি, লিয়াং তো মনে মনে এক ফন্দি এঁটে রেখেছে। সে জাদু-তুলির দুই টানে এক সমুদ্দুর এঁকে ফেলল। সমুদ্দুরের নীল ঢেউ আছড়ে পড়ল তার আর রাজামশাইয়ের মাঝখানে।

না, না সমুদ্রের নয়। আমি তো তোমায় সোনার গাছ আঁকতে বললাম,—রাজামশাই সমুদ্রের অপর পাড় থেকে চিৎকার করে উঠলেন।

সে-কথায় কান না দিয়ে লিয়াং সমুদ্রের মাঝে একটা দ্বীপ আঁকল। চারপাশে ছড়ানো জমির মধ্যিখানে আঁকল একটি গাছ। লম্বা, ভীষণ লম্বা। আকাশে তার মাথা ঠেকেছে। আঁকা শেষ হলে সে বলল, এ গাছ-ই আপনি চেয়েছিলেন রাজামশাই?

রাজামশাই দেখলেন, বাঃ কী আশ্চর্য গাছ! সোনার ডালে হিরের ফুল দুলছে। স্ফটিকের গোলার মতো ফল। এমন গাছ আছে নাকি কোথাও?

তিনি অধীর হয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক এমনি গাছই আমি চেয়েছিলাম। ঠিক এমনি গাছই আমি চেয়েছিলাম। এবারে একটা নৌকো আঁকো, মস্ত নৌকো—আমরা সবাই ওই দ্বীপে যাব। এখুনি যাব। জলদি, জলদি—

রাজামশাইয়ের তাড়া দেখে লিয়াং নৌকো আঁকতে শুরু করল। এক প্রকাণ্ড ময়ূরপঙ্খি। চৌদ্দজন দাঁড়ি দাঁড়ে বসল। রাজামশাই, রানি, রাজকন্যে, পাত্র-মিত্র সকলকে নিয়ে নৌকোয় উঠলেন। নৌকো কূল ছাড়ল। তরতর করে পৌঁছে গেল মাঝ দরিয়ায়। ঠিক তখনি জাদু-তুলির দুই টানে এক মস্ত মেঘের টুকরো আঁকল লিয়াং। মুহূর্তে মেঘ বড়ো হয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলল। প্রবল ঝড়ে নৌকো উঠল দুলে। লিয়াং জাদু-তুলিতে আরো দু'টান দিল। বৃষ্টি শুরু হল। প্রবল ঝড়-তুফান সঙ্গে ধারাপতন। মোচার খোলার মতো নৌকো দুলতে লাগল ঢেউয়ের মাথায় মাথায়। কখনো জল ছাপিয়ে উঠল ময়ূরপঙ্খির ভিতরে।

রাজামশাই চিৎকার করে উঠলেন, ঝড় থামাও লিয়াং, ঝড় থামাও।

লিয়াং-এর তুলি আরো দু'টান দিল। প্রবল হল বাদল-তুফান। ঢেউ-এর আঘাতে শেষে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল নৌকো আর দলবল নিয়ে রাজামশাই পড়লেন অথৈ জলে। তারপরে ডুবতে ডুবতে একসময়ে টুপুস করে ডুবে গেলেন। তার ডাক লিয়াং-এর কানে পৌঁছোল না।

ছবি। প্রণবেশ মাইতি



পলাশবরন পাল

রাজার প্রিয় ঘোড়ার বয়স হয়েছে, রাজা তাই নতুন একজন লোক রাখলেন তার পরিচর্যার জন্য। হবি তো হ, বুড়ো ঘোড়াটা অক্কা পেল তার কয়েকদিনের মধ্যেই। ভয়ানক চটে গেলেন রাজা। নির্ঘাৎ সহিসটারই গাফিলতি! হুকুম দিলেন,—মৃত্যুদণ্ড।

এ শুধু লঘু পাপে গুরু দণ্ড নয়, তার চেয়েও বেশি। সহিসটার আদৌ দোষ আছে কি না তারই ঠিক নেই, এ দিকে শাস্তি হল এত মারাত্মক। কিন্তু রাজার খেয়াল, কে বোঝাবে তাঁকে?

রাজার সভাসদ ছিলেন ইয়েন ৎসু। দাঁড়িয়ে বললেন, 'মহারাজ, কেবল যদি মেরেই ফেলেন তবে তো লোকটা নিজের দোষটাও ভালোমতো বুঝতে পারবে না। অনুমতি দেন তো ওকে বুঝিয়ে বলি, ওর দোষটা কী। অন্যরাও শুনুক, জানুক বুঝুক। মারতে হয় তার পরে মারবেন।'

'ভালো কথা', বললেন রাজা।

ইয়েন ৎসু বলতে শুরু করলেন, 'দ্যাখো হে বাপু, দোষ তোমার এক-আধটা নয়, তিন

তিনটে। তোমার ওপরে ঘোড়াটা দেখাশোনার ভার ছিল, সে কর্তব্যে তুমি অবহেলা করেছ। আমি নিজে অবশ্য ঘোড়ার ব্যাপারে কিছুই বুঝি না, কিন্তু নিশ্চয়ই অবহেলা করেছ তুমি, নইলে ঘোড়াটা মরলই বা কেন, আর রাজামশাই তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেনই বা কেন? এটা তোমার পয়লা নম্বর দোষ, তা মানতেই হবে। তারপর দ্যাখো, আমাদের রাজার মনে তুমি দুঃখ দিয়েছ। রাজা আমাদের সবার প্রিয়, সবার প্রভু। রাজাকে দুঃখ দেওয়া মানে আমাদের সবাইকেই দুঃখ দেওয়া। রাজ্যসুদ্ধ সবাইকে এমন একটা দুঃখের মধ্যে ফেলে দিলে, এ হল তোমার দু নম্বর দোষ। শুধু এজন্যই তোমার গর্দান নেওয়া উচিত। কিন্তু এসব কথা যদি বাদও দিই, তুমি তিন নম্বর এমন একটা দোষ করেছ, তার কোনো ক্ষমা নেই। দ্যাখো, তুমি এমন একটা কাণ্ড বাধালে যে সামান্য একটা ঘোড়ার মৃত্যুর জন্য রাজাকে একজন জলজ্যান্ত মানুষের প্রাণদণ্ড ঘোষণা করতে হল। রাজ্যের লোকে যখন এ কথা জানবে, তারা রাজাকে ঘেন্না করবে। আশেপাশের রাজ্যের লোক যখন জানবে, তারা আমাদের রাজ্যের নিন্দে করবে। কাজেই দ্যাখো, তুমি একটা ঘোড়ার মৃত্যুর জন্য বিশ্বসুদ্ধ সবার কাছে আমাদের মাথা হেঁট করে দিলে, আমাদের রাজার মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিলে। ছি ছি।'

রাজা বললেন, 'ওকে ছেড়ে দাও।'



ছবি। প্রণবেশ মাইতি



দক্ষিণারঞ্জন বসু

অনেক, অনেককাল আগের কথা।

তখন চিনে তাঙবংশীয় রাজত্ব চলছে। সেই বংশেরই এক অপরূপা সুন্দরী রাজকুমারী ওয়েন চেঙ।

ওয়েন চেঙ-এর রূপ-লাবণ্য এবং বুদ্ধিমত্তার প্রশংসায় যখন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নানা দেশের রাজধানী শহরগুলো সব মুখরিত, ঠিক সেই সময় হঠাৎ একদিন ঘোষিত হল রাজকুমারীর বিয়ের উদ্যোগের খবর। আর অমনি দেশ-দেশান্তর থেকে সব রাজদূতরা আসতে আরম্ভ করল বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

তিব্বতের রাজকুমার সুনচেন কুম্পো সম্রাট-দুহিতা ওয়েন চেঙকে কোনোদিন চোখে দেখেননি, কিন্তু স্বপ্নে দেখেছেন। ওয়েন চেঙ-এর গুণাবলির কথা শুনে তিনি অনেকদিন থেকেই মুগ্ধ এবং মনে মনে তাকেই তিনি রানিত্বে বরণ করে রেখেছেন। তিব্বতের চতুরতম ব্যক্তি এবং অতিশয় সূক্ষ্মবুদ্ধি-দূত লুতুঙৎসেনকে তাই তিনি সপত্র পাঠিয়ে দিলেন সম্রাটের কাছে। কিন্তু তিনি এসে দেখেন তাঁরই মতো আরো ছয় রাজ্যের ছয়জন দূত সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত। একই সরকারি ভবনে সাতজন রাজদূতের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রত্যেক

দূতই মনে মনে ভাবলেন, এ ব্যবস্থা ভালোই—কারণ, প্রভুর মনস্তুষ্টি বিধান করা কার পক্ষে সম্ভব হবে কেউ বলতে পারে না, তবে এই সুযোগে তাঁদের নিজেদের আলাপ-পরিচয়টা তো বেশ নিবিড় হয়ে উঠবে, তাঁদের পক্ষে এই লাভ।

তিব্বতের রাজকুমারের হাতে মেয়ে তুলে দিতে তাঙ-সম্রাট কিন্তু প্রথম থেকেই অনিচ্ছুক। অত দূরদেশে মেয়ের বিয়ে হলে তাকে যখন-তখন দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে না, এজন্যেই তাঁর এই অনিচ্ছা। কিন্তু পাত্র হিসেবে যে তিব্বতের রাজকুমার সর্ববিষয়ে উপযুক্ত, সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় মনের দ্বন্দ্বকে কাটিয়ে ওঠা এক কঠিন ব্যাপার। সম্রাট তাই পারিষদবর্গের এক সভা ডাকলেন। স্থির হল, নানারকম প্রশ্ন তুলে যত রকম বাধা সৃষ্টি করা সম্ভব, তাই করা হবে। তিব্বতের রাজদূত সেসব প্রশ্নের মীমাংসায় যদি অপারগ হন, তখন তাঁকে সসম্মানে বিদায় দিতে বিবেকের কোনো বাধা বোধ করতে হবে না। আসলে ঘটবেও তাই, সকলেরই এই ধারণা।

সিদ্ধান্তমতো পরের দিন সম্রাটের লোকজনরা পাঁচশত ঘোটকী এবং পাঁচশত অশ্বশাবক নিয়ে এল রাজধানীতে। রাজপ্রাসাদের অদূরে এক বিরাট প্রান্তরে তাদের নিয়ে হাজির করা হল। সমাগত রাজদূতদের সঙ্গে করে স্বয়ং সম্রাট সেখানে উপস্থিত। পারিষদবর্গ তো আছেনই, দর্শক সমাগমও হয়েছে প্রচুর।

সম্রাট এক ঘোষণায় বললেন, "যে সাতটি রাজ্যের রাজকুমারেরা আমার কন্যার পাণি-পীড়নের জন্য দূত পাঠিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই আমার সাম্রাজ্য ও সিংহাসনের এক-একটি শক্তি-স্তম্ভ। কিন্তু আমার দুঃখ এই, আমি সাতকন্যার পিতা নই যে সাত রাজকুমারকেই একটি করে কন্যা দান করে ধন্য হব। আমার একটি মাত্র কন্যা, আমি তাই বুঝে উঠতে পারছি না কার হাতে আমি তাকে সঁপে দেব। কারো প্রতিই যাতে কোনোরূপ অবিচার করা না হয়, সেজন্যে এখানে একধরনের লটারির আয়োজন করেছি। পাঁচশত অশ্বশাবক এবং তাদের মাতাদের এই মাঠে এনে পৃথকভাবে রাখা হয়েছে। যাঁর দূত প্রত্যেকটি শাবককে তার মায়ের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলিয়ে দিতে পারবেন তাঁর সঙ্গেই ওয়েন চেঙ-এর বিয়ের প্রস্তাব স্থির হবে।"

নিরপেক্ষ সুবিচারের এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক দূতই খুশি হলেন। তিব্বতের দূত অপর ছয়জনকে আগে সুযোগ দিয়ে নিজে সবার শেষে এগিয়ে এলেন পাঁচশত ঘোটকীর সঙ্গে তাদের নিজ নিজ শাবককে মিলিয়ে দেবার শক্ত কাজে।

কিন্তু তিব্বতিদের কাছে এ কাজ মোটেই শক্ত নয়। ঘোড়া-গাধা নিয়ে ওদের রাত-দিন কারবার। অন্য ছয়জন দূতের প্রত্যেকেই যেখানে মা আর বাচ্চা ঘোড়াদের মিলিয়ে দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে এক অভিনব পদ্ধতি প্রয়োগ করে লুতুঙৎসেন অনায়াসেই সফল হলেন। আর সবার মতো তিনি অশ্বশাবকদের নিয়ে টানাটানি করলেন না, জোর করে মেলাতে গেলেন না ওদের মায়েদের সঙ্গে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—

মিলতে ওদের দেরি নাই,
খানা-দানা প্রচুর চাই।

সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাটের আদেশে প্রচুর ঘোড়ার খাদ্য এনে মাঠের মাঝখানে স্তূপ করে রেখে জমানো হল।

তারপরে ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিতেই ওরা এসে পরমানন্দে খানাপিনা শেষ করে ওদের নিজ নিজ বাচ্চাদের তল্লাস শুরু করে দিলে। তিব্বতের দূতের ইচ্ছানুসারে তখনই অশ্বশাবকদের ছেড়ে দেওয়া হল আর ওরা অমনি ছুটতে ছুটতে এসে যে যার মায়ের দুধ খেতে আরম্ভ করল।

এই দেখে সম্রাট বহুৎ তারিফ করলেন তিব্বতি-দূতের সূক্ষ্মবুদ্ধির। কিন্তু তিনি একথাও বললেন—তাঁর ন্যায় বিচারে এবং নিরপেক্ষতায় যাতে কোনো প্রশ্ন উঠতে না পারে, সেজন্য তিনি আরো কয়েকরকম লটারির অনুষ্ঠান করতে চান। তাঁর প্রস্তাবে সমাগত দূতরাও রাজি হলেন সবাই।

পরদিন সকালে দরবার-হলে বৈঠক বসল। সম্রাট বিশেষভাবে তৈরি একখানি বড়ো সবুজ পাথর সেখানে উপস্থিত করে জানালেন যে, ওই পাথরখানিতে অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য একটি ছিদ্র রয়েছে। যে রাজকুমারের দূত ওই ছিদ্রপথে সুতো নিয়ে আসতে পারবেন, সেই রাজকুমারই আমার কন্যার যোগ্য স্বামী বলে বিবেচিত হবেন।

দরবার-হলের মাঝখানে পাথরটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। এক এক করে ছয়জন দূতই প্রাণপণ চেষ্টা করলেন পাথরের বুকে ছিদ্রটি খুঁজে বার করতে। ছয়জনই পর পর ব্যর্থ হলেন এবং প্রত্যেকেই এ-রূপ মন্তব্য করলেন যে, এ ছিদ্রের সন্ধান পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না।

সবার শেষে তিব্বতি দূত উঠে দাঁড়ালেন। এতক্ষণ ধরে গভীর ভাবনায় তিনি ডুবে-ছিলেন। দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—

একটি খুদে পিঁপড়ে চাই,
আর খানিকটা মধু;
ওয়েন চেঙকে হতেই হবে
তিব্বত-রাজের বধূ।

লুতুঙৎসেনের এ কথা তাঙ-সম্রাটের বিশেষ মনঃপূত না-হলেও তাঁকে চুপ করেই থাকতে হয়। তবু তাঁর আশা, একটা-না-একটা পরীক্ষায় তিব্বতি-দূতকে ব্যর্থ করতে পারলেই কন্যাকে তিব্বত-রাজকুমারের হাতে অর্পণের দায় থেকে তাঁর নিষ্কৃতি।

পিঁপড়ে আর মধু নিয়ে আসা হলে তিব্বতি দূত এমন সব ব্যাপার আরম্ভ করে দিলেন যা দেখে সবাই অবাক। তিনি প্রথমেই পিঁপড়েটার পায়ে একটি খুব সরু সুতো বেঁধে দিলেন। তারপরে সবুজ পাথর-টুকরোর এক পিঠের একাংশে বেশ খানিকটা মধু মাখিয়ে দিলেন। আর উল্টো পিঠে সুতো-বাঁধা পিঁপড়েটাকে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে থাকলেন।

সমগ্র রাজসভা একেবারে থম্‌থমে। সকলেরই চিন্তা কী ঘটে—কী হয়। হঠাৎ দেখা গেল মধুর গন্ধে পিঁপড়েটা সেই সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়েই গলে গিয়ে পাথরটার আর একদিকে হাজির হয়েছে।

তিব্বতি-দূতের বুদ্ধির প্রখরতায় মুগ্ধ হলেও সম্রাট আর একটি পরীক্ষার আয়োজনের নির্দেশ দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। তাঁরই হুকুমে বিরাট এক গাছের গুঁড়ির একটি অংশকে এনে হাজির করা হল দরবার-হলে। গুঁড়ির এই অংশটিকে এমনভাবে পালিশ করা হয়েছে এবং তার দুটি দিককে এমনভাবে কেটে তৈরি করা হয়েছে যে, দেখে ঠিকমতো বলা সত্যি খুব কঠিন, কোনটা উপরের দিক আর কোনটা নীচের দিক। আগত দূতদের মধ্যে কে তা বলতে পারেন—তাই সম্রাট দেখতে চান তাঁর কন্যার স্বামী নির্ধারণের পূর্বে।

অন্যান্যবারের মতো এবারও আবার ছয়জন সঙ্গীর ব্যর্থতার পর তিব্বতি-দূত এগিয়ে এসে বললেন—

এ এমন কী কঠিন ব্যাপার, কীসের তোলপাড় ?
ফেললে জলে ডুববে গোড়া যেদিক বেশি ভার।
পাহাড় দেশের পাহাড়িয়া এসব আমার জানা,
ওই পরিখায় পরীক্ষা হোক, নেই তো কোনো মানা?

না না, এতে আবার মানা কীসের। লুতুঙৎসেনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ধরাধরি করে গাছের গুঁড়িটাকে নিয়ে প্রাসাদ-বেষ্টনী পরিখার জলে ফেলে দেওয়া হল এবং মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল গুঁড়ির যেদিকটা বেশি ভারী সে দিকটাই আগে ডুবে গেল এবং সেদিকটাই গোড়া।

এ পরীক্ষাতেও তিব্বতি-দূতের সাফল্যে এবং তাঁর অপূর্ব দক্ষতায় গভীর আনন্দ পেলেন তাঙ-সম্রাট। কিন্তু তবু তিনি মনস্থির করতে পারছেন না কী করে তাঁর অত আদরের মেয়েকে দূর-দেশ তিব্বতে বিয়ে দেবেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন আর একবার তিনি এ বিষয়ে তাঁর পারিষদবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং তাঁদের পরামর্শমতোই যা হয় সিদ্ধান্ত করবেন।

সে রাত্রিতেই মন্ত্রীদের ডাকা হল। তাঁরা অনেক আলাপ-আলোচনার পর একটি পরিকল্পনা স্থির করে সম্রাটকে গিয়ে বললেন, "মহামহিম, আপনার আদেশে সারা দেশ থেকে খুঁজে খুঁজে তিনশো এমন সুন্দরী তরুণী সংগ্রহ করে আনা হোক যারা দেখতে অনেকটা সম্রাট-নন্দিনীর মতো। অবিকল সম্রাট-কন্যার মতো পোশাক পরিয়েই তাদের দরবার-হলে হাজির করতে হবে। রাজকুমারী ওয়েন চেঙও ওদেরই সঙ্গে মিলেমিশে থাকবেন একই পোশাকে। যে দেশের দূত তাদের মধ্য থেকে সম্রাট-দুহিতা ওয়েন চেঙকে খুঁজে বার করতে পারবেন, সে-দেশের রাজকুমারের হাতেই কন্যা সমর্পণ করা হবে—এ প্রতিশ্রুতি আপনি দিতে পারেন। কারণ, এ পরীক্ষায় সাতজন দূতের একজনও উত্তীর্ণ হতে পারবেন—এমন কোনো ভরসাই নেই। কাজেই রাজকুমারী আপনারই সঙ্গে থাকবেন—এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

পরদিন সকালে আবার দরবার বসল দরবার-হলে। সম্রাট তাঁর মন্ত্রীদের প্রস্তাবে খুবই আশ্বস্ত। সেই আনন্দেই তিনি নির্ভয়ে ঘোষণা করলেন, "সমাগত দূতগণের সম্মানে এবারের পরীক্ষাই হবে শেষ পরীক্ষা। এখানে সমুপস্থিত তিনশত চিনা-সুন্দরীর মধ্যে থেকে যে দূত খুঁজে বার করতে পারবেন রাজকুমারীকে, তিনি তাঁর প্রভুর কাছে তাকে নিয়ে যেতে পারবেন।"

সবাই সচকিত সম্রাটের এই ঘোষণায়। সত্যি এ এক কঠিন পরীক্ষা। পরীক্ষার্থী সাতজনের কেউ কখনো দেখেননি রাজকুমারীকে। তিনশো তরুণীর মধ্যে তিনি লুকিয়ে আছেন। কী করে তাদের মধ্যে থেকে আন্দাজে ঠিক করা সম্ভব কোন জন ওয়েন চেঙ?

তবু তো একবার অন্তত চেষ্টা করে দেখতে হবে। তাই আগের মতোই পর পর ছয়জন দূত এগিয়ে এসে চেষ্টা করলেন ওয়েন চেঙকে খুঁজে বার করতে, কিন্তু প্রত্যেকেই ব্যর্থ হলেন। সব শেষে তিব্বতি-দূতের পালা। তিনি একদিন সময় চাইলেন সম্রাটের কাছে এই অসাধ্য-সাধনের জন্য।

শক্ত বটে অসাধ্য নয় সময় প্রয়োজন,
একটি মাত্র দিন যাচ্ঞা, রইল আমার পণ।

তিব্বতী-দূতের প্রতিজ্ঞায় হকচকিয়ে ওঠেন সম্রাট। তবু তিনি একটি দিনের সময় মঞ্জুর করেন তাঁকে। সে সময় পেয়ে তাঁর কী আনন্দ!

কার কাছ থেকে রাজকুমারীর চেহারা সম্বন্ধে এবং তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু জানা যেতে পারে—তাই হল তিব্বতি-দূতের প্রধান চিন্তা। অন্যান্য দূতরা, যাকে সবচেয়ে সুন্দরী মনে হয়েছে, তাকেই সম্রাট-নন্দিনী ধরে নিয়ে ওয়েন চেঙ বলে নির্দেশ করেছে। কিন্তু সম্রাটের মেয়ে হলেই তাঁকে সবচেয়ে সুন্দরী হতে হবে—তার কী মানে হতে পারে!

সেই সকাল থেকে লুতুঙৎসেন সম্রাটসদনের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং প্রাসাদের সিংহ-দরজা ও অন্যান্য গেট দিয়ে যে-ই যখন বেরিয়ে আসছে, তাকেই গিয়ে ধরে রাজকুমারী সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করছেন। প্রথমেই তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এক রাজকর্মচারীর সঙ্গে। দূতমহাশয়ের কথা শুনে সে বেচারা শুধু একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে দ্রুত সরে পড়ে সেখান থেকে। গর্দান যাবে যদি ঘুণাক্ষরেও একথা কোনোরকমে প্রকাশ হয়ে পড়ে, এটুকু বলে সে যেন আর পালাবার পথ পায় না এই অকথা। তারপরে এক এক করে তাঁর সঙ্গে দেখা হল এক গাড়োয়ানের, এক সবজিওয়ালার এবং এক পোশাকবিক্রেতার। কিন্তু একই রকম কথা শুনতে হল তাদের প্রত্যেকের মুখে, তারা কেউ কখনো দেখেনি রাজকুমারীকে—তারা কেউ জানে না রাজকুমারী দেখতে কেমন।

শেষ পর্যন্ত প্রাসাদপুরীর ধোপানির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তিব্বতি-দূতের। এই ধোপানির কাছ থেকেই সব কিছু জানা যাবে,—এ বিষয়ে তিনি এবার নিশ্চিন্ত। কিন্তু তার মুখ থেকেও আসল কথা কিছু বার করা যে খুবই কঠিন ব্যাপার, প্রথম আলাপেই তিনি তা বুঝতে পারলেন। তা হলেও তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন না—গল্প করতে করতে তার সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে চললেন। কথা প্রসঙ্গে ধোপানি যখন বললে যে, রাজকুমারী সম্বন্ধে বাইরের কোনো

লোকের কাছে কিছু বলা নিষেধ, তিব্বতি-দূত সেকথা শুনে প্রথমটায় একটু নিরাশ হয়ে পড়লেও হঠাৎ একটা ফন্দি তাঁর মাথায় এল। তাই ধোপানিকে একটু অভয় দিয়েই তিনি জানালেন :

কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই
ফন্দি এঁটেছি মনে,
কোনোরকমেই জানিবে না কেউ
বিনে এই দুই জনে।

এই ফাঁকা কথায় ধোপানি কোনো ভরসা পায় না। সে পরিষ্কার ভাষায় তিব্বতি-দূতকে জানিয়ে দেয় যে, সম্রাটের এমন একজন গণক রয়েছেন যিনি গুনে-বেছে সমস্ত গোপন কথা ফাঁস করে দেন। কোনো বিষয়ে সম্রাটের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে তিনিই তাঁকে সত্য ধরিয়ে দেন।

লুতুঙৎসেন তবু নাছোড়বান্দা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি কতকগুলো জিনিস সংগ্রহ করে ফেললেন। তিন খণ্ড সাদা পাথরের ওপর একটা লোহার গামলা চড়িয়ে সেটা জলভর্তি করে নিলেন। তারপর সেই জলভর্তি গামলাটার ওপর বসিয়ে দিলেন একটা মস্তবড়ো কাঠের টুল এবং তাতে বুড়িকে উঠিয়ে দিয়ে রূপোয় মুখ বাঁধানো পিতলের একটা প্রকাণ্ড চোঙা তার হাতে এনে তুলে দিলেন। ধোপানিকে এতক্ষণে বাগে আনা গেছে—এটা বুঝতে পেরেই তিব্বতি-দূত তখন বললেন :

শুনছ খুড়ি,
তুমি কিছুই বলছ না;
সত্যি এ নয় বঞ্চনা।
গণক গুনে বলবে কি?
বলতেই হবে সত্যটি।
চোঙার নামে পড়বে দোষ,
পড়ুক না তার রাজার রোষ।
তিন পর্বত সে অনেক দূর,
লোহায় ঘেরা তায় সমুদ্দুর;
তার মধ্যে এক কাঠ-পাহাড়,
দোষী যে সেথা বাস তাহার।
পিতলমুখো রুপোর দাঁত,
তারই ভাগ্যে সব অভিসম্পাত।

এই বলে বুঝিয়ে-সুজিয়ে লুতুঙৎসেন বুড়িকে চোঙার ভেতর দিয়ে রাজকন্যার বর্ণনা দিতে রাজি করালেন। যাতে রাজকুমারীকে তিনশো মেয়ের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া যায়—তেমন কয়েকটি ইঙ্গিত দিলেই চলবে, সেই কথাই তিনি প্রকারান্তরে বলে দিলেন। তাঁর পীড়াপীড়িতে ধোপানি শেষ পর্যন্ত অতি সন্তর্পণে চোঙার মধ্যে দিয়ে তিনটি মাত্র সংক্ষিপ্ত নির্দেশ ঘোষণা

করল এবং তাতেই যে তাঁর কাজ হাসিল হয়ে যাবে তা বুঝতে পেরে দূতমশাই একেবারে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। সত্যিই তো রাজকুমারীকেই যে গোটা চিনদেশের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, তিনশো মেয়ের সারির দু'মাথার এক মাথাতেও রাজকুমারীকে দাঁড় করানো হয় না—তাঁকে রাখা.হয় মাঝামাঝি জায়গায়। এ ছাড়াও রাজকুমারীর একটি বিশেষ লক্ষণের যে-কথা বুড়ি প্রকাশ করেছে, বাস্তবিকই তা একেবারে মোক্ষম কথা। সম্রাট-নন্দিনী নাকি অল্প বয়স থেকেই এমন একটা মধু-গন্ধী আতর ব্যবহারে অভ্যস্ত, যার ফলে সবসময়ই কিছু মৌমাছি সবসময়ই তাঁকে ঘিরে থাকে। এ তিনটি তথ্য জেনে তিব্বতি-দূত ভারী খুশি! ধোপানিকে এই সাহায্যের জন্যে অসংখ্যবার ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে তিনি বিদায় নিলেন।

পরদিন সকালে শেষবারের মতো দরবার-হলে পুনরায় পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আয়োজন হল। তিনশো' চিনা-কুমারীর মধ্যে সম্রাট-তনয়াকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, এবার তাঁকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবেন তিব্বতি-দূত। তাঁর এ চেষ্টা সফল হলে তিব্বতের রাজকুমারের সঙ্গে সম্রাট-কন্যার বিয়ে হবে, তা না হলে এবারকারমতো বাপের কাছেই থেকে যাবেন ওয়েন চেঙ।



এ সত্যি এক আশ্চর্য ব্যাপার। ধোপানি ঠিকই বলেছে, ওই তো ঠিক মাঝখানের একটি মেয়ের চারদিকে কতগুলো মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। ওদিকে তিব্বতি-দূতের চোখ পড়তেই তিনি অবাক হয়ে যান এবং একেবারে স্থিরনিশ্চয় হবার জন্য কিছুক্ষণ ধরে সেদিকে চেয়ে থাকেন। তারপর আনন্দে হঠাৎ চিৎকার করে বলে ওঠেন—

ইনিই হবেন, ইনিই হবেন রাজকুমারী ওয়েন।
এবার তবে তাঙ-সম্রাট কন্যারে তাঁর দেন।
তিব্বতি প্রিন্স তৃপ্ত এবার তৃপ্তি আমার তায়,
কাঠ-খড় কম পুড়ল নাকো প্রশ্ন-মীমাংসায়।

এমন অসম্ভব কী করে সম্ভব হল তা ভেবেই পান না তাঙ সম্রাট। মন্ত্রীরাও একেবারে হতবাক। 'এই দূত কি তা হলে আমার মেয়েকে আগে কোনোরকম দেখবার সুযোগ পেয়েছে? অথবা কেউ তাকে কিছু বলেছে?' মনে এ রকম প্রশ্ন আসতেই সম্রাট তাঁর গণককে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু অনেক গুনে-বেছেও এ রহস্যের কোনো কূলকিনারাই করে উঠতে পারলেন না গণকমশাই। তিনি গুনে যা পেলেন তাতে আর যাই হোক কাউকে শাস্তি দেওয়া চলে না। কোথায় তিন পর্বতের মাঝখানে একটা সমুদ্র। সেই সমুদ্র আবার লোহা দিয়ে ঘেরা এবং তার ঠিক মধ্যখানে এক কাঠের পাহাড়, আর সেই পাহাড়ের ওপর থেকে একটা চোঙার ভেতর দিয়ে এমন কতগুলো কথা তিব্বতি-দূতের কানে এসেছে যার ফলে তিনি সহজেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পেরেছেন। এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলা সম্ভব হল না গণকের পক্ষে।

এ অবস্থায় আর কী করার থাকতে পারে তাঙ-সম্রাটের? তিব্বত-রাজকুমারের হাতেই তিনি কন্যাকে সমর্পণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন এবং তিব্বতি-দূতকে রাজকুমারী ওয়েন চেঙের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন।

রাজকুমারীর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালেন তিব্বতি-রাজদূত। তারপর সবিনয়ে বললেন—

কৃতজ্ঞতার নেইকো সীমা চিন সম্রাটের কাছে;
তাঁর কন্যা হবেন মোদের রানি,
এমন খবর আর কি কিছু আছে?
আপনি পরম দয়াবতী—
দু'টি কথা বলার যদি অনুমতি পাই,
এখনই তা এইখানেতে বলে যেতে চাই।

বেশ তো, বলুন। —হাসিমুখেই অনুমতি দেন রাজকুমারী। আর নির্ভয়ে মনের কথা প্রকাশের অনুমতি পেয়ে দূতমশাইও খুব খুশি। তাই নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচেই তিনি সব কথা খুলে বলেন—

আপনি যাবেন স্বামীগৃহে—
তার আগে এই প্রাসাদপুরে মহোৎসবের হবে আয়োজন।
তাতে যৌতুকের যে ছড়াছড়ি হবেই সে তো জানা,
কিন্তু সেসব নেবার আছে মানা।
সোনারুপো অঢেল মোদের কী আর প্রয়োজন।
তার চেয়ে ঢের সুখের হবে
পাই যদি বীজ কৃষির যন্ত্রপাতি,
আরো ভালো সঙ্গে তাহার মিলে যদি দক্ষ শ্রমিক
কর্মী কয়েকজন:
সম্ভব হলে নেবেন চেয়ে শ'কয় ঘোড়া-হাতি।

দুতের কথায় সম্মতি জানালেন সম্রাট-দুহিতা। কয়েকদিন ধরে তাঙ-সম্রাটের রাজধানীতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল ওয়েন চেঙের বিয়ের ব্যাপারে। কিন্তু তিব্বত-যাত্রার আগে কন্যার অনুরোধ শুনে সম্রাট তো একেবারে হতভম্ব। তা হলেও শেষ পর্যন্ত মেয়ের মন তাঁকে রাখতেই হয়। তাঁর চাহিদামতোই পাঁচশো ঘোড়ার পিঠে শস্য-বীজ বোঝাই করে এবং হাজার হাতির পিঠে কৃষির যতরকমের যন্ত্রপাতি চাপিয়ে দিয়ে সম্রাট তিব্বতের পথে রওনা করিয়ে দিলেন কন্যা-বিদায়ের মুহূর্তে। কয়েকশো সুদক্ষ কারিগরকেও তিনি ওয়েন চেঙের সঙ্গে তিব্বতে পাঠিয়ে দিলেন যৌতুক হিসেবে।

তারপর থেকেই নাকি তিব্বতের সুদিন শুরু। খাদ্যাভাবও আর কখনো দেখা দেয়নি। শিল্প-বাণিজ্যেও ঘটে চলেছে তার অগ্রগতি।

ছবি। শঙ্কর বসাক



দুই পড়শি

বিজয়া রায়

এক গ্রামে একজন মস্ত বড়োলোক আর একজন ভারী গরিবলোক পাশাপাশি বাড়িতে থাকত। বড়োলোকটির নাম সেরিঙ্গ; সে ছিল বেজায় অহংকারী আর কিপ্‌টে। গরিবলোকটির নাম ছিল চাম্বা, সে ভারী দয়ালু আর পরোপকারী।

একদিন একজোড়া চড়ুইপাখি চাম্বার সদর দরজার এক ফাটলে বাসা বেঁধে ডিম পাড়ল। সময়মতো ডিম ফুটে ছোট্ট ছোট্ট ছানা বের হল।

একদিন চড়ুইপাখিদুটি যখন ছানাগুলোর খাবারের সন্ধানে গেছে, তখন তাদের একটি বাচ্চা বাসা থেকে চাম্বার দরজার গোড়ায় পড়ে গিয়ে একটি পা ভেঙে ফেলল। কিছুক্ষণ বাদে চাম্বা বাড়ি ফিরে চড়ুই ছানাটিকে দেখতে পেল। এরকম অসহায় অবস্থায় তাকে পড়ে থাকতে দেখে তার ভারী মায়া হল। সে সাবধানে ছানাটিকে তুলে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে যত্নের সঙ্গে একটুকরো সুতো দিয়ে তার ভাঙা পা-টি বেঁধে দিল। তারপর খুব সাবধানে তাকে তার বাসায় তুলে রেখে দিয়ে এল।

পাখিটা বড়ো হলে পর একদিন হঠাৎ সে কোথা থেকে তার ঠোঁটে করে গুটিকয়েক ধান এনে চাম্বার সামনে রাখল। চাম্বা তো অবাক ! চড়ুইটা তখন কিচির কিচির করে বলল, “তুমি

একদিন আমার বড়ো উপকার করেছিলে, সেকথা আমি ভুলিনি। তোমার বাগানে এই ধান ক'টি পুঁতে দেখো কী হয়।" বলেই সে ফুড়ুত করে উড়ে পালিয়ে গেল।

চড়ুই-এর মুখে কথা শুনে চাম্বা তো থ ! তারপর সে ভাবলে, বলেছে যখন তখন দেখাই যাক না।

বাড়ির সামনের বাগানেই ধান ক'টি সে খুব যত্ন করে পুঁতল। ক্রমে ক্রমে তার থেকে ধানের গাছ হল, দিনে দিনে গাছগুলি বড়ো হতে লাগল। চাম্বার কিন্তু ততদিনে আর ধানের কথা মনেই নেই। একদিন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে, বড়ো বড়ো ধানগাছগুলোর ওপর চোখ পড়তেই সে থমকে দাঁড়াল! এ কী, ধানের গাছে ধান তো নেই! তার বদলে প্রত্যেক গাছে ঝলমলে সব মণিমুক্তো ঝুলছে! এতে আর কে খুশি না হয় বলো! চাম্বা তো মহা আনন্দে পাথরগুলো নিয়ে শহরে বিক্রি করে অনেক টাকা পেল। সেই টাকায় দেখতে দেখতে চাম্বার অবস্থা ফিরে গেল।

এদিকে তার বড়োলোক পড়শি সেরিঙ্গা গরিব চাম্বার হালচাল জাঁকজমক দেখে হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরে! একদিন সে মনে মনে ঠিক করল যে, যেমন করে হোক চাম্বার বাড়িতে গিয়ে তার এই হঠাৎ বড়োলোক হওয়ার কায়দাটা জেনে আসবে।

যেমন কথা, তেমনি কাজ।

চাম্বার বাড়িতে গিয়ে সেরিঙ্গের সে কী খোশামোদ! এখন তো আর চাম্বা গরিব নয়, তাই সেরিঙ্গা এমন ভাব দেখাতে লাগল, যেন সে চাম্বার কতদিনের বন্ধু। আগে হলে তো চাম্বার দিকে সে ফিরেও তাকাত না। চাম্বা বেচারি নেহাত ভালোমানুষ, সেরিঙ্গের ফন্দি সে বুঝবে কী করে? সেরিঙ্গা অতি সহজেই চাম্বার কাছ থেকে তার বড়োলোক হবার ইতিহাসটুকু জেনে নিল। ফেরার পথে তার বারবার মনে হতে লাগল, "আহা, আমার ভাগ্যে এমনটি যদি হত।"

কী আশ্চর্য! সেরিঙ্গা যা চেয়েছিল, ঠিক তাই হল! একদিন সকালে উঠে সে দেখল, তার



সদর দরজার উপরে চড়ুইপাখি বাসা বেঁধেছে। তখন আর তাকে পায় কে। সেদিন থেকে সে খুব কড়া নজর রাখল সেই বাসাটার উপর। চড়ুয়ের ডিম হল, ডিম ফুটে বাচ্চা হল। এবারে বাচ্চার পা ভাঙা চাই। সেরিঙ্গের আর তর সয় না। সে একদিন করল কী, চালার উপর উঠে একটা বাচ্চাকে বাসা থেকে তুলে মাটিতে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছানা বেচারির একটা পা ভেঙে গেল। তখন সেরিঙ্গ ঠিক চাম্বা যেরকম করেছিল, সেইরকম সুতো দিয়ে পা বেঁধে ছানাটাকে আবার তার বাসায় রেখে দিয়ে এল।

এই ছানাটিও বড়ো হয়ে একদিন ঠোঁটে করে সেরিঙ্গের জন্য ধান নিয়ে এল। সেরিঙ্গ তো এইজন্যই অপেক্ষা করছিল। মহা আনন্দে সে তক্ষুনি বাগানে গিয়ে ধানগুলো পুঁতে ফেলল। তারপর থেকে সারাদিন পোঁতা ধানগুলোর আশপাশে সে ঘুরে বেড়ায়—আর তাড়াতাড়ি বড়ো হচ্ছে না কেন ভেবে অস্থির হয়ে ওঠে। সময়মতো ধানগাছগুলো বড়ো হয়ে উঠল। সেরিঙ্গ রোজ ভাবে, আজই বোধহয় দেখবে গাছগুলো মণিমুক্তোর ভারে নুয়ে আছে।

একদিন সে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাগানে গিয়েই ভয়ে থমকে দাঁড়াল। কোথায় তার ধানগাছ! যেখানে গাছ পোঁতা হয়েছিল সেখানে তার আর কোনো চিহ্ন নেই। তার বদলে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বিরাটকায় বিকট এক মানুষ, বগলে তার একতাড়া কাগজ।

সেরিঙ্গকে দেখেই সেই মানুষটি দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, "আমাকে ফাঁকি দেবে ভেবেছিলে, না? সেটি হচ্ছে না। আমি তোমার আগের জন্মের পাওনাদার। দলিলপত্র সব আমার কাছে। সুদেআসলে প্রতিটি পয়সা তোমার কাছ থেকে আদায় না-করে আমি ছাড়ছি না।"

ভয়ে সেরিঙ্গের মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। লোকটা তার বাড়ি-ঘরদোর, ধনসম্পত্তি যেখানে যা-কিছু ছিল, সব নিয়ে সেরিঙ্গকে প্রায় পথের ভিখিরি করে ছেড়ে দিল।

এর কিছুদিন বাদে চাম্বা বিদেশ যাবে। এখন তার প্রচুর টাকা। যাবার আগে এক থলিভর্তি সোনা এনে বলল, "ভাই সেরিঙ্গ, এগুলো তোমার কাছে রেখে গেলাম। ফিরে এসে আবার নেব।"

সেরিঙ্গের অবস্থা এখন এত খারাপ যে, সে আর লোভ সামলাতে পারল না। চাম্বা যাবার পর অল্প অল্প করে সব সোনা সে খরচ করে ফেলল। চাম্বার থলি খালি হয়ে গেল। সেরিঙ্গ তখন সেই খালি থলি বালি দিয়ে ভরে রাখল।

চাম্বা ফিরে এসে যখন থলি ফেরত চাইল, সেরিঙ্গ ওই বালিভর্তি থলি তার হাতে তুলে দিল। থলি খুলেই তো চাম্বার চক্ষুস্থির। বললে, "ভাই, বন্ধু বলে বিশ্বাস করে তোমার কাছে যা রেখে গেলাম, তার বদলে তুমি এ কী ফেরত দিলে?"

সেরিঙ্গ এমন ভাব দেখাল যেন এ-সবের সে কিছুই জানে না; খুব অবাক হবার ভান করে সে কেবলই বলতে লাগল, "ভাই, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—তোমার সোনাই বালি হয়ে গেছে, তোমার সোনাই বালি হয়ে গেছে।"

চাম্বা মনে মনে খুব দুঃখ পেলেও মুখে কিছু না বলে বাড়ি ফিরে এল।

কিছুদিন পর সেরিঙ্গের হঠাৎ বিদেশ যাওয়ার দরকার হল। যাবার সময় বলল, "ভাই



চাম্বা, আমি বিদেশ যাচ্ছি। আমার ছেলে তোমার কাছে রইল। তুমি ওর একটু দেখাশোনা কোরো।"

কিছুদিন পরে বিদেশ থেকে ফিরে এসে সেরিঙ্গ সোজা চাম্বার বাড়িতে গিয়ে হাজির। তখন চাম্বার বাড়িতে ইশকুল বসেছে, চাম্বাই ছেলেদের পড়াচ্ছে। এদিক-ওদিক চেয়ে সেরিঙ্গ নিজের ছেলেকে কোথাও পেল না। শুধু দেখল ছেলেদের সঙ্গে একটা বাঁদর বসে রয়েছে। সেরিঙ্গ চাম্বাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "ভাই, আমার ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? সে কোথায়? লেখাপড়া ঠিকমতো করছে তো?"

চাম্বা তখন কোনো কথা না বলে সেই বাঁদরটাকে সেরিঙ্গের কাছে এনে দিল। সেরিঙ্গ বলল, "এ তো বাঁদর! আমার ছেলে কোথায়?"

বাঁদরটা তখন সেরিঙ্গের দিকে ফিরে বলে উঠল, "বাবা, আমি বাঁদর হয়ে গেছি—"

বাঁদরটা আসলে চাম্বার পোষা, এবং সেরিঙ্গ যতদিন বাইরে ছিল চাম্বা ততদিনে বাঁদরটাকে ওই একটা কথা বলতে শিখিয়েছিল। সেরিঙ্গ যতই বলে, "আমার ছেলে কোথায়?" বাঁদর ততই বলে, "বাবা, আমি বাঁদর হয়ে গেছি,— বাবা, আমি বাঁদর হয়ে গেছি।"

সেরিঙ্গ ভয়ানক রেগে গেলেও মনে মনে বুঝতে পারল চাম্বা তাকে উচিত শিক্ষাই দিয়েছে। সে তখন চাম্বার কাছে তার অন্যায়ের জন্য অনেক করে ক্ষমা চাইল আর প্রতিজ্ঞা করল যে, সে নিশ্চয়ই চাম্বার সোনা ফেরত দিয়ে দেবে। বন্ধুকে শিক্ষা দেওয়া ছাড়া চাম্বার মনে আর কোনো অভিসন্ধি ছিল না, তাই সে তক্ষুনি সেরিঙ্গের ছেলেকে ঘর থেকে বার করে আনল। বিদায়ের সময় চাম্বা বলল, "বন্ধু সেরিঙ্গ, আর কখনও কাউকে এভাবে ঠকাতে যেয়ো না।"

ছবি। সত্যজিৎ রায়



দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বুড়ো শিকারি। ধনুকতির কাঁধে ফেলে বনে বনে ঘুরছে। চোপর দিন ঘুরে যায়। না জানোয়ার না পক্ষী, একটা কাঠবেড়াল অবধি না। গাছপালার ফাঁকে নিবু-নিবু লাগছে আকাশখানা, এমনি কালো বনছায়ায় ঘোরে ঘোরে চোখে পড়ল দূর দিয়ে কে আসছে। মানুষ? এই বিজুবনে? যত কাছে আসে, দেখে, না, মাথাটা যেন ঘোড়ার মাথা, পেছনে যেন চামরপুচ্ছ, যে হও বাপু—দেব্‌তা মিলিয়ে দিয়েছেন, আজকের পয়লা শিকার তুমি। ধনুক উঠিয়েছে, তিরলাফে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল এক্কেবারে মুখের ওপর—দোহাই বাবা, মেরো না।

এ যে দেখছি মানুষ! না, লেজটেজ নেই, ডালপাতা জড়িয়ে লাগছিল বটে সেইরকম, মুখটা তো একদম ঘোড়ামুখ, হতকুচ্ছিত। যাই হোক, ধনুক নামাল শিকারি। কে তুই?

আমি? যাক্‌রো খত্তো। প্রাণ বাঁচালে বাবা, তোমার ভালো হোক। বলেই তেমনি তিরঝাঁপ দিয়ে জংলা বনে কোথায় যে হুশ করে হারিয়ে গেল, শিকারি হদিশই করতে পারলে না।

পরদিন, বনশুঁড়ি ধরে যাচ্ছে, দেখে কুচকুচে গায়ের রং একটা ছেলে মস্ত এক গাছে ঠেস দিয়ে বসে, তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

কে ও! এই কুহুবনের ভেতরে। কে তুমি? হেথায় কেন?

যখে পেয়েছে দেশ, ঘর ছেড়ে চলে এসেছি। আমি বনকুমার। তুমি?

আমিও চলে আসছি বাড়ি থেকে। আমি যাক্‌রো খত্তো।

ভালো হল দুজন হলুম। এসো তা হলে বন্ধু পাতাই।

দুটো ফুলপাতা তুলে, ছুঁয়ে ধরে, দুজন দুজনকে বলল, "আজ থেকে বন্ধু হলুম আমরা, কেউ কাউকে ছাড়ব না।"

ভরদিন দু দিন তিন দিন দুজনে মিলে ঘুরল চুড়োয় দরিতে ঝরনার কূলে আগুনফুলের গাছতলায়-তলায়। হঠাৎ দেখে ও মা! সবজি-শামলা গায়ের রং একটা ছেলে মস্ত একটা গাছে ঠেস দিয়ে বসে আছে, পাশে শোয়া একখানা তরোয়াল।

এই কুহুবনের মধ্যে এ কে আবার! কে তুমি?

যখে পেয়েছে দেশ, ঘর ছেড়ে চলে এসেছি। আমি ঘাসকুমার।

ভালো হল দেখা হল। এসো তা হলে বন্ধু পাতাই। রাজি?

দুটো ফুলপাতা তুলে, ছুঁয়ে ধরে, তিন জন তিন জনকে বলল, "আজ থেকে বন্ধু আমরা, কেউ কাউকে ছাড়ব না।"

ভরদিন দু-দিন তিন দিন ঘুরল তিন বন্ধুতে বনপুরীর ভেতর ভেতর বরফি পাহাড়ের পাশপথে জমা নদীর পায়ে পায়ে, আবার একদিন দেখে অবিকল বড়োসড়ো কড়ির পুতুলের মতন একটা ছেলে—বন ভেঙে বেরিয়ে আসছে।

কে তুমি? পথ আগলাল গিয়ে তিন বন্ধুতে।

না, বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি একা একা, যখে পেয়েছে সারা দেশ। আমি ফটিককুমার।

ভালোই হল। এসো তা হলে বন্ধু পাতাই। রাজি তো?

বিকেলবেলাতে আগুনফুলের লাল লাগা মণিমুক্তো পাহাড়, নদীপাড়ের ব্রাহ্মণী হাঁস আর মেঘের মাঝখানকার ছোর্তেন দেউল সাক্ষী করে আমরণ বন্ধু পাতাল চারজনে

বিপদে সম্পদে আমরা থাকব একত্তরে
আমরা থাকব একত্তরে আমরা কেউ যাব না ঘরে...

অত্তখানিক আকাশটাতে আবির ঘষা দিয়ে পাহাড়ের পিছনপথে টুপ্ করে লাফ দিয়ে নেবে গেল মরীচিসূর্য। কাঠকুটো জ্বেলে শুকনো ঘাস বিছিয়ে রাত কাটাবার জোগাড় করতে বসল চার বন্ধুতে।

দিন যায়। অমানুষ দেশ। বন পাহাড় দরি দিঘির মাঝ দিয়ে পাশ দিয়ে আকাশ অবধি যত দূর চাও, ছুটে যাও, কেউ নেই। একটা পাখি কোথায় ডাক দিয়ে গেল টি ট্রি ট্রি ট্রি, একটা জানোয়ার মুখ দেখিয়েই ঢুকে গেল পাতালতার চিক টেনে দিয়ে। শিকার ঝলসে, ফলপাকড় পেড়ে ঘাসের মউজ বিছানায় শুয়ে-গড়িয়ে দিন যায়। একদিন হঠাৎ দেখে চাঁই পাথরের বেড় ঘেরা একটু জমির মধ্যে ছোট্ট দোতলা একটা কাঠের বাড়ি। এখানে বাড়ি কার? যার হোক, সাহস করে দেয়াল ডিঙিয়ে ঢুকল চারজনে। ঝাঁটপাট দেয়া উঠোনটুকু। দোরগোড়ায় গিয়ে ঠেলা দিতেই দোর খুলে গেল। নীচে পোষাপ্রাণীর চিহ্ন—যেন এখুনি ছিল; সিঁড়ি বেয়ে ওপরে

উঠে গেল পিঠোপিঠি চারজন। তকতক করছে ঘর, পাতা বিছনা, তাকে তাকে সামিগ্রি—যেন কেউ ছিল এখুনি, পাশের ঘরে রাঁধাবাড়ার সব কিছু তাওয়াতিজেল বাসনকোসন মাস-আনাজ—যেন এখুনি এসে কেউ রান্নার গোছ করতে বসে যাবে। কার বাড়ি এই অমানুষ দেশে ?

যার হোক, এমনি বাড়ি দেখে যেতেও মন যায় না, আবার থাকতেও বুক ধুক্‌পুক্ করে। সারা দুপুর দিন, সন্ধে থেকে গোটা রাত্তির উঠোনে বসে কাটিয়ে দিলে চার বন্ধুতে — গাছপাতার ডাক, রাতপশুর সর্‌সর্, নিচু আকাশে ভর্তি তারার তাপ গরম—ঘুমোতেও ভয়, জাগতেও ছমছম লাগে! ভোরবেলা অবধি কেউ ফিরল না দেখে চার বন্ধুতে ভরসা করে খাওয়ার থাকার খানিকটা গোছ দেখতে বেরোল আশেপাশে। সে বাড়ি ওরা ছাড়ল না।

দিন গেল তো রাতে ঠিক হল পালা করে পাহারা জাগবে এক এক জনে। গাছপাতা পশুপাখি অমনিষ্যি নিশিপহরের কতরকম শব্দ, যেন বাড়ির চার পাশ চাপ দিয়ে ধরে আছে। তো সে রাতও ভোর হল। কেউ এল না।

একদিন দুদিন তিনদিনেও যখন কেউ এল না, ওরা নিশ্চয় করলে এ বাড়ি তা হলে চার বন্ধুর জন্যে ভগবান চেন্‌রেজির দেয়া, এ কারোর নয়। রোজ দিন যাযাবরের মতন না ঘুরে, গুহায় ফাঁকায় রাত না ঘুমিয়ে এ বেশ হল। এ বাড়ি আর ওরা ছাড়বে না। ঠিক হল রোজ এক-এক জন পালা করে রাঁধাবাড়া-গেরস্থালি দেখবে, বাকি তিনজন বেরোবে খাবারের জোগাড়ে, ফিরলে চারজনে ভাগাভাগি খাবে গলাগলি ঘুমোবে একত্তরে।

সেই ভালো।

একদিন, সেদিন বনকুমারের পালা ঘর রাখার, রেঁধেবেড়ে তুলছে বাটিকুটি ভরে ভরে, হঠাৎ দোরে আওয়াজ হল। আজ এখ্‌খুনি? ভাবছে, ভাবার অবসর না দিয়ে একেবারে শন্‌শন্ মুখের ওপর উঠে এসেছে এক ঢ্যাঙাপারা মেয়েমানুষ।

কে— কে—ডাক পেড়ে উঠল বনকুমার।

ও কী, চমকালে কেন? সরু গলায় বলে উঠেছে সে-মেয়ে। কী রাঁধছ দেখতে এলুম গো! বলে, ব্যাস্! আর কোনো কথা নেই, আপনা হাতেই বাটিকুটি টেনে নিয়ে খেতে শুরু করে দিয়েছে। সে আর কতক্ষণ বা, নিমিষের মধ্যে বাটি ঠনঠন কাঁসি ঠনঠন—হাঁ হাঁ করে উঠবে কী, তার মধ্যে সে-মেয়েও হাওয়া। একনিমিষে গেল কোথায়? দোর অবধি উজিয়ে, নেবে উঠোন ঘুরে, বেড়ের বাইরে চক্কর দিয়ে—নাঃ, কোথাও নেই।

ফিরে এসে দেখে হাঁড়ি বাটি লেপাপোঁছা, কিচ্ছু নেই।

কী হবে এখন। এখুনি যে তিন বন্ধু এসে পড়বে হাঁই হাঁই খিদে নিয়ে। যা সে দেখল, সে কি মানবে কেউ? হাঁড়ি বাটি ছড়ানো রইল, সে সোজা দোরগোড়াতে বসল গিয়ে চুপ করে।

বন্ধুরা ফিরতে ফিরতেই তিরিক্ষি গলা—খাবার বাড় রে, জলদি কর রে, নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে গেল।

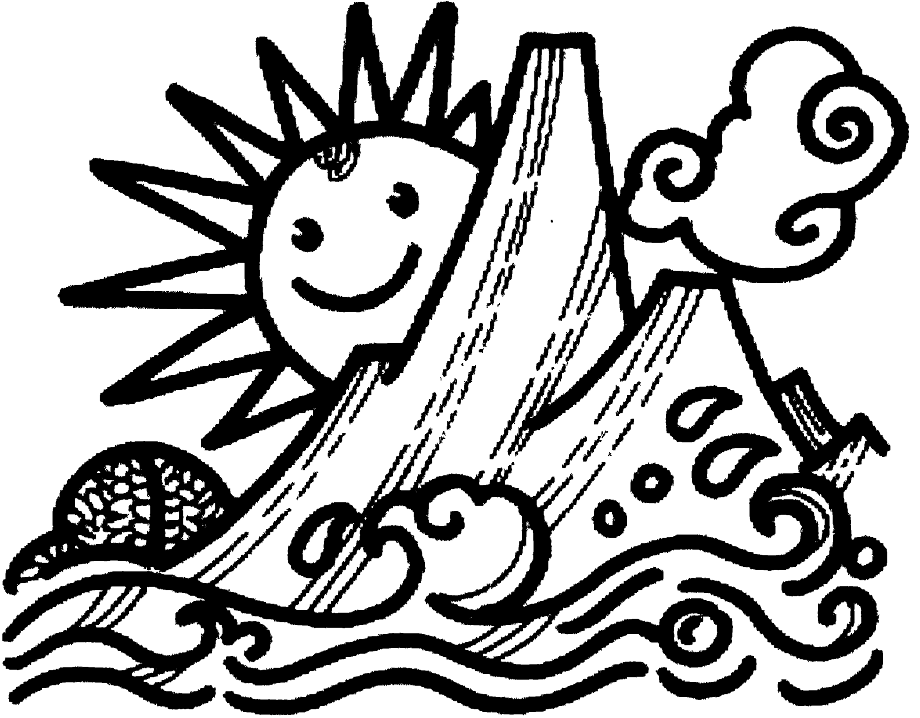
বনকুমার কালোমুখ করে বলে, আজ আর খাবার চেয়ো না বাপু—চাক্‌পা-লুটেরা এসেছিল

চড়াও হয়ে এক পাল, চেটেপুটে খেয়ে গেছে সর্বস্ব।

বলিস কী? বন্ধুরা ঢুকে দেখে রান্নাঘর তছনছ, একটা দানা লেগে নেই হাঁড়িকুড়ির কোত্থাও।

পরদিন ঘাসকুমারের পালা, রেঁধেবেড়ে তুলছে বাটি বাটি ভরে—খুশবু দিচ্ছে, তাও প্রাণে ধরে একটু মুখে দেয় না একসঙ্গে খাবে বলে, হঠাৎ দোরে আওয়াজ হল। এখুনি ফিরল সব? ভাবছে, ভাবার অবসর না দিয়ে একেবারে শন্‌শন্‌ করে মুখের ওপর উঠে এসেছে এক ঢ্যাঙাপারা মেয়েমানুষ।

কে— কে—



কেউ না গো! একেবারে যে চমকে উঠলে—সরু গলায় বলে উঠেছে সে-মেয়ে, কী রাঁধছ দেখতে এলুম গো—শুকো মাস ছাম্বা লা-ফু আরা-তারা ও ব্বাবা, কত্ত। বলে আর কথা নেই, আপনা হাতেই বাটিকুটি টেনে নিয়ে খেতে শুরু করে দিয়েছে। সে শুধু একটা নিমিষ, পরক্ষণেই বাটি ঠনঠন কাঁসি ঠনঠন—সে-মেয়ে বা গেল কোথায়? দোর অবধি গিয়ে, নেবে হাতাবাতা চক্কর দিয়ে—নাঃ, কোথাও তো নেই!

থাক গে সব ছড়ানো। ঘাসকুমার চুপ করে বসে রইল গিয়ে দোরগোড়াতে।

বন্ধুরা খিদেয় তিরিক্ষি হয়ে ফিরতে ফিরতেই কালোমুখে সে বললে, একটা দল দ্রোক্‌পা-রাখোয়াল বাড়ি চড়াও হয়ে এসে সর্বস্ব চেটেপুটে খেয়ে গেছে, কী খাবে খাও দেখ গে—

বলিস কী!

বলার আর আছে কী। একটা দানাও লেগে নেই হাঁড়িকুড়ির কোত্থাও।

পরদিন পালা ফটিককুমারের।

তো সেই একই ঘটনা। ফটিককুমার কালোমুখ করে বসে আরেকটা হানাদারির গল্প শোনাল বন্ধুদের। দেখ, কী খাবে ফের আজকের দিন!

শেষে পড়ল যাক্‌রো খত্তোর দিন। সেও রেঁধেছে-বেড়েছে অনেক পদ—থরে থরে বাটি ভরা ভরা রান্না—বন্ধুরা আসুক ছাই তাড়াতাড়ি। এমনি সময় দোরে আওয়াজ হল। আর আওয়াজের প্রায় সাথে-সাথেই—সেই ঢ্যাঙাপারা মেয়েমানুষ—

কী রাঁধলে গো আজ!

খত্তো নিমিষের মধ্যে মনে মনে বুঝে ফেলল কী হয়েছিল বন্ধুদের বেলায়। মুহূর্তে বাসন-ব্যান্নন সব আগলে আড়াল করে সে উঠে দাঁড়াল—এক ঘড়া জল এনে দাও না গো দিদি, একসাথে বসে খাই, বলে জিভ চুকিয়ে উঠেছে দেখতাই। সে-মেয়ে দেখলে যে সহজে নাগাল মিলছে না খাবারের, তখন বললে, তো দে দেখি, যাই—

খত্তো তাকে দিল একটা ঝাঁঝরা ঘড়া।

জল ছাই ওঠেই না। বারবার ফেলছে নিয়ে ইঁদারাতে—কীসের কী! জল ওঠেই না।

আর এরই মধ্যে খত্তো দেখে সে-মেয়ে একটা ঝুলি সেখানে ফেলে গেছে, নেড়েচেড়ে খুলতে অমনি বেরিয়ে পড়েছে খানিকটা মান্‌ষের গায়ের শিরাদড়ি, একটা ছেনি, একটা হাতুড়—যা থাক মনে থাক, খত্তো কী ভেবে পলকের মধ্যে সেগুনো বদলে ফেলল খানিকটা ঘাসী দড়ি, একটা কাঠের ছেনি, একটা শোলার হাতুড়ি ভরে রেখে। তখুনি ফিরে এসেছে সে-মেয়ে। না বাছা, তোমার জল আনা আমার সাধ্যি না!

খাই কী করে জল না হলে। দেখ দিকি মুশকিল। সে-মেয়ে দেখে ছেলেটা নড়েও না সরেও না, কোনো গেরাহ্যিই নেই। তখন অগত্যা সে বললে, তা বাছা খেতে না দাও তো এসো একটা খেলা খেলি—বলে সে ঝুলি খুলে বের করল খানিক দড়ি।

এই দড়ি দিয়ে তোমায় বাঁধি। খুলতে পারো তো ছেড়ে যাব, না পারো তো—

বলে ভয়ংকর মুখখানা করে চাইল, শুধু তীব্র খন্‌খন্‌ করছে খুলিকপাল—

যাক্‌রো খত্তো কাঁপল না। বলল, বেশ বাঁধো।

সে তো খত্তোরই বদলে রাখা বিচুলির দড়ি, এক টানে ছিঁড়ে বের হয়ে এল খত্তো। এবার এসো তোমায় বাঁধি তা হলে—বলে মান্‌ষের সেই শিরাদড়ি বের করে কষে পেঁচ দিয়ে বাঁধলে সে মেয়েকে। সে ছেঁড়ে কার সাধ্যি।

আচ্ছা বাপু হার মানছি, খুলে দাও—অনেক টেনেটুনে বেরোতে না পেরে সে-মেয়ে তখন

নত হচ্ছে। বাঁধ খুলে বেরিয়ে বলল, বেশ, এসো খেলি ফিরতি খেলাখানা। পারো তো দেখো কেমন লাগে এই ছেনির ঘাটুকু, সও তো ছেড়ে যাব, নয় তো—

বলে ভয়ংকর মুখখানা করে চাইল, দুটো রক্তবর্ণ ভাঁটা ঘুরছে খুলির চক্ষুগহ্বরে—

খত্তো কাঁপল না। বলল, বেশ, বের করো ছেনি—

বলতে বলতে সে-মেয়ে বসিয়ে দিয়েছে ঠিক বুকের পাঁজরায়। কাঠের যন্তর, তার আর জোর কত।

নাও, সও এবারে তবে আমার ছেনিটুকু—বলে খত্তো সোজা বসিয়ে দিয়েছে চোখের পলকে তার ছেনি। ধার লোহা—উহুহুহু ডাক পেড়ে চেঁচিয়ে উঠল মেয়ে— এ কী। রক্তের ভাঁটা চোখদুটো যেন খুলে বেরিয়ে আসছে, যেন প্রাণপণ চেষ্টা করছে সামলাতে তবু খুলিমুখ কিছুতে মেয়েমুখ হচ্ছে না—

কী করলি, কী করলি রে তুই. ওরে লোশে। নে, তবে এই বার বার তিন বার—বলে খত্তোকে ভাবার সময় না দিয়ে সে তার হাতুড়খানা প্রলয় জোরে বসিয়ে দিলে খত্তোর মাথায়—

পলকা শোলার হাতুড়ি—এক ঘায়ে ভেঙে সাতটুকরো।
কে রে লোশে তুই, যক্ষ হাতুড় সাতখানা করলি ভেঙে?

সে কথার জবাব না করে খত্তো বের করেছে তখন তার হাতুড়ি—এবার আমার দান, ধরো বলে প্রবল বিভীষণ শক্তিতে ঘা বসিয়ে দিয়েছে মেয়ের বুকে। এক ঘায় ঘুরে পড়ল মেয়ে। আর উঠল না।

খত্তো তখন সেই লাশ কাঁধে ফেলে, ফেলে দিয়ে এল নিয়ে ইঁদারাতে। পিছু ফিরে না তাকিয়ে ফিরে দোর দিয়ে বসে আছে ফের ঘরে। খিদেয় হই হই করতে করতে ফিরল বন্ধুরা। দোর খুলে আগলে দাঁড়াল সে মুখোমুখি—এই তোমাদের চরিত্রি? কে আসত রোজ দুপুর-দিনে পাত সুদ্ধু চুষে খেতে? লুটেরা-দ্রুক্‌পা? চলো, দেখ এসো—বলে কুয়োপাড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখে অজলা কুয়োর তলায় স্পষ্ট শোয়া সেই ডাইনির মড়া—কিন্তু মড়া তো নয়, মড়ার চার ধারে ঝলমল করছে—ও কী ও। ও যে মাণিক্যপাথর। অগুনতি মাণিক্যপাথর—ধাঁধা দিয়ে উঠছে।

দেখে, বনকুমার ঘাসকুমার ফটিককুমার যেন মুহূর্তে আত্মহারা হয়ে উঠল—এ যে সাত রাজার ধন এক মানিক, তারই ছড়াছড়ি। নিশ্চয় জুটিয়ে দিয়েছেন দেবতা দ্রোলমা জেতসুন, মিছে নয়। পেলুম, তো পেতেই হবে, এ ধন না পেলে জীবন বৃথা।

জীবন তো বৃথা, কিন্তু নাবে কে।

কতকালের হরা ঝরা কুয়ো, কে জানে। তাও ডাইনি মরে পড়ে আছে, কে জানে সত্যি মরে আছে কি না—এ ওকে ঠেলে, ও একে টানে, এক পা যায় তো তিন পা পিছোয়—

তখন খত্তো বলল, বেশ আমিই নাবছি। কোমরে রশি বেঁধে আমায় নাবিয়ে দাও, তাইতেই ঝোড়া বেঁধে আস্তে আস্তে তোমাদের তুলে দি সব, শেষে আমায় তুলে নিয়ো।

আহা, খত্তো আমাদের বীরকুমার, খত্তোর তুল্যি নেই গোটা দুনিয়াতে!' হাতে একটা ঝোড়া দিয়ে, কোমরে রশি বেঁধে, খত্তোকে নাবিয়ে দিল তখন তিন বন্ধুতে মিলে।

পা শিরশির, গা ছমছম। আড়মোড়া দিয়ে জেগে উঠবে না তো ফের মড়াটা! পা-ঠেলা দিয়ে দেখে—নাঃ, মরে একেবারে কাঠ হয়ে আছে। আর, সে মড়া যেন চোখেও পড়ে না। তার ওপর-নীচে আশেপাশে ঝলমল ঝলমল করছে রাশি রাশি মাণিক্যপাথর—মুঠোয় মুঠোয় ঝোড়া বোঝাই দিতে বসল খত্তো। ঝোড়া উঠছে, ঝোড়া নাবছে, কতক্ষণ যে বোঝাই দিয়ে চলেছে খত্তোর খেয়ালই নেই—গা হাত টনটন করছে, শেষবারের বার ঝোড়া উঠিয়ে লেপাপোঁছা কুয়োতলার মেঝেয় শান্তির নিশ্বাস ফেলে খত্তো বসে পড়ল ক্লান্ত হয়ে।

তারপর ...

হঠাৎ খেয়াল হল। রশি তো কই নাবছে না? ওপরমুখো দেখছে চেয়ে, তো সেই চেয়েই আছে—ওপরটায় যেন আলো নিবে এসেছে কখন—একটা আবছায়া অন্ধকার যেন ঝুলে পড়ল ওপরের ওই গোল মুখটাতে—আরো কতক্ষণ পরে দেখে ওই উঁচুর 'পরে এতখানি একখানা গোল মাণিক্যপাথর যেন জ্বলছে—আরো কতক্ষণ গেল, গোল হয়ে ঘুরছে দেখে পুচ্ছবাঁধা শ্বেতরুপোর তারা-হাঁস একটা দল—ঝাঁ ঝাঁ করছে নিশুতি।

খত্তো তখনও অসাড় হয়ে চেয়ে আছে অপেক্ষাতে।

কী একটা ত্রস্ত খসখস করে ছুটছে যেন ওপরতলায়, কানে এসে বাজে। কীসের একটা দমকা যেন প্রতিধ্বনি করে নীচে নেবে এল আচম্‌কা—ঘোর ভাঙতে প্রথমেই খত্তোর মনে হল দড়ি আর নাববে না।

আর মনে হতেই সারা দেহ যেন পাক দিয়ে উঠেছে—সে কি রাগে, না দুঃখে, না ভয়ে, কে জানে। হাতে স্পর্শ করে উঠল—না মাণিক্য নয়, কী ফলের একটা শুকনো বিচি। তো সেটাকেই কী মনে ভেবে মাথায় ঠেকাল খত্তো—হে দেবতা, আকাশের বাতাসের পাহাড়ের পাতালের দেব্‌তা, যদি সত্যি হও তো এই বিচি থেকে যেন গাছবৃক্ষ বেড়ে ওঠে ওই ওপর ছাপিয়ে, যেন আমার খুব ঘুম পায়, যেন ফলপাতা বোঝাই গাছ অনেক অনেক বেড়ে ওঠার আগে আমার ঘুম না ভাঙে, আর এই বিচি যদি মরা বিচি হয় তো দেব্‌তা, আমার ঘুম যেন আর না ভাঙে। ডাইনির মড়াটায় মাথা ঠেস দিয়ে শুয়ে শুয়ে যাক্‌রো খত্তো দেখতে লাগল, উই চুড়ো-উঁচু দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে চলেছে পুচ্ছবাঁধা শ্বেতরুপোর তারা-হাঁস একটা দল—এক পাক দু পাক তিন পাক চার পাক...

যখন ঘুম ভাঙল, দেখে সোনালি ডুরি খেলছে গায়ে, ঠাস সবজি-ফলপাতার গন্ধ, উঠে বসে চোখ ডলে চেয়ে দেখে কতখানি একটা গাছ কুয়োতলা থেকে ডালে ডালে ভুঁই ছাপিয়ে উঠে গেছে, ওপরকার সাড়া নীচে বেয়ে নেবে আসে তখ্‌খুনি—মড়াটা কোথায় গেল, সেই ডাইনি? নেই তো! কই? নেই তো! ডাল বেয়ে খত্তো ওপরে উঠে এল।

ঘরে উঠতে গিয়ে দেখে ভাঙা পোড়া কাঠের পাতা, ঝুরঝুর করছে দুটো-তিনটে কন্ধকাটা খুঁটো; আর কিচ্ছু না। তো ফের পথের ছেলে পথেই নাবি গিয়ে। যাক্‌রো খত্তো একা-একাই

হাঁটতে লাগল দরি-পাহাড় ছু-নদীর ওপরকার ঘাসলতার সাঁকো পার হয়ে আগুনফুলের গাছতলায়-তলায়—

যেতে যেতে ফের একদিন দেখে পেছন আড়াল করে তেতলা-পাঁচতলা এক মস্ত কাঠের বাড়ি—এদিক সেদিক চরছে গোরু-শুয়োর ভোট ঘোড়া—হাতা পার হয়ে ঢুকেই দেখে তার সে তিন বন্ধু—বিপদে সম্পদে আমরা থাকব একত্তরে আমরা থাকব একত্তরে, আমরা কেউ যাব না...

একত্তরেই আছে তিন বন্ধুতে, পুরীপ্রাসাদ তুলে জমি-পশু ঘেরা হয়ে ঘোর সংসারী—খত্তোকে দেখে যেন ভূত দেখেছে—

কোথায় ছিলে খত্তো এত বছর?

যেখানে রেখে এলে সেখানেই রয়ে গেলুম। খত্তো বুঝতে পারল কুয়োতলায় তার অনেক বছর কেটে গেছে।

এ কী কথা বলছ খত্তো! কত বার করে দড়ি নাবালুম, কত ডাক ডাকলুম, তুমি সাড়াও করলে না, উঠলেও না। কী ভীষণ রাত কাটল সে রাতে, সবাই ভাবলুম ডাইনি বেঁচে উঠে খত্তোকে খেয়েছে নির্ঘাত। আহা আমাদের মধ্যে সবচাইতে বীরকুমার খত্তো। আমাদের কত দিনকার দুঃখসুখের একত্তরের বন্ধু—

তা খত্তো, যা হয়েছে হয়েছে, এসো আবার থাকি একসঙ্গে। দেখ আমাদের কত ধনজন ঘোড়া শুয়োর গাই কত বড়ো বাড়ি—যা হয়েছে তো হয়েই গিয়েছে—

খত্তো বলল, না ভাই, এখন আমি ঘর যাব। কত দিন বাড়ি ছাড়া। না জানি কেমন আছে আমার মা, বাবা, বোন, ভাই—

পাথর-বেড়া দেয়া বিশাল পাঁচিলখানা পার হয়ে খত্তো রাস্তায় উঠল।

আবার দিনের পিঠে দিন—ছায়া দরি বরফি পাহাড়ের পাশ ঘেঁষে জমা নদীর পায়ে পায়ে ধস্-কাঙ্রু-র গরাস ফাঁকি দিয়ে উঁচুনিচু অফুরন পথ—একদিন দেখে কাঁটামাটির গায়ে ফের ঘোড়াখুরের ছাপ, কতক পথ যেতেই ভেসে উঠেছে এক বিশাল রাজপুরী—লোকজন চলাফেরা শুরু হল এক-আধজন করে, কিন্তু লোকগুলো যেন ফ্যাকাশে মরামানুষ—কোনো দিকে না চেয়ে দ্রুত চলে যায়, এক-আধজন করে পুছে শুধিয়ে একটু একটু জানা গেল সেখানে রাজা আছেন বিষম বিপত্তিতে—তো খত্তো দেউড়িতে গিয়ে রাজার দর্শন চেয়ে ঘণ্টায় ঘা দিল। বিদেশি আশ্রয়প্রার্থী, ধরনা দিয়ে আছি দরোজায়।

দেখা—সে কিছুতেই হবে না, পুরো একটা বেলা অপেক্ষায় বসে বসে শেষ অবধি মঞ্জুর হল প্রার্থনা।

কী চাও চট্‌পট্‌ বলো।

কাজ চাই মহারাজ।

কাজ নেই। সারা রাজ্যে অশান্তি, প্রেত ভূত যখ পিশাচ চরছে সর্বত্র—রাজ্যের দেবচক্র গোম্‌বাদেউল ধ্বংস করে, আমিই আছি কি নেই, এখন কাজ কোথায়?

মহারাজ, তবু পায়ে ঠাঁই দেন তো থাকি।

সারা রাজ্যের লোক পালাচ্ছে ভয়ে, কোথায় থাকবে?

থাকি তা হলে পাহারাদার হয়ে।

বেশ, থাকো তো থাকো রাজপুরীর পাহারাদার হয়ে।

ধনুকতির কাঁধে ফেলে চার দোর ঘুরে দেখতে গেল খত্তো।

আছে সেই থেকে। কুহু রাতে পুরী বেড় দিয়ে ঘুরে বেড়ায়—হল হল সুবাহা—পড়ে পড়ে মন্ত্রপূত করে রাখে ধনুকতির—দুদিন না যেতে দেখে রাতের চাঁদতারা আচ্ছন্ন করে শন্‌শন্‌ চলাচল করে উঠছে কোথাকার ভর লাগা কুবাতাস—

খত্তো দেখে, হঠাৎ ঘোর করা গেরি-পাহাড়ের মতন আকাশখানা যেন দুলছে—মনে হচ্ছে আকাশ ঢাকা দিয়ে বড়ো বড়ো গিধাপাখি শয়ে শয়ে—তাদের ডানার পালকে ঘষা লেগে স্ফুলিঙ্গ খসে পড়ছে মাথার ওপর—মন্ত্র স্মরণ করে খত্তো তির জুতল একখানি ছিলা-টান দিয়ে। বিদ্যুৎবেগে উড়ে গেল তির, এক তির শত তির হয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলল নিমিষের মধ্যে—আর তখুনি, মুহূর্তে, আকাশের এমুড়ো ওমুড়ো খালি দাপাদাপি চিৎকার—রক্ত আর আগুনছটা ছুটে পড়ছে ফোয়ারা দিয়ে—যেন প্রবল প্রলয় জেগে উঠেছে ভূপৃথিবীর ছাদের মাথায়—

একটু পরেই দেখে মাটিতে আকুলিবিকুলি করছে পড়ে কালো ভুসোর বর্ণ অগুনতি ভূত আর যখ—

ঘাসকাঁটায় বুক সেঁটে পড়ে ওই বুঝি রাজা! মাথার মটুক তেমনি মাথায়—রাতের কালোতেও দেখা যায় সাত তির দপ্‌দপ্‌ করছে দেহ ফুঁড়ে—

দেখতে দেখতে কতগুনো আবছায়া মূর্তি এসে ধরাধরি কাঁধে তুলে তখুনি উড় দিল বাতাসবেগে—

ভোর হয়ে এল।

সেই দণ্ডে সোনার ঘণ্টায় অভয় বেজে উঠল ঢঙ্‌ ঢঙ্‌—সিংদরোজায়, রাজার দেউলে, সোনার কবাট খুলে রাজা বের হয়ে এলেন : দৈববাণী শুনতে পেলুম যখরাজা মরণফোঁড় ফোঁড়া হয়ে পালিয়েছে এ রাজ্য ছেড়ে, অবশেষে গ্রহমুক্তি হল তা হলে। এখন তবে বলো কী চাও—বলে গলার মণিমালা খুলে দিলেন যাক্‌রো খত্তোর হাতে—আমাদের গোটা দেশ, সব্বাইকে তুমি বাঁচিয়েছ, খত্তো, আজ থেকে আর পাহারাদার নও, সেনাপতি তুমি এ রাজ্যের—

খত্তো বলল, মহারাজ, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিলুম অনেকদিন। না জানি কেমন আছে আমার মা, বাবা, বোন, ভাই। মহারাজ, আমি থাকব না।

মনে দুঃখ পেলেন রাজা, মুখে বললেন, যাবে মন করেছ, যাও। কিন্তু শুনে যাও, যা বলি। বড্ড শত্রু তোমার চারিদিকে। এখান থেকে যে পথেই যাও, পথহারা হয়ে উঠতে হবে তোমায় এক দানোর দেশে। লোভশ্বাস ফেলে শিকার বশ করে সেথায় মানুষখাওয়া দানোরা। ভয় পেয়ো না। বোলো আমি সর্বরোগের বিষারি ওঝা। তোমার ভালো হবে।

খত্তো বেরিয়ে পড়ল। যায় সূর্য দেখে তারা গুনে চার ধার সাবহিত হয়ে, তবু জানে না কখন পথ ভুল হয়ে গেল। ভুল পথে ঘুরতে ঘুরতে লোকজন দেখে নিশ্চিন্দি হতে গিয়েও থমক লেগে যায়—পিঠে উত্তাপ নিশ্বাস লাগছে ও তবে কার। চেয়ে দেখে, দেখতে মনিষ্যি হলে কী হয়, মুখের দু-পাশে ঠেলা দিচ্ছে যেন আবছায়া শ্বাদাঁত, চোখ যেন হলকা হিম—ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলে ওঠে তখন, আমি বিদেশি লোক, সর্বরোগের বিষারি ওঝা, আমায় দরকার?

বলতেই লোকটার চোখ চকচক করে উঠেছে—বিদেশি? বিষারি ওঝা? পারবে তুমি ভালো করতে? আমাদের রাজাকে?

না দেখে বলতে পারি?

কিন্তু দেখে কি ফিরতে পারবে? কথা মুখেরই মধ্যে, জোরে বলছে কথার পরটুকু—ভালো যদি না করতে পারো?

তো চলো, দেখি আগে।

লোকটা তাকে নিয়ে চলল। রাজবাড়ির ফটক দিঘি বাগ-বাগান মহলের পরে মহল পার হয়ে অবশেষে একটা কাঁচা সোনার ঘর, ভেতরে পালঙ্কের চার ধারে নিঃশব্দ পাহারার মাঝখানে অচৈতন্য শুয়ে আছে—এই নাকি রাজা? বুকটা ধক্ করে উঠল। এ তো সেই। সাত তির ফুঁড়ে আছে, একটা তার কপালের মাঝখানটায় আধা ঢোকা—সেখানে চাপ রক্ত, শিয়রে পাশে পাছতলায় পাথরমূর্তির মতন ক'জন দাঁড়িয়ে—যাক্‌রো বলল, কারোর সামনে তো আমি রুগি দেখি না, গুহ্য চিকিৎসে আমার—

একা থাকুক তা হলে ওই দেহরক্ষী রাজার।

থাকুক। আমি যাই।

যাক্‌রো ফিরে দাঁড়াতেই সব নরম হয়ে একে একে ঘর খালি করে বেরিয়ে গেল। সে লোকটা খালি বলে, বাইরে রইলুম। দেখি কত বড়ো তুমি বিষারি ওঝা।

সব বেরিয়ে যেতেই চার ধার ভালো করে ঠাওর করে নিয়ে যাক্‌রো কপালের তিরটা শক্ত মুঠো করে ধরে প্রাণপণ আরো ঢুকিয়ে দিলে মাথার মধ্যে—বিপর্যয় পাথরফাটা চিৎকার করে শয্যা ছেড়ে মেঝেয় আছড়ে মরে পড়ল যখরাজা। আর তখুনি মুহূর্তের মধ্যে দিশেহারা ঘর কপাট ভেঙে যেখান থেকে সেখান থেকে ঘোর নাদে জোয়ারের মতো ঘরে ঢুকতে লাগল দলকে দল—যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেত পিশাচ—তো সে আর ফিরে দেখল না, সেই বেপট বিশৃঙ্খলার ভেতর পলকের মধ্যে জানলা গলে বার হয়ে পড়ল যাক্‌রো—

কিন্তু পালাবে কোন্ পথে? আকাশ ফেটে পড়ছে তোলপাড় বজ্রবিদ্যুতের ঘায়ে—লক্ষ যখ শত চেড়ী নিয়ে যখরাজার সাত রানি ছুটে আসছে পিছনে। যাক্‌রো ছুটেছে তিরের গতি, তো লক্ষ আগুনের জিভ লকলক করে ছুঁয়ে যাচ্ছে পিঠ। ঝাঁপ দিয়ে পার হয়ে গেল চুড়ো থেকে চুড়ো—পিছন থেকে আগুন যেন লকলক করে ঝাঁপ দিয়ে পার হয়ে এল উড়ন্ত লক্ষ নাগ—এক মুহূর্তে যাক্‌রোর মনে হল যেন পেছন দিয়ে তার কণ্ঠা বেড় দিয়ে ধরেছে তীব্র

আরকের মতন সেই নাগপাক, আর পিঁজে পিঁজে তার পিঠ চারিয়ে যাচ্ছে কালকূট বিষ! যাক্‌রো টের পেল নরম ঝাপটার মতো সে তিরঝাঁক যেন অবলীলায় তাকে বয়ে নিয়েই ছুটেছে—তার আর ছুটতে হচ্ছে না—

জমা নদীর মুখে দাঁড়িয়ে যাক্‌রো দেখে নদীর শতঝোরা খুলে গেছে অকস্মাৎ। ওপাড়ের কন্ধকাটা একটা কাঠের খুঁটো যেন ডালপাতা বোঝাই হয়ে দেখতে দেখতে ছেয়ে গেল আগুনফুলে-ফুলে, সেই মুহূর্তে আকাশ আবছায়া করে হঠাৎ শিয়রের কাছটায় জ্বলে উঠল এতখানি একখানা সেই যে সাতরাজার ধন, সেই মাণিক্যপাথর—ঝলমল করে জ্বলতে জ্বলতে সেটা কখন বরফি চাঁদের চাইতেও বড়ো হয়ে গেছে—মস্তবড়ো দেখা যাচ্ছে তার মধ্যেকার বাড়িখানা—বাড়ির সামনে পাহাড়ি মাঠ—আমাদের। ঘোড়া দড়বড় করে তার ভাই এগিয়ে আসছে—দাদা—

ছবি। শঙ্কর বসাক



জেলের ভাগ্য

হরেন ঘোষ

এক গরিব জেলে নদীর ধারে দুই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে, নিজের ধরা মাছ দিয়ে চপ তৈরি করে বিক্রি করত। একদিন তার কাছে এক লামা এলেন। তাঁর মাথায় ছাতার মতো বিরাট এক টুপি।

—তুমি এখানে কী করছ? লামা জিজ্ঞেস করলেন জেলেকে। তোমার ওই বিরাট গামলা থেকে বেরোনো ধোঁওয়া সমস্ত পরিবেশ নষ্ট করছে।

জেলে জানাল, সে মাছ সেদ্ধ করছে যাতে চপ তৈরি করে বিক্রি করতে পারে। এইভাবেই সে উপার্জন করে সংসার চালায়।

—হুঁ, লামা বললেন—তুমি মাছ সেদ্ধ করছ। এইভাবে অসহায় প্রাণীদের হত্যা করছ। তোমার কি একটুও ভয় হচ্ছে না, এ জন্যে পরের জন্মে কী কঠিন শাস্তি হতে পারে।

তারপর তিনি গামলার দিকে এগিয়ে গেলেন তার ঢাকনি খুলে দেখার জন্যে।

জেলে চিৎকার করে উঠল—হে প্রভু, ওতে হাত দেবেন না। আপনার আঙুল পুড়ে যাবে। ভেতরে টগবগ করে জল ফুটছে। এই নিন হাতাটা। যদি ইচ্ছে করেন চেখে দেখতে পারেন। ওখানে একটি বাটিও রয়েছে।



—দূর বোকা, আমি অন্ধ নই। তবে তোর যদি ইচ্ছে হয়, ঢাকনিটা তোল।

যে মুহূর্তে ঢাকনি তোলা হল, জেলে অবাক হয়ে দেখল, লামা পুরো গামলার ফুটন্ত জলসহ মাছ এক চুমুকে গলায় ঢেলে দিলেন! এই দৃশ্য দেখে জেলে বাক্যহারা হয়ে গেল! সে ভেবেছিল, লামা দারুণভাবে পুড়ে যাবেন এবং মুহূর্তে মারা যাবেন। তারপর সে ভাবতে থাকল, কীভাবে একজন অতখানি জল আর মাছ একপলকে নিঃশেষ করতে পারেন। সে একেবারে বোবা হয়ে গেল। ভাবল, স্বপ্ন দেখছে না তো।

—জীবন্ত প্রাণী ধ্বংস করা মহাপাপ। লামা আবার বললেন, তোমার পাত্র এখন শূন্য, এতে আশা করি তোমার শিক্ষা হবে।

—হে পবিত্র পিতা, হে মহান প্রভু, সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তোতলামি করে বলল জেলে, বলুন আমায় আপনি কে? আমি যতটা মাছ সিদ্ধ করছিলাম সব আপনি গিলে ফেললেন। আর ঝোলটাও। এটা কি অন্যায় নয়? পাপ নয়?

—দূর দূর। হাসলেন লামা, —তুই কি ভাবছিস তুই যেমন পাপ করেছিস আমিও তাই করেছি। চল আমার সঙ্গে নদীর ধারে। দ্যাখ, আমি কী করতে পারি।

এবার জেলেকে সঙ্গে নিয়ে লামা নদীর ধারে গেলেন এবং ঢেকুর তুলে যা তিনি গিলেছিলেন

সব মাছ মুখ থেকে বার করে দিলেন। জেলে অবাক হয়ে দেখল, মাছগুলি সব জ্যান্ত। লাফাতে লাফাতে জলে নেমে সাঁতার কেটে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হতভম্ব গরিব জেলে জানতে চাইল এমন অসম্ভব ঘটনা তিনি কীভাবে সম্ভব করলেন।

—হাঃ হাঃ—নিজের বিশাল টুপিতে একটা থাবা দিয়ে তিনি বললেন, তুমি নিশ্চয় আমার গুরু নগ-এর মহান লামা বোসদারকে দেখেছ, তিনি মৃত মানুষকে জীবন্ত করতে পারতেন। নাও, এবার শোন আমার কথা। যদি মাছ ধরতে হয় এমন জায়গায় যাবে যেখানে কেউ তোমায় দেখতে পাবে না। কখনোই এমন পথের ধারে নয়। আমি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই তোমায় জানাতে হল। আমার মনে হল এটা পাপ কাজ হচ্ছে। যদি না করতাম তা হলে তোমার পাপের ভাগীদার আমিও হতাম। যেহেতু আমি দেখে ফেলেছি।

লামা এবার নিজের গন্তব্যের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করলেন।

লামা চলে যাবার পর জেলে স্বগতোক্তি করল, একেই হয়তো বলে জেলের ভাগ্য! হয়তো একদিন সবকটি মাছ একজোট হয়ে আমায় ঘিরে ধরে প্রতিবাদ জানাবে এবং তারপর আমায় কুরে কুরে খেয়ে ফেলবে।

ছবি। শঙ্কর বসাক



অকৃতজ্ঞ বাঘের সাজা

সুজিত হালদার

একদিন এক বাঘ ঢুকে পড়ল এক কাঠুরিয়ার কুটিরে। কাঠুরিয়া বাঘটাকে দেখেই ভয় পেয়ে এক ছুটে কুটিরের বাইরে এল। তারপর বাইরে থেকে কুটিরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

কুটিরের দরজা জানালাগুলো খুবই শক্ত-পোক্ত। কাজে কাজেই বাঘ বাইরে বেরনোর কোনও পথ খুঁজে পেল না। তখন বাঘ আর কী করে, উপায় না পেয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকাডাকি শুরু করল।

এমন সময় একটা হরিণ ওই পথ দিয়ে ঝরনার জল খেতে যাচ্ছিল। হরিণকে দেখে বাঘ একটু আশার আলো দেখল। বাঘ চিৎকার করে বলল, "ও ভাই হরিণ, আমাকে বাঁচাও।"

বাঘের গলার আওয়াজ শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল হরিণ। তার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে! আবার বাঘের করুণ অবস্থা দেখে একটু অবাক হল হরিণ।

বাঘ বলল, "হরিণভাই দরজার শিকল খুলে দিয়ে আমাকে বাঁচাও। তোমার এই উপকারের কথা আমি সারাজীবন মনে রাখব।".

হরিণ বলল, "তাই কি হয়? তুমি বাঘ, আর আমি হরিণ। ছাড়া পেয়েই তুমি আমার ঘাড়



মটকাবে।"

বাঘ বলল, "না ভাই, বিশ্বাস কর, আমি কোনও উপকারীর অপকার করি না। মুক্তি পেলেই আমি জঙ্গলে চলে যাব, সেখানে অন্য কত ছাগল-ভেড়া আছে, হরিণ আছে—তাদের খাব। তোমাকে কিছুই বলব না, কিছুই করব না।"

বাঘের ছলনায় হরিণের বুদ্ধিসুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে গেল। সে ভালো মানুষের মতো কাজ করল। বাইরে থেকে কুটিরের দরজা খুলে দিল।

ব্যাস। আর যায় কোথায়! কুটির থেকে ছাড়া পেয়েই বাঘ হুংকার ছাড়ল। বলল, "টানা তিনদিন আমি না খেয়ে আছি। এখন তোকে খেয়ে আমার খিদের জ্বালা মেটাব।"

হরিণ দেখল, এ তো মহাবিপদ। কিন্তু, এই বিপদেও সে বুদ্ধি হারাল না।

সে বলল, "সে কী কথা! এইমাত্র তুমি প্রতিজ্ঞা করলে যে, ছাড়া পেলে আমাকে খাবে না। আর এখন উল্টো কথা বলছ? তোমাকে বিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি। তুমি কিন্তু অন্যায় কথা বলছ।"

বাঘ বলল, "আমার কাছে প্রতিজ্ঞা, বিশ্বাস, ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই। আমি তোকে খাবই খাব।"

হরিণ একটু ভেবে বলল, "ঠিক আছে এ বিষয়ে তিনজনকে জিজ্ঞাসা করব। তারা যদি তোমার হয়ে কথা বলে তবে তুমি আমাকে খাবে। আর যদি তারা আমার পক্ষে কথা বলে তবে আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।"

বাঘ হরিণের কথায় রাজি হয়ে গেল। বাঘ ও হরিণ এগিয়ে চলল। একটু যেতেই তারা একটা মস্তবড়ো বটগাছ দেখতে পেল। হরিণ বটগাছকে সব ঘটনা খুলে বলল। বটগাছ সব কথা শুনে খুব দুঃখ পেল। বটগাছ বলল, "ভাই হরিণ, তোমার মরণ আমি চাই না। কিন্তু, আমার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। আমি এত বড়ো বটগাছ। কত পথিক আমার ছায়ায় বিশ্রাম নেয়। ঝড়বাদলের সময় আমার আশ্রয়ে কতজন রক্ষা পায়। কত মানুষ আমার নিরাপদ কোলে এসে রাত কাটায়। তারাই আবার আমার শাখা-প্রশাখা নির্মমভাবে কেটে নেয়। আমার উপকারের কথা তারা কেউ মনে রাখে না।"

বটগাছের কথা শুনে বাঘ আনন্দে ডাক ছাড়ল — হালুম। ভয়ে হরিণের চোখমুখ শুকিয়ে গেল।

এবার পথ চলতে চলতে দেখা হল এক বুড়ি গাইগোরুর সঙ্গে। গোরু সব কথা শুনে 'হাম্বা হাম্বা' করে হেসে দিল। বলল, "কৃতজ্ঞতা বলে কিছুই নেই এই জগতে। ওই যে আমার বাছুরকে দেখছ, এর মধ্যেই ও ভালো ঘাস আর লতাপাতা খাওয়ার জন্য আমাকে গুঁতোয়। আরও বড়ো হলে আমাকে তাড়িয়েই দেবে মনে হয়। অথচ আমার দুধ খেয়ে ও বড়ো হয়েছে। উপকারের কথা কেউ মনে রাখে না—এটাই নিয়ম।"

এবার হরিণ আরও ভয় পেল। প্রায় সবাই বাঘের পক্ষে মতামত দিয়েছে। বাকি আর একজন।

আবার পথ চলছে বাঘ আর হরিণ। বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর দেখা হল এক খরগোশের সঙ্গে। সে-ই বেচারা হরিণের শেষ আশা। হরিণ সবকথা গুছিয়ে বলল খরগোশকে।

সবকিছু শোনার পর খরগোশ কী যেন ভাবল। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করল, "কুটিরের দরজা খোলা ছিল?"

বাঘ বলল, "না, বন্ধ ছিল।"

খরগোশ জিজ্ঞাসা করল, "দরজা বন্ধ, আর তোমরা দু'জন বাইরে ছিলে?"

এবার হরিণ বলল, "না ভাই, খরগোশ, বাঘমশাই ভিতরে ছিলেন।"

এত কিছু বলার পরও খরগোশ কিছুই বুঝতে পারল না দেখে বাঘমশাই ভীষণ রেগে গেলেন।

খরগোশ বলল, "কে কোথায় কেমন ছিল তা দেখিয়ে দিলে তবে আমি বুঝতে পারব এবং তারপর আমার মতামত জানাব।"

এবার সবাই গেল কাঠুরিয়ার কুটিরে। বাঘ একলাফে ঢুকে পড়ল কুটিরের মধ্যে। চিৎকার করে বলল, "দেখো ভাই খরগোশ, আমি এইভাবে এই কুটিরের মধ্যে বন্দি হয়ে ছিলাম।"

খরগোশ এমনই এক সুযোগ খুঁজছিল। একটুও দেরি না-করে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল খরগোশ।

অকৃতজ্ঞ বাঘ উচিত সাজা পেল। কথার দাম না-রাখার জন্য সে আটকে রইল সেই কুটিরে। আর খরগোশের বুদ্ধির তারিফ করতে করতে হরিণ চলল, সঙ্গে খরগোশ। তারপর একসময় ওরা মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

ছবি। প্রণবেশ মাইতি



দীননাথ সেন

তার কোনো তুলি ছিল না।
সে ছবি আঁকত।
কী দিয়ে আঁকত তবে?

পেনসিল দিয়ে?

না।

চক দিয়ে?

না।

সে ছবি আঁকত মাটিতে আঁচড় কেটে কেটে।

সে ছবি আঁকত পাহাড়ের গায়ে জলের দাগ বুলিয়ে বুলিয়ে।

সে ছবি আঁকত বালির উপর আঙুল দিয়ে।

ছবি ভালো হত?

ভালো আর কী? এটা সেটা। গাছের মতো কোনোটা। মাছের মতো কোনোটা। কোনোটা চাঁদের মতো। নৌকার মতো। মাথার মতো। পাতার মতো সব হিজিবিজি।

সে ভাবত ওগুলো তার ছবি। ছবি আঁকতে ভালো লাগত খুব। সে ভাবত, আমার যদি একটা তুলি থাকত।

ভাবত, তা হলে ছবি আঁকতাম। বড়ো বড়ো ছবি। সুন্দর সুন্দর ছবি।

তার নাম কী?

তার নাম মা লিয়াং। আমরা তাকে ডাকব লিয়াং।

লিয়াং ছোটো একটি ছেলে।

কোথায় থাকত সে?

সেটা বলছি শোনো।

লিয়াং গ্রামের ছেলে। তাদের গ্রামটা ছিল একটা পাহাড়ের কোলে। গরিব ঘরের ছেলে লিয়াং।

ও থাকে একটি কুঁড়েঘরে। লিয়াং একা। তার মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই। লোকের বাড়ি ফাইফরমাশ খাটে। কোনোমতে চলে যায়।

এত অভাব তার। তবু তার ভাবনা যায় না। যদি একটা তুলি থাকত তার।

পড়াশোনায় মন ছিল না লিয়াংয়ের। ছবি আঁকার দিকেই তার ঝোঁক। ছবি আঁকতেই ভালোবাসে সে। যা দেখে তাই আঁকে। সাপ, ব্যাং, গাছ নদী, চাঁদ, তারা যেমন দেখে তেমনি আঁকে।

সব কি আর ঠিক ঠিক হয়?

তাতে কী?

ছবি সে এঁকে যায়। যা পারে, যতটুকু পারে।

একদিন সেই বুড়োর সঙ্গে দেখা।

কোন্ বুড়ো? কোথায় দেখা হল?

বলছি।

লিয়াং সেদিন নদীর চরে বসে ছিল। বসে বসে বালির উপর আঁকিবুকি করছিল। আঁকতে আঁকতে এক সময় বালির উপরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল লিয়াং।

একটা বুড়ো।

বুড়োটাকে স্বপ্নেই দেখছিল। দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো। মুখভর্তি লম্বা লম্বা দাড়ি। ধবধবে সাদা। লম্বা চওড়া চেহারা। টিকালো নাক। গায়ের রং ফরসা। মাথাজোড়া টাক।

লিয়াংদের গাঁয়ে তো কত বুড়োমানুষ আছে। তারা কেউ এই বুড়োটার মতো নয়। একেবারেই নয়। লিয়াং অবাক হয়ে তাকে দেখে।

তুমি কে গা? তোমাকে তো দেখিনি আগে।

লিয়াংয়ের কথা শুনে বুড়ো একগাল হাসে।

আমি তোমার মনের কথা জানি।

কী কথা বলো তো?

তোমার আঁকার তুলি নেই, তাই তোমার মন খারাপ।

হ্যাঁ। আমার যদি একটা তুলি থাকত আমি কত কিছু আঁকতে পারতাম।

আমি তোমাকে একটা তুলি দিতে এসেছি। এটা দিয়ে তুমি যা খুশি যেমন খুশি আঁকতে পারবে। কেমন, খুশি তো?

হ্যাঁ। এটা পেয়ে আমি ভীষণ খুশি হলাম।

তবে একটা কথা লিয়াং।

কী কথা বলো।

এটা জাদুতুলি। খুব যত্নে রাখবে। যেখানে সেখানে ফেলে রাখবে না।

ঠিক আছে।

আর একটা কথা মনে রেখো।

বলো।

খুব দরকার হলে তবেই তুলিটা কাজে লাগাবে।

আচ্ছা। মনে রাখব।

এই নাও।

লিয়াং বুড়োর হাত থেকে তুলিটা নিল। তুলিটা মাথায় ঠেকাল।

তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে।

তুলিটা বেশি একটা বড়ো নয়।

তুলিটা একটু মোটা আর ভারী।

তুলিটার রং সোনালি।

তুলিটা ঝকঝক করছে।

আঃ! কী সুন্দর তুলি।

বুড়ো, তুমি খুব ভালো। তোমার তুলিটা খুব ভালো। আমি অনেক ছবি আঁকব এটা দিয়ে। অনেক ছবি।

ঘুম ভেঙে গেল লিয়াংয়ের। চোখ মেলে দেখে, আরে!

কোথায় বুড়ো লোকটা? এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল লিয়াং।

আশেপাশে দূরেকাছে ভালো করে দেখে। কোথায় সেই বুড়োটা? কোনো মানুষজন দেখা যাচ্ছে না ধারেকাছে। অবাক কাণ্ড!

আর, তুলিটা?

তুলিটা তো হাতে ধরাই আছে। তাইতে আরও অবাক হয়ে যায় লিয়াং।

তবে কি এটা স্বপ্ন নয়?

তবে কি সত্যি কেউ এসেছিল? ঘুমের মধ্যে তার হাতে তুলিটা দিয়েছে? তারপর আবার চলে গেছে?

লিয়াং একবার নদীর দিকে তাকায়, একবার হাতের তুলিটা দেখে। ঘুমের ঘোরে যেমনটি



দেখেছিল ঠিক তেমনটি।

তেমনি ভারী তুলিটা।

তেমনি সোনালি রং।

তেমনি ঝকঝকে।

লিয়াং এবার করল কী জানো?

কী করল, লিয়াং কী করল?

লিয়াং তার নতুন তুলি দিয়ে একটা পাখির ছবি আঁকল।

অমনি ছবির পাখিটা জ্যান্ত পাখি হয়ে গেল!

পাখিটা ডানা মেলে উড়ে গেল।

পাখিটা দূরে একটা গাছের ডালে গিয়ে বসল।

পাখিটা মিষ্টি সুরে গান গাইতে লাগল।

লিয়াং তো অবাক!

লিয়াং এবার আঁকল একটা মাছ। মাছটাও জ্যান্ত হয়ে গেল।

মাছটা ল্যাজ নাড়তে লাগল।

মাছটা লাফ দিয়ে পড়ল জলে।

মাছটা মনের সুখে সাঁতার কাটতে লাগল।

লিয়াং তার জাদুতুলি নিয়ে ফিরে এল বাড়িতে।

এদিকে তার ছবির খবর ছড়িয়ে পড়ল।

চারিদিকে জানাজানি হয়ে গেল, লিয়াংয়ের ছবি জ্যান্ত হয়ে যায়।

কথাটা গাঁয়ের জমিদারের কানেও গেল।

জমিদার বলল, তাই নাকি? এমন কথা তো জীবনে শুনিনি। তাও আবার হয় নাকি?

সবাই বলল, হয় মহারাজ। লিয়াংয়ের ছবি গান গায়, ওড়ে, লাফায়, সাঁতার কাটে।

হুঁ। জমিদার ভাবল, তাই যদি সত্যি হয় তবে তো আমার একটা কাজ হতে পারে।

বলুন জমিদারমশাই, আপনার কাজটা কী?

বুঝলে, আমার বাড়ি পাহারার জন্যে একটা বড়োসড়ো কুকুর দরকার। অমন একটা কুকুর কি—? আচ্ছা, লিয়াং কি পারবে এমন একটা ছবি আঁকতে?

পারবে কর্তা, লিয়াং ঠিক পারবে।

আপনি ওকে একবার ডেকে পাঠান কর্তা।

জমিদারের ডাকে লিয়াং এসে হাজির হল জমিদারবাড়িতে।

কী হে, পারবে তো বেশ বড়ো একটা কুকুর করে দিতে?

কুকুরের ছবি আঁকতে তো পারি। তবে—

তবে? তবে আবার কী?

না, আমি ভাবছি, অত বড়ো কুকুর যদি কারোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে তো বিপদ হবে।

বিপদ হবে কি হবে না সেটা আমি বুঝব।

তা ছাড়া এত বড়ো কুকুর যদি ঘেউঘেউ করতে থাকে তো গায়ের লোক খেপে যাবে।

দেখো লিয়াং, আমি গাঁয়ের জমিদার। গাঁয়ের লোকের ভালোখারাপ আমি দেখব।

না না জমিদারমশাই। এটা কিছুতেই ভালো হবে না। আপনি আমায় মাপ করবেন।

জমিদার তো রেগে আগুন।

কী? আমার হুকুম মানবি না? এত বড়ো সাহস? এই, কে আছিস। একে নিয়ে ঘরের মধ্যে আটকে রাখ্। খাবারদাবার কিচ্ছু দিবি না।

জমিদারের পেয়াদা লিয়াংকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটা কুঠুরিতে বেঁধে রাখল।

থাকুক ব্যাটা ওখানে। কদিন আর উপোস করে থাকবে? দুদিন পরেই খিদের জ্বালায় ছটফট করবে। তখন কুকুরের ছবি ওকে আঁকতেই হবে।

দুদিন কী, সাত দিন কেটে গেল।

এই, যা তো, ছেলেটা নিশ্চয় কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে, দেখে আয়।

না কর্তা, ঘরের ভেতর থেকে কোনো আওয়াজই আসছে না। কর্তা মনে হয় খাবার না পেয়ে, জল না পেয়ে লিয়াং বোধ হয় মরে পড়ে আছে।

দেখি চল্ তো।

জমিদার দরজা খুলে অবাক।

কেন? অবাক হল কেন?

ওই যে জাদুতুলি।

লিয়াং আঁকল থালায় ভাত, বটিতে মাছ, তরকারি।

আর আঁকল একটা মেয়ে।

ব্যস্। ওসব ছবি জ্যান্ত হয়ে উঠেছে।

আর জমিদার তখন কী করল?

ওসব দেখে জমিদার ভয়ে কাঁপতে থাকে। দরদর করে ঘাম ঝরতে থাকে। সে ভাবল এসব ভূতুড়ে কাণ্ড। লিয়াং মরে ভূত হয়ে গেছে। সেই ভূতই এসব করেছে।

জমিদার বেহুঁশ হয়ে ধপ করে পড়ে গেল।

একটা ভারী কিছু পড়ার আওয়াজ শুনে লিয়াং দেখল কুঠুরির দরজা খোলা। জমিদারের দেহ লুটিয়ে পড়ে আছে।

অমনি লিয়াং একটা ঘোড়ার ছবি আঁকল। আর আঁকল চাবুক।

ছবি শেষ হতেই ঘোড়া লাফিয়ে উঠল। লিয়াং তার পিঠে চেপে বসল। চাবুক মারতেই ঘোড়া তিরের বেগে ছুটতে থাকে।

লিয়াংকে পিঠে নিয়ে ঘোড়া পেরিয়ে যায় অনেক গাঁ, অনেক মাঠ। পাহাড়, নদী, বন।

লিয়াং এসে পৌঁছোয় এক রাজার দেশে।

তারপর?

তারপর লিয়াং ঠিক করল এখানেই সে ঘর বাঁধবে।

লিয়াং একটা সুন্দর বাড়ির ছবি আঁকল। বাড়ি হল।

লিয়াং ময়না আঁকে, মুনিয়া আঁকে, টিয়া আঁকে। ওরা শিস দেয়, দোল খায়।

লিয়াং তার ছবির মতো সুন্দর বাড়িটায় থাকে।

লিয়াং নানা জিনিসের ছবি আঁকে। ছবিগুলো সত্যিকারের জিনিস হয়। লিয়াং সেগুলো বিক্রি করে।

তার দিন কেটে যায় সুখে।

লিয়াংয়ের গল্প এখানেই শেষ?

না—না। গল্প এখনও অনেক বাকি।......

শোনোই না।

সেই দেশের রাজা ঠিক জেনে গেলেন লিয়াংয়ের কথা, তার জাদুতুলির কথা।

তাই নাকি? তাই নাকি?

হ্যাঁ মহারাজ। ছেলেটি দেখতে অতি সাধারণ। কারো সাতেপাঁচে থাকে না। ও আপন মনে

শুধু ছবি আঁকে।

মহারাজ, ওর যে জাদুতুলি আছে, তা দিয়ে সে সব জ্যান্ত ছবি আঁকে। আপনি দেখলে অবাক না হয়ে পারবেন না।

সেদিন থেকে রাজার ঘুম নেই।

কেন? কেন?

মাঝে মাঝেই মনে জেগে ওঠে একটা ইচ্ছে।

ইচ্ছেটা কী?

ওই জাদুতুলিটা আমার চাই।

একদিন সেপাইকে ডেকে বললেন, এই যা তো, ওই লিয়াং ছেলেটাকে ধরে নিয়ে আয়।

হাতে শেকল পরিয়ে নিয়ে আসবি।

রাজার সেপাই গিয়ে পাকড়াও করল লিয়াংকে।

চলো। আমাদের সাথে যেতে হবে।

কেন?

রাজার হুকুম।

রাজার কাছে কেন?

তা জানি না। চলো।

এই যে রাজামশাই সেই ছেলে। লিয়াং।

ও। তুমিই লিয়াং?

হ্যাঁ রাজামশাই। আমার নাম মা লিয়াং।

তোর তুলিটা আমায় দিয়ে দে।

তুলি—মানে আমার তুলি—

দে বলছি।

রাজা তার তুলিটা কেড়ে নেয়। সেপাইকে হুকুম করে—ওর হাতে শেকল পরিয়ে দে।

তুলি দিয়ে রাজা কী করলেন? নিজে ছবি আঁকলেন?

হ্যাঁ। উনি একটা চিল আঁকলেন। চিলটা অমনি ডানা মেলে একপাক উড়ে এসে রাজাকে ঠোকর মারতে থাকে।

ঠোকর পড়ছে নাকেমুখে।

রাজার নাকমুখ থেকে রক্ত ঝরতে থাকে।

রাজার লোক চিলটাকে তাড়া করল, চিলটা উড়ে গেল।

তারপর?

তারপর রাজা আর একদিন আঁকলেন সাপের ছবি। সাপটা ফণা তুলে তেড়ে এল রাজার দিকে। ভয়ে রাজার প্রাণ উড়ে গেল।

বাঁচাও। বাঁচা। সাপে কামড়ালে আমি বাঁচব না।

রাজার লোক সাপটাকে তাড়া করল।

সাপটা ছুটে পালাল।

তারপরও রাজা ছবি আঁকলেন?

না। ছবিটবি আর আঁকলেন না। জাদুতুলির ছবি! কী ভয়ানক!

বরং ছবি আঁকুক লিয়াং। তবে তাঁর হুকুম মতো।

এই, ছেলেটাকে নিয়ে আয়।

ওরা লিয়াংকে তাঁর সামনে এনে হাজির করল।

ওর হাতের শেকল খুলে দে।

লিয়াং তার হাত দুটোর দিকে তাকায়। শেকলের দাগ পড়ে গেছে হাতে।

এই নে তোর তুলি। যদি আমার কথামতো ছবি আঁকিস তাহলে আর তোকে শেকল পরাব না। নয়তো—।

লিয়াং বলল, বেশ, তাই হবে। কী আঁকতে হবে বলুন।

বনজঙ্গল আঁক। না না। দরকার নেই। দলে দলে বুনো জানোয়ারেরা ছুটে এলে মহাবিপদ।

তুই বরং একটা সাগর আঁক।

লিয়াং সাগর আঁকল। বিরাট বিরাট ঢেউ উঠতে থাকে সাগরে।

লিয়াং নৌকা আঁকল।

সাগরের নীল জলে সাদা পাল তুলে নৌকা দুলতে থাকে।

এই নৌকায় করে আমি বেড়াব।

রাজা নৌকায় উঠে বসলেন।

কই, নৌকা তো চলছে না। হাওয়া নেই। হাওয়া এঁকে দাও।

লিয়াং জাদুতুলি দিয়ে আঁকল হাওয়া। ঝোড়ো হাওয়া।

প্রবল ঝড় উঠল। উথালপাথাল হল সাগর। নৌকো ডুবুডুবু।

রাজা চেঁচিয়ে উঠলেন, থামাও, থামাও। ঝড় থামাও। ঢেউ থামাও।

লিয়াং রাজার হুকুম মানল না।

রাজা তাকে শেকল পরিয়েছিল।

রাজা তার তুলি কেড়ে নিয়েছিল।

ঝড় উঠুক। নৌকা ডুবুক!

বাঁচাও। বাঁচাও!

ঝড়ের আওয়াজে রাজার চিৎকার কানেই এল না কারও।

নৌকা তলিয়ে গেল।

রাজাও তলিয়ে গেলেন চিরতরে।

আর লিয়াং? তার জাদুতুলি?

কেউ জানে না তার কী হল।

ছবি। সমীর সরকার



আয়নার কাণ্ড

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

অজপাড়াগাঁয়ে তাদের বাড়ি। সে বাড়িতে কেবল বাপ আর ছেলে। এ দুইটি প্রাণী ছাড়া সে সংসারে আর কেউ ছিল না।

ছেলেটি যখন খুব কচি তখন থেকে তার মা নেই। বাপ কোলে-পিঠে করে ছেলেটিকে মানুষ করেন—নিজের হাতে খাওয়ান দাওয়ান। ছেলেটি তাই বাপ ছাড়া আর কাউকে জানে না—বাবা না হলে তার এক দণ্ড চলে না।

ছেলে ছাড়া বাপেরও আর কেউ নেই। মায়া বলো, স্নেহ ভালোবাসা বলো, যা কিছু প্রাণের জিনিস তার সমস্তটুকু ছেলেটিকে দিয়েই তিনি আনন্দ পান। ছেলে তাঁর নয়নের মণি, আঁধার ঘরের মানিক, অন্ধের নড়ি। সে ছেলে চোখের আড়াল হলে বাপ পলকে প্রলয় দেখেন।

ছেলে বড়ো হতে লাগল, বাপ বুড়ো হতে থাকলেন। বাপের তখন ভাবনা হল—আমি মরে গেলে ছেলের কী দশা হবে? কী সুখে সে ঘরে থাকবে?

বাপ ছেলেকে ডেকে বললেন, বাবা, তুমি বিয়ে করো।

ছেলে বললে, কেন বাবা, আমরা দুটিতে তো বেশ আছি—মাঝের থেকে আর একজনকে

আনব কেন?

বাবা বললেন, না, বাবা তুমি বুঝছ না। আমি আজ আছি, কাল নেই। তোমাকে সংসারী দেখে মরতে পারলে আমি সুখে মরব; বিয়ে না করলে কি তোমার চলে?

বাবা বলছেন, তাঁর কথা কখনো অমান্য করেনি। ছেলে রাজি হল। একটি টুকটুকে কনে দেখে বাপ ছেলের বিয়ে দিলেন।

তারপরেই বাপের শরীর একেবারে ভেঙে পড়ল! বিছানা থেকে উঠতে পারেন না— নানারকমের রোগ এসে বুড়োর শরীর ছেঁকে ধরলে।

ছেলে আহার নিদ্রা ভুলে সেবাশুশ্রূষা করলে, কিন্তু বাপকে তাতে রাখতে পারলে না। যে বাপকে সে একদন্ড না দেখে থাকতে পারত না সেই বাপ তাকে ছেড়ে জন্মের মতো চলে গেলেন।

ছেলেটি শোকে বড়ো কাতর হয়ে পড়ল। তার স্ত্রী তাকে কত সান্ত্বনা দিয়ে, কত হেসে হেসে কথা কয়, কিন্তু মন থেকে শোক কিছুতে যায় না।

ছেলেটি সমস্ত দিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে, থেকে থেকে বাপের কথা মনে পড়ে, চোখে জল আসে। বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীর সঙ্গে কথা কয়, গপ্পো করে, তাতে মনে সুখ পায় না, বাপের জন্য প্রাণটা কেবলই কাঁদতে থাকে।

শোক যখন কিছুতে ভুলতে পারলে না, তখন ছেলেটি মনে মনে ভাবল, যাই একবার দেশবিদেশ ঘুরে আসি, নানান জিনিস দেখে যদি বাপের কথা ভুলতে পারি।

কিয়োটো শহর, ভারী আশ্চর্য শহর। দেশবিদেশ থেকে লোক সে শহর দেখতে আসে। সে শহরে নাচ-তামাশা, দেখবার জিনিস ঢের আছে। ছেলেটি মনে করল সেইখানেই যায়।

কিয়োটো শহরে যা কিছু দেখবার জিনিস আছে, সে সমস্ত দেখা শেষ করে ছেলেটি রাস্তা দিয়ে চলেছে। রাস্তা লোকে লোকারণ্য, দোকানপাটে ভরা, গাড়ি পালকি পিঁপড়ের সারের মতো চলেছে। এইসব অবাক হয়ে দেখতে দেখতে সে যাচ্ছে।

সামনে একখানা মনোহারী দোকান পড়ল। দোকানখানা কতরকম-বেরকমের মন-ভোলানো জিনিসে ঠাসা। তার একটা জিনিসও সে কখনো চক্ষে দেখেনি, সেসব জিনিসের একটিরও দাম সে জানে না।

সেই দোকানখানির সামনে দাঁড়িয়ে এ জিনিস, সে জিনিস দেখছে আর মনে মনে তারিফ করছে, এমন সময় হঠাৎ দেয়ালে টাঙানো একখানা আয়নার দিকে তার নজর পড়ল। আয়নাখানার উপর রোদ পড়ে সেটা ঝকঝক করছিল। সে তাইতে ভারী আশ্চর্য হয়ে সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল। আয়না সে কখনো দেখেনি, আয়না কী কাজে লাগে তাও সে জানে না।

আয়নার দিকে চাইতেই সে চমকে উঠল। আয়নার ভিতর একটা মানুষ রয়েছে না? তাই তো! মানুষই তো বটে! সে চেনে চেনে করছে যে! চেনেই তো! খুব ভালো করে দেখে সে—বাবা! বলে চেঁচিয়ে উঠল। পাশের লোকগুলো অবাক হয়ে তার দিকে চাইতে সে একটু



থতমত খেয়ে গেল।

আয়নার দিকে যতই চায়, তার মন ততই আনন্দে ভরে ওঠে। বাপের সে রোগা চেহারা আর নেই। এখন মোটাসোটা হয়ে উঠেছেন। শুকনো মুখ, তোবড়া গাল বেশ নিরেট গোলগাল হয়ে উঠেছে। বাপের এই চেহারা সে খুব ছেলেবেলায় দেখেছিল বলে একটু একটু মনে পড়তে লাগল। বাপকে এইরকম দেখে তখনই তার শোক মন থেকে চলে গেল।

আয়নাখানি তাকে নিতেই হবে। বাপকে যখন একবার পেয়েছে, সে কি আর ছাড়তে পারে? তাড়াতাড়ি সেখানি দেওয়াল থেকে খুলে নিয়ে দোকানদারকে দাম জিজ্ঞেস করল।

দোকানদার বলল, দু-আনা।

অ্যাঁ! এত সস্তা! সে ভেবেছিল না জানি কত টাকাই দিতে হবে—হয়তো ঘরদুয়ার বিক্রি করে বাবাকে ঘরে আনতে হবে! দু-আনা শুনে ভারী আনন্দ হল। আর কথা না বলে সে কোমরের গেঁজে থেকে দু-আনা বার করে দোকানদারকে দিয়ে দিল।

আয়নাখানি সাতপুরু কাপড়ে জড়িয়ে তোরঙ্গের ভিতর পুরে সে মনে করল—এইবার যাই দেশে—আর কেন? শহরের অনেক জিনিস তখনও দেখা বাকি, কিন্তু আর কিছু

দেখবার তার সাধ নেই;—দেশে ফিরতে পারলেই সে যেন বাঁচে।

পাছে কেউ নিয়ে নেয়, এই ভয়ে যে তোরঙ্গটিতে আয়নাখানি রেখেছিল সেটি কাউকে ছুঁতে পর্যন্ত দিল না; নিজে বুকে-পিঠে-মাথায় করে সারা পথটা বয়ে নিয়ে গেল।

দেশে ফিরে আয়নাখানির কথা কাউকে বলল না। পাছে কেউ দেখতে চায়, পাছে সেখানি কোনোরকমে নষ্ট হয়ে যায়—ভয়ে ভয়ে, খুব যত্নে যক্ষের টাকার মতো লুকিয়ে রেখে দিল। স্ত্রীকে পর্যন্ত জানতে দিল না।

রোজ সে আয়নাখানি সেই লুকোনো জায়গা থেকে বার করে—আয়নার দিকে চাইলেই বাপকে দেখতে পায়, মাটিতে পড়ে তাঁকে প্রণাম করে, তাঁর সঙ্গে আরও কত কথা কয়। কাজে বেরোবার সময় হলে বাপকে বলে, বাবা, আমি এখন কাজে যাই? ফিরে এসে আবার তোমার সঙ্গে দেখা করব।

স্ত্রী ভাবলে, এ কী আশ্চর্য! ঘরে কাউকে দেখিনে অথচ স্বামী রোজ রোজ কার সঙ্গে অতক্ষণ ধরে ফিস ফিস করে কথা কন!

কিছুদিন এমনি শুনতে শুনতে মনে কেমন একটা সন্দেহ হল। তখন সে স্বামীকে একদিন জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ গা! ঘরে খিল দিয়ে রোজ দুবেলা কার সঙ্গে কথা কও?

স্বামী মনে করল, এই রে, সব বুঝি ফাঁস হয়ে যাবে! বাপকে আর রাখতে পারলুম না। থতমত খেয়ে সে কথা পর্যন্ত কইতে পারল না।

স্বামী কথার জবাব দেয় না দেখে স্ত্রীর মনে আরও সন্দেহ হল। স্বামীকে সে বারবার জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কোনো উত্তর পায় না। তখন সে রেগে উঠে বলল—বলো বলছি, নইলে ভালো হবে না!

স্বামী তখন কী করে, সব কথা খুলে বলতে হল। সে বলল, আমি যখন কিয়োটো শহরে বেড়াতে যাই তখন রাস্তায় এক দোকানে একখানা চকচকে জিনিসের ভিতরে বাবাকে হঠাৎ দেখতে পাই। সেই জিনিসটা কিনে এনেছি। বাবা তার ভিতরে আছেন। রোজ তাঁরই সঙ্গে কথা কই। তোমাকে এ কথা জানাইনি, পাছে গোলমাল হলে বাবার কিছু মন্দ হয়।

স্ত্রীর কাছে এ কথাটা কেমন কেমন ঠেকল। মরা মানুষ কি ফিরে আসে? যা হোক, সে তখন চুপ করে গেল। মনে ভাবল, এর ভিতর একটা কিছু মজা আছে।

তারপর স্বামী যখন কাজে বেরিয়ে গেল, তখন আসল কথাটা কী—তাই জানবার জন্যে স্বামী যে ঘরে লুকিয়ে কথা কয়, সে সেই ঘরে গেল।

এদিক ওদিক খুঁজে, এ জিনিস সে জিনিস নেড়ে আশ্চর্যরকমের কিছুই তার নজরে পড়ল না। খোঁজা শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, এমন সময় কাপড়-জড়ানো একটা কাঠের বাক্সো দেখতে পেল। সেই বাক্সোটা দেখেই তার মনে হল—এইবার পাওয়া গেছে, দেখি এটা খুলে ভিতরে কী আছে!

বাক্সোটা খোলাবামাত্রই কাঠ দিয়ে বাঁধানো একটা চকচকে জিনিস তার নজরে পড়ল, সেইটে দেখে মনে করলে স্বামী বোধ হয় এইটের কথাই বলেছেন।

কই দেখি, কেমন এর ভিতর ওর বাবা আছেন—এই বলে আয়নাটা তুলে নিয়ে মুখের সামনে ধরলে। ধরতেই প্রথমে চমকে উঠল।

আবার ভালো করে দেখল। মনে একটা ভারী অভিমান এল। স্বামী তাহলে তাকে মিথ্যে বলে ভুলিয়েছে! যতবার আয়নার দিকে চায় ততবারই একটি পরমা সুন্দরী মেয়ের মুখের ছবি তার উপরে ফুটে ওঠে। যতই দেখে, অভিমান গিয়ে রাগ ততই বাড়তে থাকে।

ঠিক এমনি সময় স্বামী বাড়িতে ফিরল। আর পায় কে? রাগ উথলে উঠল। স্বামীকে সে চেঁচিয়ে বলল, আমার কাছে লুকোনো! মিথ্যা বলে আমায় ঠকাবার চেষ্টা!

স্বামী বলল, রাগছ কেন, কী হয়েছে?

স্ত্রী তখন নিজের মুখের সামনে আয়নাখানা ধরে বলল, ইনি তোমার বাবা?

স্বামী। বাবাই তো!

স্ত্রী। আমি কি কানা? দেখতে পাই না? বাবা!

স্বামী। নিশ্চয় বাবা!

স্ত্রী। কক্ষনো না!

স্বামী। আমি বলছি, হ্যাঁ!

স্ত্রী। আমি বলছি, না!

স্বামী। আমি কি মিথ্যা বলছি?

স্ত্রী। না, ভারী সত্যিবাদী! এই পেতনি মতো মেয়েটার সঙ্গে রোজ লুকিয়ে কথা কওয়া হয়, আর আমায় বলা হচ্ছে ইনি ওঁর বাবা!

স্বামী বলল, এ তুমি কী বলছ? আমি কিছু বুঝতে পারছি না!

স্ত্রী বলল, আমি ঠিক বলছি! খুব বুঝতে পারছ!

এইরকমে একটা তুমুল ঝগড়া বেধে উঠল। চ্যাঁচামেচি শুনে পাড়ার লোকজন সেখানে ছুটে এল। ছেলেটি তাদের আসল কথাটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তার স্ত্রী প্রত্যেকবার বাধা দিয়ে বলতে লাগল, মিথ্যাবাদীর কথায় কেউ বিশ্বাস কোরো না—আমাকে মিথ্যা কথা বলে ভুলিয়েছে, তোমাদের ভোলাবার চেষ্টা করছে! আমি কি কানা? আমি কি চোখে দেখতে পাই না? আমি স্পষ্ট দেখেছি সে ওর বাপ নয়। একটা কালো কিস্কিন্দি মেয়ে।

স্বামী অবাক হয়ে বলল, এ আমি কিছু বুঝতে পারছি না—স্ত্রী পাগল হল নাকি! আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি তিনি আমার বাবা।

স্ত্রী আরও চটে উঠে বলল, বাবা! বাবাই বটে! আমি কি চোখের মাথা খেয়েছি?

ঝগড়া ক্রমেই বেড়ে উঠেছে দেখে একজন প্রতিবেশী এগিয়ে এসে বলল, দেখো, এরকম করলে ঝগড়া কোনোকালে শেষ হবে না। এক কাজ করো—ওপাড়ার ওই ভাঙা মন্দিরে যে ভৈরবী ঠাকরুন আছেন তাঁর কাছে যাও—জ্ঞানে বুদ্ধিতে তাঁর সমান কেউ নেই—তাঁকে গিয়ে সব খুলে বলো। তিনি ধ্যানে বসে আসল কথাটা কী তা ঠিক বলে দেবেন।

তাই ঠিক হল। স্বামী ও স্ত্রী আয়নাখানি নিয়ে সেই ভাঙা মন্দিরে ভৈরবীর কাছে গেল।

ভৈরবী ঠাকরুন আদর করে বাঘছালের উপর তাদের বসালেন। কুশল জিজ্ঞেস করে বললেন, আমার কাছে কী মনে করে, বাছারা?

ছেলেটি তখন মাটিতে পড়ে ভৈরবীকে প্রণাম করে জোড়হাত করে বলল, ঠাকরুন! আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে, যদি শোনেন তো বলি।

ভৈরবী বললেন, বলো না বাছা! শুনব বৈকি!

ছেলেটি বলল, স্ত্রী আমার উপর মিছে রাগ করেছে, আপনি ওকে ঠান্ডা হতে আজ্ঞা করুন।

ভৈরবী বললেন, ব্যাপারটা কী খুলে বলো, সব কথা শুনি।

ছেলেটি তখন বলল, আমার বাবা মারা যাবার পর আমি তাঁর শোকে বড়ো কাতর হয়ে পড়েছিলুম। তাই সে শোক ভোলবার জন্যে কিয়োটো শহরে বেড়াতে যাই। শহরের এক দোকানে একটা জিনিসের ভিতর বাবাকে দেখতে পেয়ে সে জিনিসটা আমি কিনে আনি। বাবা তারই ভিতর আছেন, তাঁর সঙ্গে রোজ কথা কই। স্ত্রী আজ সে জিনিসটা দেখতে পেয়ে বলছেন তাতে আমার বাবা নেই—আমি একটা কালো কিস্কিন্দি মেয়ে পুষে রেখেছি। এই নিয়ে ঝগড়া বেধেছে—ও বলে সে একটা মেয়ে, আমি বলি তিনি আমার বাবা।

ভৈরবী বললেন, কই, জিনিসটা দেখি!

তখন ছেলেটি আয়নাখানি ভৈরবীর হাতে দিল। ভৈরবী আয়না কখনো দেখেননি। মুখের সামনে আয়নাখানি ধরতে তিনি প্রথমে চমকে উঠলেন।

তারপর ভালো করে চেয়ে দেখে বললেন, ঠিক হয়েছে! আর ভাবনা নেই! তোমাদের দুজনের ঝগড়া দেখে মেয়েটি ভৈরবী হয়ে গেছে ; গেরুয়া পরেছে—ছাই মেখেছে—সংসারে এর আর মতিগতি নেই। ভালোই হয়েছে, এ মন্দিরে আমার দোসর কেউ নেই—এ আমার কাছেই থাক! তোমরা ঘরে ফিরে যাও।

ছেলেটি এই কথা শুনে অবাক হয়ে রইল। সে নিজের চোখে তার বাপকে দেখেছে তা তো ভুল হবার নয়! ভৈরবী ঠাকরুনও তো কখনো মিথ্যা বলবেন না! —এ তবে কী হল? ব্যাপারটা সে বুঝতে পারল না।

তার স্ত্রীর ভারী আমোদ হল—কালো কিস্কিন্দি মেয়েটা যে ভৈরবী হয়ে গেছে তাতে তার আনন্দ ধরছিল না।

কিন্তু ছেলেটির ভারী দুঃখ—হারানো বাপকে পেয়েও আবার হারাতে হল।

ছবি। সুব্রত মাজী



বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

দুজনেই রাজার ছেলে। রাজপুত্রের মতোই তাদের রূপ। শরীরে যেমন বল, অন্তরে তেমনি সাহস। রাজপ্রাসাদের স্বর্ণ সিংহাসনেই তাদের মানায়—কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় তারা নির্বাসিত। এখন বিজন বনের পর্ণকুটিরে তাদের বাস। সে কুটিরের পিছনে বিরাট পর্বত, সামনে অন্তহীন সমুদ্র।

বড়োর নাম হিনোদে। দেখলেই বোঝা যায়—বীরপুরুষ বটে। বীরত্ব ভালো—কিন্তু অহংকার তো ভালো নয়। হিনোদে ছিল একটু অহংকারী। শুধু তাই নয়, তার প্রকৃতিটাই ছিল একটু হিংসুটে রকমের।

আইরিহি ছোটো। সেও ভীরু নয়, কিন্তু মনটি তার কোমল। সে দাদাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। দাদা রাগ করলে সে কখনও উলটে রাগ করত না। সে জানত রাগ দিয়ে রাগ জয় করা যায় না।

পুবের দিগন্ত মিশেছে সাগরের নীল জলে, আকাশও নীল, জলও নীল কিন্তু প্রভাতের আলোয় তাদের মিলনভূমি হয়ে ওঠে রক্তবর্ণ। দিগন্তের এই লাল আলো ঠিকরে গিয়ে পড়ে তাদের পাতার ঘরে। পাতার ফাঁক দিয়ে গিয়ে পড়ে তাদের চোখে মুখে, পড়ে তাদের

সর্বাঙ্গে। আর পড়ে ওই কালো পাহাড়ের চূড়ায়। পাখিরা ধরে গান। অমনি ভেঙে যায় তাদের ঘুম। পাখিরা নীড় ছাড়ে, তারাও কুটির ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

দুজনের দুই পেশা। হিনোদে ধরে মাছ—জালে নয় বঁড়শিতে। কত রকমের মাছ যে তার হাতে পড়ে তা আর বলব কী। সমুদ্রে তো মাছের অভাব নেই। করাতমাছ, হাঙরমাছ, বোয়ালমাছ—তা ছাড়া আরও কত মাছ। সব মাছের নাম বলবে কে। জানেই বা কয়জন? কোন মাছটার ওজন একমণ, কোনটার দু মণ, কোনটা বা তার চেয়েও বেশি।

আইরিহির সম্বল তিরধনুক। বাঘ ভালুক তাকে ভয় করে। পাগলা হাতি তাকে দেখলে দেয় পিঠটান। তার হাতে নিষ্কৃতি নেই কারও। অমন যে সিংহ—ভালুক হাতি সকলেরই যে রাজা—আইরিহির সামনে পড়লে তাকেও আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হয় না। এমনি তার সাহস, এমনি তার শক্তি।

পুবের সূর্য যখন উঁচু পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়েন, তখন আইরিহি ফেরে পাতার ঘরে। কাঁধে তার হরিণ কি শশক। বাঘ ভালুক যা মারে তা বনের মধ্যেই পড়ে থাকে—এনে কী হবে? সেগুলো তো আর খাওয়া যায় না। ওদিক থেকে হিনোদেও ফেরে মাছ নিয়ে। সব মাছ নয়, যে সব মাছ খেতে ভালো সেগুলোই আনে; বাকি সব পড়ে থাকে সমুদ্রের ধারে বালির উপরেই।

একদিন এক খেয়াল হল আইরিহির। সে বললে, দাদা, বনেজঙ্গলে ঘুরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় লাফালাফি করে আর ভালো লাগে না। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, তুমি একদিন তিরধনুক নিয়ে বনে যাও, আর আমি যাই তোমার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে। মধ্যে মধ্যে হাত বদলালে কাজ আর এত একঘেয়ে লাগে না—না কি বল?

হিনোদে বললে—ঠিক বলেছিস আইরিহি। তা বেশ, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমার কাছে বঁড়শিও যা তিরধনুকও তাই। বঁড়শিতে যেমন মাছ পড়ে তিরধনুকেও তেমনি শিকার পড়বে। তুই কি না ছেলেমানুষ, মাছ তোর হাতে পড়লে হয়।

আইরিহি বললে—পড়ুক আর নাই পড়ুক দাদা, হাত বদলে একবার দেখাই যাক। তুমি নাও তিরধনুক, আর আমায় দাও তোমার ছিপ-বঁড়শি।

সন্ধে হল। নীড়ের পাখি ফিরল নীড়ে। গুহার জীব আশ্রয় নিলে গুহায়। আকাশে নামল ছায়া। অরণ্য হল নীরব। কেবল সমুদ্রের কল্লোল ছাড়া আর কোনও শব্দ কোথাও নেই। কিন্তু দু'ভায়ের কেউ ফেরেনি কুটিরে। আজ কারও কোনও শিকার জোটেনি।

একটি দুটি করে আকাশের এ কোণে ও কোণে দেখা দিলে তারা। দেবদারুগাছের আড়ালে উঁকি দিলে চাঁদ। দেখতে দেখতে তারার মালায় ছেয়ে গেল নীল গগন। শ্যামা মেয়ের সর্বাঙ্গ কে যেন দিলে ফুলের সাজে সাজিয়ে। সাগরের বুকে পড়ল তার ছায়া। তার ঢেউয়ের দোলায় কে যেন তাকে দোল দিতে লাগল আদর করে।

আগে ফিরল আইরিহি। মুখটি শুকনো, চোখদুটি সজল। মাছ পড়েনি একটিও। কিন্তু দুঃখ তার জন্যে নয়। তার দাদার বঁড়শি মাছে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। দাদা যখন বঁড়শি চাইবে—কী

বলবে সে? যা হয় হবে বলে, ঘরে ঢুকল আইরিহি। কিন্তু কই? হিনোদে কোথায়! সে কী এখনও ফেরেনি তবে। আইরিহির মনে বড়ো ভয় হল। জঙ্গলে যে সব ভয়ংকর জন্তু! আর হিনোদে তো কখনও বনে শিকার করতে যায়নি! তবে কী তাকে!—ভাবতে হল না—ঘরে ঢুকল হিনোদে। তারও হাত শূন্য। মুখে বেদনার চেয়ে বিরক্তির ভাবটাই বেশি। ঢুকেই সে বললে—নে নে তোর অস্ত্র! যেমন ধনুক, তেমনি বাণ। যতগুলো তাগ করলাম একটাও লাগল না। দরকার নাই বাঘ ভালুক শিকারে। আমার মাছ ধরাই ভালো। তুই কটা মাছ ধরলি! নিশ্চয়ই অনেকগুলো পেয়েছিস। কী রকম বঁড়শিখানা দেখতে হবে তো! একবার ছুঁলেই গাঁথা না হয়ে যায় না।

আইরিহির মুখখানি আরও শুকিয়ে গেল। বললে—দাদা, বড়ো দোষ হয়েছে ক্ষমা কর। তোমার বঁড়শিটি মাছে কেটে নিয়ে গেছে। আর মাছ? মাছ একটিও ধরতে পারিনি। সে যে তোমার ছিপের দোষ, তা নয়—মাছ ধরতে জানি না বলেই।

শুনে তো হিনোদে রেগে আগুন। ভাইকে মারতে যায় আর কী। বললে—কিছু শুনতে চাই না আমি। বঁড়শি আমার চাই-ই। যেখান থেকে পার আমার বঁড়শি এনে দাও।

আইরিহি বললে—মাছে যে কাঁটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, কেমন করে তা ফিরে পাব? আমি তো আর—

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে হিনোদে এক ধমক দিলে। জানিয়ে দিলে—তার বঁড়শি চাই!

আইরিহি আর কী করে? তার তিরের ফলা ভেঙে সে তখনই একটার জায়গায় একশোটা বঁড়শি তৈরি করে হিনোদের কাছে এনে দিলে।

খুশি হওয়া তো দূরের কথা, হিনোদে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলে আইরিহির গায়ের উপর। দু-চারটে কাঁটা তার হাতে পায়ে বিঁধল। একটা লাগল ঠিক গালের উপর, আর একটু হলেই চোখটা তার যেত। আইরিহির গায়ে গড়িয়ে পড়ল রক্তের ধারা।

আইরিহি চোখের জল মুছে আবার কাঁটা তৈরি করতে লাগল। এবার করলে একশোর জায়গায় হাজারটা। ভাবলে হাজারটা বঁড়শি পেলে দাদার রাগ আর থাকবে না নিশ্চয়ই। কিন্তু সে ভুল বুঝেছিল। হিনোদে তার নিজের বঁড়শি ছাড়া আর কোনো বঁড়শিই নেবে না। সে একটাই হোক, আর হাজারটাই হোক।

আইরিহি কাঁদতে কাঁদতে গেল সমুদ্রের তীরে। বসে ভাবতে লাগল—কেমন করে পাবে হারানো বঁড়শিটি।

বসে থাকতে থাকতে তন্দ্রা এল তার চোখে। পরিশ্রান্ত দেহ কখন যে বালুবেলায় লুটিয়ে পড়ল তা সে নিজেই বুঝতে পারলে না। কোথাও কেউ নেই—আকাশের তারাগুলি অনিমেষ নয়নে তার দিকে চেয়ে রইল। চাঁদ হেলে পড়ল পশ্চিমে। পাণ্ডুর হয়ে এল তার রং।

হঠাৎ কার হাতের ছোঁয়া লেগে ঘুম ভেঙে গেল আইরিহির। সে ভাবলে তার দাদা বুঝি। কিন্তু চেয়ে দেখে, না—দাদা তো নয়। সৌম্যমূর্তি এক বৃদ্ধ। প্রশান্ত তাঁর মুখ—সাদা দাড়ি,

সাদা চুল। চোখদুটি উজ্জ্বল। স্নেহের সুরে বৃদ্ধ বললেন;—কে তুমি বৎস? কী তোমার দুঃখ?

আইরিহি সব কথা খুলে শেষে বললে—আমার অপরাধ নেবেন না, কিন্তু আপনাকে তো কখনও দেখিনি।

বৃদ্ধ বললেন—আমি জলদেবতা। এই সমুদ্রেই আমার বাস। তোমার দুঃখ দেখে এসেছি।

আইরিহি বৃদ্ধকে প্রণাম করে তাঁর দয়ার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানালে।

বৃদ্ধ তখন সমুদ্রের দিকে হাত বাড়িয়ে যেন কাকে ইঙ্গিত করলেন। অমনি সাগরের জল থেকে উঠল একটি নৌকো। সোনার হাল, সোনার দাঁড়, সোনার পাল। সবই সোনার। কিন্তু দাঁড়ে নেই দাঁড়ি, হালে নেই মাঝি। নৌকো আপনি এল ভেসে, লাগল তীরে।

বৃদ্ধ বললেন—ওঠো এই নৌকোয়। চোখ বুজে বসে থাকো পাটাতনে। উঠলেই নৌকো চলবে। যতক্ষণ না থামে চোখ খুলো না যেন? তা হলে ভয় পাবে। এই সাগরের যে রাজা, নৌকো লাগাবে তাঁর দেশে। তাঁর দুই কন্যা—দুজনই খুব সুন্দরী। কিন্তু ছোটো রাজকন্যার মনটি বড়ো নরম, ফুলের মতো। কারও দুঃখের কথা শুনলেই তার চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে। তার সাহায্যে তোমার হারানো বঁড়শি পাবে। কিন্তু সাবধান, বড়ো রাজকন্যা ভারী হিংসুটে, তার কাছে এসব কথা বোলো না কিছুই। সে যদি শোনে তাহলে অনেক বাধা দেবে।

এমন সময় কী একটা পাখি শিস দিতে দিতে ঠিক আইরিহির মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। আইরিহি মাথা তুললে—দেখলে আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে, সকাল হয় হয়। তখনই সে জলদেবতাকে প্রণাম করবার জন্যে মুখ ফেরালে। কিন্তু কই? আশে পাশে জনপ্রাণী নেই। শূন্য সৈকত। সাদা বালির অনন্ত শয্যা। একদিকে সীমাহীন তরঙ্গময় সমুদ্র, অন্যদিকে ধূসর দুর্গম পর্বত। মধ্যে বালুবেলা। কোথায় তার শেষ, কোথায়-বা তার আরম্ভ—কে জানে?

কিন্তু ভাবনার সময় নেই। নৌকো তখনও দাঁড়িয়ে আছে, তারই অপেক্ষায়। উঠে পড়ল সে সোনার নৌকোয়। চোখ বুজে বসল পাটাতনে, বায়ুবেগে নৌকো চলতে লাগল, ঢেউ ভেঙে আর জল কেটে।

কতক্ষণ যে এমনি করে কাটাল—সে জ্ঞান তার নেই। নৌকো যখন থামল, একটা ধাক্কা লেগে তার চমক ভাঙল। চেয়ে দেখে একটি সুন্দর দ্বীপ। আইরিহি নেমে পড়ল নৌকো থেকে, কিন্তু যাবে কোথায়? লোকজন কেউ কোথাও নেই যে জিজ্ঞেস করে। তাই সে আপন মনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে এলে একটি গাছের তলায়। এমন গাছ সে কখনও দেখেনি। রূপার গাছ, তাতে জড়িয়ে আছে সোনার লতা। মুক্তোর ফলে গাছের ডাল পড়েছে নুয়ে। সেই গাছের তলায় একটি কুয়ো। কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছ তার জল। তেষ্টায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, জল দেখে তার তেষ্টা আরও বাড়ল। কিন্তু জল তো খাবার উপায় নেই। জল তুলবে কী দিয়ে?

সে ভাবলে যে, এ কুয়োর জল যখন এমন সুন্দর তখন লোকে নিশ্চয় এ জল খায়। অপেক্ষা করলে নিশ্চয় কেউ না কেউ জল তুলতে আসবে। ততক্ষণ এক কাজ করা যাক। এই গাছটার উপরে উঠে একটু বসি। —এই বলে সে উঠে বসে রইল গাছের উপর।

যায় যায়—অনেকক্ষণ যায়। তেষ্টায় গলা কাঠ হয়ে গেল। কিন্তু কই, কেউ তো আসে না! তবে কি এদেশে কেউ নেই?

এমনি ভাবছে, এমন সময়ে কী একটা শব্দ বাতাসে ভেসে এল। মুখ তুলে দেখল, কয়েকটি মেয়ে কথা বলতে বলতে এই দিকেই আসছে। তাদের সকলের হাতেই একটি করে সোনার কলসি। রঙিন বেশভূষায় তাদের দেহ সজ্জিত। আইরিহি ঠিক বুঝতে পারলে না—এরা কে? তবে এরা যে জল নিতে আসছে এই কুয়োর দিকেই—তাতে আর কোনও সন্দেহ রইল না।

দেখতে দেখতে তারা এসে পৌঁছোল কুয়োর ধারে। তখন তাদের কথাবার্তা আইরিহির কানে এল। বুঝল এরা রাজকন্যা নয়। তাঁদের সহচরী।

একজন বলছে—ভাই, বড়ো সখীর জন্যে ভাবি না। সে যে হিংসুটে তার বরও তেমনি হলেই চলবে। দেশে খারাপ লোকের তো অভাব নেই। তার বরের জন্যে মহারাজের ভাবতে হবে না।

আর একজন বললে—তা যা বলেছিস, সই। কিন্তু ছোটো সখীর কথা একবার ভেবেছিস



কি? হাসি হাসি মুখখানি। আমাদের সকলকে ঠিক বোনের মতো দেখে। কখনও একটু জোরে কথা বলে না। আহা তবু বেচারি দিদির মন পেলে না। তার জন্যেই ভাবনা। এমন রত্ন কার হাতে পড়বে।

তৃতীয় সহচরী বললে—মহারাজ যাই বলুন না কেন, যার তার হাতে ছোটো সখীকে আমরা কিছুতেই দিতে দেব না। বানরে কি মুক্তোর মালার মর্ম বোঝে?

কথা বলতে বলতে অনেকক্ষণ কাটল। সে খেয়াল তাদের ছিল না। হঠাৎ একজন বলে উঠল—গল্প করতে করতে কতক্ষণ কাটল সে দিকে কারও নজর আছে কি? নে নে চল। জল তুলে প্রাসাদে ফিরতে হবে তো? ছোটো সখী একলা আছে—সেটা কি তোরা ভুলে গেলি?

সবাই বললে—তাই তো। গল্পে গল্পে কতক্ষণ কেটে গেছে। চল চল জল তুলে বাড়ি ফিরি। —এই বলে তারা সোনার কলসে রূপার দঁড়ি বাঁধলে। বেঁধে ডুবালে কুয়োর জলে। কিন্তু যেই কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে জলের দিকে মাথা ঝুঁকিয়েছে, অমনি সবাই একসঙ্গে চমকে উঠল। চমকে ওঠার কারণ আর কিছু নয়। কুয়োর স্বচ্ছ জলে সবাই দেখলে রাজপুত্র আইরিহির ছায়া। প্রথম ভয় কেটে যেতে একটু সামলে নিয়ে তারা তাকালে উপরের দিকে। ভাবলে কে এ আগন্তুক? কোন দেশে এর বাস?

আইরিহি তাদের অবস্থা বুঝতে পেরে বললে—আমি এক রাজপুত্র। সাগরতীরে আমার বাস। তোমাদের ছোটো রাজকুমারীর দেখা পেতে চাই। জলদেবতা স্বয়ং আমাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সে সব কথা পরে হবে। আমি বড়ো তৃষ্ণার্ত। আমাকে একটু জল দাও।

সখীরা অমনি সোনার বাটিতে করে রাজপুত্রের হাতে জল দিলে। আইরিহি জল খেয়ে বাটিটি ফিরিয়ে দিয়ে বললে—তোমাদের উপকার আমি কখনও ভুলব না। তোমরা আজ আমার প্রাণ দিয়েছ।

তারা বললে—রাজকুমার প্রাসাদে চলুন সেখানেই আমাদের সখীর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে। আপনার মতো অতিথি পেলে মহারাজ খুশি হবেন।

আইরিহি বললে—না, তোমরা প্রাসাদে ফিরে যাও। সময় হলে যাব। এখনও আমার যাবার সময় হয়নি।

বাটিটা যখন আইরিহি ফিরিয়ে দেয় সখীরা সেটা ভালো করে দেখে নেয়নি। পথে যেতে যেতে একজন বললে—ওরে বাটিতে ওটা কী বল দেখি? সকলে বললে—কী দেখি?

বাটিতে ছিল একটি মানিক—সাত রাজার ধন যার দাম—সেই মানিক। সখীরা ভাবলে;—জল খাবার সময় হয়তো কোনও রকমে রাজপুত্রের গলা থেকে মানিকটি পড়েছে খসে। আমরা সেটা নিয়ে চলে এলাম। তিনি না জানি কী ভাববেন। তারা ঠিক করলে মানিকটা তারা রাজপুত্রকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। কিন্তু এ কী? মানিক যে তোলা যায় না। বাটির গায়ে এমন ভাবে আটকে গেছে যে, সবাই মিলে চেষ্টা করেও সেটা খুলতে পারলে না।

তখন রাজপুত্রের কাছে আর না ফিরে, এল ছোটো রাজকন্যার কাছে। ছোটো রাজকন্যা

সব শুনে বলল—দেখি তো কেমন মানিক। কিন্তু বলেই কেমন যেন তাঁর লজ্জা করতে লাগল। মুখ চোখ তাঁর লাল হয়ে উঠল। সখীরা অলক্ষ্যে তাই দেখে একটুখানি মুখ টিপে হাসল। যাই হোক তবু রাজকন্যা নিলেন সেই বাটি। মানিকটিতে তাঁর হাত লাগাতেই সেটি গেল খুলে। তিনি সহজেই সেটি তুলে ফেললেন। সখীরা সবাই মিলে প্রাণপণ চেষ্টায় যেটা খুলতে পারেনি, তিনি অনায়াসেই সেটা তুলে ফেললেন দেখে সকলে বিস্মিত হয়ে গেল। ভাবলে—এর অর্থ কী?

এক সহচরী বললে;—কী সখী, তবে মহারাজকে খবর দি?

ছোটো রাজকন্যা তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে রাগের সুরে বললেন—কী খবরটা শুনি?

—যে মহারাজের একটা ভাবনা দূর হল।

—কোন ভাবনাটা আবার দূর হল?

—কোন ভাবনা আর? কিছুই যেন বোঝেন না উনি। তেমনি বোকা মেয়ে কি না।—বলেই চপলা সখীটি হেসে উঠল। আর সবাই যোগ দিল সেই সঙ্গে।

মহারাজ সমুদ্রনাথ সেই সবে রাজসভার কাজ সেরে বিশ্রামের জন্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন। সংবাদ পেয়েই মহারানিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন ছোটো রাজকুমারীর ঘরে। তিনি হলেন সমুদ্রনাথ। সাত সমুদ্র তেরো নদী—সব তাঁর চোখে চোখে। দেশ-দেশান্তরের খবর তাঁর নখদর্পণে। তিনি মানিক দেখেই বুঝলেন—এ মানিক কার। অদৃশ্য অক্ষরে লেখা ছিল তাতে নির্বাসিত রাজপুত্রের নাম। মহারাজের মুখ থেকে বেরিয়ে এল; আঃ বাঁচলাম, যার খোঁজ করছি এতদিন ধরে, আজ সে এসেছে নিজেই। ভগবান তবে মুখ তুলে চাইলেন বোধ হয়।

তিনি স্বয়ং বেরিয়ে পড়লেন রাজকুমারকে অভ্যর্থনা করে আনতে। সঙ্গে সঙ্গে চলল সভাসদ পারিষদ। পিছনে পিছনে ভিড় করে চলতে লাগল অন্যান্য রাজপরিজনেরা।

রাজা এলেন সেই কুয়োর পাড়ে। তাঁর বেশভূষা দেখেই আইরিহি বুঝেছিল সাতসাগরের রাজা ইনিই। জলদেবতা এঁর কন্যার কথাই তাহলে তাকে বলেছিলেন। আইরিহি নামল গাছ থেকে। সভাসদরা জানিয়ে দিলে, স্বয়ং সাতসাগরের রাজা এসেছেন তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে। আইরিহি প্রণাম করলে রাজাকে। রাজা তাকে হাত ধরে তুললেন। তারপর তাকে পরম সমাদরে নিয়ে এলেন নিজের প্রাসাদে।

রাজ-অতিথি আইরিহি আছে রাজপ্রাসাদে। আদর যত্নে মাসখানেক তার কাটল। সাগরদ্বীপে কানাঘুষা শোনা গেল আইরিহির সঙ্গে ছোটো রাজকন্যার বিয়ে।

একদিন সত্যি সত্যি বিয়ে হয়ে গেল। সে কী ধুমধাম। সে কী জাঁকজমক। সাত সমুদ্র তেরো নদীর যত অধিবাসী সবাই তো এক রাজার শাসনে। সবাই পেলে নিমন্ত্রণ। সবাই নিয়ে এল আপন আপন সাধ্যমতো উপহার রাজকন্যার বিয়ে উপলক্ষে। এল তিমি—ত্রিশ হাজার মন তেল নিয়ে। এই তেলে জ্বলবে আলো। এল কুমির—অসংখ্য রত্ন নিয়ে। রত্নাকর বলে সমুদ্রকে। তার তলায় রত্নের অভাব তো নেই। কুমির ডুব দিয়ে এনেছে—মণি-মাণিক্য

রাশি রাশি। ছোটো রাজকন্যার অঙ্গে জ্বলজ্বল করতে লাগল সেই সব রত্নাভরণ। এল হাঙর—শৈবালের শাড়ি নিয়ে! কী সুন্দর সেই কাপড়ের বুনানি, কী অপরূপ তার কারুকার্য। জরির কাজ করা রেশমি শাড়িও তার কাছে হার মানে। সখীরা রাজকন্যাকে পরিয়ে দিলে সেই কাপড়।

বিয়ের পর বর-কনে বেরুলেন দ্বীপ পরিক্রম করতে জলহস্তীর পিঠে চড়ে। সামন্ত শঙ্খরাজ নিয়েছেন বাদ্যের ভার। তাঁর হুকুমে বেজে উঠল জলতরঙ্গের সুমধুর ধ্বনি।

প্রবাল সমুদ্র-রাজের রাজমিস্ত্রি। তিনি নিয়েছেন বাসর নির্মাণের ভার। কী অপরূপ ভাস্কর্য সে বাসরঘরের। সে ঘরে জ্বলছে হিরের বাতি। মানিকের পালঙ্কের উপর ঝুলছে চাঁদের আলোর মতো শুভ্রবর্ণ মুক্তোর চাঁদোয়া। মৎস্যকন্যা ও নাগনন্দিনীরা চামর হাতে দাঁড়িয়ে আছেন বরকনের প্রতীক্ষায়। মুক্তাঝুরির হ্রদ থেকে এসেছেন রানি কমলমণি পুষ্পসম্ভার নিয়ে অসংখ্য রকমের। ফুলের গন্ধে বাসরঘর আমোদিত।

দ্বীপ পরিভ্রমণ করে এসে বরকনে প্রবেশ করলে সেই বাসরঘরে। শঙ্খরাজের হুকুমে বাদ্যকরেরা নতুন রাগিণীতে ধরলে গান। বেজে উঠল নতুন তালে কাড়া নাকাড়া।

বছর তিনেক গেল কেটে সুখে স্বচ্ছন্দে। দাদার কথা আইরিহি একরকম ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ একদিন সে স্বপ্ন দেখলে হিনোদেকে। এক নিমেষে সব কথা তার মনে পড়ল। ধড়মড় করে সে উঠে পড়ল বিছানা থেকে। রাজকন্যারও ঘুম ভেঙে গেল। বললে—কী হল?

আইরিহি বললে—না, কিছু না। তার মুখ ভারী, স্বর করুণ।

রাজকুমারী বললে—নিশ্চয় তোমার মনে কিছু দুঃখ আছে। আমার কাছে গোপন কোরো না। বলো হয়তো বা আমি কিছু করতে পারি।

তখন আইরিহি বললে—নিতান্তই যদি শুনতে চাও তো শোনো। বলে সে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সব কথাই খুলে বললে। রাজকন্যা শুনে বললে—এই কথা? তা এতদিন বলো নি কেন? এই আমি চললুম বাবার কাছে—কালই ফিরে পাবে তোমার দাদার বঁড়শি।

সম্রাট সমুদ্ররাজ মেয়ের মুখে সব কথা শুনে পরদিন সকালেই সভা ডাকলেন। সে সভায় তলব পড়ল মৎস্যখণ্ডের অধিবাসীদের। তারা সবাই এল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। কে জানে মহারাজের কী হুকুম হয়।

মৎস্যদেশের প্রজামণ্ডলী উপস্থিত হলে মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন—তিন বৎসর আগে আমার জামাই ধরছিলেন মাছ—এই সাগরের তীরে বসে। তোমাদের মধ্যে কেউ তাঁর বঁড়শি নিয়ে গেছ—কাল রাত্রে এই সংবাদ এল আমার কাছে। কার কাছে সেই বঁড়শি আছে জানতে চাই।

সভা নিস্তব্ধ। সবাই কেবল মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু একটি কথাও কেউ বললে না। হঠাৎ বুড়ো বোয়ালের নাতি লাফ দিয়ে উঠে বললে—মহারাজ, আমার দাদামশায় বড্ড বুড়ো হয়েছেন বলে আসতে পারেননি। তাঁর বদলে আমাকেই পাঠিয়েছেন—সভায় হাজিরা দেওয়ার জন্যে। আজ তিন বছর হল তাঁর গলায় কী একটা যেন আটকে আছে।

কিছু খেতে গেলেই লাগে। তবে সেটা ঠিক বঁড়শি কি না—জানি না। মহারাজ যদি হুকুম করেন একবার রাজবৈদ্যকে নিয়ে যাই—তিনি যদি অস্ত্রোপচার করে দেখেন, তা হলেই বোঝা যাবে গলায় কী লেগে আছে।

হুকুম পেয়েই রাজবৈদ্য গেলেন বুড়ো বোয়ালের বাড়ি। খুব সাবধানে তিনি বোয়ালের গলায় করাত চালিয়ে দিলেন। দেখা গেল সত্যিই তার গলার এক কোণে বিঁধে রয়েছে একটা লোহার কাঁটা। কবিরাজ ফিরলেন বঁড়শিটি নিয়ে রাজপ্রাসাদে।

আজ সকাল থেকেই আয়োজন চলেছে—রাজকুমার ফিরে যাবেন দাদার কাছে। সাগরের তীরে এসে লেগেছে সাতখানি নৌকো। যেটিতে বর-কনে যাবে সেটি চমৎকার সাজানো—দেখলে চোখ জুড়ায়।

সকাল থেকে রানি-মা শয্যা নিয়েছেন—আদরের মেয়ে চিরদিনের মতো ছেড়ে চলল—এই ভেবে মহারাজের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। বড়ো রাজকুমারী—যে ছোটোবোনকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না, সেও আজ বালিশের উপর উপুড় হয়ে কেঁদে আকুল।

ছোটো রাজকন্যা তার কাছে এসে বসলেন। ধীরে ধীরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন—মাপ করো দিদি, তোমায় কত কটু কথা বলেছি, কত কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু সে সব কথা ভুলে যেয়ো। ছোটো বোনটি বলে সব দোষ ক্ষমা করো।

বড়ো রাজকন্যা আর পারলেন না। বোনকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বললেন—বোন, তুই তো কখনও কোনো দোষ করিসনি ভাই। আমিই তো তোকে চিরদিন যন্ত্রণা দিয়েছি। স্বামীর বাড়িতে গিয়ে তুই সুখী হ—এই আশীর্বাদ করি।

সাগরতীরে ভারী ভিড়। মহারাজ মহারানি এসেছেন মেয়ে-জামাইকে বিদায় দিতে। এসেছে পাত্রমিত্র কোটাল—এসেছে সেপাই সান্ত্রী—এসেছে লোকলশকর—এসেছে পাইক বরকন্দাজ, আর এসেছে রাজকন্যার সহচরীরা সজল চোখে বিরস মুখে। আর সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে পাষাণপ্রতিমার মতো কে ওই মেয়েটি? ও আর কেউ নয়—বড়ো রাজকন্যা। চোখের জলে আজ তার মনের ময়লা সব ধুয়ে গেছে। আহা, কী করুণ তার মুখখানি।

বিদায়ের পালা সাঙ্গ হল। নৌকো ছাড়ার আগে মহারাজ জামাইয়ের হাতে দিলেন দুটি নীলকণ্ঠ মণি। বলে দিলেন—এর একটিতে আনে জোয়ার—অন্যটিতে ভাটা। দরকার হলে এদের কাজে লাগিয়ো। জোয়ারমণি হাতে নিয়ে যদি বলো 'জোয়ার', অমনি শুকনো মাটিতে বন্যা বইবে। আর ভাটা-মণিটি হাতে ধরে যদি বলো 'ভাটা', অমনি অথই জলও শুকিয়ে যাবে—দেখতে পাবে শুকনো মাটি।

আইরিহি রত্নদুটি যত্ন করে বেঁধে রাখলে।

আইরিহি ফিরল পাতার কুটিরে। এসেই দাদাকে দিলে তার বঁড়শিটি—আর দিলে তার যৌতুকের অর্ধেক। কিন্তু হিনোদের ঈর্ষা হল আইরিহির ঐশ্বর্য দেখে। সে খুশি হল না মোটেই।

আইরিহি এসে নতুন করে আর একটি কুটির তৈরি করলে নিজের জন্যে। সেইখানেই

সে বাস করতে লাগল।

আইরিহি চাষ করে নীচের মাটিতে পাহাড়ের তলায়। হিনোদে করে উপরে, পাহাড়ের গায়ে। বছরের শেষে আইরিহির গোলা শস্যে পূর্ণ হয়, কিন্তু হিনোদের দুঃখ ঘোচে না, তার গোলা শূন্য থেকে যায়। তখন হিনোদে বলে, নীচের জমি তোমার নয়, আমার। তুমি যাও উপরের জমি চাষ করগে।

আইরিহি তাতেই রাজি হয়।

কিন্তু ফল হয় একই। আইরিহির চেষ্টায় পাথরেও সোনা ফলে। হিনোদের ভালো জমিতেও শস্য ফলে না।

হিনোদে নিষ্ফল আক্রোশে নিজেই জ্বলে-পুড়ে মরে। একদিন সে মনে মনে ভাবলে যে আইরিহি নিশ্চয় কোনও মন্ত্র শিখে এসেছে। সেই মন্ত্র দিয়ে নিজের জমিতে শস্য ফলায়, আর তার জমির উর্বরতা দেয় কমিয়ে। তাকে মেরে ফেললে, হিনোদের আর কোনও দুঃখ থাকবে না। এই ভেবে সে করলে কী, না—একটা তরোয়াল নিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল আইরিহিরি কুটিরের পাশে। উদ্দেশ্য—আইরিহি যেই বেরোবে ঘর থেকে, অমনি বসাবে তার ঘাড়ের উপর এক কোপ। ব্যস্ তখন আর কী?

দাদার ব্যবহারে আইরিহির মনে সর্বদাই একটা ভাবনা ছিল। সে যতই তার ভালো করতে যায়, হিনোদে ততই তার অনিষ্ট করে। তাই সে নীলকণ্ঠ-মণিদুটি সব সময় হাতে হাতে রাখত—ডান হাতে জোয়ার-মণি আর বাঁ হাতে ভাটা-মণি। সেদিনও সে মণিদুটি হাতে করে বেরিয়েছে কুটির থেকে। জানে না যে হিনোদ দাঁড়িয়ে আছে দরজার গোড়ায়। তাকে দেখেই হিনোদে ওঠালে অস্ত্র। কিন্তু আর হাত নামাতে হল না। আইরিহি ডান হাত তুলে ডাক দিলে—জোয়ার। কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ পর্বতপ্রমাণ ঢেউ তুলে গর্জন করতে করতে সমুদ্র এল ছুটে। স্রোতে ভেসে গেল হিনোদে। কিন্তু সে জল আইরিহির গায়েও লাগল না। আইরিহি দেখতে পেল, হিনোদে স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে ডুবতে ডুবতে। তখন তার নিজের মনেই দয়া হল। সে বাঁ হাত তুলে বললে,—'ভাটা'। আবার মুহূর্তের মধ্যে সব শুকনো। যেখানে যা ছিল সব ঠিক তেমনি আছে। কেবল হিনোদে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে দূর থেকে।

হিনোদে কাছে এসেই ভাইকে জড়িয়ে ধরে বললে, আমায় মাপ কর আইরিহি। আমি হিংসা করে তোকে সারা-জীবন কষ্ট দিয়েছি। তুই একটি কথাও না বলে সব সহ্য করেছিস। আজ আমার জ্ঞান হয়েছে। বুঝতে পেরেছি—বয়সে ছোটো হলেও মনটা তোর কত বড়ো। কিন্তু আমি—

আইরিহি তার দাদার কথা শেষ করতে দিলে না। দাদাকে এ রকম শাস্তি দিয়ে সে নিজেই অনুতপ্ত হয়েছিল। তার কথা শুনে আইরিহির মনে অনুতাপ আরও বাড়ল। সে বললে—দাদা, ছোটো ভাই বলে আমার সব অপরাধ ক্ষমা করো।

তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না।

হিনোদে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল—আজ থেকে আবার আমাদের নতুন করে জীবন শুরু হল। সুখে-দুঃখে আমরা ভাই ভাই। আনন্দে-বিষাদে আমরা ভাই। ভায়ের মতো আপনজন আর কে আছে জগতে। সে ভাইকে দুঃখ দিয়েছি এতদিন। আজ ভুল ভাঙল।

আইরিহি বললে—চল দাদা, আজ আমার কুটিরে তোমার নিমন্ত্রণ।

হিনোদে বললে—নিমন্ত্রণ কিরে? এবার থেকে এক কুটিরেই তো বাস করব। তবে কুটিরটা তৈরি করে নিতে হবে, একটু বড়ো করে।

পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল— সে ব্যবস্থা আমিই করে দেব বাবা। কিন্তু তার আগে তো সংসারী হতে হবে।

দুজনেই চমকে উঠল। চেয়ে দেখল দুজনেই। রাজার মতো বেশ-ভূষা, রাজার মতো সব সাজ-সজ্জা একজন বৃদ্ধ। আর তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে—মুখটি লজ্জায় রাঙা।

আইরিহি দেখেই চিনতে পারল—বৃদ্ধ হচ্ছেন সমুদ্ররাজ—তার শ্বশুর। আর মেয়েটি—বড়ো রাজকুমারী।

তারপর কী হল? সে কথা আর বলব না।

ছবি। সুব্রত মাজী



বেণুবালা

ধীরেন্দ্রলাল ধর

পাহাড়ের কোলে ছোটো একখানি গ্রাম। গ্রামের শেষে একটি পুকুর। পুকুরের একপাশে ছোটো একখানি কুঁড়েঘর। সেই ঘরে থাকে এক কাঠুরে আর তার বউ। পাহাড়ের গা বেয়ে ঘন জঙ্গল নেমে এসেছে পুকুরের কিনারা অবধি। কাঠুরে জঙ্গলে গিয়ে রোজ কাঠ কাটে, কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে ফেরে দিনের শেষে। কাঠুরে-বউ সেই কাঠ বেচে আসে গাঁয়ের ঘরে ঘরে, তাতেই দু-চার পয়সা যা পায়, কোনওমতে দিন কেটে যায়।

দিন যায়। কিন্তু কাঠুরের মনে বড়ো কষ্ট। কাঠুরের কোনো ছেলে-মেয়ে নেই। ঘরে বুদ্ধমূর্তি আছে, প্রতিদিন সেই মূর্তির তারা পুজো করে, ধূপ-ধুনো দেয় আর পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রার্থনা করে—'হে ঠাকুর আমাদের একটি ছেলে দাও।'

দিন যায়। একদিন এক সন্ন্যাসী এলেন দুয়ারে। সাধু-সন্ন্যাসীর উপর কাঠুরের ভক্তিশ্রদ্ধা খুব। সন্ন্যাসীকে সে খুব যত্ন করল। ভালো করে খাওয়া-শোয়ার ব্যবস্থা করে দিল। সন্ন্যাসী বড়ো খুশি হলেন। একদিন থেকে গেলেন কাঠুরের কুঁড়েঘরে। যাবার সময় সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করে গেলেন—'তোদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। যা চাস তা পাবি।'

সন্ন্যাসী চলে গেলেন। কাঠুরেও গেল বনে কাঠ কাটতে। বনের ভিতর কিছুটা গিয়ে একটা গাছের গোড়ায় সবে কুড়ুলের কোপ মেরেছে এমন সময় কানে এল কান্নার সুর। কোথায় যেন ছোটো ছেলে কাঁদছে—ঙ—ঙ—ঙ।

বনের মাঝে ছোটো ছেলে কাঁদে কোথায়? এখানে ছোটো ছেলে এল কোত্থেকে? কাঠুরের কাঠ কাটা থেমে গেল, দেখতে লাগল এদিকে ওদিকে। তারপর যেদিক থেকে কান্না আসছিল সেই দিকে এগোল।

শুরু হয়েছে বাঁশঝাড়। ঘন বাঁশঝাড়। সেই বাঁশের সারি ভেঙে ভিতরে ঢোকার পথ নেই। সেখান থেকেই কান্নাটা আসছে আর কান্নার সুরে সুরে একটা পাকা বাঁশ দুলে দুলে উঠছে। কাঠুরে গেল সেখানে। তার মনে হল এই বাঁশটাই যে কাঁদছে। খানিক থ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কাঠুরে সেই কান্না শুনল—ঙ—ঙ—ঙ। তারপর কী ভেবে কাঠুরে বাঁশটির গোড়ায় বসাল কুড়ুলের এক কোপ।

ফাঁপা বাঁশ। কুড়ুলের কোপ পড়তেই সে ফাঁক দিয়ে সেই কান্নাটা আরো জোরালো হল। কাঠুরে আবার ঘা মারল বাঁশটির গায়। কুড়ুলের কয়েক ঘায়ে কাঠুরে বাঁশটিকে চিরে ফেলল।

অবাক কাণ্ড। মোটা বাঁশের ভিতরটা সবই ফাঁপা। তারই মধ্যে একটি ছোট্ট মেয়ে বসে আছে। বসে বসে কাঁদছে—'ঙ—ঙ—ঙ'।

নেহাত ছোট্ট এতটুকু মেয়ে, বিঘত খানেকের মতো মাথায় উঁচু। ফুটফুটে রং, গোলাপের মতো মুখ চোখ। কাঠুরে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলে। মেয়ের কান্না থামল। কাঠ কাটা আর হল না, কাঠুরে ঘরে ফিরে এল।

কাঠুরে-বউ তো মেয়ে দেখে ভারী খুশি। বললে—'বনের দেবতা এই মেয়ে আমাদের দিয়েছেন, একে আমি মানুষ করব।'

কাঠুরে বলল—'কিন্তু এ যে নেহাত ছোট্ট, এতটুকু একটা জ্যান্ত পুতুল যেন।'

বউ বলল—'তা হোক, ওই আমার ভালো।'

কাঠুরে-বউ সেই মেয়েকে মানুষ করতে লাগল। বাঁশবনে পাওয়া মেয়ে তাই নাম রাখল বেণুবালা।

বেণুবালা দিনে দিনে বড়ো হয়। মানুষের মতো বাড়ে না। বাঁশের মতোই বাড়তে থাকে। এক বিঘত মেয়ে তিন মাসেই এক হাত উঁচু হল। এক বছরে দেখতে হল পাঁচ বছরের মতো। মেয়ে আর ঘরের মধ্যে থাকে না। ঘরের বাইরে খেলাধুলো করে, ছুটোছুটি করে, গাঁয়ের মানুষ দেখে জিজ্ঞাসা করে—'কার মেয়ে গো?'

কাঠুরে সত্যি কথা বলে— 'বনের মাঝে কুড়িয়ে পেয়েছি।'

তারা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে দেখে, যত দেখে তত ভালো লাগে, চোখ আর ফেরাতে পারে না। এমন রূপ কেউ কখনও দেখেনি। বলে 'সত্যি, এ বনেরই কোনো বনদেবী হবে।'

দিন যায়। কাঠুরে আর তার বউ মেয়েটিকে এক লহমা চোখের আড়াল করে না, আদর যত্নের আর শেষ নই।

এদিকে বেণুবালা বাড়তে থাকে বাঁশের মতো। তিন বছরে যে মেয়ে হল পনেরো বছরের মতো। সবাই বলল—'এমন তো হবেই, এ যে বনদেবী। এ তো সাধারণ মানুষ নয়।'

পাড়াপড়শি বলল— 'মেয়ে তো বড়ো হল, এবার মেয়ের বিয়ে দাও।'

কাঠুরে বলল—'তোমরা পাঁচজন তাহলে একটা ভালো পাত্র দেখে দাও।'

লোকের মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে—অপরূপ সুন্দরী কন্যার জন্য পাত্র চাই।

এক সদাগরের ছেলে এল মেয়ে দেখতে। দেখেই তার পছন্দ, বলল—'আমি বিয়ে করব।'

বেণুবালা বলল—'কিন্তু আমার যে একটা কথা আছে।'

সদাগরপুত্র বলল—'কী কথা বল?'

—'বিয়ের আগে আমাকে একটা জিনিস যৌতুক দিতে হবে।'

—'কোন জিনিস?'

—'ভগবান বুদ্ধ যে পাত্রটি হাতে নিয়ে ভিক্ষা করতেন সেই পাত্রটি আমার চাই।'

—'সে তো এখানে পাওয়া যাবে না। ভারতভূমিতে গিয়ে আনতে হবে।'

—'তুমি সদাগর, দেশ-বিদেশে কেনা-বেচা কর, ভারতে খোঁজ নিয়ে এসো।'

—'দুই হাজার বছর আগের জিনিস এখন পাব কি?'

—'খুঁজে দেখ। মাঠে মাঠে খোঁজ করবে, মন্দিরে মন্দিরে দেখবে।'

সদাগরপুত্র চলে গেল, বলে গেল—'ছ'মাস পরে আবার আমি আসব, সেই ভিক্ষাপাত্র নিয়েই আসব।'

ভারতভূমিতে সদাগর পুত্র আগে গেছে। সাগরে ময়ূরপঙ্খ নাও ভাসিয়ে, সাতখান পাল টাঙিয়ে পঞ্চাশ দাঁড়ি দাঁড় টানলে দেশে পৌঁছাতে লাগে দুমাস। ভাসতেও লাগে দুমাস। তারপর সেখানে খোঁজাখুঁজি করতেও আরো লাগবে দুটি মাস। পুরো ছয় মাসের ব্যাপার। তারপর যা চায় তা খুঁজে পাবে কি না তার ঠিক নেই। কবে বুদ্ধ মারা গেছেন। দুই হাজার বছর কেটে গেছে তাঁর ভিক্ষাপাত্র কি এখনও আছে? আর থাকলেও কোন মন্দিরে বা কী মঠে আছে, ভক্তেরা তা ছাড়বে কেন? সদাগরের ছেলে এই সব ভাবে। তার বুদ্ধি ব্যবসায়ী বুদ্ধি। এত ঝামেলা সে পোহাতে যাবে কেন? সে সহজ উপায় বের করে ফেলল। শহরে কুমোরের বাড়ি গিয়ে বলল—'বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র তৈরি করে দাও, ছবিতে যেমনটি দেখ তেমনটি হবে। দেখলেই যেন মনে হয় হাজার হাজার বছরের পুরোনো। যা মজুরি চাও তাই আমি দেব।'

পাকা কারিগর পুরো তিন মাস ধরে অনেক দেখে-শুনে পাত্র তৈরি করল, যা দেখলেই মনে হয় অনেক কালের পুরোনো। সদাগরপুত্র সেই পাত্র দেখে খুশি হল। কারিগরকে অনেক টাকা বখশিস দিল। তারপর আরো তিন মাস সেই পাত্র সে রেখে দিল ঘরে। ছ'মাস যখন

কাটল তখন সদাগর পুত্র সেই পাত্র নিয়ে এল কাঠুরের বাড়ি বেণুবালার কাছে। বলল—'এই নাও বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র।'

বেণুবালা দেখে-শুনে বলল—'কোথা থেকে পেলে?'

সদাগরপুত্র বলল—'ভারতভূমি থেকে নিয়ে এলাম। যেতে দুমাস, আসতে দুমাস খুঁজে বের করতে দুমাস—তাই তো ছ'মাস দেরি হল।'

বেণুবালা হাসল, বলল—'তুমি বেজায় মিথ্যাবাদী। বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র ভারতভূমিতে কোথাও নেই, তুমি পাবে কী করে? কারিগর দিয়ে তৈরি করিয়ে এনেছ। তোমার মতো মিথ্যাবাদীকে আমি বিয়ে করব না।'

সদাগরপুত্র কিছু বলতে পারল না, মাথা নিচু করে ফিরে গেল।

দিন যায়। এবার এল কোটালপুত্র। মেয়ে দেখেই পছন্দ হল, বলল—'আমি বিয়ে করব।'

বেণুবালা বলল—'বিয়ের আগে আমি যৌতুক চাই, দিতে পারবে?'

কোটালপুত্র বলল—'কী চাও বল?'

বেণুবালা বলল—'জান, গন্ডারের চামড়া দিয়ে ঢাল তৈরি হয়। তা কোনও অস্ত্র দিয়ে ভেদ করা যায় না?'

কোটালপুত্র বলল—'জানি।'

বেণুবালা বলল—'আবার এমন গন্ডারের চামড়া আছে যা আগুনে পোড়ে না। তা জান?'

—'না, এই প্রথম শুনলাম।'

—'আছে। সেই রকম একখানা চামড়া আমার চাই। সোনালি গন্ডারের চামড়া।'

—'বেশ, আমাকে সময় দাও, আমি তিন মাস বনে বনে ঘুরে দেখি।'

কোটালপুত্র চলে গেল। সোনালি গন্ডার আছে বলে সে কখনো শোনেনি, তার চামড়া যে আগুনে পোড়ে না এমন কথাও সে জানে না। কোথায় খুঁজবে? কোন জঙ্গলে গিয়ে সাপের মুখে বাঘের মুখে প্রাণ হারাবে? সেটা ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। নগরের সব সেরা রসায়নবিদকে সে ডেকে পাঠাল, বলল—'একখানা চামড়া বানিয়ে দিতে পারবে, যা আগুনে পুড়বে না। যা চাই তাই দেব।'

রসায়নবিদ নানা আরক, নানা রস নিয়ে কাজ করে, বলল—'গন্ডারের চামড়া আনিয়ে দাও, আমি করে দেব'।

কোটালপুত্র গন্ডারের চামড়া একখানা কিনে এনে দিলে রসায়নবিদ সেই চামড়াখানা দিনের পর দিন আরকে ভেজাল আর রোদে শুকাল। কালো চামড়া দিনে দিনে সোনালি হয়ে গেল। তিন মাস পরে চামড়াখানি পাকিয়ে রসায়নবিদ এনে দিল কোটালপুত্রকে, বলল—'এই চামড়া আগুনে পুড়বে না।'

কোটালপুত্র অনেক টাকা রসায়নবিদকে বখশিস দিল, তারপর সেই চামড়াখানি হাতে নিয়ে এল কাঠুরিয়ার ঘরে। বেণুবালাকে বলল— 'তুমি যা চেয়েছিলে, এনেছি, দেখ।'

বেণুবালা চামড়াখানি হাতে নিয়েই বলল—'তুমি বেজায় মিথ্যাবাদী। এ তো আরকে ভেজানো। তুমি আমার সঙ্গে জুয়াচুরি করছ। আমি তোমাকে বিয়ে করব না।'

কোটালপুত্রের মুখে আর কথা জোগাল না। মাথা হেঁট করে সে বেরিয়ে গেল।

দিন যায়। এবার এল মন্ত্রীপুত্র। মেয়ে দেখেই পছন্দ, বলল—'আমি বিয়ে করব।'

বেণুবালা বলল—'বিয়ের আগে আমায় যৌতুক দিতে হবে যে?'

মন্ত্রীপুত্র বলল—'বল কী যৌতুক?'

বেণুবালা বলল—'সাগরের তীরে পাখির বাসায় এক রকম শাঁখ পাওয়া যায়। যে শাঁখ ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয় না! জোরে বাতাস বইলে আপনি বাজে। আমাকে সেই শাঁখ এনে দাও।'

মন্ত্রীপুত্র বলল—'আমাকে একমাস সময় দাও, সাগর-সৈকতে ঘুরে আসি।'

মন্ত্রীপুত্র শাঁখ খুঁজতে বেরুল। সাগরপাড়ে গেল। সাগরপাড়ে শুধুই ঝাউবন, সেই ঝাউগাছের মাথায় হাজার হাজার পাখির বাসা। তার কোন্ বাসায় শাঁখ পাওয়া যাবে কে জানে। অত



গাছে গাছে উঠে কে পাখির বাসা খুঁজবে? মন্ত্রীপুত্র গেল শাঁখারিটোলায়। এক শাঁখারিকে ডেকে বলল—'পারবে এমন শাঁখ বানাতে যা হাওয়া লাগলে আপনি বাজবে?'

শাঁখারি বলল—'কেন পারব না? পয়সা খরচ করলে যা বলবেন তাই করে দেব। তবে সময় দিতে হবে। এ কাজে অনেক কারিকুরি আছে।'

মন্ত্রীপুত্র বলল—'বেশ সময় নাও, বখশিসও দেব।'

মাসখানেক পরে শাঁখারি শাঁখ এনে দিল মন্ত্রীপুত্রকে। হাওয়ার মুখে ধরলেই সে শাঁখ বেজে ওঠে।

মন্ত্রীপুত্র সেই শাঁখ নিয়ে এল কাঠুরিয়ার কুঁড়ে ঘরে বেণুবালার কাছে। বলল—'এই নাও তোমার শাঁখ, যা চেয়েছিলে তা-ই।'

বেণুবালা বলল—'তোমার মিছে কথা। এ বাজে শাঁখ। শাঁখের মুখে বাঁশি লাগানো আছে। এ তো জুয়াচুরি। তোমার মতো জুয়াচোরকে আমি বিয়ে করব না।'

মন্ত্রীপুত্র আর মাথা তুলতে পারল না। ঘাড় হেঁট করে চলে গেল।

দিন যায়। এবার এল রাজপুত্র। মেয়ে দেখেই পছন্দ। বলল—'বিয়ে করব।'

বেণুবালা বলল—'আমায় যৌতুক দিতে হবে যে?'

রাজপুত্র বলল—'আমি রাজার ছেলে পরে একদিন দেশের রাজা হব। তুমি হবে রানি। রাজ্যে সবই তখন তোমার হবে। আমি আবার তোমাকে যৌতুক দেব কেন?'

বেণুবালা বলল—'কিন্তু যৌতুক নেওয়াই যে আমার পণ।

রাজপুত্র বলল—'ওসব পণটন আমি বুঝি না। আমার সেপাই সান্ত্রী পাইক পেয়াদা তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে রাজবাড়িতে, সেখানে বিয়ে হবে।'

বেণুবালা বলল—'আমি বিয়ে করব না।'

রাজপুত্র বলল—'একথা আমি শুনব না।'

বেণুবালা বলল—'আমি চললাম।'

রাজপুত্র বলল—'কোথায় যাবে? আমার সেপাই সান্ত্রী তোমাকে আটক করবে।'

'কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না'—বলে বেণুবালা তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

রাজপুত্র এল তার পিছনে।

বেণুবালা এল পুকুরের ঘাটে। রাজপুত্র এল তাকে ধরতে। বেণুবালা ঝাঁপিয়ে পড়ল পুকুরের জলে। পুকুরভরা পদ্ম ফুটে ছিল, সেই পদ্মপাতা বেণুবালাকে জড়িয়ে ধরল। বেণুবালা ডুবল আর ভাসল না।

রাজপুত্রের হাঁকডাকে গাঁয়ের মানুষ ছুটে এল। জেলে ডুবুরি পুকুরে নামল। কিন্তু বেণুবালাকে খুঁজে পেল না। পুকুরে জাল ফেলা হল, কিন্তু সে জালে বেণুবালা ধরা পড়ল না। বেণুবালা পুকুরের জলে পদ্মপাতায় মিশে গেল।

কাঠুরে আর তার বউ কাঁদতে লাগল।

রাজপুত্র লোকজন নিয়ে ফিরে গেল।

দিনের আলো ফুরিয়ে রাতের আঁধার নামল। কাঁদতে কাঁদতে কাঠুরে আর তার বউ পুকুরপাড়েই কখন ঘুমিয়ে পড়ল। রাত গভীর হল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঠুরে-বউ স্বপ্ন দেখল, বেণুবালা পুকুর থেকে উঠে এসেছে, বলছে—'মা তুই কাঁদিসনে। আমি চাঁদের মেয়ে চাঁদে ফিরে গেছি। দুষ্টুমি করার জন্য বাবা আমাকে শাস্তি দিয়েছিল। তাই এই পৃথিবীতে এসে পড়েছিলাম। বাঁশবনে বাঁশের মাঝে তোরা আমায় পেয়েছিলি। আমার শাপের কাল শেষ হল। আমার পৃথিবীর কষ্টভোগ ফুরোল, তাই আমি আবার চাঁদে ফিরে এলাম। তোরা দুঃখ করিসনি। পূর্ণিমার রাতে চাঁদের পাশে তাকালে তোরা আমাকে দেখতে পাবি। আমি চাঁদের পিঠে বসে থাকব।'

কাঠুরে-বউ বলল—'তোকে ছেড়ে আমরা থাকব কেমন করে?'

বেণুবালা বলল—'তবে তোরা চল চাঁদের দেশে। আমি রামধনুর সিঁড়ি নামিয়ে দেব আকাশ থেকে।'

দেখতে দেখতে রামধনুর সিঁড়ি নেমে এল। কাঠুরে-বাবা মার হাত ধরে বেণুবালা সেই রামধনুর সিঁড়ি বেয়ে আকাশে উঠে গেল রাতের অন্ধকারে। কেউ জানল না, ঘুমন্ত গ্রামে কেউ দেখল না।

দেখল সবাই পরদিন সকালে, কাঠুরের কুঁড়ে শূন্য খাঁ খাঁ করছে।

সেই থেকে পূর্ণিমার চাঁদের পানে তাকালে বেণুবালাকে দেখা যায়। লোকে বলে—'চাঁদের বুড়ি!'

ছবি। সুব্রত মাজী



আকাশরাজ্যের রূপকথা

নির্মলকুমার দাস

অনেক দিন আগে জাপানের এক যুবরাজ ছিল। তার বিয়ে হয়নি। বিয়ের জন্যে তন্নতন্ন করে পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু মনের মতো পাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না। একদিন শোনা গেল জাপানের দক্ষিণদিকে এক রাজকন্যা আছে। রূপেগুণে সে একেবারে লক্ষ্মীসরস্বতী। এই শুনে যুবরাজ বলল, 'ওকেই বিয়ে করব আমি।'

ব্যস। শুরু হয়ে গেল তোড়জোড়। যুবরাজের হুকুমে পঞ্চাশটা ধবধবে সাদা ঘোড়া আনা হল। তাব থেকে যুবরাজ একটি ঘোড়া বেছে নিল। সেই ঘোড়ায় মেঘের ছবি আঁকা রুপোর জিন লাগানো হল। যুবরাজ পরল চাঁদ-সূর্যের ছবি আঁকা ঝলমলে পোশাক। কোমরে সোনার বেল্ট। হাতে নিল নীল রঙের হাতপাখা। তারপর ঘোড়ার পিঠে উঠে সে চাবুক হাঁকাল।

ছুটল ঘোড়া টগবগিয়ে। ছুটতে ছুটতে সমুদ্রের সামনে এসে থেমে গেল। কিন্তু এ তো আর যে-সে ঘোড়া নয় যে, সমুদ্র দেখে থমকে যাবে। পিছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে সে সামনের পা দুটো তুলে নিল আকাশে। তারপর সমুদ্র পেরিয়ে চলে এল এপারে। এপারে এক পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের রাজপ্রাসাদেই থাকে সেই রাজকন্যা।

জানলা দিয়ে যুবরাজের ঘোড়াকে দেখে রাজকন্যা বলল, 'আরে! এমন ঘোড়া তো আমি

কখনও দেখিনি। আহা, যদি পেতাম এই ঘোড়াটা।'

এদিকে জানলায় রাজকন্যাকে দেখে যুবরাজ অবাক হয়ে গেল। কী সুন্দর এক আলো বেরোচ্ছে রাজকন্যার শরীর থেকে। যুবরাজ বলল, 'আজ থেকে তুমি আমার রানি। চলো তুমি আমার সঙ্গে।' এই বলে সে রাজকন্যাকে নিয়ে ফিরে এল নিজের দেশে।

একদিন রাজকন্যা প্রাসাদের জানলা দিয়ে দেখল—সমুদ্রে একটা কালো নৌকা। নৌকাটা এদিকেই আসছে। যুবরাজকে ডেকে দেখাতেই যুবরাজ বলল, 'যে-সে নৌকা নয়। মনে হচ্ছে কোনো শত্রুর নৌকা। তুমি সাবধানে থাকো। আমি দেখে আসছি।'

যুবরাজ তিরধনুক নিয়ে ঘোড়ায় চড়ল। তারপর চলে এল সমুদ্রের ধারে। এদিকে ওই কালো নৌকাটাও অনেক কাছে চলে এসেছে। যুবরাজ আর দেরি করল না। ঝাঁকে ঝাঁকে তির ছুড়তে লাগল ওই নৌকায়। নিরানব্বইজন শত্রু তির বিঁধে সমুদ্রে পড়ে গেল। সেনাপতি তখনও নৌকায় ছিল।

যুবরাজ বলল, 'তোমার সৈন্যরা সব মারা গেছে। তুমি আর কীভাবে যুদ্ধ করবে। যাও, দেশে ফিরে যাও।' এই বলে সে প্রাসাদের দিকে ফিরতে লাগল।

ওদিকে নৌকা থেকে সেই সেনাপতি নেমে এল। তার মুখে কালো দাড়িগোঁফ। কোমর থেকে তরোয়াল বের করে সে যুবরাজের সামনে এল। বলল, 'কেন তুমি আমার বোনকে এখানে নিয়ে এসেছ?'

ব্যস। শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। যুবরাজ তরোয়ালের এক কোপে ওই সেনাপতির মাথা কেটে ফেলল। প্রাসাদে ফিরে রাজকন্যাকে সব বলতেই রাজকন্যা আঁতকে উঠল, 'কী করেছ তুমি? ও যে আমার ভাই।' এই বলেই রাজকন্যা অজ্ঞান হয়ে গেল। লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। তারপর মারা গেল।

যুবরাজ রাজকন্যাকে মেঝে থেকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর ঘোড়ার কাছে এসে বলল, 'আমার রানির আত্মা এতক্ষণে আকাশরাজ্যে চলে গেছে। চলো ওখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি তাকে।' এই বলে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল আকাশে।

ছুটতে ছুটতে একসময় তারা পৌঁছে গেল আকাশরাজ্যে। যুবরাজ ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে এক তারার সঙ্গে দেখা। সেই তারার নাম কৃত্তিকা। যুবরাজ তাকে বলল, 'কৃত্তিকা, ও কৃত্তিকা, তুমি কি আমার রানিকে দেখেছ?'

কৃত্তিকা বলল, 'না তো। একটু পরে কালপুরুষ ফিরবে। ওকে জিজ্ঞেস কোরো।'

একটু পরে কালপুরুষ এল। তাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, 'আমিও দেখিনি। একটু পরে শুকতারা ফিরবে। তাকে জিজ্ঞেস কোরো।'

শুকতারার সঙ্গে দেখা হতে শুকতারা বলল, 'হ্যাঁ দেখেছি। ওই যে সরোবর দেখছ, ওই সরোবরের পাড়ে একটা পাইন গাছ আছে। ঘোড়াকে নীচে বেঁধে রেখে তুমি গাছের মাথায় উঠে যাও। তোমার রানিকে তুমি দেখতে পাবে।'

ঠিক তাই। পাইন গাছের ওপর থেকে যুবরাজ দেখল—সরোবরে তিনজন স্নান করছে।

তাদের মধ্যে একজন তার রানি। তাড়াতাড়ি সে পাইন গাছ থেকে নামতে শুরু করল। এদিকে রাজকন্যা সরোবর থেকে উঠে এসেছে। পাইন গাছের সঙ্গে বাঁধা ঘোড়াটিকে দেখে সে চিনতে পারল।

এটা তো আমার সেই ঘোড়া! এখানে কী করে এল! রাজকন্যা কেঁদে ফেলল।

যুবরাজও চোখের জল ধরে রাখতে পারল না। তার চোখের জল ওপর থেকে রাজকন্যার গায়ে পড়তেই রাজকন্যা ওপর দিকে তাকাল।



'তুমি! এখানে কেন এসেছ?'

'তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি আমি! আচ্ছা, তুমি কি আর আগের জন্মে ফিরতে পারবে না?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে?'

রাজকন্যা বলল, 'তুমি যদি না খেয়ে, একটুও নড়াচড়া না করে রাজপ্রাসাদের দরজার সামনে টানা সাত দিন বসে থাকতে পারো, তাহলেই আমি আগের জন্মে ফিরে যেতে পারব।'

'এ তো খুব সহজ কাজ।'

যুবরাজ আর দেরি করল না। অনড় দেহে অনশন ব্রত নিয়ে সে রাজপ্রাসাদের সামনে বসে পড়ল।

সাত দিনও গেল না। এর মধ্যে আর এক কাণ্ড। যেদিন থেকে যুবরাজ রাজপ্রাসাদের

সামনে বসে আছে, সেইদিন থেকে গাছে আর ফুল ফুটছে না। ফুটে থাকা ফুলগুলোও সব ঝরে গেল। অকালে ঝরে পড়ল গাছের পাতা। শুকনো গাছে পাখিরা বসে ইতিউতি তাকাচ্ছে। তারাও রোগা হয়ে গেছে অনেক। ওদের গলায় কোনো ডাক নেই। কোনো গান নেই।

কী হল? সবাই ছুটল আকাশরাজ্যের রাজার কাছে। আকাশরাজাও মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন। সত্যিই তো। কেন এমন হল? গণক ডেকে আনার জন্যে তিনি দূত পাঠালেন। আকাশেও আছে সমুদ্র। সেই সমুদ্রে আছে নানান দ্বীপ। গণকরা সব ওই দ্বীপগুলোতে থাকে। তারা এল, গণনা করে বলল, 'একজন মানুষ সিংহদুয়ারে একভাবে বসে আছে। কিছুই খাচ্ছে না সে। শুধু মন দিয়ে প্রার্থনা করে যাচ্ছে।'

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'মানুষ!'

'হ্যাঁ পৃথিবী থেকে এসেছে। অন্য গ্রহ থেকে এসেছে বলে গাছে আর ফুল ফুটছে না। পাখিরা গান গাইছে না।'

আকাশরাজা হুকুম দিলেন ওকে ধরে আনার জন্য। তিনটে প্রহরী যুবরাজকে ধরে নিয়ে এল। প্রহরী নয়, ওরা আসলে দৈত্য।

আকাশরাজা বললেন, 'আকাশরাজ্যে তো পৃথিবীর মানুষের ঠাঁই হয় না। কেন এসেছ তুমি এখানে?'

যুবরাজ বলল, 'আমার রানি মারা যাবার পর এখানে এসেছে। আমি এসেছি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।'

'কোথায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?'

'পৃথিবীতে।'

আকাশরাজা বললেন, 'মারা যাবার পর কেউ আর পৃথিবীতে ফিরতে পারে না। কীভাবে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?'

যুবরাজ বলল, 'যেভাবে এসেছি।'

'কীভাবে এসেছ?'

'ঘোড়ায় চড়ে।'

'ঘোড়ায় চড়ে?' আকাশরাজা অবাক হলেন।

যুবরাজ বলল, 'আমার ঘোড়া যদি মেঘসমুদ্র সাঁতার কেটে এখানে আসতে পারে, ফিরিয়েও নিয়ে যেতে পারবে সে আমার রানিকে এখান থেকে পৃথিবীতে।'

'ঠিক আছে। নিয়ে যাও তোমার রানিকে।' এই বলে আকাশরাজা প্রাসাদের ভিতর থেকে কাগজের একটা বড়ো ঝোলা নিয়ে এলেন। বললেন, 'এর ভিতরে তোমার রানি আছে। পৃথিবীতে ফিরে তবেই ঝোলা খুলবে। তার আগে নয়।'

ঝোলাটা খুব হালকা। সত্যিই কি এর ভিতরে কেউ আছে? যুবরাজ ঝোলাটা নিয়ে চলে এল সেই সরোবরের কাছে। এখানেই তার ঘোড়াটা বাঁধা আছে পাইন গাছের সাথে। ঘোড়ায়

চড়ে সে চাবুক হাঁকাল। আর ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে আকাশে উঠল। তারপর ওড়া শুরু করল মেঘসমুদ্রে।

আচ্ছা, ঝোলার ভিতরে কি সত্যিই আমার রানি আছে? যদি থাকে, তাহলে ঝোলাটা এত হালকা কেন? আকাশরাজ্য থেকে পৃথিবীতে নেমেই সে ঝোলার মুখটা খুলল। আর তখনই একটা মাছি ঝোলা থেকে বেরিয়ে উড়ে গেল। এ-ই তাহলে আমার রানি। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল যুবরাজের। কেন যে ঝোলার মুখটা আমি খুলতে গেলাম।

ঘোড়া ততক্ষণে প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে গেছ। হঠাৎ যুবরাজ তাঁত বোনার খট খট খটাং শব্দ শুনতে পেল। তাঁতঘরের কাছে গিয়ে দেখল—তার রানি তাঁত বুনছে। তার আর আনন্দের সীমা রইল না।

ছবি। সুব্রত মাজী



বানর ও রঙিন পাখি

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

বানর আর রঙিন পাখির ছিল এক টুকরো ধানের খেত। ওই খেতে ছিল দুজনের ভাগ। চাষের সময় এগিয়ে আসছে। আগাছায় পথঘাট ঢেকে গিয়েছে। তাই পথ বানানো দরকার। রঙিন পাখি বলল, 'বন্ধু, দেখ সবাই কাজে নেমে পড়েছে, খেতে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করছে। আমাদেরও যে কাজে নামতে হয়।'

বানর বলল 'খুব জুতসই কথা। কিন্তু ভাই, তুমি তো জানো আমার পায়ে কেমন চোট লেগেছে। আমি তো এখন কাজে যেতে পারব না।'

'ঠিক আছে, তার জন্য কী হয়েছে। তুমি ভাই বাড়িতে থেকে বিশ্রাম নিয়ে সেরেসুরে ওঠ, আমি এখন না হয় একাই যাই।' এই কথা বলে রঙিন পাখি খেতের রাস্তা পরিষ্কার করতে একাই চলে গেল।

এমনি করে কয়েকদিন কেটে গেল। খেতে মাটি তৈরির সময় এসে গেছে। রঙিন পাখি বানরের কাছে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, সবাই খেতে নেমে পড়েছে, মাটি তৈরি করছে, আমাদেরও যে কাজে নামতে হয়।'

'উঃ, যা মাথা ধরেছে আমার, আমি যে আজ কোনো কাজই করতে পারব না।'

'আচ্ছা, তার জন্য কী আছে।' এই কথা বলে রঙিন পাখি খেতে চলে গেল, একমনে কাজ করতে লাগল সে।

কয়েকদিন পরে রঙিন পাখি এসে বলল, 'বন্ধু, সবাই খেতে নেমে পড়েছে, ধানের চারা বুনছে। আমাদেরও যে কাজে নামতে হয়।'

'এখন আমি কী করি? হায়! হায়! দিন তিনেক হল আমার যা কাশি হয়েছে না! এখন তো আমি মোটেই যেতে পারব না।'

'ঠিক আছে।' এই কথা বলে রঙিন পাখি চলে গেল খেতে চারা বুনতে। তার তো কিছু করার ছিল না, তাকে যে যেতেই হবে।

চারা বোনা হয়ে গেল, নিত্যি সে চারায় জল দেওয়া হল, গাছের গোড়ার ঘাস আগাছা একটা একটা করে তুলে ফেলতে হল, এমনি করে কষ্টের গরমকাল শেষ হল। এল সুন্দর শরৎকাল। সোনালি ধানের সারি হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে। এই ফসল যারা ফলিয়েছে তাদের মনেও খুশির দোলা। এবার ফসল কাটার পালা।

রঙিন পাখি বানরের কাছে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, সবাই খেতে নেমে পড়েছে, পাকা ফসল কাটছে। আমাদেরও যে কাজে নামতে হয়।'

'আর কী বলব ভাই। কয়েকটা কারণে আমার পিঠে আঘাত লেগেছে, আমার হাতে-পায়ে ভীষণ ব্যথা করছে, এমন মাথা ধরেছে যেন মাথা ছিঁড়ে পড়বে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' রঙিন পাখি তাড়াতাড়ি বলল, একটাও অনুযোগের কথা মুখে আনল না। ফসল কাটার ধকল তো কম নয়। অনেক খেটেখুটে রঙিন পাখি একাই সব কাজ করল। ধান ঘরে তুলে সে নিজেই ধান ভানলো, ঝাড়াই-মাড়াই করল—শেষকালে সাগরের মুক্তোর মতো চালের শস্যদানা বেরিয়ে এল।

সূর্য ডুবু ডুবু। বানর এল রঙিন পাখির ঘরে। মধু-ঢালা মুখে বলল, 'রঙিন পাখি, বন্ধু আমার, এতদিন কত কষ্টে তুমি একাই সব কাজ করলে। আমি তো কিছুই করতে পারলাম না। যাক, এখন এসো, আমরা দুজনে মিলে খাওয়ার জন্য কিছু ভাত রাঁধি।'

'খুব ভালো কথা, খুব ভালো কথা।' রঙিন পাখি সায় দিল। আজ সত্যি সে বড়ো ক্লান্ত, রাক্ষুসে খিদেও পেয়েছে। সে রাজি হল। তারা দুজনে ভাত রাঁধতে লাগল। উনুনে ভাত সেদ্ধ হওয়ার পরে তারা একটা পাত্রে ধোঁয়া ওঠা ভাত রাখল, তারপরে সেগুলো চটকে চটকে দলা দলা মতন করল। সুন্দর বাস বেরিয়েছে নতুন চালের রান্নায়।

ভাত দলা দলা করে পাকানো হয়ে গেলে বানর বলল, 'বন্ধু, হাত-মুখ ধোওয়ার জন্য তো জল চাই। তুমি একটু জল নিয়ে এসো।'

'ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ'। রঙিন পাখি একথা বলেই একটা পাত্র নিয়ে রান্নাঘরের পেছনে জল আনতে গেল।

যেই না রঙিন পাখি পেছন ফিরেছে, অমনি বানর পাত্র থেকে ভাতের দলাগুলো এক

তাল করে, তার মধ্যে একটা লাঠি ঢুকিয়ে, লাঠি কাঁধে ফেলে রওনা দিল। সোজা হেঁটে চলল পাহাড়-পানে।

জল নিয়ে ফিরে এসে রঙিন পাখি দেখে, বানর ঘরে নেই, একরত্তি ভাতও নেই সেই পাত্রে। সব বুঝল রঙিন পাখি। পেটে খিদে, চোখে জল, ধরা গলায় সে বলল, 'এমন স্বার্থপর বদ বানর! হায়! হায়! এমন করে ঠকাতে হয়?'

কাঁদতে কাঁদতে রঙিন পাখি চারিদিকে খুঁজে দেখল, এপাশ ওপাশ দেখল, কিন্তু কোথাও বানরের দেখা পেল না। এত কষ্টের পরে, অনেকদিনের আধপেটা খাওয়ার পরে আজ একটু ভালোভাবে খাবে ভেবেছিল, তাও হল না। বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসছে রঙিন পাখির। সে ভাবল, 'আমার কপাল মন্দ, এমনি করেই আমাদের দিন যাবে'।

এদিকে মনের আনন্দে সেই লোভী স্বার্থপর বানর জোরে জোরে পা ফেলে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে উপরে উঠছে। চোখদুটো চকচক করছে, জিভ দিয়ে তার জল গড়াচ্ছে। এইভাবে চলতে চলতে লাঠির ডগা থেকে কখন যে ভাতের তাল পড়ে গিয়েছে বানর তা খেয়ালই করেনি। শুধু লাঠি কাঁধে বাগিয়ে সে এগিয়েই চলেছে। 'রঙিন পাখি এখন কেমন কাঁদছে'— এই কথা চিন্তা করে মাথা দুপাশে নাড়িয়ে লেজ নাচিয়ে বানর চলেছে। পাহাড়ের একেবারে চুড়োয় এসে সে থামল। একটা চ্যাপটা পাথরের উপর সে লেজ ছড়িয়ে বসল, কাঁধের উপর থেকে লাঠিটা নামিয়ে লোভী চোখে তাকিয়ে বানর আঁতকে উঠল, ভাতের তাল নেই...।



রাগে-দুঃখে চিৎকার করে বানর বলল, 'কোথায় গেল আমার ভাত?' সেই শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে লেগে ফিরে এল বানরের কাছে। কেমন অবাক শোনাল সেই প্রতিধ্বনি। ফিরে চলল বানর সেই পথে যে পথে সে পাহাড়ের চুড়োয় উঠেছিল। খুব তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখল পথের উপরে, পথের দুপাশে। কোমর বেঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বানর চলছে ছোটো ছোটো জুলজুলে চোখ মেলে, মুখ থেকে গজরানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ঢালু বেয়ে অনেকটা নেমে আসার পরে বানর দেখল, একটা ঝোপের পাশে বসে রঙিন পাখি ধুলো থেকে ভাত তুলে খাচ্ছে। একমনে সে খেয়ে চলেছে।

'ও, রঙিন পাখি, তাহলে তুমি এখানে বসে আছ? ভাত খেতে কেমন লাগছে?

'ও হো! তুমি এসে গিয়েছ বানর। ধুলো-বালি সরিয়ে তুমি যদি ভাতের দলা মুখে দাও, তবে খেতে যে কী ভালোই লাগবে! আহা-হা!'

'তাহলে বন্ধু আমাকে একটুখানি দাও। চেখে দেখি।' ধপ করে জ্বলে উঠল রঙিন পাখির চোখ, নখগুলো খাড়া হয়ে উঠল। সে খুব শান্ত ভাবে বলল, 'অনেকগুলো দলা এখানে ওখানে পড়ে রয়েছে, তুমি একটা তুলে নিয়ে ধুলোবালি সরিয়ে খেতে পারো। আমি নিজে ফুঁ দিয়ে ধুলোবালি পরিষ্কার করছি আর খাচ্ছি।'

'তুমি কী করছ সেটা আমি জানতে চাইনি। আমি তোমার কাছে কিছুটা ভালো ভাত চাইছি'—বানর বলল।

'আমি তোমাকে এককণাও দেব না।' অনেক সয়েছে রঙিন পাখি, আর নয়। স্পষ্ট গলায় সে জবাব দেয়।

'এই কথা? ঠিক আছে। ভালোভাবে অন্ধকার নেমে আসুক, আমি আবার ফিরে আসব। তখন দেখাব তোমার মজা, মনে থাকে যেন।' রাগে গজগজ করতে করতে বানর পাহাড়ের দিকে হাঁটা দিল। আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল রঙিন পাখিকে।

বানর তো চলে গেল, এদিকে রঙিন পাখি বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছে। বানর তাকে শাসিয়ে গেল, আড়চোখে তাকিয়ে গেল, আলো চলে যাবার পরে আসবে বলল—এইসব চিন্তা করতে করতে রঙিন পাখির খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

কী আর করে! ঘরে ফিরে এসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল 'উঁ উঁ'।

তার কান্না শুনে একটা ডিম গড়াতে-গড়াতে-গড়াতে রঙিন পাখির পাশে এসে থামল। বলল, 'ও রঙিন পাখি, কী হয়েছে ভাই তোমার, এমনি করে কাঁদছ কেন?'

'বানর আমাকে শাসিয়ে গিয়েছে, অন্ধকার নেমে এলেই সে আসবে আর আমায় মজা দেখাবে। আমি এখন কী করি, তাই কাঁদছি।'

'কিচ্ছু ভেবো না তুমি, আমি তোমায় সাহায্য করব। কিচ্ছু ভেবো না।' ডিম তাকে বলল।

তবু কাঁদছে রঙিন পাখি। দরজা বন্ধ করার লম্বা লাঠি লম্বা পায়ে এগিয়ে এসে রঙিন পাখিকে বলল, 'ও রঙিন পাখি, কী হয়েছে ভাই তোমার, এমনি করে কাঁদছ কেন?'

'না কেঁদে কী-ই বা করি বলো! অন্ধকার হলেই বানর আসবে আর আমায় মজা দেখাবে। আমি এখন কী করি, তাই কাঁদছি।'

'আমিও তোমায় সাহায্য করব, তুমি কিছু ভেবো না। আর কেঁদো না।' দরজা বন্ধ করার লম্বা লাঠি তাকে বলল।

তবুও কাঁদছে রঙিন পাখি। তার কান্না শুনে এগিয়ে এল একটা কেন্নো, একটা ছারপোকা, আর একটা মাদুর-বোনা লম্বা মোটা সুচ। তাদের আসতে দেখে এগিয়ে এল ঘোড়ার খাবার-রাখা পাথরের জালা আর একতাল গোবর। তারা সবাই বলল, 'রঙিন পাখি, রঙিন পাখি, আর তো তোমার কান্নার কিছু নেই। তুমি বিপদে পড়েছ, তাই আমরা সবাই মিলে তোমাকে সাহায্য করব। এটা যে করতেই হবে। তুমি আর কেঁদো না।'

সূর্য ডুবে গেল। তখনও আকাশের এক কোণে আলোর ছটা। সে আলোর ছটাও মিলিয়ে গেল একসময়। চারিদিকে অন্ধকার নেমে এল।

এরা সবাই তৈরি হয়ে নিল। দুষ্টু শত্রুকে মজা দেখাতে হবে। দরজা ভেজিয়ে লম্বা লাঠি পাশে দাঁড়িয়ে রইল, ডিম ঢুকে পড়ল উনুনে, সুচ উনুনের সামনে মুখ উঁচু করে দাঁড়াল, কেন্নো জলের কেতলির মধ্যে ভাসতে লাগল, ছারপোকা সয়াবিনের নোনতা তরকারির মধ্যে চুপটি করে বসে রইল, বাগানে যাওয়ার দরজার সামনে গোবর ছড়িয়ে পড়ল আর পাথরের জালা ছাদে উঠে কড়িকাঠে বসে রইল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে তারা সবাই বানরের আসার অপেক্ষায় চুপ করে থাকল।

নিকষ কালো অন্ধকার। চারিদিকে কিছুই দেখা যায় না। কোনো শব্দও নেই আশেপাশে।

এমন সময় দূর থেকে তারা বানরের রাগী গলা শুনতে পেল। 'রঙিন পাখি, আমি ঠিক এসে গিয়েছি, এবার তোর মজা দেখাচ্ছি। রঙিন পাখি, তুই হতচ্ছাড়া কোথায়?'

দরজার কাছে এল বানর। সাড়া নেই শব্দ নেই, অন্ধকার নিঝুম বাড়ি। 'রঙিন পাখি, দোর খোল, আমি সেই বানর, এখন এসে গিয়েছি। আমি তোর মজা দেখাচ্ছি।' যত জোরে পারে বানর চিৎকার করতে লাগল।

তবু কেউ সাড়া দিল না। 'তুই নিজেই দোর খুলবি, না আমি দোর ভেঙে ফেলব? যাই কর না কেন, আমি ভেতরে ঢুকে তোকে মজা দেখাব। কেউ বুঝতে পারবে না!' এই না বলে বানর দড়াম করে মারল এক লাথি। দরজা ভেজানো ছিল, ক্যাঁচ করে শব্দ হয়ে দরজা গেল খুলে। আর খোলা দরজায় যেই না বানর মাথা গলিয়েছে, অমনি লম্বা লাঠি গায়ের জোরে তার মাথার উপরে এসে পড়ল।

'কে? কে? কে আমার মাথায় মারল? উঃ বড্ড শীত করছে।' বানর তাড়াতাড়ি উনুনের কাছে গেল, নিভন্ত উনুনে ফুঁ দিল। অমনি ডিম গেল ফেটে, গরম কুসুম তার মুখে লেপটে গেল। 'উঃ, পুড়ে গেলাম।' বলেই বানর পেছনে পড়ে গেল। সেখানে সুচ ছিল উঁচিয়ে, ফুটে গেল বানরের পেছনে। 'মুখ পুড়েছে পেছন কেটে রক্ত ঝরছে, সয়াবিনের ঠান্ডা তরকারি লাগালে আরাম লাগত'—এই না বলে বানর সয়াবিনের তরকারি আনতে পাশে গেল।

তাড়াতাড়িতে পশ্চাতে-মুখে না লাগিয়ে লোভী বানর তা মুখে পুরে দিল, কামড় বসাল ছারপোকার গায়ে। 'ওঃ কী বিচ্ছিরি গন্ধ, কী তেতো'—চিৎকার করে মুখে জল দিতে কেতলির কাছে গেল বানর। জল মুখে ঢালতেই সুড়ুৎ করে কেন্নো বেরিয়ে তার মুখে ঢুকে গেল আর বানরের জিব প্রাণপণে কামড়ে দিল।

'হায় হায়! আমি এসেছিলাম রঙিন পাখিকে মজা দেখাব বলে, আর এখন হতচ্ছাড়া রঙিন পাখিই উলটে আমাকে মজা দেখাচ্ছে। এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। হায়! হায়! এ আমার কী হল?' গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগল সেই দুষ্টু বানর।

'এখন আর না, পালাতে হবে এখান থেকে।' অবাক হয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে বানর বাগানের দরজা দিয়ে পালাতে গেল। পথে ছিল লেপটানো গোবর। সড়াৎ করে উলটে পড়ল বানর, চিৎপাত হয়ে দড়াম করে মেঝেতে আছাড় খেল।

'এইবার আমার পালা। এইবার বানরকে উচিত শিক্ষা দেব আমি। লোভী বানরকে শেষ করব আমি।' ভারী মোটা গলায় চিৎকার করে উঠল কড়িকাঠে বসে-থাকা সেই পাথরের জালা। গড়িয়ে পড়ল সে সেখান থেকে, সোজা এসে পড়ল বানরের শক্ত মাথায়। মাথা গেল ফেটে আর একবার নড়েই বানর গেল মরে। বানরকে মজা দেখাবার সব কাজ শেষ হল।

ছবি। সুব্রত মাজী



এক বাঁদর ও এক শুয়োর

প্রদীপচন্দ্র বসু

অনেক অনেক দিন আগে জাপানের শিনশিন প্রদেশে একজন বাঁদর-খেলানেওলা ছিল। বাঁদর নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে মজার খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সে খুব খারাপ মেজাজ নিয়ে বাড়ি ফিরল। বউকে বলল পরদিন সকালে কসাইকে ডেকে আনতে।

বউ হতভম্ব। জিজ্ঞেস করল, "তুমি কসাইকে ডেকে আনতে বলছ কেন আমাকে?"

"এই বাঁদরটাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে আর কোনও লাভ হয় না।" উত্তর দিল স্বামী "ব্যাটা বুড়ো হয়ে গেছে, খেলাগুলোও মনে রাখতে পারে না। যতটা পারি লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে মনে করানোর চেষ্টা করি, কিন্তু ও ঠিকভাবে নাচে না। আমি এবার ওকে কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেব। যা টাকা পাই তা-ই আমার লাভ। এছাড়া আর কিছু করার নেই।"

অবলা ছোট্ট প্রাণিটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে খুব মন খারাপ হয়ে গেল বউয়ের। স্বামীকে অনেকবার অনুরোধ করল বাঁদরটাকে রেহাই দিতে। কিন্তু সব অনুরোধ ব্যর্থ হয়ে গেল। কসাইয়ের কাছে বাঁদরকে বিক্রি করার সিদ্ধান্তে অনড় রইল তার স্বামী।

এখন হয়েছে কী, এইসব কথাবার্তা চলার সময় বাঁদরটা ছিল পাশের ঘরে। ফলে সবই শুনে ফেলেছিল ও। বুঝতে পেরেছিল কথাবার্তার অর্থ। 'আমাকে এবার মেরে ফেলা হবে।' মনে মনে নিজেকে বলল, "আমার প্রভু সত্যিই নৃশংস। এত বছর ধরে আমি বিশ্বস্তভাবে সেবা করা সত্ত্বেও আমার শেষ দিনগুলি আরামে ও শান্তিতে কাটাতে দিতে চায় না। আমাকে কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেবে। আমার দুর্বল শরীরটাকে কেটে, ঝলসিয়ে স্যুপ বানিয়ে খাবে অনেকে। হায় কী দুর্ভাগা আমি! এখন আমি কী করি।"

নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ বাঁদরটার মাথায় একটা দারুণ বুদ্ধি খেলল। ওর মনে পড়ল কাছের জঙ্গলে এক বুনো শুয়োর থাকে। অনেকের মুখে তার জ্ঞান ও বাস্তব বুদ্ধির প্রশংসা শুনেছে। বাঁদর ভাবল, 'আমি যদি কাছে গিয়ে আমার দুর্দশার কথা বলে পরামর্শ চাই, শুয়োর নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবে।'

নষ্ট করার মতো সময় ছিল না হাতে। ভাবনাটা মাথায় আসতেই বাঁদর চুপিসাড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যত দ্রুত সম্ভব দৌড়ে জঙ্গলে গেল শুয়োরের সঙ্গে দেখা করতে। শুয়োর নিজের বাড়িতেই ছিল। দেখা হতেই বাঁদর তার দুর্দশার কথা খুলে বলতে শুরু করল।

"মাননীয় শুয়োর মশাই, আমি তোমার অসাধারণ জ্ঞান ও বাস্তব বুদ্ধির কথা শুনেছি। এই মুহূর্তে আমি খুবই বিপদগ্রস্ত, যার থেকে উদ্ধারে একমাত্র তুমিই আমাকে সাহায্য করতে পারো। প্রভুর সেবা করতে করতে এখন বুড়ো হয়ে গেছি আমি। আগের মতো আর ঠিকঠাক নাচতে পারি না। এজন্য আমাকে কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হবে। আমাকে বলো, আমি এখন কী করব? তুমি যে কীরকম বুদ্ধিমান, তা তো আমি জানি।"

বাঁদরের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে খুব প্রীত হল শুয়োর। ঠিক করল বাঁদরকে সাহায্য করবে। তারপর একটু ভেবে জিজ্ঞেস করল, "তোমার প্রভুর কি ছেলেমেয়ে আছে?"

"হ্যাঁ।" উত্তর দিল বাঁদর, "একটা বাচ্চা ছেলে আছে।"

শুয়োর আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার প্রভুপত্নী যখন সকালবেলা দিনের কাজ শুরু করে, তখন কি বাচ্চাটাকে দরজার কাছে শুইয়ে রাখে?"

বাঁদর উত্তর দেবার আগেই শুয়োর বলল, "ঠিক আছে। কাল সকালে তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রথমে সব দেখব। যখনই সুযোগ পাব, বাচ্চাটাকে মুখে করে তুলে নিয়ে দৌড় লাগাব আমি।"

"তারপর কী হবে?" জিজ্ঞেস করল বাঁদর।

শুয়োর বলল, "ঘটনাটা ঘটতেই বাচ্চার মা ভয় পেয়ে প্রচণ্ড ঘাবড়ে যাবে। তোমার প্রভু ও প্রভুপত্নী সেই মুহূর্তে কী করবে বুঝে ওঠার আগেই তুমি আমার পেছন পেছন দৌড়োতে শুরু করবে। এভাবে কিছুদূর এসে ওদের চোখের আড়াল হলে বাচ্চাটাকে আমার কাছ থেকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরে বাবা মার হাতে সযত্নে তুলে দেবে। দেখবে, কাল কসাই এলে ওরা প্রাণে ধরে তোমাকে বিক্রি করে দিতে পারবে না।"

শুয়োরের পরামর্শ শুনে বাঁদর আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু সে

রাত্রে ও ঘুমোতে পারল না। এটা খুব স্বাভাবিক। ওর শুধু চিন্তা হচ্ছিল, কাল কী হবে, শুয়োরের করা ফন্দি অনুযায়ী ঠিকমতো সব হওয়া না হওয়ার ওপর নির্ভর করছে ওর জীবন। পরদিন সকালে সবার আগে ঘুম থেকে উঠল ও। এবং কী ঘটে তার জন্য উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রভুপত্নী ঘুম থেকে উঠে ঘরের দরজা খুলে আলোর মুখ দেখে কাজ শুরু করার আগে পর্যন্ত ওর মনে হল যেন অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করে আছে। এরপর সবই শুয়োরের ফন্দি অনুযায়ী ঘটে গেল। বাড়িঘর পরিষ্কার করে প্রাতরাশ বানাবার আগে মা বাচ্চাটাকে ঘরের সামনে বারান্দায় শুইয়ে রেখে দিল।

মাদুরের ওপর মৃদু চাপড় দিয়ে দিয়ে ভোরের নরম রোদে বাচ্চাটা মনের আনন্দে একা একা খেলা করছিল। অকস্মাৎ বারান্দায় কীরকম একটা আওয়াজ হল এবং পরক্ষণেই শোনা গেল বাচ্চাটার জোরে কান্নার শব্দ। রান্নাঘর থেকে এই শব্দ শুনে প্রভুপত্নী সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল। বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখল বাচ্চাটা সেখানে নেই। তারপর বাড়ির বাইরে যাবার গেটের দিকে নজর ঘোরাতেই দেখে, একটা শুয়োর বাচ্চাটাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে অসহায়ভাবে সামনে দু'হাত মেলে জোরে চিৎকার করে উঠল প্রভুপত্নী। তারপর দ্রুত দৌড়ে গেল ঘরের ভেতরে, যেখানে ওর স্বামী তখনো গভীর ঘুমে নিমগ্ন।

স্ত্রীর ভয়ার্ত চিৎকার শুনে স্বামী ঘুম থেকে উঠে বসে দু-হাতে চোখ ঘষতে ঘষতে জিজ্ঞেস



করল, কীসের জন্য এত চিৎকার, চেঁচামেচি? স্ত্রীর কাছে সব শুনে দুজনে যখন বাড়ির গেটের বাইরে এল, বাচ্চা নিয়ে শুয়োরটা তখন অনেক দূর চলে গেছে। ওরা দেখল, শুয়োরটাকে ধরার জন্য বাঁদর পেছন পেছন যত জোরে পারে দৌড়ে ধাওয়া করছে।

বিচক্ষণ বাঁদরের এই সাহসী আচরণ দেখে স্বামী স্ত্রী দুজনেই তারিফ না করে পারল না। শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত বাঁদর যখন বাচ্চাকে সুস্থ অবস্থায় কোলে ফিরিয়ে দিল, সীমাহীন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল ওদের অন্তর।

"দেখো! দেখো!" স্ত্রী বলল। "এই প্রাণিটাকে তুমি মেরে ফেলার ব্যবস্থা করছিলে। আজ বাঁদরটা না থাকলে আমরা চিরদিনের জন্য হারাতাম আমাদের সন্তানকে!"

বাচ্চাকে কোলে করে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বাঁদর-খেলানেওলা বলল, "বউ আমার, এটা তুমি ঠিকই বলেছ। কসাই এলে তাকে ফিরিয়ে দিয়ো। আর, এবার আমাদের জন্য ভালো করে প্রাতরাশ বানাও তো। বাঁদরটাকেও খেতে দিয়ো কিন্তু।"

কসাই আসার পর তাকে বলা হল রাত্রে খাবার জন্য শুয়োরের মাংস দিয়ে যেতে। বাঁদরটা এরপর বাকি দিনগুলি সুখেই কাটাতে লাগল ওই বাড়ির পোষ্য হয়ে। ওর প্রভু লাঠি দিয়ে আর একদিনও মারেনি তাকে।

ছবি। সুব্রত মাজী



ঘোড়ামাথা বেহালা

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

মোঙ্গাল দেশের বেহালা একটু অন্যরকমের। ঠিক ঘোড়ার মাথার মতন দেখতে, তার ওপরে জড়ানো থাকে তার। এই বাজানোর যন্ত্রটি মোঙ্গলীয়দের খুব পছন্দ।

ঘোড়ার মাথার মতন এই বেহালার সৃষ্টি প্রথম কী করে হয়, তার একটি সুন্দর গল্প আছে।

এই গল্প সেই দেশের অনেকেই জানে। গল্পটি বড়ো করুণ।

সুহো বলে একটি রাখাল ছেলে ছিল। সে-ই প্রথম ঘোড়ামাথা বেহালা তৈরি করে। সে অনেকদিন আগেকার কথা।

সুহো ছিল খুব গরিবের ছেলে। চাহারের চরানে জমির ধারে সে থাকত। তার মা-বাবা কেউই ছিল না। দিদিমা তাকে মানুষ করে, আর দিদিমার কাছেই থাকত সে।

তাদের নিজেদের সম্পত্তি বলতে ছিল প্রায় একশো ভেড়া। সুহো সেই ভেড়ার পাল নিয়ে চরাতে যেত। আর দিদিমা রান্না আর ঘরের সব কাজকর্ম করত।

সুহো গান গাইতে পারত ছেলেবেলা থেকেই। তারপর যখন তার সতেরো-আঠারো বছর

বয়স হল, তখন সে বেশ ভালো গাইয়ে বলে সারা অঞ্চলে বিখ্যাত হয়ে উঠল। তার গান ভালোবাসত না এমন লোক ও অঞ্চলে প্রায় ছিল না বলাই চলে। রাখালের দল থেকে আরম্ভ ক'রে আশেপাশের জায়গায় মোড়লেরা পর্যন্ত তার গান মুগ্ধ হয়ে শুনত। সকলের ভালোবাসা পেয়ে তার দিন বেশ আনন্দে কেটে যেত।

রোজ সন্ধের আগেই ভেড়ার পাল চরিয়ে বাড়ি ফিরত সুহো।

কিন্তু সেদিন তার ফিরতে বড়ো দেরি হচ্ছিল। সূর্য অস্ত গেছে, আর সকলেই যে যার ঘরে ফিরেছে। কিন্তু সুহোর তখনও দেখা নেই। সন্ধে হয়ে আসছে, এখনই চারিদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। এই দেখে তার দিদিমা ছটফট করছিল নাতির জন্যে। প্রতিবেশীদেরও ভাবনা হচ্ছিল। কী হল ছেলেটার? কোনোদিন তো এত দেরি সে করে না।

আরও খানিকক্ষণ কেটে যাবার পরে ফিরে এল সুহো। হাতে তার সাদা মতন নরম তুলতুলে কী একটা রয়েছে। সবাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখে, একটা সাদা ধবধবে বাচ্চা!

সকলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে সুহো হাসতে হাসতে বললে, 'রাস্তার ধারে পড়ে বেচারি কষ্ট পাচ্ছিল। ওর মাকেও সেখানে দেখতে পেলুম না। রাত পর্যন্ত ওখানে থাকলে আর রক্ষে ছিল না। নেকড়েরা ঠিক খেয়ে ফেলত। তাই নিয়ে এলুম, আমাদের খোঁয়াড়ে থাকবে।'

শুনে তার দিদিমা বললে, 'তা বেশ করেছিস।'

সেটা একটা টাট্টু ঘোড়ার বাচ্চা।

তারপর দিন যায়।

দেখতে দেখতে বাচ্চাটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর বড়ো হয়ে উঠল। একে ভালো জাতের টাট্টু, তার ওপর সুহোর আদর-যত্ন। দিনে দিনে বাচ্চাটা এমন সুন্দর হল যে, সকলেরই তাকে খুব ভালো লাগত। যে তাকে দেখত, সে-ই গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করত। আর সুহো যে তাকে কী ভালোবাসত তা আর বলবার নয়। সারাদিন সে টাট্টুটাকে কাছে কাছে রাখত, নিজের হাতে খেতে দিত।

একদিন রাতে সুহো ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ চিঁহিঁ চিঁহিঁ শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। একটুখানি শুনেই সে বুঝতে পারলে এ তার টাট্টুর ডাক। ধড়মড়িয়ে উঠে সে ছুটল খোঁয়াড়ের দিকে।

যেতে যেতেই সে শুনতে পেলে, তার ভেড়ারাও ভীষণ চিৎকার করছে। এ সাধারণ চিৎকার নয়, প্রাণের ভয়ে যেন তারা মরিয়া হয়ে ডাকছে।

সেখানে ছুটে এসে সুহো দেখলে, একটা নেকড়েবাঘের সঙ্গে লড়ছে তার টাট্টু!

সুহো তাড়াতাড়ি নেকড়েটাকে সেখান থেকে দূর করে দিলে। তার আদরের সাদা ঘোড়াটা এতক্ষণ নেকড়েটার সঙ্গে লড়াই করে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার তখন গলদঘর্ম অবস্থা। তাকে দেখে সুহো বুঝতে পারলে, টাট্টু তার নিজের প্রাণ বিপন্ন করে নেকড়েটাকে আটকে রেখেছিল। না হলে এতক্ষণে কত ভেড়া যে শেষ হয়ে যেত তার ঠিক নেই।

তার আদরের টাট্টুকে সে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল। সে-ও যেন একজন মানুষ, এমনভাবে তার গলা জড়িয়ে ধরে সুহো বললে, 'ওরে, তুই আজ আমার ভেড়ার পালকে বাঁচিয়েছিস। তুই না থাকলে আমার সব যেত আজকে।'

এই বলে সুহো তাকে কত আদর করতে লাগল।

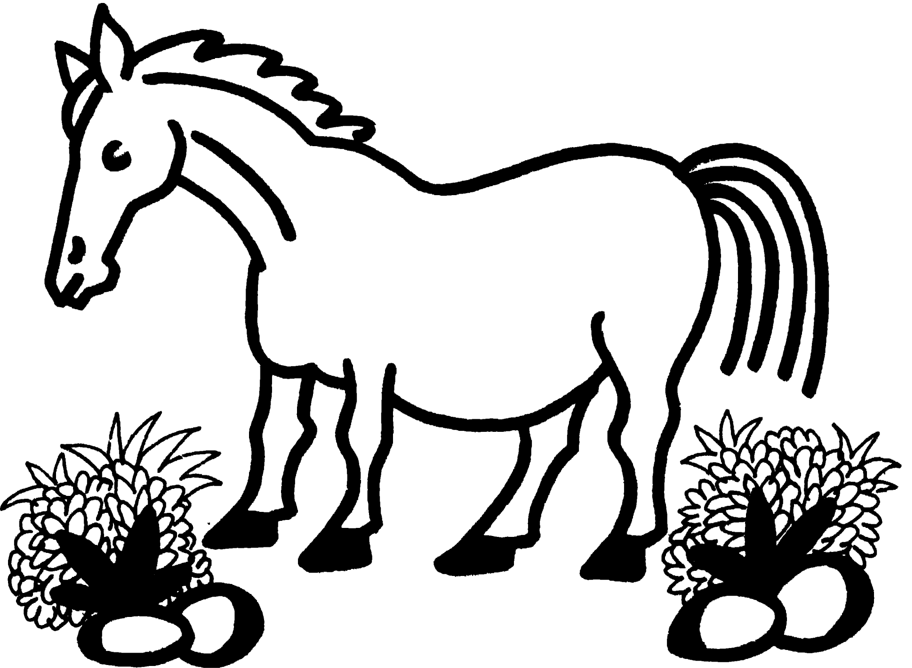
সেই দিন থেকে ঘোড়াটি তার আরও প্রিয় হয়ে উঠল। তার সঙ্গে সে বন্ধুর মতন ব্যবহার করতে লাগল। রাতে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত সে একদণ্ড তাকে কাছ ছাড়া করত না।

এমনিভাবে দিন যেতে লাগল।

সেবার শীত চলে গিয়ে বসন্তকাল আরম্ভ হয়েছে। এমন সময় একটা নতুন খবর শোনা গেল লোকের মুখে।

সেখানকার রাজা চরানে জমির উপর দিয়ে এক ঘোড়দৌড়ের আয়োজন করেছেন। এই ঘোড়দৌড় আরম্ভ হবে লামা মন্দিরের সামনে। শুধু তাই নয়। যার ঘোড়া এই বাজি জিতবে, তার সঙ্গে রাজা তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন।

সুহো এই ঘোড়দৌড়ের কথা শুনলে। কিন্তু প্রথমে সে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার কথা ভাবেনি। তার বন্ধু-বান্ধবেরা তাকে বার বার বলতে লাগল টাট্টুকে ঘোড়দৌড়ে নিয়ে



যাবার জন্যে। তাদের উৎসাহ দেখে সুহো শেষ পর্যন্ত রাজি হল। তার সাদা টাট্টু ঘোড়াটিকে নিয়ে সে গেল সেখানে।

তারপর যথাসময়ে ঘোড়দৌড় আরম্ভ হল।

সুহোর মতন আরও অনেকেই প্রতিযোগিতায় এসেছে। তার বয়সি, তার চেয়ে বড়ো অনেক ঘোড়সওয়ার তাদের ভালো ভালো ঘোড়ায় চেপে যোগ দিয়েছে এই দৌড়ে।

তারা সবাই লাগাম ধরে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। কিন্তু সুহোর টাট্টুর সঙ্গে কেউ পেরে উঠল না। সাদা ঘোড়ার সওয়ার হয়ে সুহো পৌঁছে গেল সবার আগে।

রাজা সেখানেই উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বললেন, 'ওই সাদা ঘোড়া হাঁকিয়ে যে এল তাকে ডেকে আনো।'

সুহো কাছে এসে দাঁড়াতে রাজা তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু যখন শুনলেন যে সে একজন সামান্য রাখাল, অমনি তাঁর মন অন্যরকম হয়ে গেল। তিনি নিজের মুখে আগে কী বলেছিলেন সে কথা আর তিনি মানলেন না। নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা মুখেই আনলেন না আর।

বরং চালাকি করে বললেন, 'তোমার ঘোড়ার জন্যে তোমায় তিনটে বড়ো বড়ো সোনার খামি দেওয়া হবে। তুমি এবার বাড়ি যেতে পারো।'

সুহোর সরল মন। রাজার কথা শুনে সে রাগে চিৎকার করে উঠলে, 'কী? আপনি ভেবেছেন, আমার সাদা টাট্টু আপনি কিনে ফেলবেন? আমি ঘোড়দৌড়ে এসেছি, ঘোড়া বেচতে নয়।'

রাজার অনুচর আর চাকরেরা তো তার কথা শুনে খেপে উঠলে—'এত বড়ো স্পর্ধা! একটা রাখাল রাজার মুখের উপর এমন চোপা করবার সাহস পায়? ওকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে।'

এই বলে সবাই মিলে সুহোকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেললে। আর রাজা তাঁর দলবলের সঙ্গে তার সাদা ঘোড়াটিকে নিয়ে চলে গেলেন প্রাসাদে।

সুহোর বন্ধু-বান্ধবেরা তাকে ধরাধরি করে তার ঘরে নিয়ে গেল। দিদিমার সেবা-যত্নে দিনকতক পরে বেচারি একটু সুস্থ হল। কিন্তু অমন আদরের ঘোড়াটি এইভাবে হারিয়ে তার মনে আর সুখ-শান্তি রইল না। অতি দুঃখে তার দিন কাটতে লাগল।

ওদিকে রাজা এমন চমৎকার একটি সাদা ঘোড়া পেয়ে মহা খুশি। তিনি সকলকে ঘোড়া দেখাতে লাগলেন। তারপর একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন তাঁর প্রাসাদে।

সেই উৎসবের সময়ে সবাইকে সাদা ঘোড়াটি দেখাবার ইচ্ছে হল তাঁর। তিনি হুকুম করলেন, ঘোড়াকে সেখানে নিয়ে আসবার জন্যে।

প্রাসাদের সামনে প্রকাণ্ড সভায় তাঁর নিমন্ত্রিত লোকেরা তখন বসে ছিল। তাদের সামনে রাজা সেই টাট্টু ঘোড়ায় চেপে বসলেন। আর বসামাত্র ঘোড়া পিঠের এক ঝাঁকুনি দিয়ে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিলে, আর সভার লোকদের মাঝখানে দিয়ে টগবগিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলে।

রাজা কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে, রাগে কাঁপতে কাঁপতে হুংকার দিলেন, 'শিগগির ধর। যদি ধরতে না পারিস ওটাকে মেরে ফেল।'

অমনি রাজার লোকেরা তির ছুঁড়তে লাগল ঘোড়াকে তাক করে। তখন ঘোড়াও প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করেছে, আর রাজার লোকজনও ছুড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে তির।

ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে কোনোরকমে তাদের নাগাল থেকে পালালে। কিন্তু শরীর তখন তার ক্ষত বিক্ষত।

সেই রাতে কীসের আওয়াজে সুহোর ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসে সে শুনলে, দরজায় বাইরে থেকে কে ধাক্কা দিচ্ছে।

সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কে ওখানে?'

কোনো জবাব নেই, কিন্তু দরজায় ধাক্কার শব্দ সমানে হচ্ছে।

তখন সুহোর দিদিমা তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুললে আর অবাক হয়ে বলে উঠলে, 'ওরে, ঘোড়াটা ফিরে এসেছে!'

সুহো ছুটে গিয়ে দেখলে—হ্যাঁ, সত্যিই তার সাদা টাট্টু আবার এসেছে! কিন্তু হায়, এ তার কী অবস্থা? তার সর্বাঙ্গে তির বিঁধে রয়েছে!

সুহো দাঁতে দাঁত চেপে কোনোরকমে কান্নাকে রুখতে লাগল, আর একটি একটি করে তিরগুলো ঘোড়ার গা থেকে খুলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে বেচারির প্রায় সর্বাঙ্গ থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। দেখে সুহোর বুক যেন ভেঙে গেল দুঃখে।

সে আর তার দিদিমা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল, সেবা-শুশ্রূষা করে ঘোড়াটাকে বাঁচাতে। কিন্তু এমন সাংঘাতিকভাবে সে আহত হয়েছিল যে কিছুতেই তাকে বাঁচানো গেল না। সুহোর চোখের সামনেই পরের দিন সে মারা গেল।

সুহো তার প্রিয় ঘোড়ার শোকে সারাদিন মনমরা হয়ে থাকত। তার কিছু ভালো লাগত না, কিছুতে সে আনন্দ পেত না। রাতে ভালো করে ঘুমোতে পর্যন্ত পারত না বেচারি।

এমন সময় এক রাতে সে তন্দ্রার ঘোরে দেখলে—তার সাধের ঘোড়াটি বেঁচে উঠে আবার ফিরে এসেছে! আবার তেমনি মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। তারপর সামনে এসে বলছে, 'একটা উপায় আছে, সেটি করলে আমি সব সময় তোমার কাছে থাকতে পারি। আমার হাড়গুলো দিয়ে একটা বেহালা তৈরি করে নাও। তাহলে সব সময় তুমি আমাকে পাবে!'

পরের দিন সকালে সুহো একটা নতুন বেহালা তৈরি করতে বসলে। বাজনা তৈরি করতে করতে জলে ভরে উঠল তার দু'চোখ। যে ছিল তার বন্ধুর মতন প্রিয়, সেই সাধের ঘোড়ার হাড় থেকে খোদাই করলে তারই মাথার মতন গড়ন। ঠিক যেন তার সাদা ঘোড়ার মাথা।

তাই দিয়ে বেহালার ওপরের দিকটা তৈরি হল। তারপর ঘোড়ার শিরা দিয়ে তৈরি করলে বেহালার তার। আর তার মাথার চুল দিয়ে হল—ছড়।

এমনি করে সুহো একটি নতুন বেহালা তৈরি করলে। ঘোড়ার মাথাওয়ালা তার নিজস্ব বেহালা।

যখনই সে এই যন্ত্রটি নিয়ে বাজাত, সেই রাজার দুর্ব্যবহার তার সবই মনে পড়ে যেত। আর মনে পড়ত আগেকার দিনের সব কথা, যখন সে এই সাদা টাট্টুর পিঠে চেপে টগবগিয়ে ছুটত হাওয়ায় সঙ্গে। তার এই সব মনের ভাব ফুটে উঠত তার বাজনায়, তার গানের সুরে।

এমনি করে তার গানে আর বাজনায়—শুধু তার নয়—সমস্ত রাখালদের মনের কথা, দুঃখ-সুখের কথা যেন ফুটে বেরুত।

সুহোর সুর সবাইকার মনের আবেগ আর আশা-ভরসার সঙ্গে মিলে যেত। তাই সকলে কাজের শেষে সন্ধের পর আসত তার বাজনা শোনবার জন্যে। তার সুর শুনতে শুনতে নিজেদের সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে যেত।

সুহোর সেই ঘোড়ার মাথার মতন বেহালাটি থেকে ক্রমে অমনি বাজনার চলন হয়ে যায় মোঙ্গল দেশে।

ছবি। শঙ্কর বসাক



মানিক্য বন্দ্যোপাধ্যায়

হাঙাই নামে এক পাহাড়। পাহাড়ের উপরে একটি গাছে বাস করত এক সুন্দর পাখি। নাম তার তোকানো। নীচের রাস্তা দিয়ে ব্যবসায়ীরা যেত বাণিজ্য করতে, রাজপুরুষেরা দূরের গ্রামে গ্রামে যেত খাজনা আদায় করতে, সুন্দর সেই বন-পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে ভ্রমণকারীরা যেত নতুন দেশ দেখতে। তারা শুনতে পেত তোকানো পাখির গান। যেমন মিষ্টি তেমনি ব্যথা-ভোলানো সেই সুর। পথিকরা যেতে যেতে গান শুনে পাহাড়ি পথের দুঃখকষ্ট ভুলে যেত।

সেই দেশের রাজা খুব শৌখিন মানুষ। বিচিত্র দামি দামি জিনিস আর বিভিন্ন দেশের পশুপাখি ছিল তাঁর রাজপ্রাসাদের চিড়িয়াখানায়। এক রাজমন্ত্রী তাঁকে তোকানো পাখির কথা বললেন। শুনেই রাজা লোভীর মতো বললেন—ইস! তোকানো যদি আমার হত, রোজ আমাকে গান শোনাত, আমার জীবনে তখনই সত্যিকারের সুখ হত।

এই কথা শুনে রাজার এক মন্ত্রী প্রচার করে দিল, যে ওই তোকানো পাখি ধরে আনতে পারবে, তাকে এক হাজার সোনার টাকা দেওয়া হবে।

হই চই পড়ে যায় চারদিকে! অনেকেই ছুটল পাহাড়ে জঙ্গলে। কেউ পাথর থেকে

গড়িয়ে পড়ল, কেউ গাছের ডাল ভেঙে—হুড়মুড় করে মাটিতে চিৎপাত। কোথায় সেই মিষ্টিগানের পাখি? টাকার লোভে কেউ আবার অন্য কোনো পাখি ধরে নিয়ে গেল রাজার কাছে। কিন্তু ছলনা ধরা পড়ে যাওয়াতে তাদের শাস্তি হল। তোকানো পাখির খোঁজে কত লোকে কত কী-ই না করল। হায়! তাদের সব চেষ্টাই জলে গেল।

পাহাড়ের নীচের গ্রামে একটি কিশোর ছেলে, নাম তার তানি জেতুং, সেও শুনেছিল ওই এক হাজার সোনার টাকার কথা। পাহাড়ে, বনে ঘুরে ঘুরে ওষুধ বানাবার শিকড়, গাছের পাতা জোগাড় করা তার কাজ। সেও তোকানোর গান শুনত, কী মিষ্টি গান! তানি খুব ভালোবাসত পাখির গান। পাখিটাও তানিকে খুব ভালোবাসত, তাই মাঝে মাঝে উড়ে এসে বসত তানির কাঁধে।

ওই হাজার টাকার কথা শুনে তানিও ভাবল—টাকাটা যদি পেতাম, তা হলে আমাদের সংসারের দারিদ্র্য দূর হত! এরপর যেদিন পাখিটা কাঁধে বসবে, সেদিন ওকে ধরব! কদিন পরে একদিন তানি ওষুধ বানাবার গাছ খুঁজে খুঁজে খুব ক্লান্ত হয়ে একটা পাইন গাছের ছায়ায় বসল! তোকানো উড়ে এসে বসল তার কাঁধে। তোকানো বলল—বন্ধু, আমি জানি তুমি কী ভাবছ। ঠিক আছে আমি তোমাকে একটা গল্প বলছি। গল্প শুনে তোমার যদি দুঃখ না হয়, আমি তোমার সঙ্গে যাব। আর যদি তোমার দুঃখ হয়, তবে আমি উড়ে যাব বনে।

তানি রাজি হয়ে গেল। তোকানো গল্প শুরু করল,—

এক শিকারির একটি প্রভুভক্ত কুকুর ছিল। একদিন শিকারি তার কুকুরটিকে নিয়ে জঙ্গল থেকে ফিরছিল। এ সময় দেখা হল একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে। ব্যবসায়ী মানুষটির ঘোড়ার গাড়ি ভর্তি ধনরত্ন এবং দামি দামি জিনিসপত্র। হঠাৎ গাড়ির একটা চাকা খুলে গেল বলে গাড়িটি থেমে রইল। সেই বণিক শিকারিকে অনুরোধ করল তার গাড়িটা পাহারা দিতে। সামনের গ্রামে একজন কারিগর আছে যে চাকা লাগাতে পারবে। তাকে ডেকে আনবে বণিক। ততক্ষণ যদি এইসব ধনরত্ন জিনিসপত্রের উপর শিকারি একটু নজর রাখে তাহলে সে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

শিকারি রাজি হওয়ায় বণিক গ্রামে চলে গেল। অনেকক্ষণ কাটল, ব্যবসায়ীর আর ফিরে আসার নাম নেই। শিকারিরও একটি দরকারি এবং জরুরি কাজ ছিল, তাই সে তার কুকুরটিকে মালপত্র পাহারা দেবার নির্দেশ দিয়ে গ্রামে ফিরে এল। অনেকক্ষণ পরে বণিক ফিরে এল কারিগরকে নিয়ে। কুকুরটি খুব ভালোভাবে পাহারা দিয়েছে দেখে বণিক খুব খুশি হল, আর কুকুরটিকে একটি সোনার খণ্ড পুরস্কার দিল। কুকুর সেটা মুখে করে নিয়ে চলে এল তার মনিবের বাড়ি। শিকারি ভাবল কুকুরটা নিশ্চয়ই সোনার টুক্‌রোটা চুরি করে নিয়ে এসেছে। তখন রাত্রি হয়ে গিয়েছিল, চারদিকে অন্ধকার। সে রেগে গেল, তার পরম ভক্ত কুকুরটিকে লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড মারল। কুকুরটি তার মনিবের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ছটফট করতে করতে মরে গেল।

—ইস! কী নিষ্ঠুর আর বোকা শিকারিটা! এমন নিরীহ আর বিশ্বাসী কুকুরটাকে মেরে

ফেলল। আহা বেচারা—তানি খুব দুঃখের সঙ্গে কথাগুলো বলল। এই শুনে তোকানো বলল, সত্যিই তুমি কুকুরটার জন্য দুঃখিত হয়েছ। তাহলে আমি চলি। কেমন?

পাখি উড়ে গেল। তানিও বাড়ি চলে এল। পরদিন আবার শোনা গেল রাজার ঘোষণা। এবার পাখি ধরে দেবার পুরস্কারের মূল্য দেড় হাজার সোনার টাকা। তানির আবার লোভ হল।

সেদিন, সে যখন সেই পাইনগাছের ছায়ায় গিয়ে বসল, তোকানো আবার উড়ে এসে তার কাঁধে বসল। বলল, বন্ধু, গতকালের মতো সেই একই শর্ত অনুসারে আরেকটা গল্প বলছি শোনো।

এখান থেকে কিছুটা দূরে একটি শুকনো দেশ আছে। সে দেশে গাছপালা কম, পাহাড় আছে, তবে সবুজ গাছ প্রায় নেই, কঠিন পাথরই বেশি।

একবার সে-দেশে বৃষ্টি হল না। কোথাও জল নেই—শুকনো নদী নালা পুকুর, যেন মরুভূমি।

এক চাষি সারাদিন ঘুরে ঘুরে কোথাও জল না পেয়ে দূরের একটা বনে ঢুকল। সেই বনে ছোটো এক পাহাড়ও ছিল। সে দূর থেকে ঝর ঝর শব্দ শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠল, বাঃ! এ তো ঝরনার শব্দ! নিশ্চয়ই ওখানে অনেক জল পাওয়া যাবে।

চাষি জলের কাছে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ভীষণরকম পরিশ্রান্ত সে। পাহাড়ের নীচে বিরাট একটা পাথরের ছায়ার আড়ালে বসল। একটু বিশ্রাম করেই সে যাবে। তরপর কী আনন্দ! ওই জল দিয়ে চাষবাস করা যাবে।

ভাবতে ভাবতে সে হঠাৎ দেখল তার সামনের মাটিতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। চমকে উঠে চাষিটি একটা বড়ো পাতার ঠোঙা বানিয়ে ওই ফোঁটা ফোঁটা জল ধরল। সে ভাবল কাছেই যে ঝরনা আছে, এ জল বোধহয় সেখান থেকেই চুঁইয়ে চুঁইয়ে চলে এসেছে। খানিকটা জল জমতে সে পান করবার জন্য পাতাটা তুলে ধরল। কাছেই একটা শুকনো গাছের ডালে বসে ছিল আমারই মতো একটা তোকানো পাখি। চাষি জলসুদ্ধ পাতাটা যেই মুখের কাছে ধরেছে, ওই পাখিটা অমনি উড়ে এসে পাতাটাকে ছিনিয়ে নিয়ে জলটুকু ফেলে দিল।

রাগে দুঃখে চাষি একেবারে ভয়ংকর হয়ে উঠল। তেষ্টায় তার বুকের ছাতি ফাটছে আর এই শয়তান পাখিটা কি না এরকম করল! চাষি পাথর ছুড়ে ছুড়ে তোকানো পাখিটাকে মেরে ফেলল।

চাষি এরপর উঠল, তাড়াতাড়ি গিয়ে ঝরনার জল পেটভরে পান করল। তারপর পেছন ফিরে একবার দেখল মরা পাখিটাকে—সত্যি মরেছে কি না।

হঠাৎ হিস হিস শব্দে সে চমকে তাকাল বড়ো পাথরটার উপরদিকে। রক্ত হিম হয়ে এল তার। বিরাট একটা সাপ পাথরের উপরে শুয়ে আছে। ভয়ংকর সেই সাপের মুখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা বিষ গড়িয়ে পড়ছে। চাষি জল ভেবে পাতায় যা ধরেছিল আর পান করতে



গিয়েছিল, তা এই বিষধর সাপের বিষ!

এই পর্যন্ত শুনে তানি বলে উঠল, হায়! কী দুঃখের ব্যাপার। যে পাখিটা চাষির প্রাণ বাঁচাল, তাকেই সে মারল!

এবার তোকানো তানিকে বলল, 'বন্ধু, দেখলে তো, এবারও দুঃখ প্রকাশ করলে। তাহলেই বোঝো, মানুষ প্রায় সব সময়ই পশুপাখির প্রতি হিংস্র ব্যবহার করে। আমাকে যদি ধরে দাও, রাজার কাছে, রাজা কবে রেগে গিয়ে ভুল বুঝে মেরে ফেলবে। তাছাড়া, রাজার কাছে বন্দি হয়ে থেকে শুধু রাজাকেই গান শোনাব, আর এই খোলা জায়গায়, বনে, পাহাড়ে, পথের ধারে গান গাইলে কত মানুষ শুনতে পারবে, আনন্দ পাবে।

তানির ভুল ভেঙে গিয়েছিল। সে তোকানোর নরম পিঠে আঙুল বোলাতে বোলাতে বলল, ছোট্ট বন্ধু, ঠিকই বলেছ তুমি। তোমার বন্ধুত্বই আমার বড়ো পুরস্কার, টাকার পুরস্কার চাই না। তুমি গান গেয়ে যাও, মুক্তির গান, আনন্দের গান।

ছবি। অরুণ চট্টোপাধ্যায়



অশোককুমার মিত্র

অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। এক নিমন্ত্রণে হাজির এক হরিণ, এক খরগোশ আর এক ব্যাং। গল্পগাছায় গড়াল বেলা। এল খাবার সময়। সে-গাঁয়ে এক মজার নিয়ম ছিল—ভোজসভায় হাজির নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যে বয়সে সবচেয়ে বড়ো তার পাতে সবার আগে খাবার দিতে হবে। এবারে গোল বাঁধল এ আসরে সবচেয়ে বেশি বয়সি কে তা নিয়ে।

আমার কী বাপু বয়সের আর গাছপাথর আছে, আমিই হচ্ছি সবচেয়ে বুড়ো। —মাথার শিং নাড়িয়ে হরিণ বললে, এ পাতা থেকেই পরিবেশন শুরু করো।

আঃ কী পাগলের মতো বকছ?—খরগোশ আপত্তি জানাল, আমি হচ্ছি সবার বড়ো এ তো সক্কলে জানে। আগে আমার পাতে খাবার দাও—বলে সে তার পাতা সাজিয়ে ফেলল।

দাঁড়াও দাঁড়াও বাপু এক মিনিট, তোমরা তো দুজনেই বলছ যে বয়স হল সবচেয়ে বেশি, তা তার কোনো প্রমাণ দিতে পারো কি? প্রথমে হরিণ-ই বলুক, তারপর খরগোশ বলবে।

হরিণ বললে, আচ্ছা শোনো, বলছি আমি কত বড়ো। ওই যে নীল আকাশের গায়ে দেখেছ তো কত কত তারা আছে। ওই তারাগুলো যখন পেরেক দিয়ে আকাশে আটকানো

হচ্ছিল তখন কোথাও অসুবিধে হলে ওরা আমার কাছে আসত। আমি ওদের অসুবিধে মিটিয়ে দিতাম। এবারে বোঝো আমার বয়স কত?

তার কথা শেষ হলে খরগোশ খুকখুক করে হেসে ফেলল, তা হলে দেখা যাচ্ছে তুমি অনেক বুড়ো। কিন্তু যে-মই বেয়ে তোমরা আকাশে তারা পুঁততে উঠতে সে-মই যে-গাছের ডাল দিয়ে তৈরি সেই গাছটা আমার হাতে বসানো। চারা থেকে সেই গাছ বড়ো হয়েছে, বুড়ো হয়েছে, মই-গড়ার মতো শক্তপোক্ত হয়েছে। তাহলে তো বয়সে আমি তোমার ঠাকুরদা— বলেই সে ফের পাতা সাজিয়ে ফেলে খাবার দিতে বলল।

এমন সময়ে ব্যাং হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তা দেখে হরিণ আর খরগোশ থমকে গিয়ে দুজনে প্রথমে দুজনের দিকে চেয়ে রইল। তারপরে বলল, কী হল ব্যাং, তুমি এমন কেঁদে উঠলে কেন? কেঁদো না ভাই, কেঁদো না।



হাতের চেটো দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে ব্যাং বললে, তোমাদের কথা শুনে কত পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। তোমরা তো জানো আমার তিন ছেলে ছিল। তারা তিনজনেই তিনটে গাছ পুঁতেছিল। গাছগুলো বেশ বাহারি হয়েছিল। তা তোমরা যে ওই আকাশে পেরেক দিয়ে তারা বসাবার কথা বলছিলে না, সেই পেরেক পোঁতার হাতুড়ির হাতল তৈরি হয়েছিল বড়োছেলের বসানো গাছের ডাল দিয়ে। মেজোছেলেটার গাছের গুঁড়ি দিয়ে লাঙল তৈরি করে তা দিয়ে ওই যে আকাশে ছায়াপথ দেখছ না, তার খাত তৈরি হয়েছে, আর ছোটোছেলের গাছের গোড়া দিয়ে তৈরি তুরপুনে চাঁদ আর সূর্যের ঠিক মধ্যিখানের মস্ত ছ্যাঁদা গড়া হয়েছে। দুঃখের কথা বলব কী এসব কাজ শেষ হবার আগেই বুড়ো হয়ে আমার ছেলেরা সব মরে গেছে। ও হো হো, সে কবেকার কথা।

ব্যাঙের কথা শুনে হরিণ আর খরগোশের মুখে কথা সরে না, তারা চুপটি করে বসে রইল। বুড়ো ব্যাং পাতা পাততেই ভোজের খাবার তার পাতে থরে থরে সাজিয়ে দেওয়া হল।

ছবি। অরুণ চট্টোপাধ্যায়



বাড়ি চুরির গল্প

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা।

এক দেশে এক ছোট্ট গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে বাস করত এক গরিব লোক। সে কাঠকয়লা তৈরি করত। তার ছিল একটা ছোট্ট কাঠের বাড়ি। আর ছিল মস্ত একটা কেটলি। কাঠকয়লা তৈরি করার জন্য।

সেই গরিব লোকটার কেটলি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই সবসময়ে সে খুব ভয়ে ভয়ে থাকত। এই বুঝি তার সবে-ধন নীলমণি কেটলিটা চুরি হয়ে যায়। দিনেরবেলা কাজকম্ম সেরে কাঠকয়লা নিয়ে দোরের সামনে বসে থাকত। হাটেবাজারে কাঠকয়লা বিক্রি করতে যেত না। আর রাতেরবেলা ঘুমিয়ে থাকত কেটলির মধ্যে। তার কেটলিটা খুব বড়ো তো! তাই অসুবিধা হত না। এভাবেই সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেটলি পাহারা দিত!

তার বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়। গ্রামের সবাই খেলাধুলো কাজকম্ম হাসিতামাশায় দিন কাটায়। কিন্তু কাঠকয়লা বানিয়ে লোকটার সেসবে মন ছিল না মোটেই। থাকবে কী করে? সেই একই ভয়, কেটলিটা বুঝি চুরি যায়। তাই সে একা ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকে। মনে সুখ নেই, শুধু ভয় আর ভয়।

এভাবেই তার দিন কাটছিল। একদিন গ্রামের বুড়ো মোড়ল গোমড়ামুখো লোকটিকে বলল, 'ওহে ছোকরা, সবসময় ভয়ে ভয়ে থেকে খামোখা তুমি বেঁচে থাকার আনন্দটাই মাটি করে দিচ্ছ যে!'

বোকা লোকটা মোড়লের কথায় কান দিলে না। আপনমনে সে কাঠকয়লা বানানো আর কেটলিপাহারায় দিনের পর রাত, রাতের পর দিন কাটিয়ে দিতে থাকল।

একদিন রাতেরবেলা ঘুটঘুটে অন্ধকারে দুই চোর বেরিয়েছে চুরি করতে। তারা গ্রামের ঘরে ঘরে জানলায় জানলায় উঁকি দেয় আর দেখে চুরি করা যায় কি না। জুতসই কোনো ঘর খুঁজে পায় না। সব ঘরের মেঝেতে লোকজন এমনভাবে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে যে ঘরে ঢুকলেই কেউ না কেউ জেগে উঠবে। চোর ধরা পড়ে যাবে। তারপর মার খাবে। মোড়লের কাছে নালিশ যাবে। শাস্তি হবে।

এমনিভাবে বাড়ি বাড়ি উঁকিঝুঁকি দিতে দিতে রাত প্রায় শেষ হতে বসেছে। আর বেশি দেরি হলে সবাই জেগে উঠবে। চুরির আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল তারা। এমন সময় একটা বাড়ির জানলায় উঁকি দিয়ে এক চোর দেখল, ঘরের মধ্যে কেউ কোথাও নেই। কায়দা করে দরজা খুলে দুই চোর ঘরে ঢুকল। এদিক-ওদিক দেখে ওরা খুব হতাশ হল। চুরি করার মতো কিছুই নেই যে ঘরে। আছে একটা মস্তবড়ো কালো রঙের কেটলি। মন্দের ভালো, এটাই চুরি করা যাক— ভাবল দুই চোর। তারপর একটা বাঁশের লাঠির সঙ্গে দড়ি দিয়ে কেটলিটা বেঁধে নিল। দেরি না-করে কেটলিটা কাঁধে তুলে নিয়ে চলল তারা।

এক চোর বলল, 'জীবনে এত বড়ো আর এত ভারী কেটলি দেখিনি আমি।'

অন্য চোর বলল, 'ঠিক বলেছিস ভাই, জীবন যে বেরিয়ে যাবার জোগাড়।'

কেটলিটা ভারী হবে না কেন? আসলে ওটার ভেতরে তো শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে সেই বোকা লোকটা।

অনেক কষ্টে হাঁফাতে হাঁফাতে কিছুটা দূর যেতে না যেতে এক চোর বলল, 'আমি আর পারছি না ভাই। ওদিকে আকাশ কেমন ফরসা হয়ে আসছে। এখুনি গ্রামের সবাই ঘুম থেকে জেগে উঠবে। আর চুরি করে কাজ নেই। এটাকে ফেলে রেখে পালাই।

অন্য চোর বলল, 'ঠিক ঠিক। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।'

পুব-আকাশে ধীরে ধীরে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। সোনালি আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। একচিলতে রোদ্দুর এসে ঠিকরে পড়েছে কাঠকয়লা-বানানো লোকটার চোখেমুখে। চোখ মেলে তাকাল সে। দেখল, মাথার ওপর ঘরের চালা নেই। তাড়াতাড়ি আড়মোড়া ভেঙে সে উঠে দাঁড়াল। কেটলির বাইরে এসে সে অনুভব করল পায়ের নীচে নুড়িপাথর। বড়ো বড়ো চোখ করে দেখল চারধার। ঘরের দেয়াল কোথায়? চারদিক থেকে হুহু ঠান্ডা বাতাস আসছে। মাথার ওপর ছাদ নেই—অসীম আকাশ। নীল, শুধু নীল আর আলোর ঝকমকি।

আমার বাড়ি কোথায়? সে অবাক হয়ে ভাবল, কেটলিটা তো ঠিকই আছে। হায় হায়,



শেষে আমার বাড়িটা কেউ চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।

হতাশায় সে ভেঙে পড়ল। এখন কী উপায়? কেঁদে কেঁদে পথঘাট ভাসিয়ে দিল সে।

এমন সময় সেই বুড়ো মোড়ল বেড়াতে বেড়াতে সেখানে এসেছে। সে বলল, 'তুমি কাঁদছ কেন হে ছোকরা?'

'আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, রাতে আমার বাড়িটাই চুরি হয়ে গেছে।' অবাক হয়ে বলল সে, 'এতদিন আমি ভয় পেতাম আমার কেটলিটার জন্য। এবার দেখছি আমার বাড়িটাই চুরি গেছে। হায় হায় এখন কী উপায়।'

বুড়ো মোড়ল মুচকি হেসে চোখ টিপে বলল, 'আহা ভায়া, এত কান্নার কী আছে! এটাই তো সত্যি। একটা জিনিস নিয়ে যখন তুমি ভয় পাচ্ছ—শুধু ভয় পাচ্ছ, অন্য কিছুর ভাবনা নেই—তখন দেখবে অন্যকোনো জিনিস হারিয়ে যায়। কেমন করে এমনটা হয় তুমি বুঝতেও পারবে না। এটাই তো জীবন।'

'তাহলে এমনই হয় দাদু?' হেঁচকি তুলে বলল সে।

'ঠিক বলেছ ভায়া। সেজন্য অযথা ভয় আর ভয় নিয়ে খামোখা সময় নষ্ট করা উচিত নয়। যা তুমি এতদিন করে এসেছ।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন।' বলল কাঠকয়লা-বানানো লোকটি। তখনও সে কাঁদছে, তবে তা ততটা জোরে নয়।

মোড়ল বলল, 'সকলের মনে রাখা উচিত, এখন যতটা আনন্দ পাও চেটেপুটে খেয়ে

নাও। কালকের কথা কালকেই ভাবা যাবে।'

'বাঃ, আপনি তো দারুণ ভালো ভালো কথা বলেন।' হাসতে হাসতে বলল লোকটি।

লোকটার চোখেমুখে হাসির ঝিলিক দেখে বুড়ো মোড়ল খুব খুশি হল। বলল সে, 'তুমি বলছ, তোমার বাড়িটাই চুরি হয়ে গেছে। এখন কেটলি-চুরির ভয়ে তুমি যদি সবসময় শুধু ভাবতেই থাকো,—আর ভেবে অযথা ভয় পেতেই থাকো, তবে দেখবে একদিন হয়তো তুমি নিজেই চুরি হয়ে গিয়েছ।'

ঘাড় নাড়তে নাড়তে বোকা লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'আমি যখন বেড়াতে বেড়াতে এদিকে আসছিলাম তখন পথের ধারে তোমার বাড়ির মতো দেখতে একটা বাড়ি যেন দেখেছি। অবিকল তোমার বাড়ির মতোই। যেটা কি না কাল রাতে চুরি হয়ে গেছে।' বলল বুড়ো। বলেই সে পিছন ফিরে গ্রামের দিকে হাঁটা দিল।

ওদিকে বোকা লোকটির আর বিস্ময়ের যেন সীমা নেই। কী বলছে মোড়ল বুড়ো। এ-ও কী সত্যি হয়? তাহলে তার বাড়িটা চুরি করে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারেনি। বিশ্বাস হয় না তার।

তখুনি সে চটপট কেটলিটা পিঠে বেঁধে নিল। তারপর বুড়োকে অনুসরণ করে চলল তার পিছু পিছু। বুড়ো মোড়ল বুঝতে পারল, পিছনে আসছে বোকা লোকটা। যার কি না বাড়ি চুরি হয়ে গেছে কাল রাতে।

একটু পথ যেতেই দেখা গেল মোড়ল হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে একটা বাড়ির সুমুখে।

'আরে তাই তো, এ তো দেখছি আমার বাড়িটাই—' চিৎকার করে বলে উঠল বোকা লোকটি।

মোড়লবুড়ো তাহলে ঠিকই বলেছে। বাড়িটা পথের ধারে ফেলে পালিয়েছে চোররা। তার বাড়ি যেমনটি ছিল ঠিক তেমনই রয়েছে। একচিলতে কাঠও খোয়া যায়নি। শুধু ওটা যেখানে ছিল এখন সেখানে নেই— এই যা দুঃখ। সে যাই হোক না কেন, বাড়ি ফিরে পেয়ে তার আনন্দের আর সীমা রইল না।

তারপর থেকে লোকটা একদম পালটে গেল। সে এখন আর কেটলির জন্য অযথা ভয়ে ভয়ে থাকে না। ঘরের মধ্যে কেটলির পাশে বিছানায় শোয়, ঘুমোয়। ভুলেও সে কেটলির ভিতরে ঢোকে না। এতটুকু ভাবেও না। তার মন এখন খুশিতে ভরে থাকে। গ্রামের লোকজনের সঙ্গে সে খোশমেজাজে গল্পগুজব করে, খেলাধুলো করে। খেতেখামারে কাজকম্মও করে।

এভাবেই তার দিন কাটতে লাগল। কেটলিটা যেমন ছিল তেমনি আছে। চুরি যায়নি। এমন কি তার বাড়িটাও আর কোনোদিন চুরি হয়নি।

ছবি। শঙ্কর বসাক



হতভাগা ব্যাঙের কান্না

সুখেন্দু মজুমদার

পুকুরটা যেমন বড়ো। তেমন সুন্দর।

সেই পুকুরে অন্য সবার সঙ্গে বাস করত এক ব্যাং। আর তার বাপমরা ছেলে। এমন সুন্দর জায়গাটা। খানিক উত্তরে এগিয়ে গেলে সার সার পাহাড়। দক্ষিণে গেলে ঢেউ-দোলানো সমুদ্র।

কিন্তু মায়ের মনে শান্তি নেই।

থাকবে কী করে?

ছেলেটা যেমন হতভাগা তেমনি দুষ্টু। মা কত বোঝায়। কার কথা কে শোনে।

এবেলা একরকম ঝামেলা পাকায়। তা আর-একবেলায় অন্যরকম ঝামেলা। ঝামেলার আর শেষ নেই।

মায়ের মনে দারুণ কষ্ট। দারুণ অস্বস্তি নিয়ে গোটাদিন কাটে। ছেলের সময় কই। মায়ের মন বুঝবে।

মা বলল—যা তো বাবা। ওই পাহাড়ের কাছে। দুষ্টুমি না-করে সবার সঙ্গে খেলা কর।

ছেলে চলল দক্ষিণে। সাগরের পাড়বরাবর। সেই ঢেউগুলো বারবার আছড়ে পড়ে।

খোকাব্যাং অমনি উলুটপুলুট।

মা তো কেঁদেকেটে পড়ল। ঠিক আছে পাহাড়ে যেতে হবে না। তুই বরং পুকুরপাড়ের মাঠে ঘুরে আয়।

অমনি ডুবসাঁতারে সে চলল পুকুরের নীচে।

কী আছে কে জানে। মা নিজে কখনও নামেনি। ভয়ে কেঁদে উঠল মা। বুক ফেটে যায় কষ্টে। যেটাই তাকে করতে বলা ঠিক উলটো সে করবে।

পুকুরের এককোণে বসে মা রাতদিন বিড়বিড় করে। এই ছেলেকে নিয়ে সে কী করবে। পুকুরে আরও তো খোকাব্যাং আছে। ওরা কেমন সবার কথা শোনে। সবাইকে সমীহ করে চলে। শুধু নিজের ছেলের বেলা যত সব উলটো। জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা।

মনে মনে মা ভাবে। একটা কিছু তাকে করতেই হবে। এইসব অভ্যাস না-পালটালে ছেলের যে ভালো হবে না।

মায়ের এসব কাণ্ডকারখানা দেখে খোকাব্যাং তো হেসেই খুন। সে কী বিচ্ছিরি হাসি। হাসতে হাসতেই মাকে বলল—আমার জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না। সব ঠিকঠাকই চলছে। দেখে নিয়ো তুমি।

তাই বুঝি? মা বলল। তবে কেন তুই এখনও অন্য ব্যাংদের মতো ডাকতে শিখিসনি। ঠিক আছে। আজই তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি।

মা মিটিমিটি হাসে। আর ফুলিয়েফাঁপিয়ে নিজেকে ঢোল বানিয়ে তোলে। তারপর চারদিক কাঁপিয়ে ডেকে ওঠে গ্যাঙর গ্যাং। গ্যাঙর গ্যাং।

ছেলে হেসেই গড়াগড়ি খায়।

তুই এবার চেষ্টা করে দেখা। মা খোকাব্যাংকে বলে।

মুখ বেঁকিয়ে হাসতে হাসতে ছেলে এবার নিজেকে ফুলিয়েফাঁপিয়ে ঢোল বানায়। তারপর ডেকে ওঠে কোঁকর কোঁ।

ওরে হতভাগা। তুই দেখি দিনদিন আরও অবাধ্য হয়ে উঠছিস। তোর জন্যে আমার কত কষ্ট। মা চিৎকার করে ওঠে। আমার এসব কথা একদিন নিশ্চয় শুনবি। তখন হয়তো...

কোঁকর কোঁ। কোঁকর কোঁ। বিচ্ছিরিভাবে ডেকে ওঠে খোকাব্যাং। তারপর লাফাতে লাফাতে উধাও হয়ে যায়।

কোথায় গেল খোকাব্যাং?

কোথায় আর যাবে। নিজের খুশিমতন তার চলাফেরা। রাতদিন মায়ের বকুনি শুনতে শুনতে তেমন কিছুই মনে হয় না। যেটাই বলে ঠিক তার উলটোটা সে করবেই।

দিনে দিনে মায়ের দুশ্চিন্তা বাড়ে। কারও সঙ্গে তেমন কথা বলে না। খাওয়ার জন্যে এদিক-সেদিক যেতে মন চায় না। নিজের মনে শুধু গুমরে মরে।

কদিন পর কঠিন অসুখে পড়ল মা। খোকাব্যাঙের সেদিকে খেয়ালই নেই, তার দুষ্টুমি চলতেই থাকল। ঠিক আগের মতো।

মা একদিন ডেকে পাঠাল খোকাকে। সেদিন খোকাব্যাং গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেল মায়ের বিছানার পাশে।

কতদিন আর বাঁচব সেটা জানি না। মা বলল। আমি মরে গেলে ওই পাহাড়ে আমাকে রেখে আসিস না। বরং আমাকে ওই সুন্দর নদীর পাড়ে কবর দিস।

মা কেন বলল?

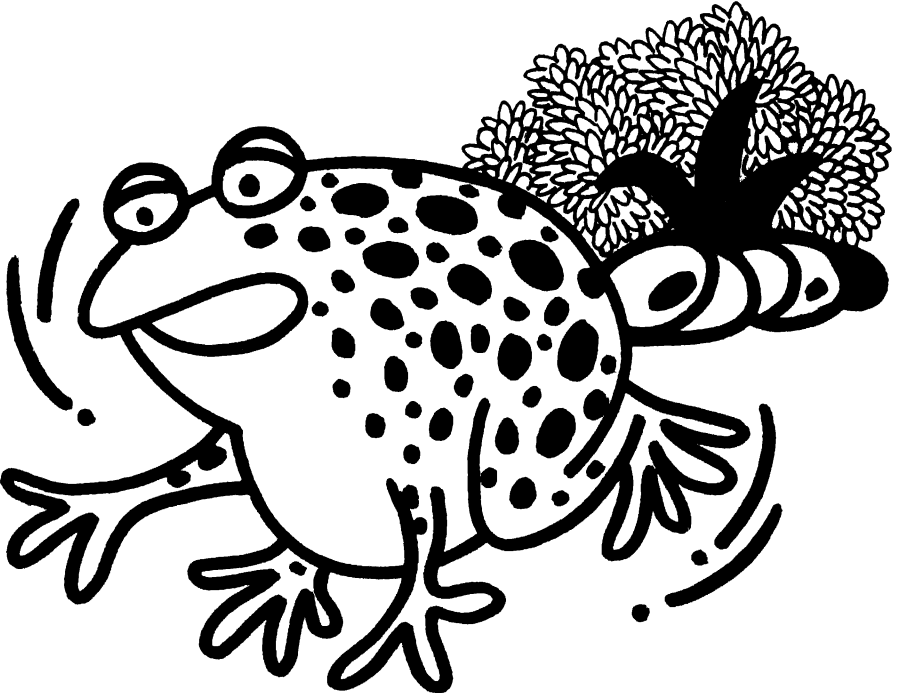
আসলে মা জানত। খোকাকে যেটাই করতে বলবে তার উলটোটা সে করবে।

কয়েকদিন পর মা-ব্যাং মারা গেল। তখন খোকার সে কী কান্না। খোকাব্যাং কাঁদে আর ভাবে। ভাবে আর বলে, আমার জন্যেই মা মরে গেল—আমিই মাকে মেরে ফেলেছি। খোকা বলে আর কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে কত কী ভাবে।

সত্যিই তো। কোনোদিন মায়ের কোনো কথা সে শোনেনি। যেটাই বলেছে তার উলটোটা সে করেছে। তার এই বেয়াদপির জন্য মায়ের মনে এত কষ্ট। তাই তাকে রেখে মা চলে গেল।

খোকাব্যাং তখন কী করল?

তার মাথা থেকে সব দুষ্টুমি উবে গেল। মায়ের জন্যে তার ভারী কষ্ট। সে ভাবল। আর নয়। এবার থেকে মা যা বলেছে তাই তাই সে করবে। উলটো কিছু করে আর মজা পাবার



ইচ্ছে নেই। আগের কথামতো সেই নদীর পাড়ে মায়ের কবরের ব্যবস্থা করল। নানানজনে নানান কথা বলে। সেসব শোনার ইচ্ছে নেই খোকাব্যাঙের। নিজেও ভাবল না কাজটা সঠিক হচ্ছে কি না। মা যখন বলেছে তখন করতেই হবে। করলও তাই।

দিনকয়েক পরে শুরু হল বৃষ্টি। চারদিক কাঁপিয়ে এল জোর ঝড়। ঝড়ে গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ে। দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো শুয়ে পড়ে মাটিতে। নদীর জলে। নদীর জলও বাড়তে থাকে হুহু করে। সব দেখেশুনে ভয় পেল খোকাব্যাং। মায়ের কবরটা নদীর পাড়ভাসা জলে ধুয়েমুছে যায় যদি। চিন্তায় ছটফট করতে করতে সে চলে এল নদীর পাড়ে। মায়ের কবরের কাছে এসে বসল।

তখনও ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। ভয় পেয়ে কান্না জুড়ে দিল খোকাব্যাং। গ্যাঙর গ্যাং। গ্যাঙর গ্যাং। কাঁদে আর বলে, আমার মায়ের কবরটা ভাসিয়ে দিয়ো না। বৃষ্টি একটু কমে। খোকাব্যাং কান্নার সুর বদলায়। যেই আবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে অমনি খোকাব্যাঙের কান্না শুরু। গ্যাঙর গ্যাং।

সেই থেকে মায়ের শেখানো ডাকে কান্না জোড়ে খোকাব্যাং। সবসময় ডাকে না। বৃষ্টি এলে তবেই।

সে ঝিরিঝিরি হোক। আর ঝমঝম হোক। বৃষ্টি এলেই কান্না জুড়ে দেয় ব্যাং। গ্যাঙর গ্যাং। গ্যাঙর গ্যাং।

ছবি। শঙ্কর বসাক

মধ্য এশিয়া



কিরঘিজস্তান তাজিকিস্তান কাজাখস্তান উজবেকিস্তান
তুর্কমেনিস্তান আজারবাইজান জর্জিয়া আর্মেনিয়া



বেচারা ব্যাং

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বড়ো এক নদীর ধারে ছোট্ট একটা বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে বাস করত এক বুড়ি। বুড়ির সঙ্গে থাকত তার নাতনি, বুনো-লোমে ভর্তি একটা কুকুর আর সবুজ-রং এক ব্যাং।

দিদিমার বাড়িতে বাচ্চা মেয়েটার বেশ সুখে-শান্তিতে দিন কাটছিল। নাতনিকে বুড়ি খুব ভালোবাসত। তার সুবিধে-অসুবিধের দিকে দিনরাত নজর রাখত বুড়ি। নাতনিকে সে সাজিয়ে রাখত সুন্দর সব পোশাকে। আর তার জন্যে রাঁধত নানা স্বাদের সব খাবার।

বুনো-লোমের কুকুরটা অবশ্য ততটা ভাগ্যবান ছিল না। কুকুরটাকে একেবারেই যত্ন-আত্তি করত না বুড়ি। সামান্য খাবারের জন্যে তাকে সর্বক্ষণ খাটাত। আর অত খাটাখাটুনি করেও কুকুরটা যা খেতে পেত তা আর কিছুই নয়,—পাতের এঁটোকাঁটা।

এদিকে সবুজ ব্যাঙের অবস্থা তো আরও শোচনীয়। তার দিকে বুড়ির কোনো নজরই ছিল না। দিনরাত বেচারা ব্যাং শুধু খেটে খেটে মরত। তাকে বয়ে আনতে হত জল। কেটে আনতে হত কাঠ। আর দিনের শেষে পেটের খিদেয় চুঁই চুঁই করতে করতে ব্যাং-কে চলে যেতে হত বিছানায়।



একদিন সারাক্ষণ বুড়ি ব্যাংটাকে শুধু বকাঝকা করতে লাগল। সারাদিন কিছুই খেতে দিল না তাকে। সন্ধের সময় বুড়ি ব্যাং-কে পাঠাল নদীতে। বরফের গর্ত থেকে জল তুলে সেই জল বয়ে আনতে হবে ব্যাং-কে। ক্রমাগত কাজ করতে করতে ব্যাং খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বুড়ির কথা অমান্য করার সাহস তার নেই। অবশ্য বুনো-লোমের কুকুরটাকে ব্যাং সঙ্গী হিসেবে পেল।

তারা দুজনে নদীর কাছে এল। বরফের গর্তের সামনে বসে তারা কাঁদতে লাগল। চাঁদের দিকে তাকিয়ে তারা কাঁদতে লাগল।

—'ও চাঁদ তুমি আমাদের একটু দয়া করো...গ্যাঙর গ্যাং, গ্যাঙর গ্যাং'... সবুজ ব্যাং বিলাপ করতে লাগল। — 'আকাশ থেকে নেমে এসো তুমি ... গ্যাঙর গ্যাং! বুনো-লোমের কুকুর আর আমাকে নিয়ে চলো তোমার বাড়িতে; গ্যাঙর গ্যাং'—হাপুস নয়নে দুজনে কাঁদছে। অবশেষে চাঁদের কানে পৌঁছোল তাদের বিলাপ। চাঁদের খুব দুঃখ হল ওদের দুজনের জন্যে। আকাশ থেকে নেমে এল চাঁদ, হাজির হল একেবারে নদীতে ভাসমান বরফের ওপর। বুনো-লোমের কুকুর আর সবুজ ব্যাং-কে চাঁদ তুলে নিল তার কোলে। তারপর উড়ে গেল আকাশে।

এদিকে ব্যাং কখন জল বয়ে আনবে তার জন্যে অপেক্ষা করছে বুড়ি। শেষমেশ ব্যস্ত হয়ে সে নিজেই নদীর দিকে গেল। কিন্তু বুনো-লোমের কুকুর আর সবুজ ব্যাং-কে কোথাও দেখতে পেল না। বুড়ি চেঁচামেচি শুরু করল। ডাকতে লাগল কুকুরটাকে। বকাঝকা করতে লাগল ব্যাং-কে। কিন্তু কারো কাছ থেকেই কোনও সাড়া নেই। তারপর বুড়ির চোখ গেল আকাশের দিকে। সে দেখতে পেল চাঁদের কোলে বসে আছে কুকুর আর ব্যাং। তারা দুজনে পাশাপাশি বসে ছিল আর খেলা করছিল।

— 'ওরে আমার ব্যাং। ওরে আমার কুকুর!' — বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে বলছিল;— 'আমি তোদের এত খাওয়ালুম, যত্নআত্তি করলুম। নিজের নাতিপুতির মতন তোদের বড়ো করলুম আর তোরা কি না আমাকে ছেড়ে চলে গেলি?'

কিন্তু বুড়ি হাজার কান্নাকাটি করলেও ওরা আর ফিরে এল না। এখন বুড়ি শুধু তার নাতনিকে নিয়ে ছোটো বাড়িটাতে থাকে। আর সেই থেকে বুনো-লোমের কুকুর আর সবুজ ব্যাং চাঁদের বাড়িতেই রয়ে গেছে।

তোমরা যদি চাঁদের দিকে তাকাও ওদের দুজনকে ঠিক দেখতে পাবে।

ছবি। সুব্রত মাজী



বুজাকি জিঙ্গিলাপো

পবিত্র সরকার

এক ছাগল ছিল। সাত-সাতটি ছানার মা সে। সবাই মিলে এক জঙ্গলে তারা বাস করত। প্রত্যেক দিন ছানাগুলোকে বাসায় রেখে মা বেরিয়ে যেত, জঙ্গলের মাঝখানে সবুজ ঘাসের জমিতে ঘাস খেতে। বেলা পড়লে ফেরার সময় সে বাচ্চাদের জন্যে ঘাস,জল আর দুধ নিয়ে ফিরত। যাবার সময় বাচ্চাদের বলত, 'খবরদার সোনারা, আমি না-থাকলে অচেনা কেউ এসে যদি দরজায় কড়া নাড়ে, তোমরা কক্ষনো দরজা খুলবে না। বুঝলে তো? অচেনা কাউকে ঘরে ঢুকতে দেবে না!'

একদিন এই কথা বলে ছাগল-মা জঙ্গলে চলে গেল। একটু পরেই একটা নেকড়েবাঘ এসে তাদের দরজায় কড়া নাড়ল। ছাগলছানাদের মধ্যে যেটা বড়ো সেটা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

নেকড়েবাঘ গলাটা খুব মোলায়েম করে উত্তর দিল, 'দরজাটা খোল্। আমি তোদের মা রে!'

ছাগলছানাটা বলল, 'না, তুমি কক্ষনোও আমাদের মা নও। ভাগো এখান থেকে।'

নেকড়েটা আর কী করে? তখনকার মতো চলে গেল। চলে গিয়ে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে

লক্ষ করতে লাগল যে, ছাগল-মা কখন ফিরে আসে, কী বলে।

বিকেলবেলায় ছাগল-মা ফিরে এসে দরজায় কড়া নাড়ল আর বলল, 'দরজা খোল্ বাছারা! এই দেখ তোদের মা কেমন ফিরে এসেছে, শিঙের ওপর ঘাস, গালের মধ্যে জল আর বুকভরতি দুধ নিয়ে।'

বাচ্চারা অমনি ছুটে এসে দরজা খুলে দিল।



নেকড়েবাঘ পুরো ব্যাপারটা দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল। পর দিন ছাগল-মা বনে বেরিয়ে যাবার পর কিছুটা বেলা গড়িয়ে যেতে সে এসে ছাগলের বাসার দরজায় কড়া নাড়ল আর মা-ছাগলের মতো গলায় বলল, 'দরজা খোল্ বাছারা! এই দেখ তোদের মা কেমন ফিরে এসেছে—শিঙের ওপর ঘাস, গালের মধ্যে জল আর বুকভরতি দুধ নিয়ে।'

ছাগলের বাচ্চারা ভাবল ওই তো তাদের মা এসেছে, তাই ছুট্টে গিয়ে দরজা খুলে দিল। আর যায় কোথায়? নেকড়ে এসে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছটা বাচ্চাকে তক্ষুনি পেটে পুরে পালিয়ে গেল।

ওদিকে বেলাশেষে ছাগল ফিরে এসে দেখে দরজাটা হাট করে খোলা, কিন্তু বাচ্চারা কেউ

কোথাও নেই। তখন সে রাগে দুঃখে পাগল হয়ে জঙ্গলে ছুটে গেল, গিয়ে ভালুককে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আমার বাচ্চাদের খেয়েছ?'

ভালুক বলল, 'পাগল নাকি? আমি কেন তোমার বাচ্চাদের খেতে যাব?'

তখন ছাগল ছুটে গেল খ্যাঁকশেয়ালের কাছে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আমার বাচ্চাদের খেয়েছ?'

খ্যাঁকশেয়াল মুখ ঝামটে জবাব দিল, 'পাগল নাকি? আমি কেন তোমার বাচ্চাদের খেতে যাব? আমি তাদের চোখেই দেখিনি কোনোদিন।'

ছাগলের খুব মনখারাপ হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে এসে সে ডুকরে কেঁদে উঠল। তার কান্না শুনে উনুনের পেছন থেকে একটা বাচ্চা লাফিয়ে তার কোলে এল--সে লুকিয়ে পড়েছিল বলে নেকড়েটা তাকে দেখতে পায়নি, খেতেও পারেনি। তার মা তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আ বাছা, তুই এখনও বেঁচে আছিস? তোর ভাইবোনদের কী হল?'

বাচ্চাটা তখন নেকড়ের কথাটা তার মাকে খুলে বলল।

ছাগল আবার একছুটে জঙ্গলে বেরিয়ে গেল। এবার সে সটান নেকড়ের মুখোমুখি। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আমার বাচ্চাদের খেয়েছ?'

নেকড়ে চালাক-চালাক মুখে মিটিমিটি হেসে বলল, 'হ্যাঁ খেয়েছি তো। তা তুমি করবেটা কী?'

ছাগল বলল, 'করবটা কী তুমি দ্যাখো। এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো। ভয়ে পালিয়ে যেয়ো না। যতক্ষণ না ফিরে আসি আমি, এইখানে থাকো।'

নেকড়ে বলল, 'যেখানে যাবি যা। আমি এখানেই থাকব!'

ছাগল তখন দৌড়ে কামারের কাছে গিয়ে বলল, 'কামারভাই, কামারভাই, আমার শিংদুটোয় ভালো করে ধার দিয়ে দাও তো!'

কামার তার উকো দিয়ে ঘষে তার শিংদুটোকে ছুঁচের মতো ধারালো আর তীক্ষ্ণ করে দিল।

ছাগল জঙ্গলে ফিরে এসে নেকড়েকে বলল, 'সাহস থাকে তো আমার সঙ্গে লড়াই করো।'

নেকড়ে হাঁ-করে জ্বলন্ত চোখে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঘাড় কামড়ে ধরতে গেল, কিন্তু তার আগেই ছাগলের শিঙে তার পেটটা ফুটো হয়ে গেল। আর সেইখান দিয়ে ছটা ছাগলছানা 'মা-মা' করে লাফিয়ে পড়ল।

নেকড়ে জঙ্গলে মরে পড়ে রইল। ছাগল-মা ছটা বাচ্চা নিয়ে বাড়ি ফিরে আগের মতো সুখে দিন কাটাতে লাগল।

ছবি। শঙ্কর বসাক



বুদ্ধিমতী রানি

অশোককুমার সেনগুপ্ত

এক ছিল মেষপালক। তার ছিল এক সুন্দরী কন্যা। রূপের ছটায় মেয়ের মুখে যেন হাজার তারা ঝিকিরমিকির করত। মেয়ের মাথায় ছিল এক ঢাল চুল। ছিল আয়ত একজোড়া চোখ। গভীর দিঘির মতো সেই চোখের দৃষ্টি। যাতে ফুটে বেরুত মেয়ের বুদ্ধির দীপ্তি। হাত পায়ের নিটোল গড়ন। যেন শিল্পী গড়ে তুলেছে মনের মতো করে এক জীবন্ত প্রতিমা। হাঁটলে যেন ছন্দ গড়ে উঠে যাওয়ার পথে ছড়িয়ে পড়ত। হাসলে ঝরে পড়ত জ্যোৎস্নার আলো।

মেষপালকের মেয়ে তো। পাহাড়ে, ঢালে, তৃণভূমিতে, উপত্যকার গাছগাছালিভরা সুরম্য প্রকৃতির উদ্যানে সে ঘুরে বেড়াত। তার রূপের বন্যায় প্রকৃতি যেন আরও সুন্দর হত।

এমন সুন্দরী মেয়েকে কে না বিয়ে করতে চায়, কিন্তু মেয়ে রাজি হলে তো। সে আনন্দের জোয়ারে ভেসে থাকে। পাহাড়ের সৌন্দর্য, গাছ, ফুল, পাখির গান তারপর পালপাল মেষের চরে বেড়ানো দেখতে দেখতে খুশিতে কাটায় দিনগুলি।

বাপ-মায়ের চিন্তা। মেয়ে বড়ো হচ্ছে। বিয়ে দিতে হবে তো। কিন্তু মেয়ে যদি রাজি না হয়। বিয়ের নামে শুধু হাসে। বকবে যে তার জো নেই। অমন সুন্দর মুখের মিষ্টি হাসির

মেয়েকে বকাঝকা করা যায়? রাগ তো গলে জল হয়ে পড়ে অমন অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে তাকালে। বাপ-মা ভাবে কী হবে? অমন মেয়ের বিয়ে হলে তারা থাকবে কেমন করে।

একদিন এক রাজা পাহাড়ে একা একা বেড়াতে এসেছে, ছদ্মবেশে অবশ্য। রাজা বলে চেনা যায় না। সাধারণ পোশাকের এক যুবক। অবশ্য চোখ মুখ দেখে মনে হয় বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ। যা হোক, রাজা তো মেয়েকে দেখল। দেখেই মুগ্ধ। মনে মনে ভাবল, রানি করতে হলে এমন মেয়েকেই করতে হবে।

ও মেয়ে, আমার একটা কথা শুনবে?

মেয়ে হেসে বলল, কেন শুনব না।

তুমি কাদের বাড়ির মেয়ে?

তাই বল। আমি ভাবলাম, তুমি আমার কাছে কোনো সাহায্য চাইবে, দেখে তো মনে হচ্ছে নতুন মানুষ। হ্যাঁ, আমার বাড়ি এখানেই। আমার বাবা মেষপালক।

হ্যাঁ। এদিকে তো সব মেষপালকের বাস। যাক্‌গে, আমি সোজা কথা বলি, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

মেয়ে ঠোঁট কামড়ে একটুখানি ভাবল। তারপর বলল, না।

না মানে! তুমি বিয়ে করবে না? নাকি আমাকে অপছন্দ।

সে কথা নয়। তুমি যে সরাসরি প্রস্তাব দিয়েছ, তাতে তোমাকে সাহসী বলে মনে হয়। তোমার শরীর স্বাস্থ্যও প্রমাণ করছে, তোমার ক্ষমতা আছে। আর বিয়ের কথা বলছ, তা করাই যেতে পারে। কিন্তু তোমাকে কাজ করে দেখিয়ে দিতে হবে, তোমার দক্ষতা আছে। যে লোক কাজ করে না, তাকে আমার একেবারেই পছন্দ নয়।

ঠিক আছে। আমি কাজ করেই দেখাব।

মেষপালক আর তার বউ রাজাকে দেখে অবাক। তারা তো আর রাজা বলে জানে না। দেখল বলিষ্ঠ চেহারার এক যুবক। এখানে কাজ দেখাবে। মেয়ে শর্ত দিয়েছে। কাজের লোক হলেই বিয়ে করবে।

তা তাঁত ছিল ঘরে। তা নিয়ে বসে পড়ল রাজা। বুনে ফেলল চমৎকার একটা কম্বল। এত রংবাহারি, এত সুন্দর বুনুনি যে, মেয়ে তা স্বীকার না করে পারল না। বলতেই হল, বাঃ কী সুন্দর কম্বল। না, মানতেই হবে তুমি কাজকর্ম করতে জান।

তাহলে বিয়েতে তুমি রাজি আছ?

তা আছি।

কিন্তু আমার পরিচয় জানলে না তো। আমি হলাম রাজা।

মেয়ে বলল, সে তোমার চেহারা দেখেই অনুমান করেছি।

---বল কী।

---হ্যাঁ, তাই তো কাজকর্ম জান কি না দেখে নিলাম।

মেষপালকের মেয়ে তো রাজরানি হয়ে এল রাজপ্রাসাদে। রাজা রাজ্যশাসন করে। দিন



কাটে। প্রজারা সুখেশান্তিতে থাকে। তবে রাজা চুপচাপ বসে থাকে না। ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ে মাঝেমধ্যে। এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়ও। রাজকর্মচারীরা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না, প্রজারা সবাই খেতে পাচ্ছে কি না, তাদের ওপর কোনো অত্যাচার হচ্ছে কি না, এসব দেখাও তো রাজাদেরই কর্তব্য। এই রাজা তো একজন কর্তব্যপরায়ণ রাজা। একে তো করতেই হবে দেখতেই হবে ঘুরে ঘুরে রাজ্য।

রাজ্যে ছিল এক সরাইখানা। সেখানে নানা লোক আসত। যাত্রীরা খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিত। আবার অন্য পথে চলে যেত। তবে একটা কাণ্ড হত। সরাইখানায় এসে সব মানুষ যে সহজে বেরিয়ে যেতে পারত, তা কিন্তু নয়। আসলে সরাইখানাটি ছিল কয়েকজন ডাকাতের। তারা এখানে-ওখানে ডাকাতি তো করতই, তারপর তাক করত সরাইখানার যাত্রীদের ওপর। ভিতরের দিকে ছিল একটা ঘর। যখনই বুঝতে পারত যাত্রীটির কাছে টাকাকড়ি আছে, তখনই তাকে ভিতরে টেনে নিয়ে যেত। তারপর লুটপাট করে ছেড়ে দিত। সে বেচারার কিছু করার সাধ্য থাকত না। অন্য যাত্রীরা জানতেও পারত না।

রাজা ছদ্মবেশে সরাইখানায় একদিন এল, ডাকাতরা দেখেই বুঝতে পারল, এ এক সম্ভ্রান্ত লোক। নিশ্চয়ই এর কাছে বেশ মোটারকমের টাকাকড়ি আছে। ডাকাতরা বাইরে এসে

শলাপরামর্শ করল।

একজন বলল, কিন্তু সঙ্গে তো কিছু নেই। না পুঁটলি, না থলে।

অন্যজন বলল, চেহারা দেখে বুঝছিস্ না। জোব্বার ভিতর নিশ্চয়ই মাল আছে।

তাহলে ঢোকা বেটাকে ভিতরে।

সেই ভালো। চল চল।

রাজা বলে ওরা তো চেনে না। টেনেহিঁচড়ে পাশের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর চার ডাকাত সামনে দাঁড়াল। দশাসই চেহারা, বড়ো বড়ো চোখ। লোমশ হাত-পা।

—এ কী। আমাকে আটকালে কেন?

ডাকাতরা হাঃ হাঃ করে হাসতে থাকল। একজন বলল, —বুঝতে পারলি না?

—না।

—কী আছে বের কর।

রাজা বলল, কী বের করব। তোমরা কারা?

—আমরা ডাকাত।

—তাই নাকি? কিন্তু আমার কাছে তো কিছু নেই।

—আচ্ছা, দেখছি।

একজন ডাকাত জামা, পাজামা, কোমর চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করল। না কিছুটি নেই। কী আশ্চর্য, কেমন লোক, কিছু না-নিয়েই বেরিয়ে পড়েছে।

তুমি কীরকম লোক হে। কিছু না-নিয়ে বেরিয়েছ।

—কী করব বলো।

এক ডাকাত বলল, দেখে তো মনে হচ্ছে, বেশ দু-পয়সা আছে তোমার। নইলে চেহারায় এমন জেল্লা দেয়!

—বেশ ভালোমন্দ খাওয়া-দাওয়াও হয়। আর এক ডাকাত বলে।

চুপ করে থাকে রাজা। ওরা আরও কথা বলে যায়। তার চেহারা নিয়ে মন্তব্য করে।

—আমাকে ছেড়ে দাও।

—ছেড়ে তো দেবই। মুক্তিপণ দিলেই মুক্তি।

—মুক্তিপণ কী?

—কী বোকা লোক রে। মুক্তিপণ মানে জানে না।

আর এক ডাকাত বুঝিয়ে দেয়, মুক্তিপণ হল, তোমাকে যে ছাড়া হবে, তার জন্যে তোমার বাড়ি থেকে টাকা চাই। তুমি তোমার বাড়িটা বলো। আর টাকাটা আনিয়ে দাও। সেসব ব্যবস্থা করে দেব।

—টাকা।

—হ্যাঁ। সোনা অলংকারও হতে পারে। তোমার জীবনের দাম, সে তো আর কম নয়। লাখ চার পাঁচ তো বটেই।

রাজা আঁতকে ওঠার ভান করে, বল কী! অত পাব কোথায়! সত্যি বলছি ভাই, আমার অবস্থা তেমন নয়।

—তাহলে মৃত্যুর অপেক্ষা কর। তোমার বাড়ির লোকেদেরও জানিয়ে দিই।

—শোন! শোন! আমার কিছু নেই। তবে টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

— কী করে।

—এখানে তাঁত আছে?

—তা আছে।

—আমাকে দিনপাঁচেক সময় দিতে পারো?

—তাও আমরা পারি। যদি টাকা পাই।

—ব্যস্ তাহলে তো মিটেই গেল। রাজা বলল, আমি একটা খুব সুন্দর কম্বল বানাব। তবে সে কম্বল রাজরাজড়া ছাড়া কিনতে পারবে না। তোমরা কম্বলটা নিয়ে রানির কাছে যাবে। আমি হলফ করে বলতে পারি, রানির পছন্দ হবেই। তোমরাও দাঁও বুঝে কোপ মারবে বেশ মোটা টাকার।

এক ডাকাত বলল, মন্দ বলেনি লোকটা।

অন্য ডাকাত মাথা নাচিয়ে বলল, ব্যাটার বুদ্ধি আছে।

যাই হোক, রাজা চমৎকার একটা কম্বল বুনে দিল। ডাকাতরা সেই কম্বল নিয়ে হাজির হল রাজবাড়িতে। বুদ্ধিমতী রানি। সে বুঝল রাজা তার পরিচয় ওদের কাছে দিব্যি গোপন করেছে। এখন তার কাছে কম্বল নিয়ে বিক্রির জন্য লোক এসেছে খবর পেয়ে রানি বুঝে ফেলল, রাজার ঠিক খবর সে পাবে। কম্বলই তাকে পথ দেখাবে।

রানি কম্বলটা হাতে নিয়ে উলটে-পালটে দেখে।

ডাকাতদের একজন বলল, পছন্দ হচ্ছে তো।

—দাঁড়াও, ভালো করে দেখি।

—দেখুন! দেখুন। এত সুন্দর কম্বল পৃথিবী ঢুঁড়লেও আপনি পাবেন না।

—বটেই তো।

রানি কম্বলের কাজ দেখে যায়। চেনা কাজ। তার ওপর রাজার নামটা পর্যন্ত নকশায় লেখা হয়েছে। আর সন্দেহ কী। রানি ভাবল, রাজা নিশ্চয়ই বিপাকে পড়েছে। বলল, দাম কত?

— পাঁচ লক্ষ টাকা।

রানি বলল, বড্ড বেশি হচ্ছে। তা হোক। পছন্দের জিনিস তো একটু বেশি দাম দিয়েই কিনতে হবে। ও খাজাঞ্চিমশাই, দিয়ে দিন টাকা।

ডাকাতরা টাকা নিয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে রানি করেছে কী। সেনাপতিকে ডেকে পাঠিয়েছে।

—সেনাপতি!

—বলুন রানিমা।

—আপনি এক্ষুনি ওই যাদের কাছে কম্বল কিনলাম, তাদের অনুসরণ করুন। সঙ্গে নেবেন বিশ্বস্ত অনুচর। খুব সাবধান ওরা যেন টের না পায়।

—এক্ষুনি যাচ্ছি।

—হ্যাঁ, রাজাকে ওখানেই পাবেন।

সেনাপতি আর দেরি করল না। বেরিয়ে পড়ল বেশ কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈনিককে নিয়ে।

তারপর। তারা গিয়ে ঘিরে ফেলল সেই সরাইখানা। ভিতরের ঘর থেকে রাজাকে বের করল। ডাকাতদের বন্দি করে নিয়ে এল। পাঁচ লক্ষ টাকাও আবার রাজার কোশাগারে এসে ঢুকল।

রাজা বলল, না, রানি তোমার বুদ্ধিকে তারিফ করতে হয়। তোমার জন্যই আমি মুক্তি পেলাম।

উহুঁ। তুমি মুক্ত হয়েছ, তোমার নিজের কাজ দেখিয়ে। সেজন্যেই তো বলেছিলাম তোমাকে, আমি কাজের মানুষকে বিয়ে করতে চাই। তুমি কম্বল বুনতে শিখেছিলে ভাগ্যিস্!

রাজা বলল, যা বলেছ।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



যাব কী যাব না

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

একদিন ভালুকেরা সবাই মিলে ঠিক করল যে, বঁইচি ফলের ঝোপে অনেক দিন থাকা হল; এবার থাকার জায়গা পালটাতে হবে। কোথায় যাওয়া যায়? কোথায় যাওয়া যায়? ... এমন একটা জায়গায় যাওয়া যাক যেখানে শুধু ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যাঙের ছাতা পাওয়া যায়। জায়গাটা ঠিক হওয়ামাত্র সবাই এক পায়ে খাড়া। বড়ো ভালুকেরা রাস্তা দেখিয়ে আগে আগে চলল, ছোটোরা চলল তাদের পেছনে।

যাচ্ছে তো তারা যাচ্ছেই। যাচ্ছে তো তারা যাচ্ছেই। যেতে যেতে পড়ল একটা ঝরনা। সেটা তারা পেরিয়ে গেল। তারপর পড়ল একটা নদী। সেটা তারা সাঁতরে পার হল। তারপর পড়ল একটা পাহাড়। সবাই উঠতে লাগল সেই পাহাড়ে।

ছোট্ট ভালুক ছিল সকলের শেষে। সে বিরস মুখে, অতিকষ্টে পাহাড়ে উঠতে লাগল। কারণ তার খুব ক্লান্ত লাগছিল। কিছুক্ষণ বাদে ছোটো ভালুক কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে লাগল, কিন্তু তার মা সেই কান্না শুনতে পেল না। তখন বাচ্চা ভালুক আরও জোরে কাঁদতে লাগল, কিন্তু তাও তার মা শুনতে পেল না। মা-ভালুক অন্যদের সঙ্গে পাহাড়ে উঠেই চলেছে, দূরের দিকে তার চোখ। বাচ্চাটা তার মায়ের কাছে যেতে চাইল, কিন্তু পারবে কীভাবে? তার ছোট্ট

শরীরটাতে কি অত শক্তি আছে? তা ছাড়া তার পায়ের থাবাগুলোতে ব্যথা। কপালে দুঃখ থাকলে যা হয়, — বাচ্চাটা সামনে দেখতে পেল পাকা টুসটুসে নীল রঙের ফল। পেট খিদেয় চুঁই চুঁই করছিল; সুতরাং বাচ্চাটা সেই ফল খেতে লাগল। একের পর এক ফল খেয়ে পেট যখন ফুলে ঢোল হয়ে উঠল তখন সে থামল। চারপাশে তাকিয়ে সে একজন ভালুককেও দেখতে পেল না। তারা কখন পাহাড় পেরিয়ে গেছে।

বাচ্চা ভালুক খুব ভয় পেয়ে গেল। বরফে ঢাকা পাহাড়ে সে একা, চারপাশে কেউ নেই। ভয়ে সে চিৎকার শুরু করল। কেউ একজন উত্তর দিল। কিন্তু সেই অচেনা জন্তুর গলার স্বরে সে ভয় পেয়ে গেল।

ভয়ে সে ছোটাছুটি করতে লাগল। একটা পাথরের উপর লাফিয়ে উঠতে গিয়ে থাবায় আঘাত পেল। ঝোপঝাড়ে আঁচড় খেল। একটা ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে নদীতে পড়ে সর্বাঙ্গ ভিজে গেল তার, অনেক কষ্টে সাঁতরে আবার তীরে ফিরে এল। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে গেছে।

চারপাশে টিলা, তার মাঝখানে সে ঘুমিয়ে পড়ল। পর দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল কে একজন তার পাশে বসে আছে। যে বসে আছে তার লম্বা লম্বা কান, একটা ছোট্ট লেজ আর বোঁচা নাক। বাচ্চা ভালুকের জন্তুটাকে দেখে হাসি পেল।

"তুমি কে?"

"আমি হচ্ছি খরগোশ। তুমি এখানে এলে কীভাবে?"

"বড়ো ভালুকেরা সবাই আমাকে ফেলে রেখে চলে গেছে।"

বাচ্চা ভালুকের এই কথা শুনে খরগোশ বড়ো দুঃখ পেল এবং তাকে তার ডেরায় নিয়ে এল। দুজনে খুব বন্ধু হয়ে গেল, একসঙ্গে দিন কাটাতে লাগল। খরগোশ খায় লতাপাতা, বাচ্চা ভালুক খায় বঁইচিফল। খরগোশ তার শক্ত থাবা দিয়ে বাচ্চা ভালুকের লোম থেকে ধুলো ঝেড়ে দেয় আর বাচ্চা ভালুক তার নখ দিয়ে খরগোশের লোম আঁচড়ে দ্যায়। সুন্দর জীবন কাটাচ্ছিল দুজন।

একদিন খরগোশ গেল নদীতে জল খেতে। দেখল একটা বড়ো ভালুক নদীর জলে মাছ ধরছে।

জল খেয়ে খরগোশ চলে যাবে এমন সময় তার মনে হল, ওই ভালুকটা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি ঠিক পালিয়ে যেতে পারব।

সুতরাং সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওহে শুনতে পাচ্ছো?"

—"হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। কী বলছ?"

—"সব ভালুকেরা তো চলে গেছে। তুমি এখানে কী করছ?"

—"আমি আমার বাচ্চাকে খুঁজছি। ব্যাঙের ছাতা যেখানে পাওয়া যায় সেই জায়গায় পৌঁছোনোর পর খেয়াল হল আমার ছেলে হারিয়ে গেছে। সব বাচ্চা ভালুকেরা সেখানে পৌঁছেছে, শুধু আমার বাচ্চাটারই কোনো পাত্তা নেই। ওই পাহাড়ের মধ্যে কোথাও নিশ্চয়ই



আমার বাচ্চা হারিয়ে গেছে।"

—"আমি তোমাকে সব বলছি বন্ধু। তুমি আমার সঙ্গে আমার ডেরায় চলো। আমার সঙ্গে একটা বাচ্চা ভালুক থাকে। সে যদি তোমার ছেলে হয় তাহলে তাকে তুমি নিয়ে যাবে। আর যদি তা না হয়, তাহলে সে আমার সঙ্গে থেকে যাবে।"

খরগোশের ডেরার কাছাকাছি ওরা যেতেই, বাচ্চা ভালুক তার মাকে দেখতে পেল আর ছুটে এল মায়ের কাছে। মা-ভালুক তো বাচ্চাকে পেয়ে খুব খুশি। সে তাকে খুব আদর করতে লাগল।

—"শেষমেশ তোকে খুঁজে পেয়ে আমার কী আনন্দ যে হচ্ছে না! চল এবার আমরা সেই নতুন জায়গায় যাই।" মা-ভালুক বলল।

বাচ্চা ভালুক মায়ের সঙ্গে যেতে লাগল। কিছু দূর যাবার পর সে পেছন ফিরে তাকাল এবং দেখল যে বেচারা খরগোশ তার ডেরার সামনে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে।

—"এসো আমরা এখানেই থেকে যাই। আমি অন্য কোথাও যাব না!" বাচ্চা ভালুক ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল।

—"চলে আয় রে সোনা!" মা-ভালুক অনুনয়-বিনয় করতে লাগল, "সেখানে কত ব্যাঙের ছাতা আছে জানিস! চল না গিয়ে দেখবি কী সুন্দর জায়গা।"

বাচ্চাকে নিয়ে মা-ভালুক বনের মধ্যে দিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু বাচ্চাটার কান্না কিছুতেই থামে না। মা তাকে যত শান্ত করার চেষ্টা করছে সে শুধু কাঁদতেই থাকে। কোনওভাবেই তাকে

শান্ত করা যাচ্ছে না। মা খাবার দিল, সে খেল না। খেলাধুলোও করতে চাইছে না। শুধু কেঁদেই চলেছে।

—"এই জায়গাটা খুব বাজে! বনের মধ্যে কী অন্ধকার। ওখানে পাহাড়ে কত আলো। এই ব্যাঙের ছাতা খেতে কী তেতো। আর ওখানকার বঁইচি ফল কী মিষ্টি। আমি ফিরে যেতে চাই। পাহাড়েই আবার ফিরে চলো।" বাচ্চা ভালুক কাঁদতে লাগল।

মা-ভালুক বুঝতে পারছে না কী করবে।

—"বেশ", সে বলল, "আমরা এখানে রাতটা কাটাব। তারপর কাল ভোরে পাহাড়ে চলে যাব।"

তারপর তারা ঘুমোতে গেল। বাচ্চা ভালুক সারারাত শুধু এপাশ-ওপাশ করতে লাগল আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সে একটা শব্দ শুনতে পেল থপ থপ। তারা যেখানে শুয়েছিল তার কাছাকাছি শব্দটা শোনা যাচ্ছিল।

বাচ্চা ভালুক মুখ বাড়িয়ে দেখতে গেল কীসের শব্দ। সে দেখতে পেল তার বন্ধুকে—সেই লম্বা কানের খরগোশ। বনের মধ্যে তারা দুজনে লুকোচুরি খেলতে লাগল। একটু পরেই মা-ভালুক ঘুম থেকে উঠে পড়ল আর পাহাড়ে ফিরে যাবার জন্যে তোড়জোড় শুরু করল।

—"মা তুমি কোথায় যাচ্ছো?" বাচ্চা-ভালুক জিজ্ঞেস করল।

—"কেন? সেই পাহাড়ে ফিরে যাব? তুমিই তো বললে ফিরে যেতে চাও। এই জায়গাটা নাকি তোমার ভালো লাগছে না।"

—"কিন্তু এখন জায়গাটা ভালো লাগছে। কী সুন্দর বন এখানে। কত গাছপালা। আর ব্যাঙের ছাতায় ছেয়ে আছে জায়গাটা। এ জায়গা ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না।"

সুতরাং ওরা বনে থেকে গেল। মা-ভালুক, বাচ্চা-ভালুক আর তার সবথেকে প্রিয় বন্ধু—খরগোশ।

ছবি। সুব্রত মাজী



জুমরাদ আর কিস্মত

পবিত্র সরকার

সে অনেক দিনের কথা। উজবেকিস্তানের এক শহরে ছিল এক বুড়ো, বউ আর মেয়ে জুমরাদকে নিয়ে সে সুখেই বাস করত।

সুখের দিন খুব তাড়াতাড়ি ফুরোয়। একদিন হঠাৎ বুড়োর বউ মারা গেল, মেয়েকে নিয়ে বুড়ো পড়ল আথান্তরে। মেয়ের খাওয়াদাওয়া পোশাক-আশাক—এসব নিয়ে তার কিছুই জানা ছিল না, তাকে কীভাবে মানুষ করতে হবে সেসব ব্যবস্থাও তার বউয়েরই মাথায় ছিল। তাই বুড়ো ভাবল, আর-একটা বিয়েই করে ফেলি। তাহলে মেয়েটার একটা নতুন মা হবে, সে-ই মেয়ের ভালোমন্দ নিয়ে ভাববে। এই ভেবে সে একজনকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এল। সে-মহিলারও জুমরাদের বয়সেরই একটি মেয়ে ছিল, তার নাম কিস্মত। জুমরাদ যেখানে দারুণ সুন্দরী, বুদ্ধিমতী আর দয়ামায়ায় ভরতি সেখানে কিস্মত মেয়েটা দেখতেও ভালো নয়, সেই সঙ্গে দুষ্টু আর হিংসুটে। মা-মেয়ে দুজনের কেউ জুমরাদকে সহ্য করতে পারত না।

সূর্য উঠতে-না-উঠতেই জুমরাদ রোজ উঠে পড়ত, আর জলপাত্র নিয়ে নদীতে জল আনতে যেত। যে-পথ দিয়ে সে যেত, দুধারে ঝোপঝাড়ে ফুল ফুটে সুগন্ধ ছড়িয়ে তাকে

বলত, 'এসো এসো জুমরাদ, দিন দিন তুমি সুন্দর হয়ে উঠছ, আমাদের খুশির সীমা নেই।'

ওদিকে কিস্মত ছিল ভারী আলসে আর কুবুদ্ধির ধাড়ি। সে দুমদাম করে পথ চলত, নদীতে যাবার সময় পথের ফুলগুলোকে মাড়িয়ে যেত, তাই তাকে দেখলেই ফুলগুলোর মুখ গোমড়া হয়ে যেত, তাদের গন্ধও কোথায় লুকিয়ে পড়ত।

সৎমার তো কথাই নেই। নিজের মেয়ে দেখতে ভালো নয় বলে জুমরাদ ছিল তার দুচক্ষের বিষ। ফলে বাড়ির সব কাজের দায় সে চাপাত জুমরাদের ঘাড়ে। বাড়ি ঝাড় দাও রে, ঝাড়পোছ করো রে, খাওয়ার আর রান্নার জল আনো রে—দুবেলা রান্না করো রে—বেচারি জুমরাদের আর নিশ্বাস ফেলবার অবসর ছিল না।

কিন্তু সে যত খাটুক যত করুক, সৎমার তাতেও মন উঠত না। সে অষ্টপ্রহর বকুনি দিত, 'ওরে আমার নবাবনন্দিনী রে, এইটুকু কাজ তিনি করে উঠতে পারছেন না।' না-হয় বলত, 'আহা! কাজের কী ছিরি!'

অন্য দিকে কিস্মত দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে ভালো ভালো জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়াত, সৎমা তাকে কুটোটিও নাড়তে দিত না।

একদিন জুমরাদ রাত্রের রান্না করছে। উনুনে কী একটা চাপিয়ে একটু অন্য দিকে গেছে, ওমনি কিস্মত এসে তাতে একগাদা নুন ঢেলে দিয়েছে। সৎমা ফিরে এসে মেয়েকে খেতে দিয়েছে, তখন পদটা মুখে না-দিয়েই কিস্মত থুথু করে ফেলে দিয়েছে, নুনে পোড়া সে ব্যঞ্জন। সৎমা জুমরাদকে এই মারে তো সেই মারে। বলল, 'তুই ইচ্ছে করে খাবারটা নষ্ট করেছিস, আমাদের না-খাইয়ে মারবার মতলব তোর। যাঃ। এক্ষুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা। আর একদণ্ড তোর আমাদের সঙ্গে থাকা চলবে না।'

বুড়োকে গিয়ে সে বলল যে, সে জুমরাদের মতো কুঁড়ে আর পাজি মেয়েকে এ বাড়িতে থাকতে দিতে চায় না, তাই তাকে তাড়িয়ে দিতে চায়। বুড়ো তাকে কোথাও গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসুক।

বেচারা বুড়ো আর কী করে। সে মনের দুঃখ মনে চেপে জুমরাদকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, কোনো বনে তাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে। বউকে অমান্য করার সাহস তার ছিল না।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে জুমরাদকে বুড়ো একজায়গায় অপেক্ষা করতে বলল। বলল, 'মা তুই এখানে দাঁড়া, আমি এই আশেপাশেই ক-টা গাছ কেটে আসি। কেটে কাঠ এনে এখানে একটু আগুন জ্বালাব। শীতও করছে, আর আগুন দেখে পশুপাখি কেউ কাছে আসবে না।'

জুমরাদ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। আর তার বাবা করল কী, সে একটা গাছের উঁচু ডালে কুডুলটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখল। তখন খুব জোরে বাতাস বইছে, আব ডালটা বাতাসে নড়ছে, আর কুডুলটাও দুলতে দুলতে একবার এ-ডালে, আর-একবার ওই ডালে আঘাত করছে। তাতে ঠকাঠক শব্দ হচ্ছে, আর জুমরাদ ভাবছে তার বাবা বুঝি কাঠ কেটেই চলেছে।



জুমরাদ যেখানে ছিল সেখানকার ঝোপগুলোতে ফুটে-থাকা সুন্দর ফুলগুলোকে তুলছে আর ভাবছে যে, বাবার কাঠ-কাটা কখন শেষ হবে।

হঠাৎ কিন্তু কুড়ুলের শব্দ থেমে গেল। জুমরাদ ভাবল, বাবা এবার আসবে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরেও বাবা এল না দেখে জুমরাদ একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে— কোথায় বাবা কোথায় কাঠ— গাছের ডালে তার কুড়ুলটাই শুধু ঝুলছে। হাওয়া পড়ে গেছে বলে শব্দও হচ্ছে না।

ভয় পেয়ে জুমরাদ চেঁচিয়ে বাবাকে ডাকল, 'ও বাবা, বাবা গো, তুমি কোথায়? আমার ভীষণ ভয় করছে যে।' কাঁদতে কাঁদতে দুপুর গড়াতে চলল, কিন্তু তার বাবার আর দেখা নেই।

হঠাৎ তার চোখে পড়ল, বনের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পথ দেখা যাচ্ছে। ভাবল, এই পথটা ধরে এগোই, দেখি কোথায় গিয়ে থামি। হাঁটতে হাঁটতে পথ আর ফুরোয় না, তার হাঁটাও শেষ হয় না।

হঠাৎ সে দেখল বনের মধ্যে চমৎকার একটা সাজানো বাড়ি, তার চিমনি থেকে ধোঁয়াও বেরোচ্ছে, সুস্বাদু রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। জুমরাদ এগিয়ে গিয়ে ভালো করে জানলা দিয়ে তাকাতেই দেখতে পেল এক বৃদ্ধা ঘরের মধ্যে হেলান দেওয়া চেয়ারে বসে জামা সেলাই করছেন।

জুমরাদের মনে হল যেন তার শান্তশিষ্ট স্নেহময়ী দিদিমাই বসে আছেন। তার মনে সাহস এল। সে এগিয়ে গিয়ে দরজায় আওয়াজ করল।

বৃদ্ধা এগিয়ে এসে দরজা খুলেই বুঝলেন, মেয়েটি বনের মধ্যে পথ হারিয়েছে, বললেন, 'আহা, কে তুমি, ভেতরে এসো বাছা!'

এই বৃদ্ধা আসলে বনের এক পরি, ওই বাড়িতেই সে থাকে। জুমরাদের মুখচোখ দেখে তার মনে হল, এ পৃথিবীতে এ মেয়েটার কেউ নেই, সে একেবারে অসহায়।

তার মাথায় হাত রেখে বলল, 'বাছা তুই এখানেই থাক, আর তোকে মানুষের ঘরে ফিরতে হবে না।'

এখন জুমরাদের দিন অনেক বেশি সুখে কাটে।

ছবি। শঙ্কর বসাক



কোঁকোর কোঁ

সুধীন্দ্র সরকার

কোঁও! কোঁকোর কোঁ! কঁক্ কঁক্!

লালঝুঁটি মোরগ লেজ দোলাতে দোলাতে আসছিল মাঠের পথ ধরে। ধানখেতে ধান খুঁটে খাওয়ার মজা অনেক। খুশিতে গান গাইতে গাইতে মোরগ পড়ে-থাকা ধানগুলো খাচ্ছিল খুঁটে খুঁটে।

হুক্কা হুয়া! হুক্কা হুয়া!

চমকে উঠল মোরগ। দেখল, একটা খেঁকশিয়াল ওর দিকে গুটিগুটি এগিয়ে আসছে।

শেয়ালটা যে খুব দুষ্টু সেটা মোরগ ভালো করেই জানে। তবু পালাল না মোরগ। নিজের মনে ধান খেতে লাগল আগের মতো।

শেয়ালটা মোরগের কাছে এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছিল আর ভাবছিল, আঃ কী সুন্দর মোরগটা! আর ওর মাংসও না জানি কত ভালো! দেখে তো মনে হয় পালকগুলোও পর্যন্ত মিষ্টি!

জিভে জল এসে গেল শেয়ালের। তবুও সে সাহস করে মোরগের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারল না। কেন-না ধানখেতে তখন চাষারা ধান কাটছিল। যদি ওরা শেয়ালকে মারে? তাই

শেয়ালটা তখন মনে মনে একটা ফন্দি আঁটল।

'সোনা মোরগ। সোনা মোরগ!'

শেয়ালটা মোরগের সামনে এসে দাঁড়াল। মিষ্টি গলায় বললে, 'অনেক দিনের ইচ্ছে লালঝুঁটি মোরগের সঙ্গে বন্ধু পাতাই। তুমি কি আমার বন্ধু হবে?'

মোরগটা ভয়ে হ্যাঁ বা না কিছুই বললে না।

—কী গো কথা বলছ না কেন? তোমার নামটি কী ভাই? আমার নাম লম্বা লেজ। শেয়াল বললে।'

'আমার নাম কোঁকোর কোঁ।' মোরগ বললে।

—'বাঃ বাঃ খুউব সুন্দর নাম।' শেয়াল বললে, 'কাল আমার বাড়িতে এসো। তোমার নেমন্তন্ন। হাজার হোক নতুন বন্ধু তুমি।'

মোরগ রাজি হল শেয়ালের বাড়ি যেতে। এখনকার মতো তো বাঁচা যাক। জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার বাড়ি কোনদিকে?'

'ওই তো কদমফুলি মাঠের পাশে।' মুখ তুলে শেয়াল বললে, 'তাহলে, কাল আসছ তো?' আমি কিন্তু তোমার জন্যে রান্না করে বসে থাকব।

ঝুঁটি নেড়ে মোরগ বললে, 'কাল সক্কালেই যাব।'

শেয়ালটা চলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'এই দেখ, তোমার নামটা কী যেন বললে? ভুলেই গেছি। তুমি একটু নামটা লিখে দেবে?'

লালঝুঁটি মনে মনে হাসল। ঠোঁট দিয়ে ইটের টুকরো তুলে, শেয়ালের কপালে বড়ো বড়ো করে লিখল 'ভাল্লুক'।

লাফাতে লাফাতে শেয়াল চলে গেল কদমফুলি মাঠের দিকে। লালঝুঁটি চেয়ে রইল ওর চলার পথে।

পরের দিন সারা সকালটা পথ চেয়ে বসে রইল শেয়াল। কিন্তু মোরগ আর এল না। না খেয়েই দিন কাটল ওর। মোরগ দিয়ে ভোজ সারা আর হল না।

খুব রেগে গেল শেয়াল। দাঁতের পাটিদুটো কড়মড় করে উঠল রাগে। এখন মোরগকে যদি সামনে পায় জ্যান্ত গিলে খাবে। শেয়ালকে ঠকানোর শাস্তি দেবে হাতেনাতে।

দিনের পর দিন শেয়াল ঘুরে ঘুরে খুঁজতে লাগল মোরগকে। যাকে সামনে পায় তাকেই জিজ্ঞেস করে, লালঝুঁটি মোরগের কথা। কেউই ওকে মোরগের খবর দিতে পারে না। একদিন হল কী— মাঠেঘাটে খুঁজতে খুঁজতে শেয়াল পড়ে গেল একটা নেকড়ের সামনে।

শেয়ালকে পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছুটতে দেখে নেকড়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কী ব্যাপার শেয়ালভাই। অমন হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছ?'

শেয়াল রেগেমেগে বললে, 'আমি একটা ঠকবাজকে খুঁজছি। ব্যাটা আমাকে খুব ঠকিয়েছে। পেলে ওকে জ্যান্ত চিবিয়ে খাব।'

নেকড়ে জিজ্ঞেস করলে, 'নাম কী তার?'



—'নামটা তো মনে নেই।' 'শেয়াল নেকড়ের সামনে মুখ তুলে বলল, 'দ্যাখো-না, ওর নাম আমার কপালের উপর লেখা আছে।'

নেকড়েটা শেয়ালের কপালে 'ভাল্লুক' লেখা দেখে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল বোকার মতো। অবাক হয়ে ভাবল, শেয়ালটা যদি ভাল্লুককে চিবিয়ে খেতে পারে, তাহলে ওকে গিলেই ফেলবে।

ভয়ে দৌড় লাগাল নেকড়ে। আর দাঁড়াল না শেয়ালের সামনে।

ঠিক তখুনি একটা ভাল্লুক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। নেকড়েকে ওই ভাবে পালাতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে!

শেয়ালটা খুঁজতে খুঁজতে ভাল্লুকের সামনে এসে পড়ল।

ভাল্লুক শেয়ালকে জিজ্ঞেস করলে, 'শেয়ালভায়া, তোমায় দেখে নেকড়েটা অমন তড়িঘড়ি ছুটল কেন?'

শেয়ালের অতশত কথা ভালো লাগছিল না। ও তখন মোরগ খুঁজতেই ব্যস্ত। মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'তা আমি কী করে জানব? আমি মরছি আমার জ্বালায়! ক-দিন ধরে খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়ে গেলুম, তবু কোনো হদিশ পাচ্ছি না।'

--'কাকে খুঁজছ তুমি?' জিজ্ঞেস করলে ভাল্লুক।

—'একটা বদমাশ ঠক্‌বাজকে। পেলে ওকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করব।'

—'সে কে? কী নাম তার?'

—'ওই নামটাই তো আমার মনে থাকে না। খালি খালি ভুলে যাই। দ্যাখো-না, আমার কপালে লেখা আছে।' মুখ তুলল শেয়াল। ভাল্লুক শেয়ালের কপালে নিজের নাম দেখে অবাক হল খুব। জিজ্ঞেস করল, 'ওকে খুঁজে পেলে কী করবে বলছিলে?'

দাঁত কড়মড় করে শেয়াল বললে, 'ছিঁড়ে কুটি কুটি করব।'

—বটে! চিৎকার করে উঠল ভাল্লুক, 'কুটি কুটি করাচ্ছি তোকে।' বলেই শেয়ালের লম্বা লেজটা ধরে শূন্যে কয়েকটা পাক দিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

ধপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়ে শেয়াল কেঁদে উঠল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়োতে লাগল বাড়ির দিকে।

মাথায় চোট লাগাতে শেয়াল আগের সব কথা বেমালুম ভুলে গেল। এমন কী লালঝুঁটি মোরগকেও।

ছবি। সুব্রত মাজী



সুখেন্দু মজুমদার

হঠাৎ আকাশ থেকে নেমে এল একচোখো দাঁড়কাক।

এসে বসল গোয়ালার ঘরের চালে।

ঘরের চালে বসে কী করছিল?

এমনি এমনি বসে ছিল?

না।

বসে বসে রোদ পোহাচ্ছিল?

না।

বসেই রোদে শুকোতে দেওয়া পনিরগুলো ঠোকরাতে শুরু করল।

গোয়ালা আর তার বউ কতদিন পাহারা দিচ্ছে। প্রতিদিনই তাদের পনিরগুলো একটু একটু করে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা প্রথমে গোয়ালার নজরে আসে। নিজের হাতে পনিরগুলো বানানো। অথচ গুছিয়েগাছিয়ে বাজারে নিয়ে যাবার সময় কম কম। এক দিন। দুই দিন। বউ শুনে অবাক। কেমন করে হবে।

শেষকালে ফাঁদ পাতা হল। না পেতে উপায় ছিল না। কষ্টের দিন যে শেষ হতে চায় না।

গোয়ালার একটাই গোরু ছিল। গোটাদিন বনে বনে ঘাস খাওয়ায়।

গোয়ালা-বউ বাড়ির কাজ করে।

বাড়ি বলতে ছোট্ট একটা কুঁড়ে। মাটির দেয়াল। আর খড়ের চালা।

গোয়ালা-বউ গোরুর দুধ দোওয়ায়। সেই দুধ জমিয়ে জমিয়ে ছানা। সেই ছানা থেকে পনির বানায় গোয়ালা।

সেই পনির ঠোকরাতে এসে ফাঁদে ধরা পড়ে গেল একচোখো দাঁড়কাক।

গোয়ালা তো সেই কবে থেকে রেগে আছে। ফাঁদে ধরা পড়ামাত্র গোয়ালা তেড়ে গেল। একচোখো দাঁড়কাকটাকে ধরেই আলতো করে গলায় দিল এক মোচড়।

রেগে গেলে কত কিছুই তো করে সবাই।

গোয়ালা যত মোচড়ায় একচোখো দাঁড়কাক তত চিৎকার জোড়ে, 'দোহাই আমাকে মেরো না। আমি তোমাকে একটা দারুণ উপহার দেব।'

গোয়ালা চোখ গোলগোল করে বলে, 'বিপদে পড়লে সবাই এমন বলে।'

'না। না। সত্যি বলছি। কাল তুমি আমার বাড়ি চলে এসো।'

'কোন মুলুকে তোমার বাড়ি।'

'ঘাসপাতার মাঠ পেরিয়ে গিয়ে যে কাউকে জিগ্যেস কোরো। আমার বাড়ি দেখিয়ে দেবে।'

একচোখো দাঁড়কাকের কথা গোয়ালা আর তার বউ বিশ্বাস করল। এমন করে বললে সবাই বিশ্বাস করে। গোয়ালা আর তার বউ ফাঁদ খুলে দাঁড়কাকটাকে উড়িয়ে দিল।

পরের দিন গোয়ালা গোরুটাকে ঘাসপাতার মাঠে চরাতে নিয়ে গেল না। বাড়ির কাছাকাছি তাকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল গোয়ালা।

কোথায় গেল গোয়ালা?

বারে। সেই একচোখো দাঁড়কাকের বাড়ি যেতে হবে না!

মাঠে নেমে হাঁটতে শুরু করল গোয়ালা। কিছুটা হেঁটে চোখে পড়ল একপাল ভেড়া। মাঠে ঘুরছে ফিরছে। আর ঘাসপাতা খাচ্ছে।

কাছে গিয়ে গোয়ালা জানতে চাইল, এই ভেড়াগুলোর মালিক কে?

কাছাকাছিই ছিল মেষপালক। গোয়ালার কথা শুনে বলল, 'এই ভেড়াগুলোর মালিক একচোখো দাঁড়কাক।'

'কোথায় গেলে তাকে পাবো।' গোয়ালা বলল।

'এই পথটা বরাবর আরও কিছুটা হেঁটে যান। পথেই দেখা হবে আরও কিছু রাখালের

সঙ্গে। তারাই পথ বলে দেবে।'

নিশ্চিত হয়ে হাঁটতে শুরু করে গোয়ালা।

হাঁটতে হাঁটতে পেরোল অনেকটা পথ। চোখে পড়ল একপাল ঘোড়া।

'এই ঘোড়ার পালের মালিক কে?' গোয়ালা জানতে চাইল অশ্বপালকের কাছে।

'একচোখো দাঁড়কাক।' অশ্বপালক বলল।

গোয়ালা জানতে চাইল তার বাড়িটা কোথায়।

'এই পথ ধরে হাঁটতে থাকো, যতক্ষণ না একপাল উটের দেখা পাও। সেই উটপালকের কাছে জানতে পারবে একচোখো দাঁড়কাক কোথায় থাকে।'

গোয়ালা শুরু করল হাঁটতে, যতক্ষণ না উটের পালের দেখা পায়। যেমনি দেখা উটপালকের কাছে জানতে চাইল একচোখো দাঁড়কাকের বাড়ির খোঁজ।

শেষে উটপালক একচোখো দাঁড়কাকের বাড়ির পথটা গোয়ালাকে দেখিয়ে দিল। ঘাসপাতা মোড়া মাঠের শেষে নানান পশুর পাল আর পালকদের মালিক দাঁড়কাক গোয়ালাকে দেখামাত্রই স্বাগত জানাল । নানান চমৎকার উপাদেয় খাবারের থালা সাজিয়ে আপ্যায়িত করল তাকে। তারপর একচোখো দাঁড়কাক বসল মনের কথা বলতে। সে যে কত কথা। সময় গড়ায় গড়গড়িয়ে।

কথার ফাঁকে একচোখো দাঁড়কাক একটা চাদর উপহার দিল গোয়ালাকে। বলল, 'শুধু বলবে—

লাগ ভেলকি লাগ
চাদর খুলে যাক
মণ্ডা মিঠাই যার যেটা চাই
পেটটা ভরে খাক।—

অমনি দেখবে কত রকমের খাবার হাজির হয়ে যাবে। ঠিক যেমনটি-যেমনটি চাইবে তুমি। তারপর খাওয়ার পাট শেষ হয়ে গেলে আবার বলবে,—

লাগ ভেলকি লাগ
চাদর হবে ভাঁজ
ইষ্টিকুটুম মিষ্টিকুটুম
ভোজ হয়েছে আজ। —

অমনি চটপট ভাঁজ হয়ে যাবে চাদর।'

বাড়ি ফিরে হাঁক দিল গোয়ালা, 'কই গো বউ। তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে এসো। এবার খেতে বসতে হবে যে।'

'ঘরে তো কিছুই নেই। তাই রান্নাও হয়নি আজ। কী খাবো আমরা?' বউ বলল।

ততক্ষণে হাত ধুয়ে মাদুর পেতে বসে পড়েছে গোয়ালা। সামনে রাখা উপহার পাওয়া চাদরটা। গোয়ালা বলল, —

'লাগ ভেলকি লাগ
চাদর খুলে যাক
মন্ডা মিঠাই যার যেটা চাই
পেটটা ভরে খাক।'

যেমনি বলা, খুলে গেল চাদর। মাদুরের ওপর সুন্দর করে পাতা। চাদরের ওপর ছড়ানো কত রকমের সব খাবার।

গোয়ালা-বউ অবাক। সত্যি তো এমন সব খাবার। কতদিন খায়নি ওরা। চটপট শুরু করে খাওয়া।

যেই না খাওয়া শেষ, গোয়ালা চাদরটাকে বলল,—

'লাগ ভেলকি লাগ
চাদর হবে ভাঁজ
ইষ্টিকুটুম মিষ্টিকুটুম
ভোজ হয়েছে আজ।'

কথামতো চাদর তাই করল।

গল্প জুড়ল গোয়ালা আর তার বউ।

'কাল সুলতান আর তার সভাসদদের নেমন্তন্ন করলে কেমন হয়?' গোয়ালা বলল।

'ভুলে যাও এসব আজগুবি ভাবনা। দেখতে পেলে সুলতানের লোকজন আমাদের এই আশ্চর্য চাদরটা নিয়ে যাবে।' গোয়ালা-বউ কাকুতি মিনতি জুড়ল গোয়ালার কাছে।

গোয়ালা জেদ ধরল, 'আমি যখন একবার ঠিক করে ফেলেছি তখন সুলতানকে নেমন্তন্ন করতেই হবে। আর যাই হোক আমার কাছে আশ্চর্য চাদরটা তো আছে।'

তাই হল। নেমন্তন্ন পেয়ে সভাসদসহ সুলতান হাজির গোয়ালার বাড়ি। বসবার জন্য সুদৃশ্য মাদুর পাতা হল। চারপাশে বসল সবাই। মাঝখানে রাখা সেই আশ্চর্য চাদর।

গোয়ালা আদেশের সুরে বলল,

'লাগ ভেলকি লাগ
চাদর খুলে যাক
মন্ডা মিঠাই যার যেটা চাই
পেটটা ভরে খাক।'

চোখের পলকে তা হল। সুলতান আর তার সভাসদদের সামনে হাজির হতে থাকল চোখজুড়োনো সব খাবার।

সবাই দারুণ খুশি। খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ করে সদলবলে ফিরে গেল সুলতান। প্রাসাদে ফিরে গিয়ে সে তার দুজন রক্ষীকে আদেশ করল, 'যাও। সেই হতভাগা গোয়ালার আশ্চর্য চাদরটা কেড়ে নিয়ে এসো।'

সুলতানের কথামতো রক্ষীরা করল তাই। বেচারা গোয়ালা। কী আর করে। উপায় না

পেয়ে চলল একচোখো দাঁড়কাকের বাড়ি। অভিযোগ জানাল রাজার বিরুদ্ধে, 'আমার আশ্চর্য চাদরটা সুলতানের রক্ষীরা কেড়ে নিয়ে গেছে।'

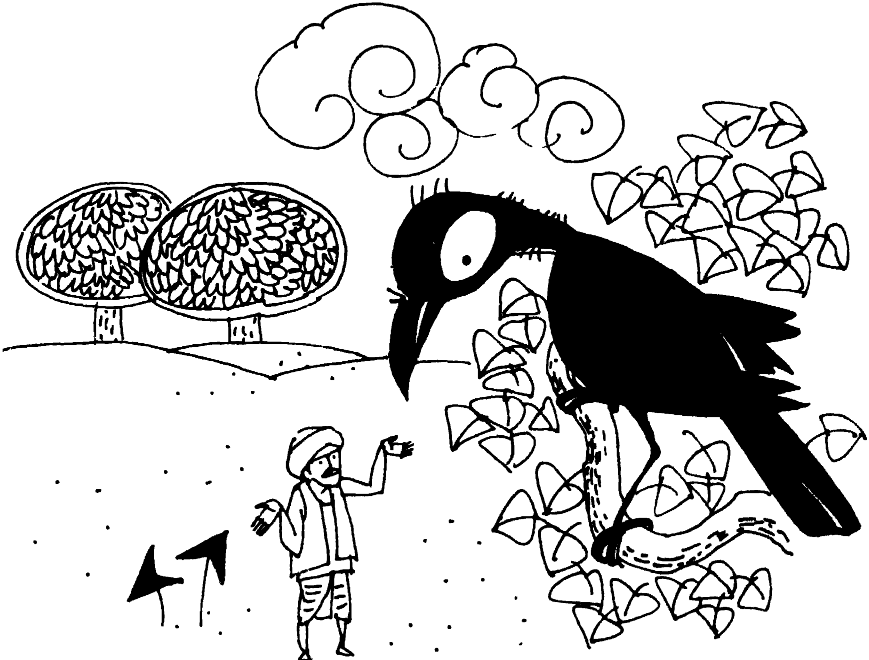
'তাতে হয়েছে কী? ঠিক আছে আমি তোমাকে এই গাধাটা দিলাম। তুমি যেই তাকে হেট হেট বলবে অমনি গাধাটা গোবর না ছড়িয়ে সোনা ছড়াতে ছড়াতে যাবে।' একচোখো দাঁড়কাক বলল, 'যাও এবার বাড়ি ফিরে।'

গাধাটা পেয়ে গোয়ালা দারুণ খুশি। চেপে বসল তার পিঠে। তারপর সুলতানের প্রাসাদের পথ পেরিয়ে ফিরে চলল বাড়ি।

মনে মনে ভাবল গোয়ালা, পথে আর বিপদ ডেকে এনে লাভ নেই। তার চেয়ে তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভালো। যেই না ভাবা অমনি গোড়ালি দিয়ে গাধাটাকে খোঁচা মেরে গোয়ালা বলে ফেলল 'হেট হেট।' পথে যেতে যেতে হাতের লাঠিটা দিয়ে খোঁচা মেরে সবাই যেমন বলে।

তখন খোঁচা-খাওয়া গাধা শুরু করল সোনা ছড়ানো। ঠিক সেই সময় শিকার শেষে সুলতান প্রাসাদে ফিরে আসছে। আশ্চর্য গাধার কাণ্ড দেখে হতবাক সে। মুহূর্তে গোয়ালাকে গাধার পিঠ থেকে ফেলে সুলতান গাধাটাকে নিয়ে চলল প্রাসাদের দিকে।

পরের দিন হতভাগা গোয়ালা ধুঁকতে ধুঁকতে চলল দাঁড়কাকের বাড়িতে। গোয়ালাকে



আসতে দেখে হাঁক দিল দাঁড়কাক, 'কী হে গোয়ালা। কেউ আবার কিছু করল নাকি?'

'রাজা আমার গাধাটা কেড়ে নিয়েছে।'

দাঁড়কাক এবার সত্যি সত্যি খুউব বিরক্ত। তবু কিছু না বলে গোয়ালাকে ডেকে তার তৃতীয় উপহার একটা সুদৃশ্য বাক্সো দিল। আর বলল, 'যখন যে জিনিস দরকার বাক্সোটা সামনে রেখে বলবে,

তাইরে না নাইরে
বাক্সোটা খুলে যাক
খুলে যাক ভাইরে
নাইরে না তাইরে
গদা হাতে এইবার
চলে আয় বাইরে—

অমনি একটা লোক গদা হাতে বাক্সো থেকে বেরিয়ে আসবে। আশপাশের দুষ্টুলোকদের গদা দিয়ে পিটিয়ে ভাগিয়ে দেবে। যেই তুমি বলবে—

আর নয় আর নয়
এখানেই শেষ
ফিরে যা ফিরে যা তুই
বাক্সোয় বেশ। —

তখনই গদা হাতে লোকটা বাক্সে ঢুকে পড়বে।'

বাক্সোটা পেয়ে গোয়ালা দারুণ খুশি। সেটা মাথায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। মনের ভিতর একটা ব্যাপার কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে। একজন মানুষ কেমন করে এই ছোট্ট বাক্সোটায় থাকে। তার গদাটাও তেমন ছোটোখাটো নয়। মনটা উশখুশ করছে। ব্যাপারটা একবার দেখলে কেমন হয়। যেমনি ভাবা, পাহাড়ের উপর বাক্সোটা নামিয়ে রাখল সে। তারপর পছন্দসই একটা বড়োসড়ো গর্তের ভিতর লুকিয়ে পড়ে চিৎকার জুড়ল,

'তাইরে না নাইরে
বাক্সোটা খুলে যাক
খুলে যাক ভাইরে
নাইরে না তাইরে
গদা হাতে এইবার
চলে আয় বাইরে—'

তক্ষুনি তড়াক করে বাক্সো থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক, হাতে কাঠের গদা। এপাশ ওপাশ কী যেন খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ নজরে পড়ে গেল গর্তের ভিতর গোয়ালাকে। যেই তাকে সজোরে মারতে উদ্যত হয়েছে গোয়ালা চিৎকার জোড়ে,

'আর নয় আর নয়
এখানেই শেষ
ফিরে যা ফিরে যা তুই
বাক্সোয় বেশ—'

সুড়ুৎ করে গদা হাতে লোকটা ঢুকে পড়ল বাক্সোর ভিতর। বাক্সোটাও হয়ে গেল বন্ধ। বন্ধ বাক্সোটা আঁকড়ে ধরে গোয়ালা সোজা চলল রাজপ্রাসাদের দিকে। তারপর হাজির সোজা রাজসভায়। একটা গোপন জায়গায় বাক্সোটা লুকিয়ে রেখে গোয়ালা নিজেও লুকিয়ে পড়ল পছন্দসই জায়গায়। আড়াল থেকে চিৎকার করে ওঠে গোয়ালা,

'তাইরে না নাইরে
বাক্সোটা খুলে যাক
খুলে যাক ভাইরে
নাইরে না তাইরে
গদা হাতে এইবার
চলে আয় বাইরে—'

যেই-না বলা বাক্সো গেল খুলে। গদা হাতে লোকটা তড়াক করে বেরিয়ে এল বাক্সো থেকে। তারপর প্রথমে গদা দিয়ে সজোরে আঘাত করল সুলতানকে। সুলতানের পর আঘাত করল উজির-অমাত্যদের। সবশেষে সভাসদদের। যতক্ষণ না সবাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ততক্ষণ আঘাত করল সে। সবশেষে ধ্বংস করে দিল গোটা প্রাসাদ।

সে এক আশ্চর্য কাণ্ড। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে গোয়ালা চিৎকার করে ওঠে,

'আর নয় আর নয়
এখানেই শেষ
ফিরে যা ফিরে যা তুই
বাক্সোয় বেশ—'

লোকটা ঢুকে পড়ল বাক্সোর ভিতর। বাক্সোটাও বন্ধ হয়ে গেল। গোয়ালা খুঁজে পেল তার আশ্চর্য চাদর। খুঁজে পেল আশ্চর্য গাধাটা। তারপর গাধার পিঠে চড়ে ফিরে এল বাড়িতে।

বাড়ি ফিরে দিল এক মহাভোজ। দেশের সব মানুষের নেমন্তন্ন ছিল সেই ভোজে। সুখেদুখে সবাইকে নিয়ে এখন দিন কাটায় গোয়ালা।

ছবি। সুব্রত মাজী



খ্যাঁকশেয়াল আর সারস

পবিত্র সরকার

এক ছিল সারস, আর এক ছিল খ্যাঁকশেয়াল। তারা খুব বন্ধু। একদিন খ্যাঁকশেয়াল বন্ধু সারসকে বলল, 'আজ তোমার আমার বাড়িতে নেমন্তন্ন। না-এলে খুব দুঃখ পাব।'

সারস বলল, 'তোমার নেমন্তন্ন, আর আমি যাব না? তা কি কখনও হতে পারে!'

রাত্রে সারস আসতেই খ্যাঁকশেয়াল বলল, 'এসো আজ তোমাকে একটা নতুন সুপ খাওয়াব।'' বলে পাতলা সুপ থালায় ঢেলে সে চকাৎ চকাৎ করে জিভ দিয়ে নিজে সবটা সুপ খেয়ে নিল। বেচারা সারস থালায় ঠোঁট লাগিয়ে সে সুপ মুখে তুলতেই পারল না, খ্যাঁকশেয়ালের পেটে গেল সবটা সুপ, ওদিকে সারস বেচারার পেট খালি, খিদেতে চুঁই চুঁই করছে।

পেটে খিদে নিয়েই সে বাড়ি ফিরে গেল।

ক-দিন গেল। আবার সারসকে খ্যাঁকশেয়ালের নেমন্তন্ন। মনের রাগ মনে চেপে সারস আবার নেমন্তন্ন রাখতে গেল।

কিন্তু এবারও সেই একই চালাকি। খ্যাঁকশেয়াল পুরোটা সুপ খেয়ে নিল, সারস বেচারা

শুকনো মুখে চুপ করে বসে রইল। বন্ধুর এই বিশ্বাসঘাতকতায় তার মন ভেঙে গেল, কিন্তু সে মুখে কিছু অভিযোগ করল না। ভাবল, 'আচ্ছা, আমারও দিন আসবে একদিন।'

বরং মুখে বলল, 'ভারী ভালো লাগল বন্ধু তোমার নেমন্তন্ন খেয়ে। চলো দুজনে একটু হেঁটে আসি।'

সুপ খেয়ে খ্যাঁকশেয়ালের পেট তো ভারী হয়ে গেছে। সে বলল, 'ভরপেট খাওয়ার পর হাঁটাটা কি ঠিক হবে?'

সারস বলল, 'বেশ, তাহলে তুমি আমার পাখায় চড়ে বসো, আমি তোমাকে খানিকক্ষণ আকাশে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।'

খ্যাঁকশেয়াল সারসের ডানার ওপর উঠে বসল, সারস একঝটকায় আকাশে উঠে পড়ল।

কিছুক্ষণ ওড়বার পর সারস বলল, 'বন্ধু, এখন পৃথিবীকে কেমন লাগছে?'

খ্যাঁকশেয়াল বলল, 'ও মা, এ তো ধানঝাড়াইয়ের মেঝের মতো দেখছি—কীরকম চ্যাপটা—।'

সারস আর-একটু ওপরে উঠে গেল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এবার? এবার পৃথিবীটাকে কেমন দেখছ?'

শেয়াল বলল, 'আরে, পৃথিবীটা কোথায় গেল? তাকে তো দেখতেই পাচ্ছি না।'

সারস আরও খানিকটা ওপরে উঠে বলল, 'উঃ, আর পারছি না। উড়ে উড়ে আমার ডানাদুটো ব্যথা করছে। বন্ধু, এবার তুমি চট করে নেমে পড়ো দিকিনি, আমি একটু হালকা হই।'

খ্যাঁকশেয়াল হাঁ-হাঁ করে উঠল, 'আরে কী বলছ পাগলের মতো। এই শূন্যে হাওয়ার মধ্যে আমি নামব কী করে? আমাকে পৃথিবীর মাটিতে কোথাও নামিয়ে দাও, তবে তো!'

'ওসব আমি বুঝি না'—সারস বলল। 'তুমি যদি না নামো তো আমি ডানা ঝেড়ে তোমাকে ফেলে দেব।'

খ্যাঁকশেয়াল তখন বুঝতে পারল তার বোকামি। সে তখন হাউমাউ করে সারসের পায়ে ধরতে চায়, বলে, 'ভাই, আমি খুব অন্যায় করেছি তোমাকে নেমন্তন্নে ঠকিয়ে। তুমি যদি এবারের মতো আমায় মাপ করো আর মাটিতে নামিয়ে দাও, তাহলে আমি সারাজীবন তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।'

তখন সারস বলল, 'জানো তো, যেমন কর্ম তেমনি ফল? মনে থাকে যেন।' বলে খানিকটা নেমে এসে ডানা কাত করে শেয়ালকে পৃথিবীর পিঠে ফেলে দিল।

খ্যাঁকশেয়াল এসে পড়ল ইস্কুলের একগাদা ছাত্রছাত্রীর মাঝখানে। স্কুল সবে ছুটি হয়েছিল, তারা বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ এই বিপত্তি।

তারা বইখাতা ফেলে যে যেদিকে পারল পালাল। খ্যাঁকশেয়াল একখানা বই মুখে করে দৌড়ে একটা পাহাড়ের গুহায় চলে এল। এসে গুহার দরজায় বসে বইটা খুলে সে বিড়বিড় করতে শুরু করল, যেন কত সে বইটা পড়ছে।

ওই গুহার সামনের রাস্তা দিয়ে তখন একটা ভালুক যাচ্ছিল। সে খ্যাঁকশেয়ালকে বই পড়তে দেখে খুব অবাক হয়ে গেল। চোখ গোল-গোল করে জিজ্ঞেস করল, 'আরে খ্যাঁকশেয়াল ভাই। তুমি করছটা কী?'

খ্যাঁকশেয়াল ভালুকের এই প্রশ্নে কেন যেন খুব চটে উঠল। রাগতস্বরে বলল, 'বোকার মতো প্রশ্ন। দেখছ না আমি শাস্ত্র পড়ছি? এতে সব ধর্মের কথা আছে। আমি পণ্ডিতগিরি করি, বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাই।'

ভালুক লজ্জা পেয়ে বলল, 'দেখো দাদা, আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমি কী করে বুঝব এসবের মানে। শোনো এখন। আমার দুটো ছেলে আছে, তাদের একটু শাস্ত্র পড়াবে? আমি তাদের তোমার হাতে ছেড়ে যাব। তারপর একটা আজারবাইজানি প্রবাদ আউড়ে বলল, 'ওদের মাংস তোমার, আর হাড়গুলো আমার।' তার মানে হল ওদের তুমি 'যত খুশি পেটাও, 'আমি কিচ্ছু বলতে আসব না।'

শেয়াল বলল, 'ঠিক দুমাসে আমি ওদের জ্ঞান-বিজ্ঞান যা আছে সব শিখিয়ে 'মানুষ', মানে 'ভালুক' করে দেব।'

ভালুক বাড়ি ফিরে গেল। গিয়ে দুটো ছেলেকে নিয়ে এসে শেয়ালের কাছে হাজির করল। শেয়াল খুশি হয়ে বলল, 'নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যাও, দেখবে দুমাসে ওরা কীরকম পণ্ডিত হয়ে ওঠে।'



ভালুক যেই চোখের আড়ালে গেছে, অমনি শেয়াল ভালুকছানাদুটোকে মেরে খেয়ে ফেলল, আর তাদের হাড়গোড় একটা বস্তায় পুরে তার মুখ বেঁধে রাখল।

দুমাস কেটে যাবার পরে ভালুক ফিরে এল, বলল, 'কই আমার পণ্ডিত ছেলেরা কোথায়?'

শেয়াল বলল, 'এখনও তাদের সব শেখা হয়নি। আরও ক-দিন পরে এসো।'

ভালুক মাথা নাড়তে নাড়তে ফিরে গেল।

আবার মাসদুয়েক পরে সে ফিরে এসেছে কী, শেয়াল হাড়ের বস্তাটা তার সামনে ছুড়ে দিল।

ভালুক বলল, 'এটা আবার কী?'

'কেন?' শেয়াল রেগে উঠে বলল, 'তুমিই তো বলেছিলে ওদের মাংসটা আমার আর হাড়গুলো তোমার! ওই নাও ওদের বস্তাবাঁধা হাড়গোড়!'

ভালুক রাগেদুঃখে লাফিয়ে খ্যাঁকশেয়ালকে ধরতে গেল, কিন্তু খ্যাঁকশেয়াল তখন একদৌড়ে পগারপার। ভালুক আর তাকে ধরতে পারল না।

ভালুক তার এই বোকামিতে কিছুদিন খুব লজ্জিত হয়ে রইল। তার বিষম ভয়, দুনিয়ার সবাই না তার বোকামির কথা জানতে পারে। তাহলে তার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

একদিন সে চুপিচুপি খেতের এক চাষিকে জিজ্ঞেস করল, 'চাষিভাই, তুমি কি জানো যে হতচ্ছাড়া খ্যাঁকশেয়ালটা আমার ছেলেদুটোকে খেয়ে ফেলেছে?'

চাষি বলল, 'হ্যাঁ, সে তো জানিই।'

ভালুক ভাবল, সর্বনাশ! একজন জেনেছে তো সারা দুনিয়ার লোক জানতে কতক্ষণ! তাই সে চাষিকে হাতজোড় করে বলল, 'ভাই, এ কথাটা তুমি কাউকে বোলো না, কেমন? আমি তোমাকে রোজ একটা করে ভেড়া এনে দেব।'

চাষির খুব মজা। রোজ ভালুক একটা করে ভেড়া এনে দিচ্ছে, ভেড়ার মাংস খেতে খেতে তাদের মুখে চড়া পড়ে গেল। শেষে একদিন চাষির বউ চাষিকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, রোজ রোজ এই ভেড়া তোমাকে কে দেয়, বলো তো!'

চাষি বলল, 'ওরে ব্বাবা! সেকথা আমি বলতে পারব না।'

তখন চাষির বউ রেগে গেল। বলল, 'তাহলে রইল তোমার ঘরসংসার, আমি বাপের বাড়ি চললুম।'

চাষি আর কী করে? বউকে বলতে হল কথাটা। আর বউকে বলা মানেই সারা গ্রামে জানাজানি হওয়া। গ্রামের লোক জানল ভালুকের বোকামির খবর, তাদের থেকে কাকপক্ষীরা জানল, কাকপক্ষীদের থেকে বনের পশুরা। ভালুকের কানে সেটা পৌঁছোতেই সে রাগে অন্ধ হয়ে চাষির কাছে ছুটে এল। চাষি দরজায় তালা লাগিয়ে রেখেছিল বলে সে বাড়িতে ঢুকতে পেল না, কিন্তু চাষিকে শাসিয়ে গেল, 'ঠিক আছে, তুমি একবার জমিতে চাষ করতে এসো, তখন তোমায় আমি দেখে নেব।'

ভয়ে চাষি কদিন ঘর থেকে বেরোল না। জমিতেও গেল না। কিন্তু এভাবে ক-দিন চলে। হাটবাজার নেই বলে ঘরে রান্নাবান্না বন্ধ হওয়ার জোগাড়। জমিতে চাষ না-দিলে পরে খাবে কী? আত্মীয়স্বজনেরা তাকে বকুনি দিতে শুরু করল।

শেষে একদিন যেতেই হল তাকে জমিতে। সেখানে সেই খ্যাঁকশেয়ালের সঙ্গে তার দেখা। সে জিজ্ঞেস করল, 'কদ্দিন জমিতে আসনি কেন চাষিভাই?'

চাষি তাকে ভালুকের সব কথা খুলে বলল। খ্যাঁকশেয়াল বলল, 'আমি যদি ভালুকটাকে মেরে ফেলতে পারি আমাকে তুমি কী দেবে?'

চাষি বলল, 'আমি তোমাকে দুজোড়া মোরগ আর মুরগি দেব।'

'ঠিক আছে,' শেয়াল খুশি হয়ে বলল, 'ভালুক যেদিন আসবে সেদিন আমি লক্ষ রাখব। ও এলে আমি আমার ল্যাজে একটা ঝাঁটা বেঁধে নিয়ে পাহাড়চুড়োর শুকনো মাটিতে ঝাঁট দিয়ে মেঘের মতো ধুলোর ঝড় তুলব।' ভালুক এসে জিজ্ঞেস করবে, 'অত ধুলো উড়ছে কেন হে?' তখন তুমি বলবে, 'ওখানে সব রাজার লোকজন রয়েছে। রাজার ছেলের ভীষণ অসুখ করেছে, আর হেকিম এসে বিধান দিয়েছে যে, ভালুকের মাংস খেলে সে রোগ সেরে যাবে।' ভালুক তখন ভয় পেয়ে যাবে। বলবে, 'ওরে ভাই, বলে দে আমি কোথায় লুকোব!' তখন তুমি এই বস্তাটার মুখ খুলে তার দিকে বাড়িয়ে বলবে যে, 'এসো ভাই, এই বস্তার ভেতরে লুকোও। সে বস্তায় ঢুকলেই তুমি বস্তার মুখে বাঁধন দেবে শক্ত করে।'

পরদিন শেয়াল কথামতো পাহাড়ের চুড়োয় গিয়ে ধুলোর মেঘ তৈরি করল। তা দেখে ভালুক দৌড়ে চাষির কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'ওই ধুলোর মেঘ কেন রে ভাই?' চাষি উত্তর দিল, 'আরে এও জানো না? ওখানে রাজার লোকজন রয়েছে। রাজার ছেলের ভয়ানক অসুখ করেছে, সে বুঝি আর বাঁচবে না। এদিকে হেকিম বলেছে, বাঁচতে পারে যদি একমাত্র ভালুকের মাংস তাকে খাওয়ানো যায়।'

এ কথা শুনে ভালুক ঘাবড়ে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এই সেরেছে, চাষিভাই, তুমি এক্ষুনি আমাকে লুকোও। আমি এখানে আছি জানতে পারলে আর আমার রক্ষে থাকবে না।'

চাষি তখন সেই বস্তাটা তার সামনে খুলে ধরে বলল, 'চটপট এটার মধ্যে ঢুকে পড়ো দিকি, তাহলে আর তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না। সবাই ভাববে বস্তাতে গম তোলা আছে।' ভালুক তৎক্ষণাৎ বস্তায় ঢুকে পড়ল, আর চাষিও ঝট করে তার মুখটা শক্ত করে বেঁধে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে খ্যাঁকশেয়াল আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, আর দুজনে মিলে বস্তার ওপরে লাঠির বাড়ি মারতে মারতে ভালুককে মেরে ফেলল।

পরেরদিন শেয়াল এসে চাষিকে বলল, 'এবার আমার দুজোড়া মোরগ আর মুরগি দাও।'

চাষি আগেরদিন টক-দই খেয়ে রেখেছিল, তাই তার পেট গরগর আওয়াজ শুরু করে দিল। খ্যাঁকশেয়াল ভয় পেয়ে বলল, 'ও কীসের আওয়াজ হে?'

চাষি বলল, 'আর বোলো না। আমার পেটের মধ্যে একটা বাঘের বাচ্চা ঢুকে বসে আছে।

সে বেরিয়ে এসে তোমাকে খেয়ে ফেলতে চাইছে। আমি অনেক কষ্টে তাকে আটকে রেখেছি।'

খ্যাঁকশেয়াল বলল, 'ভাই, আমি ভালুক মেরে তোমার উপকার করেছি, তুমি আমার এই উপকারটি করো। ওটাকে আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখো, যতক্ষণ না আমি দৌড়ে চোখের আড়ালে চলে যাই।'

ব্যস, এই বলে সে চোঁ চাঁ দৌড়। চাষি হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে গেল।

ছবি। শঙ্কর বসাক



ছন্দা বাগচী

সে অনেক অনেক কাল আগের কথা। একজন লোক ছিল, সে কেবল শুয়ে শুয়েই থাকত। অথচ সব সময় ভাবত 'কী করে আমি ধনী হব, যাতে কাজ না-করেও নিশ্চিন্তে বাঁচতে পারি।' অনেক ভেবেচিন্তে সে ঠিক করল, এক গুনিনের কাছে যাবে। সেই গুনিন সকলের সবরকম সমস্যার সমাধান করতে পারত। কিন্তু সেই গুনিন থাকে অনেক দূরে। কাজেই এর জন্য তাকে কষ্ট করে বিছানা থেকে উঠে রওনা দিতে হয় দূরের পথে।

তিন দিন তিন রাত চলার পর পথে দেখা হল এক কঙ্কালসার নেকড়ে বাঘের সঙ্গে। নেকড়ে ধুঁকতে ধুঁকতে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি গো ভালোমানুষ, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

কুঁড়েও ধুঁকতে ধুঁকতে উত্তর দিল, 'এই একটু গুনিনের কাছে যাচ্ছি, না-খেটে কী করে বড়োলোক হওয়া যায় পরামর্শ নিতে।'

নেকড়ে শুনে বলল, 'তাহলে আমাকে একটু সাহায্য কর ভাই, তিন বছর ভীষণ পেটের ব্যথায় ভুগছি। কিছু খেতে পারি না। কী করলে সারবে, গুনিনকে একটু জিজ্ঞেস কোরো ভাই।'

'ঠিক আছে।' বলে কুঁড়ে আবার চলতে লাগল। পথের মাঝে কিছু দূরে দেখল একটা বিবর্ণ আপেল গাছ।

—'কী ভাই, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' আপেল গাছ জিজ্ঞেস করল।

—'এই যাচ্ছি একটু গুনিনের কাছে পরামর্শের জন্য, কী করে না-খেটে সুখে থাকা যায়।' উত্তর করল কুঁড়ে!

আপেল গাছ শুকনো ডাল নেড়ে মিনতি করল, 'তাহলে আমার কথাটাও জিজ্ঞেস করবে, প্রতি বসন্তে আমার ডালপালা পাতায় কুঁড়িতে ভরে যায়। কিন্তু যেই ফুল ফোটে সব ফুল এক সঙ্গে ঝরে পড়ে। আমাকে কী করতে হবে, গুনিন যদি বলে শুনে এসো।'

কুঁড়ে বলল, 'আচ্ছা।' বলে আবার চলতে লাগল। পা আর চলে না, ক্লান্ত হয়ে কাছে একটা বড়ো জলাশয় দেখে বসে পড়ল। এমন সময় একটা মস্তবড়ো মাছ জল থেকে মাথা তুলে বলল, 'খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

কুঁড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'যাচ্ছি তো একটু গুনিনের কাছে বড়োলোক হওয়ার উপায় জানার জন্য, আর না-খেটে কীভাবে খাবার পাওয়া যায় তারই পরামর্শের জন্য। কিন্তু সে কী আমার কপালে আছে? আর পথের কষ্ট পারছি না সইতে।'

মাছ বলল, 'তাহলে ভাই আমারও একটু উপকার কর। সাত বছর গলায় কী একটা আটকে আছে। বড্ড ব্যথা করে। গুনিন যদি বলে দেয়, কীভাবে সেরে যাবে।'

কুঁড়ে বলল, 'ঠিক আছে! যদি পৌঁছোতে পারি, বলব।'

অবশেষে সে এক বনের ধারে এসে পৌঁছোল। দ্যাখে, বনের মধ্যে একটা গাছের তলায়



বসে লম্বা, সাদাদাড়ি এক বুড়ো। বুড়ো নিষ্কর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কীরে, কী চাই তোর?'

কুঁড়ে আহ্লাদে গদগদ হয়ে বলে, 'তুমিই বুঝি সেই গুনিন, যার পরামর্শ আমি চাইছি?'

গুনিন বলল, 'হ্যাঁ, চটপট বল কী চাই।'

কুঁড়ে তখন নিজের সব কথা বলল। নেকড়ে, আপেল গাছ আর মাছের কথাও বলল। সব শুনে গুনিন বলল, 'মাছের গলায় মহামূল্যবান একটা পাথর আটকে আছে। সেটা বের করে দিলে ভালো হয়ে যাবে। আপেল গাছের গোড়ার কাছে এক কলশ রুপো পোঁতা আছে। তা খুঁড়ে তুললেই আপেল গাছ আর শুকোবে না, ফল হবে। আর নেকড়েকে বলবি, যে-কুঁড়েকে প্রথম দেখবে, তাকে গিলে খেলেই পেটের ব্যথা সেরে যাবে।'

কুঁড়ে জিজ্ঞেস করে, 'আর আমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে?'

গুনিন মুচকি হেসে বলে, 'আমি তো সব কথা বলেই দিলাম। ফিরে যা।'

কুঁড়ে ভাবল, বাড়ি ফিরে গেলেই বোধ হয় সব হবে। তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালাল। প্রথমেই দেখা হল মাছের সঙ্গে, 'তোর গলায় মহামূল্যবান পাথর বিঁধে আছে। বার করে ফেললেই সেরে উঠবি।' বলল কুঁড়ে।

মাছ বলল, 'তা, তুমিই বের করে দাও না। তাতে আমারও উপকার হবে, আর তুমিও ধনী হবে।'

—'আরে বাপু, ওসব পারব না। খেটে লাভ কী, ধনদৌলত নিজেই আমার কাছে আসবে।' এই বলে চলতে আরম্ভ করল সে। পথে আপেল গাছকে বলতেই তার পাতা দুলে উঠল। সে কুঁড়েকে বলল, 'তা রুপোর কলশটা তুমি তুলে নাও না ভাই। তাতে তোমারই ভালো। সঙ্গে সঙ্গে রাজা হয়ে যাবে।'

—'না-না, আমি খাটতে চাই না। গুনিন বলেছে, আমি বাড়ি ফিরলেই এমনিতে সব পাব।' এই বলে কুঁড়ে আবার চলতে লাগল। এবার দেখা হল নেকড়ের সঙ্গে। অধীর হয়ে ছুটল সে কুঁড়ের কাছে। কুঁড়ে বলল, 'নে, গুনিন বলেছে, যে-কুঁড়েকে প্রথম দেখতে পাবি, তাকে গিলে খেলেই সঙ্গে সঙ্গে সেরে উঠবি।'

নেকড়ে কৃতজ্ঞ হয়ে বলল, 'পথে আর কী কী দেখলে, কুঁড়ে? কী করলে?'

কুঁড়ে আনন্দে জানাল, মাছ আর আপেল গাছের কথা, মহামূল্য পাথর আর রুপোর কলসির কথা। সে বলল আরও—'তাই বলে আমি মহামূল্যবান পাথর আর রুপোর কলশ বার করিনি। আমার কী দায়? কেনই-বা অত খাটব? আমি তো এমনিই বড়োলোক হতে পারব।'

সব শুনে নেকড়ে বলল, 'পৃথিবীতে তোর চেয়ে বোকা আর কুঁড়ে আর কেউ নেই। আমার তো দেখছি, কুঁড়ে না খুঁজলেই চলবে।' এই-না বলে নেকড়ে গপ করে কুঁড়েকে গিলে ফেলল।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



শেয়ালের বালিশ

সুধীন্দ্র সরকার

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছিল বিরাট একটা জঙ্গল। দিনের বেলাতে সেই জঙ্গালে আলো ঢুকতে পারত না। এত ঘন ছিল তার গাছগাছালি। আর রাতে চাঁদের আলোর তো ঢুকতেই মানা। তাই সবসময় আঁধার ঘিরে থাকত সেই জঙ্গালে। সেই অন্ধকারের রাজত্বের রাজা ছিল একটা ভাল্লুক। তার এক মন্ত্রী ছিল। সে হচ্ছে নেকড়ে। আর কুকুর ছিল সেনাপতি।

একদিন একদল লালঝুঁটি মোরগ ছুটতে ছুটতে এল রাজার কাছে। জঙ্গালে একটা দুষ্টু শেয়াল আছে, তার নামে নালিশ করতে। ওরা বললে, 'রাজামশাই! রাজামশাই! আমরা যে আর বাঁচিনে।'

ভাল্লুকরাজা জিজ্ঞেস করলে, 'কেন? কী হয়েছে তোদের?'

'কোঁকর কোঁকর কো! কোঁকর কোঁকর কোঁ!' বলে কাঁদতে কাঁদতে বনমোরগের দল একসঙ্গে বলে উঠল, 'দুষ্টু শেয়ালটা রোজ রাতে আমাদের এক-একজনকে মেরে খেয়ে ফেলছে।'

'অ্যাঁ! সে কী? আচ্ছা আমি দেখছি!' বলে ভাল্লুকরাজা চিৎকার করে করে ডাকতে লাগল, 'শেয়াল! অ্যাই দুষ্টু শেয়াল!'

দুষ্টু শেয়ালটা বোধ হয় কাছেপিঠে কোথাও লুকিয়ে ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিল সব কথা। ভাল্লুকের ডাক শুনে একলাফে সেখানে হাজির হল। ওর হাতে একটা ছোট্ট বালিশ। তারপর, রাজাভাল্লুক কিছু বলার আগেই বলতে শুরু করল, 'হুক্কা হুয়াই! হুক্কা হুয়াই পেন্নাম হই রাজামশাই। আপনার জন্যে একটা বালিশ এনেছি। রাতে মাথায় দিয়ে শুলে আপনার আরাম হবে। কাল সারারাত জেগে এটা তৈরি করেছি। এটা মাথার নীচে রাখলে আবার স্বপ্নও দেখবেন। আপনি কি এটা নেবেন?'

রাজাভাল্লুক ঘাড় নেড়ে বললে, 'কেন নেব না? নিশ্চয় নেব। ভালোবাসার দান কি ফেরাতে হয়!'



দুষ্টু শেয়াল ভাল্লুককে বালিশটা দিতে দিতে বললে, 'আমি আপনার আরামের জন্যে কত চিন্তা করি। কিন্তু, এই লালঝুঁটি মোরগগুলো কিছুতেই বোঝে না।'

বালিশটা ছিল তুলোর মতো নরম। পালকের মতো হালকা। ভাল্লুকরাজা বালিশটায় ঠেস দিয়ে বসে মেজাজে দেখতে লাগল বনের শোভা। আর শুনতে লাগল পাখপাখালির ডাক।

বনমোরগগুলো মিহিসুরে কঁক কঁক করতে করতে রাজাকে জিজ্ঞেস করল, 'রাজামশাই! আমাদের জন্যে কী করলেন?'

রাজাভাল্লুক রেগেমেগে চিৎকার করে উঠল, 'দূর হ! আমি কোথায় স্বপ্ন দেখার কথা ভাবছি, আর তোরা কি না ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে এসেছিস নালিশ করতে! ভাগ!'

লালঝুঁটি বনমোরগের দল কী আর করে? দৌড়ে পালায় সেখান থেকে।

দুষ্টু শেয়ালের তো পোয়াবারো। রাজামশাই হাতের মুঠোয় যখন, ওর আর ভয় কী! সেই রাতেই শেয়ালটা আবার মোরগছানা মেরে খেল। একটা নয়, দু-দুটো।

বনমোরগের দল এবার আর রাজার কাছে গেল না। গেল মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী হল গিয়ে নেকড়ে।

মন্ত্রী নেকড়ের কাছে বনমোরগের দল ফের নালিশ জানাল, 'কোঁকর কোঁ! কোঁকর কোঁ! আমাদের বাঁচান মন্ত্রীমশাই!'

'তোরা তো দিব্যি বেঁচে আছিস দেখছি।' মন্ত্রী নেকড়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল, 'কেমন দাঁড়িয়ে আছিস আমার সামনে।'

'আমাদের ছানাগুলোকে বাঁচান। বনমোরগের দল লালঝুঁটি নাড়াতে নাড়াতে বললে, 'দুষ্টু শেয়াল ফের আমাদের দুটো ছানাকে খেয়েছে।'

'ও! বুঝেছি!' বলে নেকড়ে তখনই তলব পাঠাল শেয়ালকে।

শেয়াল তো আগেভাগে সব জানত। সে এক দৌড়ে মন্ত্রীর সামনে এসে নাকিসুরে বললে, 'হুক্কা হুয়াই! হুক্কা হুয়াই! পেন্নাম হই মন্ত্রীমশাই।'

শেয়াল ছোট্ট একটা বালিশ সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, সেটা মন্ত্রীমশাইয়ের সামনে রেখে ফের বললে, 'আমি আপনার জন্যে একটা মজার বালিশ এনেছি। বালিশটা মাথায় দিলে এখনই আপনার ঘুম এসে যাবে।'

'সে কী রে? কই দেখি কী রকম মজার বালিশ।' নেকড়ে ধারালো দাঁত বের করল, 'খালি মাথায় শুয়ে শুয়ে মগজ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে।'

দুষ্টু শেয়ালটা নেকড়েমন্ত্রীর কাছে বালিশটা দিতে দিতে বলে, 'আমি আপনার আরামের জন্যে কত চিন্তা করি। কিন্তু, এই বনমোরগগুলো কিছুতেই বোঝে না।'

নেকড়ে তখন পালকের মতো হালকা বালিশে হেলান দিয়ে মোরগগুলোকে ধমকাল, 'দূর হ তোরা। শেয়াল যা ভালো বুঝেছে—করেছে।'

বনমোরগের দল ভয় পেয়ে ছিটকে গেল এদিক-সেদিক। শেয়ালেরও সাহস গেল বেড়ে। সেই রাতে সে তিনটে মোরগছানা দিয়ে রাতের খানা সারল। তাই বলে বনমোরগের দল কিন্তু বসে রইল না। তারা কুকুর-সেনাপতির কাছে কেঁদে-কেটে পড়ল। বলল তাদের দুঃখের কথা।

কুকুর রাগে গজগজ করতে করতে সেপাই পাঠাল দুষ্টু শেয়ালকে ধরে আনতে। কিন্তু, শেয়াল তার আগেই এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে সেই পুরোনো কথা, 'হুক্কা হুয়াই! হুক্কা হুয়াই! পেন্নাম হই সেনাপতিমশাই। আপনি সারারাত জেগে জঙ্গল পাহারা দেন। কত কষ্ট আপনার। তাই আপনার আরামের জন্যে একটা বালিশ এনেছি। বালিশটা মাথায় দিলে আপনার সারারাতের ক্লান্তি দূর হবে।'

দুষ্টু শেয়াল কুকুর-সেনাপতির কাছে বালিশটা এগিয়ে দিল।

কুকুর-সেনাপতি বালিশটা নাকের কাছে এনে দুবার শুঁকল। বুঝতে পারল শেয়ালের চালাকি। ছিঁড়ে ফেলল বালিশটা। একরাশ পালক বেরিয়ে হাওয়ায় উড়তে লাগল। দুষ্টু শেয়াল মোরগছানার মাংস খাওয়ার পর, তাদের পালক দিয়েই বালিশ তৈরি করে। আর, এইভাবে সে পালকের বালিশ উপহার দিয়ে রাজা আর মন্ত্রীর কাছে ভালো শেয়াল সেজেছে। রাগে দাঁতকড়মড়িয়ে উঠল সেনাপতির।

ভৌ ভৌ চিৎকার করে কুকুর-সেনাপতি অন্য সব কুকুরদের ডেকে বললে, 'এসো সবাই মিলে লোভী শেয়ালকে অকাজের উপযুক্ত পুরস্কার দি।'

দুষ্টু শেয়াল দৌড়ে পালাতে গেল। পারল না। কুকুরেরা সকলে মিলে শেয়ালকে ঘিরে ধরল। তারপর তাকে টুকরো টুকরো করে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল।

ভৌ ভৌ চিৎকারে কেঁপে উঠল জঙ্গল। আর লালঝুঁটি বনমোরগের দল বাঁচল হাঁফ ছেড়ে।

ছবি। সুব্রত মাজী



শিকারি রাজপুত্র ও শেয়াল

দি [illegible] ত মজুমদার

এক যে ছিল রাজা। রাজার একটি মাত্র ছেলে। রাজপুত্র একদিন বড়ো হল। তার বিয়ের বয়েস হল।

রাজা বললেন, এবার তোমার বিয়ে দেব।

ছেলে বলল, খুব ভালো কথা। কিন্তু বাবা, আমি পুবদেশের রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। যদি তার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও, তাহলে বিয়ে করব। অন্য কোনো মেয়েকে আমি বিয়ে করতে পারব না।

রাজা বললেন, না, তা হবে না। পুবের রাজা খুব গরিব। তার মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে চাইছ কেন? আমি বিশাল ধনী এক রাজার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চাই।

ছেলে বলল, আমি অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করব না। আমি ওকেই বিয়ে করব।

ভীষণ রেগে গেলেন রাজা, তুমি আমার ছেলে, আমি যা বলব তোমায় তা-ই শুনতে হবে।

না, না, আমি অন্য কথা শুনতে চাই না, —ছেলে একথা বলে রাজার সামনে থেকে চলে গেল। সে মনে মনে ভাবল, বাড়ি ছেড়ে চলে যাব অন্য কোথাও।

তিরধনুক, পোশাক-আশাক নিয়ে ঘোড়ায় চেপে রাজপুত্র সেই রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। দূর বনে পাহাড়ের নীচে সে এল, সেখানে দেখতে পেল সুন্দর একটা গুহা রয়েছে। ঘোড়াও তার মধ্যে থাকতে পারবে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মিষ্টি জলের সরু পাহাড়ি নদী। সেখানে থাকতে লাগল রাজপুত্র।

প্রতিদিন সে একটা করে হরিণ মারে। হরিণের কাছ থেকে কিছুটা মাংস কেটে নিয়ে বাকিটা গুহার বাইরে ফেলে দিত। একার জন্য সামান্য মাংসই সে রাখত।

শেয়াল যাচ্ছিল সন্ধ্যার অন্ধকারে। মাংসের গন্ধ পেয়ে সে থমকে দাঁড়াল, দেখল বিরাট হরিণ পড়ে রয়েছে। টাটকা মাংস পেয়ে সে মনের সুখে খেল। আচমকা মাংস পেয়ে সে খুব খুশি।

পরের দিনও শেয়াল প্রায় আস্ত একটা হরিণ পেল। মাংসের গন্ধে উঁচু পাহাড় থেকে নেমে এল এক ইগল, এল একটা বেড়াল, তারপরে একটা খরগোশ। তারা বন্ধু হয়ে গেল, সবাই মিলে হরিণের মাংস খেল।

খাওয়ার পরে শেয়াল বলল, আমরা নেকড়ে আর ভালুককেও ডেকে আনি। ওদের বোধ হয় খুব খিদে পেয়েছে। তারাও এসে মাংস খেয়ে পেট ভরাক। অনেক অনেক মাংস রয়েছে।

নেকড়ে এল, ভালুক এল। পেট পুরে মাংস খেল, হাড় চিবোল। সবাই খুশি।

শেয়ালের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে ভাবল, আমাদের মধ্যে থেকে একজনকে সর্দার করা হোক। নইলে একদিন ঠিক ঝগড়া বেধে যাবে, আর তারপরে রাগের মাথায় একজন অন্যজনকে ছিঁড়ে ফেলবে। টুকরো টুকরো হয়ে আমাদের দেহ পড়ে থাকবে। এমনই হয়ে থাকে।

সে বন্ধুদের ডেকে বলল, আমাদের মধ্যে থেকে একজনকে সর্দার করা হোক। আমাদের গোষ্ঠীপতি। আমাদের নেতা। সর্দার আমাদের যেভাবে মাংস ভাগ করে দেবে, আমরা তাই নেব। সে মাংস যদি এক টুকরোও হয় তবু তাতেই আমাদের খুশি থাকতে হবে। কেউ তাকে অমান্য করবে না। নইলে একদিন হয়তো আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করেই শেষ হয়ে যাব। তোমরা কি বল? আমার কথা ঠিক কি না বল।

সবাই একসঙ্গে বলল, খুব ভালো বুদ্ধি বের করেছ বন্ধু। এতে আমাদের সবার উপকার হবে।

শেয়ালের খুব ইচ্ছে সে-ই হবে দলের সর্দার কিন্তু নিজের নাম সে নিজে বলবে কেমন করে? তাই শেয়াল বলল, নেকড়ে তুমিই হও সর্দার।

নেকড়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, না, না, আমি সর্দারের উপযুক্ত নই। আমি হব না। মাংস ভাগ করতে গিয়ে হয়তো লোভের বশে আমি বেশি নিয়ে ফেলব, আর সবাই যাবে রেগে, আমায় দেবে তাড়িয়ে। ওসবের মধ্যে আমি নেই।

শেয়াল বেশ খুশি হয়ে বলল, তাহলে ভালুক, তুমিই হও আমাদের সর্দার। সেই ভালো।

ভালুক মোটা দেহ দুলিয়ে বলল, না, না, বন্ধু, আমি না।



তখন সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, বেশ তাহলে শেয়াল, তুমিই হও আমাদের সর্দার। আর কেউ নয়।

শেয়াল আর কথা না বাড়িয়ে বলল, বেশ, তোমরা যখন সবাই বলছ, তখন আমার আপত্তি নেই। কিন্তু মনে রাখবে, আমার কথামতো চলতে হবে। না বলা চলবে না।

সবাই তোমাকে মানব, সবাই মেনে চলব। —পশুরা বলল।

শেয়াল বলল, বেশ, তাহলে মন দিয়ে শোন। আচ্ছা, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, এই যে প্রচুর মাংস আমরা প্রতিদিন পাচ্ছি, এ কি এমনি এমনি আসছে? না, তা মোটেই নয়। ওই যে গুহায় সাহসী শিকারি থাকে, ওই আমাদের মাংস দেয়। তাই আমাদেরও প্রমাণ করতে হবে যে শিকারির প্রতি আমরাও কৃতজ্ঞ। আমরা কিছুতেই অকৃতজ্ঞ হব না।

আমাদের তাহলে কী করতে হবে?

বলছি, শোন। পুবদেশের মেয়েকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। সে হবে শিকারির বউ।

কেমন করে রাজকন্যাকে এখানে নিয়ে আসব?

শেয়াল বলল, বলছি। ভালুক, নেকড়ে আর ইগল তোমরা তিনজনে পুবদেশের রাজার প্রাসাদে যাবে। ভালুক আর নেকড়ে রাজার জমি চাষ করবে। খুব খেটেখুটে মন দিয়ে চাষ করবে। রাজা খুব খুশি হবেন আর বিস্মিত হয়ে ভাববেন, দেখেছ পশুরা পর্যন্ত আমায় ভয় পায় আর আমার সেবা করে। রাজা রানি ও রাজকন্যাকে ডেকে এই দৃশ্য দেখিয়ে বলবেন, দেখ, বুনো পশুও আমার হয়ে কাজ করছে। রাজকন্যা তাই দেখতে প্রাসাদের বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াবে,—আর ইগল তুমি ঠিক সেই সময়ে আকাশ থেকে তিরের বেগে বারান্দায় নেমে আসবে, ছোঁ মেরে তাকে তুলে নিয়ে আকাশে আবার উড়ে পড়বে। আর তারপরে রাজকন্যাকে আমাদের বন্ধুর গুহায় নিয়ে আসবে।

সর্দার শেয়ালের আদেশ পালন করতেই হবে। ইগল উড়ে গিয়ে পুবদেশের রাজার প্রাসাদের উপরে পাক খেতে লাগল। ভালুক আর নেকড়ে রাজার জমি চাষ করতে শুরু করল। রাজা বাইরে বেরিয়ে এলেন, বাইরে এলেন রানি ও রাজকন্যা। পাথর যেমন করে গড়িয়ে পড়ে ইগল তেমনিভাবে নেমে এল, রাজকন্যাকে ছোঁ মেরে আকাশে উড়ে গেল। সব পশু মিলে রাজকন্যাকে শিকারির গুহায় সামনে রেখে এল।

গুহার বাইরে এসে রাজকন্যাকে দেখে শিকারি অবাক হয়ে গেল। সে শিকার করে সবে ফিরেছে। তাকে দেখে বলল, তুমি কে?

আমি পুবদেশের রাজার মেয়ে।

বিস্ময়ে শিকারি বলল, কী সৌভাগ্য আমার! তোমার জন্যই বাড়ি ছেড়ে, সব সুখ ছেড়ে এই গুহায় রয়েছি। তোমার পথ চেয়ে বসে রয়েছি। কিন্তু এখানে তোমাকে কে নিয়ে এল?

সুন্দরী রাজকন্যা সব কথা খুলে বলল। যা যা ঘটেছে সব বলল।

আরও অবাক হল রাজপুত্র। বলল, তুমি বলছ, এই পশুরা তোমায় এখানে নিয়ে এসেছে? আশ্চর্য তো!

সেদিন থেকে শিকারি পশুদের আরও বেশি করে মাংস দিতে লাগল।

শেয়াল আবার পশুদের ডেকে বলল, রাজপুত্র-রাজকন্যা হল মানুষ। তারা কি খালি মাটির উপরে শুয়ে থাকতে পারে?

আমরা তাহলে কী করব? পশুরা জিজ্ঞেস করল।

শেয়াল বলল, বলছি শোন, অল্প দূরেই রয়েছে এক গঞ্জ এলাকা, বাজার রয়েছে সেখানে। নেকড়ে, তুমি বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়বে। লোকজন দোকান ছেড়ে তোমার পেছনে ধাওয়া করবে। ভালুক, তুমি সেই ফাঁকে দোকানে ঢুকে পড়বে। আর একটা ভালো সুন্দর তোশক তুলে নিয়ে এখানে চলে আসবে।

নেকড়ে বলল, ওরে বাবা, ওরা আমায় ঠিক ধরে ফেলবে। কুকুর দেখলে আমার প্রাণ উবে যায়।

শেয়াল চিৎকার করে বলল, একথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না? কুকুরকে ভয় পাও? তুমি ভুলে গেলে, তুমি কত জোরে ছুটতে পার? যখন খিদে পায় তোমার গতি আরও কত

বেড়ে যায়। সামান্য কুকুরকে ভয়? তুমি একথা বললে কী করে?.

নেকড়ে লজ্জা পেয়ে বলল, ঠিক আছে, আমি যাব। এ কাজটা আমাদের করতেই হবে।

নেকড়ে ভালুক গঞ্জের দিকে রওনা দিল। বাজারে ঢুকেই নেকড়ে প্রাণপণে দৌড় দিল। লোকজন দোকান থেকে বেরিয়ে তাকে তাড়া করল। একটা সাজানো দোকান দেখে ভালুক তাতে ঢুকে পড়ল। পিঠে তুলে নিল নকশা-কাটা মস্তবড়ো একটা তোশক। দৌড় দিল বনের পথে। লোকজন ভালুককেও দেখতে পেল। কেউ কেউ নেকড়েকে ছেড়ে তার দিকেও ধেয়ে এল। কিন্তু তারা দুজনের একজনকেও ধরতে পারল না।

পশুরা গুহায় গিয়ে সুন্দর করে সেই তোশক মাটিতে বিছিয়ে দিল। ওরা ভালোভাবে থাকুক।

এদিকে হয়েছে কী, পুবদেশের রাজা ঘোষণা করেছেন, যে আমার মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, আমি তার দেহের ওজনের সমান সোনা দেব।

এক ছিল বুড়ি ডাইনি। লাঠিতে ভর দিয়ে সে গেল পুবদেশের রাজার প্রাসাদে। বলল, আমি তোমার মেয়েকে খুঁজেপেতে এনে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব।

রাজা বললেন, বেশ, খুব ভালো কথা। এই রইল সোনা। এখন আমি তোমাকে অর্ধেক সোনা দিচ্ছি। মেয়ে নিয়ে আসার পরে বাকি অর্ধেকটা দেব।

ডাইনি বলল, বেশ, খুব খুশি হলাম। এখন আমাকে একটা পিপে দাও। আর কিছু চাই না।

রাজার লোকেরা তাকে একটা পিপে দিল। পিপের মধ্যে উঠে চলে গেল ডাইনি। বন থেকে তুলে নিল একটা সাপ, চাবুকের মতো তাকে আঘাত করল পিপেতে, পিপে হাওয়ার বেগে চলল। গুহা থেকে অল্প দূরে পিপে থামিয়ে সাপটাকে পিপের মধ্যে ঢুকিয়ে ছড়ি হাতে ডাইনি হেঁটে চলল।

রাজপুত্র চলেছে শিকারে। বুড়িকে কুঁজো হয়ে কষ্ট করে হাঁটতে দেখে তার খুব দয়া হল। বলল, বুড়িমা, তুমি কে? কোথায় চলেছ একা একা?

বুড়ি বলল, তোমার ভালো হোক ছেলে। আমি গাঁয়ের লোকের সঙ্গে নদীতে নাইতে এসেছিলাম। ওরা এগিয়ে গিয়েছে। আমি বুড়ি, তাই পিছিয়ে পড়েছি। পথ চিনি না, কেমন করে যে গাঁয়ে ফিরব? বড়ো ক্লান্ত আমি।

কিছু ভেবো না বুড়িমা, আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে গাঁয়ে পৌঁছে দেব।

ছেলে, তুমি থাক কোথায়?

আমি থাকি ওই পাহাড়ি গুহায়। এখান থেকে খুব কাছে।

বুড়ির চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, সুখে থাকো বাবা, বুড়ি মানুষকে দয়া দেখিয়েছ, চিরকাল বেঁচে থাকো।

রাজপুত্র বুড়িকে ঘোড়ায় তুলে নিল। কিন্তু ঘোড়া নড়েও না চড়েও না, —ঘোড়া শত্রুর গন্ধ পেয়েছে। রাজপুত্র চাবুক মারতে লাগল, ঘোড়ার চামড়া ফেটে রক্ত ঝরছে, তবু ঘোড়া

নড়ে না। শেষকালে ঘোড়া আস্তে আস্তে গুহার দিকে চলল।

বুড়িকে নিয়ে গুহার সামনে আসতেই রাজকন্যা রাগে ফেটে পড়ল, এই খুনখুনে বুড়িকে কেন তুমি ঘরে নিয়ে এলে?

রাজপুত্র বলল, রাগ করো না বউ, আজ রাতের মতো ওকে ঠাঁই দাও, কালকে যা হোক ব্যকথা করব।

সে রাতে বুড়ি গুহায় থাকল। পরের দিন সকালে বুড়ি গরম জল করে আদর করে রাজকন্যাকে চান করিয়ে দিল, টুকিটাকি কাজে তাকে সাহায্য করল।

রাজকন্যা খুব খুশি হল। বলল, ওগো, বুড়িকে আমাদের কাছেই রেখে দাও। বড়ো ভালো, মায়ের মতো।

শিকারি হেসে বলল, কেমন! বউ, কাল তাকে দেখে রেগে গিয়েছিলে, আর আজ তাকে পেয়ে কত খুশি তুমি।

বুড়ি রয়ে গেল গুহায়। অনেক কাজ করে সে। আদরযত্ন করে রাজকন্যার।

একদিন শিকারি গভীর বনে শিকার করতে গিয়েছে। অনেক দূরের পথ। ইগল ভালুক নেকড়ে বেড়াল খরগোশ বনের এধারে-ওধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিশ্চিন্ত তারা, কোনো ভয়ডর নেই। গুহায় রয়েছে বুড়ি আর রাজকন্যা।

বুড়ি বলল চল, একটু বেড়িয়ে আসি। সারাদিন গুহায় থাকতে কি আর ভালো লাগে?

হাঁটতে হাঁটতে তারা সেই পিপের কাছে এল। পিপে দেখে বউ বলল, বুড়িমা, এখানে পিপে পড়ে আছে কেন?

মেয়ে, তা আমি জানব কেমন করে? চল, সামনে গিয়ে দেখি, কী আছে ওর মধ্যে।

পিপের মধ্যে উঁকি দিয়ে বউ দেখতে পেল, কী যেন রয়েছে ওর মধ্যে। ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না।

বুড়ি বলল, মেয়ে, আমার কোমরে বড্ড ব্যথা, নিচু হতে পারি না। তুমি ভালো করে দেখ তো, কী রয়েছে ওর মধ্যে।

বউ উবু হয়ে মাথা ঢুকিয়ে দেখতে লাগল। এক হাত পিপের পাশে ধরে রেখে মাথা গলিয়ে দিল বউ। ঠিক তখনি মেয়ের কোমরে ধাক্কা দিয়ে বুড়ি তাকে পিপের মধ্যে ফেলে দিল। তারপর পিপের উপরে বসে কী বলল আর পিপে উড়ে চলল আকাশে। অল্পক্ষণ পরেই পিপে এসে পৌঁছোল পুবের রাজার প্রাসাদে।

রাজকন্যা বাবাকে সব খুলে বলল। সে কোথায় ছিল, কার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, গুহায় কেমন করে দিনরাত কাটিয়েছে, কীভাবে পিপেতে করে আবার ফিরে এসেছে বাবা-মায়ের কাছে।

গুহায় ফিরে এসেছে পশুরা।

শেয়াল বলল, আমাদের রাজকন্যা কোথায়? সে তো গুহায় নেই।

বেড়াল বলল, তাই তো দেখছি। কোথায় গেল আমাদের আদরের রাজকন্যা?

অনেকক্ষণ চিন্তা করে শেয়াল বলল, আমার মনে হচ্ছে, ওই বুড়ি আমাদের রাজকন্যাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে ওর বাবার কাছে। বুড়িও নেই, রাজকন্যা তাহলে যাবে কোথায়?

শেয়াল ভীষণ রেগে গেল। ভালুক নেকড়ে আর ইগলকে বকাবকি করতে লাগল। তারা সবাই মিলে কেন বনে বেড়াতে গেল? রাজকন্যাকে একা ফেলে এভাবে কখনও যেতে আছে! বুদ্ধিসুদ্ধি কি সব লোপ পেয়ে গিয়েছে? এখন কী হবে? শিকারি ফিরলে কী জবাব দেব?

অনেক ভেবে ভেবে শেয়াল বেড়ালকে বলল, বন্ধু, তুমি পুবদেশের রাজার প্রাসাদে যাবে। রাজকন্যার খোঁজ করে তার ঘরে ঢুকবে। রাজকন্যা তোমায় দেখে বলবে, পুশি, তুমি কেমন করে আমার কাছে এলে? তোমার প্রভু শিকারি রাজপুত্র কেমন আছে? তারপরে তুমি চলে আসবে এই বনে, আমাদের খবর দেবে। মনে রাখবে, তুমি লক্ষ রাখবে রাজকন্যা তোমায় দেখে খুব খুশি হয়েছে না হয়নি। এটা জেনেই তুমি চলে আসবে।

বেড়াল লেজ তুলে দৌড় দিল। অল্পক্ষণ পরেই বেড়াল পৌঁছে গেল পুবের দেশের রাজার প্রাসাদে।

বেড়ালকে দেখতে পেয়েই রাজকন্যা তাকে চিনতে পারল, আরে, আমাদের সেই বেড়াল! আদরের পুশি, তুমি পথ চিনে এলে কেমন করে? দাঁড়াও, তোমায় আগে কিছু খেতে দি। মাংস খাবে তো?

মেয়ে গেল মাংস আনতে। বেড়াল বেজায় খুশি হল, রাজকন্যা তাকে চিনতে পেরেছে, দেখে খুশি হয়েছে। সে আর অপেক্ষা করল না, দৌড় দিল বনের পথে। বনে এসে যা যা ঘটেছিল সব বলল শেয়ালকে।

শেয়াল ইগলকে ডেকে বলল, এবারের কাজ তোমায় করতে হবে। তুমি উড়ে যাবে প্রাসাদের উপরে, ঘুরতে থাকবে, নজর রাখবে কখন রাজকন্যা প্রাসাদের বাইরের বারান্দায় আসে। সে তোমাকে চিনতে পারবে, বিশ্বাসও করবে। তাকে পিঠে বসিয়ে উড়ে আসবে এখানে।

ইগল প্রাসাদের উপরে উড়তে লাগল। বাইরের বারান্দায় এসে রাজকন্যা তাকে দেখতে পেয়েই চিনতে পারল। ইগল নীচে নেমে এল, পিঠে তুলে নিল রাজকন্যাকে। উড়ে এসে পাহাড়ি গুহার সামনে নামিয়ে দিল রাজকন্যাকে। রাজপুত্র বউকে দেখে খুব খুশি হল। আবার সে রাজকন্যাকে ফিরে পেয়েছে।

কিন্তু শেয়াল বলল, শোন বন্ধুরা, এতেই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। আমাদের সব সময় নজর রাখতে হবে। অঘটন ঘটে যেতে পারে। নেকড়ে, তুমি বনের ওইপাশে থাকবে। আর ভালুক, তুমি এই দিকে থাকবে। খরগোশ, তুমি ফাঁকা মাঠে ঘুরবে। আর ইগল তুমি আকাশে চক্কর দেবে, দেখবে দূর থেকে শত্রুরা আসে কি না। ওরা আমাদের সহজে ছেড়ে দেবে না।

শেয়ালের কথাই ঠিক হল। পুবদেশের রাজা তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে জামাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চললেন। মেয়ের মুখে রাজা শুনেছিলেন তারা কোথায় থাকে। গুহা থেকে বেশ কিছুটা দূরে এসে রাজা তাঁবু ফেললেন। রাজার জন্য একটা কালো তাঁবু খাটানো হল।

এঁদের দেখতে পেয়েই নেকড়ে প্রাণপণে ছুটে এসে ভালুককে খবর দিল, ভালুক, পুবদেশের রাজা মেয়েকে নিয়ে যেতে এসেছে। তাড়াতাড়ি শেয়ালকে খবর দাও।

ভালুক ঘোঁতঘোঁত করতে করতে ছুটল। শেয়ালের কাছে এসে বলল, পুবদেশের রাজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে চলে এসেছে।

তখন নেকড়ে, ভালুক, ইগল, খরগোশ, বেড়াল ও শেয়াল একসঙ্গে বসে পরামর্শ করল। সন্ধ্যা নেমে এল একটু পরেই। এই পশুপাখিরা ছিল তাদের নিজের নিজের গোষ্ঠীর দলপতি। তারা রাজা।

শেয়াল বলল, ভালুক, তোমার কাছ থেকে আমি এক লক্ষ ভালুক চাই। নেকড়ে, ইগল, খরগোশ আর বেড়াল, তোমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেও আমি এক লক্ষ করে পশুপাখি চাই। মাঝরাতের মধ্যে সব খবরাখবর আমায় দেবে। পশুপাখি জোগাড় করবে তাড়াতাড়ি। সময় বেশি নেই।

নেকড়ে বনের গভীরে ছুটে গেল। ডাকল তার জাতভাইদের। সে দ্বিগুণ নেকড়ে জোগাড় করে আনল। এমনিভাবে সবাই অনেক বেশি বেশি পশুপাখি সঙ্গে নিয়ে গুহার সামনে চলে এল। মাঝরাত হতে তখনও দেরি।

একটা মোটা গাছের গুঁড়িতে বসে শেয়াল বলল, তোমরা যারা এখানে এসেছ, সবাই একসঙ্গে লড়াই করবে। কিন্তু কেউ ভুলেও মানুষের মাংস খাবে না। লড়াইতে যেসব ঘোড়া মারা পড়বে, শুধু তাদের মাংস খাবে। আর মনে রাখবে, আমি যে তাঁবুটার সামনে পাহারা দেব, সেটা আক্রমণ করবে না।

সারে সারে পশু, মাথার উপর দিয়ে ইগলরা চলল। ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজার সৈন্যদের উপর। সকাল হওয়ার আগেই রাজার সব সৈন্য মরে গেল। তাদের সামনে ওরা দাঁড়াতেই পারল না। পশুরা শুধু ঘোড়ার মাংস খেল। আর শেয়াল রাজার কালো তাঁবু পাহারা দিতে লাগল।

শেয়াল সকালবেলা রাজাকে বলল, সব শেষ। আপনিও কি যুদ্ধ করতে চান? আর কেউ নেই কিন্তু।

রাজা সব বুঝলেন। বললেন, আমি একবার শুধু আমার জামাইকে দেখতে চাই, তারপর তোমার ইচ্ছে হলে আমাকে মেরে ফেলতে পারো।

শেয়াল রাজাকে গুহায় নিয়ে এল। রাজা জামাইকে বললেন, আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। আর নয়। এবার তোমরা প্রাসাদে চল। আমার মেয়ে-জামাই হয়ে তোমরা কেন বনের মধ্যে পাহাড়ি গুহায় জীবন কাটাবে?

রাজপুত্র বলল, আগে আমাদের নেতা শেয়ালকে জিজ্ঞাস করি, তারপরে বলব।

শেয়াল মত দিল। হ্যাঁ, এখন তারা প্রাসাদে যেতে পারে।

রাজা, জামাই, মেয়ে আগে আগে চলেছে। পেছনে শেয়াল, নেকড়ে, ভালুক, ইগল, খরগোশ আর বেড়াল। সবাই প্রাসাদে থাকতে লাগল। প্রত্যেক দিন শেয়ালকে খেতে দেওয়া

হত একটা মুরগি, নেকড়েকে একটা ভেড়া, ভালুককে একটা ষাঁড়, ঈগলকে একটা হাঁস, খরগোশকে এক ঝুড়ি কচি ঘাস আর বেড়ালকে এক বাটি দুধ।

প্রাসাদে মহা আনন্দে এমনি করে দু-সপ্তাহ কেটে গেল। রাজা কিন্তু ফন্দি এঁটেছেন, সুযোগ পেলেই জামাইকে মেরে ফেলবেন। শেয়াল কেমন করে যেন আঁচ পেল।

একদিন ঘুমের ভান করে অনেকক্ষণ পড়ে রইল। তারপর জেগে উঠে বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার দাদু ঠাকুমা আমার সামনে এসে বলছে, তারা খুব রাগ করেছে। কেন-না, স্বর্গে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করিনি। আমি স্বর্গে যাব, সেখানে গিয়ে দেখে আসব তারা কেমন আছে।

রাজা আর অন্যান্য মন্ত্রী জিজ্ঞেস করল, তুমি বেঁচে থেকে স্বর্গে যাবে কেমন করে?

শেয়াল গম্ভীর হয়ে বলল, বলছি। তোমরা দুই গোরুর গাড়ি বোঝাই শুকনো কাঠ আনবে। ওই জমির উপরে তাই দিয়ে চিতা সাজাবে। আমি চিতার মধ্যে নেমে পড়ব। আর তোমরা চিতায় আগুন ধরিয়ে দেবে। আগুনের শিখা উপরে উঠবে, ধোঁয়া আকাশের পথে উঠবে আর আমিও ধোঁয়ার সঙ্গে স্বর্গে পৌঁছে যাব।

শেয়ালের কথামতো তারা মস্ত চিতা সাজিয়ে দিল। শেয়াল কাঠ বেয়ে উপরে উঠে মাঝখানের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নীচে নেমে গেল। আর কেউ শেয়ালকে দেখতে পেল না। রাজার লোকেরা যখন আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত, শেয়াল সেই ফাঁকে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। নাকটা বের করে দেহের উপরে মাটি ঢেকে দিল।

আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠতে লাগল। রাজা ও তার লোকজন ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে রইল, তারা দেখতে চায় শেয়াল কেমন করে স্বর্গে যায়। কিন্তু তারা কিছুই দেখতে পেল না। এত ঘন ধোঁয়ার মধ্যে কি কিছু দেখা যায়!

অনেকক্ষণ কেটে গেল। আগুন নিভে এল। শেয়াল ছাইগাদা থেকে বেরিয়ে গা ঝেড়ে রাজার সামনে গিয়ে প্রণাম করে বলল, রাজা, আপনার দাদু-ঠাকুমা ভীষণ রেগে আছেন। আপনি তাদের সঙ্গে তাদের মৃত্যুর পর একবারও দেখা করেননি। খুব অন্যায় করেছেন। তারা আমাকে বললেন।

রাজা মন্ত্রীদের বললেন, ঠিক কথা! শেয়াল যদি তার দাদু-ঠাকুমাকে দেখে স্বর্গ থেকে ফিরে আসতে পারে, তাহলে আমারও যাওয়া দরকার। বুড়ো-বুড়ি কেমন আছে একবার দেখে আসি। ওরা তো একা একাই রয়েছে!

দুই গোরুর গাড়ি বোঝাই শুকনো কাঠ আনা হল। মাটির উপরে চিতা সাজানো হল। রাজা চিতার মাঝখানে নামলেন। অন্য মন্ত্রীরাও রাজার সঙ্গে চিতার মধ্যে ঢুকল। তারাও স্বর্গে গিয়ে দাদু-ঠাকুমাদের একবার দেখে আসতে চায়। রাজা যখন যাচ্ছেন তখন আর ভয়ের কী আছে?

আগুন জ্বলে উঠল। দাউ দাউ আগুন। সেই বিশাল কাঠের বোঝার নীচে রাজা ও অন্যেরা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

মুচকি হেসে শেয়াল বলল, শিকারি রাজপুত্র, তুমি পুবদেশের রাজ সিংহাসনে বসো। এখন

থেকে তুমিই পুবদেশের রাজা। খুব মন দিয়ে রাজ্য শাসন কর। নিষ্ঠুর হবে না, সবাইকে ভালোবাসবে। তুমি হবে দয়ালু রাজা।

শিকারি রাজপুত্র সিংহাসনে বসল, পাশে সেই আদরের বউ। আর সেদিন থেকে সুখের রাজ্য গড়ে উঠল, পুবদেশে আনন্দ বয়ে গেল।

রাজার কাছে রয়ে গেল শেয়াল, নেকড়ে, ভালুক, ইগল, খরগোশ আর বেড়াল। কোনো অভাব আর রইল না তাদের।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



শয়তান, চাষির ছেলে আর রাজকন্যা

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সবকিছুই ঘটেছিল; যদিও যা যা ঘটেছিল তাদের একটি বর্ণও সত্যি নয়। অনেক বছর আগে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল এক কন্যা। রাজা সেই কন্যাকে রেখে দিয়েছিলেন অনেক উঁচু এক প্রাসাদে। সেখানে মেয়েকে দেখতে যেতেন রোজ। ওজন-দাঁড়িতে ওজন করতেন মেয়েকে। জানতে চাইতেন মেয়ের ওজন বাড়ছে না কমছে।

প্রাসাদের কাছাকাছি থাকত এক চাষি। তার ছিল একটাই মাত্র ছেলে।

চাষি মারা গেল। একেবারে পিতৃহীন হয়ে গেল ছেলেটা। কিছুদিন বাদে সে তার মাকেও হারাল।

ছেলেটা কিন্তু বাড়তে লাগল। অনেকেই বাড়ে বছরে বছরে। এই ছেলের বাড় যেন দিনে-দিনে।

প্রাসাদ থেকে রাজকন্যা প্রতিদিন তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে আর ছেলেটাকে দেখতে পায়। এভাবে দেখতে দেখতে কবে যেন সে চাষির ছেলেকে ভালোবেসে ফেলল। কিন্তু মুখ ফুটে সে কাউকে কিছু বলতে পারে না; তার ভয় তার বাবাকে, যিনি স্বয়ং রাজামশাই।

যাইহোক, শেষমেশ অনেক সাহস করে একদিন সে একটা চিঠি লিখে ছুঁড়ে দিলে চাষির ছেলের দিকে।

ছেলেটা কিছুক্ষণ ভাবল, একটা লম্বা দড়ি জোগাড় করল, সেই দড়ির শেষদিকটা বাঁধল একটা পাথরের সঙ্গে; তারপর প্রাসাদের জানলা দিয়ে সেটা গলিয়ে দিলে। রাজকন্যা দড়িটাকে ধরে নিল। তারপর একটা টেবিলের পায়ার সঙ্গে বেঁধে ফেলল দড়িটাকে। চাষির ছেলে সেই দড়ি বেয়ে উঠে এল ঘরে। তারপর থেকে তারা দুজনে বাস করতে লাগল প্রাসাদে। রাজা এলেই ছেলেটা লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু রাজামশাই তো নিজের মেয়েকে প্রতিদিন ওজন করেন। তো তিনি দেখলেন যে তাঁর মেয়ে গায়েগতরে বেশ বাড়ছে!

রাজকন্যা বুঝে গেল যে তার বাবা তাকে সন্দেহ করছে। সে তখন চাষির ছেলেকে বলল; "আমাদের পালিয়ে যেতে হবে।"

সেই একই দড়ি বেয়ে তারা প্রাসাদের বাইরে এল। তারপর চাষির ছেলে তার বউকে তুলল নিজের ছোট্ট আর নোংরা কুঁড়েঘরে।

রাজাকে জানানো হল যে, তাঁর মেয়ে প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

মেয়ের খোঁজে রাজামশাই চতুর্দিকে খবর পাঠালেন। রাজার ভৃত্যেরা জানতে পারল যে, রাজকন্যা চাষির ছেলের কুঁড়েঘরে বাস করছে। রাজা সাতজন অমাত্যকে পাঠালেন নিজের মেয়ে এবং ছেলেটিকে ধরে এনে তাঁর সামনে হাজির করতে।

অমাত্যরা সদলবলে গেল। চাষির ছেলে তখন বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে কাপড় কাচছিল। তাকে দেখতে পেয়েই অমাত্যরা দৌড়ে গেল তাকে ধরার জন্যে। চাষির ছেলে ঝাঁ করে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল, পরক্ষণেই নিজের তরোয়ালটা নিয়ে বেরিয়ে এল এবং একজন বাদে বাকি ছ-জনকে কচুকাটা করে ফেলল।

যে লোকটা বেঁচেছিল তাকে সে বলল, "যাও তোমার রাজাকে গিয়ে বলো আর যেন কাউকে না পাঠায়। রাজকন্যা এখন আমার স্ত্রী। আমার সঙ্গেই এখন সে থাকবে।"

রাজা তো রেগে কাঁই! এবার তিনি বারোজন কোটালকে পাঠালেন চাষির ছেলেকে বেঁধে আনতে।

তারা সবাই মিলে এসে ছেলেটাকে বন্দি করতে চাইল কিন্তু আদৌ সুবিধে করতে পারল না। সে তার তরোয়াল বের করে এগারোজনেরই গলা কেটে ফেলল। দ্বাদশ ব্যক্তিটিকে মারল না। তাকে বলল, "যাও—রাজাকে বলো আর যেন কাউকে না পাঠায়।"

এবার অবশ্য রাজকন্যা তার স্বামীকে বলল, "এখান থেকে আমাদের চলে যাওয়াই ভালো। আমার বাবা আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবেন না।" চাষির ছেলে একমত হল। তারা তাদের সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল এবং নতুন বাসার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল।

চাষির ছেলে হাতে নিল তির-ধনুক। তারপর বলল যে, তার ছোঁড়া তির যেখানে গিয়ে পড়বে, সেখানেই তারা বাসা বাঁধবে।

নয়টি উঁচু পাহাড় পেরিয়ে তিরটি গিয়ে পড়ল এক বাড়ির উঠোনে; সেই বাড়িতে থাকে নয়জন শয়তান লোক, তারা পরস্পর পরস্পরের ভাই।

শয়তানরা দেখল তাদের বাড়ির উঠোনে একটা তির এসে পড়েছে; তারা ছুটে গেল তিরটাকে তুলতে কিন্তু কিছুতেই সেটা মাটি থেকে তুলতে পারল না।

চাষির ছেলে বউকে নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছোল এবং কালবিলম্ব না-করে তিরটা মাটি থেকে টেনে তুলল। নয়জন শয়তানকে তো আর শয়তানের মতো দেখতে নয়, দিব্যি মানুষের মতো দেখতে। তাদের দিকে তাকিয়ে চাষির ছেলে নমস্কার জানাল। শয়তানেরা সত্যিই অবাক। যে তির তারা নয়জন মিলে মাটি থেকে টেনে বের করতে পারল না, সেই তির এই ছেলেটি বাঁ-হাতে পরম অবহেলায় তুলে নিয়ে এল!

শয়তানরা ঠিক করল যে, পরীক্ষা করে দেখবে ছেলেটার গায়ে সত্যিই এত বল আছে কি না।

শয়তানদের ছিল একটা বিশাল কড়াই যাতে তারা রান্না করত। সেই কড়াই এত ভারী যে, তারা ন-জনে মিলে ধরাধরি করে উনুনে বসাত। শয়তানরা চাষির ছেলেকে বলল, "উনুন থেকে কড়াইটা নামাও তো দেখি।"

প্রায় চোখের নিমেষে ছেলেটা দু-হাত দিয়ে কড়াইটা ধরল এবং উনুন থেকে একাই সেটাকে নামিয়ে আনল।

শয়তানদের বুঝতে বাকি রইল না যে, ছেলেটা প্রকৃতই বলশালী এবং যদি ওর সঙ্গে ওরা



লাগতে যায় তাহলে আদৌ পেরে উঠবে না। সুতরাং তারা ঠিক করল ওর সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে।

কিন্তু শয়তানরা তাদের বদমেজাজ আর কুচক্রী স্বভাব কতদিন চাপা দিয়ে রাখবে? একদিন সামান্য ব্যাপারে চাষির ছেলের সঙ্গে ওদের ঝগড়া বেধে গেল, তারপর শুরু হল মারামারি। চাষির ছেলে একাই আটজন শয়তানকে মেরে শেষ করে দিল। শুধু নবম শয়তান, যে ছিল খোঁড়া, একটা গভীর গর্তের মধ্যে লুকিয়ে কোনওরকমে নিজের প্রাণ বাঁচাল।

শয়তানদের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হল রাজকন্যা আর তার স্বামী।

তারা দু-জনে মিলেমিশে, সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল।

কিছুদিন বাদে চাষির ছেলের শিকারে যাবার শখ হল। সে বউকে বলল, "ফিরে এসে আমি তিনবার দরজায় কড়া নাড়ব। তবে দরজা খুলবে। এ ছাড়া আর কাউকে দরজা খুলে দিয়ো না যেন।"

কিন্তু সেই খোঁড়া শয়তান আড়াল থেকে চাষির ছেলের সব কথা শুনল।

চাষির ছেলে শিকার করতে বেরিয়ে গেল আর সেই ফাঁকে খোঁড়া শয়তান গর্ত থেকে বেরিয়ে এল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজার কাছে এল, তারপর সে যেমন শুনেছিল তিনবার কড়া নাড়ল।

রাজকন্যা কিন্তু বুঝে গেল, দরজায় যে কড়া নাড়ছে সে তার স্বামী হতেই পারে না। সুতরাং সে দরজা খুলল না। শয়তান খুব অনুনয়-বিনয় করতে লাগল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি। যদি তুমি দরজা না-খোল অন্তত দরজার ফাঁক দিয়ে তোমার কড়ে-আঙুলটা বাড়িয়ে দাও। আমি একবার আঙুলে চুমু খাব। আর তারপরই চলে যাব।"

এত অনুনয়-বিনয় রাজকন্যার মন গলে গেল। সে দরজার ফাঁক দিয়ে তার কড়ে-আঙুলটা যেই-না বাড়িয়ে দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শয়তান সেটা তার দাঁত দিয়ে চেপে ধরল। রাজকন্যা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল।

"দরজা খোল", শয়তান বলল, "না হলে তোমার আঙুল আমি কামড়ে কেটে নেব।"

রাজকন্যা যন্ত্রণা সহ্য করতে না-পেরে দরজা খুলে দিল। শয়তান ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল।...

সন্ধের দিকে চাষির ছেলে ফিরল। সে কড়া নাড়ল দরজায়। রাজকন্যা দরজা খুলে দিল। তার স্বামী ঘরে ঢুকল। ইতিমধ্যে শয়তান লুকিয়ে পড়েছে।

পরদিন সকালে চাষির ছেলে আবার গেল শিকারে। রাজকন্যাকে একা পেয়ে শয়তান এবার নিজের মতলবের কথা বলল, "তোমার স্বামীকে মেরে ফেলতে হবে।"

"কেমন করে ওকে মারব?"—রাজকন্যা জিজ্ঞেস করল।

শয়তান তার মতলবের কথা খুলে বলল, "তোমার স্বামী যখন বাড়ি ফিরবে এমন ভান করবে যেন তুমি অসুস্থ। যদি ও জিজ্ঞেস করে কী হয়েছে তোমার এবং কী করলে তুমি ভালো বোধ করবে, তুমি বলবে যে এই বনের মধ্যে একটা ওক গাছের নীচে একটা বুনো বরাহ বাস

করে; তার কলিজা খেলে তবেই তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। '—যদি তুমি আমাকে ওই কলিজা এনে দিতে পারো তবেই আমি সেরে উঠব, আর না হলে আমার মৃত্যু হবে।' তুমি তোমার স্বামীকে বলবে। তখন তোমার স্বামী বরাহকে ধরতে যাবে। কিন্তু পারবে না। ওই বরাহ ভীষণ হিংস্র। তোমার স্বামীকে মেরে ফেলবে আর তারপর আমরা দুজনে বিয়ে করব।"

চাষির ছেলে শিকার থেকে ফিরে এল।

ঘরে ঢুকে দেখল রাজকন্যা বিছানায় শুয়ে ভীষণ কাতরাচ্ছে; মর মর অবস্থা।

"কী হয়েছে তোমার?"—চাষির ছেলে জিজ্ঞেস করল।

রাজকন্যা কাতরাতে কাতরাতে শয়তানের শেখানো কথাগুলো উগরে দিল, "শুনেছি এই বনে ওক গাছের নীচে একটা বুনো বরাহ থাকে। তুমি যদি তার কলিজা এনে আমাকে খাওয়াতে পারো, তবেই আমি বাঁচব; না হলে আমি মারা যাব।"

চাষির ছেলে তো সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। ওক-গাছ খুঁজে তার উপর চড়ে বসল। অপেক্ষা করতে লাগল কখন বুনো বরাহটা আসে। বুনো বরাহ ইতিমধ্যে মানুষের গন্ধ পেয়ে গেছে। সে ছুটে এল ওক গাছের নীচে। দেখল একটা লোক গাছের ডালে বসে আছে।

বরাহ গাছটাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। তার ধারাল দাঁতদুটো ঢুকিয়ে দিল গাছের গুঁড়ির ভিতর। গুঁড়িটা দু-ফালা হয়ে গেল। প্রচণ্ড রাগে আর হিংসায় বরাহ গাছটাকে শুধু ঝাঁকুনি দিচ্ছে, গাছের শেকড়-বাকড়ের মধ্যে তার লম্বা দাঁতদুটো এবার ঢুকিয়ে দিল আর তাতে হল এক বিপত্তি। জন্তুটার দাঁতদুটো শেকড়-বাকড়ের মধ্যে আটকে গেল।

এইবার চাষির ছেলে একটু নিচু ডালে নেমে এল, তার তরোয়াল দিয়ে খোঁচা দিল, উত্ত্যক্ত করতে লাগল জন্তুটাকে। বরাহ তো রাগে গরগর করতে লাগল। সে চাইছে শেকড়-বাকড়ের জঞ্জাল থেকে নিজের দাঁতদুটোকে ছাড়িয়ে নিতে; কিন্তু কিছুতেই পারছে না।

সেই সুযোগে চাষির ছেলে লাফিয়ে মাটিতে নামল, তরোয়ালের এক কোপে বরাহের মুণ্ডটা কেটে নিল, তার দেহটাকেও কাটল, তার কলিজাটা বের করে নিল। তারপর হাঁটা দিল বাড়ির দিকে।

বাড়ির সামনে এসে দরজার কড়া নাড়ল। স্বামী বরাহের পাল্লায় পড়ে মারা গেছে ধরে রাজকন্যা শয়তানের সঙ্গে তখন খোশগল্পে ব্যস্ত।

দরজার কড়া নড়ছে শুনে তারা দুজনে তো লাফিয়ে উঠল। শয়তান লুকিয়ে পড়ল। আর রাজকন্যা খুলে দিল দরজা।

রাজকন্যার স্বামী বরাহের কলিজা রান্না করে খেতে দিল তাকে। রাজকন্যা আর কী করবে? বাধ্য হয়ে তাকে সেই কলিজা খেতে হল এবং সুস্থ হয়ে ওঠার ভান করতে হল।

পরের দিন সকালে চাষির ছেলে আবার শিকারে বেরিয়ে গেল। লুকোনো জায়গা থেকে শয়তান বেরিয়ে এল। আবার সে রাজকন্যাকে মন্ত্রণা দিল অসুস্থ হবার ভান করতে এবং স্বামীকে বলতে যে, একমাত্র বুনো হরিণের কলিজাই তাকে বাঁচাতে পারে।

"ওই বুনো হরিণকে খুঁজতে খুঁজতেই তোমার স্বামী মারা পড়বে আর তখন আর আমাদের কোনও অসুবিধা থাকবে না।" — শয়তান বলল।

চাষির ছেলে শিকার থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখল আবার তার বউ কাতরাচ্ছে।

—"আবার কী হল তোমার?" — চাষির ছেলে জিজ্ঞেস করল।

—"বুনো হরিণের কলিজা এনে দাও আমাকে। ওই কলিজা খেলেই আমার এই রোগ সারবে, তা না-হলে আমি মরব।"—রাজকন্যা বলল।

চাষির ছেলে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়ল বুনো হরিণ শিকার করতে।

কতক্ষণ যে সে হাঁটল ঠিক বলা যাবে না; তবে সে এসে পৌঁছোল একটা পাহাড়ের কাছে। সেই পাহাড়ের নীচে ছড়ানো তৃণভূমি। সেখানে বারোজন লোক একমনে ঘাস কাটছে। এক মুহূর্তের জন্যেও কেউ এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে না।

চাষির ছেলে চেঁচিয়ে তাদের বলল, "ওহে শুনতে পাচ্ছো?"

কেউ উত্তর দিল না।

দ্বিতীয়বার আবার সে বলল, "ওহে শুনতে পাচ্ছো?"

এবার একজন উত্তর দিল, "শুনতে পাচ্ছি তো বটেই। কিন্তু সন্ধের মধ্যে যদি আমরা এই জমির সব ঘাস কেটে নিতে না-পারি এবং তিনটে আঁটি বেঁধে তুলে নিয়ে যেতে না-পারি তাহলে বুনো হরিণ এসে আমাদের সকলকে মেরে ফেলবে আর জমির সব ঘাস খেয়ে নিয়ে চলে যাবে।"

চাষির ছেলে বলল, "কোনও ভয় নেই, তোমরা আমার কাছে এসো।"

লোকগুলো এগিয়ে এল। চাষির ছেলে তাদের নির্ভয়ে বসতে বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, ঠিক কোন্ দিক থেকে হরিণটা আসতে পারে। যা যা জানার ছিল লোকগুলোর কাছ থেকে সে সব জেনে নিল। তারপর সে সেই লোকগুলোর একজনের থেকে তার কাস্তেটা চেয়ে নিল। অল্প সময়ের মধ্যেই চাষির ছেলে মাঠের যত ঘাস সব কেটে ফেলল; চটপট আঁটি বেঁধে ফেলল তিনটে। বুনো হরিণ যেদিক দিয়ে আসবে সেদিকে রাখল একটা আঁটি। দ্বিতীয় আঁটিটা রাখল মাঝামাঝি আর তৃতীয় আঁটিটার আড়ালে সে নিজে লুকিয়ে রইল।

হরিণ একসময় এল। প্রথম আঁটিটা সে নিমেষের মধ্যে খেয়ে নিল। দ্বিতীয় আঁটিটাও তাই। তারপর তৃতীয় আঁটিটা খেতে এল। চাষির ছেলে আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে এবং তির মেরে ধরাশায়ী করে ফেলল হরিণটাকে।

হরিণটাকে ওরা টুকরো টুকরো করে কাটল এবং তার ছালও ছাড়িয়ে নিল। চাষির ছেলে শুধু হরিণের কলিজাটি নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

এদিকে রাজকন্যা শয়তানের সঙ্গে বেশ হেসেখেলে সময় কাটাচ্ছে আর ভাবছে তার স্বামী আর ফিরে আসবে না।

হঠাৎ দরজায় কড়া বেজে উঠল।

শয়তান তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ল। রাজকন্যা দরজা খুলে দিল। চাষির ছেলে ঘরে ঢুকল, হরিণের কলিজা রেঁধে তাকে খাওয়াল এবং রাজকন্যাকে আবার ভান করতে হল যে সে সুস্থ হয়ে উঠেছে।

পরদিন আবার চাষির ছেলে শিকারে বের হল। আবার শয়তান রাজকন্যাকে কুমন্ত্রণা দিল।

এবার সে বলল, "আরও একবার তোমাকে অসুস্থ হবার ভান করতে হবে। তোমার স্বামী যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে কী হয়েছে তখন তুমি বলবে যে তোমার অসুখ সারবে সেই জল খেলে যে জল মানুষকে অমর করে। সেই জল খুঁজতে বের হবে সে। জল কোনওদিনই সে খুঁজে পাবে না আর ফিরবেও না কোনও দিন। তারপর আমরা দুজনে...."

চাষির ছেলে ঘরে ফিরে দেখল আবার তার বউ অসুস্থ।

"আবার কী হল তোমার?" সে জিজ্ঞেস করল।

"উঃ আহ!" কাতরাতে লাগল বউ, "যদি তুমি সেই জল আমার জন্যে আনতে পার..."

"কোন্ জল?"

"যে জল খেলে মানুষ আর মরে না, অমর হয়ে যায়; — একমাত্র সেই জল খেলেই আমি ভালো হয়ে উঠব, না হলে আর বাঁচব না...।"

কালবিলম্ব না করে চাষির ছেলে বেরিয়ে পড়ল। পথে সে দেখতে পেল একটা ঘোড়াকে। সেই ঘোড়া যে-সে ঘোড়া নয়। সেই ঘোড়া হল জাদু-ঘোড়া। জাদু-ঘোড়া চাষির ছেলেকে বলল, "তোমাকে যেখানে যেতে হবে আমাকে ছাড়া সেখানে তুমি পৌঁছোতেই পারবে না। আমার পিঠে উঠে পড় আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।"

চাষির ছেলেকে আর পায় কে। এ তো মেঘ না চাইতেই জল!

সে তো ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। যেতে যেতে পড়ল একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের মুখটা শুধু খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে।

ঘোড়া বলল, "আমাকে তিনবার লাথি মারো যাতে আমার গায়ে তিনটে দাগ হয়ে যায়।

পাহাড়ের গুহার মুখ যেই না খুলল, অমনি চাষির ছেলে ঘোড়াকে তিনবার লাথি মারল। ঘোড়াটা শূন্যে উঠে পাহাড়ের ভিতরে উড়ে গেল। পাহাড়ের গায়ে ঘষা লেগে শুধু যা ওর লেজটাই খসে পড়ল।

ওরা দুজনে যাচ্ছে তো যাচ্ছে। যেতে যেতে তারা দেখল রাস্তা আগলে বিশাল আগুন জ্বলছে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে কোনওভাবেই সেই আগুন পার হওয়া যাবে না। ঘোড়া বলল, "আবার আমার গায়ে লাথি মারো। এত জোরে লাথি মারবে যে আমার গায়ে যেন তিনটে দাগ বসে যায়।"

চাষির ছেলে তাই করল। ঘোড়া আবার উড়তে লাগল এবং অগ্নিবলয় পেরিয়ে চলে গেল।

তারপর তারা এসে পৌঁছোল সেই ঝরনার কাছে, যে ঝরনার জল খেলে অমর হওয়া যায়।

চাষির ছেলে ঘোড়ার লাগাম আলগা করে দিল। নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। ঘোড়া নিজের ইচ্ছেমতো চরতে থাকল। আর চাষির ছেলে ঝরনার জলে স্নান করল, জল পান করল, বিশ্রাম নেবার জন্যে ঝরনার ধারে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়েও পড়ল একসময়।

ঝরনার কাছাকাছি একটা চারতলা উঁচু বিশাল বাড়ি। সেই বাড়িতে থাকে এক জাদুকরি আর তার সাতজন ছাত্রী।

জাদুকরি বুঝতে পেরেছে যে, একজন জোয়ান মরদ তার এলাকায় এসেছে। তার পরিচয় জানতে সে এক ছাত্রীকে পাঠাল। মেয়েটা ঝরনার কাছে এসে দেখতে পেল যুবককে। সে এত সুন্দর যে, তার ওপর থেকে মেয়েটা চোখ সরাতে পারছিল না। অবাক হয়ে মেয়েটা যুবকের দিকে তাকিয়ে আছে। তার নড়বার যেন শক্তি নেই। জাদুকরি তখন দ্বিতীয় এক মেয়েকে পাঠাল, তারপর তৃতীয় একজনকে, তারপর চতুর্থ একজনকে। তাদের কেউই ফিরে এল না।

সাত মেয়ের প্রত্যেকেই, যেই না যুবককে দেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নড়বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। অবশেষে জাদুকরি নিজেই চলে এল ঝরনার ধারে। সে প্রথমেই তার সাত ছাত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। তারপর চাষির ছেলেকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। সে যেহেতু জাদুকরি, তাই চাষির ছেলে তার বউ-এর দ্বারা প্রতারিত হবার খবর সবই রাখে।

জাদুকরি যুবককে বলল, "তোমার বউ তোমার সঙ্গে অবিশ্বাসের কাজ করেছে। সে এখন একজন শয়তানকে ভালোবাসে। ওরা দুজনে মিলে মতলব করেছে তোমাকে মেরে ফেলবে। তুমি আর ওদের কাছে ফিরে যেয়ো না।"

চাষির ছেলে জাদুকরির কথায় বিশ্বাস করল না। যে জল খেলে মানুষ অমর হয়ে যায়, সেই জল সে একটা পাত্রে ভরল, ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলে গেল।

বাড়ি পৌঁছে সে আবার দরজার কড়া নাড়ল। আবার শয়তান লুকিয়ে পড়ল আর রাজকন্যা দরজা খুলে দিল। তার বয়ে আনা জল বউ খেল এবং আবার সেরে উঠবার ভান করল।

পরের দিন চাষির ছেলে আবার শিকারে বের হল। শয়তান রাজকন্যাকে এবার বলল, "আমরা তোমার স্বামীকে কোনও দিনই মারতে পারব না যতদিন না জানতে পারছি ওর ক্ষমতার রহস্যটা ঠিক কী।"

স্বামী ঘরে ফিরলে রাজকন্যা তাকে খুব আদর করতে লাগল; তারপর তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?"

—"কী প্রশ্ন?"

—"তুমি শরীরে এত ক্ষমতা কোথা থেকে পাও?"

সে হেসে বলল, "আমার সব ক্ষমতা আমার আঙুলগুলোয়।"

"বেশ," — রাজকন্যা বলল, "আমি তোমার আঙুলগুলো একটা মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিচ্ছি। দেখি তুমি সেই দড়ির বাঁধন খুলতে পারো কি না।

রাজকন্যা তার স্বামীর দু-হাতের আঙুলগুলো মোটা দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে দিল। চাষির ছেলে আঙুলগুলো শুধু একটু মেলে ধরল আর দড়িগুলো পটপট করে ছিঁড়ে গেল।

"কিন্তু তোমার এত শারীরিক ক্ষমতার আসল রহস্যটা কী?"— রাজকন্যা আবার জিজ্ঞেস করল।

"—আমার কাঁধে।" চাষির ছেলে বলল।

"তাহলে এসো এই কড়াইয়ের মধ্যে বসো। দেখি তুমি কাঁধ দিয়ে এই কড়াই ভাঙতে পারো কি না।"

এটা হচ্ছে সেই বিশাল আর ভারী কড়াই ন-জন শয়তান মিলে যাকে নাড়াচাড়া করতে পারত।

চাষির ছেলে যেই-না কড়াইয়ের মধ্যে বসেছে অমনি সেই খোঁড়া শয়তান লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এল আর বেচারা চাষির ছেলে কিছু বুঝতে পারার আগেই শয়তান আর রাজকন্যা দুজনে মিলে কড়াইয়ের ঢাকনাটা চাপিয়ে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিল যাতে চাষির ছেলে তার মধ্যে বন্দি হয়ে থাকে। তারপর শয়তান সেই কড়াই পিঠে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সে কড়াই নিয়ে এসে পৌঁছোল একটা পাহাড়ের চূড়ায়। তারপর সেখান থেকে অনেক নীচে খাদের মধ্যে কড়াইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

কিন্তু খাদের ঠিক নীচেই বয়ে যাচ্ছিল একটা নদী। কড়াইটা পড়ল সেই নদীতে। নদীর জলে ভাসতে ভাসতে কড়াই এসে পৌঁছোল সেই জায়গায় যেখানে এমন একটা ঝরনা আছে যে ঝরনার জল খেলে লোকে অমর হয়ে যায়। সেই ঝরনার কাছেই আবার জাদুকরির বিশাল বাড়ি।

জাদুকরি তার সব ছাত্রীদের ডেকে পাঠাল।

তাদের বলল, "নদীর জলে কালো মতন কী একটা ভাসছে। তোমরা সবাই নদীতে নেমে দ্যাখো তো ওটা কী ভাসছে।"

মেয়েরা সবাই ছুটে গেল। কড়াইটাকে ধরে ধরে ঠেলতে ঠেলতে নদীর তীরে নিয়ে এল। তারপর সাতজন মিলে ধরাধরি করে কড়াইটাকে নিয়ে এল জাদুকরির কাছে।

কড়াইয়ের ঢাকা খোলা হল। সবাই দেখল, সেই যুবককে, তার নিশ্বাস পড়ছে না, সারা শরীর ভাঙাচোরা, ক্ষতবিক্ষত।

জাদুকরি চাষির ছেলের দেহটাকে খণ্ড খণ্ড করে কাটল, প্রতি খণ্ডে ঝরনার জল ছিটিয়ে দিল, দেহটাকে জোড়া লাগাল এবং তাকে বাঁচিয়ে তুলল আবার।

যুবক চোখ মেলল, উঠে বসল। জাদুকরি আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরল।

যুবক বলল, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু তুমি যা বলেছ সব সত্যি। আমি এখন বাড়িতে ফিরে যাব। আমার বউ আর সেই শয়তানের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করতে হবে। তারপর আমি ফিরে আসব। বিয়ে করব তোমাকে, সংসার পাতব দুজনে।"

নিজের বাড়িতে ফিরে গেল সে। দেখল শয়তান আর তার বউ দুজনে খুব ফুর্তি করছে; নিশ্চয়ই এই ভেবে যে, সে আর বেঁচে নেই। চাষির ছেলে এগিয়ে গিয়ে শয়তানের একটা পা ধরল, তারপর আর একটা পা নিজের পা দিয়ে চেপে ধরল মেঝেতে। তারপর শয়তানটাকে দু-আধখানা করে ফেলল। এরপর বিশ্বাসঘাতিনী রাজকন্যাকেও সে হত্যা করল।

তারপর আর কী?...

জাদুকরির কাছে ফিরে এসে সে তাকে বিয়ে করল। বিয়ের মহাভোজ দিল তারা।

আমিও সেই বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিলাম। প্রচুর খাওয়াদাওয়া হল। তারপর জাদুকরির এক ছাত্রীর সঙ্গে আমারও বিয়ে হয়ে গেল।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



হাজারান বুলবুল

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা মন্দির স্থাপন করলেন। দেশবিদেশের যশনামি মিস্তিরি-ওস্তাগর খাটছে উদয়াস্ত— বেড় তোরণ চবুতরা নাটদেউল, দেলচুড়োর তলায় কষকষ করছে মণিঘর—পাথরের পর পাথর ঘষে মেজে ছবি কুঁদে—

সাত বচ্ছর লাগল।

দেবতা প্রতিষ্ঠার দিনে রাজা চলেছেন পূজারি-ঋত্বিকের পেছনে, দমকা ঝড় এসে পঞ্চদীপ নিবিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল। কী হল, কী হল—দিশেহারা হয়ে হঠাৎ সামনে দেখেন এক জটাধারী সন্ন্যাসী, বলছে : এত করে গড়লি, তাও খুঁত রয়ে গেল রে মন্দিরে!

কীসের খুঁত ? আবার একটা দমকা ঝড় দিল চোখেমুখে, সামলে নিয়ে দেখেন সন্ন্যাসী নেই।

রাজার মনটায় ধন্দ লেগে গেল। না, ভাঙো মন্দির, আবার গড়তে হবে নতুন করে। আরও সাত বচ্ছরের উদয়াস্ত পরিশ্রমে আকাশ ছুঁয়ে উঠল ঝলমল দেউরি—আর তাইতে যে কত কাজ কত কারু কত ছবি, আগের চেয়েও যেন আরও সুন্দর। দেবতা প্রতিষ্ঠার দিনে রাজা চলেছেন পূজারি-ঋত্বিককে আগে করে, দমকা ঝড় এসে পঞ্চদীপ নিবিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

কী হল, কী হল—দিশেহারা হয়ে হঠাৎ সামনে ফের সেই জটাধারী সন্ন্যাসী—এত করে গড়লি, তাও খুঁত রয়ে গেল রে মন্দিরে।

আবার খুঁত?

না, ফের তবে ভাঙো। বারবার তিনবারের বার ফের আবার সাত বচ্ছরের উদয়াস্ত পরিশ্রমে মেঘ ফোঁড় দিয়ে উঠল মন্দিরের কনকচুড়ো, গা ভর্তি হিরেমোতির মুখে মুখে খেলছে রামধনুরশ্মি। অপূর্ব! দেবতা প্রতিষ্ঠার দিনে রাজা চলেছেন পূজারি-ঋত্বিককে আগে করে, আবার দমকা ঝড় এসে পঞ্চদীপ নিবিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল। তারপর যেই সে সন্ন্যাসীকে দেখা, পলক না পড়তে রাজা চট করে মুঠোয় ধরে ফেললেন সন্ন্যাসীর হাত। এবারেও খুঁত? তবে কীসের খুঁত ? না বললে ছাড়ছি না।

হাজারান বুলবুল কই মন্দিরে?

বলতে না বলতে, ও মা! যেন উবে গেছে, কোথায় সন্ন্যাসী? এদিক চান ওদিক চান, রাজা থমথমিয়ে রাজপুরী ফিরে এসে ডেকে পাঠালেন তিন ছেলেকে। তিন বার করে মন্দির গড়লুম, এবারেও খুঁত রয়ে গেল?

কীসের খুঁত, বাবা?

কোথায় মন্দিরের আলসেয় বসে ভোর-ডাকা রাত-ডাকা আমার হাজারান বুলবুল পাখি?

এই কথা? তা হলে নিয়াসতে চললুম বাবা যেখান থেকে পাই— তিন রাজপুত্র ভাই ঘোড়া ছুটিয়ে দিক জয় করতে বেরিয়ে পড়ল চোখের পলক না পড়তে।

দিন পার হয়ে রাত পার হয়ে রাজ্যের সীমানা পার হয়ে ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছেই— কোথায়? তাই তো। জেনে আসা হয়নি তো সে কোথাকার কোন্ দেশের পাখি! তেমোহনা এক রাস্তার মুখে এসে তিন ভাই-ই নেবে পড়ল ঘোড়া থেকে। তিনটে পথ দেখছি ঢুকে গেছে তিন মুখো। এখন তা হলে কোন্ পথে যাওয়া?

দেখে, এক সন্ন্যাসীঠাকুর আসছেন সুমুখের রাস্তা ধরে। কোথায় যাচ্ছ বাছারা?

যাচ্ছি তো হাজারান বুলবুলের খোঁজে, কিন্তু সে পাখি যে কোথায় থাকে—

তারপরে হঠাৎ এই তিন মুখো তিন রাস্তা বেরিয়ে গেল, এর কোন্ পথটাতে যে যাওয়া--

তিন ভাই একে একে নেবে গড় হয়ে প্রণাম করল সন্ন্যাসীঠাকুরকে।

শোন্ তবে বলি। যে যায় পয়লা পথে সে ঠিক ফিরেও আসে। যে যায় দয়লা পথে সেও হয়তো বা ফেরে। কিন্তু ওই যে ওই তুসরি পথখানা, ও পথে গেলে সে আর ফিরবে কি না কেউ জানে না।

আর বুলবুল?

কীসের বুলবুল, কোথায় বা কে। শুনসান তেমোহানা রাস্তার মুখটায় আলো থমথম করছে—না কোনো আওয়াজ, না কোনো সাড়া। একটা হাওয়া, একটা মাছি, এক ফোঁটা দিশা রেখা অবধি কোত্থাও নেই।

যাক গে। বড়ো ভাই ঘোড়ায় উঠে আগেভাগেই ধরল ডানমুখো পয়লা পথ। মেজো

অমনি ধরে নিল দুয়ের সড়কখানা—মাঝ দিয়ে। আর ছোটো? সে কি না সবার পরে, কাজেই সে নিল বাকি তিন নম্বরের বাঁ-হাতি ঝোপকাঁটা গজানো অচলা অপথা রাস্তা। ঢুকতে গিয়েই ছমছম করে ওঠে মনটা। কে জানে, ফিরব কি না ফের।

যাক গে। না ফিরি সে পরে। কিন্তু বুলবুল? মনে মনে ভাবছে, দেখতে পাব তো বুলবুল, হাজারান বুলবুল।

পাবি। পাবি। ও মা! দেখে, ফের সেই সন্ন্যাসীঠাকুর।

ঘোড়া থেকে নেবে পড়ল ছোটো।

শোন বলি। সাবধানে চলবি সারাক্ষণ। কতক পথ গেলে পাবি নদীর খাত। শুকনো খাত। তো তাইতেই নেবে জল খাবি আঁজলা পুরে, আর বলবি, আহা আহা, জল খেলুম গো, প্রাণ পেলুম গো—

নদী পার হয়ে আবার কতক পথ গিয়ে পাবি একটা চুড়ো বাঁধা কাঁটা গাছ। তার কণ্ঠার কাছটায় বিষকাঁটার একটা আঁটো এতখানি ফুল ফুটে আছে। গিয়ে কাঁটাগাছ জড়িয়ে ধরে ছড়া-ছেঁড়া ভুরুক্ষেপ না করে প্রাণভরে বাস নিবি ফুলটার, আর বলবি, আহা, আহা, দেবপুষ্পের বাস নিলুম গো, শ্বাস নিলুম গো—

তারপর ফুলটাকে দু-হাতে স্পর্শ করে আবার যাবি, কতক পথ গিয়ে দেখবি পাশাপাশি খুঁটোয় বাঁধা দুটো ভেড়া আর বাঘ, বাঘের মুখের গোড়ায় ঘাসের আঁটি, ভেড়ার মুখের নীচে দলা করা এক চাং মাংস।

তো বদলাবদলি করে দিবি মাংস আর ঘাস যার যার মুখের গোড়ায়। তারপর আবার যাবি। কতক পথ গিয়ে এবার পাবি একজোড়া দরজা-ফটক—একটা খোলা, আরেক পাট বন্ধ। খোলা দোর ভেজিয়ে বন্ধ দোর খুলে ঢুকবি দেউড়ি পার হয়ে—হাজারকারি ফুলের গাছ আর নকশা-নহর বাঁধা গুলশন বাগিচা, সেখানে সোনার আখরোট গাছের তলায় বাঁধা জাজমের 'পরে শুয়ে এক অপরূপ কন্যা—শিয়রের সোনার ডালে এত বড়ো চুনিপাথরের মতন চুপ করে বসে আছে পাখি—ওই হল হাজারান বুলবুল আর তার মালকিন। সে মেয়ে সাতদিন পড়ে পড়ে ঘুমোয় পর পর, আর সাত দিন জাগে, ভানুমতী-বিদ্যের বিদ্যেধরী সে মেয়ে—এই বললুম এতখানি, এখন কর যা পারিস—

বলতে বলতেই সন্ন্যাসী আবার শুনসান হয়ে গেছে হাওয়াবাতাসের মধ্যে।

এদিকে বড়ো ভাই যে পথ ধরে যাচ্ছে সে যেন পালিশ পাথরের রাস্তা, একটুকু ধুলোনুড়ি অবধি নেই। হলে কী হয়, দু-দিন তিন দিন পাঁচ দিনে খাবার তো ফুরিয়েছে, পথে একটা গাছ কী এক ফোঁটা জলও মেলে না। খিদেয় তেষ্টায়—দূর দিয়ে একটা সরাই মতন চোখে পড়েছে তো ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে হাজির। —এক আঁজলা জল একখানা রুটি আগে দাও তো তারপর কথা বলি।

যদি বান্দা হও তো মজুরি পাবে, নইলে যাও, এগোও।

তো তাই সই। প্রাণ তো বাঁচুক আগে।

বড়ো ভাই সেখানেই রয়ে গেল সরাইখানার নফর হয়ে।

মেজো ভাই মাঝ-সড়ক ধরে যেতে যেতে একদিন দিন ফুরোবার মুখে সামনে দেখে পথজোড়া গড়ান্তে এক টিলা পাহাড়। টিলার মাথায় খোপ খোপ আলো জ্বলছে মস্ত এক বাড়ি, যেন রাজবাড়ি। ঘোড়া থেকে নেবে পুরীপাঁচিলের বাইরে একটা ধাপে বসে এক দণ্ড ঠাণ্ডা হচ্ছে, আমেজ ফুলের গন্ধ চার ধারে—হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে দৈত্যের মতন এক কাফরি এক্কেবারে মুখের ওপরে, হাতে-আসা ছড়ি ছটফট করছে একগাছা। কী করবে, ভাববার সে অবসরই পেলে না, ছড়ির ছোঁয়াতে তখুনি একটা রঙিন পাথরটুকরো হয়ে গড়িয়ে পড়ল ধাপের পাশে।

ছোটোও চলেছে। ভয়ে-আশায় উঠছে পড়ছে ঘোড়ার কদম। একদিন দু-দিন কতক দিন যাবার পর পড়ল সেই শুষনি নদী। নদী পার হয়ে আবার যেতে যেতে কতক দূর গিয়ে এক দিন পড়ল সেই বিষকাঁটার ফুলফোটা গাছ, সেই খুঁটোয় বাঁধা ভেড়া আর বাঘ, তারপর খোলা ফটক ভেজিয়ে, বন্ধ কপাট খুলে সে ঢুকল গিয়ে—হাজারকেয়ারি ফুল পতপত করে উড়ছে বোঁটায় বোঁটায় গেরো দেয়া, রুপো বওয়া নহরের পাড় দিয়ে দিয়ে সবজি বাগ, সবু সবু ফুলপাতা-ঝরা আলের 'পর আল ডিঙিয়ে সোনার অখরোট গাছের তলায় দেখে বাঁধানো পাটির 'পরে অকাতরে ঘুমিয়ে আছে যেন অপরূপ এক রাজবালা, যেন গোল আভা ধরে আছে চার ধারটা। শিয়রের ডালে দোলা দাঁড় থেকে রেশমি হাওয়ায় ঢেউ তুলে পাখি নেবে এল ঘুমন্ত মেয়ের বুকের ওপর, তারপর হঠাৎ বোবা ভেঙে ডাক দিয়ে উঠল যেন কাজল সবুজ ছলছল করে উঠল পাতায় লতায়, আভা দিনমান যেন দুলতে লাগল চোখের ওপরে। দ্বিতীয় কলি পড়ে উঠল গাঢ় অস্ফুট নিখাদে—ছেলের মনে হল তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। তারপর অরোধা ধারার মতো কিনারা-নহর-গাছের চুড়ো চারিদিকে কিরণরঙের জাল যেন ছড়িয়ে চলেছে বেড়ে বেড়ে— সে কী সুর, না জ্যোৎস্না, না, বুকে ঘন হয়ে ওঠা নিষ্ঠুর চাপ—ছেলের মনে হল, তার হাত-পা-চোখের-মনের বাঁধন সব অবশ হয়ে গেছে।

কতক্ষণ যে অমনিধারা দাঁড়িয়ে আছে মনে নেই, হঠাৎ ঘোর ভেঙে ভাবে, আ রে! এই তো সুযোগ! কী ভাগ্যি, মেয়ের এই ঘুমোবার কাল! তড়িৎ হাতে তখুনি পাখিটাকে মুঠোয় বেঁধে মেয়ের গোলাপি কপালে ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে নিমিষে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ফিরতি-মুখো।

সাত দিন বাদে ঘুম ভেঙে উঠে মেয়ে দেখে ফুলের গাছের ছায়া লেগে লেগে দাঁড় দোলা খাচ্ছে একা একা, বুলবুল নেই।

কী হল বুলবুল আমার? কে নিল আমার হাজারান বুলবুল?
ফটক, ফটক, দেউরি ফটক—ছুটল মেয়ে—
ঢুকল কে বল? চোর, না সে ঠক—
সে যে রাজপুত্র!
ছুটল মেয়ে—ফটক, ফটক, ধর— গিয়ে ধর—



কেন ধরব? সে যে আমাদের এতদিনকার বোজা দিকটা খুলে দিয়ে গেল, খোলা দিকটা দিয়ে দিয়েছে—আঃ কী আরাম!

ও ভেড়া, ও বাঘ, ধর—তেড়ে ধর—

কেন ধরব? সে যে এতদিন বাদে মুখে তুলে দিয়ে গেল মুখের গরাস—ভেড়ার ঘাস, বাঘের মাস—

ও রে কাঁটাফুল, ধর না— যা না রে—

কেন ধরব? তুমি আমায় করলে বিষকাঁটার ফুল, সে যে আমায় বলল দেবপুষ্প!

ছুটল মেয়ে—

ও নদী, ও নদী, ধর— গিলে ফেল—

কেন ধরব? তুমি আমায় করে দিলে মড়ক নালার ধারা, সে যে আমায় বলল তাকে প্রাণ দিয়েছি—

হাওয়ারাজ ঘোড়া আমার, ঘোড়া—

মেয়ের ডাক শুনে পলকে দিক ফুঁড়ে ছুটে এল বাতাসকেশর ওড়া ঘোড়া। লাফ দিয়ে চড়ে বসল মেয়ে।

এদিকে ছোটো ছেলে ততক্ষণে পৌঁছে গেছে তেমোহানার মুখে। দেখে ঠিক সেইখানটাতে বসে আছেন সন্ন্যাসীঠাকুর। পাখি পেলি?

এই তো পাখি। দাদারা ফিরেছে, ঠাকুর?

না তো। যা, তবে খোঁজ করে নিয়ায় গিয়ে ফিরিয়ে।

পাখিটাকে সন্ন্যাসীঠাকুরের জিম্মে করে ছেলে চলল ডানমুখো। অজলা অবৃক্ষ দেশের মধ্যে চলে চলে যখন সে সরাই পড়ল, সেও গিয়ে তেমনি ঘা দিয়েছে, দেখে চাকর খাটছে বড়ো দাদা।

ও দাদা, এ কী বেশ তোমার?

আর বলিস নে রে ভাই!

হাজারানকে পেয়েছি দাদা, চল ফিরি। মুক্তি-দাম গুনে দিয়ে দাদাকে নিয়ে তেমোহানার মুখে পৌঁছে দিয়ে ফের সে চলল মেজো দাদার সন্ধানে।

মাঝের পথ, সেও যেন শান বাঁধা ধুলোকুটোহারা সড়ক, যেতে যেতে শেষবেলার ঝোঁকে সে পৌঁছোল সেই টিলাপাহাড়ের তলায়। পথ জোড়া পাহাড়, তার মাথায় খোপ খোপ আলো জ্বলে উঠেছে মস্ত এক বাড়ি, যেন রাজবাড়ি। ঘোড়া থেকে নেবে পুরীপাঁচিলের বাইরে একটা ধাপে বসে এক দণ্ড ঠান্ডা হচ্ছে—হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে দৈত্যের মতন এক কাফরি এক্কেবারে মুখের ওপরে, হাতে লিকলিকে একগাছা আসা-ছড়ি। লাঠি উঠিয়েছে কিন্তু তার আগে বিদ্যুৎগতি সে লাঠি কেড়ে নিয়ে কাফরিকেই ছোটো বসিয়ে দিয়েছে এক ঘা, আর—

আজব কাণ্ড! অমন যে দশাসই কাফরি, একটা টুকরো রঙিন পাথর হয়ে গড়িয়ে পড়ল ধাপের পাশে।

তবে তো—ভেবে, যা পায় তাতেই ছোটো বসিয়ে দেয় এক ঘা—ও মা! দেখে ঘা খেয়ে অমনি একটা পাথর দাঁড়িয়ে উঠল মানুষ হয়ে, আর উঠেই তখুনি ছুটেছে কোনো দিকে না চেয়ে—এক-দুই-তিন, একেবারে এক—

ছোটো তুই!

চমকে থেমে পড়ে ছোটো, দেখে মেজোদাদা তার।

এ কী দশা তোমার দাদা

আর বলিস নে রে ভাই!

যাক গে যাক। হাজারানকে পেয়েছি দাদা, ফিরি চলো।

তেমোহানার মুখে এসে সন্ন্যাসীঠাকুরের কাছে পাখিটা হাতে নিল ছোটো। চুপ সেই থেকে এক্কেবারে, কিন্তু কী সুন্দর দেখতে! কী সুন্দর পাখিটা রে! বড়ো মেজো দু ভাই তারিফ করে দশবার করে।



তো চল এবারে ফিরি।

যেন রাজ্য জয় করে ফিরছে এমনি খুশির রোল তুলে তিন ভাইয়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। লোকজন নেই তো গাছজঙ্গলকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, দেখ রে এই চললুম হাজারানকে নিয়ে, যখন গান গাইবে দেখবি কুঁড়ি ফুলে ভরে যাবে দু-ধারি যেখানকার যত—

গাছপাতা নেই তো খরা মাঠকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, দেখ এই ফিরে যাচ্ছি হাজারানকে নিয়ে, যখন গান গাইবে সমস্ত সমস্ত শুখা সবুজ হয়ে যাবে চারি ধারে—

যেতে যেতে নেড়া মাঠের মধ্যে এক ইঁদারা। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে রে ছোটো, জল তুলিস তো প্রাণটা জুড়োয় খেয়ে।

তাই সই। তিন ভাইয়ে নাবল ঘোড়া থেকে। ছোটো জল তুলছে ঘটির মুখে দড়ি বেঁধে নুয়ে পড়ে—

হঠাৎ দু-ভাই চমকা ঠেলা দিল গিয়ে পেছন থেকে—

একটু শব্দ উঠল নীচে থেকে উপর। কিন্তু সে আর কে শুনবে।

দু-ভাই পাখি নিয়ে হাজির সোজা রাজার খাসমহলে, হাজারানকে এনেছি বাবা।

রাজা উঠে এলেন, ও মা কী সুন্দর পাখি! এই নাকি হাজারান বুলবুল? বাঃ! তারিফ করার মতো বটে। কিন্তু পড়ে কই? গায় কই?

গাইবে বাবা। আগে সওয়া হোক।

ছোটো? এতক্ষণে নজর গেছে রাজার।

দু-ভাই, মাথা নুয়ে মুখ কালো করে চোখের জল ফেলে বলল, নির্বুদ্ধি গোঁয়ার ছেলে, বাদাবাদি লাগিয়েছে অমনিষ্যি, তো তারই সাথে। ছোটোকে বাঁচাতে পারিনি, বাবা।

রাজাও কাঁদলেন দু-ভাইয়ের মাঝে বসে। এত সুখ, তারও মধ্যে কি না কালি এতখানিক। না, ভরা সুখ তাঁর কপালে লেখা নেই। দৈব।

কী আর করা।

মন্দিরের নাটবাড়ির মুখে সোনার দাঁড় গড়ে দিলেন রাজা হাজারানের। দাঁড়ে বিনিয়ে বেঁধে দিলেন অঝর ফুলের লতা।

কিন্তু পাখি শুধু বসে থাকে। সে ডাকেও না, পড়েও না, গায়ও না। সারাক্ষণ বসে বসে খালি ঝিমোয়।

রাজ্যের লোক দেখতে আসে গল্পকথার পাখিটাকে সত্যি সত্যি। এ কেমনধারা পাখি গো। এ যে খালি ঝিমোতেই আছে!

নতুন দেশে উপড়ে আনা, গা সওয়া হোক আগে।

তো তারপর তা হলে আসা যাবে নয় ফের।

দিন যায়। ততদিনে এসে পৌঁছেছে ভানুমতী রাজকন্যা, পাখির মালকিন। সপাটে রাজার দরবারে গিয়ে সভাসুদ্ধু লোকের সামনে চেঁচিয়ে উঠেছে, কই? চোর কই? কে এনেছে আমার হাজারানকে চুরি করে?

গোটা সভা থমথমিয়ে ওঠে, এ আবার কী ব্যাপার!

মেয়ে বলছে মুঠো পাকিয়ে, কই আমার পাখি? কই, চোর কই?

রাজা ডাক দিলেন দু-ছেলেকে—এই যে।

কী হয় না কী হয়! দু-ভাই এগিয়ে এসে সবার সুমখে জোর গলা করে বলে উঠল, এই যে আমরা। আমরা এনেছি হাজারান পাখি। বলো, কী করবে!

তোমরা?

হ্যাঁ, আমরা। চোর বলো তো তাই।

পথে পেয়েছিলে কাউকে?

না তো।

তা হলে তোমরা নও। তোমরা আনোনি।

আনিনি, তবে এল কীসে পাখি?

তোমরা আনো-ই নি।

সভাসুদ্ধু লোকে বিষম খেয়ে উঠল নতুন কথার ফেরে। রাজা, যেন ধাক্কা খেয়ে নেবে এলেন সিংহআসন ছেড়ে। কে তবে? কে এনেছে পাখি?

এরা নয়। এরা জানেও না এ পাখি কার, কোথাকার।

তবে?

তবে আর কিছু নয়, চুরির দণ্ড দিতে জানি আমি, যেখানে হোক, যে হোক সে চোর— বলতে বলতে মেয়ে ফুঁ দিল শঙ্খফুকারের মতো, আর হাওয়া কালো হয়ে উঠল দেখতে দেখতে সভার ভিতর। ফের বার ফুঁ দিতে এধার-ওধার নেবে উঠে যেন ওড়পাড় করতে লাগল অন্ধকার—অন্ধ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে লোকে দিশেহারা পালানোর কালে এ ওর গায়ে ঘা খেয়ে আছড়ে পড়তে লাগল মাটিতে—বুঝি পিশাচ প্রেত বুক চাপড়ে এগিয়ে আসছে শয়ে শয়ে, চারধার তোলপাড় করে—রাজা অচৈতন্য হয়ে গেলেন।

জ্ঞান হতে দেখেন তাঁরই পাতালকারাঘরের পাষাণ মেঝেয় দু-ছেলের মাঝখানে শুয়ে আছেন। ওপরের ঘুলঘুলি ফাঁক দিয়ে এক ফোঁটা আলো আসছে, মনে হয় দিনের আলো।

এদিকে বনের কাঠুরেরা কুয়োর ভিতর মানুষের সাড় পেয়ে গিয়ে তুলেছে ছেলেকে, সে তো আর কেউ জানে না। ছেলেও তো জানে না দেশের ভিতরে তাদের কী ঘটছে, কী বৃত্তান্ত তখন। ফিরছে, দেখে লোকজন চলে না পথে, গাঁ দেশ পাড়ার পর পাড়া থমকে আছে অজানা ভয়ে, কারও দাওয়ায় দাঁড়াতে গেলে সে অমনি আরও জোর দিয়ে চেপে রাখে দরোজা।

কী হল?

যত ফেরে, রাজপুরী শহরের যত কাছে আসে দেখে দোকানপাট বোজা, যেখানে ভিড় গমগম করত, সেখানে মাছিটাও নেই। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে রাজসভায় ঢুকে গিয়ে দেখে সেই যে মেয়ে সে একলা আলো হয়ে বসে আছে সিংহাসনে, আর তার ধার জুড়ে যারা দাঁড়িয়ে-বসে তারা সব যেন কেমন, কেউ যেন নয়, মানযের মতনও যেন নয়। রাজা কোথায়, আমার বাবা?

ছেলে দাঁড়িয়েছে সামনে গিয়ে।

চোরের দণ্ড ভোগ করছে পাতালকারাঘরে। তুমি কে?

আমায় তুমি দেখোনি। তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। আমি আনতে গিয়েছিলাম তোমার হাজারান পাখি।

তুমি? পথে পেয়েছিলে কাউকে?

পেয়েছিলুম। ছেলে বলল শুষনি নদী, বিষফুলের গাছ, অনাহারী ভেড়া-বাঘের কথা, বোজানো আর খোলা কপাটের ভেতরকার গুলশন বাগিচা, রুপোর নকশা-নহর, সোনাব অখরোট গাছ, বাঁধা জাজিমের পরে অঘোরে ঘুমোনো রূপবতী মেয়ের কথা তার শিয়রে দোলা-দাঁড় থেকে এক পাখি নেবে এসে বসল ঘুমোনো মেয়ের বুকের ওপর, তারপর গেয়ে উঠল—

আর এই জ্বলছে দেখো আমার কপালটা এইখানে? বলতে বলতে মেয়ে নেবে এসে হাত ধরল সে ছেলের।

রাজা, তাঁর দুই ছেলে, সভাসদ উজির আমির, সৈন্য সিপাহি, দাসদাসী, লোকজন সব ফিরে এল। সারা দিনে খুশির ফুয়ারা ফুটছে দিকে দিকে, সারা রাতে এত আতশ এত রোশন, কোথাও, কোথাও ঘুম নেই। রাত ফিকে দিতে মন্দিরের নাটঘরের দোলা-দাঁড়ের' পরে বসে হঠাৎ ডেকে উঠেছে পাখি—ও কী, ও? যেন কাজল সবুজ ছলছল করে উঠল শূন্য আকাশ ছাওয়া ডাল কাঠ পাতায় লতায়—আভা দিনমান যেন ফুলে ফুলে উঠছে চোখের ওপর। দ্বিতীয় কলি পড়ে উঠেছে গাঢ় অস্ফুট খাদে—মনে হয় সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠছে—

রাজা নতুন বউয়ের হাত ধরে ছোটো ছেলেকে যুবরাজ অভিষেক করলেন রাজ্যের জয়ধ্বনির সামনে।

দু-ভাই নির্বাসন শাস্তি বয়ে পা বাড়াতে, ছোটো বলল ওরা থাক বাবা, ওরা আমার বড়ো দাদা মেজো দাদা—

কিন্তু তারা যে কোন্ ফাঁকে কোথায় চলে গেল দেশান্তরী হয়ে, সে আর কেউ জানে না।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



ধাঁধানো ধাঁধা

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

দূরদেশি এক রাজার দরবারে পুবদেশি এক রাজার দূত এলেন। রাজপ্রহরী ভিতরে গিয়ে রাজামশাইকে খবর দিতেই তিনি সেই দূতকে সাদর অমন্ত্রণ জানালেন। দূত দরবারে প্রবেশ করে সোজা রাজামশাইয়ের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে এলেন এবং হাতের লাঠিটি দিয়ে সেখানে একটি বৃত্ত এঁকে তার মধ্যেই গ্যাঁট হয়ে বসে পড়লেন।

দূতের দ্রুত কাণ্ডকারখানা দেখে রাজা তো হতভম্ব! মন্ত্রীরা ততোধিক। তাই তো ব্যাপারখানা কী!

ওদিকে দূতমশাই কোনও দিকে দৃকপাত না-করে, একটি কথাও না-বলে দিব্যি নিজের রচনা করা বৃত্তের মধ্যে বসে রইলেন।

রাজা তাকান মন্ত্রীর দিকে, ব্যাপারখানা কী। মন্ত্রী তাকান কোটালের দিকে, ব্যাপারখানা কী! কোটাল তাকান প্রহরীর দিকে, ব্যাপারখানা কী!

ব্যাপার একটা কিছু আছেই। রাজা চোখ বড়ো বড়ো করে গালে হাত রেখে মন্ত্রীর দিকে আবার তাকান।

রাজামশাইয়ের এই তাকানোর অর্থ প্রবীণ মন্ত্রী নিমেষেই বুঝতে পারেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, পুবদেশি দূতের এই অস্বাভাবিক আচরণের রহস্য রাজামশাইকে উদ্ধার করে দিতে হবে এবং তা সূর্যাস্তের মধ্যে। না হলে উপস্থিত রাজকর্মচারীদের গর্দান যাবে। অতএব রাজকর্মচারীদের মধ্যে সোরগোল। সকলে ছুটলেন এর জবাব খুঁজতে। রাজ্যের কেউ যদি এর অর্থ বলতে পারেন।

রাজ্যের উত্তর-দক্ষিণ, পুব-পশ্চিমে কেউ যখন এই ধাঁধার মর্মোদ্ধার করতে পারলেন না, তখন হতাশ হয়ে ফিরছিলেন এক রাজকর্মচারী। পথে তার নজরে এল এক তাঁত-ঘর। সেখানে তাঁতি বসে একটা সুন্দর কাপড় বুনছিলেন। তাঁতিকে অমন সুন্দর তাঁত চালাতে দেখে তাঁর মনে হল, লোকটা হয়তো এই সমস্যার একটা সুরাহা করতে পারবেন।

রাজকর্মচারীটি তাঁতিকে এই সমস্যার কথা খুলে বললেন।

সেই তাঁতি ছিলেন খুব বুদ্ধিমান। সব শুনেটুনে ক্ষণিকের জন্য কী যেন ভাবলেন। বললেন,



ঠিক আছে। এ আর এমন কী! আমি এর সমাধান করে দেব।

তাঁতির কথা শুনে রাজকর্মচারী তো মহাখুশি। বললেন, তাঁতিমশাই, তাহলে চলুন রাজদরবারে। রাজামশাই অপেক্ষা করছেন। একটু জলদি।

তাঁতিমশাই বললেন, হ্যাঁ চলুন।—বলেই তিনি চটপট বাড়ির উঠোন থেকে পরিষ্কার দু-খণ্ড হাড় আর মুরগি-ঘর থেকে একটা মুরগি বগলদাবা করে ছুটলেন রাজদরবারে।

পৌঁছেই হাড় দু-খানা রাখলেন পুবদেশি দূতের পাশে। তা দেখে দূতমশাই স্মিত হেসে ঝোলা থেকে দু-মুঠো গম ছড়িয়ে দিলেন মেঝেতে। গম ছড়িয়ে দিতেই তাঁতি সঙ্গে সঙ্গে মুরগিটাকে ছেড়ে দিলেন সেখানে। ছড়ানো গম দেখে মুরগি বেচারি টপটপ সেগুলি খেয়ে ফেলল এবং কী আশ্চর্য, তাই না দেখে পুবদেশি দূতমশাই সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে দে চম্পট!

সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার চকিতে ঘটতে দেখে রাজামশাই হতবাক!

তিনি তাঁতিকে বললেন, শেষ পর্যন্ত তোমার দ্বারাই মুশকিল আসান হল। খুব ভালো কথা! কিন্তু ব্যাপারখানার আসল রহস্য ভেঙে বলো তো বাপু।

তাঁতিমশাই জবাব দিলেন, মহারাজ, ধাঁধাটি ধাঁধানো নয়। খুবই সোজা।

দূতমশাই যে বৃত্তটি রচনা করেছিলেন তার অর্থ হল, পুবদেশি রাজা যদি আপনার রাজ্য ঘিরে ফেলেন তাহলে আপনি বশ্যতাস্বীকার করবেন কি না?

তার জবাবে আমি হাড় দু-খানা প্রতীক হিসেবে সেই দূতের পাশেই রেখেছিলাম, যার অর্থ, তোমরা হচ্ছো ছেলেমানুষ, এই দিলুম তোমাদের খেলনা! আর গম হচ্ছে রাজার সৈন্যবাহিনী এবং এই মুরগি হচ্ছে আমাদের এক-একটি সৈন্যের প্রতীক—যার অর্থ, আমাদের একজন সৈন্যই তোমাদের অনেকগুলি সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করার পক্ষে যথেষ্ট!

সুতরাং মহারাজ, পুবদেশি দূত সেজন্য সব দেখেশুনে ঘাবড়ে গিয়ে দে চম্পট। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওই রাজ্য ভুলেও আর এ-রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।

তাঁতির প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে রাজা খুব খুশি হলেন এবং দু-হাতে তাঁকে প্রচুর পুরস্কার দিলেন।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



জলদৈত্য

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বাবা আর মা, আর তাদের একমাত্র ছেলে; এই নিয়ে ছোটো এবং সুখী পরিবার। একদিন বাবা চলল ছেলেকে নিয়ে। ছেলেটাকে কাজটাজ কিছু-একটা শেখাতে হবে। তাকে একজন কারিগর বানাতে হবে। ছেলেকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাবার খুব জলতেষ্টা পেল। এক জলাশয়ের কাছে এসে তারা থামল। বাবা জল খেয়ে তার তৃষ্ণা মেটাল এবং তৃপ্তির সঙ্গে বলল, "আহ-হ!"

সঙ্গে সঙ্গে জলের ভিতর থেকে উঠে এল এক দৈত্য এবং সবিনয়ে বলল, "বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি? আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"আমি আমার ছেলেকে কোনও কারিগরের কাছে ভরতি করতে চাই যাতে ও কাজকর্ম কিছু শিখতে পারে।"

"ওকে আমার কাছে রেখে যান, আমি একজন ভালো কারিগর।"

বাবা এক কথায় রাজি। সে ছেলেকে রেখে গেল দৈত্যের কাছে। ছেলেটাকে নিয়ে দৈত্য জলের নীচে চলে এল, জলের অতল গভীরে তার বাড়ি। বাবা ফিরে এল নিজের বাড়িতে। কয়েক মাস কাটল। ছেলে কাছে নেই, বাবা-মা'র দিন যেন আর কাটে না। বাবা আবার

একদিন জলাশয়ের কাছে এল। আঁজলা ভরে জল পান করল, তারপর তৃপ্তির সঙ্গে বলল, "আহ্-হ্।"

আবির্ভাব হল দৈত্যের।

—"কী ব্যাপার? তলব কেন?"

—"দিন আর কাটছে না আমাদের," বাবা বলল, "আমি ছেলেকে নিয়ে যেতে এসেছি। ওকে বাড়িতে দরকার।"

—"ওর শিক্ষা এখনও শেষ হয়নি।" দৈত্য বলল।

—"তাই যদি হয় তাহলে আমরা যাতে বেঁচেবর্তে থাকতে পারি, তার জন্যে কিছু-একটা করুন। অন্তত ছেলে যতদিন না রোজগার করতে পারছে।"

দৈত্য জলে ডুব দিল, নিয়ে এল একটা চাদর। বাবার হাতে সেটা দিয়ে বলল, "যখনই খিদে পাবে, এই চাদরটি টেবিলে বিছিয়ে দেবে।"

বাবা সেই চাদর নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। যেই-না একটা টেবিলে ওরা চাদরটা বিছিয়েছে, তখনই নানারকম খাবার এসে পড়তে লাগল তার উপর।

বাবা আর মা বেশ শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে। খাবারের চিন্তা আর নেই।

একদিন বউ বলল, "জমিদার-গিন্নিকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো উচিত।"

—"কাজটা ঠিক হবে না।" — বর বলল।

—"কেন ঠিক হবে না?"

—"চাদরের গুণ যদি জমিদার-গিন্নি বুঝতে পারে, তাহলে আমাদের কাছ থেকে ও চাদরটা নিয়ে যেতে চাইবে।"

—"চাইলেই আমরা দিচ্ছি আর কী। জমিদার-গিন্নিকে নেমন্তন্ন করতেই হবে।" বউ তো যাকে বলে নাছোড়বান্দা।

—"ওকে নেমন্তন্ন কোরো না, আমি ভালো কথা বলছি, পরে এর জন্যে পস্তাতে হবে।"

কিন্তু বউ কিছুতেই কথা শুনল না। জমিদার-গিন্নিকে তো নেমন্তন্ন করল, তার সঙ্গে পাড়ার অন্যান্য বউদেরও নেমন্তন্নকরতে ছাড়ল না।

যখন সব অতিথিরা এসে জুটল বাড়িতে, তারা দেখল খাবার-দাবারের কোনও ব্যবস্থাই নেই। এমনকি উনুন পর্যন্ত জ্বলছে না।

—"এরা আমাদের নেমন্তন্ন করল কেন?"—নিমন্ত্রিতেরা একে অপরকে জিগ্যেস করতে লাগল।

যাই হোক, সবাই যখন খেতে বসল তখন তারা দেখল যে, সেই বাড়ির গিন্নি টেবিলে একটা চাদর বিছিয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে তার উপর হরেকরকম খাবার এসে পড়তে লাগল। তারপর খাবারগুলো সরিয়ে চাদরটা ভাঁজ করে রাখল। কাণ্ড দেখে জমিদার-গিন্নির চোখ তো ছানাবড়া। সে ভাবল, এই দারুণ চাদরটা আমাকে বাগাতেই হবে। কী করা যায়...কী করা যায়...ভাবতে ভাবতে জমিদার-গিন্নির মাথায় একটা বুদ্ধি এল। তার সঙ্গে একজন

পাহারাদার এসেছিল। জমিদার-গিন্নি পাহারাদারকে ডেকে সকলের অলক্ষ্যে ফিসফিস করে বলল, "আমাদের বাড়িতে ঠিক একইরকম দেখতে একটা টেবিল ঢাকা দেওয়ার চাদর আছে। সেটা এখনই নিয়ে এসো!"

পাহারাদার গিন্নি-মা'র আদেশ পালন করতে পড়িমরি করে ছুটল। চাদরটা নিয়ে এসে মালকিনকে দিল। আর জমিদার-গিন্নি করল কী, সকলের অলক্ষ্যে নিজের চাদরটার সঙ্গে মন্ত্রপূত চাদরটা বদলে নিল।

খাওয়া-দাওয়া মিটে গেলে অতিথিরা যে যার বাড়ির পথ ধরল। সবাই চলে গেলে তারা ভাবল, এবার খেয়ে নেওয়া যাক। তারা যথারীতি চাদরটা বিছিয়ে দিল। কিন্তু হায় কপাল! কোনও খাবারেরই পাত্তা নেই। তখন তারা বুঝল যে, তাদের আসল চাদরটা জমিদার-গিন্নি চুরি করে নিয়ে গেছে।

ওরা দুজনেই জলাশয়ের ধারে এসে হাজির। দুজনেই আঁজলা ভরে জল পান করল। তারপর দুজনেই তৃপ্তির সুরে বলল, "আহ্-হ্!"

মুহূর্তের মধ্যে জল থেকে উঠে এল দৈত্য।

—"আবার কী হল?"

—"আমাদের খুব খিদে পেয়েছে।"



—"কিন্তু আমি তো তোমাদের একটা চাদর দিয়েছিলাম?"

—"জমিদার-গিন্নি আমাদের বাড়ি এসেছিল। সে সেটা চুরি করে নিয়ে গেছে।"

দৈত্য জলের নীচে ডুব দিল। এবার নিয়ে এল একটা কুমড়ো।

—"এই হল একটা কুমড়ো। তোমরা যেই এটাকে নাড়াবে সঙ্গে সঙ্গে এর ভিতর থেকে একদল সৈন্য বেরিয়ে আসবে আর তারা সবাই মিলে জমিদারকে মেরে পাট করে দেবে।"

ওরা দুজনে কুমড়োটা নিয়ে বাড়ি ফিরল। দুজনে মিলে কুমড়োটা ঝাঁকাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ঢালতরোয়াল নিয়ে কুড়িজন যোদ্ধার আবির্ভাব হল। তারা বলল, "বলুন কী আদেশ?"

—"জমিদারের কাছ থেকে আমাদের চাদরটা ফেরত আনতে হবে।" — সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধারা রে রে করে ছুটল জমিদারের বাড়ির দিকে। সেখানে পৌঁছে তারা দরজা-জানলা ভাঙতে লাগল।

অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেল।

তারা সৈন্যদের জিজ্ঞেস করল, "জমিদারের বাড়ি আক্রমণ করছেন কেন?"

"আমরা একটা চাদর ফেরত নিয়ে যেতে এসেছি। জমিদারের গিন্নি সেটা চুরি করে এনেছে।" সৈন্যরা বলল।

সৈন্যদের রণং-দেহী মূর্তি দেখে জমিদার তো ভয়ে কাঁপতে লাগল। কালবিলম্ব না-করে সে গিন্নির কাছ থেকে চাদরটা নিয়ে সৈন্যদের ফেরত দিয়ে দিল।

চাদর ফেরত পেয়ে ওরা সৈন্যদের ধন্যবাদ জানাল এবং আবার কুমড়োর ভিতর ফিরে যেতে বলল। তারা সবাই কুমড়োর ভিতর সেঁধিয়ে গেল। তখন ওরা কুমড়োটাকে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখল।

কয়েক বছর কাটল।

একদিন বর বউকে বলল, "আমার মনে হয় আমাদের ছেলে এতদিনে যা শেখার শিখে ফেলেছে। চল এবার ওকে আমরা বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসি।"

আবার দুজনে সেই জলাশয়ের কাছে গেল। আঁজলা ভরে জল পান করল এবং তৃপ্তির সুরে দুজনেই বলল, "আহ-হ!"

দৈত্য এসে হাজির। জিজ্ঞেস করল, "আবার আমার ডাক পড়ল কেন?"

—"আমাদের ছেলেকে এবার ফিরিয়ে দাও। অনেকদিন ধরেই তো ও শিখছে।"

—"আচ্ছা দেখছি ছেলেটা কেমন শিখেছে;" — দৈত্য বলল, "যদি আমি দেখি যে ওর যা শেখার ও ভালোই শিখেছে, তাহলে আমি ওকে নিয়ে আসছি।" এই বলে সে জলের তলায় ডুব দিল।

দৈত্যের ছিল এক মেয়ে। সে ছেলেটাকে বলল, "এই কাটা মুন্ডুগুলো দেখছ? এগুলো সব আমার বাবার ছাত্রদের মুন্ডু। যদি আমার বাবা তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে, তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে কি না, তাহলে তুমি বলবে—হয়নি। যদি হ্যাঁ ব'লো তাহলে তোমারও মুন্ডু কাটা যাবে।"

দৈত্য বাড়িতে এসে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, "এই বাচ্চা বল তো তুই সব শিখে গেছিস, তোর বাবা-মা তোকে নিতে এসেছে।"

—"আমি এখনও সব শিখিনি মাস্টারমশাই।" ছেলেটা বলল। দৈত্য তখন তার ওপর চড়চাপড় চালাতে লাগল আর বলতে লাগল, "বল তুই সব শিখেছিস। বল তুই সব শিখেছিস।"

কিন্তু ছেলেটা শুধুই এক কথা বলে যায়, "না আমি কিছু শিখিনি। আমি কিছু শিখিনি।"

শেষমেশ দৈত্য ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং ছেলেটাকে তার বাবা-মার হাতে তুলে দিল।

ছেলে বলল, "তোমরা এগিয়ে যাও আমি তোমাদের রাস্তায় ধরে ফেলব।"

বাবা-মা কিছু দূর এগিয়ে গেলে ছেলেটা বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে হয়ে গেল একটা কালো ঘোড়া। খটখট করে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে লাগল, বাবা-মাকে পেরিয়ে গেল, তারপর আবার নিজের স্বরূপ ধারণ করে বাবা-মা'র সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বাবা বলল, "আহা রে তুই পিছিয়ে পড়লি? একটা কালো ঘোড়া এইমাত্র আমাদের পেরিয়ে চলে গেল। তুই যদি আমাদের সঙ্গে থাকতিস আমরা ওকে ধরে ফেলতাম।"

বাড়ির দিকে যেতে যেতে ছেলেটা বারবার পিছিয়ে পড়তে লাগল আর কখনও ঘোড়া হল, কখনও হরিণী হল, কখনও হরিণ হল; এরকম নানা প্রাণীর রূপ ধারণ করে বাবা আর মা'র পাশ দিয়ে ছুটে ছুটে যেতে লাগল।

বাড়ি ফিরে সে বাবাকে বলল, "বাবা, শোনো একটা কথা..."

—"কী কথা রে?"

—"এই যে তোমরা দেখলে ঘোড়া, হরিণী, হরিণ আর অন্যান্য জন্তুরা তোমাদের পাশ দিয়ে ছুটে ছুটে গেল ওরা সবাই আসলে আমি।"

—"বলিস কিরে? তুই এতরকম প্রাণীর রূপ ধরতে পারিস?"

—"হ্যাঁ বাবা, এই হল আমার শিক্ষা। এই শিক্ষাকে বলে রূপান্তর। দৈত্যের কাছে আমি এই শিক্ষাই পেয়েছি।"

—"এই শিক্ষা পেয়ে আমাদের কী লাভ হবে?" — বাবা জিজ্ঞেস করল।

—"আমি এখনই একটা ঘোড়ার রূপ ধরছি। তুমি সেই ঘোড়াকে বাজারে বিক্রি করতে পারো। শুধু একটা কথা মনে রাখতে হবে।"

—"কী কথা রে?"

—"তুমি আমাকে বিক্রি করবে কিন্তু আমার লাগামটাকে বিক্রি করবে না। যদি আমার সঙ্গে আমার লাগামটাকেও বিক্রি করে দাও তাহলে আমি আর ফিরে আসতে পারব না।"

এরপর বেশ কয়েকবার ছেলেটা কালো ঘোড়ার রূপ ধারণ করল; তার বাবা তাকে, মানে ওই ঘোড়াকে কয়েকবার হাটে বিক্রি করে পয়সা উপায় করল। সন্ধেবেলা ছেলে আবার বাড়িতে হাজির।

একদিন এক কাণ্ড ঘটল। যথারীতি ছেলে কালো ঘোড়ার রূপ ধরেছে আর বাবা তাকে বিক্রি করতে নিয়ে গেছে হাটে। এমন সময় সেই জলদৈত্যও সেই হাটে এসে হাজির। দৈত্য

একনজরে দেখেই বাবাকে চিনল আবার তার ছেলেকেও চিনল। কিন্তু দৈত্য তখন সাধারণ মানুষের রূপ ধরেছে। বাবা তাকে চিনতে পারল না।

—"ঘোড়াটার জন্যে কত দিতে হবে?"—দৈত্য জিজ্ঞেস করল বাবাকে।

—"দেড়শো স্বর্ণমুদ্রা।" — বাবা বলল।

—"কিন্তু আমি ঘোড়ার সঙ্গে তার লাগামটাকেও কিনতে চাই।"

—"নাহ, লাগাম বিক্রি হবে না।"

—"আপনি যদি ঘোড়াটাকে লাগামশুদ্ধ বিক্রি করেন তাহলে আমি আপনাকে দু'শো স্বর্ণমুদ্রা দেব।"—দৈত্য বলল।

এত টাকার লোভ বাবা সামলাতে পারল না। সে রাজি হয়ে গেল।

জলদৈত্য ঘোড়াটাকে বাড়িতে নিয়ে গেল, একটা খুঁটির সঙ্গে তাকে বাঁধল।

তারপর তার মেয়েকে বলল, "তুই এর ওপর লক্ষ রাখিস। আমি আমার তির-ধনুকটা নিয়ে আসি।"

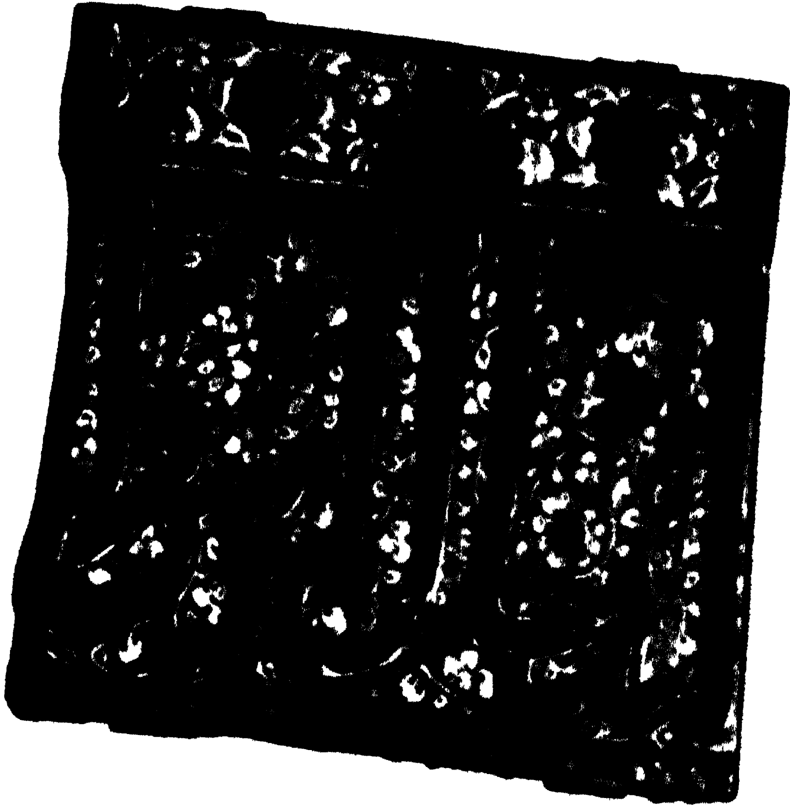
কিন্তু মেয়েটার প্রাণে মায়াদয়া ছিল। সে ঘোড়াটাকে খুঁটির বাঁধন থেকে ছেড়ে দিল। মুক্তি পেয়ে ছেলেটা ঘুঘুপাখির রূপ ধরল এবং উড়ে চলে গেল। জলদৈত্য তখন বাজপাখির রূপ ধরল এবং ঘুঘুকে তাড়া করল।

উড়তে উড়তে ঘুঘু দেখল নীচে এক জায়গায় বিয়ের ভোজ চলছে। সে তখন একটা গোলাপ ফুল হয়ে গেল এবং অতিথিদের ভিড়ে টুপ করে পড়ল। বাজপাখি তখন রূপ ধরল এক চারণ-কবির, তার হাতে একটা বাদ্যযন্ত্র; সে সোজা ঢুকে পড়ল বিয়েবাড়ির অতিথিদের ভিড়ে। গোলাপটা এত সুন্দর, অতিথিরা একে একে সেটা হাতে নিয়ে তার গন্ধ শুঁকছিল। হাত ঘুরে ঘুরে আসতে আসতে যখন সেটা চারণকবির হাতে এসে পড়ল, সে দুই হাতে গোলাপটাকে পিষে ফেলতে চাইল। কিন্তু সেই মুহূর্তে গোলাপটা হয়ে গেল এক মুঠো ভুট্টার দানা এবং ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। একটা ভুট্টার দানা একজন অতিথির জুতোর মধ্যে সেঁদিয়ে গেল। চারণকবি এবার রূপ ধরল একটা মোরগের এবং ভুট্টার দানাগুলো খেয়ে নিতে লাগল। এদিকে অতিথির জুতোর মধ্যে ঢুকে-থাকা ভুট্টার দানা রূপ ধরল এক খ্যাঁকশিয়ালের। সেই খ্যাঁকশিয়াল লাফিয়ে মোরগের ঘাড় কামড়ে ধরল এবং তাকে সাবাড় করে দিল। তারপর খ্যাঁকশিয়াল হয়ে গেল সেই ছেলে। নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে বসে সে মহানন্দে ভোজ খেতে লেগে গেল।

আকাশ থেকে তিনটি আপেল খসে পড়ল। একটি আপেল হল গল্পকারের পুরস্কার। দ্বিতীয় আপেলটি হল এই গল্পের শ্রোতার জন্য। আর তৃতীয় আপেলটি হল সারা পৃথিবীর জন্যে।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

ক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া



তুরস্ক সাইপ্রাস লেবানন ইজরায়েল সিরিয়া ইরাক
ইরান সৌদি আরব কুয়েত কাতার
সংযুক্ত আরব আমিরশাহি প্যালেস্টাইন ওমান ইয়েমেন



জাদুর পাগড়ি

কুলদারঞ্জন রায়

দুই ভাই ছিল, তাদের বাপ মা কেউ ছিল না। বাপ মরবার সময় তাঁর টাকাকড়ি দু-ভাইকে সমান ভাগ করে দিয়েছিলেন। বড়োভাই সেই টাকায় দোকান করে বেশ দু'পয়সা রোজগার করতে লাগল। কিন্তু ছোটোভাই তার টাকাকড়ি দু'দিনে উড়িয়ে দিল বাবুয়ানা করে আর অপব্যয় করে। একদিন ছোটোভাই দেখল, হাত একেবারে শূন্য—খাবে কী? বড়োভাইয়ের কাছ থেকে কিছু চেয়ে আনল, কিন্তু তাও গেল চক্ষের নিমেষে উড়ে! আবার আনল, তাও ওড়াতে দু'দিন বই লাগল না। বড়ো দেখল যে মহামুশকিল! দোকান বিক্রি করে কোথাও চলে না গেলে তাকেও শিগগিরই পথের ভিখিরি হতে হবে। তখন বড়োভাই চুপি চুপি দোকানপাট বিক্রি করে, টাকা সংগ্রহ করল এবং স্থির করল যে, গোপনে মিশরদেশে চলে যাবে। এ দিকে, কী করে জানি এই সংবাদ পেয়ে, ছোটোভাই সেই জাহাজে গিয়ে আগে থাকতে লুকিয়ে চড়ে বসে আছে। বড়োভাই জাহাজে উঠে একেবারে ক্যাবিনের ভিতর—ডেকের উপর আসে না, পাছে তাকে দেখতে পেয়ে ছোটোও এসে হাজির হয়। ক্রমে জাহাজ ছেড়ে দিলে পর, দু'ভাই একসঙ্গে ডেকে এসে উপস্থিত। ছোটোকে দেখে বড়োর বড্ড রাগ হল, কিন্তু তখন আর উপায় কী!

মিশরে পৌঁছে বড়োভাই করল কী, ছোটোকে সমুদ্রের তীরে জিনিসপত্রের কাছে বসিয়ে রেখে গেল গাড়ি আনতে। সেই যে গেল, আর ফিরে এল না। ছোটো বসে বসে নিরাশ হয়ে, শেষে বেরোল দাদার সন্ধানে। সেই শহর থেকে আরম্ভ করে কত দেশ, কত নগর যে সে ঘুরে বেড়াল, কিন্তু কোথাও দাদার সন্ধান পেল না।

ঘুরতে ঘুরতে ছোটো একদিন এক পাহাড়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত। দেখল, সেখানে তিনজন লোক ভারী কোলাহল আরম্ভ করেছে।

কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনজনের মধ্যে বড়োটি বলল—'মশায়! আমরা তিনভাই। বাবা মরবার সময়ে তিনটি জিনিস রেখে গিয়েছেন—একটা পাগড়ি, একটা চাবুক আর একখানা আসন। যে পাগড়িটি মাথায় দেবে, তাকে কেউ দেখতে পাবে না। কেউ আসনটিতে বসে চাবুকটা দিয়ে সপাং করবামাত্র, বিদ্যুৎবেগে যেখানে ইচ্ছা উড়ে যেতে পারে। এখন আমাদের কে পাগড়ি পাবে, কে আসন পাবে আর কে চাবুক পাবে, তাই নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে।'

এই বলে তিনভাই একসঙ্গে বলে উঠল—'মশায়! আমাদের মধ্যে যে কেউ একজনই এই তিনটা জিনিস পাবে। এখন আপনি দয়া করে মীমাংসা করে দিন।'

এই কথা শুনে ছোটো করল কী, একটা গাছের ডাল দিয়ে তিরধনুক বানিয়ে বলল—'দেখো! আমি এই তিরটা ছুঁড়ব। তোমাদের মধ্যে যে ছুটে গিয়ে আগে তিরটা নিয়ে আসতে পারবে—এই তিনটি জিনিসই তার হবে।'

এই বলে সে তির ছুঁড়বামাত্র তিনভাই ছুটে চলল তার উদ্দেশে।

তখন ছোটো ভাবল—'বাঃ, খাসা সুযোগ!'

দাদার কথা ভাবতে ভাবতে চক্ষের নিমেষে সে পাগড়িটি মাথায় দিয়ে আসনে বসেই চাবুক দিয়ে সপাং—আর দেখতে না দেখতে আকাশে উড়ে, মস্তবড়ো এক শহরের দরজায় গিয়ে উপস্থিত।

শহরে ঢুকে সেই দেশের বাদশার এক চাকরের কাছে শুনল—বাদশাজাদি রোজ রাত্রে কোথায় জানি চলে যান, কেউ তার সন্ধান করতে পারে না। তাই বাদশা ঘোষণা করেছেন—যে কেউ সন্ধান করতে পারবে, তাকে তিনি অর্ধেক রাজত্ব দেবেন আর তার সঙ্গে বাদশাজাদির বিয়ে দেবেন।

একথা শুনেই ছোটোভাই বলল—'আমাকে নিয়ে চলো বাদশার কাছে। আমি বলে দেব বাদশাজাদি কোথায় যান। যদি না পারি, তবে আমার গর্দান দেব।'

চাকর তখনই তাকে বাদশার কাছে নিয়ে গেল।

বাদশাও হুকুম করলেন—'যাও তবে, বাদশাজাদির ঘরের দরজার কাছে গিয়ে রাত্রে শুয়ে থাকো আর পাহারা দাও। খবরদার! ঘুমিয়ে পড়লেই কিন্তু কাল তোমার মাথা কাটা যাবে!'

রাত্রে সেই অপব্যয়ী ভাই গিয়ে বাদশাজাদির ঘরের দরজায় ঘুমের ভান করে শুয়ে রয়েছে। গভীর রাত্রে বাদশাজাদি ভাবলেন—লোকটা হয়তো এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।



দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, সত্যি তাই। তবু, ভালো-করে পরীক্ষা করবার জন্য করলেন কী, বেরিয়ে এসে একটা ছুঁচ নিয়ে তার পায়ের তলায় খোঁচা মারলেন। কিন্তু তবু সে কোনো সাড়া দিল না দেখে, একটা বাতি নিয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ছোটোভাই চোখ পিটপিট করে সব দেখছিল, তখনই সে পাগড়িটা মাথায় দিয়ে চট করে উঠেই বাদশাজাদির পিছনে পিছনে চলল। প্রাসাদের বাইরে এসেই দেখে, এই-বড়ো এক দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে—তার মাথায় একটা সোনার ঝুড়ি, তার মধ্যে বাদশাজাদি বসে রয়েছেন।

ছোটোভাই তখনই এক লাফে সেই ঝুড়িতে গিয়ে বসেছে—আর একটু হলেই ঝুড়ি উলটে পড়েছিল আর কী।

দৈত্য আশ্চর্য হয়ে বলল—'করছেন কী বাদশাজাদি!'

বাদশাজাদি বললেন—'কই, আমি তো নড়িচড়িনি, চুপ করেই তো বসে আছি।'

ছোটো মাথায় পাগড়ি পরে আছে, কাজেই কেউই তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

দৈত্য কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই দেখল যে, ঝুড়িটা বড্ড ভারী লাগছে। বলল—'বাদশাজাদি! রোজ তো আপনাকে বয়ে নিয়ে যাই, এত ভারী তো লাগে না? আজ মনে হচ্ছে যেন আপনার ভারে চুরমার হয়ে গেলাম!'

যা হোক, দৈত্য ঝুড়ি মাথায় করে, মুহূর্তের মধ্যে এক আশ্চর্য বাগানে গিয়ে উপস্থিত। বাগানের গাছ আর ডালপালা সবই রুপো আর হিরের তৈরি। ছোটোভাই গাছের একটা ডাল ভেঙে নিয়ে পকেটে রেখে দিল।

ডাল ভাঙতেই গাছগুলি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে—'হায় রে হায়। আজ পৃথিবীর মানুষ আমাদের ডাল ভাঙলে!'

দৈত্য আর বাদশাজাদি দুজনেই অবাক। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারলে না, ব্যাপারটা কী।

আর কিছুদূর গিয়ে আর একটা বাগান, তার গাছগুলি সোনা আর দামি পাথরের তৈরি। সে গাছেরও একটা ডাল ভেঙে ছোটো পকেটে রাখল।

গাছগুলি বেদনায় অস্থির হয়ে বলতে লাগল—'হায় রে হায়! আজ মানুষের হাতে দুঃখ ভোগ করতে হল।'

তা শুনে দৈত্যের অবস্থা এমনি হল যে, তার মুখ দিয়ে আর কথা সরে না।

বাগান পার হয়ে একটা পোল, সেটা পার হয়ে এক প্রাসাদ—তার দরজায় শত শত দাসদাসী বাদশাজাদির জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনি দৈত্যের মাথা থেকে নামতেই, তারা মণিমুক্তার কাজকরা একজোড়া চটি এনে দিল। অপব্যয়ী ছোটোভাই তখনই একপাটি চটি নিয়ে পকেটে পুরেছে। অন্য পাটি পরে বাদশাজাদি আর একখানা খুঁজে কিছুতেই পেলেন না। একেবারে নিরুদ্দেশ। রাগে গজগজ করতে করতে তিনি প্রাসাদে ঢুকলেন, ছোটোও তাঁর পিছন পিছন ঢুকল—মাথায় পাগড়ি পরে, হাতে আসন ও চাবুক নিয়ে।

বাদশাজাদি একটা ঘরে গিয়ে দেখলেন—দৈত্যের রাজা বসে আছেন।

সে কী যেমন তেমন দৈত্য! বাপরে, কী ভীষণ চেহারা! ঠোঁটদুটো যেন আকাশপাতাল জুড়ে রয়েছে। বাদশাজাদি তার কাছে গিয়ে বসতেই, দাসী হিরের কাজ-করা পেয়ালাতে করে শরবত নিয়ে এল। বাদশাজাদি হাত বাড়িয়ে শরবতের পেয়ালা নিতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে ছোটো দাসীর হাতে মারল এক থাবড়া। আর পেয়ালা মাটিতে পড়ে চুরমার। ছোটো সেই ভাঙা পেয়ালার একটুকরো নিয়ে পকেটে পুরল।

বাদশাজাদি এই পেয়ালা ভাঙা দেখে ভারী ব্যস্ত হলেন আর রাজাকে বললেন—'আজকের দিনটাই অলক্ষুনে। আমি আর শরবত খাব না, আর কিছুই খাব না, এখনই চলে যাব।'

দৈত্যরাজ বুঝিয়েসুঝিয়ে তাঁকে ঠান্ডা করে চাকরদের বললেন খানা ঠিক করতে। টেবিল পাতা হল, খাবার সাজানো হল।

দৈত্যরাজ ও বাদশাজাদি খেতে বসলেন। তাঁরা খাচ্ছেন, আর ছোটোভাই কি শুধু চেয়ে দেখবে? তারও তো খিদে পেয়েছিল, কাজেই সেও ডিশের পর ডিশ সাবাড় করতে লাগল। কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না, অথচ কে জানি সব খাবার খেয়ে ফেলছে।

দৈত্যরাজ ও বাদশাজাদি তখন বুঝতে পারলেন যে, টেবিলে একজন তৃতীয় ব্যক্তি আছে, অদৃশ্য এক অতিথি—তখন ভয়ে তাঁদের জ্ঞান লোপ পাবার মতো হল।

দৈত্যরাজ তখনই সর্দার চাকরকে ডাকলেন, যে বাদশাজাদিকে রোজ মাথায় করে আনত,

আর বললেন—'এখনই বাদশাজাদিকে বাড়িতে দিয়ে এসো।'

এই সময়ে ছোটোভাই করল কী, তলোয়ার নিয়ে দৈত্যরাজের গলায় এক কোপ—আর তখনই তার মাথাটা গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

প্রাসাদে হুলুস্থুল ব্যাপার লেগে গেল—সর্বনাশ হয়েছে!

হায় হায়! আমাদের দৈত্যরাজকে মানুষে কেটে ফেলেছে!

ছোটোও তখন আসনে বসেই চাবুক নিয়ে সপাং। বাদশাজাদি বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন, ছেলেটি ঠিক ঘরের দরজায় শুয়ে আছে, ঘুমে যেন অচেতন।

দেখে তাঁর বড়ো রাগ হল, বললেন—'লক্ষ্মীছাড়া। তোমার জন্যই না আজ এতসব কাণ্ড হয়েছে।' .... ছুঁচ দিয়ে তার পায়ের তলায় আবার এক খোঁচা।

খোঁচা খেয়েও যখন সে চুপ করে রইল, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, সে সত্যি সত্যি ঘুমোচ্ছে।

পরদিন অপব্যয়ী ভাইকে বাদশার কাছে নিয়ে গেলে পর, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'কি হে, সন্ধান পেলে কিছু, রাত্রে বাদশাজাদি কোথায় চলে যান?'

'হাঁ হুজুর। পেয়েছি বই-কি। তবে আমার একটা অনুরোধ আছে। রাজ্যের সব লোক একত্র করুন, সকলের সাক্ষাতে আমি বলব।'

ছোটোভাই ভেবেছিল যে, রাজ্যের সব লোক একত্র হলে, তার মধ্যে নিশ্চয় সে তার দাদাকে পাবে।

বাদশার হুকুমে প্রাসাদের সমুখের প্রকাণ্ড মাঠে রাজ্যের লোক সব এসে জড়ো হল। উঁচু বেদিতে বাদশা মেয়েকে নিয়ে বসলেন। বেদির কাছে দাঁড়িয়ে ছোটোভাই প্রথম থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ঘটনা বলল।

বলা শেষ হলে বাদশাজাদি বললেন—'না বাবা, সব মিছে কথা বলছে, একটাও সত্যি না।'

একথা শুনে ছোটোভাই পকেট থেকে মণি-মুক্তোর ডাল, একপাটি জরির চটি আর পেয়ালার টুকরো বার করে দেখাল। তারপর যেই দৈত্যরাজার মৃত্যুর কথা বলছে, এমন সময় হঠাৎ চেয়ে দেখল, জনতার মাঝে তার দাদা রয়েছেন।

আর কথাটি নাই, ছুটে গিয়ে সে দাদাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

দাদাকে বাদশার কাছে নিয়ে এসে বলল—'দোহাই বাদশা, আপনার প্রতিজ্ঞা রাখুন, আমার দাদাকে অর্ধেক রাজত্ব দিন আর তাঁর সঙ্গে বাদশাজাদির বিয়ে দিন। আমি কিছু চাই না। আমার পাগড়ি, আসন আর চাবুক আছে। তাই নিয়ে বেশ দিন কেটে যাবে। আমি শুধু চাই যে, চিরজীবন যেন দাদার কাছে থাকতে পারি।'

দৈত্যরাজার মৃত্যুসংবাদ শুনে বাদশাজাদি ভারী খুশি হলেন। এই হতভাগা দৈত্য তাঁকে জাদু করেছিল। সেই জাদুর বশ হয়েই তিনি রোজ রাত্রে দৈত্যের চাকরের মাথায় চেপে দৈত্যপুরীতে যেতেন। দৈত্যের মৃত্যুতে জাদু ভেঙে গিয়েছে। এখন তিনি বুঝতে পারছেন,

হতভাগা দানবকে আসলে তিনি কী ভীষণ ঘৃণা করতেন। জাদু থেকে মুক্ত হয়ে বাদশাজাদি এতই খুশি হলেন যে, ছোটোভাইয়ের অনুরোধে তার দাদাকে বিয়ে করতে তিনি তখনই রাজি হলেন।

শুভদিনে বড়োভাইয়ের সঙ্গে বাদশাজাদির বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের যৌতুক স্বরূপ বাদশা জামাতাকে অর্ধেক রাজত্ব দিলেন। ছোটোভাইয়ের সুখের সীমা নাই—এখন সে মনের আনন্দে সব সময়ে দাদার সঙ্গে থাকতে পারবে আর মাঝে মাঝে পাগড়ি মাথায় দিয়ে আসনে বসে চাবুকটা সপাং না করেও ছাড়বে না।

ছবি। শঙ্কর বসাক



অতি লোভের সাজা

কুলদারঞ্জন রায়

দামাসকাস্ নগরে হাসান নামে একটি যুবক ছিল—সে যেমন সুপুরুষ তেমনি গুণবান, আর তার স্বভাবটি ছিল তেমনই মিষ্টি! বিশেষত বাঁশি বাজাইতে এবং গান গাহিতে হাসানের তুল্য আর কেহই নিপুণ ছিল না। সে জন্য ডামাস্কাস্ নগরের সকলেই তাহাকে খুব ভালোবাসিত। হাসানদের পরিবারে সে নিজে, তাহার পিতা এবং বিমাতা এই তিনটি প্রাণী। পিতা হাসানকে একটি মনোহারী দোকান করিয়ে দিয়াছিলেন—সেই দোকানের আয় দ্বারাই তাহাদের সংসার চলিত। নগরের মান্যগণ্য লোকেরা তাঁহাদের দরকারি জিনিসপত্রের জন্য, হাসানের দোকান ছাড়া অন্যত্র যাইতেন না। শুধু তাহাই নহে, জিনিস কিনিতে আসিয়া সকলে হাসানের মিষ্ট ব্যবহারে এবং তাহার গান ও বাঁশি শুনিয়া এমনই খুশি হইতেন যে, সকলেই ক্রীত জিনিসের তিন চারি গুণ মূল্য দিতেন। এইরূপে হাসানের পিতা গুণবান পুত্রের কল্যাণে বেশ দুপয়সা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

একদিন পদ্মনাভ নামে এক ব্রাহ্মণ হাসানের দোকানে আসিলেন। হাসানের স্বভাবে এবং তাহার গান শুনিয়া ব্রাহ্মণের মন গলিল, এবং যাইবার সময় তিনি তাহার হাতে দুইটি টাকা দিয়া তাহাকে অনেক আশীর্বাদ করিয়া গেলেন। তখন হইতে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন হাসানের

দোকানে আসিয়া তাহার গান বাঁশি শুনেন আর দুইটি করিয়া টাকা দিয়া চলিয়া যান।

এই ভাবে কিছুদিন গেলে পর, হাসান তাহার পিতার নিকট ব্রাহ্মণের কথা বলিল। শুনিয়া বৃদ্ধ যেমন বিস্মিত হইলেন, তেমনি তাঁহার মনে সন্দেহও হইল। পুত্রকে বলিলেন—"বাবা! আমার বোধ হয় ব্রাহ্মণের মনে কোনো দুষ্ট মতলব আছে, নতুবা রোজ কেন সে মিছামিছি তোমাকে টাকা দিয়ে যায়? যাহোক্ ব্রাহ্মণ আবার এলে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে বোলো। আরো বোলো যে, তিনি আমার বাড়িতে এলে আমি খুব খুশি হব। তাঁর সঙ্গে আমি কথাবার্তা বললেই, তাঁর মতলব বুঝতে পারব।"

পরদিন ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ হাসানের দোকানে আসিলে, হাসান তাঁহাকে পিতার অনুরোধ জানাইল। ব্রাহ্মণ রাজি হইলেন, হাসান তাঁহাকে পিতার নিকট লইয়া গেল। হাসানের পিতা ক্ষণকাল পদ্মনাভের সহিত আলাপ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মনে কোনো দুরভিসন্ধি নাই। অধিকন্তু, পদ্মনাভের ভদ্রতা ও উদারতা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মহাশয়! আমার নাম পদ্মনাভ, আমি বিদেশি লোক—কোনো বিশেষ কাজে এখানে আমাকে আসতে হয়েছে এবং কিছুদিন আমাকে এই নগরে থাকতে হবে।" ইহা শুনিয়া হাসানের পিতা মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তা যদি হয়, তবে দয়া করে আমার বাড়িতে এ কয়দিন থাকুন, আপনার কোনো রকম কষ্ট হবে না আপনার সেবা করে আমরা ধন্য হব।" পদ্মনাভ সন্তুষ্টচিত্তে এই প্রস্তাবে রাজি হইলেন।

হাসানের ও তাহার পিতার সেবাযত্নে পদ্মনাভ পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গেলে পর, একদিন পদ্মনাভ গোপনে হাসানকে বলিলেন—"বৎস হাসান! তোমার স্বভাবে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি কতগুলি গুপ্তবিদ্যা জানি, সেই সব বিদ্যা তোমাকে শিখিয়ে দিব, আর তোমাকে সকলের চেয়ে ধনী করে সুখী করব, তাই আমার ইচ্ছা। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তবে কতগুলি গুপ্তধন তোমাকে আমি দান করব।"

হাসান বলিল—"মহাশয়! আপনি আমাকে খুব স্নেহ করেন, আমার উপকার করাই আপনার ইচ্ছা তা আমি বেশ জানি। কিন্তু পিতার অনুমতি না নিয়ে আমি কী করে যাব?" তখন পদ্মনাভ হাসানের পিতাকে সব কথা বলিলে, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিলেন। হাসান মহাখুশি হইয়া পদ্মনাভের সহিত যাত্রা করিল।

ক্রমে তাঁহারা নগর পার হইয়া জনশূন্য এক প্রান্তরে উপস্থিত হইলে, হাসান দেখিল, সম্মুখে একটি অতি পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকা। অট্টালিকার নিকটেই একটি প্রাচীন কূপ। পদ্মনাভ বলিলেন—"বৎস! এই কুয়ার মধ্যে অতুল গুপ্তধন আছে, সমস্ত তোমাকে দান করব।" হাসান বলিল—"কুয়া যে দেখ্‌ছি জলপূর্ণ, কী করে নাম্‌ব?"

পদ্মনাভ বলিলেন—"বৎস! বিস্মিত হয়ো না, ঐশী শক্তির বলে সব কাজই সিদ্ধ হয়।" এই বলিয়া পদ্মনাভ একখণ্ড কাগজে একটি মন্ত্র লিখিয়া কুয়ার জলে ফেলিবামাত্র, জল শুকাইয়া গেল। হাসান দেখিল, কুয়ার মধ্যে সুন্দর সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে। তখন পদ্মনাভ হাসানের সহিত সেই সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। কিছুদূর গেলে পর প্রকাণ্ড তামার কপাট দেখা গেল। পদ্মনাভ আবার কাগজে মন্ত্র লিখিয়া কপাটে ছোঁয়াইলেন, কপাট খুলিয়া গেল। সেই দরজা দিয়া দুইজনে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই দেখিলেন—বিকটাকার একটা



বিদ্‌ঘুটে কালো লোক প্রকাণ্ড পাথর হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই তো ভয়ে হাসানের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু পদ্মনাভ বিড়বিড় করিয়া একটা মন্ত্র পড়িলেন, আর তখনই সেই বিকটাকার লোকটা অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

পদ্মনাভ হাসানকে লইয়া সেই ঘর পার হইলেন। পার হইয়া আর একটা ঘরের দরজায় উপস্থিত হইলে দেখা গেল, ভীষণ দুইটা বাঘ দরজায় প্রহরী, তাহাদের মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে আগুন বাহির হইতেছে! পদ্মনাভ আবার একটা মন্ত্র পাঠ করিবামাত্র, বাঘ দুইটা অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি হাসানকে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেই ঘরে রাশি রাশি রত্ন, ঘরের মধ্যখানে প্রকাণ্ড একটা চুনীপাথর, তাহা যেন সূর্যের মতো জ্বলিতেছে। সেই ঘর পার হইয়া তাঁহারা আর একটি ঘরে গেলেন। সেই ঘরের মধ্যে হীরা, মতি, চুনী, পান্না, মণি, মুক্তা, সোনা রূপা স্তূপাকারে সাজানো রহিয়াছে। আর একটা রূপার সিন্দুকের মধ্যে এক রাজার মৃতদেহ!

হাসান অবাক হইয়া সমস্ত দেখিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়! সিন্দুকের মধ্যে যে মৃতদেহ দেখছি, ইনি কে?" পদ্মনাভ বলিলেন—"ইনি পূর্বে মিশরদেশের রাজা ছিলেন। ইনি অনেক রকম গুপ্তবিদ্যা জানতেন এবং সেই বিদ্যার বলে এই নির্জন স্থানটিতে সোনার পুরী তৈরি করেছিলেন। এই অগাধ ধনরাশি তাঁহারই বিদ্যাবলে সঞ্চিত; আর ওই যে পশ্চিম দিকে কালো রঙের মাটি সঞ্চিত দেখছ, এই মাটির গুণের কথা শুনলে

বিস্ময়ের সীমা থাকবে না। ঘরের কোণে ওই যে রূপার পাত্রগুলি দেখছ, তাতে পরিষ্কার টলটলে জল আছে। খানিকটা এই কালো মাটি এই জলে ভিজিয়ে রাখলে, একটু পরেই সব সোনা হয়ে যায়। যে কোনও সামান্য পাথরে এই মাটি ছোঁয়ালে পর, তা মহামূল্য পাথর হয়ে যাবে। বৎস! এই মাটি যদি খানিকটা নিয়ে যাও, তবে সমস্ত মিশর দেশটা হীরায় মুড়িয়া দিতে পারবে। এই মাটির আরো গুণ এই যে—যে কোনও রোগী হোক না কেন, এই মাটি খেলে তৎক্ষণাৎ তার রোগ দূর হয়। আর এই মাটির প্রলেপ চোখে লাগালে পৃথিবীর সমস্ত দৈত্য দানব তার বশীভূত হয়। বৎস! এখন ভেবে দেখ, আমি তোমাকে কত ধনের অধিকারী করলাম।"

হাসান আনন্দে নাচিয়া উঠিয়া পদ্মনাভকে বলিল—"প্রভো! আপনার দয়ার সীমা নাই। এখন যদি অনুমতি করেন, তবে এই ধনের কিঞ্চিৎ নিয়ে গিয়ে মা বাবাকে সুখী করতে পারি।" পদ্মনাভ সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিলেন।

তখন হাসান পদ্মনাভকে অনেক ধন্যবাদ করিয়া, ইচ্ছামতো নানা রকম রত্ন গ্রহণ করিল। তারপর পদ্মনাভ তাহাকে লইয়া কুয়া হইতে উঠিয়া আসিলেন। তখন হাসান মহা বিস্মিত হইয়া দেখিল, যে, আবার কুয়াটি জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ইহার পর পদ্মনাভ হাসানকে লইয়া নগরে ফিরিয়া আসিলেন। হাসানের নিকট সেই অমূল্য রত্নসকল দেখিয়া, তাহার জনকজননীর আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। তখন হইতে মনোহারী দোকান তুলিয়া দিয়া, হাসান পিতামাতার সহিত পরমসুখে বাস করিতে লাগিল।

বিমাতাকে হাসান আপন মায়ের মতো ভালোবাসিত, শ্রদ্ধাভক্তি করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার বিমাতা ছিলেন ভারী দুষ্ট স্ত্রীলোক। হাসান যে ধন আনিয়াছিল তাহা দ্বারা তাহারা আজীবন পরমসুখে থাকিতে পারিত। কিন্তু বিমাতার মনে দারুণ লোভের সঞ্চার হইল। তিনি একদিন হাসানকে নির্জনে ডাকিয়া বলিলেন—"বাছা, হাসান! তুমি অগাধ ধন এনেছ, তা ঠিক! কিন্তু ক্রমাগত খরচ করতে করতে সে ধন আর কত দিন থাকবে? যাহোক, আমি তোমার ভালোর জন্য একটা যুক্তি ঠিক করেছি—শুন। পদ্মনাভ তোমাকে পুত্রের চাইতেও বেশি স্নেহ করেন। তুমি তাঁর কাছ থেকে সমস্ত বিদ্যা শিখে নাও। তারপর তাঁকে কোনও রকমে মেরে ফেলতে পারলে আর আমাদের চিন্তার কারণই থাকবে না। তখন ইচ্ছামতো যখন খুশি গিয়ে কুয়ার ধন নিয়ে আসতে পারব। মানুষ তো আর চিরদিন কেউ বেঁচে থাকবে না? পদ্মনাভও বৃদ্ধ হয়েছেন—এই বেলা একটা কিছু ব্যবস্থা করে রাখাই মঙ্গল।"

বিমাতার দুরভিসন্ধি শুনিয়া হাসানের চক্ষু স্থির হইয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল—"মা! আপনি এমন জঘন্য কথা আর মুখে আনবেন না। আমি যে ধন এনেছি, রাজাব ভাণ্ডারেও তা আছে কি না সন্দেহ। আর যদি এ ধন ফুরিয়েও যায়, তাতেই বা চিন্তার কারণ কী? আমি বলবামাত্র ব্রাহ্মণ আমাকে আবার সেখানে নিয়ে যাবেন, আমি ইচ্ছামতো ধন আনতে পারব। আপনি কখনও এরূপ লোভ করবেন না। যিনি রাতদিন আমার মঙ্গল কামনা করেন, যাঁর কল্যাণে অগাধ ধন পেয়ে আমরা পরমসুখে আছি—তাঁকেই মেরে

ফেলতে পরামর্শ দিচ্ছেন? আমাদ্বারা এরূপ জঘন্য পাপ কাজ কখনই হবে না।"

কিন্তু হায়! বিমাতা হাসানকে নানা রকম যুক্তি দেখাইয়া, শেষে তাহাকে এমনই মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন যে সাধু-হৃদয় হাসানের মনেও দারুণ লোভের সঞ্চার হইল, সে বিমাতার পরামর্শে সায় না দিয়া আর পারিল না। তখন সে ধীরে ধীরে পদ্মনাভের নিকটে গিয়া তাঁহার গুপ্তবিদ্যা শিক্ষার প্রার্থনা জানাইল। বলা বাহুল্য, প্রার্থনা করামাত্র পদ্মনাভও সম্মত হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই হাসান পদ্মনাভের সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিল। তখন তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। হাসান পদ্মনাভের সমস্ত বিদ্যা শিখিয়াছে শুনিয়া, পাপীয়সী বিমাতা ভারী খুশি হইলেন।

তারপর একদিন হাসান, পিতা ও বিমাতার সহিত সেই গুপ্ত-ধনাগারে যাত্রা করিল। কুয়ার নিকটে গিয়া হাসান মন্ত্র-লেখা কাগজ জলে ফেলিবামাত্র, কুয়ার জল শুকাইয়া গেল। তখন সিঁড়ি দিয়া তিনজনে নীচে নামিলেন। সেই তামার কপাটের নিকট উপস্থিত হইয়া হাসান মন্ত্র উচ্চারণ করিলে পর, কপাট খুলিয়া গেল। সকলে যেমন ঘরে ঢুকিয়াছেন, অমনি সেই বিকটাকার কালো লোকটি পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল এবং হাসানও মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র সে একেবারে অজ্ঞান!

ঘরে ঢুকিবামাত্র সেই ভীষণ দুই বাঘ মহা গর্জন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। হাসান আবার মন্ত্র উচ্চারণ করিলে পর বাঘ দুটিকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন আর কথা কী? তিনজনে মিলিয়া রাশি রাশি নানা রকমের রত্ন সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এক একজনের পুঁটুলি গুরুতর ভারী হইল। অবশেষে অতি কষ্টে পুঁটুলি মাথায় লইয়া তিন জন ঘর হইতে বাহির হইবেন, এমন সময় অতি ভয়ংকর তিনটি মহা বলবান দৈত্য তাঁহাদিগের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল!

ভয়ে হাসানের শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দৈত্য বশ করিবার মন্ত্র তো সে শিখে নাই—এখন উপায়? এখন জোড় হস্তে দৈত্যের স্তব করা ভিন্ন আর উপায় কী আছে? কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হইল না দেখিয়া হাসান বিমাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিল— "পাপীয়সী! তোর পরামর্শে পড়েই এই বিপদগ্রস্ত হয়েছি। নিশ্চয় পদ্মনাভ আমাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে, আমাদের মারবার জন্য এই দৈত্য পাঠিয়েছেন।"

এই সময়ে হঠাৎ গম্ভীর স্বরে দৈববাণী হইল—"অকৃতজ্ঞ নরাধম! তোকে পুত্রের সমান ভালোবেসে আমার সব বিদ্যা শিখিয়েছিলাম। তার প্রতিদানে, আমাকে মেরে এই অতুল ধন ভোগ করবি ভেবেছিলি—এখন তার ফল ভোগ কর। বিদ্যাবলে তোদের দুষ্ট মতলব জানতে পেরে আমিই এই দৈত্য পাঠিয়েছি, তোদের সাজা দেবার জন্য।"

এই দৈববাণী শেষ হইবামাত্র, দৈত্যেরা তিন জনেরই প্রাণ বধ করিল।

ছবি। শঙ্কর বসাক



সুলতানের দাওয়াই

বিমান ঘোষরায়

অনেক দিন আগে তুরস্কদেশে এক সুলতান বাস করত যে নাকি অসম্ভব খেতে ভালোবাসত। দিনের মধ্যে সাতবার আটবার করে সে খালি খেতই। মন্ডা, মেঠাই, কালিয়া, কাবাব, মাংস, পোলাও, চাটনি, খেজুর, শরবত, সারাদিনে কত কিছু যে খেত সে তা বলে শেষই করা যাবে না। রকমারি বিভিন্ন সব খাবারের পাহাড় সাজিয়ে সুলতান যখন খেতে বসত তখন সে দৃশ্য ছিল সত্যিই দেখবার মতো। সুলতান গান শুনতে শুনতে, নাচ দেখতে দেখতে, পাখার হাওয়া খেতে খেতে নানারকম সুখাদ্য ধীরে ধীরে পেটের মধ্যে চালান করে দিত। সুলতানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। তোশাখানায় তার দৌলতের অন্ত নেই। সুতরাং দামি দামি খাবারের কোনোদিন তার অভাব হত না।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে সুলতান প্রত্যেকদিন ধীরে সুস্থে দাঁড়িপাল্লার ওপর এসে বসত। তার ওজন নিয়মিত বাড়ছে দেখে সুলতানের মনে পুলকের সীমা থাকত না। তার এক আজীব ধারণা ছিল, যতই সে মোটা আর ভারী হবে ততই তার তাগদ বাড়বে ও চেহারায় চেকনাই খুলবে। এদিকে মোটা হতে হতে সুলতানের চেহারাটি হল ঠিক কুমড়োর মতোই।

শেষে তো সুলতান একদিন দাঁড়িপাল্লার দড়ি ছিঁড়ে দড়াম করে পড়েই গেল মাটির ওপর। পড়ে গিয়ে ভারী শরীরে দারুণ ব্যথা পায় সে। কোমরে এমন সাংঘাতিক চোট লাগে যে দাঁড়াতে ভীষণ কষ্ট হয় তার।

অবশ্য দাঁড়িপাল্লার দড়িটা যে একদিন ছিঁড়বে সুলতানের তা আগেই বোঝা উচিত ছিল। কারণ ইতিমধ্যেই তার শরীরের বিষম চাপে সিংহাসনেই ফাটল ধরে গিয়েছিল এবং সেই ফাটল প্রতিদিনই একটু একটু করে বাড়ছিল। সুলতানের আদেশে যদিও আরেকটা আরও শক্ত, দামি ও মজবুত সিংহাসনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না সেটা তৈরি হয়ে আসে ততদিন পর্যন্ত সুলতানকে এই ফাটলধরা সিংহাসনেই বসতে হচ্ছিল। এবং তখতেরই হাল যখন এই, তখন দাঁড়িপাল্লার রশির অবস্থা কত আর ভালো থাকবে? অতএব সুলতানের উচিত ছিল পাল্লার রশি পালটানোর কথা ভাবা। কিন্তু সুলতান আর সে সব হিসেব কষেনি। চব্বিশ ঘণ্টা কেবল খেতেই যে ব্যস্ত সে আর কখন কষবে ও-সব হিসেবনিকেশ?

এদিকে দেহের প্রচণ্ড চাপে সুলতানের দামি দামি পোশাকের সেলাই খুলে যায়, পিরানের বোতাম ছিঁড়ে যায়, কামিজ ফেঁসে যায়, ফতুয়া ফেটে যায়। কেলেঙ্কারি কাণ্ড। দিন গেলেই দর্জিরা সুলতানের জন্য নতুন নতুন মাপের পোশাক তৈরি করে আনে। আবার সেগুলো ফেঁসে যায়।

সুলতান এবার পরিষ্কার বুঝতে পারে যে খুব বেশি রকম মোটা হয়ে গেছে সে। ফুলতে ফুলতে এমন কুমড়োপটাশের মতো চেহারা হয়েছে তার যে চলাফেরা তো দূরের কথা, বসতে কিংবা শুতে পর্যন্ত তার ভীষণ তকলিফ হচ্ছে আজকাল।

অতঃপর সুলতানের আদেশে তার রাজ্যের প্রধান উজির ঘোষণা করে দেয়, যে হেকিম সুলতানকে চিকন ও সুঠাম করে দিতে পারবে, বিস্তর ইনাম পাবে সে।

ইনামের ঘোষণা শুনে তামাম রাজ্যে যত হেকিম ছিল তারা সুলতানের দরবারে এসে ভিড় করে।

প্রথম হেকিম সুলতানকে বলে, হুজুর, আপনি ভারী খানা বিলকুল বাতিল করে দিন। এখন থেকে ফল মেওয়া ছাড়া আর আপনি কিচ্ছু খাবেন না।

সুলতান ভাবে, দেখাই যাক না। সাতদিন ধরে খালি ফলই খাবে ঠিক করে সুলতান। সকালে ঘুমের থেকে উঠে সে ফল খায়, দুপুরে ফল খায়, বিকেলে ফল খায়, রাত্রে ফল খায়। তারপর প্রচণ্ড খিদের জ্বালায় যখন নাকি সে চোখে সর্ষেফুল দেখে তখন সে ফল খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে খায় বিরিয়ানি, জালেবি আর বাদশাহি হালওয়া। এক সপ্তাহের পর সুলতানের ওজন নিয়ে দেখা গেল যে তার ওজন আরো বেড়ে গেছে। বিষম রাগ হয় তার। প্রচণ্ড হুংকার ছাড়ে সুলতান। হুকুম দেয়, এ হেকিমকে কয়েদখানায় ভরে রাখ। আর হতভাগাকে ফল ছাড়া আর কিচ্ছু খেতে দিবি না।

এবার দ্বিতীয় হেকিম সুলতানকে বহুৎ সময় ধরে পরীক্ষা করে বলে, জাঁহাপনা, সারাদিনে



আপনি শরবত ছাড়া কিচ্ছু খাবেন না। আর মেহেরবানি করে শরবতের মধ্যে শক্কর না দিয়ে স্রিফ একটু নিমক দিয়ে নেবেন।

হেকিমের কথামতো সুলতান সাতদিন ধরে স্রিফ নিমক শরবত খায়। সকালে শরবত, দুপুরে শরবত, বিকেলে শরবত, রাত্রে শরবত। এদিকে শরবত খেয়ে সুলতানের খিদে কিছুতেই আর মেটে না। তখন সুলতান খেত পোলাও, কোফ্‌তা, কোর্মা আর তার অতি প্রিয় কিশমিশ দেয়া ঘি-জবজবে বাদশাহি হালওয়া, পরোটা আর দরবেশ। সাতদিন পর ওজন নিয়ে দেখা গেল সুলতানের ওজন যথারীতি বেড়ে গেছে। সুলতানের হুকুমে দ্বিতীয় হেকিমকেও হাজতে আটক করে রাখা হয় এবং সারাদিন তার বরাতে জোটে স্রিফ নিমক শরবত!

আরও যে কত হেকিম আসে সুলতানের দরবারে। কেউ বলে, সুলতানকে নিয়মিত খেল্‌-কুদ করতে হবে। কেউ বলে, তেলমালিশ দিতে হবে প্রতিদিন সকালে বিকেলে। আবার কেউ বলে, নিদ থোড়া কমিয়ে দিলেই সুলতানের গায়ের গত্তি হালকা হয়ে যাবে। এইরকম কত হেকিম যে কতরকম দাওয়াইয়ের সুপারিশ করে তার শেষ নেই। কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হয় না। এইভাবে চল্লিশজন হেকিম সুলতানকে রোগা করার দাওয়াই বাতলাতে এসে হাজতবাস করতে থাকে। আর এদিকে সুলতান ফুলেফেঁপে আরো ঢোল হয়।

হাঁটতে চলতে এখন অন্যের মদত না পেলে আর তার চলে না।

একদিন সুলতান সিংহাসনের ওপর বসে মজাসে তরমুজ খাচ্ছিল। তরমুজের মিষ্টি রস দুই হাতের দুই কনুই বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল দরবারখানার মেঝের ওপর। সুলতান বেশ বিরক্তই। এমন সময় দরবারখানার খিড়কির দিকে নজর পড়তে দেখে সড়ক দিয়ে হেঁটে চলছে ভারী তাগদওয়ালা জোয়ান মর্দ এক লোক। তার ঘাড়ের ওপর রাজ্যের বোঝা চাপানো। কিন্তু সেই বোঝা ঘাড়ে নিয়েও কেমন অক্লেশে হেঁটে চলেছে মজদুর লোকটি।

সুলতান হুংকার ছাড়ে, ওরে, কে আছিস, ডাক ওই মজদুর ব্যাটাকে।

তৎক্ষণাৎ মজদুরকে ধরে নিয়ে আসে সুলতানের পেয়াদা। সে বেচারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সুলতানের দরবারে এসে ঢোকে। ঘাবড়েটাবড়ে গিয়ে কুর্নিশ করতেই ভুলে যায় বেচারা। সুলতানের উজির-ই-আজম বলে, অনেক মোট তো বইতে পারিস দেখছি তুই। এখন নিয়ে যা তো আমাদের সুলতানকে কাঁধে করে গোসলখানা। ওখানে ওজু করিয়ে নিয়ে যা তারপর সুলতানকে বিছানায়। শুইয়ে দে মালিককে, বুঝলি?

মজদুর ইতিমধ্যেই তার ইয়ার-দোস্তদের মুখে সুলতানের সম্পর্কে গল্প শুনেছিল বিস্তর। চল্লিশজন হেকিমের হাজতবাসের কথাও তার অজানা নয়। সে ভাবল, কে জানে, তার বরাতেও হাজতবাসই লেখা আছে হয়তো। তবে যা থাকে নসিবে, সাহস করে সে হক কথাটাই বলে বসে বেফিকির। বলে, সুলতান তখ্‌তেই বসুন আর বিস্তারাতেই শুয়ে থাকুন, চল্লিশ দিনের বেশি সুলতান আর একদিনও বাঁচবেন না। চল্লিশ দিন-ই সুলতানের জীবনের মেয়াদ।

সামান্য এক মজদুরের মুখে এত বড়ো কথা শুনে সুলতান তো মহা খাপ্পা। চেঁচিয়ে বলে, কী বললি তুই বেওকফ? এত বড়ো আস্পর্ধা তোর? যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা?

তারপর আবার কী মনে হতেই গলার স্বর একটু নামিয়ে মজদুরকে জিজ্ঞেস করে সুলতান, কী করে তুই জানলি যে আমি আর মোটে চল্লিশ দিন জিন্দা থাকব?

মজদুর পাক্কা সমঝদারের মতো বলে, আমার মালুম, বিলকুল মালুম, আপনি আর মাত্র চল্লিশদিন আছেন এই দুনিয়ায়।

সুলতান রাগে অন্ধ হয়ে চিৎকার করতে থাকে। বলে, ব্যাটা বুরবক্, ইবলিশের বাচ্চা, তোর একটা কথাও ঠিক নয়। কী ভেবেছিস, তোর কথা আমি বিশ্বাস করব? কচু করব। এখন যা ব্যাটা উজবুক, কয়েদ খাট চল্লিশ দিন।

কিন্তু ওই ঘটনার পর কী যে হল, সুলতানের সব খিদেটিদে যেন উবে গেল। সেই সর্বনেশে খিদে যা নাকি সর্বক্ষণ তার পেটে আগুন জ্বালাত, ভোজবাজির মতো কোথায় যে মিলিয়ে গেল সেই সাংঘাতিক রাক্ষুসে খিদের জ্বালা। সুলতান ভাবে, তবে কি সত্যিই আর মাত্র চল্লিশ দিন বাঁচবে সে? ফোঁ-ও-স করে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে গালে হাত দিয়ে ঠায় বসে থাকে সুলতান। কোনো কাজেই এবং অন্য কিছুতেই আর মন বসাতে পারে না।

ফজরে ঘুম থেকে উঠে বিলকুল খেতেই ভুলে যায় পেটুক সুলতান। দুপুরে সামান্য একটু

খায় কী না খায়। রাতেও ঠিক তাই। দিনের পর দিন এইভাবেই চলতে থাকে। সুলতান গালে হাত দিয়ে রাতদিন খালি ভাবে আর ভাবে। কোথা দিয়ে যেন বিশটা দিন পার হয়ে যায়। চিন্তায় ভাবনায়, আর তামাম দিনে স্রিফ চিড়িয়ার মতো সামান্য একটু খানা খেয়ে সুলতান কিন্তু এদিকে রোগা হতে শুরু করে দিয়েছে দ্রুত। হাঁটাচলা করতে, শুতে বসতে আর কোনো কষ্টই হয় না তার এখন। কুর্তা, কামিজ, আচকান তার রোগা পটকা শরীরে ঢলঢল করে।

এইভাবে যত দিন যায় সুলতানের দুশ্চিন্তা তত বাড়তে থাকে। খাওয়া আরো কমে যায়, আরো রোগা হতে থাকে সুলতান।

চল্লিশ দিনের দিন সুলতান ভাবে, আজই তার আখ্‌রি দিন। তারপরেই সব শেষ। রাতও হয়তো পোহাবে না যখন তার ভাগ্যে করাল মৃত্যু নেমে আসবে। এইরকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে দিন যায়, রাত আসে। নানারকম চিন্তা করতে করতে সুলতান কখন যে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে টেরও পায় না তা।

সুবাহ্ হতে না হতে পাখির কিচিরমিচির ডাকে সুলতানের ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙতেই দূরে মসজিদের মিনার থেকে আজানের সুমধুর ধ্বনি ভেসে আসে। সুলতান চোখ রগড়ে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসে। ভাবে, আরে তাজ্জব ব্যাপার। চল্লিশ পেরিয়ে আজ একচল্লিশ দিন না! তাই তো। নিজের শরীরে চিমটি কেটে দেখে, এ কী, আজও সে তবে বেঁচে আছে! তাজ্জব কী বাত! এ-ও কি সম্ভব, না সব খোয়াব? সংবিৎ ফিরতে চিৎকার করে ডাকে, ওরে, কে আছিস, নিয়ে আয় তো ধরে ওই কাম্‌লাটাকে, এক্ষুনি, এই দণ্ডে।

হুকুম তামিল করতে পেয়াদা ছোটে। সুলতানের চল্লিশ পেয়াদা কয়েদখানা থেকে ধরে নিয়ে আসে তাকে। এনে সুলতানের সামনে দাঁড় করায় লোকটাকে।

সুলতান চোখ লাল করে বলে, কী রে ব্যাটা, খুব তো ওস্তাদের মতো বলেছিলি যে আমি আর মোটে চল্লিশ দিন নাকি বাঁচব। আজ তো একচল্লিশ দিন হল, তাই না? বল তবে কেন ঝুট্ বলেছিলি তুই। সুলতান রাগে অগ্নিশর্মা একেবারে।

মজদুরটা ভয় পেয়ে বিষম তোত্‌লাতে থাকে, তা....তা....তা আমি ব-বলেছিলাম বটে। ঠিকই জাঁহাপনা। তারপর কিছুটা সামলে নিয়ে, মাথা চুলকে, চোখ পিট পিট করে বলে, গোস্তাকি মাফ করবেন দীন-দুনিয়ার মালিক, কিন্তু আপনি তো আর মোটা নেই এখন। কত দুব্‌লা হয়ে গেছেন এই চল্লিশ দিনে।

সুলতান ভাবে, তাই তো! বিছানা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে নেমে সুলতান ঘরময় পায়চারি শুরু করে দেয়। তার গায়ের ঢোলা ঢোলা পোশাক পটর-পটর ঝুলতে থাকে। আরশির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে সুলতান। অবাক কাণ্ড। তার অত বড়ো আলিবাবার জালার মতো ভুঁড়িটা কোথায় উধাও হয়ে গেছে। গাল, গলা, ঘাড়, হাত, পা আর একদম মোটা নেই। ফুস্‌মন্তরে গায়ের তাবৎ চর্বি একেবারে যেন হাওয়া। এখন আর মোটা নয় সুলতান। একটুও না।

এবারে সুলতান হাঁকে, ওরে কে আছিস, নিয়ে আয় তো একটা দাঁড়িপাল্লা।

দাঁড়িপাল্লা এলে সুলতান পাল্লার একদিকে উঠে বসে। তারপর পাইক-বরকন্দাজ, নফর-বান্দাদের হুকুম করে, তোরা পাল্লার ওদিকে আশ্‌রফি চাপাতে থাক যতক্ষণ না তার ওজন আমার সমান ওজনের হয়।

ওজন শেষ হলে সুলতানের আদেশে বিরাট বড়ো এক বস্তার মধ্যে সব আশ্‌রফি ভরা হয়। ঝকঝক করতে থাকে সে আশ্‌রফির স্তূপ। ভরা শেষ হলে সুলতান মজদুরকে বলে, এ আশ্‌রফির বস্তা তোমার। তোমার অসামান্য আক্কেলের পুরস্কার।

গরিব মজদুর সুলতানের দিকে খানিকক্ষণ অবাক বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর সে সুলতানকে কুর্নিশ করে তার আক্কেলমন্তের ইনাম কাঁধে নিয়ে খুশমেজাজে নিজের বাড়ির পথে দ্রুত হেঁটে চলে।

ছবি। শঙ্কর বসাক



মাটির বউ

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী শাশ্বতী রায়চৌধুরী

পুবের আকাশ রাঙিয়ে লাল সূর্যটা সবেমাত্র তখন উঠি উঠি করছে; কুকুর, বেড়াল, ছাগলেরা ঘর ছেড়ে বেরোবার জন্য ছটফট করছে। এমন সময় হঠাৎ চাষির বাড়ির দরজার কড়াটা জোরে নড়ে উঠল। ঠক্ ঠক্। চাষির বউ ঘুমচোখে দরজা খুলেই দেখে বাইরে এক বুড়ো দাঁড়িয়ে। হাতে একটা লাঠি। ওকে দেখেই একগাল হেসে বুড়ো বলে উঠল, "এই যে মেয়ে, আমার এই লাঠিটা একদিনের জন্য তোমার কাছে রাখবে? ভুল করে উনুনে আবার জ্বালিয়ে দিয়ো না, কেমন? আমি কাল সকালেই এসে নিয়ে যাব।" এই বলে বুড়ো চলে গেল।

চাষির বাড়িতে মাটির উনুনে রান্না হত। তা সেদিন ভাত রান্না করতে করতে চাষি বউ-এর সব কাঠ গেল ফুরিয়ে। ও খুঁজেপেতে দু-এক টুকরো কাঠ যা পড়ে ছিল তা দিয়েই রান্না সারল। চাষি-বউ খেয়ালই করল না যে, তাড়াহুড়োতে ও বুড়োর লাঠিটাও কাঠ ভেবে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

পরদিন সকাল হতে-না-হতেই বুড়ো এসে হাজির। চাষি-বউকে বলল, "আমার লাঠিটা যত্ন করে রেখেছিলে তো? তা দাও এখন সেটা, আমাকে আবার অনেক দূর যেতে হবে।"

চাষি-বউ লাঠিটা অনেকক্ষণ খুঁজে না পেয়ে বুঝতে পারল সে ভুল করে সেটা পুড়িয়ে ফেলেছে। ও বুড়োকে এসে বলল, "আমার খুব ভুল হয়ে গেছে। গতকাল আমার কাঠ শেষ হয়ে যাওয়ায় ভুল করে আপনার লাঠিটা আমি জ্বালিয়ে ফেলেছি। তা, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি এক্ষুনি ঠিক ওরকম একটা লাঠি আপনাকে জোগাড় করে দিচ্ছি।"

শুনে বুড়ো বেজায় খেপে গেল, "কী, আমার লাঠি উনুনে পুড়িয়ে ফেলেছ! তোমার উনুনটাই আমি আজ নিয়ে যাব। কোনো কথা শুনব না।"—বলেই বুড়ো মাটির উনুনটা পাশের দাওয়া থেকে তুলে নিয়ে গটগট করে চলে গেল।

কিছু দূর গিয়ে বুড়ো এক গোয়ালা বউ-এর দেখা পেল। গোয়ালা-বউ তখন গোরুগুলোকে বাড়ির পাশের মাঠে বেঁধে দিয়ে ছাগলগুলোকে চরাচ্ছে। বুড়ো এসে ওকে বলল, "এই যে মেয়ে, এই উনুনটা তোমার কাছে রাখবে? আমি কাল সকালে এসে নিয়ে যাব। কিন্তু দেখো, তোমার দুষ্টু ছাগলছানাগুলো আবার উনুনটা ভেঙে না ফেলে।"—বলে বুড়ো চলে গেল।

অনেকক্ষণ ছাগল চরিয়ে ক্লান্ত হয়ে গোয়ালা-বউ গাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম নিতে বসল। তারপর কখন জানি ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে দেখে দুটো দুষ্টু ছাগলছানা লুটোপুটি করতে করতে বুড়োর উনুনটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

পরদিন সকালে গোয়ালা-বউ ছাগল নিয়ে মাঠে আসতে-না-আসতেই বুড়ো এসে হাজির। এসেই বলল, "আমি বেশিক্ষণ দাঁড়াব না, একদম সময় নেই। তা আমার উনুনটা কোথায়?"

গোয়ালা-বউ খুব লজ্জিত হয়ে বলল, "আমার ছাগলছানাদুটো আপনার উনুনটা কাল ভেঙে ফেলেছে। তা আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এক্ষুনি কুমোর বাড়ি থেকে ঠিক ওরকমই একটা উনুন আপনাকে এনে দিচ্ছি। কাল সন্ধে হয়ে গিয়েছিল বলে যেতে পারিনি।"

"না, না আমার অত সময় নেই। তোমার ছাগলছানারা আমার উনুন ভেঙেছে, কাজেই আমি এই ছাগলছানাদুটোই নিয়ে চললাম।"—বলেই বুড়ো আর না দাঁড়িয়ে দু'হাতে দুটো ছাগলছানাকে খপ করে ধরে নিয়ে হনহন করে হাঁটা দিল।

হাঁটতে হাঁটতে বুড়ো এক বিয়ে-বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হল। সেখানে তখন ভোজ চলছিল। বুড়ো গিয়ে বরকে বলল, "এই যে ছেলে, আমার এই ছাগলদুটোকে একদিনের জন্য তোমার কাছে রাখতে পারবে? কাল সকালে এসে আমি ফেরত নিয়ে যাব। কিন্তু সাবধান ভোজের মাংস কম পড়লে আবার এদের ওপর নজর দিয়ো না বাপু।"—বলে বুড়ো চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর ঠিক ভোজের মাংস ফুরিয়ে গেল। কিন্তু তখনও অনেক লোকের খাওয়া বাকি। আর হাতের কাছে এমন নধর দুটো ছাগলছানা থাকতে কে আর মাংসের খোঁজে যায়? তাই একটু পরেই দেখা গেল লোকজন মহানন্দে ছাগলের মাংসের ঝোল খাচ্ছে।

পরদিন সকাল হতে-না-হতেই বুড়ো এসে হাজির। আগের দিন ভোজ শেষ হতে হতে রাত হয়ে যাওয়ায় বুড়োর ছাগলের কথা কারুর আর মনে ছিল না। আজ বুড়োকে দেখতে পেয়েই বর এগিয়ে এসে বলল, "কিছু মনে করবেন না, কাল মাংস কম পড়ায় বাধ্য হয়ে



আপনার ছাগলদুটোকে আমরা রান্না করে খেয়ে ফেলেছি। তা, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি হাট থেকে এক্ষুনি দুটো ছাগলছানা কিনে নিয়ে আসছি।"

বুড়ো তো রেগে আগুন—"কী এতবড়ো সাহস! সবাই মিলে আমার ছাগলছানাদুটোকে খেয়ে ফেললে। আমি তোমাদের ছাড়ব না। এই তোমার বউকে নিয়ে যাচ্ছি। দেখি কী করতে পার!" —বলে বর কিছু বুঝে ওঠার আগেই বুড়ো তার নতুন বউয়ের হাত ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে পথের বাঁকে উধাও হয়ে গেল। কিছুটা দূরে গিয়ে বুড়ো একটা বড়ো থলের মধ্যে বউটাকে ভরে থলের মুখটা একটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। তারপর আরো একটু এগিয়ে বুড়ো একটা কুঁড়েঘর দেখতে পেল। সেখানে এক বুড়ি থাকত। বুড়ো ওই থলেটা নিয়ে গিয়ে বুড়িকে বলল, "এই থলেটা তোমার কাছে রাখবে? আমি কাল এসে নিয়ে যাব। কিন্তু তুমি থলেটা আবার খুলো না যেন।"—বলে বুড়ির কাছে বিদায় নিয়ে বুড়ো চলে গেল।

একটু পরেই থলের মধ্যে থেকে একটা কান্নার আওয়াজ পেয়ে বুড়ি থলের মুখটা খুলে ফেলল, আর খুলেই চক্ষুস্থির। ভেতরে গুটিশুটি মেরে বসে আছে এক সুন্দরী বউ। তারপর সব শুনে বুড়ি বলল, "এই তোমার সুযোগ। শিগ্‌গিরি পালাও। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ো না।"—বলে বুড়ি ওকে বাড়ির পথ দেখিয়ে দিল। তারপর মাটি, খড়, লতাপাতা দিয়ে ঠিক বউটার

মাপের এক পুতুল বানিয়ে সেটাকে থলেতে ভরে বুড়ি ওই দড়িটা দিয়ে আবার আগেকার মতো করে বেঁধে রাখল।

কথামতো বুড়ো পরদিন সকালেই এসে বলল, "কোথায়, আমার থলেটা কোথায়?"

"এই যে এখানে, তুমি যেখানে রেখে গিয়েছিলে, সেখানেই আছে।" বুড়ি একগাল হেসে বলল। থলেটা ঠিক আছে দেখে বুড়ো খুব খুশি হল। তারপর বুড়িকে ধন্যবাদ জানিয়ে থলেটা কাঁধে নিয়ে রওয়ানা হল।

বুড়ো এরপর এক গির্জায় গেল। সেখানকার ফাদারকে গিয়ে বলল, "ফাদার, আমার একটা আর্জি আছে। এই থলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে।"—বুড়ো ভয় পাচ্ছিল যে, যদি থলের বাইরে বেরিয়ে বউটা ফাদারকে সব কথা বলে দেয় তাহলে ফাদার বিয়ে দিতে রাজি হবেন না। তাই মেয়েটা থলের মধ্যে থাকা অবস্থাতেই বিয়ে হওয়া সব থেকে ভালো।

ফাদার ভাবলেন বুড়ো নিশ্চয়ই পাগল, না হলে থলেকে বিয়ে করতে চায়! ফাদার প্রথমে বুড়োকে এড়িয়ে যেতে চাইলেন কিন্তু বুড়োও নাছোড়বান্দা। কিছুতেই ছাড়বে না। তখন বাধ্য হয়ে ফাদার থলের সঙ্গে বুড়োর বিয়ে দিয়ে দিলেন।

থলে নিয়ে বুড়ো চলল। মনে আনন্দ আর ধরে না। অনেক আগেই বুড়োর বউ মারা গিয়েছিল। রান্নাবান্না, ঘরদোর পরিষ্কার সব বুড়োকেই করতে হত। তাই অনেকদিন পরে বউ পেয়ে বুড়ো খুব খুশি। বাড়ি পৌঁছে গুনগুন করে প্রিয় গানটা গাইতে গাইতে বুড়ো থলের মুখটা খুলল। খুলেই তো চোখ ছানাবড়া। কোথায় গেল সেই সুন্দরী বউ! এ তো একটা মাটির পুতুল। ধূর্ত বুড়োর উচিত শিক্ষা হল।

ছবি। শঙ্কর বসাক

লেবানন



রাজপুত্র আর যুবরানি

রত্নেশ্বর হাজরা

অনেক—অনেক দিন আগে এক ছিল রাজপুত্র আর ছিল এক যুবরানি। রাজপুত্র ছিল দারুণ সাহসী আর মস্তবড়ো যোদ্ধা। যুবরানি ছিল খুব সুন্দরী এবং দয়ালু। তারা দুজনে একটা দুর্গে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন এক ডাইনি সেখানে এসে উপস্থিত। ডাইনি বলল, ''আমি তোদের ঘেন্না করি। ঘেন্না করি তোদের ভালোবাসাকেও। তাই আমি আজ তোদের মেরে ফেলব—এবং ফেলবই।''

সাহসী রাজপুত্র একটুও ভয় না-পেয়ে ডাইনিটাকে বলল, ''আমিই তোকে মেরে ফেলব আর তার সঙ্গে শেষ করে দেব তোর শয়তানিকেও।'' এই বলে রাজপুত্র সেই ডাইনিকে মেরে ফেলার অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। কারণ ডাইনি তক্ষুনি তাকে বলল, ''তুই একটা শেয়াল হয়ে যা''—আর অমনি রাজপুত্র একটা শেয়াল হয়ে গেল। এসব দেখে যুবরানি যখন এগিয়ে গেল রাজপুত্রকে সাহায্য করতে, তখন ডাইনি তাকেও একটা ব্যাং বানিয়ে ফেলল। তারপর তাদের দুজনকে বন্দি করে রাখল একটা উঁচু মিনারে।

এভাবে কিছুদিন চলে যাবার পর কেউ একজন সেই বন্দি রাজপুত্র আর যুবরানিকে সাহায্য করার জন্য পাঠিয়ে দিল একটা ড্রাগন। ড্রাগন সেই ডাইনির কাছে গিয়ে মুখ থেকে আগুনের একটা



হলকা ছেড়ে ভস্ম করে ফেলল ডাইনিটাকে। ডাইনিটা যেমন পুড়ে ছাই হয়ে গেল অমনি রাজপুত্র আর যুবরানিও ফিরে পেল তাদের হারিয়ে যাওয়া রূপ, তাদের স্বাভাবিক চেহারা।

অবশেষে, তারা দুজনে সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল।

ছবি। প্রণবেশ মাইতি



বোকা হনি

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেবাননের এক গাঁয়ে থাকত হনি আর তার বউ মরিয়ম। হনি এমনিতে সোজা-সরল ভালোমানুষ, আর বড্ডই আলসে। মরিয়ম চালাক-চতুর, কাজের মেয়ে—বড়োলোকের বাড়ি দাসীবৃত্তি করে তাকেই সংসার চালাতে হয়, হাজার গঞ্জনা দিয়েও হনিকে সে কোনোমতে কাজে বের করতে পারল না। হনি খালি হাসে আর শুয়ে-বসে কুঁড়েমি করে।

একবার মরিয়ম পড়ল অসুখে—দু-দিন, পাঁচ দিন—একেবারে শোয়া, ঘরে নিরম্বু বাড়ন্ত সব, এবারে? আরও কুঁড়েমি করলে কালকে খাবে কী? এবারে বেরোও, দেখ কোথায় কী মেলে। না হোক জমিদারবাড়ির ফাইফরমাশটুকু পাও কি না দেখ। মাল বওয়া-আনা করবে, যাবে-আসবে গাধার পেছনে—যাও যাও, দেখ একবার গিয়ে—

কী আর করা। পরদিন ভোরবেলাতে হনি চলল জমিদারবাড়ি।

এখন জমিদারমশাই বিলক্ষণ চেনেন হনিদের, বউয়ের পরে তাদের গোটা সংসারটা, সেই কি না শুয়ে। বেচারা! হনিকে একটা আস্ত সোনার দিনার ধরে দিয়ে বললেন, এটা তোকে ধার দিলুম, যা একটা গাধা কেন! হনির কাজ হল রোজ সে জমিদারবাড়ির টুকিটাকি গেরস্থালি

কিনতে যাবে ব্যায়রুট, গাধার পিঠে হাট চাপিয়ে ফিরে আসবে। ব্যাস!

যে কথা। হনি দেখেশুনে জোয়ান সমর্থ একটা গাধা কিনল ব্যায়রুটের বাজারে, কেনা-আনা শুরু করে দিল জমিদারবাড়ির। মাসের শেষে নিয়মমতো মাইনে মিলতে লাগল তার।

এক দিনে জমিদারবাবু ডেকে বললেন, হনি, যা তো অমুক দোকান থেকে ভালো সরু চাল নিয়ায় তো ক-বস্তা!

সে দোকান থেকে হনি নিত্যিই সওদা নিয়াসে। কিন্তু হয়েছে কী, সেদিনে তার বড্ডই কুঁড়েয় পেয়েছে। আবার অদ্দূর যাওয়া। বাব্বা, ব্যায়রুট কি এখানে! বেজার মনেই হঠাৎ মনে হল, গাধাটাও তো হরদিন যাচ্ছে-আসছে, ওকে পাঠালেও তো হয়—একটা দিন সঙ্গে না-গেলে চলবে না? অবিশ্যি জানা দরকার পারবে কি না—ভেবে, হনি গাধাটাকে খুঁটো খুলে বের করে এনে বললে, শোন, ব্যায়রুটের যে দোকান থেকে চাল-মশলা কিনি, যেতে পারবি না একা? বাবুর একটা বস্তা চাল নিয়াসবি, পারবি?

গাধাটা, যেমন স্বভাব, ঘাড় ওপর-নীচ করে আওয়াজ করে উঠেছে চ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা—হনি ভাবলে, বলছে, হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, পারব না তো কী!

বাঁচা গেল। হনি তখন দু-হাত কাপড় পেঁচিয়ে গাধার মাথায় বেঁধে দিল পাগড়ি করে, তার ফাঁকে গুঁজে দিল বাবুর দেয়া চাল কেনার দিনার টাকাটা, তারপর এগিয়ে ছেড়ে দিয়েলো নিয়ে ব্যায়রুটের পথে—সাবধান! দেখেশুনে যাবি। ইদিক-সিদিক যাবি না। কারও কথা শুনবি না। টটপট টটপট—গাধাটা নজরের বার হয়ে গেলে তারপর নিশ্চিন্দি ঘরে ফিরল হনি।

বউ বলছে, ও কী গো. ফিরে এলে যে? যাওনি?

গাধাটাকে পাঠিয়ে দিলুম তো। রোজ যাচ্ছে, পারবে না? তা ছাড়া জেনে বুঝেও নিয়েছি, পারবে কি না। বলল সে খুব পারবে।

খোদাতালা তোমার মাথায় কি কানাকড়ি মগজ দেয়নি গো! যাও, যাও—এখুনি ধর গিয়ে ছুটে—গাধাটা গেল, টাকাটা গেল, চাকরিটাও বুঝি গেল—ছোট, ছোট—

বউ একরকম ঘাড়ে ধরেই হনিকে রাস্তায় বের করে দিলে।

তো হনি প্রাণপণ ছুটছে গাধার নাগাল পেতে—ছুটছে তো ছুটছে—জিভ বেরিয়ে গেল হাঁপ লেগে—ছুটতে ছুটতে পৌঁছ হয়ে গেল একদম ব্যায়রুট বাজার—কই গাধার পাত্তা নেই! গিয়ে দোকানিকে শুধোয় হাঁপাতে হাঁপাতে, গাধাটা এসেছিল। চাল নিয়ে গেছে কিনে।

হনিকে দোকানি ভালোই চিনত, ভাবলে মজা করি একটু। বলল হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমার গাধা তো ভারী লায়েক হে, আমাদের চাল তার মনেই ধরে না। বিলকুল না-পসন্দ করে চলে গেল হাইফার বাজারে চাল কিনতে।

হনি গোলমালে পড়ে গেল। এখন সেই হাইফা অবধি তা হলে ছুট করতে হবে? করতেই হবে। মরিয়মও নইলে ঘরে ঢুকতে দেবে না।

কী করা। দোকানদারের কাছেই কটা পয়সা ধার করে হনি ছুটল জাহাজঘাটা। একটা ইস্টিমার ছাড়ছে তখুনি হাইফার দিকে, চটপট টিকিট কিনে ছুটতে ছুটতে হনি উঠল গিয়ে

তাতে।

হাইফার নেবে ঢুঁড়ছে গাধাটাকে যদি দেখতে পায়—বড্ড লায়েক হয়ে গেছে, একটু সমঝে দেয়াও দরকার। দেখেছ সাহস, না বলে চলে এয়েছে এতখানি? ঘুরছে তো ঘুরছে—কোথাও না কোথাও তো দেখা পেতেই হবে। সরেশ চালের আড়তটা এখানে কোথা? রাস্তার একটা লোককে জিজ্ঞেস করতে সে খানিকটা এগিয়েই দিয়েলো দোকানমুখো। হনি উঠে গেল তরতর করে মালিকের গদিতে—কত্তা, আমার গাধাটা এয়েছিল আপনার দোকানে চাল কিনতে?

গাধা এসেছিল চাল কিনতে? চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে সে হনিকে।

এখন গদিয়ান সে লোকটার বহুত দিনের একটা বাগও পোষা ছিল বড়ো কাজির ওপরে, সে ভাবলে, এই তো মোকা!

সে খুব মিঠে বচনে আপ্যায়ন করে বলল, আ-রে দাদা, সে তোমার গাধা? এতনা কামিল জানোয়ার! এসেই সে এমনি দরাদরি লাগিয়ে দিয়েছে যে দোকান ঘেরাও ভিড়—বুঝলে তো, সব তামাশা দেখতে। শেষে, কী তাজ্জব ব্যাপার! গাধার এত বুদ্ধি? পাঁচজনে যুক্তি করে জোরজার ওকে করে দিয়েছে এখন শহরের বড়ো কাজি। দেখবে তো আদালতে যাও,



এতক্ষণে এজলাসে বসে গেছে ধড়াচুড়ো এঁটে— কে বলবে হাকিম নয়। যাও, দেখ চিনতে পারলে হয়।

লোক দিয়ে হনিকে আদালতের দোরগোড়া অবধিই একরকম এগিয়ে দিয়েলো আড়তদার। কিন্তু হনির তখন আরেক দুশ্চিন্তা—অত বড়ো হাকিমি পদ, সে ছেড়ে কি গাধা এখন ফিরতে চাইবে তাদের অজগাঁয়ে। কোথায় হাইফা শহর, আর গাঁ মানে তাদের সে হদ্দ পাড়াগাঁ। হনি বাজার থেকে যা হোক লাল তাজা গাজর কিনে নিলে বড়ো আঁটি, হাতে ঝুলিয়ে মুখ হাসি করে আদালতের দরজা অবধি এসেছে—ঢুকতে যাবে, আটকে দিয়েছে পাহারালা। হনি যত বলে, তুমি বাধা দেবার কে হে! আমার গাধার সঙ্গে আমি কথা কইতে যাচ্ছি, সে এখন তোমাদের বড়ো হাকিম—পাহারালা তাকে এই মারে তো এই মারে! রাস্তায় লোক যেতে গিয়ে ভিড় জমিয়ে ফেলল তামাশা দেখতে।

গোল শুনে কাজি স্বয়ং বের হয়ে এসেছেন, ব্যাপার কী?

ব্যাপার শুনে বুঝে নিতে অবিশ্যি দেরি হল না কার কাণ্ড! উঃ! শয়তানিটা দেখ। কার আবার? ওই চালপট্টির কালোবাজারি বদমাশটার। ফুটন্ত রাগ চেপে হনিকে এজলাসে হাজির করার হুকুম দিয়ে কাজি ভিতরে ঢুকে গেলেন।

কাজির মুখের সামনে লাল তাজা গাজর-ছড়া নাচাতে নাচাতে হনি আদর গলায় বলতে বলতে ঢুকছে, আ হা হা হা হা, এই তো আমার পিয়ারা গাধা, জামাজোড়া পরে মানিয়েছে দেখ না। ও মেরে মহুয়া গাধা, কাজি সেজে আর চেনাই যায় না—আ হা হা হা হা

হ্যাঁ রে, সে টাকা কোথায়—চালের দাম যে গুঁজে দিলাম তোর পিঠে?

ততক্ষণে কাজির কাছে খোলসা হয়ে গেছে লোকটার চেহারা। কাজি মনে মনে আওড়ান, বজ্জাত আড়তদার, ঠারো বদমাশ, তোমার মজা দেখাচ্ছি, মুখে মিঠাই বুলি বলেন, কত দিয়ে কিনেছিলে তোমার গাধা, মনে আছে? আচ্ছা থাক থাক, এই নাও—বলে পাঁচটা-সাতটা গোটা গোটা সোনার দিনার বাজিয়ে তুলে দিলেন হনির হাতে—নাও এটা নিয়ে এখন বাড়ি যাও—

কী আদর-সহব সব কাজিদের। এই না হলে শহরের বড়ো কাজি! অতগুনো টাকা বিনা বাক্যয় দিয়ে দিল কি না দেখতে এয়েছে বলে। হনি অবাক বিস্ময়ে হয়ে টাকাগুনো মুঠোর ভিতরে চাপ দেয় আর আনন্দে ফুলে ফুলে ওঠে। কাজি ততক্ষণে আমরা কামলা লোকজনের ভিড়ে আপন মামলায় ঘেরাও হয়ে পড়েছেন। আর অপেক্ষা করেই-বা কী লাভ। হনি মহা-আনন্দে আদালত ছেড়ে বের হয়ে এল ব্যায়রুটের পথে। ফিরে, দোকানির পয়সা কটা ফেরত করে, নতুন আরেকটা গাধা কিনে, গাধার পিঠে ফের এক ছালা চাল বোঝাই দিয়ে ফূর্তি সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ফিরে চলল জমিদারবাড়ি।

দড়ির আগায় বাঁধা খুঁটো মুঠোয় চেপে চলতে চলতে হাত টাটাচ্ছে, তো হনি প্যান্টুলের কোমরে পেঁচিয়ে আটকে নিল খুঁটোটা—আটকে, গাধাটাকে পেছনে করে আগে আগে যাচ্ছে—উঃ! কতগুনো টাকা বল তো এখনও! আছে তো আবার? হনি জেব-এ চাপ দিয়ে দেখে, হ্যাঁ আছে। উঃ! না হোক কতগুনো টাকা। তার সেই গাধা, সে কি না আজ হাইফার শহরের অত

বড়ো হাকিম। উ হু হু হু, শুনে মরিয়ম-বা কী বলবে। না, সে আরও ফরমাশ খাটতে যাবে কারও আরো? কখ্খনো না। মরিয়ম যা বলে বলুক। আনন্দে ফুটছে যেন দেহখানা হনির। এঁকা-বেঁকা উঁচাই-নীচাই পথ—দুধারি দৃশ্যও মনোরম—গুনগুন করতে করতে ঠেলে ওঠে দাঁতের গোড়ায়, গলা ছেড়ে গাইতে গাইতে গানের ঝোঁক আর কিছু খেয়ালও থাকে না—

এতই সে ব্যস্ত হয়ে চলেছে যে তিনটে বদ ছেলে সব জেনেশুনে যে সেই থেকে তার পিছু নিয়েছে চুপিসারে, সে হনি জানেও না। একটা টান উঁচাই বাঁকের বরাবর হতেই এক ছেলে তার গাধার গলার দড়িটা খুলে গলিয়ে নিয়েছে আপন গলাতে—খুঁটো টান দিয়ে দিয়ে চলতে লেগেছে হনির পেছনে, আর-একজনা চালের ছালাসুদ্ধু গাধাটাকে নিয়ে দে চম্পট—

খানিকটা গিয়ে হনির হঠাৎ মনে হল কোমরের খুঁটোতে যেন বড্ডই কামড় লাগছে তখন থেকে—এত টানছে কেন গাধাটা? হনি গান থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছ ফিরে দেখে, ও বাবা। এ আবার কী?

কে হে তুমি?

আমি গাধা।

গাধা?

তোমার গাধা গো। চিনতে পারছ না?

আমার গাধা! হনির থতোমতো লাগছে দেখেশুনে—তো সে ছেলে তখন বলতে শুরু করেছে, আগেও আমি মানুষ ছিলুম গো, একদিন ঘরে ফিরেছি মারপিট করে—আগুন মেজাজ, সামনে পেয়ে মাকেই যা নয় তাই বলে থালা-পাতিল ছুঁড়ে ভেঙে ঘর তছনছ করছি, মা হঠাৎ রক্তচক্ষু করে বিড়বিড় করে কী যে মন্তর পড়েছে, বলব কী, পলকের মধ্যে হয়ে গেলুম চার পা ছটকানো থুম্বু একটা গাধা। পড়শি চাচা গলায় দড়ি লাগিয়ে বেচে দিয়েলো আমায় গাধা হাটে—

তারপর? হনি ততক্ষণে বড়ো বড়ো চোখ করে যেন গিলতে লেগেছে কথাগুনো—

তারপর আর কী! কী কষ্ট যে গেল অ্যাদ্দিন। শেষে আজ তুমি কিনে নিয়াসছ আর সারা রাস্তা আল্লার কাছে প্রার্থনা করছি, আর কখ্খনো মারপিট করব না, আমায় মানুষ করে দাও আল্লা। হে আল্লা। আর কখ্খনো গলতি করব না—বলছি, আর কানে হাত লাগিয়ে নিঃশব্দ হয়ে কাঁদছি—হে আল্লা! হঠাৎ এক মুহূর্ত দেখি—ও মা! আমি নাকি গাধা! আমায় দড়ি গলায় বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে কি না একটা লোক! যে হও সে হও বাবা, এই কানে হাত, সত্যি বলছি আর কখ্খনো করব না, দোহাই আমায় ছেড়ে দাও—

হনি আবার গোলমালে পড়ে গেল। কিন্তু তোমার পিঠে আমার চালের বস্তাটা ছিল।

দেখ না, মানুষ হয়ে যাচ্ছি, সেই সময় কোথা দিয়ে সে পিঠ থেকে খসে গেল ছালাটা সে বোধই হল না। দোহাই বাবু গলার ফাঁসটা খুলে দাও, আমি বরং পিছিয়ে দেখে আসি কোথায় পড়ল।

চলো আমিও যাই—হনির ফের যেন কেমন গোলমাল লাগছে, তো সেও পেছনে চলল

ছেলেটার। যেতে যেতে— গাঁওপথ ছেড়ে ফের সেই ব্যায়রুটের পথ—কোথায় ছালা? কোথায় পড়ল, খেয়াল হল না? শুধোতে গিয়ে মুখ তুলে হনি দেখে রাস্তা ভর্তি রাশি রাশি লোক হাঁটছে—তার মধ্যে কোথায় সে ছেলে? ভিড়ের ভেতরে হনি হদিসই করতে পারলে না।

কী করা। টাকা আরও গোটা কত আছে, হনি ফের চলল সেই গাধাহাটায়। বিনি-গাধায় ফিরলে তো বুঝতেই পারছ।

এ গাধা সে গাধা হাতিয়ে পরখ করছে— আ-রে সেই গাধাটাই-না, একটু আগে কিনে নিয়ে গিয়েছিল? হ্যাঁ, ডান কানের নীচে ওই তো সে-দাগটা, ঠিক।

হনি চিনেছে ঠিকই। আসলে হয়েছে কী, ছেলেগুনো এরই মধ্যে এসে গাধাটাকে বেচে দিয়ে গেছে জলের দামে। হনি গাধাটার গা-পিঠ পরখ করছে টিপে চেপে, হ্যাঁ, সেইটাই বটে। ঠিক চিনেছে! গলা উঁচিয়ে গাধাওলাকে ডাক দিয়ে বলল, বাপু হে, দুটো কথা বলব গাধাটার সঙ্গে?

বলো, বলো, পরম উৎসাহে এগিয়ে এল গাধাওলা।

হনি তখন গাধার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে চেঁচাতে লেগেছে, বদমাশ! বেশরম্! কিছুতে শিক্ষা নেই তোর? এই না বলছিলি আর কখ্খনো করবি না, তোর নাকি খুব দুঃখু লাগছে দোষ করে? কতক্ষণ হয়েছে তারপর? ভাবছিস আবার কিনব তোকে? কিনে ফের পস্তাব? কখ্খনো না।

হনি তার মুখের ওপরেই আর-একটা গাধা কিনল। কিনে বেঁধে নিয়ে চলল আবার মুঠোয় শক্ত করে খুঁটোটা চেপে। না, আবার ভুল হয়? বাব্বা! চাল কিনল বাকি টাকা যা ছিল তবিল চেঁছে পুঁছে। ঘরে ফিরে, গাধা বেঁধে, জমিদারবাড়ি চাল পৌঁছ করে দিয়েসে তবে ফের নিশ্চিন্দি।

কুঁড়েমি করা আর হল না হনির। পরদিন থেকে রোজ রোজ সে বেরোতে লাগল জমিদারবাড়ির কাজে। এদিকে মরিয়মও সেরে উঠেছিল। দুজনে মিলে অনেক রোজগারপাতি জমিয়ে ফেলল তারা ক্রমে ক্রমে। তারপর দিব্বি সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



ভগবানের বিধান

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জেরুজালেমের কাছে এক পল্লিতে থাকত আলহনান, আর তার বউ দিনা। আলহনানের বন্ধকি ব্যাবসা, তাইতে সে অনেক টাকাকড়ি উপার্জন করেছিল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব ধর্মিষ্ঠ, কোনো আচার অনুষ্ঠান তাদের বাদ যেত না। তা বাদে আলহনান তোরা পড়েছিল যত্ন করে। শাস্ত্রবাক্য তাদের সুমুখে ছিল প্রত্যক্ষ ভগবানের মতন।

এত সত্ত্বেও, ব্যাবসার ব্যাপারে কিন্তু আর-কিছুরই কোনো দাম ছিল না তাদের কাছে! এমনকি নিরন্ন ভিখিরিও যদি চাইত এসে কিছু, দিনা মুখিয়ে উঠত— রাখি-জিনিস দিয়ে যাও কিছু, নিয়ে যাও। এর মধ্যে আর কোনো কথা নেই।

কাজেই আলহনানের সম্পদ দিন-দিনই বাড়তে লাগল।

একদিন সচম থেকে লোক এসেছে টাকা ধারতে, সুন্দর-জামানতি সামিগ্রি এনেছে একটা, যাচিয়ে দেখে আলহনান ভারী খুশি। দিনা, চাবিটা নিয়ে যাও তো একবার উপরে! ব্রোঞ্জের দেরাজে টাকা আছে—

দেরাজ খুলে টাকা বের করতে যাবে দিনা, হঠাৎ শোনে, দেবাজের মধ্যে থেকে কে যেন

বলে উঠল : টাকা রেখে দাও। ও টাকাও তোমাদের না, এ বাড়ির হিরে মুক্তো রুপো সোনার যত বাসনকোশন তাও তোমাদের না।

আতঙ্কে হাত সরিয়ে নিয়ে দিনা দ্রুতপায়ে নেমে এল নীচে—তুমি চলো, শিগগির চলো—

কেন, কী হল! বলে আলহনান উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে এসেছে দিনার পেছনে।

যাও, নাও এবার টাকা?

যেই হাত বাড়িয়েছে আলহনান, শোনে হঠাৎ দেরাজের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল; টাকা রেখে দাও! ও টাকাও তোমাদের না, এ বাড়ির হিরে মুক্তো সোনা রুপোর যত বাসনকোশন তাও তোমাদের না।

আতঙ্কে হাত সরিয়ে নিল আলহনান।

কার তা হলে এসব?

দেরাজের মধ্যে থেকে জবাব এল : জেরুজালেমে জলপাই পাহাড়ের পাহাড়তলি গাঁয়ে থাকে কাঠের কারিগর অব্রাহাম, এ সমস্ত তার।

আলহনান চিন্তিত হয়ে পড়ল। যদি এসব আমার না হয়, আমি ভোগ করব না। বাইবেলে স্পষ্ট লেখা আছে : ঘরের মধ্যে মিথ্যে পাপ জমিয়ো না!

দুজনে মিলে সেই রাতেই সোনা-রুপোর বাসনকোশন, হিরে-মুক্তো যত ছিল বাড়িতে সব দেরাজে ভরল। অন্ধকারের মধ্যেই টানতে টানতে নামিয়ে তাদেরই বাগানের জলপাই গাছটার ফাঁপা গুঁড়ির ভিতর পুরল নিয়ে সেই দেরাজ। তারপর কাঠকুটো, বালি, মাটি ঠেসে গুঁড়িটা ভরাট করে দিল। থাক এইখানে। যদি অব্রাহামেরই হয় এসব, নিয়ে যাক সে এসে।

কয়েকদিনের মধ্যেই মুষলধারায় বৃষ্টি নামল জেরুজালেমের পাহাড়ে—একটানা উপর্ঝরন বর্ষা—গাছপালা বাড়িঘর ভাসিয়ে নিয়ে চলল প্লাবনবেগে, তার মধ্যে আলহনানের জলপাই গাছটাও ভেসে গেল। ভেসে গিয়ে পড়ল সোরেক নদীর জলে।

সোরেক নদী মেছো নদী। এক জেলে মাছ ধরতে বসে দেখে মস্ত একটা গাছ ভেসে যাচ্ছে নদীর জলে। ভাবল, এমন কাঠ যদি ভালো কারিগরের হাতে পড়ে তো সুন্দর সব জিনিস বানাতে পারে সে। ভেবে, গাছটা সে টেনে তুলল। জেরুজালেমের অব্রাহাম কাঠুয়ার কাছে নিয়ে গেলে ভালো দরও পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

ভেবে, পরদিন সে গাধার পিঠে মাছ বোঝাই দিয়ে শহর-বাজারে চলল বেচতে। জেরুজালেমের লোকেদের মাছ বড়ো প্রিয়—শহরে ঢোকার আগেই মাছের বোঝা তার আদ্ধেক, অব্রাহাম ধরল তাকে সেই শহরতলিতেই। দাও, সুকোতের পরব-দিনের জন্যে মাছ নিয়ে রাখি।

তখন জেলে বলল, কত্তা, ভালো দর পাই তো আর একখানা জলপাই গাছের গুঁড়ি দিয়ে যাই।

বেশ! পছন্দ যদি হয়, খুশি করে দেব।

কাঠ দেখে অব্রাহামের খুব পছন্দ। জেলেকে সে খুশিই করে দিল।

তারপর গুঁড়িটা নিয়ে চেরাই-কলে ফেলতেই গুঁড়ির পেট থেকে বেরিয়ে পড়েছে দেরাজ। পাল্লা খুলতেই হিরে মুক্তো সোনা রুপোর এক পাঁজ বাসনকোশন—কার এসব?

অব্রাহাম দেরাজ উলটে-পালটে, প্রত্যেকটা বাসন পাথর উলটে-পালটে দেখে—যদি কারও নাম খোদাই থাকে কোথাও। না, কারোর নাম নেই।

তাহলে ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন তাকে।

আর কিছু না-ভেবে অব্রাহাম কারবারটাকেই বাড়াতে বসল। আর কিছুদিনের মধ্যে জেরুজালেমের ধনী-মানী দশজনের মধ্যে তার স্থান হয়ে গেল, আগের দিকে।

এদিকে অব্রাহামেরও সম্পদ বাড়ছে, আর আলহনানের কারবার হঠাৎ প্রায় বন্ধ। জমা পয়সায় হাত পড়ল, দেখতে দেখতে তাও নিঃশেষ হয়ে এল। তারপর একদিন আলহনান হঠাৎ একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। নিঃস্ব হলে পেটের জ্বালা তো যায় না। লুকিয়ে লুকিয়ে দূর দূর গাঁয়ে সে ভিক্ষেতেই বেরোতে শুরু করল, শুধু শুক্কুরবারে শাবাতের কালে আরও জীর্ণ দেহে ফিরে আসে—



একদিন ডাকল বউকে—দিনা, আর তো সয় না। চলো জেরুজালেমে গিয়ে দেখে আসি গে আমাদের সেই দেরাজটার কী দশা—সত্যি পৌঁছেছে কি না অব্রাহামের কাছে।

মন করে বেরিয়ে পড়ল দুজন জেরুজালেম। ছেঁড়াখোঁড়া বেশ, দুই জাতভিখিরি যেন আসছে সাফেদ থেকে, কী আর কোথাও থেকে। সে দিনও শুক্রবার। অব্রাহাম কারিগরের ছেলের বিয়ে হবে পরের সপ্তাহে। চাঁদোয়া পড়ে গেছে এরই মধ্যে। শব্দাই লেখা লেখা কাগজ পড়ে গেছে সব দোর থামে। সেই শাবাতের দিনে জেরুজালেমের সমস্ত বড়োমানুষ নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে অব্রাহামের বাড়ি। ভোজের টেবিলে রঙিন দু-সলতে তে-সলতে মোমের পাশে পাশে ঝকমক করছে সেই যে দেরাজ থেকে পাওয়া সেইসব সোনা-রুপোর বাসনকোশন—

অব্রাহামের বউ বেরিয়েছিল ঘর থেকে। দেখে, এমন শুভদিনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছে অচেনা দুটি মানুষ।

—কী হয়েছে তোমাদের?

—না মা, কিছুই হয়নি। বলে চোখের জল মুছে নিতে যায় দুজন একসঙ্গে, কিন্তু কিছুতেই মোছে না।

—নাগো, তোমাদের নিশ্চয় হয়েছে কিছু! আমার এমন শুভদিনে অমঙ্গল করে না বাছা, বলো কী হয়েছে।

পীড়াপীড়িতে মুখ খুলল আলহনান। বলল সব আদ্যোপান্ত। কী মহিমা ভগবানের! সব বাসন তেমনি ঝকমক করছে, প্রত্যেকটা বাসন...

অব্রাহামের বউ বলল, এ জিনিস আসলে যখন তোমাদের, তোমরা নিয়ে যাও। আমাদের অনেক আছে বাছা।

—তা হয় না মা। ভগবান যদি চাইতেন, আমাদেরই তো থাকত সব। তাহলে কি এমন আদেশ হত? নিশ্চয় আমরা পাপী. এই শাস্তি তার।

তবু পীড়াপীড়ি আমন্ত্রণে দু'জনকে ঢুকতে হল অভ্যাগত হয়ে। আনন্দ-উৎসব, এখানে বাইরে থেকে চোখের জল ফেলে চলে যাওয়া চলবে না।

শাবাত শেষ হয়ে যাওয়ার পর অব্রাহামকে বলল তার বউ—ওরা তো কিছুই নেবে না, যা-ই দিতে যাই হাত উলটে ধরে। তাহলে অন্যরকমে খানিকটা পুরিয়ে দাও ওদের।

বিরাট এক কেক বানাল অব্রাহামের বউ—এলাচি খোবানি মধু মিশিয়ে, কেকের মধ্যে গোপনে গোপনে ভরে দিল চারশো সোনার মোহর। তারপর ওরা চলে যাবার কালে নিয়ে গেল হাতে করে; হাতে ধরে দিলেও তো কিছু তোমরা নেবে না বাছা, তা এই একটা কেক অন্তত নিয়ে যাও, না কোরো না, পথে খেয়ো।

একটা কেক—আদর করে দেয়া—সে কি আর না বলা যায়। ঝোলায় ভরে আবার রাস্তায় নামল আলহনান আর দিনা।

নতুন শহরের সীমানা পেরোতে যাবে যেই, ধরল এসে তাদের চুঙ্গি কর্মচারী : কর না দিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

গরিব মানুষ বাবা, পয়সাকড়ি নেই।

তাহলে চল ফাটকে! কর না দিয়ে ঢুকেছ শহরে?

হাতে-পায়ে ধরেও ছাড়ান নেই। তখন মনে পড়ল, কেক রয়েছে তো একটা! ঝোলা থেকে বের করে বলে, এই কেকটা নিয়ে ছেড়ে দাও বাবা। আর কিছু নেই আমাদের।

মধুর বাস উঠছে, বিরাট আখরোট-মনাক্কার নকশা দেয়া কেক। দেখেই ভালো লাগে। না! ছাড়া যেতে পারে বটে এটার বদলে। কেকটা নিয়ে সীমারক্ষী অফিসারের মনে হল, নিশ্চয় ভগবানের দান। এই যে ভাবছিলুম ক-দিন থেকে কারিগর অব্রাহাম আমার পুরোনো বন্ধু, নেমন্তন্ন করেছে ছেলের বিয়েতে—কী দেয়া! এমন একটা কেক পেলে ওরা কী খুশি না হবে! রাংতা কাগজে মুড়ে, সিল্কের ফুল বেঁধে লোক দিয়ে সে কেক সে উপহার পাঠিয়ে দিল অব্রাহামের বাড়ি।

আর কেক হাতে নিয়ে অব্রাহাম আর তার বউ আশ্চর্য হয়ে চেয়ে আছে, মুখে কথা নেই। এই তবে ভগবানের বিধান! বলেছেন : 'সোনা-রুপো যা-কিছু দেখ, সব আমার। যে আমার চোখের দৃষ্টিতে করুণার আলো দেখতে পায়, তাকেই আমি সব দেব।'

দুঃখে দারিদ্র্যে জীবনান্ত হল আলহনান আর দিনার। ধর্মিষ্ঠ এ দুই ইহুদি স্বামী-স্ত্রী। তবু এত দুঃখ পেল তারা শুধু গরিব ভিখিরিদের দোর থেকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল বলে।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



উজিরকন্যের বুদ্ধি

নবনীতা দেব সেন

এক দেশে এক রাজা ছিলেন।

তিনি তাঁর উজিরকে নিয়ে রোজ দরবারে বসেন। উজির খুব জ্ঞানী, তাই তিনি প্রধানমন্ত্রী—বসেন রাজার ডানদিকের আসনে।

দিব্যি চলছিল রাজ্যপাট, হঠাৎ রাজার মনে কী যে হল!

হঠাৎ কী কুক্ষণে
রাজার হল মনে
বুড়ো হয়ে উজিরবাবুর
বুদ্ধি গেছে কমে!

রাজা ঠিক করলেন উজিরমশাইয়ের বুদ্ধির পরীক্ষা নিতে হবে! রাজার যেমন ভাবা, তেমনি কাজ! তিনি উজিরকে ডেকে পাঠালেন নিজের গোপনঘরে। হঠাৎ কেন গোপনঘরে ডাক? উজিরের তো আগে থেকেই বুক ধুক্‌পুক। কেবল খুব গোলমেলে পরামর্শের জন্যেই তো ওখানে ডাক পড়ে। আবার কী হল? শত্রুটত্রু আসছে নাকি দেশে? যুদ্ধুটুদ্ধু বাধাবে নাকি? উজির তো গিয়ে হাজির।

—"বলুন, রাজামশাই!"

কোনো ধানাই-পানাই না-করে রাজা বললেন, "তোমার বুদ্ধির পরীক্ষা নেব। মন দিয়ে শোনো।"

উজির বললেন, "শুনছি মহারাজ। বলুন।"

তখন রাজা বললেন, "তোমাকে তিনটে প্রশ্ন দিচ্ছি। কাল সকালেই জবাব চাই। না পারলে তোমার মুন্ডু চাই!"

প্রশ্ন শুনে উজির তো ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে বাড়ি গেলেন। প্রশ্নগুলোর উত্তর তাঁর জানা নেই।

বাবার মুখের চেহারা দেখে ব্যস্ত হয়ে তাঁর মেয়েটি এসে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?"

"না মা, শরীর খারাপ হয়নি। [illegible] তিনটে প্রশ্ন দিয়েছেন, তার উত্তর যদি কাল সকালেই আমি না দিতে পারি, তাহলে আমার মুন্ডু যাবে!"

মেয়ে বললে, "সে কী কথা, বাবা? তুমি হলে রাজার প্রধানমন্ত্রী, রাজার ডানদিকেই তোমার আসন—তুমি তিনটে প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না, তা কখনও হতে পারে? বলো তো শুনি এমন কী প্রশ্ন? দেখি যদি আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি!"

এখন হয়েছে কী, মেয়েটা ধাঁধার উত্তর বের করতে খুব ভালোবাসত।

মন্ত্রী তখন বললেন, "প্রশ্ন তিনটে এই—সবচেয়ে মূল্যবান পাথরটি কী? সবচেয়ে মধুর শব্দটি কী? ঈশ্বরের পরে আমাদের প্রাণদান করে কে?"

মেয়ে মন দিয়ে শুনল। শুনে বলল, "বাবা, ধাঁধাগুলো কঠিন নয়। পাথরের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে জাঁতার পাথর। আমাদের রুটি দেয়। শব্দের মধ্যে সবচেয়ে মধুর হচ্ছে প্রার্থনার জন্যে ডাক, আজানের শব্দ। আর ঈশ্বরের পরে যা প্রাণদান করে, তা হল জল। জল ছাড়া প্রাণ বাঁচে না।"

মন্ত্রী পরদিন গিয়ে রাজাকে এই উত্তরগুলি দিলেন। রাজা খুশি হলেন, কিন্তু তাঁর উজিরকে পরীক্ষা করার ইচ্ছে এখানেই থেমে গেল না।

উজিরকে তিনি একদিন একটা সোনার থালা দিলেন। তাতে একটি সোনার মুরগি খোদাই করা আছে, এবং সঙ্গে তার সোনার ছানারা, সবাই মুক্তোর দানা খাচ্ছে। রাজা বললেন উজিরকে, "এই সোনার মুরগিটার ওর ছানাসমেত কত দাম হতে পারে, আমাকে জানাও। যদি বলতে পারো, তাহলে আমার থালাটা তোমার। আর যদি বলতে না পারো, তাহলে তোমার মুন্ডুটা আমার!"

শুনে তো উজিরের খুব মনখারাপ। এ আবার কেউ বলতে পারে নাকি? খোদাই করা সোনার মুরগির ছাপসমেত থালার কত দাম? এটা একটা প্রশ্ন হল? উজির বাড়ি ফিরে মন খারাপ করে শুয়ে পড়লেন। দেখে মেয়ে বললে, "বাবা আমাকে বলো, কী হয়েছে?"

উজির তখন মনের কষ্টে মেয়েকে বললেন, রাজার খামখেয়ালি প্রশ্নের কথা। উজিরের

মেয়ে শুনে ঠোঁট কামড়ে বললে, "বটে? এই প্রশ্ন? তাহলে তুমি এই উত্তরটা দিয়ো তাঁকে।

মহারাজ!
সোনার মুরগির দাম যত হয়,
উজিরের মগজের কাম যত হয়,
খরা জমিতে এক পশলা বৃষ্টির দাম
তার চেয়ে ঢের, ঢের গুণ বেশি হয়।"

মন্ত্রী গিয়ে রাজাকে ছড়াটা শোনালেন। রাজা চুপ!

এবারেও মন্ত্রীর বুদ্ধির কাছে হার মেনে রাজা আবার একটা নতুন উপায় ঠাওরালেন যাতে উজিরকে ফাঁদে ফেলতে পারেন। তিনি এবারে করলেন কী, উজিরকে একটা ভেড়া দিয়ে বললেন, "তুমি কি এই ভেড়া থেকে আমাকে এক রাত্তিরের ডিনার খাওয়াতে পারবে? তারপর এই ভেড়া থেকেই আমার কিছু টাকা রোজগার হয় যাতে, সেই ব্যবস্থা করতে পারবে? তারপর কাল সকালে এই ভেড়াটা জ্যান্ত আমাকে আবার ফেরত দিতে পারবে?"

উজির এবারে ভেড়া-বগলে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এলেন। রাজার খামখেয়ালে তিনি অতিষ্ঠ। এবারে আর রক্ষে নেই! মেয়েকে বললেন, "মা গো, আর আমরা পারলুম না। এবার আমার মুন্ডু যাবেই। তুমি সাবধানে থেকো।"

মেয়ে বললে, "কিচ্ছু ভাবনা নেই বাবা। কেঁদো না তুমি। আমি সব ঠিকঠাক করে দিচ্ছি। এটা দুম্বা ভেড়া তো, আগে তুমি ওর মোটা সোটা লেজটা কেটে নিয়ে এসো দেখি। দুম্বা ভেড়ার লেজ খুব মাংসল হয়। আর লেজ বাদ দিলেও ভেড়ার প্রাণের কিছু ক্ষতি হয় না।



লেজটাতে যে মাংস ছিল সেটা রান্না করে তুলে রাখল মেয়েটি। তারপরে ভেড়াটার সব লোম চেঁছে নিয়ে উল-ওয়ালাদের কাছে বিক্রি করতে পাঠাল। লোম বিক্রি করে দশ টাকা নিয়ে এল উজিরের লোকটি। পরের দিন সকালে উঠে একহাতে ভেড়ার মাংসের পাত্র, অন্য হাতে ভেড়ার দড়ি, আর পকেটে দশ টাকা নিয়ে রাজসভায় গেলেন।

"এই যে আপনার জ্যান্ত ভেড়া। এই যে দশ টাকা, আপনার ভেড়ার লোম থেকে রোজগার। আর হুজুর এই নিন আপনার ভেড়ার ডিনার।"

হেসে ফেলে রাজা বললেন, "নাঃ! আর তোমাকে আমি প্রশ্ন করব না মন্ত্রী—কেবল এই একটি প্রশ্ন ছাড়া। বলো দেখি কেমন করে তুমি আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারলে।"

শুনে মন্ত্রীর ভয় করল। সত্যি বলবেন? সত্যি শুনলে যদি রাজা আবার খেপে যান? কিন্তু উজির রাজার কাছে কখনও মিথ্যে বলেন না—তাই তিনি এবারেও সত্যি কথাই বললেন। গর্বে বুক ফুলিয়ে উজির বললেন "মহারাজ, আমার ঘরে আমারও একটি খুদে মন্ত্রী আছে। আমার মেয়ে। সে খুব ধাঁধার উত্তর দিতে ভালোবাসে। আপনার সব প্রশ্নের উত্তর সেই আমাকে বলে দিয়েছে।"

সেই না শুনে, রাজা আহ্লাদে সিংহাসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। আকাশে দু'হাত ছুড়ে রাজামশাই বললেন "এই তো? পেয়েছি, অবিকল এমনি একটি মেয়েকেই তো আমি সারাজীবন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। রানি করব বলে!"

উজির এখনও রাজার ডানদিকের আসনে বসে হাসিমুখে মন্ত্রীগিরি করেন। উপরন্তু তিনি এখন রাজার শ্বশুর। রানিমার বাবা।

রাজার প্রশ্ন ফুরোল।
উজিরের প্রাণ জুড়োল॥
রাজার ঘরে রানি এলেন।
উজির রাজার শ্বশুর হলেন॥
রাজার মন্ত্রী রাজার রানি।
সব প্রশ্নের জবাব জানি॥

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিরিয়া শহরের এক জুতোসিলাই মুচি, হোনিম। দিবারাত্র যখন যাও খাটছে নেশার মতো। আসলে ওস্তাদ কারিগর সে—যেমনি তার সরেশ জুতো তেমনি হাতের কাজ। কত জায়গার কত লোক যে আসে-যায় তার হাতের একজোড়া জুতোর দিশেয় যে কী বলব।

এই যে হোনিম, একদিন টকটকে লাল চামড়ার উপরে সোনালি জরি ফলিয়ে ভারী সুন্দর চপ্পল বানালে একজোড়া। সে যে কী অপূর্ব কাজ—চামড়ার লালি যেন ছায়ার মধ্যে দীপের মতো জ্বলছে, নকশাজরি মনে হচ্ছে যেন মণিমুক্তোর ঝিলিমিলি—এই টুকটুকু মাপের চপ্পলজোড়া দেখে মনে হয় যেন রাজবালা জোচ্ছনাকুমারীর আভা দেওয়া গোলাপি চিকন পা দু-খানা ওর ভিতর রাখলে তবে মানায়। নিজের কাজ নিজেই হোনিম চোখ ফেরাতে পারে না। নাঃ, এ চটিজোড়া ও বেচবে না। কাঁচ দেওয়া তাকে যত্ন করে সাজিয়ে রেখে হোনিম আবার কাজে বসল। কিন্তু বারেবারেই উঠে গিয়ে দেখে আসে এক-একবার। হল কী, রোজদিনই কাজ করতে করতে হোনিম এক একবার উঠে গিয়ে দেখে আসে, হাত বুলোয়।

লাল চপ্পলের কথা দেখতে দেখতে অনেক দূর রটে গেল।

নাকি জব্বর একজোড়া চটি বানিয়েছ মুচিভাই! ওই তো— বাঃ! লাল যেন ফেটে পড়া আনারের, গায়ে ঘুর কাটা নকশাজরি যেন আপনা-ফোটা লতা ফুল, ফোঁড়টুকু জোড়টুকু আঁচ হয় না, বাঃ। লোক আসে, দেখে, তারিফ করে—ওস্তাদ কারিগর বটে!

একদিন ঘোড়ার পিঠে এল জমকা বেশবাস করা এক ছেলে। নেবে ঢুকে, হাতে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে—নাঃ মনপসন্দ কাউকে দিতে হয় তো এমনি চপ্পল একজোড়া, আমিরের মেয়ে তার পিয়ারী বউ গোঁসা করে গেছে বাপের ঘরে—তো এ চটিজোড়া তার চাই-ই চাই—

যেই ভাবা, সে চটিজোড়া হাতে ধরেই গেছে সে হোনিমের লাগোয়া—কত দেব হে তোমায়—

কাজ করতে করতে একটু থেমে চেয়ে নিচু গলায় বলল হোনিম, না রাজাদাদা, ওটা বিক্কিরির না। বলে আবার উবু হয়ে পড়ল কাজে।

কত, চাও কত বলোই না, বেশিই পাবে। বলে বুঝিয়ে জোর-জেদ করে তাও কিছুতে কিছু না। ওই যে একবার না বলে কাজে উবু হয়ে বসেছে, মুচি আর মাথাই তোলে না। রাগে হারে রাঙা হয়ে ছুটলাফে ঘোড়ায় উঠে ঘোড়া ফিরিয়ে চলল সে ঘরমুখো। বড়োমানুষ সওদাগরের একমাত্র ছেলে, কোনো চাওয়া তার না হয়নি কখ্খনো।

না, এ জুতো তার চাই-ই চাই। কিন্তু কীসে যে পাবে, সে তার কিছুতেই মাথায় এল না সেই মুহূর্তে।

পরদিন ফের গেল সে হোনিমের দোকানে। ওহে দোকানদার, দেখ এই দেখ, বলে জেব থেকে হাত গলিয়ে বের করে এনেছে একটা পেট ফোলা বটুয়া-ভর্তি আশরফি-মোহর, দেখ, এতে হবে?

হোনিম মাথা না তুলেই বলল, ও চটি বিক্কিরির না রাজাবাবু— চামড়া কাটছে তো কাটছে, সিলিয়েই চলেছে, আর নজর নেই।

রাগে ছটফট করে উঠল ছেলে—বেচবে না? এক কথা তোমার। আচ্ছা দেখি কী রকম না বেচ।

সে রাতে বউ বলল হোনিমকে, কেন অমন গোঁয়ারতুমি করছ বল দিকি ? রাজারাজড়া লোক ওরা, কত ওদের বল তা জান?

আর বেচবে না যদি তো অত খাটনি করে বানালে কেন? মেহনতের দাম নেই?

হোনিম বউকে বোঝাতে পারলে না, ও তাকে দিয়ে দেব্‌তা বানিয়ে নিয়েছেন খোদা মালুম কার জন্যে, দেব্‌তার দয়া না হলে ও তার অমনি হত না।

কিন্তু দিনের বেলায় ফের সে ছেলে। আবার ঘুমের বেলা ফের তার বউয়ের গাওনা, দিবারাত্র ঘ্যানঘ্যানানিতে একদিন ছেলেকে দেখেই ত্যক্ত হয়ে হোনিম বলে ফেলল, নাও বাপু—নিয়েই যাও, যা খুশি দাও, দিয়ে নিয়ে যাও।

দিগ্‌বিজয়ী বীরের মতন জুতো তো না, সাতরাজার ধন হাতে করে যেন হাওয়া উড়ে বাড়ি ফিরে এল ছেলে। আর হোনিম?

ফের উবু হয়ে বসেছে যন্তরের পরে। মাঝে মাঝে নিশ্বাস ফেলে বিক্কিরি চটিজোড়ার ফাঁকটুকুর দিকে চায়, আবার হাত চলেছে সমানে।

এদিকে পরদিন ভোরবেলায় সদাগরের বাড়িতে হই হই কাণ্ড। কী, না ভোরে উঠে ডান পায়ের চপ্পলপাটি মিলছে না তার আমিরজাদি বউয়ের। গেল কোথায়? খোঁজ খোঁজ— ঘরকোনায় দোরগোড়ায়—উপর থেকে নীচতলার কামরাকানাচ তোলপাড়— সে চটি কোত্থাও নেই। এরই মধ্যে মুখে মুখে চাউর হয়ে গেছে, না কি এক ধুরন্ধর চোর ঘর গলে ঢুকে সে



চটি নিয়ে হাওয়া। দাসী বাঁদি নফর-চাকর—ধমকে ধাতিয়ে হুংকার করে কোনো হদিসই হল না। তা হলে কী—

হাবাগোবা ভান করে ওই যে লোকটা উবু হয়ে মুখ গুঁজে জুতো সিলোয় বসে নাগাড়ে, কথাই কইতে চায় না—তা হলে কী—

নির্ঘাত। বেচেছে ভালোমানুষী করে, এখন ফের, হ্যাঁ! নির্ঘাত! চুরি করেছে রাত না পুয়োতে...

বদমাশ বেওকুফ, আমার হাতে পার পাবি এইতে ?

মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়া নিয়ে ছেলে হাজির মুচির দোকানে। কই, কই সে জুতো?

অবিকল সেই জায়গাটাতে ছবির মতন মাথা গুঁজে বলে লোকটা যন্তরের পরে. অবাক হয়ে মাথা তুলে একবার আদাব জানিয়ে, ব্যাস্! আবার বেহুঁশ তার সে যন্তরের পরে।

চ্যাঁচামেচি করে, এদিকেরটা ওদিক করে, গেঁটে-নেটে ছেলে কোনোই কিনারা করতে পারলে না কিছুর। নিশ্চয় সরিয়ে ফেলেছে চোরাই মাল। কিন্তু—

জিজ্ঞেস করলেই কি জবাব পাবে? জোর দেখালে? লোভ দেখালে? ফ্যাল ফ্যাল করে একবার চায় শুধু লোকটা। পাড়াপড়শি জমে গেছে হাঁকেডাকে, তারাও বোধ হয় সুচোখে দেখছে না ছেলের ব্যাপারস্যাপার। কী করা! বিরক্ত নিরাশ হয়েই ফিরতে হল অগত্যা।

বাড়ির মুখে ফের আর একপ্রস্থ ভিড়। না, মেলেনি। ইনাম কবুল করেছেন সওদাগর। খুঁজতেও বাকি নেই কোনোখানে। কিন্তু, না।

ঘরে ঢুকে বিবির মুখ ভার, নিজের মন ভার, তার ওপর একপাটি চপ্পলেই যেন সোনা জ্বলছে। রাগের চাইতেও বেশি লাগে মনখারাপি। যেই চোর হও বাপ, আর পাটি না পেলে তোমারও তো উপায় নেই।

তো ডবল পাহারা বসুক আজ রাতে।

বসল পাহারা।

ভোরে উঠে, পয়লা নজর পড়তেই, ও ব্বাবা!

বাকি পাটিটা-বা কোথায়?

চোরের মার খেল পাহারাদার লোকগুলো। তবু কিছুতে কেউ বলতে পারে না, কী হয়েছিল। কখন গেল চপ্পলপাটি। খোদা মালুম হুজুর। আমাদের কসুর নেই।

এত বড়ো চোর কে আছে এই এতগুলো চোখের ওপর দিয়ে তুলে নিয়ে যায় সামিগ্রি?

আবার অতখানি বাড়ির ঘরবার কামরাকানাচ তছনছ করে খোঁজা হল। না, কোথাও নেই।

বিবি মুখ ফুলিয়েছে কেঁদে, ছেলের মাথা ফুটছে রাগে অনুপায়ে, সদাগর নিজে গেলেন মুচির কাছে। অমনি আরেক জোড়া চপ্পল যে না হলেই নয়, যত টাকা লাগে। আর-সব ফেলে এখুনি বসো কাজে, এই দণ্ডে—

বড়োমানুষের কথা. সে প্রায় রাজ-আজ্ঞার তুল্য। আর কাজ ফেলে হোনিম তখুনি বসে

গেল ফের। যত্নে সাবধানে মাপ চামড়া কেটে-জুড়ে রং ফলিয়ে, নকশাজরি লিখে গড়তে লাগল বসে বসে

নাঃ। দুঃখ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে আপনাতেই, হয়নি।

হল না হুজুর। কুণ্ঠায় সংকুচিত হয়ে পড়ে হোনিম, সওদাগরের সামনে। হাতে তুলে পরখ করেন সদাগর। গম্ভীর মুখ। ফের বানাও, যত দাম লাগে পরোয়া নেই।

হোনিম মরিয়া হয়ে দিনরাত ভুলে ঘুম খাওয়া ভুলে একাসনে নিশ্ছিদ্রি উবু হয়ে মুখ গুঁজে—এক-দুই-তিন-চার

গড়ে, আর ফেলে দেয়—নাঃ, তেমনটা কিছুতে হয় না—কোথাও-না-কোথাও খুঁত ধরে আছে সে তো কারিগরের চোখ এড়াতে পায় না। আগের সে চপ্পলজোড়া যে চোখে ধরে দেখেছে সেও মিলাতে পারে না। তা হলে?

আবার গড়ি হুজুর—

শিরদাঁড়া ধনুকের মতন বেঁকে গেল মুচির, সে আর বসে না সোজা হয়ে। সে কথা কইতে ভুলে গেল, তার চোখজোড়া নিবু হয়ে আসতে লাগল ক্রমে ক্রমে।

চার পাশের ঝাপটা হাসির ধমকে ছেলে চলে গেল একদিন, সে ঘরে ফিরল না—

কেঁদে চোখ ক্ষয়ে ফেলল সোহাগি তার আমিরজাদি বউ।

ছেলের শোকে পাথর হয়ে বসে রইলেন সওদাগর।

বছর ঘুরে গেল। যুগ ঘুরে গেল। সে ছেলেও নেই, সে মুচিও নেই। লাল চটিজুতোর গপ্পটুকু আজও রয়ে গেছে! লোকে বলে, আহা কী চপ্পল না গড়েছিল আমাদের সেই হোনিম। আহা, ও হল পরির চপ্পল, পরিই মুচিকে দিয়ে বানিয়ে নিয়েছিল তার ইচ্ছেখুশি, সে কি অমনি হয় মন করলেই? চামড়ার লালির গায়ে সেই জিয়ন ফুল—যেন ছটফট করছে, ছুঁতে গেলে যেন ছ্যাঁকা দিয়ে উঠবে হাতে। সে কি মানুষের লোভের জিনিস? যে লোভ করে সে কি তা রাখতে পায়? সে খালি নষ্ট করে ফেলে লোভ হাতে ছুঁয়ে।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



সেই রাখালের মেয়ে

দক্ষিণারঞ্জন বসু

পারস্য-রাজের একটিমাত্র ছেলে। ঘুরে বেড়ায়, শিকারে বেরোয়, আমোদ-প্রমোদে কাল কাটায়।

হঠাৎ একদিন রাজার কাছে এসে সে বললে, 'বাবা, সেদিন মাঠে এক রাখাল-কন্যাকে দেখে আমার ভারী ভালো লেগেছে। তুমি অনুমতি দাও, আমি সেই অপরূপা সুন্দরীকেই বিয়ে করব।'

'দূর পাগল, তা কি হয় কখনও? আমি দেশের রাজা, তুমি আমার ছেলে। আমার পরে তুমিই রাজা হবে। তোমার কি কখনও রাখালের মেয়ে বিয়ে করা চলে?'—এই বলে ছেলেকে শান্ত করতে চাইলেন পারস্য-রাজ।

রাজার চেয়েও রাজার ছেলে অনেক বেশি তুখোড়। তাকে বাগ মানানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। সঙ্গে সঙ্গেই সে জবাব দিলে, 'কেন বাবা, আমি যদি তাকে বিয়ে করি, তাহলে আমি রাজা হবার সঙ্গে সঙ্গে সেও-তো রানিই হয়ে যাবে। তখন তো রাখালের মেয়ে বলে আর তার কোনো পরিচয় থাকবে না, সবাই তাকে রানি বলেই জানবে। কাজেই এতে আর আপত্তির কী থাকতে পারে?'

রাজা দেখলেন, ছেলের যুক্তি তো খুবই প্রবল। তাছাড়া রাখাল-কন্যার প্রতি কুমারের প্রেমও খুবই গভীর। অগত্যা তিনি একজন যোগ্য দূতকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন রাখাল-কন্যার কাছে গিয়ে তাঁকে সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলতে এবং রাজকুমার যে তাকে বিয়ে করবে, সেকথা তাকে জানিয়ে আসতে।

দূত রাখালের মেয়ের কাছে গিয়ে রাজকুমারের বিয়ের প্রস্তাব তুলতেই এক ধাঁধায় পড়ে গেল রাখাল-কন্যা। সে একেবারে সরাসরি মুখের ওপর জিজ্ঞেস করে বসল, 'হাতের কাজ কিছু জানেন তো কুমার?'

'সে আবার কী কথা? রাজার ছেলে, সে আবার হাতের কাজ কী জানবে? তা আবার হয় নাকি কখনও?' — অবাক হয়ে উত্তর দেয় দূত।

'না, পরিশ্রমের কাজ, কিছু হাতের কাজ তাঁকে শিখতেই হবে। রাজার ছেলে বলে অলস জীবনযাপন করবেন এবং তিনি আমার স্বামী হবেন, তা কখনও হতে পারে না।'—রাখাল-কন্যার এইসব চোখাচোখা কথা শুনে দূত অনেকটাই ভড়কে গেল। তবু ভয়ে ভয়েই একদিন গিয়ে রাজদরবারে উপস্থিত হতে হল তাকে এবং সবিনয়ে সব কথাই সে রাজার কাছে ধীরে ধীরে খুলে বললে।

রাজাও কম বিস্মিত হলেন না দূত-মুখে সামান্য এক রাখালের মেয়ের এমনি ঔদ্ধত্যের কথা শুনে। মনে মনে তার আবার প্রশংসাও করলেন, ওরা খেটে-খাওয়া মানুষ, অকেজো লোককে ওরা পছন্দই-বা করবে কেন? যাই হোক, কুমারকে একবার সবটা বলেই দেখা যাক, এসব শুনে শেষ পর্যন্ত তার যদি মত বদলায়। সেই মতলবেই রাজা কুমারকে ডেকে পাঠালেন। নিজের কাছে একান্তে বসিয়ে তাকে রাখাল-কন্যা দূতকে যা যা বলেছে, সবই পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বললেন।

কুমার মুখ নিচু করে বাবার কথা খুব মন দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ একটি প্রশ্ন শুনে মাথা তুলে সে একবার তাকাল বাবার মুখের দিকে। বাবা তাকে প্রশ্ন করেছেন, 'তুমি রাজার ছেলে। তোমাকে কারিগর হতে বলছে রাখাল-কন্যা, তা নাহলে সে নাকি তোমায় বিয়ে করবে না। এরপরেও তুমি তাকে তোমার স্ত্রী করতে চাইবে?'

'হ্যাঁ বাবা, তাই।' — বিন্দুমাত্র না-ভেবে উত্তর দিলে কুমার। বললে, 'আমি কয়েকদিনের মধ্যেই মাদুর বানানো শিখে ফেলব এবং ওই রাখাল-মেয়েকেই তোমার ছেলের বউ করে ঘরে নিয়ে আসব।'

এরপরে আর কী বলবেন রাজা।

কুমার মাদুর বানানো শিখতে শুরু করে দিলে। তিনদিনের মধ্যেই সে নানা ধরনের মাদুর তৈরি করতে শিখে ফেললে। চমৎকার তার হাতের কাজ। রং-বেরঙের সব মাদুর সে তৈরি করলে কয়েকদিনের মধ্যে। তাতে আবার কতরকম কারুকাজের বাহার।

রাজা খুবই খুশি হলেন কুমারের কৃতিত্বে। দূতকে আবার রাজদরবারে ডাকিয়ে আনলেন। কুমারের নিজ হাতের তৈরি ভালো ভালো কয়েকটি মাদুর সঙ্গে দিয়ে তাকে আবার পাঠিয়ে



দিলেন সেই রাখাল-কন্যার কাছে।

'এই সব ক-খানা মাদুরই আমাদের কুমারের তৈরি।'—এই বলে রাজদূত মাদুরগুলো এক এক করে খুলে রাখলে রাখাল-কন্যার সামনে। আর তা দেখে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে বলে উঠল, 'এরই মধ্যে এত সুন্দর মাদুর বানাতে শিখে ফেললেন রাজকুমার? আশ্চর্য!'

সেই দূতের সঙ্গেই এবার মহাআনন্দে একেবারে রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত সেই কিশোরী রাখাল-কন্যা। মহাসমারোহে কুমারের সঙ্গে তার বিয়েও হয়ে গেল। সেই বিয়ে উপলক্ষ্যে রাজ্যময় ধূমধাম শেষ হবার পর হঠাৎ একদিন এক দুঃসংবাদ শোনা গেল। সারা রাজ্যে তা নিয়ে মহা হইচই।

রাজধানী বাগদাদের রাজপথে বেড়াতে বেরিয়েছিল রাজার কুমার। বেড়াতে বেড়াতে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এক মুসাফিরখানা দেখে সেখানে খানিক বিশ্রাম ও খানাপিনার জন্য ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে তার আর কোনো হদিসই পাওয়া যাচ্ছে না। মুসাফিরখানার লোকরাও কিছুই বলতে পারছে না তার সম্বন্ধে।

এদিকে মহানগরীর পথে পথে রব উঠেছে—

রাজার কুমার, রাজার কুমার.
কোথায় পালালে?
কাল গিয়েছে, আজও গেল;
আসছে সকালে
ফিরে আসতে হবেই হবে,
আর তা না হলে
সবাই মোরা মরবো ডুবে
সমুদ্রজলে।

কুমারকে হারিয়ে এমনিভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছে রাজধানীর সব লোকজনেরা। তারা আর কী করে জানবে যে কী এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে বাঁচবার জন্য কী অসাধারণ বুদ্ধির লড়াই করে চলতে হচ্ছে রাজপুত্রকে।

যে মুসাফিরখানায় গিয়ে রাজকুমার আশ্রয় নিয়েছিল বিশ্রামের জন্য, তার পরিচালনায় রয়েছে একদল ডাকাত। মুসাফিরখানাটি তারা এমন ঝকঝকে তকতকে করে রাখে যাতে বড়োলোকদের দৃষ্টি সেদিকে সহজেই আকৃষ্ট হতে পারে। প্রতিদিনিই এমনিভাবে কিছু সংখ্যক ধনী ওই ডাকাতদের কবলিত হয়। তাদের প্রাণ নিয়ে ডাকাতেরা ছিনিমিনি খেলে। মাটির তলায় মস্তবড়ো এক জায়গায় তাদের সবাইকে আটক করে রাখা হয়। আর বেছে বেছে আগে মোটা মোটা লোকগুলোকে জবাই করা হয়।

ভাগ্যি নিছক এক কৃশকায় তরুণ। তাই তার দিকে তেমন দৃষ্টি পড়েনি ডাকাতদের। তা ছাড়া তারা জানেও না যে, সে আর কেউ নয়, একেবারে খোদ রাজার ছেলে। কাজেই মাটির তলার গুদামঘরেই দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল কুমারের।

একদিন ডাকাতদের সঙ্গে কুমারের অনেক কথাবার্তা হল। কুমার তাদের জানাল, সে এক সামান্য কারিগর। খড় দিয়ে সে খুব সুন্দর সুন্দর মাদুর তৈরি করতে পারে এবং বাগদাদের রাজপ্রাসাদে ও অন্যান্য ধনীদের কাছে সেসব মাদুর বহুমূল্যে বিক্রয় হয়। এ শুনে ডাকাতেরা খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং কুমারকে অনেক খড় এনে দেয় ভালো ভালো কয়েকটি মাদুর তৈরি করে দেবার জন্যে।

কুমার দিন কয়েকের মধ্যেই কয়েকখানি অতি সুন্দর মাদুর বানিয়ে ডাকাতদের হাতে তুলে দিলে। তাদের একথাও বলে দেওয়া হল যে, এ মাদুরগুলো পারস্য-রাজের হাতে পড়লে এর প্রত্যেকটির জন্য একশো করে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাবেই। শুনে ডাকাতদের আনন্দ আর ধরে না।

সেদিনই রাজপ্রাসাদে তিন-চারজন লোক গিয়ে হাজির নতুন ডিজাইনের কয়েকখানি মাদুর নিয়ে। মাদুর ক-খানা দেখেই রাজার চক্ষুস্থির।

'এ যে আমারই ছেলের তৈরি মাদুর, তারই হাতের কাজ!'—রাজা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বউমাকে ডেকে এনে দেখালেন ওই মাদুরগুলো।

পুত্রবধূ এক এক করে খুঁটে খুঁটে প্রত্যেকটি মাদুর দেখলে। দেখে সে আবিষ্কার করল তা থেকে তার স্বামীর বন্দিদশার কাহিনি। এক একটি মাদুরের বুনটের ভিতর দিয়েই রাজকুমার অতি কৌশলে লিখে দিয়েছে সে কাহিনি। আর তা ধরতে পেরেই ভয়ে শিউরে উঠেছে তার নব-পরিণীতা স্ত্রী। স্বামী কি তার এখনও বেঁচে আছে? যদি থেকে থাকে তাহলে এখনই যদি তাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা না করা যায়, তবে আর তাকে রক্ষা করা যাবে না। অবিলম্বে তাকে উদ্ধার করার কথাই লিখেছে কুমার। রাজাকে মাদুর থেকে সমস্ত লেখাটুকু পড়ে শোনালে বউমা এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজাদেশ ঘোষিত হল মাদুর-বিক্রেতাদের গ্রেফতার করার জন্য। আর সেই লোকগুলোকে বেঁধে নিয়েই ডাকাতের আড্ডায় হানা দেবার জন্য জোরকদমে ছুটে চলে একদল অশ্বারোহী সৈন্য। বাগদাদের পথে পথে লোকের মুখে মুখে আবার ধ্বনি ওঠে :

রাজার কুমার, রাজার কুমার,
পালিয়ে থাকা চলবে না আর;
আনতে খুঁজে চলছে ছুটে
জোরকদমে ঘোড়সওয়ার
রাজার কুমার—!

যে কয়েকজন ডাকাতকে ধরা হয়েছে, তাদের কোতল করা হবে যদি তারা ঠিক তাদের আড্ডায় সৈন্যদলকে নিয়ে পৌঁছে না দেয়। প্রাণের দায়ে রাজাকে তারা কথা দিয়েছে সৈন্যদের তারা ঠিক ঠিকানায় নিয়ে যাবে। ঠিক পথেই তাদের তারা নিয়ে এসেছে। একটু দূর থেকে সৈন্যদের তারা দেখিয়ে দিয়েছে তাদের মুসাফিরখানা, বলে দিয়েছে মাটির তলায় তাদের বিরাট বন্দিশালার কথা।

অশ্বারোহীরা মুহূর্তের মধ্যে মুসাফিরখানার চারদিক ঘিরে ফেললে। ডাকাতদের সঙ্গে রীতিমতো একহাত লড়াই হয়ে গেল। সেখানেই বেশ কয়েকজন দস্যুর লাশ পড়ে গেল, বাকিগুলোকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হল।

মাটির তলার বিরাট গুদামঘরে ঢুকে সৈন্যদল দেখতে পায় বাগদাদের এক-একজন নামকরা লোককে সেখানে আটক করে রাখা হয়েছে। এক এক করে তাদের সকলকেই ছাড়া হতে লাগল। কিন্তু রাজকুমার কোথায়, সেটাই সৈন্যদের আসল চিন্তা।

দূর থেকে একজন বন্দিকে দেখা গেল সে একমনে মাদুর বুনে চলেছে। ওই তাহলে নিশ্চয় রাজকুমার। সৈন্যরা ছুটে গিয়ে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে বেরিয়ে এল। সুসজ্জিত এক হাতির পিঠে তুলে দেওয়া হল কুমারকে। তারপর তাকে অনুসরণ করে বিরাট এক মিছিল চলল রাজপ্রাসাদের দিকে।

সারা বাগদাদ আজ আনন্দমুখর। চতুর্দিক থেকে জয়ধ্বনি উঠছে :

রাজার কুমার, রাজার কুমার,
অ্যাদ্দিন পর ফিরলে এবার;

জয় জয়কার মহারাজার,
জয় জয়কার বউ-রানিমা'র।

প্রাসাদে ফিরে কুমার তার স্ত্রীকে পরিষ্কার বললে যে, একমাত্র তার জন্যেই সে বেঁচে গিয়েছে। সব শুনে রাজাও তাঁর রাখাল-কন্যা পুত্রবধূকে কাছে টেনে নিয়ে অজস্র আশীর্বাদ করলেন।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



খাঁটি মানুষের খোঁজে

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

কোনো এক দেশের সুলতান তাঁর রাজ্যের কর আদায়ের ব্যাপারে একজন সৎ ও বিশ্বাসী লোকের খোঁজ করছিলেন।

রাজরাজড়ার ব্যাপার। যেমন ভাবা তেমনি চারদিকে লোকের সন্ধানে ঢ্যাঁরা পেটানো হল। সুলতানের পাইক-পেয়াদারা সারা রাজ্যে খবর ছড়িয়ে দিল : চাকরি খালি! চাকরি খালি! রাজ্যের কর আদায়ের জন্য একজন বিশ্বাসী কর্মচারী সুলতান বাহাদুর খুঁজছেন।

মুহূর্তেই খবর ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের ভিতরে। অনেকের প্রাণে উৎসাহ জেগে ওঠে। প্রচুর মানুষ রাজদরবারে সেই চাকরি পাবার আশায় স্বপ্ন দেখতে থাকে।

সুলতানের দরবারে চাকরির আহ্বানে রাজ্যের ভিতরে রীতিমতো সাড়া জাগল।

প্রচুর মানুষ আবেদন জানাল। পদের সংখ্যা এক কিন্তু প্রার্থীর সংখ্যা অনেক।

তবু সুলতানবাহাদুর সাক্ষাৎকারের জন্য সমস্ত প্রার্থীকেই নির্দিষ্ট একটি দিনে আমন্ত্রণ জানালেন। এতগুলো মানুষ, এরই ভিতর থেকে সত্যিকারের একজন সৎ ও বিশ্বাসী লোককে বেছে নিতে হবে। কাজটা খুব সহজ নয়।

সুলতানবাহাদুরকে চিন্তিত দেখে তাঁর বিচক্ষণ উজির নিবেদন করলেন, যদি অনুমতি

করেন তাহলে আমি আপনাকে সত্যিকারের একজন সৎ মানুষের সন্ধান দিতে পারি। আপনি অনুগ্রহ করে প্রার্থীদের একবার আপনার সামনে শুধু নাচতে বলবেন।

উজিরের প্রস্তাব শুনে সুলতানবাহাদুর বিস্ময় প্রকাশ করলেন। কিন্তু বয়স্ক বিচক্ষণ উজিরের অনুরোধ উপেক্ষাও করতে পারলেন না। সকৌতুকে মজা দেখবার জন্য উজিরের প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন সুলতানবাহাদুর।

উজির মনে মনে তাঁর সৎলোক সন্ধানের পরিকল্পনা ছকে ফেললেন।

নির্দিষ্ট দিনে প্রার্থীরা সুলতানের দরবারে যাবার জন্য এসে উপস্থিত।

প্রার্থীদের উদ্দেশ করে দরবারে পৌঁছোবার জন্য পিছনদিককার প্রায়-অন্ধকার একটি অলিন্দ দেখিয়ে উজির বললেন, আপনারা এই পথ ধরে সাবধানে এগিয়ে যাবেন। অলিন্দ-শেষে সুলতানের দরবার, আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সুলতানবাহাদুর সেখানেই অপেক্ষা করছেন।

অন্ধকার অলিন্দ পার হয়ে প্রার্থীরা সুলতানের জাঁকজমকপূর্ণ দরবারে এসে হাজির।

সিংহাসনে পার্ষদ পরিবৃত হয়ে সুলতান তখন বসে। সুলতানকে প্রার্থীরা অভিবাদন জানাবার পরই তিনি তাঁদের বললেন, আপনারা চাকরির জন্য এসেছেন, খুব ভালো কথা। প্রথমেই একটু নাচ দেখিয়ে আমার মনোরঞ্জন করুন। পরে অন্য ব্যাপার-স্যাপারগুলি হবে।

নাচ! উপস্থিত প্রার্থীদের অনেকেই বিস্মিত হলেন।

সে কী, ভদ্রলোকের ছেলে—চাকরির জন্য এসে শেষ পর্যন্ত নাচ দেখাতে হবে!

অনেকেই আপত্তি তুলতে চেষ্টা করেন, শুধু একজন প্রার্থী ছাড়া।



সুলতানের কথায় শুধু সেই একজন সঙ্গে-সঙ্গেই নাচ দেখাতে শুরু করলেন। এবং বেশ সুন্দর নাচও দেখালেন।

অন্য প্রার্থীরা মুখ নিচু করে তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে। চোখে-মুখে তাঁদের তীব্র আপত্তি।

সুলতান বাহাদুর দমবার পাত্র নন। অন্য প্রার্থীদের এই আচরণ দেখে প্রায় রেগে গিয়ে হুকুম দিলেন : বলছি, নাচ দেখাও তোমরা, নইলে—

সুলতানবাহাদুরের হুকুম, না জানি শেষ পর্যন্ত গর্দানই হয়তো যাবে। কী আর করা যাবে— প্রাণের ভয়ে বাধ্য হয়ে অন্যান্য প্রার্থীরা তখন হাত-পা ছুঁড়তে চেষ্টা করলেন অতি সাবধানে।

যেই-না তাঁদের নাচ শুরু করা, অমনি তাঁদের ট্যাঁক থেকে, পাগড়ি থেকে, পকেট থেকে সোনাদানা মোহর টুং টাং আওয়াজ তুলে দরবারের মেঝেতে গড়িয়ে পড়তে থাকে। কারো কারো দু-পকেট বোঝাই মোহরের ঝনঝনানি দরবারের পরিবেশকে দিব্যি বাদ্যমুখরও করে তোলে।

বৃদ্ধ উজিরের চোখমুখ এইবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ওঁদের নাচ থামিয়ে দিয়ে উজির সুলতানবাহাদুরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হুজুর, খাঁটি মানুষের সন্ধান বোধ হয় আপনাকে দিতে পারলাম। ওই যে লোকটা আপনার এক কথায় কোনও প্রতিবাদ না-করে সুন্দর নাচ দেখালেন, ইনিই হচ্ছেন আপনার রাজ্যের সবচেয়ে সৎ, বিশ্বাসী মানুষ। আপনি নির্ভাবনায় ওঁকে আপনার কর আদায়ের চাকরিতে বহাল করতে পারেন।

উজির তারপর বিবৃত করলেন তাঁর পূর্ব-পরিকল্পনার কথা।

দরবারে প্রবেশের সেই সরু আলো-আঁধারে ঢাকা অলিন্দে প্রার্থীদের সততা যাচাইয়ের জন্য উজির ঢেলে রেখেছিলেন ঘড়া ঘড়া মোহর, সোনাদানা, হিরে-জহরত ইত্যাদি।

সোনাদানা মোহর ইত্যাদির উপর দিয়ে আসতে গিয়ে শুধু একজন ছাড়া অপর কেউই লোভ সামলাতে পারেননি। অন্য সকলে সুযোগ বুঝে যতটা সম্ভব সোনাদানা মোহর তুলে নিয়েছিলেন; পকেটে, পাগড়িতে, ট্যাঁকে গুঁজে রেখেছিলেন—কারোর যাতে নজরে না আসে।

উজির সুলতান বাহাদুরকে আরও নিবেদন করলেন, সুতরাং হুজুর, নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছেন, অপর সব প্রার্থীরা, আপনি নাচতে বলাতে কেন আপত্তি করেছিলেন।

উজিরের বিচক্ষণতার প্রশংসা করলেন সুলতান।

এবং সেই একমাত্র সৎ লোকটিকে তার সততার জন্য প্রচুর পুরস্কার দিয়ে চাকরিতে বহাল করলেন তিনি।

কিন্তু তার আগে ওই অসৎ লোকগুলিকেও তাদের কৃতকর্মের জন্য পুরস্কার পেতে হল সুলতানের কাছে।

প্রহরীদের ডেকে তিনি লোভী লোকগুলিকে কারাগারে আটকে রাখার হুকুম দিলেন।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



আলি কোজি আর সওদাগর

শিশির বিশ্বাস

খলিফা হারুন আল রশিদের সময়ের কথা। রাজধানী বাগদাদ শহরের এক ধনী ব্যক্তি আলি কোজির ইচ্ছে হল দেশভ্রমণে বের হবেন। সেকালের দেশভ্রমণ আজকের দিনের মতো ছিল না। শুধু টাকাপয়সাই নয়, লাগত অনেক সময়ও। অনেকের তো আর দেশে ফেরাও হয়ে উঠত না। আলি কোজি তাই তার সব সম্পত্তি একে-একে বিক্রি করে দিলেন। যাওয়ার আগে হিসেব করে দেখলেন, আনুমানিক পথ-খরচ বাদ দিয়েও বাড়তি প্রায় এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা হাতে থাকছে। আলি তাই ঠিক করলেন, মোহরগুলি বাগদাদেই কারও কাছে রেখে যাবেন।

কবে ফিরবেন ঠিক নেই। এভাবে এতগুলো মোহর কার কাছে রেখে যাবেন, অনেক ভেবেও ঠিক করতে না-পেরে আলি কোজি শেষে এক মতলব আঁটলেন। বড়ো একটা কলশিতে মোহরগুলি ভরে উপরে কিছু জলপাই চাপিয়ে দিলেন। শেষে ঢাকনা বন্ধ করে হাজির হলেন এক সওদাগর বন্ধুর গদিতে। বললেন, ‘দোস্ত, আগামীকালই শহর ছেড়ে যাচ্ছি। কলশিতে কিছু জলপাই আছে। এগুলো আর বিক্রি করা হল না। তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। ফিরে এসে নিয়ে যাব।’

সওদাগর মস্ত ব্যবসায়ী। বন্ধুর অনুরোধে গুদামঘর খুলে দিয়ে বললেন, 'এ আর এমন কী ভাই। সামান্য জলপাই যদিও তবু তুমি নিজেই আমার গুদামঘরে রেখে যাও। ভেব না, যথাস্থানেই থাকবে ওটা। ফিরে এসে নিয়ে যেয়ো আবার।'

আলি কোজি সওদাগর বন্ধুর গুদামের এক কোণে সেই কলশি রেখে নিশ্চিন্তে চলে গেলেন বিদেশ ভ্রমণে। ক্রমে কাজের চাপে সওদাগরও ভুলে গেলেন এই কলশির কথা। এর মধ্যে হয়েছে কী, এক রাতে সওদাগর খেতে বসেছেন। বাবুর্চি সেদিন চমৎকার হান্ডি কাবাব তৈরি করেছে। বউ হঠাৎ বলল, 'সঙ্গে আজ একটু আচার হলে বেশ হত। কাবাবের সঙ্গে জমত ভালো। বাবুর্চিকে বলেওছিলাম সেকথা। কিন্তু বাড়িতে জলপাই নেই। তাই আর হয়নি।'

বউয়ের কথায় সওদাগরের হঠাৎ মনে পড়ে গেল বন্ধু আলি কোজির সেই জলপাই ভরতি কলশির কথা। ততদিনে পার হয়ে গেছে সাত-সাতটি বছর। আলি আর ফিরে আসেনি। সেই কলশি ভরতি জলপাই নিশ্চয় তেমনই পড়ে আছে যথাস্থানে। সওদাগর বউকে বললেন, 'আরে আলির সেই জলপাইয়ের কলশি তো পড়েই আছে গুদামে। আর সেই যে গেছে তারপর মানুষটার কোনও খোঁজই নেই। বেঁচে আছে কি না তারও ঠিক নেই। কিছু জলপাই নিয়ে এলেই তো হয়।'

শুনে হাঁ-হাঁ করে বউ বলল, 'তাই হয় কখনও? বন্ধুকে যে কথা দিয়েছ তার খেলাপ করা ঠিক হবে না। হয়তো কোনওদিন তিনি ফিরে আসতেও পারেন। তখন লজ্জায় পড়ে যাবে। তা ছাড়া এতদিন পরে সেই জলপাই খাওয়ার উপযুক্ত রয়েছে কি না সেও এক কথা। এ কাজ না করাই ভালো।'

বউয়ের কথায় সওদাগর তখনকার মতো নিরস্ত হলেন বটে, কিন্তু মাথায় রয়েই গেল ব্যাপারটা। পরের দিনই তিনি গুদামঘরে সেই কলশিটা খুঁজে বের করলেন। ঘরের এক কোণে তেমনই পড়ে আছে সেটা। ঢাকনা খুলে দেখলেন বউয়ের কথাই ঠিক। এতদিনে জলপাইগুলো শুকিয়ে প্রায় কাঠ হয়ে রয়েছে। পচেও গেছে কতক। খানিক নিরাশ হলেও সওদাগরের মনে হল, কলশির তলার দিকের জলপাইগুলো হয়তো ভালো থাকতেও পারে। ভেবে কলশিটা উলটে দিলেন তিনি। মুহূর্তে ঝনঝন শব্দে একরাশ সোনার মোহর ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। দেখে লোভে চকচক করে উঠল তাঁর চোখ। আলি কোজি কবে ফিরবে ঠিক নেই। আদৌ আর ফিরবে কি না তারও ঠিক নেই। অযথা মোহরগুলো এভাবে পড়ে থেকে লাভ কী। সওদাগর তাই এক মতলব আঁটলেন। মোহরগুলো দ্রুত সরিয়ে ফেলে বাজার থেকে কিছু জলপাই কিনে কলশিতে ভরতি করে রেখে দিলেন যথাস্থানে।

এর অল্প কিছুদিন পরেই আলি কোজি একদিন বিদেশ ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এলেন বাগদাদে। তার পরের দিনই তিনি হাজির হলেন সওদাগর বন্ধুর বাড়িতে। অনেকদিন পরে দেখা। প্রাথমিক দু-চার কথার পর আলি আসল কথাটা পাড়লেন, 'দোস্ত, তোমার কাছে রাখা সেই কলশিটা ফেরত দাও এবার। নিয়ে যাই।'



উত্তরে মাথা নাড়লেন সওদাগর। গুদামঘরের সামনে এসে দরজার তালা খুলে দিয়ে বললেন, 'সে তো ভাই তেমনই পড়ে রয়েছে সেখানে। নিজেই দেখে নিয়ে যাও।'

আলি কোজি আর দেরি না-করে ভিতরে ঢুকে সেই কলশি নিয়ে নিজের ডেরায় ফিরে এলেন। তারপর কলশির ঢাকনা খুলে উপরের জলপাই সরিয়ে ভিতরে হাত দিয়ে তো তাঁর আক্কেল গুড়ুম হবার জোগাড়। মোহর কোথায়? কলশির ভিতর শুধু জলপাই। পাগলের মতো এবার পুরো কলশি তিনি উলটে দিলেন মেঝেতে। একরাশ জলপাই গড়িয়ে পড়ল ভিতর থেকে। একটা মোহরও খুঁজে পেলেন না কোথাও।

দীর্ঘদিন বিদেশে। হাত প্রায় খালি। ভেবেছিলেন ফিরে এসে সওদাগর বন্ধুর কাছে রাখা মোহরগুলো দিয়ে প্রয়োজন মেটাবেন। কিন্তু যা হল তাতে প্রায় আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়। ব্যাপার বুঝতে তখন আর বাকি নেই তার। তাই ফের ছুটে এলেন সওদাগর বন্ধুর কাছে।

এমন যে হবে, সে তো জানাই ছিল সওদাগরের। তাড়াতাড়ি বসতে দিয়ে বললেন, 'কী হল ভাই? এই একটু আগে জলপাইয়ের কলশিটা এসে নিয়ে গেলে, ফের যে ফিরে এলে আবার? ওটা কি তোমার নয়?'

'না দোস্ত,' ঠান্ডা গলায় আলি কোজি বললেন, 'ওটা আমার সেই কলশিটাই বটে। কিন্তু

ভিতরে জলপাইয়ের তলায় যে এক হাজার মোহর রাখা ছিল, তার একটাও নেই এখন। দোস্ত, এজন্য তোমাকে দোষ দিচ্ছি না আমি। সন্দেহ নেই, জরুরি দরকারেই তুমি নিয়েছ ওগুলো। এবার ফেরত দাও আমাকে। এ-ও বলছি, যদি এখুনি দিতে না পার অন্তত স্বীকার করে নাও ব্যাপারটা। তোমার সুবিধামতো দিনকয়েক পরে দিলেও আপত্তি করব না। কষ্টে চালিয়ে নেব কয়েকটা দিন।'

'এ কী বলছ ভাই!' আলির কথায় সওদাগর প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন। 'তোমার জলপাইয়ের কলসি তুমি নিজের হাতে আমার গুদামঘরে রেখেছিলে। ঠিক কি না?'

'ঠিক তাই দোস্ত।' আলি ঘাড় নেড়ে বললেন।

'একটু আগে সেই কলসি তুমি নিজেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছ। আমি ধরিওনি। ঠিক কি না?'

'ঠিক তাই দোস্ত।' আলি বলল, 'কিন্তু জলপাইয়ের নীচে যে এক হাজার মোহর ছিল, সেগুলোর একটাও নেই এখন।'

'তাতে আমার দোষ কোথায়?' ঠোঁট উলটে সওদাগর বলল. 'তোমার জলপাইয়ের কলসি তুমি একটু আগে দেখেশুনেই ফেরত নিয়ে গেছ। এখন বলছ, ভিতরে নাকি হাজার মোহর ছিল। এরপর হয়তো বলবে, সঙ্গে হিরে-জহরতও ছিল। এভাবে বদনাম করার কোনও অধিকার নেই তোমার। এবার ভালোয়-ভালোয় বিদেয় হও দেখি। নইলে লোক ডেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে হবে।'

কথায় কথা বাড়ল। শুরু হল চিৎকার-চ্যাঁচামেচি। সেই চিৎকারে আশপাশ থেকে ছুটে এলেন অনেকে। তাঁরা দুজনের কথাই শুনলেন। কিন্তু কোনও মীমাংসা করতে পারলেন না।

আলি কোজি থামলেন না। দিনকয়েকের মধ্যেই কাজির দরবারে অভিযোগ দায়ের করলেন। ততদিনে ব্যাপারটা নিয়ে নগরে হইচই পড়ে গেছে। খোদ হারুন আল রশিদের রাজত্বে বাগদাদ শহরে এমন ব্যাপার ঘটেনি কখনও। কাজি তাই দু-পক্ষের কথাই ধৈর্য ধরে শুনলেন। শেষে আলি কোজির কাছে জানতে চাইলেন এই ঘটনার কেউ সাক্ষী আছে কি না। উত্তরে আলি ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না জনাব, কোনও সাক্ষী নেই। সরল মনেই বন্ধু সওদাগরের গুদামঘরে কলসিটা রেখে গিয়েছিলাম। ফিরিয়েও নিয়ে গেছি সেইভাবেই। এমন যে হবে, ভাবতেও পারিনি।'

উত্তরে সওদাগর আলির অভিযোগ অস্বীকার করে তার বক্তব্য জানাল।

কাঠগড়ায় উপযুক্ত সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়া অভিযোগের কোনও মূল্য নেই। কাজি তাই খানিক চিন্তা করে মত প্রকাশ করলেন, 'উপরওয়ালা ঈশ্বর নিশ্চয় প্রকৃত কী ঘটেছিল জানেন। সওদাগর সেই খোদাতালার নামে শপথ নিয়ে আলি কোজির অভিযোগ অস্বীকার করতে পারবেন কি?'

উত্তরে কিছুমাত্র সময় নষ্ট না-করে সওদাগর খোদাতালার নামে শপথ নিয়ে জানালেন, আলির অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা।

কাজি আলির অভিযোগ খারিজ করে দিলেন এরপর।

আলি কোজি কিন্তু দমলেন না। ততদিনে জেদ চেপে গেছে তার। এবার তিনি অভিযোগ জানালেন খোদ হারুন আল রশিদের দরবারে। অচিরেই গৃহীত হল সেই অভিযোগ।

খলিফা হারুন আল রশিদ মাঝেমধ্যেই ছদ্মবেশে নগরের রাজপথে বের হয়ে পড়তেন। নিজের চোখে খোঁজ রাখতেন সব কিছুর। প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। এর কয়েকদিন পর এক রাতে তিনি উজিরকে নিয়ে ছদ্মবেশে নগরের রাজপথে ঘুরছেন। হঠাৎ দেখেন পথের ধারে ফুটফুটে জ্যোৎস্নার আলোয় কয়েকটি ছেলে খেলার ছলে কাজির দরবার বসিয়েছে। কাজি হয়েছে একজন। সওদাগরের বিরুদ্ধে আলি কোজির করা অভিযোগের বিচার হচ্ছে সেখানে। কৌতূহলী হয়ে দুজন খানিক দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল বিচার। হারুন আল রশিদ মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন। ছেলেদের খেলা শেষ হতেই পাশে উজিরকে বললেন, 'আগামীকালই আলি কোজির অভিযোগের বিচার হবে। দরবারে আমার পাশে বসে বিচার করবে আজকের খেলায় বিচারকের আসনে বসা ওই ছেলেটি। নগরের কাজির সঙ্গে দুজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীকেও যেন হাজির করা হয় সেখানে।'

পরদিন খলিফা হারুন আল রশিদের দরবারে বিচারের আসর বসেছে। খলিফার পাশের আসনে বসেছে গত রাত্তিরে বিচারকের আসনে বসা সেই ছেলেটি। দরবারে হাজির করা হয়েছে নগরের সেই কাজি আর দুই অভিজ্ঞ ফল ব্যবসায়ীকেও।

যথাসময়ে শুরু হল বিচারসভার কাজ। প্রথমেই আলি কোজি তাঁর অভিযোগ পেশ করলেন। এরপর ডাক পড়ল সওদাগরের। খোদাতালার নামে শপথ নিয়ে সওদাগর সেই আগের কথাই জানালেন। বিচারকের আসনে বসা ছেলেটি তাকে বলল, 'গুদামঘরের চাবি কি আপনি নিজের কাছেই রাখেন?'

'একদম ঠিক। চাবি আমার কাছেই থাকে সবসময়। আমার উপস্থিতি ছাড়া গুদামঘরে কারও ঢোকা নিষেধ।' সওদাগর বললেন।

'বাদী আলি কোজি সাত বছর আগে তাঁর কলশি নিজের হাতে গুদামে রেখে গিয়েছিলেন?'

'ঠিক তাই। ফিরে এসে আলি সেই কলশি নিজে গুদামঘরের ভিতর থেকে বের করে নিয়ে গেছে। আমি হাতও দিইনি তাতে।'

ছেলেটি এবার আলি কোজিকে তার সেই কলশি দরবারে এনে হাজির করতে বলল। আলি জলপাই ভরতি কলশি সঙ্গেই এনেছিলেন। আদেশ হতে সেটা খলিফার সামনে এনে রাখলেন।

'এটাই সেই কলশি তো?' ছেলেটি জানতে চাইল সওদাগরের কাছে।

উত্তরে সওদাগর জানালেন, এটাই সেই কলসি।

ছেলেটির আদেশে এবার খোলা হল জলপাইভরতি কলসির ঢাকনা। খলিফা নিজেই একটা জলপাই তুলে নিয়ে মুখে দিলেন। পাশে ছেলেটির দিকেও এগিয়ে দিলেন একটা। খলিফার আদেশে এবার উপস্থিত সবাইকে একটি করে জলপাই দিয়ে খেয়ে দেখতে বলা হল।

খাওয়া শেষ হতে ছেলেটি দরবারে উপস্থিত দুই ফল ব্যবসায়ীর কাছে জলপাইগুলো

কতদিনের পুরোনো তা জানতে চাইল।

উত্তরে দুই ফল ব্যবসায়ীই বললেন, 'জলপাইগুলো যথেষ্ট ভালো অবস্থায় রয়েছে। বড়োজোর বছর খানেক আগের।'

'জাহাঁপনা', ছেলেটি এবার পাশে খলিফা হারুন আল রশিদের দিকে চোখ ফেরাল, 'অভিজ্ঞ দুই ফল ব্যবসায়ীর মতামত নিজেই শুনলেন। অথচ সওদাগর বলছেন, সাত বছর আগে রাখা আলি কোজির কলশিতে কখনই হাত দেননি তিনি। যেমন রাখা ছিল তেমনই রয়েছে। এদিকে গুদামঘরে তিনি উপস্থিত না-থাকলে অন্য কারও ঢোকার অনুমতি নেই। সুতরাং সন্দেহ নেই, সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলেছেন তিনি। আর ফল ব্যবসায়ীদের কথায় বোঝা যাচ্ছে, জালিয়াতিটা হয়েছে গত এক বছরের মধ্যে।'

খোদ খলিফার কাছে মিথ্যে কথা বলার শাস্তি ভালোই জানা ছিল সওদাগরের। ছেলেটির অকাট্য যুক্তির পর আর দেরি না-করে অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন তিনি। আলি কোজির মোহরও ফিরিয়ে দিতে চাইলেন।

খানিক চিন্তা করে খলিফা বললেন, 'এ অপরাধের শাস্তি হাজার ঘা বেত আর সেই সঙ্গে দশ বছরের কারাবাস। কিন্তু আজকের এই বিচারসভার মুখ্য ব্যক্তি ছোটো এই ছেলেটি। তাই দণ্ডবিধানও তার হাতে।'

কথা শেষ করে খলিফা পাশে ছেলেটির দিকে তাকালেন। উত্তরে সে হেসে বলল, 'জাহাঁপনা, আমার মনে হয়, সওদাগর যখন দোষ স্বীকার করেছেন, আলি কোজিকে তাঁর হাজার মোহর ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন, তখন এবারের মতো তাঁকে মাফ করে দেওয়া হোক।'

খলিফা হারুন আল রশিদ হেসে বললেন, 'তাই হবে। অপরাধী সওদাগরকে মাফই করে দেওয়া হল এবারের মতো। আর কাজি সাহেব—।' কথা শেষ না করে তিনি এবার অর্থপূর্ণ চোখে সামনে নগরের কাজির দিকে তাকালেন।

'জাহাঁপনা', খলিফার কথায় প্রায় কাঁপতে কাঁপতে কাজি কুর্নিশ করে বললেন, 'আজ এই ছোটো ছেলেটি আমার চোখ খুলে দিয়েছে। কথা দিচ্ছি, এমন ভুল বিচার আর হবে না কখনও।'

'মনে থাকে যেন।' খলিফা বললেন. তারপর দরবার শেষ করে পাশের আসনে বসা ছেলেটিকে আলিঙ্গন করে তৎক্ষণাৎ একশো মোহর দিয়ে পুরস্কৃত করলেন তাকে।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



মনসুরের ধনদৌলত

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

এক সময়ে বোগদাদে একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। খুব ধনী বলে চারিধারে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর একটি মাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটির নাম ছিল মনসুর। ছেলেটিকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তাকে লালনপালনও করেছিলেন খুব যত্নে। তাকে শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিতগণকে। তাই ছেলেটি পুব ও পশ্চিমের ভাষা বুঝতে পারত। কালক্রমে তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর জীবনের শেষ দিনটি এগিয়ে এসেছে। তাই মনসুরকে কাছে ডেকে বললেন, "বাবা, আমার মৃত্যুর আর দেরি নেই। আমি তোমাকে অনেক ধনদৌলত দিয়ে যাব। তুমি একা সেসব ভোগ করবে। না মেপে তা খরচ কোরো না। আর, তুমি যাই কর না, তা বেশ করে ভেবে দেখবে।"

পরদিন সম্ভ্রান্ত লোকটির মৃত্যু হল। মনসুর তাঁর জন্যে কাঁদতে লাগল। কিন্তু তার বাবার ধনদৌলত দেখতে এমন কৌতূহল হল যে, তিনদিন পরেই সে অশৌচ শেষ করে দৌলতখানার চাবি নিয়ে সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে মোহর ও মণি-মুক্তোর গাদা দেখে সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, "বাবা আমায় এমন বারবার বারণ করে গেলেন কেন? এখানে এত ধনদৌলত রয়েছে যে, আমি খরচ করে উঠতে পারব না।"

তাই সে মোহর ও মণিমুক্তোভরা সিন্দুকগুলো বার করে নিয়ে যেতে তার চাকরদের হুকুম দিল। পরদিন থেকেই সে এমন সুন্দর সুন্দর বাগান ও ইমারত তৈরি শুরু করল যে, তেমন বাগান ও ইমারত কেউ কোনোদিন তৈরি করতে পারেনি। বাগানে পোঁতা হল চমৎকার চমৎকার ফলের গাছ। প্রত্যেক গাছের তলায় পাতা হল সোনা-মণি-মানিক বসানো খুব দামি কাঠের আসন।

এইভাবে মনসুর খরচ করে যেতে লাগল। শেষে তার দৌলতখানা হয়ে গেল শূন্য। তখন সে বাধ্য হয়ে তার সুন্দর বাগান, চমৎকার ইমারতগুলো একে একে বিক্রি করে ফেলতে ফেলতে মাত্র একখানি ইমারতে ঠেকল। তারপরই সে স্থির করল, সেখানিও বেচে ফেলবে। সেই টাকা দিয়ে সে পণ্য কিনে দেশবিদেশে ঘুরে ঘুরে বেচবে। তাতে আবার ধন-দৌলত লাভ করতে পারবে।

সে করলও তাই। তার শেষ বাড়িখানি বেচে, উটের পিঠে পণ্য বোঝাই করে সে মশুলের দিকে রওয়ানা হল এবং অনেকদিন ধরে, অনেক হেঁটে সে একদিন পৌঁছোল সেখানে। সে দেখল, শহরটি সুন্দর। শহরে অনেক চমৎকার ঘরবাড়ি, মনোরম বাগান। কিন্তু সেখানে তার ব্যাবসার উন্নতি হল না। এক মাস পরে সে আরও দূরে সিরিয়া যাবার সংকল্প করল। তাই একটি যাত্রীদলের সঙ্গে মশুল ছেড়ে শহর থেকে শহরে ঘুরে সে পৌঁছোল দামাসকাসে। দামাসকাস শহরটি লোকজনে ভরা। শহরের চারধারে সুন্দর বাগান, শহরে অনেক বড়ো বড়ো ইমারত। তাই দেখে তার খুব আনন্দ হল। যতদিন-না তার পণ্যগুলো সব বিকিয়ে যায়, ততদিন সে রইল সেখানে। থাকতে থাকতে তার পণ্যও বিকিয়ে গেল, টাকাপয়সাও সব গেল খরচ হয়ে। তখন সে এক যাত্রীদলের সঙ্গে শহর ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে চলল। পথে যেখানেই তারা থামে, সেখানেই সে জল এনে বণিকদের বেচে। এইভাবে সে জীবিকার্জন করল।

একদিন হল কী, তার খুব অসুখ করল। তার পোশাক তখন ছিন্নভিন্ন, সঙ্গে এমন পয়সাও নেই যে, তা দিয়ে খাবার কিনে খায়। অনেক পথ হেঁটে দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে সে এক শহরের বাজারে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তার চারধারে লোকের ভিড় জমে গেল। সে তরুণ ও বিদেশি, দেখে সকলের মনে হল দয়া। তারা তাকে খাদ্য-পানীয় দিতে গেল, কিন্তু সে নিল না। শেষে তাদের চেয়ে অবস্থাপন্ন ও সমজদার একটি লোক তাকে সেখান থেকে হামামে নিয়ে গেলেন। তাকে নতুন পোশাক দিয়ে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। মনসুর সেখানে খানাপিনা করে আশ্রয়দাতার কাছে নিজের ইতিহাস খুলে বলল। তার কথা শেষ হলে গৃহস্বামী জিজ্ঞেস করলেন, সে এখন কোথায় যেতে চায়। মনসুর জবাব দিল, সে যেতে চায় ইজিপটে। সেই দয়ালু লোকটি তখন তাকে পথখরচের জন্যে কতকগুলি মোহর দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন এবং প্রার্থনা করলেন, ভগবান যেন তাকে ধনদৌলত দান করেন।

মনসুর ইজিপটের দিকে চলল এবং সুদীর্ঘ যাত্রার পর এল বিশাল কাইরো শহরে। সেখানে সে দেখল বড়ো বড়ো বাজার, দামি পণ্যভরা দোকানপাট, পথের দু-ধারে নীল আকাশ-সমান উঁচু ইমারত সারি। দেখতে পেল নাইলের দুই তীরে সুন্দর ঘরবাড়ি, চমৎকার বাগান। সে



অনেকক্ষণ অবাক হয়ে রইল এবং তার কাছে যে টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়ে কিনল মনের মতো খাবার। অনেকদিন সে বাজারে ঘুরে বেড়াল; ইমারত আর লোকজন দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে লাগল। এখন সে প্রত্যেকবার যখনই নদীর ধারে যেখানে মেয়েরা জল নিতে আসে সেখান দিয়ে যায় তখনই একটি মেয়েকে আসতে দেখে। তার চেহারা মনসুরের ভালো লাগল। একদিন মনসুর তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করল এবং পরে কয়েকদিন ধরে সেই নদীর ঘাটে তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে লাগল। তারপর একদিন মনসুর এলে মেয়েটি দেখল সে কেমন বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ। সে মনসুরকে এমন হবার কারণ জিজ্ঞেস করলে, মনসুর বললে, তার সঙ্গে টাকাকড়ি যা ছিল, সবই প্রায় ফুরিয়ে এসেছে; সে বুঝতে পারছে না, ভবিষ্যতে কী করে বেঁচে থাকবে। মেয়েটি বললে, "এখান দিয়ে অনেক লোক যাতায়াত করে। তারা আমোদ-প্রমোদ করতেই থাকে। তুমি কিছু ফল আর সন্দেশ কিনে একখানি থালায় বা ঘাসের উপর সেগুলো বিছিয়ে রাখ। আমিও তোমাকে সাহায্য করব, খাবার দেব। লোকে তখন এখানে খাবার জন্যে বসবে, তুমি তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে, হাসির গল্প বলে তাদের খুশি করবে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবে।"

মতলবটা মনসুরের পছন্দ হল। সে তখনই গিয়ে ফল আর মিষ্টি এনে যেসব লোক নদীর ঘাটে বেড়াতে এল, তাদের দিতে লাগ্‌ল।

কিছুকাল মনসুর এইভাবে কাজ করল। তার সঙ্গে লোকের খুব আলাপ হয়ে গেল। তারা

তারই কাছ থেকে খাবার কিনতে লাগল। আর সেও প্রতি রাতে কিছু টাকা ঘরে নিয়ে যেতে লাগল। একদিন খুব জমকালো পোশাক পরা দুজন ভারতীয় এসে তার কাছে বসল। বসেই তাকে খাবারের ফরমায়েশ দিল। মনসুরও অমনি তাদের সামনে রাখল থালাভরা খাবার। তারাও মনসুরকে তাদের কাছে বসিয়ে বললে, তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে সে সারাদিন তাদের খুশি রাখুক, আর কারো কাছে যেন সে না যায়। মনসুর বললে, সে তাদেরই হুকুম তামিল করবে। এই বলে বসে তাদের সঙ্গে খানাপিনা করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারতীয় দুজন মাতাল হয়ে পড়ল এবং কতকগুলো সোনার দিনার মনসুরের সামনে ধরে মনসুরকে তাদের গান শুনিয়ে, গল্প বলে, নেচে আমোদ দিতে বললে। শেষে যখন তাদের কানে শোনবার মতো অবস্থা রইল না তখন দুজনে ভারতীয় ভাষায় কথাবার্তা কইতে লাগল, জানতেই পারল না যে মনসুর তা বুঝতে পারে। সে তাদের একজনকে বলতে শুনল, "আমরা যে মোহর এনেছিলাম তা ফুরিয়ে গেছে। আজ রাতেই গিয়ে আমাদের দরকার মতো যথেষ্ট মোহর আনতে হবে।" অপরজন বললে, "না, একমাস বেশ ভালোভাবে চলবার মতো মোহর আমি এনেছিলাম।" তাই শুনে মনসুর ভাবতে লাগল, এই দুটো লোকের নিশ্চয়ই কোথাও মোহর রাখবার জায়গা আছে। তাই সে স্থির করল, লোকদুটোর বিষয় আরও জানতে হবে আর দেখতে হবে কোথা থেকে ওরা মোহর ও ধনদৌলত আনে। তাই সূর্যাস্তের একঘণ্টা পর অবধি সে তাদের সঙ্গে রইল। তারপর তারা সঙ্গে যেসব পোশাক এনেছিল, সেগুলো তুলে নিয়ে চলতে লাগল।

মনসুর তাড়াতাড়ি তার বান্ধবীর বাড়ি এল; এসে বললে, রাতে সে নিজের বাসাতেই যেতে চায়। আর বললে, "অনেক দূরের পথ। তোমার কাছে যদি একখানা তলোয়ার থাকে দয়া করে আমায় দাও।"

মেয়েটি তাকে একখানা তলোয়ার দিতে মনসুর তলোয়ারখানি হাতে নিয়ে লোকদুটির পিছু নিল। সে তাদের পিছনে চলতে চলতে শহর ছাড়িয়ে গিয়ে পড়ল মরুভূমিতে। সেখানে তারা দুজনে বসল। মনসুর শুনতে পেল তারা পরস্পরকে বলছে, যেতে হবে খুব সাবধানে আর দেখতে হবে কেউ তাদের পিছু নিয়েছে কি না। মনসুর কপালগুণে একটা গর্ত দেখতে পেয়ে তাই শুনে তার মধ্যে লুকোল। কারণ, ভারতীয় দুজনের একজন পিছনে খানিকটা সরে এল দেখতে, যদি কাউকে কোথাও দেখা যায়। তারপর তারা আবার এগোতে লাগল। শেষে একটা গাছের কাছে এসে তার তলায় দাঁড়াল। মনসুর দেখল, তারা সেখানে খানিকক্ষণ খুঁজল। তারপর তারা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। মনসুর খুব সাবধানে সেখানে গিয়ে দেখে, একটি গর্ত; তার মধ্যে একটি দরজা। সে তার মধ্যে নামতে যাবে, এমন সময়ে একজন ভারতীয় এল পিঠে একটা থলি নিয়ে। লোকটা যেমন গর্ত থেকে উঠল অমনি মনসুর এক লাফ দিয়ে তলোয়ার দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলল। থলিটা মাটিতে গেল পড়ে। মনসুর সেটা খুলে দেখতে যেতেই অপর ভারতীয়টিও থলি পিঠে এল। মনসুর তৎক্ষণাৎ তলোয়ার হাতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকেও কেটে ফেলল। তারপর থলিদুটো খুলে দেখে মুক্তোভরা।

সে তাড়াতাড়ি গর্তের মধ্যে নেমে গেল। গিয়ে দেখে তার সম্মুখে রয়েছে একটা খুব লম্বা অন্ধকার দালান। সে দালান দিয়ে চলতে চলতে একটু একটু করে আলো হতে লাগল। যেখান থেকে আলো আসছিল সে চলল সেদিকে। একটু পরেই সে দেখতে পেল, প্রকাণ্ড এক ইমারত। তার মাঝখানে রয়েছে একটি ফোয়ারা! ফোয়ারাটিকে ঘিরে আছে মণিমাণিক্যের কাজ করা দশটি সোনার থাম। প্রত্যেক থামের পাশে রয়েছে একখানি করে মণি বসানো সিংহাসন আর অসংখ্য মণিমাণিক্য ও রত্নভরা বড়ো বড়ো পাত্র। তাই দেখে পাগল হয়ে মনসুর সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে দরজায় চাবি দিয়ে যে থলি দুটো সে মোহর বোঝাই করেনি, সে দুটো নিয়ে ফিরে এল তার বাড়ি।

পরদিন সে নতুন পাওয়া ধনরত্ন খরচ করতে আরম্ভ করল। তার প্রতিবেশীদের ডেকে সে তাদের কাছ থেকে সে অঞ্চলের সমস্ত ঘরবাড়ি খুব চড়া দামে কিনে নিয়ে সেখানে এমন একটা ইমারত তৈরি হয়ে গেলে সে তার মধ্যে তারই উপযুক্ত খুব দামি আর সুন্দর কার্পেট বিছিয়ে দেওয়াল। রাতের পর রাত সে সেই মাটির নীচের দৌলতখানা থেকে সেখানকার ধনরত্নের কিছুকিছু আনতে লাগল। কিন্তু একটি লোক যদি হাজার বছর ধরে দিন-রাত খাটত তা হলেও তা শেষ করতে পারত না।

অবশেষে কাইরোর লোকেরা মনসুরের কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল; তারা বলতে লাগল, "এই বোগদাদি আগে ফল আর সন্দেশ বেচত, সরাইয়ে সরাইয়ে ঘুরে বেড়াত। কাইরো শহরে অনেক ধনী থাকলেও ও তাদের সকলের চেয়ে ধনী। লোকটা এমন সুন্দর এক ইমারত গড়বার, অমন রাজার হালে থাকবার মতো ধনদৌলত পেল কোথায়? ও কি কাইরোর রাজাকে ওর ধনদৌলতের দশ ভাগের এক ভাগ খাজনা দেয়?"

একথা শহরের বড়ো দারোগার কানে উঠল। তাই তিনি একদিন গেলেন মনসুরের প্রাসাদে। মনসুর যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি কী কাজ করেন, দারোগা বললেন, তিনি শহরের বড়ো দারোগা। তাই শুনে মনসুর খুব ভীত হল; তার গা, হাত, পা কাঁপতে লাগল। তবে দারোগাসাহেব তাকে অভয় দিলেন; বললেন, মনসুর যদি তাঁর সঙ্গে বড়োলোকের মতো ব্যবহার করে, তাহলে তিনিও তার সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার করবেন।

মনসুর জিজ্ঞেস করল, "আমায় কত টাকা দিতে হবে?"

তিনি যখন বললেন, একশো রুপোর টাকা, তখন মনসুর হেসে উঠল। সে তাঁকে একশো সোনার দিনার দিতে বড়ো দারোগা খুব খুশি হয়ে বললেন, "আপনি যদি একশো দৌলতখানা পান তা ভোগদখল করুন। আমার দিক থেকে আপনার কোনও ভয় নেই।"

তারপর শীঘ্রই মনসুরের কথা উঠল উজিরের কানে। তিনি মনসুরকে ডেকে পাঠালেন। উজিরের কথা শুনে মনসুর বুঝতে পারলে, তার কাছ থেকে কী চাওয়া হচ্ছে। সে বললে, "স্বীকার করি যে, একটা দৌলতখানা পেয়েছি, কিন্তু সেটা এমন এক জায়গায় আছে যা কোনো মানুষেরই চোখে পড়বে না। আমি বিদেশি, যদি একে একে আমার হাত-পা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন তবু তা থেকে একটি কণাও দেব না; কিন্তু আপনাকে আমি রোজ



দেব হাজার টাকা। তাতে কাইরোয় থাকবার সব খরচপত্র কুলিয়ে যায়।"

মনসুরকে তিনি বিদায় দিলেন এই বলে, "আমার দিক থেকে আপনি যদি হাজারটা দৌলতখানা পান ভোগদখল করুন।" কিন্তু তিনি প্রথম দিনের পাওনা আনতে মনসুরের কাছে লোক পাঠালেন।

কিছুদিন গেল। তারপর দৌলতখানার কাহিনি গিয়ে উঠল সুলতানের কানে। তিনি উজিরকে ডেকে মনসুরের সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর মনসুরকে ডেকে পাঠালেন। মনসুর এলে তাকে খুব খাতির দেখিয়ে বললেন, "যুবক ! তুমি যে দৌলতখানাটি পেয়েছ, তা যদি আমায় দেখাও তাহলে আমি তা থেকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ নিয়ে বাকি সব তোমার জন্যে রেখে দেব।"

মনসুর জবাব দিল, "আমাকে এই বলে শপথ করতে হয়েছে যে, আমার গোপন কথা কোনও লোককে বলতে পারব না। আমাকে যদি হাজার টুকরো করে ফেলা হয় তবুও আমি তার কথা বলব না। তবে আমি আপনাকে রোজ বারো হাজার সোনার দিনার দিয়ে যাব।" এই ব্যবস্থাই হল। সুলতান মনসুরকে খেতাবি পোশাক দেবার আর সাধারণের হিতকারী ব্যক্তি বলে চারধারে তার নাম প্রচার করবার জন্যে উজিরকে হুকুম দিলেন।

মনসুর চলে গেলে সুলতান ভাবতে লাগলেন, মনসুর অন্যান্য খরচের সঙ্গে রোজ বারো হাজার সোনার দিনার তাঁকে দেবে। তাহলে তার ধনদৌলত যে কত! তাই অনেক ভাবলেন, কী উপায়ে মনসুরের ধনদৌলত কেড়ে নেওয়া যায়। সুলতান একমনে বসে বসে এইসব ভাবছেন, এমন সময়ে তাঁর এক ক্রীতদাসী তাঁর এই অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলে, তাঁর এত ভাবনা কীসের? সুলতান তাকে তাঁর মনের কথা খুলে বললেন। শুনে ক্রীতদাসীটি বললে, সুলতান যা চাইছেন সে তাঁকে তা এনে দেবে। সুলতানও প্রতিজ্ঞা করলেন, তাহলে তিনি তাকে দেবেন তাঁর একটি রাজবাড়ি।...

তখন, রোজ পাশে এক সিন্দুক মোহর নিয়ে তার বাড়ির চত্বরে বসা মনসুরের নিয়ম ছিল। তখন তার সামনে সার বেঁধে আসত ভিখারি আর অভাবগ্রস্ত লোকেরা। মনসুর তাদের প্রার্থনা মতো সাহায্য করলে তারা চলে যেত। মনসুর যেদিন সুলতানের সঙ্গে দেখা করলে, তার পরদিনই সেই দলে এসে যোগ দিল একটি মেয়ে। সে মনসুরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে মুখের বোরখা খুলে একটি মিষ্টি হাসি হেসে বললে, সকলের অসাক্ষাতে তার একটি অনুরোধ আছে।

তার রূপ দেখে মনসুরের বড়ো আনন্দ হল। তাকে অন্দরে যেতে বলে সেও গেল তার পিছু পিছু। সে ভৃত্যদের খাদ্য-পানীয় আনতে বলল। দুজনে খানাপিনা করতে করতে মেয়েটির ব্যবহারে মনসুর মুগ্ধ হয়ে গেল। শেষে সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, তার কীসের দরকার?

মেয়েটি জবাব দিল, "আমি শুনেছি আপনি একটি দৌলতখানা পেয়েছেন। সেটা দেখতে আমার মন জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে।"

মেয়েটির কথা শুনে মনসুর হা-হা করে হেসে উঠল। কিন্তু মেয়েটির কাকুতিমিনতিতে সে শেষে রাজি হল। সে একটা আলখাল্লা পরে, একখানি তলোয়ার নিয়ে মেয়েটিকে তার পিছু পিছু যেতে বলল। দুজনে শহরের বাইরে পৌঁছোলে, মনসুর মেয়েটির চোখখানি রুমাল দিয়ে শক্ত করে বেঁধে, তাকে মাটির তলার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে সে তার চোখ খুলে দিয়ে যা দেখবার ছিল তা দেখাল। দেখে মেয়েটি অবাক হয়ে গেল; বললে, "আপনি রোজ যে মোহর দেন তা কোথা থেকে পান আমাকে দেখান।"

মনসুর তখন তাকে একটা পুকুর দেখাল। পুকুরটি প্রায় কানা অবধি মোহরে ভরা। তার কানা থেকে মোহর অবধি মাত্র দু-আঙুল গভীর। সে বললে, "এতে আমার সারাজীবন কেটে যাবে, বাকি ধনদৌলত আমার ছোঁবার দরকার হবে না।"

কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে, মনসুর আর তার সঙ্গিনীর একটু বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হল। তারা একটি ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে ছিল একটি গদিপাতা আসন। তারা ঘরে ঢুকেই দেখলে, ঘরের আর একদিকে রয়েছে একখানি পালঙ্ক। তাতে ঘুমিয়ে আছে একটি পুরুষ। তার পাশে ঘুমোচ্ছে একটি মেয়ে। ঘুমন্ত পুরুষটির মাথার ওপর একখানি সোনার ফলকে লেখা আছে, "আমিই এইসব ধনদৌলত সংগ্রহ করেছিলাম, শহর দখল করেছিলাম, দুর্গ ভেঙেছিলাম, আমার সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করেছিলাম। যখন মৃত্যু এল তখন যে এইসব ধনদৌলত সৃষ্টি করেছিল তার তা কোনই কাজে লাগল না। এসব যদি কোনও লোকের হাতে পড়ে, তাহলে সে যেন দু-হাতে খরচ করে। তবুও এ ধন ফুরোবে না। যে এসব সংগ্রহ করেছিল তার বাসনা শেষ হয়ে গেছে। যে আমাকে দেখবে সে যেন সতর্ক হয়, আর সাংসারিক ঐশ্বর্যের দ্বারা যেন সে প্রতারিত না হয়।"

ফলকখানি পড়ে মনসুর আবার সেই ঘুমন্ত দম্পতির দিকে তাকাল। দেখল, তাদের মৃত্যু হয়েছে। মৃত মেয়েটির গলায় ছিল একগাছি রত্নহার। হারগাছাটি খুলে নিয়ে মনসুর সেটি দিল তার সঙ্গিনীকে। তারপর রুমাল দিয়ে আবার তার চোখদুটি বাঁধল। এবারে মেয়েটি কেঁদে উঠল। সে কাকুতিমিনতি করে বলতে লাগল, সে কোথায় যাচ্ছে সেই জায়গাটি তাকে দেখতে দেওয়া হোক। মনসুর তাকে জিজ্ঞেস করলে, সে কি বেঁচে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে ও কথা বলছে? মেয়েটি তখন চুপ করে রইল।

তারপর তারা শহরে ফিরে এসে, মনসুর গেল তার বাড়িতে, মেয়েটি ফিরে গেল সুলতানের অন্তঃপুরে। সেখানে গিয়ে সে সুলতানকে যা যা ঘটেছিল সেসব কথা বললে এবং জায়গাটি যে দেখতে পায়নি সে কথাও স্বীকার করলে। তাই শুনে সুলতান খুব রেগে গিয়ে তাকে মনসুরের কাছে ফিরে যেতে বললেন। সে ফিরে গেলে মনসুর তাকে আনন্দ করতে বললে। কারণ সুলতান তার ওপর যে ব্যবহার করতেন, সে করবে তার চেয়ে হাজার গুণে ভালো ও ভদ্র ব্যবহার। মনসুর সেই ক্রীতদাসীকে খুব ঘটা করে বিয়ে করলে। তারপর দুজনে অনেকদিন সুখে ঘর করল। কিন্তু মনসুর যখন মারা গেল, তখন সে ধনদৌলতের গোপন কথা কাউকেই বলে গেল না। তার ফলে সেগুলো পৃথিবী থেকে গেল অদৃশ্য হয়ে।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



আগুন থেকেই সব হল

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

আমাদের আদি বাস এই নদীর তীরে। আমাদের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন কিওমার্জ। তিনি অসীম শক্তিমান। জীবজন্তুর চামড়ার পোশাক তৈরি করে তিনি পরতেন, পশুপাখির কাঁচামাংস খেতেন আর খেতেন এই নদীর টলটলে জল। ফলমূল খেতেন কাঁচা, খেতে ভালোই লাগত। কিন্তু পশুপাখির কাঁচামাংস একটুও ভালো লাগত না। কিন্তু উপায় ছিল না, তখন তো কিওমার্জ আগুন জ্বালাতে জানতেন না। কেউ জানত না।

নদীর পাশেই ছিল উঁচু পাহাড়। পাহাড়ে কোনো গাছগাছালি নেই, শুধুই পাথর। কিওমার্জ তার মানুষজন নিয়ে সেই উঁচু পাহাড়ের অনেক গুহায় থাকতেন। তার মানুষজনও ছিল সবাই শক্তিমান। সর্দার কিওমার্জ খুব ভালো মানুষ, —তিনি মিথ্যে কথা বলতেন না, কারও ওপর অবিচার করতেন না, মাথা গরম করতেন না, সবাইকে ভালোবাসতেন। তাই তার মানুষজনও সব নিয়মনীতি মেনে চলত। সর্দারের কথা শুনত।

এরা সবাই অহুরকে পুজো করত। সবাই অহুরের ভক্ত। আর দেবতারা ছিলেন এদের শত্রু। সর্দার কিওমার্জ ও অন্যান্য সর্দার সবাই অহুরকে মেনে চলতেন। কিন্তু যা হয় আর কী, সর্দারদের মধ্যেও ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। কেউ কাউকে দেখতে পারত না, সবাই ভাবত



এই বুঝি অন্যের দাপট বেড়ে গেল। যা হয় আর কী, ক্ষমতার দম্ভ।

এইভাবেই চলছে অনেক কাল। কিন্তু একবার খুব খারাপ কাজ করে ফেলল এক সর্দার। সে ভালো নয়। শত্রুতা করে একদিন কিওমার্জের ছেলেকে সে মেরে ফেলল। এই ছেলের নাম ছিল সালামুক।

সালামুকের ছিল এক ছেলে। একমাত্র ছেলে। তার নাম হুসেং। হুসেং-এর বাবা মারা গিয়েছেন, তার মনে বড়ো দুঃখ। কিন্তু সে বোঝে, তার ঠাকুরদার আরও দুঃখ, ঠাকুরদার ছেলে মারা গিয়েছে।

হুসেং মনে মনে ভাবে, আমার বাবা মারা গিয়েছে। আমার খুব দুঃখ। কিন্তু আমার বয়েস তো কম, আমি বাবার মৃত্যুর শোক একদিন সামলে উঠব। ঠাকুরদার বয়েস হয়েছে, তিনি অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এ শোক ভুলে যাওয়া তার পক্ষে কঠিন। আমি যেমন করে পারি

ঠাকুরদার এই পুত্রশোক ভুলিয়ে দেব। আমি বীর, আমি সৎ, আমার অনেক ক্ষমতা, আমি পারবই ঠাকুরদার শোক ভুলিয়ে দিতে।

হুসেং সর্দারের নাতি। কিওমার্জের মানুষজন তার ভক্ত ছিল; এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শুধু মানুষজন নয়, পাড়ার ও বনের হিংস্র জন্তুজানোয়ারও ছিল তার ভক্ত, খুব অনুগত।

দেবতাদের সঙ্গে অহুর ভক্তদের যুদ্ধ লেগেই থাকত। যখন দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধত, তখন শুধু কিওমার্জের মানুষজন নয়, যুদ্ধে যেত বাঘ, নেকড়ে, সাপ, বাজপাখি এসব প্রাণীরাও। তির-ধনুক-বর্শা নিয়ে মানুষজনের সঙ্গে এসব পশুপাখিও শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত। দেবতারা কিছুতেই পেরে উঠত না যুদ্ধে। এইভাবেই সময় বয়ে চলেছে। আমাদের অনেক কিছু ছিল, আবার অনেক কিছু ছিলও না। ছিল-নার মধ্যে প্রধান হল আগুন। সে যে কী কষ্টের দিন কেটেছে! যাদের আগুন নেই তারাই শুধু বোঝে। শেষকালে আমরা আগুনও পেলাম। কেমন করে?

সর্দার হুসেং প্রথম আগুন এনে দেয়। অবশ্য আগুন জ্বলেছিল আচমকা। সে-ও বুঝতে পারেনি এভাবে আগুন জ্বলে উঠতে পারে। এক কাজ করতে গিয়ে অন্য জিনিস পাওয়া গেল। সে এক আজব কাণ্ড।

হুসেং এমনিতেই খুব রেগে ছিল। যে সর্দার তার বাবাকে মেরে ফেলেছিল, তাকে সে কোনোভাবেই ক্ষমা করতে পারে না, হোক না সেই সর্দার তার জ্ঞাতিভাই।

একদিন হয়েছিল কী, দূর পাহাড়ের এক খাঁজে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই সর্দার। হুসেং দূর থেকে তাকে দেখতে পেল। রক্ত টগবগিয়ে উঠল, মাথা গরম হয়ে গেল, দেহ কাঁপতে লাগল। বিশাল এক পাথর তুলে নিয়ে হুসেং সেটা ছুড়ে দিল সেই সর্দারের দিকে। কিন্তু রাগে অন্ধ হুসেং-এর সেই পাথর সর্দারের গায়ে লাগল না, নিশানা ভুল হয়ে গেল। পাথর ঘুরতে ঘুরতে প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ল পাহাড়ের গায়ে। ওই আঘাতে আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে, যেন আকাশের তারার বৃষ্টি হচ্ছে। ফুলকি ছুটে এসে পাহাড়ের নীচে নদীর তীরের গাছপালায় পড়ল। সেখানে ঘন বন। গাছপালা জ্বলতে লাগল, বন পুড়তে লাগল। সে এক ভয়ানক কাণ্ড। আগুনের ফুলকি থেকে দাবানল, দাউদাউ আগুন।

সেই সর্দার অবাক হয়ে গিয়েছে। এরকম তো সে কখনও দেখেনি। সে নেমে আসছে পাহাড় থেকে, কাছে গিয়ে দেখবে, ব্যাপারটা কী। হঠাৎ তার পা ফসকে গেল। পাহাড়ের উপর থেকে টুকরো পাথরের মতো সে নীচে পড়ল, পড়ল গাছপালার উপর, জ্বলন্ত গাছের উপর। দাবানলে পুড়ে সে মারা গেল। পাহাড়ের উপর থেকে হুসেং সর্দারের এই দশা দেখতে পেল। ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল। হুসেং কথা রাখতে পেরেছে।

হুসেং চেয়েছিল পিতার হত্যাকারীকে শাস্তি দিতে। সে প্রতিজ্ঞাও করেছিল। অবশ্য সরাসরি শত্রুকে মারতে পারেনি, কিন্তু তার পাথর ছোঁড়ার ফলেই যে-কাণ্ড ঘটল, তাতে সর্দার পুড়ে মরল। যা হওয়ার তা তো হল, কিন্তু আমরা পেলাম সবচেয়ে দামি জিনিস। এমন জিনিস পেলাম যা আমাদের সবাইকে পালটে দিল। আমরা অন্যরকম হয়ে উঠলাম। আমরা আগুন

পেলাম। পাথরের আগুন গাছে লাগল, গাছের আগুন নিয়ে আমরা ঘরে এলাম। আর জানলাম, পাথরের মধ্যে আগুন থাকে। পাথরে পাথরে ঘষলে আগুন জ্বলে। এখন থেকে নিজেরাই আগুন জ্বালাতে শিখলাম।

সর্দার হুসেং তার লোকজনদের ডেকে বলল, যে আগুন আমরা আচমকা পেলাম তা অহুরদেবের দান। তিনিই আমাদের আগুন দিলেন। তিনিই অগ্নিদেব। এখন থেকে আমরা সকলে অহুরদেবের পুজো করব। আমাদের দেবতা হবে অগ্নিদেব অহুর মজ্‌দা। যে এই আদেশ মানবে না, সে যেন ওই দেবতাদের কাছে চলে যায় যারা আমাদের শত্রু, যাদের বিরুদ্ধে আমরা মানুষ ও পশুপাখি সেই আদিকাল থেকে লড়াই করে আসছি।

এই কথা আকাশে-বাতাসে ভেসে অহুর মজ্‌দার কানে পৌঁছোল। তিনি খুশি হলেন। তিনি শেখালেন কীভাবে পশুপাখির মাংস পুড়িয়ে রান্না করে খেতে হয়, মাংস সুস্বাদু হয় কীভাবে। তারা যখন রান্না-করা মাংস খেত তখন অহুর মজ্‌দার নাম করত, আগে তাকে পুজো দিয়ে মাংস খেত। কেউ অমান্য করত না।

দিনের পর দিন পুজো পেয়ে অগ্নিদেব অহুর মজ্‌দা আরও খুশি হলেন। হুসেং-ও তার লোকজনদের ভক্তি দেখে প্রীত হল, অবাকও হল।

সে আগুনে পুড়িয়ে কাঠকে শক্ত করে কীভাবে লাঙল তৈরি করতে হয় তা শেখাল। জমিতে জল দিয়ে জমিকে নরম করে কীভাবে সেই জমিতে লাঙল দিয়ে চাষবাস করতে হয় তা শিখিয়ে দিল। জমিতে অফুরন্ত ফসল ফলল, সোনার ফসল,—আমরা অন্যরকম খাদ্য পেলাম।

তারপর সে আগুনে লোহা পুড়িয়ে কী কী তৈরি করতে হয় তাও শেখাল। কাঠের লাঙলের ফলার বদলে তৈরি হল লোহার ফলা, কাঠের বর্শার বদলে লোহার বর্শা, গাছের ছালের ঢালের বদলে লোহার ঢাল, গাছের ডালের তিরের বদলে লোহার তির, দুরন্ত পশুকে বাগে আনতে লতার দড়ির বদলে লোহার শিকল। আর এসবই হল আগুনের ব্যবহার শিখে। আগুন ছাড়া এসব কিছুই তৈরি করা অসম্ভব ছিল। আগুনই সব। আগুন আমাদের সব দিয়েছে, অগ্নিদেব অহুর মজ্‌দা আমাদের সব শেখালেন, আগুন পেলাম বলেই সব শিখতে পারলাম।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



রবির বন্ধু সূর্য

দীননাথ সেন

ছেলেটার নাম রবি।

সূর্য ওঠে। রবি বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

তুমি উঠেছ সূর্য?

সূর্যের মুখে একগাল হাসি—এক ফালি রোদ। প্রথম রোদের ফালি এসে পড়ে রবির মুখে। রবির বন্ধু মোরগ। তার খুশি ছড়িয়ে পড়ে তার ডাকে— কোঁকর কোঁ কোঁ। তার বন্ধু কাক। কাক গেয়ে ওঠে কা কা কা। তার বন্ধু খরগোশ। সে বেরিয়ে পড়ল লম্বা কানদুটো দুলিয়ে।

দেখো সূর্য, তুমি কি জানো, তুমি উঠলে সবাই ওঠে?

তুমি উঠেছ আর আমাদের বাড়িটা সুন্দর হয়ে উঠল। পুকুরের জল নীল হয়ে উঠল। গাছগুলো সবুজ হল। পাথরগুলো সাদা। পাতা দুলল। ধান দুলল। মেঘ রাঙল।

তোমার রং রাঙিয়ে দিল সবাইকে। মোরগ, কাক, খরগোশ, শালিক, টিয়া সবাইকে আমি ভালোবাসি। আর সবচেয়ে ভালোবাসি তোমাকে। বন্ধু সূর্য এবার খুব হাসে চারদিকে অনেক রোদ ছড়িয়ে। সূর্য তার হাসি দিয়ে আলো দিয়ে জড়িয়ে ধরে রবিকে।

বুকভরা সুখ নিয়ে রবি এবার তাকায় পাখিদের দিকে। পাখিদের বলে—দেখো, দেখো।

সূর্য আমায় কেমন ভালোবাসে দেখো। পাখিরা বলল—দেখেছি, দেখেছি।

রবি বলল—তোমাদের ঘুম ভাঙানো গান আমার ভালো লাগে।

পাখিরা বলে—জানি, জানি। তাইতো তোমায় রোজ গান শোনাই।

দিনের শেষে সূর্য তার আলো নিবিয়ে ডুবতে থাকে। মোরগ ফিরে যাচ্ছে তার বাসায়। খরগোশ তার কানদুটো গুটিয়ে বনের পথ ধরে। কাককে আর দেখাই যাচ্ছে না। তার গায়ের রং আর আঁধারের রং এক হয়ে যায়। রবি সূর্যের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বলে—বিদায়।

সূর্য চলে গেল।

চারিদিকের আলো গেল সরে। আঁধার ছেয়ে ফেলল চারদিক। পৃথিবীটা কালো হয়ে গেল। এখন আসছে রাতের বাজপাখি। পাখিরা ভয়ে জড়সড়। তারা আর গান গাইছে না।

রবি সূর্যের মধ্যে সব রং দেখতে পায়। এখন আর কোনো রং দেখতে পাচ্ছে না। রবি সূর্যের কথা শুনতে পায়। এখন আর তার কথা শুনতে পাচ্ছে না। রবি সূর্যের গানও শুনতে পায়। এখন তার গান আর শুনছে না। সব কালো। সব আঁধার। রবি আঁধার ভালোবাসে না। সে ঘুমাতে চলে যায়।

রবি একদিন স্বপ্ন দেখল।

স্বপ্নে সে কী দেখল?

সে বড়ো হয়ে গেছে। সে অনেকটা হাঁটছে। সে দৌড়োচ্ছে। সে ছুটছে সবাইকে ফেলে।

ঘুম ভাঙল রবির। স্বপ্নে যা দেখতে পেল সে তো সত্যি।

আমি বড়ো হয়ে গেছি কি না বলো মোরগ।

মোরগ বলল—কোঁকর কোঁকর কোঁ। ঠিক ঠিক।

আমি ছুটতে পারি, তাই না খরগোশ?

খরগোশ বলল—ঠিক তাই, ঠিক তাই।

আমি পাহাড়ে চড়তে পারব তো কাক?

কাক বলল, কা কা কা। পারবে পারবে।

সেই দিনই রবি ঠিক করে ফেলল।

কী ঠিক করল?

সে পুব পাহাড়ে উঠবে। একেবারে চুড়োয় পৌঁছে যাবে।

তারপর?

সে হাত দিয়ে সূর্যকে ধরবে।

তারপর? তারপর?

সে সূর্যকে বাড়ি নিয়ে আসবে।

কেন? কেন?

তাহলে সূর্য আর ডুববে না।

তাহলে পৃথিবীতে আর অন্ধকার হবে না।

নীল জল ঢেউ দেবে। সবুজ পাতা দোল খাবে। সাদা মেঘ ভেসে যাবে। তাহলে সূর্যের রংয়ে রঙিন হবে সব আকাশ মাটি ফুল পাখি।

সব সময় দিন, সব সময় দিন।

পরদিন মোরগ উঠেছে। ডাকছে। ডাকছে তো ডাকছেই।

বন্ধু রবির দেখা নেই।

খরগোশ কান দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে এল। এদিক তাকায় সেদিক তাকায়। রবি কোথায়, রবি কোথায়?

রবি নেই।

কাক কেবলই ডাকে কা কা কা কা। ডেকে ডেকে সারা।

রবি নেই। রবি নেই। রবি কোথায়, রবি কোথায়?

ফুল পাখি জল গাছ সবাই বলল, ওদিকে গেছে রবি।

কোন্ দিকে? কোন্ দিকে?

পাহাড়ের দিকে।

খরগোশ বলল, চলো তবে। ওর পিছু পিছু যাই।

মোরগ বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। চলো। ওকে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

কাক বলল, ঠিক বলেছ। চলো চলো।

সবাই ছুটল রবিকে ধরতে। রবির সাথে যাবে ওরা সবাই।

ওকে ধরা চাই।

এদিকে এসো। এ পথেই গেছে।

রবি পৌঁছে গেছে।

পাহাড়ের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাব্বা! একটু জিরিয়ে নিই। পথটা তো কম নয়। কম হাঁটতে হয়নি। রবি পাহাড়কে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। সূর্যকে দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের উপর উঠতে পারলে ছোঁয়া যাবে সূর্যকে। আঃ! তখন কী মজা হবে।

সূর্যকে ধরে রাখব।

সূর্যকে কাছে রাখব।

তাহলে আর চলে যেতে পারবে না।

ডুবে যেতে পারবে না।

তাহলে সূর্য অস্ত যেতে পারবে না। রাত আসবে না। আঁধার আসবে না। পৃথিবীতে কেবল দিন। কেবল আলো। সবাই খুশি হবে কত!

রবি এসব কথা ভাবছে। এমন সময় মোরগ ডেকে উঠল। কোঁকর কোঁ।

আরে মোরগ যে। তুমি এসেছ?

আসব না। ভোরে উঠে দেখি তুমি নেই। অমনি ছুটে এসেছি।



আমিও এসেছি।

ওমা, খরগোশ! তুমিও। কাক, তুমিও এসে গেছ।

হ্যাঁ! হ্যাঁ! হ্যাঁ! কা-কা-কা।

বন্ধুদের দেখে রবির খুশি আর ধরে না।

রবি মোরগের ঝুঁটিটা আদর করে নাড়িয়ে দিল।

খরগোশের নরম পশমে সে হাত বুলিয়ে দিল।

কাক ওর হাতটায় একটু ঠুকরে দিয়ে আদর জানাল।

খুব ভালো হল তোমরা এসেছ।

চলো এবার সবাই মিলে পাহাড়ে চড়ি। অনেক উঁচু পাহাড়। উঠতে সময় লাগবে। চল ওঠা যাক। দেরি হলে মুশকিল। সূর্য যদি আবার চলে যায়!

না, যাবে না যাবে না। চলো চলো।

খরগোশ বলল, আমি পথ চিনি। আমি আগে আগে যাচ্ছি। তোমরা এসো। রবি পা চালাল। পাহাড়টা কম উঁচু নয়। রবি তাড়াতাড়ি চলতে থাকে। আগে আগে খরগোশ চলছে লাফিয়ে লাফিয়ে। মোরগ যেতে একটু জিরিয়ে নেয়। তারপর আবার চলতে থাকে। কাক তো উড়েই চলল। বন্ধুদের ফেলে সে কিন্তু এগিয়ে যায় না বেশি দূর। রবিকে উৎসাহ দিয়ে ডেকে ডেকে চলে—কা-কা-কা।

বেশ ঘন বন পাহাড়ের গায়ে গায়ে। এখানে পাথর, ওখানে ঝোপ। উঁচু উঁচু সব গাছেরা দাঁড়িয়ে দুলছে। কী লম্বা লম্বা ঘাস! খরগোশের খুব মজা। নরম কচি কচি ঘাস। খেতে কী ভালো!

কোথাও পাহাড়ি ঝরনা। গর্ত ভরা জল। টলটলে পরিষ্কার। কোথাও কাঁকর ছড়ানো। কোথাও মাটি। সারা বন সবুজ সবুজ। হালকা সবুজ, গাঢ় সবুজ। বৃষ্টির জল ধুয়ে দিয়েছে

গাছের পাতাগুলোকে। কী সুন্দর চকচক করছে সবুজ সবুজ পাতা। নতুন ঘাসের রং। তাও টাটকা সবুজ।

সবুজ বরন বন। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। শুধু কি সবুজ?

সবুজ পাহাড় আর হলুদ ফুল। ডালে ডালে ফুল। লতায় লতায় ফুল। ঝোপে ঝোপে ফুল। ঘাসে ঘাসে ফুল। লাল ফুল নীল ফুল। ফিকে বেগনি কোনো ফুল। কোনো ফুল টকটকে লাল। আর আছে গাছ। ছোটো গাছ আদুরে। বড়ো গাছ নুয়ে পড়েছে। ঝোপ আছে কত। সব আছে বনে।

সবাই এদের ডাকছে—এসো এসো। এসে আমায় ছোঁও।

এসো, আমায় আদর করো। তোমরা এলে আমরা খুশি।

রবি হাসল। চাইল উপরের দিকে। আকাশের দিকে। হ্যাঁ। ওই সূর্য। যে পথে এসেছে ওরা সেদিকে তাকাল সে। কত উপরে উঠে এসেছে ওরা। পেছনে তাকাল। সেখানে ঝাড়ঝোপ। পাথর বড়ো, ছোটো, মাঝারি। দূরে পাহাড়ের নীচটা। এখন মনে হচ্ছে একটা বাদামি রেখা। ওই রেখাটি তাদের গ্রামের বাড়ির সারি।

ওখানেই তো আছে তাদের বাড়িটা। একেবারে এতটুকু দেখাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। সব বাড়ি মিলে একটা বাদামি রঙের রেখা।

রবি এবার পাহাড়-চুড়োর অন্যদিকে তাকাল। একটু একটু করে ওদিকে এগোতে থাকে। ওদিকটাতে গিয়ে দেখতে থাকে। পাহাড়ের এ পাশটাতেও গাছপালা, ঝোপঝাড় আর পাথরের চাঁই। নীচের দিকে অনেক দূরেও সারিবাঁধা বাড়ির বাদামি রেখা। ওদের গ্রামের মতো আর একটি গ্রাম। হয়তো ওখানেও আছে তাদের বাড়ির মতো বাড়ি।

উপরে তাকিয়ে দেখে রবি। আরে! সূর্যটা তো নেই। পাহাড়ের চুড়োটা তো খালি। দেখা যাচ্ছে একফালি আকাশ। তাকিয়ে দেখে খরগোশ। তাকায় মোরগ। কাকটা শুধু মুখ তুলল।

রবি বলল, সূর্য গেল কোথায়?

খরগোশ বলল, নেই নেই।

মোরগ বলল, তাইতো তাইতো।

কাক বলল, গেল কোথায় সূর্য?

কোথায় গেল ভাবতে ভাবতে রবি ঘাসের উপর গা এলিয়ে দিল। পাশে খরগোশটা বসল গুটিসুটি মেরে। কাকটা ল্যাজ নাড়তে থাকে। মোরগটা পাখা ঝাপটায়। রবি দু-হাতে চোখ ঢাকা দেয়।

এবার হাত সরিয়ে আঙুলগুলো রাখে চোখের উপর। দু-আঙুলের মাঝখানে ফাঁক করে আকাশ দেখতে থাকে। সূর্যকে খুঁজতে থাকে।

এ কী। সূর্য যে কাছে। খুব কাছে মনে হয় তার হাতের মধ্যেই সূর্যটা। সূর্যের মধ্যে দেখল আগের সেসব রং।

সে দেখল সূর্যটা লাল।

সে দেখল সূর্যটা হলুদ।

সে দেখল সূর্যটা সবুজ।

গাছের রং, আলোর রং, ঘাসের রং, মাঠের রং সব আছে সূর্যের মধ্যে।

সূর্যের মধ্যেই আছে সব।

তার চেনা সবকিছু।

তার পছন্দের সবকিছু।

সূর্য তুমি এসেছ?

হ্যাঁ, এই তো আমি। আমি সব জায়গায় আছি। সবকিছুর মধ্যে, সকলের জন্য আমি আছি। সকলের সঙ্গে আমি আছি।

যে আমাকে ভালোবাসে, সে সবাইকে ভালোবাসে।

যে আমার সঙ্গে কথা বলে, সে সবার সঙ্গে কথা বলে।

চোখের উপর থেকে আঙুল সরিয়ে রবি উঠে পড়ল।

অমনি খরগোশটাও উঠে দাঁড়াল। কান দুলিয়ে ছুটল মোরগের কাছে। ওই পাথরটার উপর বসে আছে মোরগ।

মোরগ বলল, কী হল? কী হল?

খরগোশ বলল, সূর্য রবির সঙ্গে কথা বলেছে।

মোরগ পাখা মেলল। উঁচু গলায় বলে উঠল, তাই নাকি? তাই নাকি?

দুজনে ছুটল কাকের কাছে।

সূর্য রবির সঙ্গে কথা বলেছে।

কাক দু-পায়ে ভর দিয়ে উঠল।

এক পাক উড়ে এসে বলল, তাই নাকি! তাই নাকি!

খরগোশ আর মোরগ আর কাক ছুটল।

সবাই বলতে বলতে ছুটছে—

সূর্য আমাদের রবির সঙ্গে কথা বলেছে।

সূর্য রবির সঙ্গে কথা বলেছে।

সারা বনে সাড়া পড়ে গেল।

সব গাছ সেকথা জানাল পাখিদের।

সব পাখি সেকথা জানাল পাথরদের।

সব পাথর সেকথা জানাল জলকে।

সব জল সেকথা জানাল মাটিকে।

রবি পাহাড়ের চুড়ো থেকে নেমে চলতে লাগল বাড়ির পথে।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



সিন্দবাদ নাবিকের গল্প

অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবাব হারুন-অল্ রসিদের রাজত্বকালে বোগদাদ শহরে এক গরিব ঝাঁকামুটে বাস করত।

সে একদিন গরমের সময় ভারী মোটের ভারে ক্লান্ত হয়ে একটা মস্তবড়ো বাড়ির দরজায় বসে বিশ্রাম করছিল। শহরের একদিকটা তার অচেনা; তাই একজন লোককে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়িটা কার হে?'

লোকটা বললে, 'আরে, তাজ্জব! তুই বোগদাদ শহরে থাকিস আর সিন্দবাদ নাবিকের বাড়ি চিনিস না? স্বনামধন্য নাবিক সিন্দবাদ, সাতসমুদ্র তেরো নদীতে পাল তুলে যে ঘুরে বেড়ায়।'

ঝাঁকামুটে সিন্দবাদের ঐশ্বর্যের কথা আগেই শুনেছিল। তাই সে নিজের দৈন্যের সঙ্গে তার অতুল ঐশ্বর্যের তুলনা করে বললে, 'হে সর্বশক্তিমান খোদা, একবার ভেবে দেখো দেখি আমার সঙ্গে এই ধনীর কত ফরাকত। আমি কিনা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের আর ছেলেপিলের জন্যে যৎসামান্য খাওয়াপরার জোগাড় করি আর সিন্দবাদ দিব্যি পায়ের ওপর পা দিয়ে সবরকম মজা লুটে দিন কাটায়।'

ঠিক এই সময় সেই বাড়ির একটা ঘরে অনেকগুলো বুড়ো লোক একটা টেবিলে বসে



ভালো ভালো খানা খাচ্ছিল।

ঘরের মধ্যে মালিকের আসনে বসেছিল এক গম্ভীর প্রকৃতির বুড়ো লোক; তাঁর ছিল বুক পর্যন্ত লম্বা সাদা দাড়ি, ইনি হলেন নাবিক সিন্দবাদ।

সিন্দবাদ ঝাঁকামুটের কথাগুলো সব শুনতে পেয়েছিলেন। তাঁর এক বান্দাকে হুকুম করলেন, 'মুটেকে ভেতরে নিয়ে আয়।'

ঝাঁকামুটে কাঁপতে কাঁপতে হাজির হল। আর সিন্দবাদ তাকে নিজের পাশে বসিয়ে ভালো ভালো খাবার খেতে দিলেন। ঝাঁকামুটের কী নাম, কত টাকা সে রোজগার করে সব জানতে চাইলেন।

পরিচয়ের প্রথম পর্ব শেষ হলে সিন্দবাদ বললেন, 'তুমি নিশ্চয় ভাবছ এই ঐশ্বর্য আর আরাম আমি বিনা পরিশ্রমে অতি সহজেই লাভ করেছি। ভুল, একেবারে ভুল তোমার এই ধারণা। তুমি ভাবতে পারো না কী শারীরিক আর মানসিক কষ্ট আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে এই ঐশ্বর্য আর আরাম পাবার জন্যে।'

সিন্দবাদ বলে চললেন—

'আমার বাবা যৎসামান্য টাকা রেখে গিয়েছিলেন। ওই টাকা অল্পদিনের মধ্যে খরচ হয়ে যাওয়ায় আমি খুব অভাবে পড়লাম। শেষপর্যন্ত অনেক চিন্তা করে ঠিক করলাম নাবিক হব। আমি প্রথম জলযাত্রা করি বালাশোরা বন্দর থেকে।

কালাপানিতে ভেসে যেতে যেতে একটা মস্তবড়ো কালো রঙের জমিন দেখে সেটাকে দ্বীপ ঠাউরে তার ওপর নামলাম। হা খোদা, আমরা কী তখন জানতাম সেটা একটা তিমিমাছ জলে ভেসে আছে! যেমন সকলে মিলে তার ওপর নেমেছি, অমনি মাছটা এক ঝাঁকানি দিয়ে একেবারে জলের তলায় ডুব দিলে।

আমার সঙ্গীরা একটা বোটে লাফিয়ে পড়ল। আমি কিন্তু স্রোতের মুখে একেবারে ভেসে বহুদূরে চলে গেলাম। পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল একটা কাঠ, সেটা ধরে ফেললাম। তারপর ওই কাঠটা ধরে সারাদিন আর সারারাত ভেসে চললাম।

যখন সকাল হল, তখন শরীর আর আমার বইছে না; বাঁচবার সব আশাই ছেড়ে দিয়েছি। এমন সময় কোথা থেকে একটা মস্তবড়ো ঢেউ হঠাৎ এসে আমাকে এক ধাক্কায় শুকনো ডাঙায় ফেলে দিয়ে গেল।

সে যাত্রায় আমি খোদার দয়ায় বেঁচে গেলাম। এবার শোনো আমার দ্বিতীয় জলযাত্রার কথা—

সেবার আমরা জনকয়েক মিলে একটা দ্বীপে এসে নামলাম।

দ্বীপের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একজায়গায় বসে একটু বিশ্রাম করছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। ফিরে এসে দেখি আমার সঙ্গীরা আমার দেখা না-পেয়ে চলে গেছে। ওরা ভেবেছিল আমি দিকভুল করে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। এই অচেনা দ্বীপে কোথায় আমাকে তারা খুঁজবে? তাই অগত্যা আমাকে ফেলে রেখেই ওদের চলে যেতে হয়েছে।

কী আর করব। সহায়-সঙ্গীহীন অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে দ্বীপের একজায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় মস্তবড়ো একটা সাদা বল দেখতে পেলাম।

বলটা যে একটা রকপাখির ডিম, তা আমি বুঝতে পারলাম। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে কিছু পরে দেখি প্রকাণ্ড একটা রকপাখি এসে ওই ডিমটার ওপর তা দিতে বসল।

আর-কোনো উপায় না-থাকায় আমি মতলব করে মাথার পাগড়ি দিয়ে নিজেকে বেশ করে ওই পাখির একটা ঠ্যাঙের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম।

পাখিটা তা দেওয়া সেরে যখন আকাশে উঠল, তখন আমিও উড়ে চললাম। উঃ, কী ভয় করছিল। আমার যদি কোনোরকমে একবার বাঁধনটা খুলে যায়, তাহলে পড়ে ছাতু হয়ে যাব।

যা হোক, শেষপর্যন্ত আল্লার দোয়ায় পাখিটা আমাকে নিয়ে একেবারে আফ্রিকা মহাদেশে এক পাহাড়-ঘেরা গভীর উপত্যকায় এনে ফেলল।

যখন পাখিটা স্থির হয়ে বসল, আমি তাড়াতাড়ি নিজের বাঁধন খুলে চেয়ে দেখি একটা

হিরে-ভরতি উপত্যকায় এসে পড়েছি। চারিদিকে এমন খাড়া পাহাড় যে তা পার হয়ে পালাবার কোনো উপায় নেই।

রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের গর্ত থেকে বড়ো বড়ো সাপ হিসহিস শব্দে বেরিয়ে এল। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে তাড়াতাড়ি একটা গুহায় ঢুকে গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে সারারাত জেগে কাটালাম।

সকালে সাপগুলো আবার যে যার গর্তে সেঁধিয়ে গেল। আর আমিও গুহার বাইরে খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এলাম।

রাতে একফোঁটা ঘুম না-হওয়ায় বাইরে রোদের মধ্যে যেই এসে বসেছি অমনি আমার দুচোখ ঘুমে ঢলে পড়ল ।

খানিকক্ষণ পরে একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখি একটা মস্তবড়ো মাংসের চাঁই আমার পাশে পড়ে আছে। দেখতে দেখতে একটা ঈগলপাখি ঝপ করে সেই চাঁইটার ওপর এসে বসল আর সেই মাংসটা নখে গেঁথে নিয়ে উড়ে চলে গেল—পাহাড়ের দেয়াল পার হয়ে।

আসল কথা কী জানো, ব্যবসায়ীরা হিরে সংগ্রহ করবার জন্য ওই জায়গায় এসে থাকে। কিন্তু খাড়াই পাহাড়ের বাধা কাটিয়ে তারা ভেতরে ঢুকতে পারে না। তাই তারা বড়ো বড়ো মাংসের টুকরো পাহাড়ের ওপর থেকে উপত্যকার ভেতরে ফেলে দেয় আর হিরের টুকরোগুলো ওই নরম মাংসে গেঁথে যায়। এরপর মাংসের তাল তুলে নিয়ে পাহাড় পার হয়ে ইগলপাখিরা বাসায় ফেরে। সেইসব পাখিরবাসা থেকে ব্যবসায়ীরা হিরে সংগ্রহ করে।

আমি অনেক ভেবে আমার থলিটা হিরে বোঝাই করে কোঁচড়ে বেঁধে নিলাম। আর-একটা মাংসের চাঁই নিজের পিঠের ওপরে বেঁধে উপুড় হয়ে পড়ে রইলাম।

আমার পালাবার মতলবটা ঠিক ঠিক লেগে গেল। কিছু পরে বেশ বড়ো একটা ইগল সেই তালটা আঁকড়ে ধরে আমাকে সুদ্ধ তার বাসায় নিয়ে গিয়ে হাজির করল।

এই রকপাখি আমি আর মাত্র একবার দেখেছিলাম। সেটা ছিল আমার পঞ্চম জলযাত্রা।

প্রথম অনুকূল বাতাসে আমরা পাল তুলে দিলাম। বড়ো বড়ো ঢেউ ভেঙে আমরা চলেছি এগিয়ে। কিছুদিন পর আমরা নোঙর করলাম মরুভূমির মতো এক দ্বীপে। সেই দ্বীপে হঠাৎ চোখে পড়ল একটা রকপাখির ডিম। ডিমটা তখন সবে ফুটছে আর খোলা ভেঙে বাচ্চা রকপাখির ঠোঁট সবেমাত্র একটু দেখা দিয়েছে। সেই দেখে আমার সঙ্গে যারা ছিল কুঠারের ঘায়ে ডিমটা ভেঙে পাখিটা জবাই করে আগুনে ঝলসে খেয়ে ফেলল।

সবে যখন তারা খাওয়া শেষ করেছে তখন দেখি দুটো কালো মেঘের মতো কী আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

আমার সঙ্গে এ যাত্রায় একজন খুব হুঁশিয়ারগোছের নাবিক সর্দার ছিল, সে ওই দৃশ্য দেখে আমাদের হুঁশিয়ার করে বললে, 'ওই মেঘদুটো বাচ্চাটার বাপ আর মা। সাবধান না-হলে সমূহ বিপদ।'

এই শুনে আমরা তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠে পাল তুলে দিলাম।

রকপাখি দুটো কলরব করতে করতে আরও কাছে এল। এসে তাদের ভাঙা ডিম, বাচ্চার হাড়গোড় দেখতে পেয়ে ভীষণ খেপে গেল। তারপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে যে-পথে এসে ছিল আবার সেই পথে উড়ে গেল।

এই অবসরে আমরা অনেক চেষ্টা করেও সেই জায়গা ছেড়ে মোটেই বেশি দূরে যেতে পারলাম না।

পাখিদুটো খানিক পরে ইয়া বড়ো বড়ো দুই পাথর আঁকড়ে হাজির হল, আর জাহাজের মাথায় চক্কর দিতে লাগল। মা-পাখিটা তার পাথর জাহাজের কাছে ফেলে দিল। আমাদের সারেং ছিল ভারী চতুর ; সে তাড়াতাড়ি জাহাজটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল। পাথরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে জলে পড়ে এমন এক গর্ত সৃষ্টি করল যে আমরা সমুদ্রের তলা পর্যন্ত দেখতে পেলাম।

দ্বিতীয় পাখিটা একেবারে জাহাজের মধ্যিখানে পাথরটা ফেলল। জাহাজ একেবারে দুখানা হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জলে তলিয়ে গেল।

কতক নাবিক পাথরের ঘায়ে মরল, কতক জলে ডুবে গেল, কপালগুণে আমিই একমাত্র লোক যে রক্ষা পেলাম। যদিও আমাকে ঘূর্ণিজলের চাপে ডুবিয়ে দিয়েছিল তবুও আমি ভেসে উঠে একটুকরো কাঠ ধরে অবশেষে অনেক দূরে এক দ্বীপে গিয়ে উঠলাম।

দ্বীপের পাড়টা খুব উঁচু আর খাড়াই ছিল; আমি কোনোরকমে সেখানে নামলাম। তারপর ঘাসের ওপরে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

দ্বীপটা ভারী সুন্দর ; ফল আর ফুলে ভরা। পরিষ্কার পাহাড়ি নদী ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। আমি সেই মিষ্টি জলে তৃষ্ণা মিটিয়ে, পেটভরে ফল খেয়ে মনের আনন্দে দ্বীপের আরও ভেতরে প্রবেশ করলাম। কিছুদূর যাবার পর দেখি একটা বুড়ো লোক একজায়গায় চুপ করে বসে আছে। যেন কত অসুখ করেছে এমনিভাব। আমাকে সে ইশারা করে বললে কাঁধে করে নদী পার করে দিতে। আমিও দয়াপরবশ হয়ে বুড়োকে কাঁধে তুলে নদী পার হলাম।

ওপারে গিয়ে আমি তাকে কাঁধ থেকে নামতে বললাম। আমার এখনও সেই কথা ভাবলে হাসি পায় যে সেই বুড়ো আমাকে ছেড়ে নামা দূরের কথা, তার সেই কাকের মতো সরু সরু পা দিয়ে আমার গলাটা এমন আঁকড়ে ধরল যে আমার প্রাণ যায় আর কী। আমি চাপের চোটে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে পড়লাম।

বুড়োটা কিন্তু আমার গলা আঁকড়ে ধরে রইল, কেবল একটু ঢিলে দিয়েছিল যাতে আমি শ্বাস নিতে পারি।

আমি একটু সুস্থ হতে সে পা দিয়ে আমার পেটে গোঁত্তা মেরে আবার দাঁড় করিয়ে দিলে—ঠিক যেন আমি একটা ঘোড়া।

এবার সে আমায় গাছের তলা দিয়ে যেতে বলল, আর সেই সঙ্গে বলল গাছের ফল পেড়ে খাওয়াতে। দিনেরবেলায় সে আমাকে একবারও ছাড়ত না, কেবল রাত্রে ঘুমোবার

সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে মাটিতে শুত আমার গলা দু-পায়ে জড়িয়ে ধরে।

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে গোঁত্তা মেরে উঠিয়ে দিত; সারাদিন খাটিয়ে মারত আর কাজে একটু ঢিলে দিলেই কেবল লাথি মারত।

একদিন এইরকম ঘুরতে ঘুরতে আমি একটা বেশ বড়ো শুকনো বাবোস ফল কুড়িয়ে পেলাম। বিচিগুলো বের করে বাবোসের খোলের মধ্যে একগুচ্ছ আঙুরের রস ভরে একটা গাছের গোড়ায় বসিয়ে রাখলাম। তারপর আমি ওই জায়গাটা বেশ লক্ষ করে দেখে রাখলাম যাতে পরে ভুলে না-যাই।

এরপর একদিন বুড়ো যখন আমাকে নিয়ে ঘুরছে সেই সময় ওই জায়গা দিয়ে যাবার সময় ফলটা তুলে নিয়ে দেখি তার ভিতরে আঙুরের রস গেঁজে একেবারে সেরা শরাব হয়ে গেছে। আমি ওই শরাব বেশ খানিকটা পান কবলাম, আমার গায়ে বল ফিরে এল। ফুর্তির চোটে আমি সকল দুর্ভাগ্য ভুলে গিয়ে মত্ত হয়ে নাচ আর গান করতে লেগে গেলাম বুড়োকে কাঁধে নিয়ে।

বুড়ো আমার আনন্দ দেখে আমাকে ইশারা করে ওই শরাব পান করতে চাইল। আমি তাকে বাবোসের খোল থেকে, শরাব পান করতে দিলাম, সে একেবারে শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত পান করে ফেলল।

বাবোসের ভিতর অনেকটা রস ছিল, তার ঝাঁঝ বুড়োর মাথায় চড়ে গেলে; বুড়ো নিজের মনে গান গেয়ে আমার কাঁধে বসে নেশার ঝোঁকে টাল খেতে লাগল; এইসময় তার পাদুটো আমার গলায় একটু ঢিল হতেই তাল ঠুকে এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে দিয়ে একটা পাথরের চাঙড়া দিয়ে তার মাথাটা গুঁড়িয়ে শেষ করে দিলাম।

এইবার বুড়োর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে খোশমেজাজে দরিয়ার ধারে ফিরে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি একটা জাহাজ মিঠা পানি ভরবার জন্য ডাঙার কাছে নোঙর করেছে।

আমি ওই জাহাজে গিয়ে উঠলাম। নাবিকরা আমার গল্প শুনে একেবারে তাজ্জব। তারা বললে, 'বাবা! তুমি সেই সমুদ্রের বুড়োর খপ্পরে পড়েছিলে? তার হাতে পড়লে কেউ জীবন নিয়ে ফেরে না। তুমিই প্রথম তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে এসেছ। নাবিকেরা এই দ্বীপটাকে যমের মতো ভয় করে, দ্বীপে কেউ তারা ভুলেও একা নামে না।'

ছবি। সুবোধ দাশগুপ্ত



বুদ্ধিমন্ত পরিবার

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জোড়াতাড়া চালা ঘরে দিনগুজরান করে স্বামী-স্ত্রীতে। না-খাওয়া, হাড্ডি সার গোরুও একটা আছে—সম্পত্তি। বুঝতেই পার, পয়সাকড়ির বালাই তেমন নেই। হলে কী হয়, দুজনেই ভারী চালাকচতুর। স্বামী বলে, আর কী বল, বুদ্ধির জোরেই বেঁচে আছে কোনোমতে।

বউ গিয়ে পড়শি-বউদের সঙ্গে গল্প করে আসে—আর তো কিছু নয় ভাই, ওই এক বুদ্ধি। তা তারই জোরে সংসারটা চলেছে তো! দেখতে তো পাও!

বলেই ফেলি স্বামীর নামটা তা হলে। আবদাল্লা। আব্‌দ্ মানে দাস, চাকর। আর আল্লা তো জানোই, স্বয়ং দেবতা, ভগবান। আবদাল্লার আমাদের নামটির জন্যে ভারী গরব—আল্লার খাস বান্দা সে। সত্যি! অনেকবার সে দেখেছে আল্লা তাকে খুবই পছন্দ করেন।

থাক। আসল বৃত্তান্তেই আসি।

একদিন সারারাত খুব ঝড়বাতাস হয়েছে। সকালবেলায় আবদাল্লা বাইরে বেরোতে গিয়ে দুম করে ঘা খেল মাথায়। ইয়া আল্লা! চাল নেমে এসেছে কাঁধ-সই—এ যে একেবারে বরবাদ হয়ে রয়েছে!



বউ ঘুমোচ্ছিল। জাগিয়ে তুলল তাকে ঘরে ঢুকে— দেখেছ কাণ্ড?

বউ চোখ রগড়ে উঠে বসল-—কেন, কী আবার হল!

দেখসে বাইরে।

বাইরে আসতে ঘরের বেহাল দেখে তারও মাথায় হাত। হায় হায়, এ যে ভাঙতে বসেছে! যেমন-তেমন সারাতেসুরোতেও তো এককাঁড়ি পয়সা। এখন উপায়?

দুজনেই ভাবতে বসল।

আগেই বলেছি, পয়সাকড়ির যতই কমিই হোক, বুদ্ধির অভাব নেই দুজনের কারও। এক মিনিটের মধ্যেই লাফিয়ে উঠল বউ—হয়েছে। পেয়ে গেছি।

কী বুদ্ধি করলে বল শিগগিরি। কী পেয়েছ? বল, বল!

তখন বউ বলে, ঘর সারাবার ভাবনাটা কী শুনি। গোরু তো রয়েছে একটা।

কিন্তু—

বুদ্ধিটা আবদাল্লার তত পছন্দ বলে মনে হয় না।

কিন্তু আবার কী। ঘর না সারালে চলছে? আজই হাটবার আছে। ভালোই হল। আজই হাটে যাও, গোরুটা বেচে এসো গে।

কিন্তু অ্যাদ্দিনের গোরুটা!

রাখো অ্যাদ্দিনের গোরু। কী উব্‌কারে আসছে তোমার গোরু, খালি খাবার গোঁসাই!

তিরিশটা দিনার তো হবে বেচলে। আর, আমিও যাচ্ছি—সুতো কাটা আছে কটা পাঁজ, যাব বেচে আসব। চাই কী পুরোনো ভেঙে নতুন ঘরই হয়ে যাবে আমাদের একটা।

যাই হোক, বউয়ের ঠেলায় তখন-তখনই আবদাল্লা গোরু হাঁটিয়ে পৌঁছোল গিয়ে হাটে—গিয়ে জিম্মে করে দিল ফড়ের কাছে।

নে বাবা, দরদাম তোল্ ভালো করে, আমি একটু হাটটা ঘুরে দেখি ততক্ষণে। আবদাল্লা ভাবল, ব্যাপারটা। তত কঠিন তো কিছু না—আসলে ভালোই ব্যাপারটা। ফড়ে হেঁকে হেঁকে দাম তুলুক, তারপর বিক্রিবাটা হয়ে গেলে নিখরচায় একমুঠো টাকা ট্যাঁকে বাজিয়ে ফেরা যাবে আমেজ করে। না, বুদ্ধি আছে বটে বউয়ের।

হাড়-জিরজিরে গোরু। কেনার তালাশে যারা এসেছিল, এদিকটায় যদি তেমন ঘেঁষতে তাদের না দেখা যায়, খুব একটা কিছু বলাও যায় না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ফড়ের অদ্ভুত কেরামতিতে এই গোরুরই চারপাশে লোক জমে গেল। ফড়ে চেঁচাচ্ছে— চলে গেল, চলে গেল, চলে গেল—

চোখে দেখে গুণ নয় মশায়রা, চোখে দেখে গুণ,
বিশ সেরী গায় মশায়রা, পরখিয়ে দেখুন—

আরে মশায়রা, চোখে দেখেছেন কী, বেহেশতের নবী-সায়েবরা এখনও ওরই মায়ের দুধ চুমকে খাচ্ছে—

একজন লোক এগিয়ে এসে গোরুর গা টিপে মৃদু আপত্তি করতে চাইল বলে মনে হওয়াতে ফড়ে তাকে খুব ধমক দিল—আপনি জানেন ওর গুণ? দেখেছেন ওকে আগে?

লোকটি বলল, আজ্ঞে না।

গেছেন বেহশতে? নবী-সায়েবদের কাউকে চেনেন?

আজ্ঞে...

লোকটা মিনমিন করে আরো কী বলতে যাচ্ছিল, ফড়ে ধমকে উঠল—ব্যাস, থামুন তা হলে—চেনেন না, জানেন না কিছু—

আর এই ব্যাপারে ভিড়ের সবার হঠাৎ চোখ পড়ে গেল গোরুটার ওপরে তাই তো—তবে তো—দেখতে দেখতে প্রত্যয়ও বেড়ে গেল সব সাংঘাতিক রকম। তখন সবাই সবাইকে ঠেলে গোরুর সামনে আসতে চেষ্টা করতে লাগল প্রাণপণ। সবাই সামনে যেতে চেষ্টা করতে লাগল বলে সবাই সবাইকে ধরে পেছনে টানতে লাগল। প্রাণপণ। সবাই সবাইকে পেছনে টানতে লাগল বলে কারোরই কারও আগে দেওয়া কঠিন হয়ে উঠল। কারোরই কারও আগে যাওয়া কঠিন হল বলে যে যেখান সেখান থেকে এক পাও কেউ এগোতে পারল না।

আর আবদাল্লা? আবদাল্লাও উশখুশ হয়ে উঠেছে মনে মনে অনেকক্ষণ ধরেই। ফড়ের মুখে অমন সব আশ্চর্য গুণের কথা শুনে অনেকক্ষণ ধরেই সে ভাবতে শুরু করেছে—তাই? এত গুণ?

তারই গোরুর এত গুণ? কই সে তো কিছু জানত না। কী আশ্চর্য, এতখানি খানদান, এত

বড়ো বংশের গোরু—তারই ঘরে, আর সে কি না কিছু টের পায়নি।

কিন্তু ভিড় ততক্ষণে আরো জাঁকিয়ে উঠেছে। ফড়ে চেঁচাচ্ছে—চলে গেল, চলে গেল, চলে গেল—

চোখে দেখে গুণ নয় মহায়রা, চেখে দেখে গুণ,
বিশ সেরী গায় মশায়রা, পরখিয়ে দেখুন—

আরে মশায়রা, চোখে দেখছেন কী—ঘরে নিন, দুধ দোন, জিভে ঠেকান, চেখে দেখুন?

আবদাল্লা ছিল পিছন পড়ে, প্রাণপণ কসরতে ঠেলে গলে লাফিয়ে ডিঙিয়ে সামনে এগিয়ে এল। হাঁপাচ্ছে। হাঁপাবে না? বিশ্বাস কী। বিক্রি হয়ে গেলেই হয়ে গেল। এ তো যাই তাই নয়, কত বড়ো ঘরের গোরু। কেউ কিনে ফেললেই তো ব্যাস। হাঁপাতে হাঁপাতেই যত শক্তি গলা চড়িয়ে জিগেস করল আবদাল্লা, কতয় যাচ্ছে মশায়? কতয় যাচ্ছে—

পনেরো-পনেরো— চলে গেল পনেরো—ফড়ে আবার চেঁচাতে শুরু করল—চলে গেল, চলে গেল, চলে গেল—

পনরহ্ দিনার মশায়রা, পনরহ্ দিনার,
এ গোরু বিকিয়ে গেলে মশায়রা, দুসরা কাঁহা আর—

আ রে মশায়রা, তখন আর পয়সা গিঞ্জিয়েই বা কী করবেন! মিলবে দুসরা আরেকটা?

এখন হয়েছে কী, আবদাল্লার ট্যাঁকে ছিল গোনা-গুনতি পনেরোটাই টাকা—ঘর বানাবার খুঁটোনাটা কিনে নিয়ে যাবে বলে শেষ সম্বল নিয়েসেছিল হাটে। আর ভাবারও অবসর নেই। এরই মধ্যে ভিড় ছিটকে দু-একজন গোরুটার গায়ে হাত দিয়ে যেভাবে দেখছে! ওই রে! ফেলল বুঝি কিনে। কিভাবে গা টিপছে দেখ গোরুটার। এই যে— এই যে— সবুর— আবদাল্লা ছুটে গিয়ে ধরল গোরুটাকে। কারও কথা শুনছি না মশায়! হাঁসফাঁস নিশ্বাস নিতে নিতে গোটা একটা হুজুম ভিড় গলার ধমকে দাবিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—আমার চাইতে হক আপনার? ট্যাঁক থেকে পনেরো দিনার ঠনঠন করে ফড়ের হাতে ফেলে দাপটে গোরুর দড়ি ঝটকা দিয়ে ছিনিয়ে নিল আবদাল্লা হাত থেকে তার। তারপর বিজয়ী বীরের মতন ভিড় ঠেলে গরবে গরবে পা ফেলে ফিরে চলল ঘর।

সারা রাস্তা আনন্দে ওঠ-পড় করতে লাগল আবদাল্লার বুকটা। কেউ জানে কী ধন সে নিয়ে চলেছে। এখনও জানে না? এতক্ষণে জেনে গেছে নিশ্চয়। নিশ্চয় এতক্ষণে খবর ছড়িয়ে পড়েছে পাড়ায় মহল্লায়—হুরী-পরীরা যে মায়ের দুধ খেয়ে এমনি খুবসুরৎ তারই বেটিকে ঘরে নিয়ে চলেছে সে। ওই তো! দেখ না, হাঁ করে তাকিয়ে আছে সব! অস্থির-অস্থির করতে লাগল আবদাল্লার।

ঠিক! যা ভেবেছি। ঘরে ফিরে দেখে বৌ নেই। সুতো বেচতেই গেছে। আজই দরকার হল যাবার! নাঃ, যে দিনই দেখেছে কিছু একটা দরকার, খুব দরকার, সে দিনই এমনি। ষোল আনা সুখ ভাগ্যে নেই। না, এমন একটা ব্যাপার, বৌকে না বলা অবধি থাকা যায়? অস্থির হয়ে ঘর-বার করতে লাগল সে বারবার করে।

অবশেষে ফিরে এল বৌ। ঘরে উঠেছে না উঠেছে, লাফিয়ে উঠল আবদাল্লা—কী করেছি আজ জানো?

লাফাচ্ছ কেন গো—

লাফাচ্ছি? কী করেছি আজ জানো? শুনলে তুমি তাজ্জব হয়ে যাবে। হা আল্লা! আশ্চর্য। অবশ্য সবই তাঁর দয়া। আল্লার দয়ার কথা ভেবে আবদাল্লার মনটা ফের একটু নরমই হল! আর ব্যাস। সেই ফাঁকে—দাঁড়াও, দাঁড়াও বাবা, অত ছটফট কোরো না—বলতে বলতে আবদাল্লার জলন্ত উৎসাহে বৌ এক ঘড়া ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলে হড়হড় করে। আমি যা করিছি আজ, হুঁ হুঁ—

কী করা, নাচার হয়ে আবদাল্লা বললে, বল, শুনি।

তাকে মিইয়ে যেতে দেখে বউ থামল একটু : তুমিও মস্ত কিছু করেছ জানি। কিন্তু আমি যা করে এলাম—

আবদাল্লা বিড়বিড় করে বলল, তা তো বটেই, তা তো বটেই—

শোনো। গেলাম তো হাটে সুতো নিয়ে। দেখি খুব এক বড়োমানুষ—আমলা-পেয়লাটেয়লা কেউ হবে আর কী, সরেস সুতো খুঁজছে। গেলাম এগিয়ে—সুতো নেবে?

নেবো তো সুতো, কিন্তু,

কিচ্ছু ভাবতে হবে না বাবু তোমায়, সবচেয়ে সরেস সুতো—এই দেখ—

সরেস বলছ? কিন্তু কট্টুকু হবে তোমার? সেরটাক হবে অন্তত?

হবে গো হবে, খুব হবে—বলে, চড়া দাম হাঁকলাম।

দেখি, তেমন তেড়িয়া নয় লোকটা। আমলা-পেয়লাটেয়লাদের মতন একেবারেই নয়। সেই দামেই রাজি। শুধু আমতা আমতা করে বলে, কিন্তু সেরটাক তো বাপু নেই তোমার!

রাগ হয় কথা শুনে। নেই? দেখ কথা। নেই বললেই হল? দাম নিয়ে কম দেব?

বেশ, ঝামেলার দরকার কী বাপু! পাল্লায় চাপাও, তা হলেই দেখা যাবে।

ঠিক আছে, চাপাও ওজনে। জাহিলা মেয়ে পেয়েছ? ভাবছ, ওজন শুনে চুপসে যাব? ওপরাউপরি জলদ জবাব।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। চাপাও তো পাল্লায়। কম পড়লে মালসুদ্ধু সোজা তুলে নিয়ে যাব কাজির কাছে, মনে রেখো।

বোঝ হাসির কথা, আমায় দেখাতে এয়েছেন ভয়। যা হোক, এখন তোমায় কবুল করছি বুকটা টিপটিপই করছে—যদি না হয় ঠিক! আবার কাজি তুলে বসল। তেনাদের তো আবার কথার আগেই কোতল।

যা হোক, চাপানো তো হল পাল্লায়। আর—হা আল্লা, বলব কী, বাটখারার দিকটাতেই ঝুলে পড়ল গো—

তবে রে? রেগেমেগে লোকটা সুতোটুতো নাবিয়ে এই মারে তো সেই মারে—

বোঝ আস্পদ্ধা। আমায় কিনা এই মারে সেই মারে। কিন্তু কী করি, গলত আমারই, তায়

দরবারি আদমি। খুব নরম হয়ে বললাম, পাল্লা ভুল হতে পারে বাবু। আরেকবার চাপাও, এবারে গোল হলে তখন না হয় যা-খুশি কোরো।

আবার চাপানো হল সুতো। আর, কী বোকা লোকটা—হোঃ হোঃ হোঃ—কী বলব তোমায়, ওর চোখের ওপর দিয়েই ধাঁ করে হাত সাফাই করে সুতোর পাঁজের মধ্যে গলিয়ে দিয়েছি যে আমার ভারী রুপোর তাড়— হোঃ হোঃ হোঃ—হাসতে গিয়ে দম ফাটে আর কী—লোকটার নজরেই পড়ল না। তারপর, আর যাবি কোথায়, এক্কেবারে কাঁটায় কাঁটায় ওজন। আমার সঙ্গে বুদ্ধিতে পারবেন উনি! দুড়দুড় করে দাম ফেলে দিয়ে সুতোটুতো সব সুদ্ধু তালেগোলে গুটিয়ে নিয়ে পালাতে পথ পায় না মানে মানে! পরে চোখে পড়বে? আরে, আমি আর এক দণ্ড দাঁড়াই! পয়সা বাজিয়ে নিয়ে সোজা পিঠটান! আর আমায় পাচ্ছে কোথায়?

আশ্চর্য! আশ্চর্য!! আবদাল্লা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। এত বুদ্ধি? একটা দরবারি সরকারি লোক— কী না তাকে বোকা বানিয়ে চলে এল? আবদাল্লা ঘুরে ঘুরে তারিফ করতে লাগল বউয়ের বুদ্ধির। না না, এর পাশে আমারটা কিছু না।

না হোক। আবদাল্লার বউ তাও ছাড়ল না। স্বামীর কাছ থেকে পুরো কীর্তি শুনে তবে ক্ষান্ত। তারপর সেও শতমুখে স্বামীর প্রশংসা করতে করতে বললে, দেখ বাপু, আল্লা হচ্ছেন আমাদের সহায়। তা নইলে এই বুদ্ধি কি সাধারণ মানুষের থাকে?

তা হলে ঘর সারানোর কী হল শেষ অবধি?

সে আর বাপু আমার কাছে জানতে চেয়ো না।

ছবি। *যুধাজিৎ সেনগুপ্ত*



প্রতিদান

তপনকুমার দাস

পাহাড়, মরুভূমি আর ছবির মতো অরণ্যে ঘেরা সেই দেশে বাস করত এক বেদুইন। খুউব ধনী বেদুইন। তার ছিল অনেক অনেক উট। আর ছিল তরতাজা চনমনে এক দল উটের দুধ বাজারে বিক্রি করে অনেক টাকা জমিয়েছিল বেদুইন।

সেই বেদুইনের যে প্রতিবেশী, সে ছিল খুব গরিব। দিনের শেষে ছেলেপুলে বউয়ের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার সঙ্গতিও ছিল না তার। কিন্তু গরিব হলে কী হবে, বেদুইনের সেই প্রতিবেশীটি ছিল ভীষণ সৎ।

প্রতিবেশী আর তার ছেলেপুলেদের দুঃখ কষ্ট অভাব অনটন দেখে মায়া হল বেদুইনের। সে তার উটের পাল থেকে একটা ভালো উট দিয়ে দিল প্রতিবেশীকে। মনে মনে ভাবল, আহা, উটের দুধ পান করে ছেলেপুলেদের খিদেও মিটবে পুষ্টিও হবে।

ধনী বেদুইনের কাছ থেকে উট পেয়ে গরিব প্রতিবেশী খুশি হল। আর ছেলেপুলেদের খিদে মেটাতে পেরে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেল। প্রতিবেশীর অবস্থার উন্নতি হওয়ায় খুশি হল বেদুইনও।

একদিন বেদুইন বনে গেছে শিকার করতে। সঙ্গীহীন একা। উদ্দেশ্য খরগোশ আর

গজলা হরিণ। কিন্তু শিকার কি আর সহজে করা যায়? না জন্তুরা এসে শিকারির কাছে ধরা দেয়? দেয় না। বরং শিকারিকে দেখে ভয়ে পালায়। তেমনি হরিণটাও বেদুইনকে দেখে প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে পৌঁছে যায় একেবারে পাহাড়চুড়োয়। বেদুইনও হরিণকে তাড়া করে উঠে যায় পাহাড়ে। আর ঠিক তখনই পা পিছলে একেবারে পাহাড়ের খাদে গিয়ে পড়ে সে। পা মচকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। একেই খাড়া পাহাড়, তার উপর মচকানো পায়ের ব্যথা। সুতরাং বেদুইনের পক্ষে খাদের বাইরে বেরিয়ে আসা একেবারে অসম্ভব হয়ে যায়।

খাদের পাশেই ছিল ছোট্ট একটা ঝরনা।

সেই ঝরনার জলে পা ভিজিয়ে, পোশাকের কাপড় ছিঁড়ে পট্টি বেঁধে অপেক্ষায় থাকে



বেদুইন। যদি কখনও কেউ এসে তাকে উদ্ধার করে সেই আশায়। এবং এইসব ভাবতে ভাবতেই যন্ত্রণায় কাতর ক্লান্ত বেদুইন ঘুমিয়ে পড়ে পাহাড়ের খাদে।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই অবাক হয় বেদুইন।

পাহাড়ের খাদে তার পাশে কে যেন একটা দুধের পাত্র রেখে গেছে। কে? কোথায় সেই মানুষটা? দুধের বদলে তাকে যদি উদ্ধার করত! কিন্তু না, কোথাও কেউ নেই। হাহুতাশ করা ছাড়া কী আর করবে বেদুইন। এদিকে খিদেয় চুঁই চুঁই করছে পেট। অতএব অজানা সেই মানুষটার পাঠানো দুধ পান করে আবার খাদের পাথরের দেওয়ালে হেলান দেয় বেদুইন।

এমনিভাবে একদিন, দু'দিন তিনদিন, সাত সাতটা দিন কেটে যায়। পাহাড়ের খাদে বেচারা বেদুইনের সপ্তাহ কাটে অজানা বন্ধুর রোজ পাঠানো দুধ পান করে। কিন্তু না, এইভাবে খাদের ভিতর দিনের পর দিন পড়ে থাকলে মৃত্যু ছাড়া যে আর কোনও গতি থাকবে না।

তাছাড়া অষ্টম দিনে দুধের কোনও পাত্রের পাত্তা নেই। সুতরাং মরিয়া হয়ে ওঠে বেদুইন। যে ভাবেই হোক খাদের বাইরে তাকে বেরুতেই হবে।

হামাগুঁড়ি দিয়ে খাদের প্রান্তে পৌঁছে যায় বেদুইন। ঠিক তখনই এক রাখাল ছেলে দেখতে পায় বেদুইনকে। দৌড়ে এসে উদ্ধার করে। পাহাড়ি টিলায় নিজের পাতাছাওয়া ঘরে নিয়ে যায় আহত অসুস্থ ক্লান্ত বেদুইনকে। সেবা যত্নে সুস্থ করে তোলে। সুস্থ হওয়ার পর রাখাল ছেলে আর তার পরিবারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরে আসে ধনী বেদুইন।

বাড়ি ফিরেই দেখে অবাক কাণ্ড।

তার অনুপস্থিতিতে তার ছেলেরা গরিব প্রতিবেশীর কাছ থেকে তার দান করা উটটা কেড়ে নিয়েছে। কেড়ে নিয়েছে সেই অষ্টম দিনে, যেদিন থেকে দুধের পাত্র আর খাদে পৌঁছায়নি। সব শুনে, সব বুঝে, মনে মনে মরমে শরমে মিইয়ে যায় বেদুইন। কালবিলম্ব না করে উটটাকে আবার ফিরিয়ে দেয় গরিব প্রতিবেশীকে। সঙ্গে দেয় একথলি মোহর। বেদুইনের প্রাণ বাঁচানোর প্রতিদান। দানের উট ফিরিয়ে নেওয়ার অপরাধে বকাবকি করে ছেলেদের।

বাবার ফিরে আসায় ছেলেরা খুশি, বকুনি খেয়ে বুঝতে পারে নিঃস্বার্থ দানের প্রতিদান কত মহৎ হয়।

ছবি। অরুণ চট্টোপাধ্যায়



অরুণ চট্টোপাধ্যায়

ছোট্ট এক পাহাড়ের কোল ঘেঁষে উঁচু প্রাচীর ঘেরা বিশাল একটা বাগিচা। তার এক পাশে ছোট্ট এক দিঘি। দিঘির পাশে আর-একটা মস্তবড়ো সরোবর। তার স্ফটিক জলে তিরতির করে কাঁপে সুলতানের সুরম্য প্রাসাদের ছায়া। আজ আবার রঙিন আলোর রোশনাই সারা প্রাসাদ জুড়ে। তারই প্রতিচ্ছবি সরোবরের বুকে। প্রাসাদের এই সাজসজ্জা শরিফের জন্য। শরিফ সুলতানের একমাত্র সন্তান। কাল তার জন্মদিন।

শরিফকে নিয়ে সুলতান আর বেগম বেশ খুশিমনেই রাতের ভোজনের জন্য একসঙ্গে বসেছেন। শরিফ আবদার করল, 'আব্বাজান, এবারের জন্মদিনে আমি একটা উপহার চাই। একটা বাঁদর। খেলনা পুতুল নয়, একটা জ্যান্ত বাঁদর।'

সুলতানের অট্টহাসিতে সকলে চমকে উঠল। তারপর নিজেকে সংযত করে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'বাঁদর, একটা সত্যি বাঁদর? তুমি কি জান. বাঁদরের বাঁদরামি কী ভয়ংকর?'

শরিফ বলল, 'এ আর এমন কী আব্বা? ওকে কলা খেতে দেব, বাদাম দেব। আর বাগানে আছে বেগুন টমেটো স্কোয়াশ। খেজুর গাছে উঠে নিজেই খেতে পারবে খেজুর—

আমাকেও দেবে—খুব মজা হবে, তাই না?'

ছেলের চোখে-মুখে হাসির ছটা দেখে বেগম বললেন, 'বেশ তাই হবে। তোমার জন্মদিনে ছোট্ট একটা বাঁদর এনে দেবেন সুলতান। আমি তার জন্য কুর্তা বানিয়ে দেব।'

পর দিন ভোর হতেই শরিফের ঘুম ভেঙে গেল। তখন সবে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। গাছে গাছে পাখিদের ওড়াউড়ি. ডাকাডাকি। সেদিকে মন নেই ছোট্ট শরিফের। সে ঝোপেঝাড়ে দৌড়ে বেড়ায়। খুঁজতে থাকে একটা বাঁদরকে। কোথাও দেখতে না পেয়ে শরিফ চিৎকার করে বলছে, 'কোথায় আমার বাঁদর, কোথায় আমার বাঁদর! আমি যে তার নাম রেখেছি হাসান....।'

'এই যে তোমার হাসান।' প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে ঘুম-চোখে বললেন সুলতান।

সুলতানের পিছনে বান্দা আহমদের কোলে ছোট্ট একটা বাঁদর। তার পরনে উজ্জ্বল লাল রঙের ব্যাগি প্যান্ট, লাল-হলুদ ডোরাকাটা কুর্তা আর হলুদ রঙের মখমলের পাগড়ি। শরিফের আম্মা রাত জেগে তৈরি করেছেন।

'যত্ন নিয়ো তোমার হাসানের।' এ কথা বলে সুলতান শয়ন ঘরে ফিরে গেলেন।

সুলতানের চলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল যেন হাসান। সে আহমদের কোল থেকে লাফ দিয়ে ছুটে গেল বাগিচার ভেতর। প্রথমেই সে মাথা থেকে পাগড়ি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর গোলাপবাগানে ঢুকে লাল হলুদ জাফরান রঙের ফুলগুলো ছিঁড়তে শুরু করে দিল।

'এ কী করছিস হাসান? ওই গুলবাগিচা আমার আম্মার খুব প্রিয়। ওগুলো নষ্ট করিস না সোনা।' চিৎকার করে বলল শরিফ।

কে আর শুনছে শরিফের কথা? বাঁদরামি করেই চলল হাসান। সবুজ ঘাস—যেন সবুজ এক গালিচা পাতা রয়েছে বাগান জুড়ে। নানা রঙের ফুলের পাপড়ি সেই সবুজ গালিচা ঢেকে ফেলেছে। হাসানের পিছনে ছুটতে ছুটতে শরিফ এক সময় ওর লেজ ধরে ফেলল। তারপর আদর করে ওকে কোলে তুলে নিল সে।

শরিফ বলল, 'চল তোকে নিয়ে যাব কলাবাগানে। সেখানে গাছে-গাছে কত কলা।'

সেখানে যেতেই শরিফের কোল থেকে ছিটকে পড়ল মাটিতে হাসান। এত কলা—এত গাছে-গাছে! সেদিকে মন নেই তার। ভূমিতে তরতাজা লতায় লতায় কত কত তরমুজ।

'না—না—এ কী করছিস রে বাঁদর। তুই কলা খেতে পারিস যতখুশি—একটাও তরমুজ নষ্ট করবি না—'। একথা বলতে বলতে হাসানকে ধরতে তার পিছু নিল শরিফ। কিন্তু বাঁদরের সঙ্গে পারবে কেন আট বছরের একরত্তি ছেলেটা। ততক্ষণে হাসান একটা তরমুজ ফাটিয়ে শরিফের গায়ে ছুঁড়ে মেরেছে। পাকা টসটসে তরমুজ শরিফের গায়ে পোশাকে মাখামাখি হয়ে তাকে একটা ভূত বানিয়ে দিল।

শরিফ হতভম্ব হয়ে দেখছে হাসানের আজব কাণ্ড। প্রাসাদের দেয়ালগুলো তখন বিচিত্র রঙে সেজে উঠতে লাগল। খরমুজের হলুদ রঙের পাশে তরমুজের লাল রং—গাছপালার

শিশিরের মতো সবুজ নির্যাস—সব দেয়ালে, তোরণে, দ্বারে-দ্বারে।

এখানেই শেষ হল না হাসানের কীর্তি। সরোবরে সাঁতার কাটছিল কতগুলো রাজহাঁস। তাদের ধবল পালকে ছিটকে পড়ল খরমুজের হলুদ রং। প্যাঁক প্যাঁক—জলে ডুব দিয়ে ধুয়ে ফেলল হলুদ রং। তা দেখে দুষ্টু বাঁদর রেগে গেল। পাশেই ছিল খাঁচার ভিতর খলিল—সুলতানের প্রিয় শার্দুল। বাঘটা তখন হাসানের বাঁদরামি দেখে রাগে গরগর করছে। খলিলের দিকে চোখ যেতেই হাসান তরমুজ ছুঁড়ে মারতে লাগল তার গায়ে। খলিলের তেল-চকচকে হলুদ-কালো শরীর তরমুজের গাঢ় লাল রঙে রঙিন হয়ে উঠল। সে তখন গর্জন করে উঠল প্রবল বিরক্তিতে। বাঁদরটাকে ধরার জন্য লাফালাফি করতে লাগল। এই বুঝি ভেঙে ফেলে কাঠের খাঁচাটি।

শরিফ তখন কোনোক্রমে ধরে ফেলল হাসানের লেজ, জাপটে ধরল তাকে। বলল, 'খলিল তোকে ধরতে পারলে নাস্তাটা সেরে ফেলবে তখনই। চল আমরা প্রাসাদের অন্দরে যাই।'

হাসানকে নিয়ে শরিফ প্রাসাদে ঢুকতেই তাদের সামনে এসে দাঁড়াল বান্দা আহমদ। সে বলল, 'তুমি কি দেখেছ তোমার বাঁদর প্রাসাদের দেয়াল আর বেগমসাহেবার গুলবাগিচার কী অবস্থা করেছে? সুলতান দেখলে কী করবেন ভাবতে পারছ?' এ কথা বলেই আহমদ বাইরে গেল সব পরিস্কার করতে।

শরিফ তখন হাসানকে বসিয়ে দিল পাথরের মেঝেয়। মেঝে নয় তো যেন আয়না বসানো সেখানে। নিজের মুখের প্রতিচ্ছবি দেখে ভেংচি কাটল সে। আবার শুরু হল তার বাঁদরামি। এক ছুটে চলে গেল সে খাজাঞ্চিখানায়। সুদৃশ্য আখরোট কাঠে তৈরি একটা বাক্সোর ঢাকনা খুলে ফেলল সে।

'না—না হাসান—ওটা—।' শরিফের নিষেধ শুনবে কেন হাসান। দৌড়ে সেখানে যাবার আগেই বাঁদর দু-হাত দিয়ে মণিমুক্তো সব তুলে ছড়িয়ে দিতে লাগল। পারস্য থেকে আনা গালিচা তখন ভরে উঠল ছড়ানো-ছিটানো হিরে-জহরত মণিমুক্তোয়।

শরিফ খুব ভয় পেল। আব্বার রত্নভাণ্ডারের অবস্থা দেখে সে শিউরে উঠল। না জানি তার কপালে আজ কী দুঃখ লেখা আছে! সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'দোহাই হাসান, তুই আর বাঁদরামি করিস না।'

হাসান তখন বাধ্য ছেলের মতো চলে এলো সেখান থেকে। তারপরই তার চোখ গেল ঝাড়বাতির দিকে। এক লাফে একটা ঝাড়বাতির উপর উঠে বসল। আবারও শরিফ তাকে অনুরোধ করল, 'লক্ষ্মী ছেলে আমার, দুষ্টুমি করে না। ওটা ভেনিস থেকে আনা পলকা কাচে তৈরি। ভেঙে যাবে এক্ষুনি। নেমে আয়।' বলে শরিফ দু-হাত বাড়িয়ে দিল।

অমনি কী আশ্চর্য, হাসান একলাফে মেঝেয় এসে পড়ল। তার পরেই আর-এক লাফে উঠে বসল একটা বিশাল কাচের পাত্রের উপর। তার ঢাকনা খুলে স্বর্ণমুদ্রা মুঠো মুঠো ছুঁড়তে লাগল ঘরময়।



শরিফ অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেই এলোমেলো ঘরের মাঝখানে। তার এই নতুন ছোট্ট সাথির এমন আজব কাণ্ডকারখানা দেখে সে এখন কী আর করতে পারে?

এরই মাঝে হঠাৎ হাসান ছুটে চলে গেল স্নানঘরে। সবগুলো কল খুলে দিল। হুহু করে জল পড়তে লাগল অঝোরধারায়। সেখান থেকে রসুইঘরে। তামার সব বর্তন এদিক-ওদিক ফেলতে লেগেছে। বিকট শব্দে শরিফের কানে তালা লেগে গেল যেন। এতে বাঁদরটা খুব মজা পেয়েছে!

এতক্ষণ প্রাসাদে সবাই যে-যার ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। এত গোলমালে একে-একে সবার ঘুম ভেঙে গেল।

'কী হচ্ছে এসব এখানে?' সুলতান ঘুম-চোখে দাঁড়িয়েছেন এসে। বললেন, 'মাত্র ঘণ্টা দুয়েক হয়েছে তোমার জন্মদিনের উপহার পেয়েছ শরিফ! এরই মধ্যে সারা প্রাসাদ মাতিয়ে দিয়েছে তোমার বাঁদর। খবর পেয়েছি, আমার প্রিয় শার্দুলকে সে রাগিয়ে দিয়েছে, তোমার আম্মার সাধের বাগিচা নষ্ট করেছে। কত জনের কতটা সময় যাবে এসব পরিষ্কার করতে তোমার ধারণা আছে?'

আহমদ ততক্ষণে একটা জাল এনে ধরে ফেলেছে হাসান নামের বাঁদরকে।

সুলতান বললেন, 'যাও, ওটাকে বনে ছেড়ে দিয়ে এসো আহমদ। জঙ্গলই ওর আসল জায়গা!'

শরিফ একটি কথাও বলল না। সে বুঝতে পেরেছে, বাঁদর পোষা সহজ নয়। তাই আহমদ যখন বাঁদরটা নিয়ে চলে গেল তখন ওর একটুও দুঃখ হল না। বরং আব্বাজান ওকে কী বলবেন সেই ভয়ে সে যেন কুঁকড়ে গেল। আস্তে আস্তে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সরোবরের শ্বেতপাথর বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসল। জলে পা ডুবিয়ে সে রাজহাঁসদের খেলা দেখতে লাগল। হলুদ-রঙের কইমাছগুলো তার পায়ের চারদিকে ঘুরে ঘুরে সাঁতার কাটছে। ওরা জানে, এখন ওই ছেলেটা ওদের রুটির টুকরো দেবে খেতে। কিন্তু আজ আর সে-কথা মনে নেই শরিফের। সে উদাস হয়ে বসে রইল সেখানে।

এমন সময় হঠাৎ সে শুনল আব্বাজান তার নাম ধরে ডাকছেন, 'শরিফ, কোথায় তুমি? ফিরে এসো।'

শরিফ ধীরে ধীরে প্রাসাদে এল। আব্বার সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে অমাবস্যার অন্ধকার, মাথা মাটির দিকে ঝুঁকে।

আব্বাজান তাকে বকলেন না। তার কাঁধে স্নেহের হাত রেখে হেসে বললেন, 'ভয় পেয়ো না। আজ তোমার জন্মদিন। তোমাকে কিছু বলব না। আর তোমাকে একটা উপহার তো দিতেই হবে। এই উপহার ওই মর্কটটার থেকে অনেক ভালো। যাও গিয়ে দেখো, ওই কাঠের বাক্সোটায় কী আছে!'

সুলতানের শান্তস্বরে শরিফ ভয়ডর ভুলে আনন্দে লাফিয়ে দৌড়ে গেল সেই ছোট্ট কাঠের বাক্সোটার কাছে।

'একটা ছোট্ট বাঘের বাচ্চা? কী সুন্দর!' বলতে বলতে সে কোলে তুলে নিল বাচ্চাটাকে। বলল, 'ওর পায়ের নখগুলো কেমন ধারালো!'

'ওর নখগুলো আরও তীক্ষ্ণ হবে, আরো বড়ো হতে হতে ও খলিলের মতো শক্তিশালী হবে। আহম্মদ বাচ্চাটাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তোমার বন্ধু করে তুলবে, খলিল যেমন আমার বন্ধু। ও খলিলের সঙ্গে থাকবে। তুমি রোজ ওর সঙ্গে খেলা করতে পারো।' বললেন সুলতান।

শরিফ উৎসাহভরে বলল, 'আমি ওর নাম রাখব রাদ।'

সুলতান হেসে বললেন, 'বাঃ চমৎকার নাম দিয়েছ ওর। যাও আহমদের সঙ্গে, ওর নতুন বাসায়।'

খলিল রাদকে পেয়ে খুব খুশি। যেন ও খলিলের নিজের শাবক। ওর সঙ্গে কী সুন্দর খেলা করে, খুনশুটি করে। শরিফ দেখে আর আনন্দে হাততালি দেয়। বলে, 'একটা বাঁদরের চেয়ে বাঘের বাচ্চাটা জন্মদিনের অনেক ভালো উপহার।'

'ঠিকই বলেছ শাহজাদা, রাদ কখনও তরমুজ ছুঁড়ে প্রাসাদ নষ্ট করবে না, কিংবা বেগম সাহেবার সাধের বাগিচা তছনছ করবে না।' বলল আহমদ।

ছবি। অরুণ চট্টোপাধ্যায়



তারাপদ রাহা

বনের কিনারে থাকে এক রাজহংসী। সঙ্গীসাথী কেউ নেই, একা-একাই থাকে। বড়ো সুন্দর চেহারা তার, বয়সও কম। বেশ সুখেই থাকে। বনে খাবার জিনিসের অভাব নেই, পাশেই ছোটো নদী, তার জল পান করে. তাতে গা ভাসিয়ে ছোটো ছোটো মাছ ঠুকরে খায়; দিব্বি সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কেটে যায়। বাইরের জগতের কোনো খোঁজখবর সে আর রাখে না।

হলে হবে কী,—হঠাৎ একদিন সে এক স্বপ্ন দেখে বসল। স্বপ্নটা যেমনি অদ্ভুত তেমনি ভয়ংকর। দেখলে অদ্ভুত এক জীব, পেছনের দুটো পায়ের ওপর ভর দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এমন জীব সে আগে কোনোদিন আর দেখেনি। জীবটি তার সামনে এসে বললে—'বাঃ, খাসা তো তোমার পালক, দিব্বি চেহারা, এসো তুমি আমার কাছে এসো, তোমার পালকে হাত বুলিয়ে আদর করতে ইচ্ছা করছে আমার, আমি আদমের ব্যাটা মানুষ।'

এই মিষ্টি কথায় গলে গিয়ে রাজহংসী কোয়াক্ কোয়াক্ করে এগিয়ে যাচ্ছিল তার কাছে, এমন সময় স্বপ্নের মাঝেই ভীষণ বজ্রনাদ হল, তারপরেই শুনলে গম্ভীর গলায় কে তাকে বলছে, খবরদার, খবরদার, ও আদমের ব্যাটা মানুষ; ওর কাছে যেয়ো না, আজ ও মিষ্টি কথা

বলে তোমার সঙ্গে ভাব করবে, কালই খাবার জন্য ও তোমার গলায় ছুরি বসাবে। ওকে বিশ্বাস কোরো না। ও গুলতি ছুঁড়ে আকাশের পাখি মারে, জাল ফেলে নদী-সমুদ্দুরের মাছ ধরে, ওর অসাধ্যি কাজ নেই। সবচাইতে জোরালো জীবজন্তুরও ওর কাছ থেকে রেহাই নেই। সুতরাং সাবধান, সাবধান, আদমের ব্যাটা থেকে সাবধান।

স্বপ্নে এইসব শোনার পরই ঘুম ভেঙে গেল হাঁসের, ভয়ে কাঁপতে লাগল সে, নিজের জায়গা থেকে নড়তেই ভয় পায়। রাত্রির অন্ধকার কেটে গেল, দিনের আলো দেখা দিল, তবু ভয় যায় না। ভয়ে ঝোপঝাড়ের মাঝে সে গা-ঢাকা দিয়ে রইল। কিন্তু কতক্ষণ আর এমনি করে থাকা যায়, খিদে পায় যে! পেটের জ্বালা বড়ো জ্বালা। পেটের দায়ে বেরুতে হল তাকে খাবারের খোঁজে।

কিছুদূর যেতেই সামনে পড়ল এক গুহা, গুহার সামনে দাঁড়িয়ে জমকালো চেহারার এক তরুণ সিংহ। সিংহ ওকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলে, 'কে তুমি?'

—'আমি?—আমি হচ্ছি রাজহংসী, একরকম পাখি, আপনি—আপনি কে, জনাব?'

—'আমি পশুরাজ সিংহ। কিন্তু তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি বড়ো ভয় পেয়ে গেছ। ভয় নেই, এমন সুন্দর চেহারা তোমার, আমি সুলতানের বেটা হলেও তোমার কিছু ক্ষতি করব না।'

রাজহাঁস বললে, 'ভয় আমার আপনাকে দেখে নয় হুজুর।'

—'তবে?'

হাঁস তখন তার স্বপ্নবৃত্তান্ত তরুণ সিংহটিকে সব খুলে বললে। শুনে রাগে গজরাতে লাগল সিংহ, ঘনঘন লেজ আছড়াতে লাগল, 'হাঁ, হাঁ, শুনেছি। আমার বাপজানও এই কথা বলেন বটে, আদমের ব্যাটা বেঁচে থাকতে কোনো জীবজন্তুর স্বস্তিতে বসবাস করবার উপায় নেই।'

শুনে রাজহংসী আরও ভয় পেয়ে গিয়ে বললে, 'হুজুর, মিনতি করছি, আপনি তাহলে আদমের ব্যাটাটাকে মারবার ভার নিন। এত শক্তি আপনার, এত সাহস, আপনি অনায়াসে এ কাজ করতে পারবেন। ওকে মারতে পারলে আমরা একটু নিশ্চিন্তে, নিরাপদে খোদার দুনিয়া ভোগ করতে পারি।'

রাজহংসীর কথায় উৎসাহ পেয়ে সিংহ বলে উঠল, 'হাঁ, হাঁ, এ করতে হবে বই-কি! সুলতানের ব্যাটা আমি, এ আমার কর্তব্য। আমার বাপের প্রজাদের যে শত্রু, তাকে নিধন আমায় করতেই হবে। আমার কাছে কোনো কৌশলই ওর খাটবে না। এসো, এসো দেখি আমার সঙ্গে দুজনে মিলে খুঁজে দেখি—কোথায় সে আদমের ব্যাটা।'

এই বলে সিংহ রাজহংসীকে নিয়ে পথ চলতে শুরু করল। কিছুদূর চলবার পরই দেখে, পথের ধুলো উড়িয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বিকট শব্দ করতে করতে এক চতুষ্পদ তাদের সামনে দিয়ে ছুটে যায়।

—'এই, থামো!...কে তুমি, এমন জোর ছুটছই-বা কেন? কোথায় যাচ্ছ?' বলে উঠল সিংহ।

চতুষ্পদটি থেমে সিংহকে সেলাম করে বললে, 'হুজুর, আমি গাধা—ছুটছি প্রাণের দায়ে, আদমের ব্যাটার ভয়ে।'

—'আরে মলো যা!—কীসের ভয়, আদমের ব্যাটা কি মেরে ফেলবে তোমাকে?'

—'না না, মারবে কেন, মারে না কিন্তু যা করে, তা মারের চেয়েও বড়ো।'

—'কেন, কী করে সে?'

—'করে হুজুর, সে এক বিশ্রী ব্যাপার, প্রাণান্তকর ব্যাপার—চামড়া দিয়ে তৈরি জিন বলে একটা জিনিস আমার পিঠে দিয়ে চামড়ার পেটি দিয়ে আচ্ছা করে কষে বাঁধে, তারপর লোহা দিয়ে তৈরি একটা জিনিস আমার মুখের মাঝে দেয়, দু-পাশ তার চামড়া দিয়ে বাঁধে—চামড়ার পেটি। আমার পিঠের উপর চড়ে সেটা সে হাতে নেয়। এটাকে বলে লাগাম। এই লাগাম ধরে কখনও গোড়ালি লাগিয়ে, কখনও চাবুক মেরে নিজের খুশিমতো জায়গায় তাকে বয়ে নিয়ে যেতে আমায় বাধ্য করে। এমনি করে বছরের পর বছর কেটে গেলে যখন বুড়ো হয়ে তাকে নিয়ে আর ছুটতে পারিনে, তখন সে ভিস্তিওয়ালার কাছে আমায় বিক্রি করে দেয়, তার জলের বোঝা টানতে টানতেই একদিন আমার শেষদিন ঘনিয়ে আসে। আদমের ব্যাটার হাতে পড়লে আমার কী দশা হয়—শুনলেন তো হুজুর, বলুন তো এর থেকে দুঃখের জীবন কী আর হতে পারে!'

রাজহংসীটা তো গাধার কথা শুনে ভয়ে কাঁপতে লাগল, সিংহের মেজাজ গেল নতুন করে চড়ে, সে বললে, 'তা তুমি এখন কোথায় চলেছ?'

—'আদমের ব্যাটা আমায় দেখতে না পায় এমন একটা জায়গার খোঁজে চলেছি আমি।'

বলতে না বলতে দূরে পথে আবার ধুলো উড়তে দেখা গেল।

—'এই রে সেরেছে, ওই এল বুঝি আদমের ব্যাটা!' বলেই গাধা আর কোনো কথা না বলে দিল বেদম ছুট। আদমের ব্যাটা আসছে মনে করে সিংহ রাগে কেশর দুলিয়ে পাথুরে মাটিতে নিজের নখ ঘষতে লাগল। রাজহংসীটা ভয়ে একটা ঝোপের মাঝে গা ঢাকা দিল।

তার ভয় করবার কিন্তু কারণ ছিল না এবার কিছুই। ধুলো উড়িয়ে তাদের দিকে আসছিল এবার যে, সে একটা কালো ঘোড়া।—মাথার সামনের চুলগুলি তার নতুন রুপোর টাকার মতো চকচক করছে। সিংহকে সামনে দেখে সে একবার হ্রেষা রব করে থমকে দাঁড়িয়ে সেলাম করল।

সিংহ বললে, 'বাঃ, দিব্বি চেহারা তো তোমার,—খাসা। তা তুমি কে, আর এত জোরে ছুটে পালাচ্ছই-বা কেন তুমি?'

—'হুজুর, আমি ঘোড়া, পালাচ্ছি আমি আদমের ব্যাটার ভয়ে।'

—'লজ্জা করে না তোমার বলতে ? — এত সুন্দর তেজি চেহারা তোমার, এত বড়ো, এত দ্রুত ছুটতে পারো তুমি, তুমিও করছ আদমের ব্যাটার ভয়। কেন, তোমার এক পায়ের লাথিতে তাকে কাত করতে পারো না—পালাচ্ছ?

—'না পালিয়ে কী করব হুজুর, তার কৌশলের সঙ্গে আমি কিছুতেই এঁটে উঠতে পারি

না। বন থেকে ফাঁদ পেতে ধরে সে আমায় শক্ত শণের দড়ি দিয়ে বাঁধে। মাথাটা বাঁধে একটা উঁচু খুটোর সঙ্গে, এমন করে বাঁধে যে, না পারি আমি হাঁটু ভেঙে বসতে, না পারি শুতে। শুধু কী তাই, আমার পিঠের উপর জিন পেতে, মুখে লোহার টুকরোসমেত লাগাম এঁটে আমার পিঠে চড়ে তার ইচ্ছামতো আমায় ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। একটু ওড়ামোড়া করতে গেলেই লাগায় চাবুক। বুড়ো হয়ে গেলে যখন আর আমি তাকে পিঠে নিয়ে দ্রুত ছুটতে পারি না, তখন সে আমায় বিক্রি করে দেয় জাঁতাওয়ালার কাছে। এই জাঁতাকলে ঘুরতে ঘুরতেই শেষে একদিন আমি অক্কা পাই।'

শুনে রাজহংসী থরথর করে কাঁপতে লাগল, সিংহ রাগে লেজ আছড়াতে লাগল। ঠিক এই সময় পথে আর একটা ধুলোর মেঘ দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

—'এই রে, এল বুঝি আদমের ব্যাটা! আর আমি তার হাতে ধরা পড়ছি না, আগে থেকেই পালাই।' এই বলে ঘোড়া আর কোনো কথা না বলে সেখান থেকে দিলে জোর এক ছুট।

ধুলোর মেঘ কাছে এসে গেল এবার, তার মাঝ থেকে বেরুচ্ছে ক্রুদ্ধ এক গরগরানি। এ আর আদমের ব্যাটা না হয়ে যায় না ভেবে সিংহ রাগে গজরাতে গজরাতে আক্রমণের জন্য ওঁত পেতে বসল মাটিতে— বেড়ালের মতো।

কিন্তু এ কি, ধুলোর মেঘের মাঝ থেকে বেরিয়ে পড়ল এ কার মাথা? — এ যে এক তামাটে উট।

ওদের দেখতে পেয়েই উট সিংহকে বললে, 'শাহজাদা, সেলাম।' রাজহংসীকে বললে, 'বিবিসাব, সেলাম।'

উত্তরে দুইজনেই বলে উঠল, 'সেলাম, সেলাম।'

সিংহের কিন্তু এবার উটের উপরই রাগ হল, 'বলি বেয়াকুব তুমি এমন ছুটছ কেন, তুমিও আদমের ব্যাটার ভয়ে পালাচ্ছ না কি?'

—'হুজুর ঠিকই ধরেছেন। না পালিয়ে উপায় নেই। আদমের ব্যাটার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে সব জীবেরই এমনি করে পালানো উচিত।'

—'কী বলছ তুমি! এত বড়ো দেখতে, এত বল তোমার শরীরে, তুমিও পেরে উঠবে না তার সঙ্গে? যত সব বাজে কথা।'

—'না হুজুর, বাজে কথা নয়, এমন ধূর্ত সে যে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া কেউ তাকে ঘায়েল করতে পারে না। ও আমার নাক ছ্যাঁদা করে তার মাঝে ছাগলের লোমের এক দড়ি পরিয়ে দেয়, মাথায় আর গলায় বাঁধে এক চামড়ার পেটি। এই করে আমায় এমনি কাবু করে দেয় যে, অতি ছোটো ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত এত বড়ো আমাকে তাদের যেখানে খুশি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। শুধু কি তাই, আমার পিঠের উপর ভারী ভারী বোঝা চাপিয়ে ওই আদমের ব্যাটারা আমায় আগুন ঢালা মরুভূমির ভিতর দিয়ে নিজেদের খুশিমতো জায়গায় নিয়ে যায়। এমনি করে বোঝা বয়ে বয়ে যখন আমি বুড়ো হয়ে যাই, যখন আমার মাল টানার সাধ্য থাকে

না, তখন দেয় আমায় কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে। কসাই আমায় জবাই করে চামড়াটা বিক্রি করে চামারের কাছে, আর মাংসটা আমার রান্না হয়ে যায় ওই আদমের ব্যাটাদের পেটে। সুতরাং আদমের বেটার কাছ থেকে না-পালিয়ে কী করব আমি বলুন।'

সিংহ বললে, 'কখন পালিয়েছ তুমি তার কাছ থেকে?'

—'কাল সন্ধ্যাবেলা। হুজুর, তারপর সারারাত ছুটেছি, দিনেরও এত বেলা ছুটেছি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি, কিন্তু আচ্ছামতো একটা লুকানোর জায়গা না-পাওয়া পর্যন্ত আমার এমনি করে ছুটতে হবে। আমি জানি সে আমার পিছু ধাওয়া করেছে।'

—'না. না, আর ছুটতে হবে না তোমায়। তুমি দাঁড়াও এখানে, আসুক আগে সে, দেখ



না আমি কেমন তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করি। তাকে মেরে ফেললে তোমার আর কোনো ভয় থাকবে না তো?'

উট বললে, 'না হুজুর, না, মাফ করবেন, আমি দাঁড়াতে সাহস পাই না। কিছু মনে করবেন না আপনি, আপনি আমাদের সুলতানের ব্যাটা হয়েও তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন না।'

এই সময় আর একটা ধুলোর মেঘ দেখা দিল পথে। ওই-ওই যে সে আসছে বলে চমকে উঠে উট সিংহের সঙ্গে আর কথা না বলে যেদিকে ঘন গাছপালা আছে, সেইদিকে দিলে জবর এক ছুট।

সিংহও বেড়ালের মতো ওঁত পেতে বসলে, শত্রু এসে পড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তার গায়ের উপর। কিন্তু এবারের ধুলোর মেঘ তো ছুটে আসছে না, মেঘটা তো বড়োও নয়।

মেঘটা সিংহের কাছাকাছি এসে পড়লে তার মাঝ থেকে বেরিয়ে পড়ল অদ্ভুত এক জীব, এমন জীব তাদের আর কোনোদিন চোখে পড়েনি। দেখতে অনেকটা বুড়ো বানরের মতো, চোখমুখ কেমন কোঁচকানো, পিছনের দু-টো পায়ের ওপর ভর দিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলেছে। এক কাঁধে তার থলেভরতি কী সব যন্ত্রপাতি, আর এক কাঁধে এক বোঝা কাঠ।

সিংহ তাকে বললে, 'সেলাম, খুদে ভাই, কে তুমি, এ দিকেই-বা তুমি কী দরকারে এসেছ?'

বানরের মতো জীবটা সিংহকে সেলাম করে বললে, 'আল্লা আপনার ভালো করুন হুজুর, আমি ছুতোর মিস্ত্রী।' বলতেই চোখে জল এসে গেল তার, তারপর চোখের জল ফেলতে ফেলতেই বললে, 'আমি আমার শত্রু আদমের ব্যাটার ভয়ে পালাচ্ছি।' বলেই সে তখন হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। তাতে বড্ড বেশি বোকা বোকা দেখাতে লাগল তাকে।

দেখে সিংহ বললে, 'তা তোমার সবাইকেই ভয় করা উচিত। যা তুমি দুর্বল। ... সে তো হল, কিন্তু ওই কাঠ আর কী সব নিয়ে তুমি চলেছ কোথায়?'

—'আর বলবেন না, হুজুর, আপনার বাপ সুলতানের যে উজির চিতাবাঘ, তিনি তলব করে পাঠিয়েছেন আমায় তাঁর শত্রু আদমের ব্যাটার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে একটু মজবুত দুর্গ তৈরি করে দিতে হবে তাঁকে। তাই উজিরসাহেবের ওখানেই চলেছি আমি।'

—'কী, উজিরের জন্য দুর্গ?—আমি শাহজাদা, আমার এখনও দুর্গ হল না, উজির চিতার জন্য দুর্গ! ও সব চলবে না, ওই কাঠ দিয়ে আগে তুমি আমার জন্যে দুর্গ করে দাও,—এক্ষুনি,—এইখানে।'

—'হুজুর, আমার সাহসে কুলায় না, উজিরসাহেব শুনতে পেলে আমায় আর আস্ত রাখবেন না।'

—'কী, এত বড়ো সাহস তোমার, আমার কথার ওপর কথা!' বলে সিংহ খুব আস্তেই ছুতোরকে দিলে এক থাবা। থাবাটা আস্তে হলে হবে কী, তাতেই ছুতোর ধুলোর মাঝে চিতপাত। ছুতোরকে তখন এমন বোকার মতো দেখাতে লাগল যে সিংহ না হেসে আর পারল না, রাজহংসীও হেসে উঠল।

ছুতোরের ভীষণ রাগ হলেও সে মুখে হাসির ভাব এনে, উঠে দাঁড়িয়ে পায়ের ধুলো ঝাড়তে লাগল।

সিংহ বললে, 'কী, আমার দুর্গ এখন তৈরি হচ্ছে তো?'

—'জি, হুজুর, এখনই আরম্ভ করছি আমি।' বলে সে তখনই তার করাত, হাতুড়ি, বাটালি, পেরেক বের করে কাঠের ছোটো একটা ঘরের মতো জিনিস তৈরি করতে শুরু করে দিলে। জানালার নাম করে কয়েকটা ছেঁদা এবং ছোট্ট একটা দরজাও করা হল তাতে। ঘরটা তৈরি হয়ে গেলে ছুতোর সিংহের দিকে ফিরে মাথা নিচু করে, সেলাম জানালে—অর্থাৎ হয়ে গেল।

সিংহের যেন তত পছন্দ হল না এটা, ওটার চারিদিকে একবার ঘুরে এসে বললে, 'বড্ড ছোটো!'

—'কিন্তু খুবই মজবুত।' উত্তর দিলে ছুতোর, 'হুজুর একবার দুর্গটার মাঝে ঢুকে দেখবেন

কি,—আপনার ঠিক হল কি না?'—বলেই সে তার হাতুড়িটা আর বড়ো বড়ো গেজেল পেরেকে হাত দিল।

সিংহ তখন ওর ছোট্ট দরজা দিয়ে গুড়িসুড়ি মেরে হিঁচড়ে কোনোরকমে তার ভিতরে ঢুকল, লেজটা আর না ঢোকাতে ছুতোরই সেটা মুচড়ে ঢুকিয়ে দিলে। তারপরই অতি দ্রুত ডজনখানেক পেরেক মেরে দরজার পাল্লাটা দিলে আচ্ছা করে এঁটে।

ছোট্ট খাঁচার মাছে আটক পড়ে গর্জে উঠল সিংহ, 'এই বেতমিজ, শিগগির আমায় বের করে দে, নইলে ভালো হবে না তোর, বলছি।'

ছুতোর তখন আনন্দে নেচে নেচে বলতে লাগল, 'সেটি আর হচ্ছে না, জাদু। এবার তামাশা করো, থাপ্পড় মারো আমায়, মারো। —আমি আদমের ব্যাটা মানুষ, বুঝলে ধন, এবার ঠেলা বোঝ। —রসো, আরও বোঝাচ্ছি তোমায়'—বলে মস্ত লম্বা একটা বাটালি বের করে খাঁচার ছেঁদা দিয়ে সিংহের গায়ে বসিয়ে দিলে মোক্ষম জোরে কয়েক ঘা।

ব্যাস্—হয়ে গেল সিংহের।

ছুতোর এরপর তার যন্ত্রপাতির থলে কাঁধে নিয়ে গুন গুন করে গান করতে করতে রওনা দিলে, আর রাজহংসী কাণ্ড দেখে দিলে জবর এক ছুট—এক ছুটে সে তার সাবেক নিরাপদ বাসায়!

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

প্যালেস্টাইন



শিকারি ও আবদাল্লা

রত্নেশ্বর হাজরা

বহুদিন আগের কথা। একটা ছোট্ট শহরের কাছে বাস করত এক ব্যাধ। সে শুধু শিকার করে বেড়াত বলে তার নামটাই হয়ে গিয়েছিল শিকারি। একদিন সে শিকাবে বেরিয়ে বনের মধ্যে দেখতে পেল একটা হরিণ। কিন্তু হরিণটার দিকে শিকারি তার তিরের নিশানা করতেই পলকের মধ্যে হরিণটা উধাও হয়ে গেল। খুঁজতে খুঁজতে শিকারি সেই হরিণটাকে দেখতে পেল অন্য এক জায়গায়। শিকারি আবার তাক করল তার তির। এবার হরিণটা নিমেষের মধ্যে হয়ে গেল একজন মানুষ। শিকারি তো হতভম্ব। ছিল হরিণ, হয়ে গেল একজন লোক! সেই লোকটি তখন শিকারির কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কেন তুমি সবসময় হরিণ আর পাখপাখালি শিকার করে বেড়াও? জানো না যে ওদেরও একজন মালিক আছেন?'

শিকারি বলল, 'দ্যাখো, আমারও ঘরসংসার আছে। সংসারে পরিজন আছে। তাদের ভরণপোষণের ভার তো আমার ওপরেই। শিকার ছাড়া আর কী-ই বা করব, বলো।'

লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পরিবার কত বড়ো, লোক কতজন?'

—'দুটি ছেলে, একটি মেয়ে, আমার স্ত্রী আর আমি—এই পাঁচজন। শিকার করেই

আমাদের খাওয়াপরা চালাতে হয়।' বলল শিকারি।

লোকটি বলল, 'ঠিক আছে। আমি যদি তোমাকে কিছু অর্থ দিই তাহলে কি তুমি এই শিকার করা বন্ধ করবে?'

—'অবশ্যই বন্ধ করব।' জবাব দিল শিকারি। 'যতক্ষণ আমার কাছে সেই অর্থ থাকবে ততক্ষণ আমি আর শিকার করব না।'

লোকটি তক্ষুনি তার আলখাল্লার পকেট থেকে পঞ্চাশটি দিনার বের করে শিকারিকে দিল এবং জিজ্ঞেস করল, 'চলে যাবার আগে তোমার নামটা একটু বলবে কি?'

—'আমার নাম শিকারি। তোমার নাম?'

লোকটি উত্তর দিল, 'আমাকে তুমি আবদাল্লা বলে ডাকতে পারো। তোমার যেমন, তেমনি আমারও পরিবারপরিজন আছে।'

বাড়ি ফিরে এল শিকারি। তিরধনুক ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে টাঙিয়ে রাখল দেয়ালে। স্ত্রীকে বলল যে, সে আর শিকারে যাবে না। আল্লা তাকে আয়ের একটা উপায় ঠিক করে দিয়েছেন।

কিন্তু ফুরিয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই পুরোপুরি ফুরিয়ে গেল সেই দিনার ক-টি। বাধ্য হয়ে তিরধনুক নিয়ে সে আবার বেরিয়ে পড়ল শিকারে। চলে এল তার চেনা জায়গায় এবং দেখতে পেল সেই আগেকার হরিণটাই সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। শিকারি তার তিরের নিশানা করতেই হরিণটা হয়ে গেল আবদাল্লা।

আবদাল্লা জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল না?'

শিকারি বলল, 'তুমি যে দিনার ক-টা দিয়েছিলে, সে তো কবেই শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা প্রায় না-খেয়েই দিন কাটাচ্ছি। অনাহারেই মরতে বসেছি বলতে পারো।'

—'ওই পাথরটা দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল আবদাল্লা। 'আমাকে যখনই তোমার দরকার হবে. ওই পাথরটার কাছে এসে 'আবদাল্লা' 'আবদাল্লা' বলে ডাকলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব।'এই বলে আবদাল্লা শিকারিকে আরও পঞ্চাশটি দিনার দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শিকারি তো মহাখুশি। বাড়ি ফিরে ওই দিনারগুলো স্ত্রীকে দিতেই সে জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো তুমি কোথায় পেয়েছ?'

শিকারি সব কথা জানিয়ে স্ত্রীকে বলল যে, সে এমন একজন বন্ধুর দেখা পেয়েছে যে সবসময় তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। শিকারিকে শুধু একবার সেই বিশেষ পাথরটার কাছে গিয়ে তার নাম ধরে ডাকতে হবে।

—'তুমি একটা হাড়কেপ্পন লোক,' বলল তার স্ত্রী, 'তোমার কি উচিত ছিল না তাকে আমাদের বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসা? সবাই একসঙ্গে খানাপিনা করতে পারতাম। আমাদের মধ্যে একটা দারুণ দোস্তি তৈরি হত।'

স্ত্রীর কথা শুনে শিকারি চলে এল সেই পাথরটার কাছে। ডাকল, 'আবদাল্লা, ও আবদাল্লা।'

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল আবদাল্লা। বেরিয়ে আসতেই শিকারি তাকে নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন না-করার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিল। কিন্তু আবদাল্লা জেদ করতে লাগল যে, শিকারিকেই পরিবার নিয়ে তার বাড়িতে আগে আসতে হবে। অবশেষে ঠিক হল যে, পরদিন সকালে শিকারি তার পরিবার নিয়ে আবদাল্লার বাড়িতে আসবে।

পরদিন শিকারি ও তার স্ত্রী উপহার দেবার জন্য কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে চলে এল সেই পাথরটার কাছে। এসে দেখল, আবদাল্লা ও তার



পরিবারের সবাই শিকারিদের জন্য সেখানেই অপেক্ষা করে আছে। আবদাল্লারা শিকারিদের স্বাগত জানাল। তারা একে অপরের সঙ্গে হাতে-হাত মেলাল। এভাবে আপ্যায়নের পর নিমেষের মধ্যে সবাই যেন চলে এল অন্য একটা দুনিয়ায়।

আবদাল্লারা আয়োজন করেছিল বিশাল এক ভূরিভোজের। নিমন্ত্রিত ছিল আবদাল্লার প্রতিবেশীরাও। শিকারিদের জন্য তারাও এনেছিল প্রচুর উপহার এবং দিনার। এভাবে কিছুক্ষণ মহানন্দে কাটাবার পর শিকারিরা উপহারে পাওয়া সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। তাদের হাতে এখন প্রচুর ধনদৌলত। তা থেকে কিছু খরচ করে একটা সুন্দর বাড়ি বানাল এবং মহাসুখে বাস করতে লাগল।

এভাবে কিছুদিন কেটে যাবার পর একদিন শিকারি এল তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

আবদাল্লা দেখা দিয়ে শিকারির সঙ্গে হাতে হাত মেলাল আর পলকের মধ্যে চলে এল অন্য এক জায়গায়। আবদাল্লা এবার শিকারিকে দিল এক হাজার দিনার।

শিকারি বাড়ি ফিরলে তার স্ত্রী বলল, 'দ্যাখো, আমাদের হাতে এখন প্রচুর অর্থ। আমরা তো এখন বড়ো ছেলেটার শাদি দিতেই পারি তাই না?'

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। এক সুন্দরী কনেও জোগাড় হয়ে গেল আর বিয়ের জন্য একটা দিনও ঠিক করে ফেলল তারা।

বিয়ের দিন আবদাল্লা আর তার পরিবারকে নেমন্তন্ন করল শিকারিরা।

আবদাল্লা শিকারিকে বলল, 'দোস্ত, তুমি আমার ও আরও কুড়িজন লোকের জন্য আলাদা একটা ঘর দেবে, আর দেখবে অন্য কেউ যেন সে-ঘরে না-আসতে পারে।'

বিয়ের দিন শহরের সব লোক নিমন্ত্রিত হল। আবদাল্লা যা বলেছিল শিকারি তা-ও পালন করল। নিমন্ত্রিত লোকেরা দেখল যে, থালাভরতি খাবারদাবার নিয়ে শিকারি সেই বিশেষ ঘরটায় ঢুকছে আর কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে আসছে একেবারে খালি থালাগুলো নিয়ে অথচ ঘরে কোনো লোকজন নেই—ঘর পুরো ফাঁকা।

নিমন্ত্রিতেরা সবাই চলে গেলে আবদাল্লা শিকারিকে জিজ্ঞেস করল, 'দোস্ত, আমরা কি এখন দুলহনকে উপহারগুলো দিতে যেতে পারি।'

তারপর তারা একে-একে নতুন বউকে উপহারগুলো দিয়ে এল। নতুন বউ তো নানা ধরনের হিরেমুক্তোর গয়না পেয়ে দারুণ খুশি। চলে যাবার সময় আবদাল্লা শিকারিদের এক সপ্তাহের জন্য তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে গেল।

এদিকে নতুন বউয়ের গয়নার বাক্সের খোঁজ পেয়ে গেল শহরের একদল ডাকাত। শিকারিরা যখন আবদাল্লার বাড়িতে তখন সে ডাকাতেরা শিকারিদের ঘর থেকে সব গয়নাগুলো লুট করে নিয়ে গেল। শিকারিরা বাড়ি ফিরে দেখল যে, গয়নার বাক্সো ফাঁকা। সব লুট হয়ে গেছে।

কী আর করে শিকারি! আবদাল্লার কাছে ছাড়া সে আর কার কাছেই বা যাবে! কার কাছেই বা চাইতে পারে সাহায্য। তাই সে চলে গেল আবদাল্লার কাছে। তাকে জানাল তাদের দুর্ভাগ্যের কথা।

আবদাল্লা শিকারিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'যাও দোস্ত, বাড়ি ফিরে যাও। গিয়ে গয়নার বাক্সোটা আবার খুলে দ্যাখো।'

বাড়ি ফিরে গয়নার বাক্সোটা খুলে ফেলল শিকারি। কিন্তু এ কী! যতটা গয়না বাক্সে ছিল, এবারে তার দ্বিগুণ হিরেজহরতের গয়নায় বাক্সোটা যে ভরতি!

আবদাল্লা একদিন শিকারিকে বলল, 'ভাইসাব, এরপর যখনই তোমরা আমাদের বাড়িতে আসবে, তখন আমরাই তোমাদের ঘরবাড়ি রক্ষা করব।'

ছবি। শঙ্কর বসাক



চন্দন নাথ

এক ছিল মস্ত সওদাগর। সারা আরব দুনিয়া জুড়ে ছড়ানো ছিল তাঁর ব্যাবসাদারির পাট। এত বড়ো ব্যাবসা তো আর একলাটি দেখভাল করা যায় না, তাই তাঁর ছিল অনেক অনেক লোকলশকর। তারাই সামলাত সেই সওদাগরের রাজত্ব। এই এত এত লোকলশকরের মধ্যে একটি ছেলে ছিল সব্বার চেয়ে আলাদা। দেখতে সে ছিল যেমনটি সুন্দর, তেমনই সুন্দর ছিল তার স্বভাব। ভারী শান্ত, ভারী বিশ্বস্ত। আর বুদ্ধিতে সে ছিল সব্বার সেরা। এমন ভালো কাজের ছেলে পেলে সওদাগর যে তাকেই ভরসা করবে তাতে আর সন্দেহ কী! এত বিশ্বাসী তো আর সবাই হয় না। সওদাগর তাঁর অনেক কাজই ছেলেটির ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতেন। আর তাঁর বিদেশপাড়ি দেওয়ার সময় সমস্ত ব্যাবসাবাণিজ্য দেখাশোনার ভার থাকত ছেলেটির ওপরেই। কিন্তু এমন ভালো ছেলেটির নামটিই তো বলা হয়নি। নাম ছিল তার জারিফ-ই-টল। ছোট্ট করে জারিফ। এত বড়ো ব্যাবসাবাণিজ্যের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলে কী হবে, জারিফ নিজে কিন্তু ছিল খুবই গরিব। কাজ করে যেটুকু মজুরি পেত তাই দিয়ে কষ্টেই দিন কাটত তার।

থাক কষ্ট, তবু বেশ কাটছিল দিন। হঠাৎই একদিন উলটে-পালটে গেল সব। সওদাগরের

মেয়ে তার আব্বার খোঁজে হাজির হল দোকানঘরে। কে যেন এক মান্যিগণ্যি মানুষ তার আব্বার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বলে লোক মারফত খবর পাঠিয়েছেন। খুব জরুরি দরকার। মেয়েটি এসেছে আব্বার কাছে সে খবরটাই পৌঁছে দিতে। দোকানে তো তখন সওদাগর ছিল না, ছিল জারিফ। এক খরিদ্দারকে জিনিসপত্র বুঝিয়ে দিচ্ছিল সে। মেয়েটি সেলাম জানিয়ে তাকেই জানাল খবরটা। জানাল কেন সে ছুটে এসেছে। কিন্তু জারিফ? ঘোর যেন তার কাটতেই চায় না। এ কাকে সে দেখছে সামনে! কোনো গুলবাগিচার ফুল বুঝি। নাকি এক হুরি নেমে এসেছে মাটিতে। গভীর কালো চোখদুটি তার। লম্বা কালো একরাশ ঢেউখেলানো চুলের ঢাল, মাঝে ঢলঢল করছে মিষ্টি মুখখানি। আঙুরের মতো মসৃণ দুটি গালে ছড়িয়ে রয়েছে লজ্জার রাঙা আভা।

সেই অবাককরা সৌন্দর্য দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে জারিফ শেষে বলল, 'নিশ্চয়ই। তোমার আব্বা এলেই তাঁকে আমি খবরটা দিয়ে দেব। চিন্তা কোরো না।'

জারিফের কথাটুকু শুনেই মেয়েটি পা বাড়াল ফিরে যাওয়ার জন্য। জারিফের খুব ইচ্ছে করছিল, এমন সুন্দর মেয়েটির নামটুকু জানতে। কিন্তু সে যে তার বাবার কর্মচারীমাত্র। মনিবের মেয়েকে নাম জিজ্ঞেস করা উচিত হবে? সেটা ভেবে উঠতে পারল না সে, তাই জানাও হল না নামটা।

কী যে হয়ে গেল জারিফের। উলটে-পালটে গেল সবকিছু। এই দিনটার পর থেকে সে না-পারে ঘুমাতে, না-পারে ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করতে। সকাল-দুপুর-রাত্রি—সারাক্ষণ তার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায় সেই মিষ্টি মুখটা। একসময় অবস্থা এমনই হল যে জারিফ যেদিকে তাকায় সেদিকেই যেন দেখতে পায় একরাশ কালো চুলের ঢেউয়ের মাঝে মিষ্টি সেই মুখখানি। সেই ভ্রমরের মতো চোখ যেন চেয়ে থাকে তার দিকে। অস্থির হয়ে উঠল জারিফ, যেমন করে হোক তাকে জানতেই হবে মেয়েটির কথা—তার সব কথা।

একদিন সুযোগ মিলল। মনিবের বাড়িতে নতুন একটা জিনিসের নমুনা আনার জন্য যেতে হল জারিফকে। সওদাগর জারিফকে দেখে এগিয়ে গেলেন, 'আরে, এসো এসো' বলে অভ্যর্থনা জানালেন প্রিয় কর্মচারীটিকে। আর তারপরই মেয়েকে ডেকে বললেন, 'মা অটাবা, একটু চা করে আনো তো মা, জারিফের জন্য।'

অটাবা! অটাবা! —এই নামটুকু জানার জন্যই না কত আকুতি তার প্রাণে। কী সুন্দর নামটা! পাখির গাওয়া গানের সুর যেন বেজে উঠছিল কোথায়!

ঠিক এমন সময় কে একজন এল সওদাগরের সঙ্গে দেখা করতে। 'এক্ষুনি আসছি আমি' বলে সওদাগর এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। মেয়েটি তখন চা নিয়ে এসেছে। মেয়েটি, মানে অটাবা। জারিফ তাকে বলল, 'ভারী সুন্দর নাম তোমার। ভারী মিষ্টি।'

বড়ো লাজুক অটাবা। চোখ তুলে চাইতেই পারছিল না সে। রাঙা হয়ে উঠল তার দুটি গাল।

জারিফ বলল, 'ভুল বুঝো না আমাকে। আমি তোমার আব্বার কর্মচারী আর....'

তার কথা শেষ হওয়ার আগে অটাবা বলল, 'আমি জানি তোমার কথা। বাবার কাছে অনেক শুনেছি।'



আঃ কী সুন্দর গলা অটাবার। যেন মধু ঝরে পড়ল।

'তুমি জানো আমার কথা!' জারিফের দুচোখ ঝলমল করে উঠল আনন্দে।

অটাবা বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে। জারিফ আগলে দাঁড়াল তাকে। বলল, 'খুব ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে কথা বলি। কাল সকালে নদীর ধারে একটিবার আসতে পারবে?'

'না-না, তা কী করে হয়!' আঁতকে উঠে মুখ তোলে অটাবা, 'তুমি ভুলে যেয়ো না তোমার পরিচয়। নিজের অধিকারের সীমা পার হলে তুমি বিপদে পড়বে, জারিফ। সেটা খেয়াল রাখো।'

সেদিন রাত্রিটা বড্ড বড়ো মনে হল জারিফের। রাতটা যেন আর কাটতেই চায় না। মনজুড়ে তার ছটফটানি। একটাই শুধু ভাবনা, আবার কেমন করে সে দেখা পাবে অটাবার, কোন্ পথে?

পরদিন সকালে নিজেকেই আর ধরে রাখতে পারল না জারিফ। ঘুম ভাঙতে-না-ভাঙতেই ছুটল দোকানে। অপেক্ষা করতে লাগল সওদাগরের জন্য। মনের মধ্যে একটাই কথা ঘুরপাক খাচ্ছে তার। সওদাগরকে বলতেই হবে সে-কথা। আজই বলতে হবে।

সওদাগর আসতে-না-আসতে জারিফ সটান হাজির হল তাঁর সামনে। দাঁড়াল সোজা হয়ে। মাথা তুলেই। তারপর কোনোরকম ভণিতা না-করে বলেই ফেলল কথাটা, 'হুজুর, আমি আপনার মেয়েকে শাদি করতে চাই।'

শুনে সওদাগরের তো চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। ঘোর কাটতে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মানে! কী বলতে চাও তুমি! এ কখনও হতে পারে? জানো, কত যত্নে আমি বড়ো করেছি অটাবাকে। জানো, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ওর ব্যবহারের জন্য কত কত দামি জিনিস ওকে এনে দিই আমি। পারবে তুমি সেসব এনে দিতে? ক্ষমতা আছে তোমার?'

জারিফ সামান্য একজন কর্মচারী। গরিব সে। সত্যিই তো দামি জিনিসপত্র কেনার সামর্থ্য কোথায় তার। কিন্তু এখন সে দমবার পাত্র নয়। গলায় জোর এনে সে জবাব দিল শান্তভাবে, 'হ্যাঁ, আমি পারব। আপনি পরীক্ষা করে দেখুন। অটাবার জন্য আমি সব কাজ করতে পারব।'

সওদাগর তাকে বোঝানোর নানান চেষ্টা করল। কিন্তু জারিফ নাছোড়বান্দা। সে হার মানবে না কিছুতেই। অনেক তর্কবিতর্কেও সে পিছু হটছে না দেখে সওদাগর বললেন, 'বেশ তো পারবে তুমি দেশের সেরা আঙুরের থোকা এনে দিতে? যদি পারো তাহলে মানতেই হবে ক্ষমতা আছে তোমার। আর তাহলে তো, ভাবতেই হবে তোমার কথা।'

হাসি ফুটল জারিফের ঠোঁটে। বলল, 'বেশ, রাজি আমি।'

তর যেন আর সইছে না তার। তক্ষুনি তক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে পারলেই হয়। কিন্তু এমন খুশির কথাটা অটাবাকে না-বলে কি থাকা যায়!

ছুটল সে অটাবার কাছে। অটাবাকে দেখতে পেয়ে গড়গড় করে বলে ফেলল সব কথা। মিষ্টি মেয়ে অটাবা। তার বড়ো ভালো লেগেছে জারিফকে। কিন্তু কীই-বা করতে পারে সে ভরসা দেওয়া ছাড়া। লাজুক মেয়েটি লজ্জাজড়ানো গলায় বলল, 'আমি জানি জারিফ তুমি পারবে। তুমি পারবেই। আমি অপেক্ষায় থাকব তোমার।'

জারিফ এখন দারুণ খুশি। নিজের ওপর দারুণ ভরসা তার। অটাবা যে ভরসা দিয়েছে

তাকে। অটাবাকে সে বলল, 'দেখো পৃথিবীর সেরা আঙুরের থোকা আমি এনে দেব তোমার হাতে। যেমন করে পারি আনবই।'

বেরিয়ে পড়ল জারিফ। সবসেরা আঙুর পাওয়া যায় খলিল শহরে। সে অনেক দূরের পথ। অনেক কষ্টের পথ। হোক তা, জারিফ অল্প কয়েকটা পয়সা সঙ্গে নিয়ে পাড়ি দিল দূরের পথে। কত যে কষ্ট তাকে পোহাতে হল সে আর বলার নয়। পেরোতে হল কত বাধা, কত বিপদ। তারপর শেষপর্যন্ত সত্যি সত্যিই সে পৌঁছোল খলিল শহরে। যেটুকু সম্বল তার ছিল সেইসব দিয়ে সে কিনল সেই আঙুর। আঙুর তো নয় যেন থোকায় গাঁথা চুনি-মণিমাণিক্য। চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলেই। আহা। খেতে না-জানি কত সুন্দর।

নিজের তার খাওয়া জুটছে না। জুটছে না গলার তৃষ্ণা মেটানোর জন্য একচুমুক জলও। তবু কত যত্নে সেই আঙুরের থোকা আগলে সে ফিরে এল তার নিজের শহরে। ছুটল তার মনিবের বাড়িতে। সওদাগরের কাছে—অটাবার আব্বার কাছে। কিন্তু খুশি কি হল অটাবার আব্বা?

জারিফকে দেখে চমকে উঠলেন তিনি। চমকে গেলেন আরও জারিফের হাতে অমন মণিমাণিক্যের মতো একথোকা আঙুর দেখে। চোখকে যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁর। এমনটা তো চাননি তিনি মোটেই। ভেবেছিলেন এত লম্বা পথের ধকল পেরিয়ে ঘরেই ফিরতে পারবে না ছেলেটা। কী আশ্চর্য। ছেলেটা ফিরেছে আর আঙুর নিয়েই ফিরেছে।

ঢোঁক গিলে সওদাগর বললেন, 'শাবাশ বেটা। খুব খুশি হলাম আমি। কিন্তু বাহাদুর ছেলে, আরও একটু পরীক্ষা যে দিতে হবে তোমাকে, —আমার মেয়ে জাফা থেকে আনা কমলালেবু ছাড়া অন্য লেবু মুখে তোলে না। পারবে তুমি জাফা থেকে সেরা কমলালেবু এনে দিতে। যদি পারো....'

জারিফ বুঝল তার মনিবের বাকি কথাগুলো। কিন্তু জাফা? সে তো অনেক দূরের পথ অনেক, অ-নে-ক দূরের। কিন্তু হার মানলে তো অটাবাকে পাওয়া হবে না তার। সুতরাং মনিবের চোখে চোখ রেখে সে বলল, 'পারব হুজুর, পারব আমি।'

হ্যাঁ, পারল জারিফ। বাধাবিপত্তি সব জয় করে সে ঠিক নিয়ে এল জাফা থেকে পৃথিবীর সেরা কমলালেবু। ভোরবেলাকার সূর্যের মতো রং সে লেবুর। চোখ জুড়িয়ে যায় তার রূপে। প্রাণ জুড়িয়ে যায় তার গন্ধে। সওদাগরের দুচোখের পাতা যেন পড়ে না সেই কমলালেবু দেখে। লেবু তো নয়, শিল্পীর শিল্পকর্ম।

কিন্তু সওদাগর কি সন্তুষ্ট হলেন? মোটেই না। তিনি যে মনে মনে চান না আদরের মেয়েকে জারিফের হাতে তুলে দিতে। তাই নানা ছুতোয় জারিফকে পাঠাতে লাগলেন এখানে-সেখানে। জারিফ তাঁর হুকুম তালিম করতে লাগল মুখ বুজে। ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে সারা প্যালেস্তাইন দেশটাই ঘোরা হয়ে গেল তার। কখনও হেঁটে, কখনও ঘোড়ায়, কখনও গাড়িতে কত কত পথ পাড়ি দিল সে। কত কত লোকের সঙ্গে আলাপ হল তার। কতরকমের লোক তারা। বেচারি জারিফ সুযোগ পেলেই মনের কষ্ট ভোলার জন্য তাদের

কাছে গল্প করে। গান করে। সেই গানের কথায়, গল্পের কাহিনিতে মিশে থাকে অটাবার জন্যে তার অনেক অনেক ভালোবাসার কথা। তার গানের সুর কেঁদে কেঁদে খুঁজে বেড়ায় বুঝি অটাবাকে। সেই দুঃখের কাহিনি শুনে, দুঃখের গান শুনে চোখের জল ফেলে অচিনদেশের মানুষগুলোও। জারিফ একদিন বিদায় নিয়ে চলে যায় আরও আরও দূরে। কিন্তু মানুষগুলো ভুলতে পারে না জারিফের কথা অটাবার কথা। তাদের ভালোবাসার কাহিনির কথা। সারা প্যালেস্তাইনজুড়ে ছড়িয়ে গেল জারিফ আর অটাবার কথা। তাদের কথা গানের সুরে সুরে ফিরতে লাগল মানুষের মুখেমুখে।

এমনি করে আরও কতদিন জারিফকে ঘুরতে হত কে জানে! কিন্তু চিরটাকালই তো আর দুঃখের হয় না। একসময় এল শুভ দিন জারিফের জীবনেও।

সেবারেও মনিবের হুকুম তামিল করতে সে গিয়েছিল মিশরদেশে। জীর্ণবেশে, শীর্ণশরীরে সে খুঁজছিল মালিকের হুকুমমতো সেরা জিনিস। মালিকের জন্যে কী আর। অটাবা...অটাবার জন্যে। খুঁজছে তো খুঁজছেই! খুঁজছে তো খুঁজছেই। শেষটায় হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল এক পুরোনো বন্ধুর কথা। যেমন-তেমন মানুষ নয় সে। পুরোনো সেই বন্ধু এখন মিশরের বাদশাহের প্রতিনিধি—মুকতার। জারিফ খোঁজ করতে করতে পৌঁছোল তার কাছে। খুলে বলল তার সব কথা। বলল কেন সে এসেছে এত পথ পাড়ি দিয়ে সেই কথা। অটাবার কথা। তাদের ভালোবাসার কথা।

এমন দুঃখের কথা বলে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হল জারিফ। কোথায় তার দুঃখে বন্ধুও দুঃখ পাবে, তা নয়। মিটিমিটি হাসছে সে।

জারিফ বলল, 'এ কী দোস্ত। হাসছ তুমি? এতটুকু দুঃখ নেই তোমার?'

বন্ধু হেসে বলল, 'দুঃখের দিন তো এবার শেষ হল, বন্ধু। কেন যে তোমার সঙ্গে আগে আমার যোগাযোগ হল না, তাহলে এত কষ্ট তোমাকে করতেই হত না।'

অস্থির হল জারিফ, 'কী বলছ তুমি। আমি তো মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝছি না। তুমি আমার জন্য কী করতে পারতে?'

মুকতার হাসল আবারও। বলল, 'যে অটাবার জন্য এমন পাগল তুমি, তার আব্বা আমার দোস্ত। আমার ভীষণ প্রিয় বন্ধু। কাজেই....'

দুচোখে খুশির ঝিলিক খেলে গেল জারিফের, 'কী বলছ তুমি বন্ধু। তাহলে এতদিনে আমায় স্বপ্ন সফল হবে?'

বন্ধু বলল, 'হবে হবে। এবার তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নাও।'

আর বিশ্রাম। জারিফ তখন দেশে ফিরবে কবে সেই চিন্তায় অস্থির। ভাবনা একটাই, কখন তার সঙ্গে আবার দেখা হবে অটাবার। বন্ধুর সঙ্গে পাড়ি দিল সে প্যালেস্তাইনে, নিজের শহরের পথে।

দেশে ফিরেই ছুটল তারা সওদাগরের বাড়ি। অটাবার আব্বা তাঁর এতকালের পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে জারিফকে দেখে তো হতবাক্। সেই কোন সুদূর মিশর থেকে জারিফের সঙ্গে

কেমন করে এল তাঁর বন্ধু। যে-সে লোক তো নয় সে, স্বয়ং মিশরের বাদশার প্রতিনিধি সে—একজন জবরদস্ত মুকতার। আপ্যায়নের পালা চুকলে সওদাগরকে তাঁর বন্ধু জানাল তার এত পথ পাড়ি দিয়ে হাজির হওয়ার কারণ। বলল, 'এতদিনেও তুমি জারিফকে চিনতে পারলে না বন্ধু? ওর মতন সৎ আর পরিশ্রমী মানুষ আর কে আছে এ দুনিয়ায়? অনেক হয়েছে পরীক্ষা, এবার ক্ষান্ত দাও। তোমার অটাবার জন্য এর চেয়ে ভালো দুলহা আর পাবে না। এবার ওদের শাদির ব্যবস্থা করো।'

এবার আর না-করতে পারল না সওদাগর। সত্যিই বড়ো অন্যায় করা হয়েছে ছেলেটার সঙ্গে। আর নয়।

মস্ত বড়ো আয়োজন হল অটাবা আর জারিফের শাদির জন্য। এলাহি আয়োজন। সওদাগরের মেয়ের বিয়ে বলে কথা। সারা প্যালেস্তাইন থেকে লোক হাজির হল শাদির আসরে। গানে গানে ভরে উঠল আসর। সে গানে জারিফ আর অটাবার কথা। অটাবা আর জারিফের ভালোবাসার কথা। কিন্তু দুঃখ নয়,গানের সুরে সুরে আজ আনন্দ। অফুরান আনন্দ। আনন্দের সেই জোয়ারে সবার ভালোবাসা আর শুভেচ্ছায় ভাসতে থাকল জারিফ আর তার মিষ্টি বেগম অটাবা।

ছবি। শঙ্কর বসাক



পাথরের খেজুর

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক অনেক দিন আগের কথা। ওমান দেশে নাকাল নামের এক আধা-শহরে একজন ইমাম থাকতেন। তিনি ছিলেন সুপুরুষ, জ্ঞানী আর উদার। মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করে তিনি খুব আনন্দ পেতেন।

নাকালের কাছেই ওয়াদি মিসতেল নামে ছোট্ট এক গ্রাম। একদিন সেই গ্রাম থেকে আবদুল নামে এক মেষপালক ইমামসাহেবের কাছে এল। নিজের পরিচয় দিয়ে আমতা-আমতা করে বলল, 'আলি জনাব, আপনার কাছে আমার একটা আর্জি আছে। আমার সঙ্গে এক বস্তা খেজুর আছে। গ্রামে আমার মাথা গোঁজার যে জায়গাটুকু আছে সেখানে অত বড়ো বস্তা রাখার জো নেই। শুনেছি আপনার এক মস্ত গুদামঘর আছে। মেহেরবানি করে সেখানে আমার বস্তাটা রাখার যদি একটা ব্যবস্থা করেন তো খুব উপকার হয়। শীত পড়লেই বস্তা সরিয়ে নিয়ে যাব।'

একটু চিন্তা করে ইমাম বললেন, 'বেশ, বেশ। বস্তার ওপর নিজের নাম লিখে গুদামঘরে রেখে যান।'

'বহুৎ মেহেরবানি, আলি জনাব। বহুৎ মেহেরবানি।'

'রহমান, ও রহমান। এঁকে নিয়ে একবার গুদামঘরে যাও তো।'

ভৃত্য রহমান পায়ে পায়ে এগিয়ে এলে তার সঙ্গে চলে যায় আবদুল। কয়েক-শো হাত দূরেই ইমামসাহেবের গুদামঘর। একটা গাধার পিঠে আবদুলের খেজুরের বস্তা চাপানো ছিল। গাধাকে নিয়ে গুদামঘরে এসে পৌঁছোয় আবদুল। রহমান তার হাতে একটুকরো কাঠকয়লা দেয়। সাদা বস্তার গায়ে নিজের নাম লিখে গুদামঘরে বস্তাটা রেখে দেয় আবদুল।

২

কয়েকমাস পরের কথা। বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। এক হাড়কাঁপানো সকালে আবদুল এসে পৌঁছোল নাকালে। ইমামসাহেবের সঙ্গে দেখা করে বলল, 'সেলাম-আলেকম্। আমাকে চিনতে পারছেন আলি জনাব? আমি আবদুল।'

'আলেকুম সেলাম', মিষ্টি হেসে ইমাম বললেন, 'আপনার বস্তাটা নেবেন তো। বসুন। রহমান, ও রহমান।'

রহমান ছুটে আসে। ইমাম বলেন, 'এঁকে নিয়ে গুদামঘরে যাও। ইনি এঁর বস্তাটা নিয়ে যাবেন।'

আবদুল উঠে দাঁড়ায়। যেতে যেতে বলে, 'বহুৎ মেহেরবানি, জনাবে আলি।'

গুদামে ঢুকে আরও অনেক বস্তার মাঝে নিজের বস্তাটা খুঁজে পায় আবদুল কিন্তু তার মাথায় হঠাৎই দুষ্টু বুদ্ধি ভর করে। ইমামসাহেবের বাগানের ভালো জাতের খেজুরে-ভরা অনেকগুলো বস্তা গুদামঘরে ডাঁই করা আছে। তারই একটি টেনে নেয় আবদুল। ক্ষিপ্র হাতে একটা বস্তা মাঝ-বরাবর ফেঁড়ে দুটো ভাগ করে। জোব্বার পকেট থেকে দড়ি বের করে ছোটো আকারের ওই বস্তাদুটোর মুখ চটপট বেঁধে ফেলে। তারপর রহমানের সাহায্য নিয়ে বস্তাদুটো গুদামের বাইরে এনে গাধার পিঠে তুলে দেয়।

খুবই কম সময়ের মধ্যে এই ঘটনাগুলো ঘটে যায়। পলকের মধ্যে কত-কী যে ঘটে গেল রহমান তা বুঝতে পারে না। গাধার পিঠে দামি খেজুর নিয়ে চম্পট দেয় আবদুল।

৩

ঘণ্টাখানেক পর। ইমামসাহেবকে হঠাৎই আসতে হল গুদামঘরে। হঠাৎ-করে বাড়িতে লোকজন এসে পড়ায় ভালো খেজুরের দরকার পড়েছে তাঁর।

গুদামে ঢুকে বস্তাগুলো একটু অবিন্যস্ত বলে মনে হল তাঁর। একটু নজর করতেই আবদুলের নাম লেখা বস্তাটা দেখতে পেলেন ইমাম। রহমান সঙ্গে ছিল। তার দিকে চেয়ে ইমাম বললেন, 'হাঁরে, রহমান—আবদুল তার বস্তা নেয়নি?'

'জী হাঁ, হুজুর', রহমান বলল।

ইমাম বুঝতে পারলেন আবদুল একটা ঘোরতর অন্যায় করেছে। তাঁর হৃদয় যদিও খুবই উদার ছিল তবু তিনি জানতেন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তাই তিনি মনে-মনে



বললেন, 'আবদুল যদি ভুল করে আমার খেজুর নিয়ে যায় তবে সেগুলো ওর। মনের আশ মিটিয়েই ভোগ করুক সে কিন্তু যদি জেনে বুঝে চুরি করে থাকে তবে আল্লার ইচ্ছায় খেজুরগুলো পাথর বনে যাক।

আবদুলের গর্দভ ততক্ষণে ওয়াদি মিসতেলের মেঠো রাস্তায় ঢুকে পড়েছে। সামনে হাঁটছিল আবদুল। মনটা ভারী খুশিতে ভরে আছে তার। হঠাৎই বিকট একটা শব্দ শুনে পিছনে তাকায় সে। দ্যাখে, গাধার পিঠে থেকে খেজুরের বস্তাদুটো বেবাক লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে।

বস্তা তুলতে গিয়ে চমকে ওঠে আবদুল। এ কী! বস্তাদুটো এমন ভারী হল কী করে? একটা বস্তার মুখ খুলে আবদুল সবিস্ময়ে দেখল, সেখানে খেজুরের চিহ্নমাত্র নেই। তার জায়গায় গাদাগাদি করে আছে কতকগুলো চোকলা-ওঠা খসকুটে পাথর!

'হা আল্লা!' বলে মাথায় সজোরে চাপড় মেরে মাটিতে পড়ে গেল আবদুল। কতক্ষণে তার জ্ঞান ফিরেছিল তা আমাদের জানা নেই কিন্তু আজও যদি কেউ ওয়াদি মিসতেল গ্রামে যায়, পাথুরে খেজুরের ওই বস্তাদুটো দেখতে পাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ছবি। সুব্রত মাজী



সুলতানের শেষ ইচ্ছা

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

আরবদেশে এক সুলতান ছিলেন। ধনদৌলতের ভাণ্ডার ছিল তার অফুরন্ত। আর ছিল অসংখ্য উট, ঘোড়া, ভেড়ার পাল। তিনি যেমন ছিলেন সম্পদশালী, তেমনই ছিল তাঁর পরাক্রম। প্রতিবেশী রাজ্যের সুলতানরা তাঁকে খুব সমীহ করে চলত।

বহুকাল সুখে-স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করার পর তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। এখন অশক্ত শরীর, তিনি আর দরবারে হাজির হতে পারেন না। প্রজাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনবেন কী ভাবে! তখন সুলতান একদিন তাঁর তিন ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। ওদের নিয়েই যত দুশ্চিন্তা সুলতানের। কন্যা তাঁর পরমা সুন্দরী, তাকে নিয়ে সুলতানের বিশেষ কোনও চিন্তা ছিল না।

ছেলেরা কুর্নিশ জানিয়ে আব্বাজানের সমুখে হাজির হতেই সুলতান বললেন, 'দেখতেই পারছ তোমরা, আমার এখন আর চলাফেরার শক্তি নেই। এভাবে চলতে পারে না। তাই আমার বিষয়-সম্পত্তি সব তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে চাই। আমার এন্তেকালের আগেই দেখে যেতে চাই, তোমরা তিন ভাই মিলেমিশে রাজকার্য পরিচালনা করতে শিখেছ।

নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ যেন না হয় কখনও। আমার আদেশ তোমরা নিশ্চয় মেনে চলবে।'

সুলতানের শেষ ইচ্ছের কথা শুনে তিন ভাই সমস্বরে বলে উঠল, 'আপনার আদেশ শিরোধার্য আব্বাজান। আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।'

নিশ্চিন্ত হয়ে সুলতান বললেন, 'তবে শোন আমার সিদ্ধান্তের কথা। জ্যেষ্ঠপুত্র বসবে আমার মসনদে। সে রাজ্য শাসন করবে। এটাই নিয়ম। মধ্যমপুত্র পাবে ধনদৌলতের ভাণ্ডার। সে খাজানা সামলাবে। আর কনিষ্ঠ, তুমি হবে উট, ঘোড়া, ভেড়া ইত্যাদি সব পশুদের মালিক। কেউ কারোর অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না। তিনজনেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে, এবং পরস্পরকে সাহায্য করবে।'

তারপর তিনি মুহুরিকে ডেকে একটি হলফনামা তৈরি করে তাতে স্বাক্ষর করলেন। এর কিছুদিন পর সুলতান শেষবারের মতো চোখ বুজলেন।

কাজকম্মো সব মিটে গেলে সুলতানের শূন্য আসনে কে বসবে এই নিয়ে ভাইদের মধ্যে বিবাদ শুরু হল। বড়োভাইকে আর দুই ভাই কিছুতেই সুলতান হিসেবে মেনে নিতে চাইল না। রাজ্যের উজির, নাজির, সিপাহসালার, সভাসদ্‌রা শত চেষ্টা করেও কোনও উপায় খুঁজে পেলেন না। তাঁরা সুলতানের হলফনামার কথা ছোটো দুই ভাইকে মনে করিয়ে দিলেন। তাতেও সমস্যা মিটল না। তখন বড়োভাই বলল, 'বেশ বেশ, এভাবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে লাভ নেই। এবার তবে আমার কথা শোনো। আব্বাজানের অধীনে তিনজন বিচক্ষণ করদ সুলতান আছেন। তাঁদের একজনের কাছে গিয়ে আমরা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতে পারি।'

এ-কথা সবাই মেনে নিল। এমনকি উজিরও বড়ো ভাইয়ের প্রস্তাবে সায় দিলেন।

তখন তিন ভাই চলল এক করদরাজ্যের দিকে। অনেকটা পথ পেরিয়ে তারা একটি জায়গায় এসে থামল। সবুজ গাছপালায় ঘেরা সেই প্রান্তর। পাশ দিয়ে বহে চলেছে এক পাহাড়ি নদী। এমন স্নিগ্ধ পরিবেশ পেয়ে তারা বিশ্রাম করার জন্য ঘাসের সবুজ গালিচায় বসল। সঙ্গে এনেছিল কিছু খাবার। খানা খেতে খেতে এক ভাই বলল, 'একটা উট এই পথ দিয়ে কিছুক্ষণ আগে হেঁটে গেছে। তার পিঠের এক দিকে ছিল মিষ্টির বোঝা, অন্যদিকের বোঝায় ছিল শস্যদানা।'

আর এক ভাই বলল, 'আর ওই উট ছিল কানা, একটা চোখে দেখতে পায় না।'

কনিষ্ঠ ভাই তখন বলল, 'ঠিক ঠিক, সেই উটের লেজটি কাটা।'

তিন ভাইয়ের কথাবার্তা শেষ হয়েছে কী হয়নি, সেই উটের মালিক ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। এতক্ষণ সে আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল তাদের কথা। সে ভাবল এরা নিশ্চয় তার উটটি চুরি করে লুকিয়ে রেখেছে পাশের বনের কোথাও। সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'তাহলে তোমরাই আমার উট চুরি করেছ।'

তার কথা শুনে তিন ভাই হতবাক। সে কী কথা, তারা উট চুরি করবে কী, চোখেই



দেখেনি তাকে।

ওদের কথা উটের মালিক বিশ্বাস করল না। সে বলল, 'তাহলে চলো সুলতানের কাছে। তিনিই বিচার করবেন।'

ওরা চার জন হাজির হল সুলতানের দরবারে। সুলতানকে আদাব জানিয়ে উটের মালিক বলল, 'মহামান্য প্রভু, এই তিন ভাই আমার উটটাকে চুরি করেছে। এর বিচার চাই...'

সুলতান জিগ্যেস করলেন তাকে, 'কী করে বুঝলে তুমি, যে তোমার উট ওরাই চুরি করেছে?'

—'হুজুর ওরা যখন খানাপিনা করতে করতে কথা বলছিল তখন আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। ওরা বলছিল—আমার উটটার একটা চোখ কানা, লেজটা কাটা—আর ওর পিঠের দু'পাশে দুটি বোঝা ছিল, একটায় শস্যদানা আর একটায় মিষ্টি! ওরা যদি না চুরি করবে তো এতসব কথা কী করে জানবে?'

তিন ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে সুলতান বললেন, 'ও যা বলছে সব কি সত্যি?

এক ভাই বলল, 'হ্যাঁ হুজুর, আমরা যা যা বলেছি তা উনি ঠিক-ঠিক বলেছেন। তবে

একথা সত্যি নয় যে আমরা উটটাকে চুরি করেছি। এটাই সত্যি হুজুর, আমরা উটটাকে চোখেই দেখিনি।'

বিস্মিত হয়ে সুলতান তাকালেন বড়োভাইয়ের দিকে। জিগ্যেস করলেন, 'তাহলে? কীভাবে তোমরা উটটার সঠিক বর্ণনা দিতে পারলে?'

বড়োভাই বলল, 'আমরা লক্ষ করেছি পথের ধারে সবুজ ঘাসের শুধু বাঁ দিকটার ঘাসই উটটা খেতে খেতে চলে গেছে। অন্যদিকের ঘাস যেমন-তেমন রয়েছে। এর ফলে আমরা বুঝতে পেরেছি, উটটার ডান চোখটা কানা।'

মধ্যম ভাই তখন বলল, 'তারপর আমরা আরও লক্ষ করলাম রাস্তার একদিকেই উটটার বিষ্ঠা পড়তে পড়তে গিয়েছে, অথচ আমরা জানি হুজুর, উট বিষ্ঠা ত্যাগ করার সময় লেজের ঝাপটায় তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। এজন্যই আমাদের মনে হয়েছে উটটার লেজ নেই।'

বিস্মিত হয়ে সুলতান এবার তাকালেন কনিষ্ঠ ভাইয়ের দিকে। তখন কনিষ্ঠ ভাই বলল, 'উটটা পরিশ্রান্ত হয়ে পথের পাশে এসে বসে ছিল কিছুক্ষণ। তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে নরম নরম কচি ঘাসের গালিচায়। সেখানে আমরা লক্ষ করলাম, একপাশের মাটিতে ঘাসের উপর একঝাঁক মাছি ভনভন করছে। বিপরীত দিকে বা আশেপাশে কোথাও একটি মাছিও নজরে পড়ল না। এতেই আমাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে উটটার একদিকের বস্তায় মিষ্টি জাতীয় কিছু ছিল। আর অন্য দিকে শস্যদানা থাকা সম্ভব।'

তিন ভাইয়ের বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সুলতান খুবই খুশি হলেন। তিনি নিশ্চিত হলেন যে ওরা উটটাকে চুরি করোনি। তাই তিনি উটের মালিককে বললেন, 'আমার দৃঢ়বিশ্বাস ওরা উট চুরি করেনি। তুমি এখুনি ফিরে যাও, খুঁজে দেখ তোমার উট কোথায় আছে।'

উটের মালিক কী আর করবে, সে দরবার থেকে বিদায় নিল। আর সুলতান? তিনি তিন ভাইকে অতিথিশালায় সাদরে আপ্যায়ন করলেন। তাদের খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের সুবন্দোবস্ত করতে আদেশ দিলেন উজিরকে।

বিশ্রামঘরে এসে তিন ভাই খুব খুশি হল। ঠিক যেন নিজেদের প্রাসাদে ফিরে এসেছে তারা। নাস্তা করে জিরিয়ে নিল বেশ কিছুক্ষণ। কখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে তারা কেউই টের পায়নি। যখন রাতের ভোজন এল, যা নিতান্তই সাদামাটা, তখন তিন ভাইয়ের মনে পড়ল তাদের আসল পরিচয়ের কথা। এখনও সে-পরিচয় গোপন রাখাই সঠিক বলে সিদ্ধান্ত নিল তারা।

রুপোর রেকাবি থেকে এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে নিতে নিতে বড়োভাই বলল, 'আমার মনে হয়, এই রুটি তৈরি করেছে এক অসুস্থ মহিলা।'

মেজোভাই বলল, 'এখানকার সব কিছুতেই যেন কী একটা গোলমাল আছে দেখছি। উঠানে ঘুরছিল একটা ছাগলছানা, ওর মা-টা মারা গেছে অনেক দিন হল।'

তখন কনিষ্ঠ ভাই একটু জোরেই বলে ফেলল, 'আরে হবেই-বা না কেন, যে দেশের সুলতানের বাবা-মা'র সঠিক পরিচয় নেই সে দেশের তো এই অবস্থাই হওয়ার কথা।'

ওদিকে হয়েছে কী, অতিথিদের ঘরে ঢুকতে গিয়ে সুলতান তাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে থমকে গিয়েছিলেন। তিন ভাইয়ের কথা শুনে প্রথমে সুলতান খুব রেগে গেলেন। পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ল এই তিন বিচক্ষণ অতিথির পর্যবেক্ষণের কথা।

তিনি তখনই তড়িঘড়ি ছুটলেন অন্তঃপুরে। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন রুটি আর ছাগলছানার বিষয়ে দুই ভাই যা বলেছে তা নির্ভুল।

কিন্তু কনিষ্ঠ ভাই? সে সুলতানের বিষয়ে কী ভয়ংকর কথা বলেছে! সুলতান পাগলের মতো ছুটে গেলেন জেনানা মহলে, মায়ের কক্ষে। হাতে তাঁর উন্মুক্ত তরবারি। অভিবাদন না জানিয়েই তিনি জিগ্যেস করলেন, 'আমার প্রিয় আম্মা, সত্যি করে বলুন তো, আমার প্রকৃত পরিচয় কী? আমি আপনার সন্তান নই? মরহুম সুলতান কি আমার পিতা নন?'

'বলছি বাপজান, সব কথা আজ আমি কবুল করছি। একথা তোমার আব্বাজানও জানতেন না। একই দিনে আমার এবং রসুইখানার এক খুবসুরত জেনানার সন্তান হল। আমার কোলে এল বেটি, আর তুমি সেই জেনানার কোল আলো করে দুনিয়ায় এলে। সুলতান চাইছিলেন পুত্র, তাঁর মসনদের উত্তরাধিকারী, —তাই নিজের জান বাঁচানোর জন্য আমি বাঁদিকে দিয়ে দুই সন্তান বদলে নিয়েছি। তা না-হলে তোমার আব্বাজান আমাকে খতম করে দিতেন বাবজান!' এই বলে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

সুলতান তাঁর উন্মুক্ত তরবারি যথাস্থানে রেখে দিলেন। তাঁর পালনকর্ত্রী জননীর অশ্রু পরম যত্নে মুছিয়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন তিনি।

মমতাময়ী জননী সুলতানকে বাধা দিয়ে বললেন, 'বাপজান, এই বৃত্তান্ত আর কেউ জানে না। তোমার জন্মদাত্রীর এন্তেকাল হয়েছে। সে-ও জানত না কিছুই। এই দেশের সুলতান তুমি, সুলতান হয়েই থাকবে বাপজান।'

এতক্ষণ সুলতানের মনে যে ঝড় উঠেছিল তা ধীরে ধীরে থেমে গেছে। শান্ত হয়ে তিনি তাঁর বিশ্রাম কক্ষে গেলেন। ডেকে পাঠালেন তিন ভাইকে। জিগ্যেস করলেন, 'কী কী লক্ষণ দেখে তোমরা এমন সব তথ্য জানতে পেরেছ?'

বড়োভাই বলল, 'হুজুর, এ আর এমন কঠিন কী। রুটি ছিঁড়েই আমি পেয়েছি ছোট্ট ছোট্ট মোটা দানা, অশক্ত শরীরে ময়দার গোলাটা ঠিকমতো ঠাসা হয়নি যে!'

মেজোভাই তখন সহজ গলায় বলল, 'ছাগল ছানাটার মা ওকে জন্ম দিয়েই মারা গেছে। সে কারণে কোনও কুকুর-মার দুগ্ধ পান করে বড়ো হচ্ছে। ওর শরীরে কোনও মেদ নেই—ঠিক কুকুররা যেমন হয়।'

সুলতান অবাক হয়ে শুনছেন ওদের কথা। এবার তাঁর সম্বন্ধে কী বলবে কনিষ্ঠ পুত্র? অধীর আগ্রহে সুলতান তাকালেন তার দিকে। সে বলল, 'হুজুর, এই অধমের গোস্তাকি মাফ করবেন। আপনার আচরণে আমরা সুলতানের আদবকায়দার কোনও পরিচয় পাইনি। খানদানের আভিজাত্য নেই অতিথিদের আপ্যায়নে। আপনি যদি সুলতান বংশের আদমি হবেন, তবে কেন আপনার ব্যবহারে আমরা মেহমান হিসেবে সেই আভিজাত্য লক্ষ করলাম না?'

সুলতান মৃদু হেসে বললেন, 'আমার তিন সম্মানীয় মেহমান দেখছি সাধারণ বংশের নয়। এবার তাহলে তোমাদের প্রকৃত পরিচয় আমাকে জানাবে কি?'

বড়োভাই নিজেদের পরিচয় জানাতেই সুলতান আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একে-একে তিন ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ওদের আব্বাজানের এন্তেকালের সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন এবং রাজ্যের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন সুলতানের জানাজা অনুষ্ঠানে। নিজে তিনি মসনদে বসে সুলতান-পুত্রদের আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। তারপর বললেন, 'বিচারের জন্য উটের মালিক তোমাদের এখানে এনেছিল। সেজন্যই তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হল।'

আব্বাজানের আদেশের কথা এবং তা নিয়ে বিবাদের কথা সবিস্তারে জানিয়ে বড়োভাই বলল, 'এজন্যই আমরা আপনার কাছে আসছিলাম, আপনার পরামর্শ নিতে।'

হঠাৎ সুলতানের অট্টহাস্যে তিন ভাই চমকে উঠল। এটা কি কোনও হাসির কথা হল?

তিন ভাইয়ের মনের অবস্থা অনুমান করে সুলতান শান্ত হয়ে বললেন, 'তোমরা দেশে ফিরে যাও। যারা এত বিচক্ষণ, এমন প্রখর যাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাদের আমি আর কী পরামর্শ দেব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে।'

সুলতানের কথা শুনে তিন ভাইয়ের বোধোদয় হল। তারা খুশিমনে রাজ্যে ফিরে গেল এবং মরহুম আব্বাজানের শেষ ইচ্ছা পালন করল।

ছবি। সুব্রত মাজী



দুখপাথরা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কতটুকু মেয়ে, স্বপন দেখলে শণচুলো কাপাসদাড়ি এক বুড়ো লোক হাত নেড়ে নেড়ে তাকে বলছে : শোন্-রে শোন্, সাত বচ্ছর খিদেয় জ্বলবি; তুই সারাক্ষণ—যত খাবি কিছুতে তোর নিবির্ত্তি হবে না। পরের সাত বচ্ছর মরবি তেষ্টাতে—দিঘি সায়র নালা নদী শুষে খেয়েও তেষ্টা যাবে না তোর, তারপর আরও সাত বছর আটকা থাকবি মরা মান্ষের ঘরে একসঙ্গে। যদি রক্ষে হোস, এতগুনো বছর পার করে তবে তোর সুখ হবে।

ঘুম ভাঙতে ভয়ে নীল হয়ে মেয়ে বলছে, ও মা, কী ভীষণ মা, শোনো—

স্বপ্ন শুনে ভয়ে নীল হয়ে গেছে মা—শুনছ গো? কী স্বপ্ন দেখেছে তোমার মেয়ে?

কী হবে?

কী আর হবে! ক-দিন না যেতে মেয়ে ডাক দিয়ে উঠেছে : মা ও মা, সেই বুঝি! কী খিদে গো মা—

ঘরে যা ছিল, যেখানে যা ছিল, হাউহাউ করে খেয়ে পরক্ষণে ফের ডাক দিয়ে উঠেছে, খিদেয় পেট জ্বলে গেল, সেই খিদে গো মা! ঘরেরটা পরেরটা নিয়ে যেচে হাউহাউ করে খেয়ে একটুখানি গেল কি না ফের, মা ও মা—

মাসখাকি আয়, জমা টাকা—ক-দিনে উড়ে গেল। ঘরের সোনাদানা, কাঁসা-পেতল কাঁড়িকাঁড়ি দ্রব্যসামিগ্রি বেচা পড়তে লাগল একে একে। তাবিজ মানত— যে যা বলে। কীসের কী। সেই এক কথা খালি থেকে থেকে, খিদে, কী খিদে গো মা—

যথাসর্বস্ব সম্বল ফুরিয়ে এল। বড়ো মহল্লার বাড়ি বেচে শস্তাগন্ডা পাড়ায়, তারপর দেহাতে, বারগাঁয়ে, অজগাঁয়ে—পরিপূর্ণ ভোজ থেকে ছাইপাঁশ গেলা—শেষে সেও আর কুলোয় না, যত জোগাও, ফের সেই এক কথা, কী খিদে গো মা—

খিদে, খিদে, এবার আমাদের খা রাক্ষুসী।

কিন্তু ওইটুকু মেয়ে, ওর কী দোষ। বাস ছেড়ে বনবাসে নামতে হল একবস্ত্রে। আঁচড়ে পাঁচড়ে খায় ফল মূল পাতা ঘাস যা পায় যেখানে। এ কি চোখে দেখা যায়? বাপ মরল পথে পড়ে। একা মা। তাতে-বা কী। সেই এক কথা থেকে থেকে—

খা ওই কুটো কাঁটা লতা শুঁয়ো তুলে নিয়ে খা মা, আর কী পাবি বনবাসে? এমনি যেতে যেতে বুঝি পুরে গেল সাত বচ্ছর। হঠাৎ একদিন মেয়ে ডাক দিয়ে উঠেছে, মা ও মা, জল খাব।

জল খাবি? তো খা। মা চমকে চায় মেয়ের মুখের দিকে।

কী তেষ্টা গো মা।

ধারে দূরে যেখানে হোক, জল দেখলে হল। উঃ, কী তেষ্টা।

তো এত জল কোথা মেলে? খানা নালা ডোবা খোঁদল যেখানে জল দেখে অমনি ছুটে গিয়ে মুখ বুড়িয়ে শুষে নেয় কণ্ঠা অবধি। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। জল নেই তো তেষ্টায় ফেনা ভাঙছে মুখ দিয়ে। কী তেষ্টা গো মা—

এ কি চোখে দেখা যায়? মা বলে, খা মা, মরণসই জল খেয়েনে। ঘর খেলি, দোর খেলি, গাঁ খেলি, বন খেলি, বাপকে খেলি, এবারে আমায় খা—আশ মিটিয়ে বুক ভরে খেয়েনে রাক্ষুসী।

কিন্তু ওইটুকু মেয়ে, ওর কী দোষ। হায় খোদা ভগবান। এ কি চোখে দেখা যায়? খানা খোঁদল ডোবা পুষ্করিণী যেখানে যা সব হাঁ হাঁ করছে তলানি খুলে, মা মেয়ে দু-জনার চারধার বেড় দিয়ে দুনিয়াখানা যেন লাল হয়ে জ্বলছে তেষ্টায়—

এমনি কত দিন কত যুগ যে গেল কে জানে। হঠাৎ একদিন সকালবেলা আলো ফুটতে মনে হয় যেন আরেক রকম, আরাম ঠান্ডা আলো। চোখ খুলতেই—ও মা। বিশাল মস্ত একখানা বাড়ি। এই বনদেশে বাড়ি এল কোত্থেকে? ছেঁড়া ছেঁড়া বন আশেপাশে। জঙ্গল উঠে গেছে খোলা ফটক ছাপিয়ে—তাই তো। খোলা যে ফটকখানা। আছে কেউ? লোক দেখি না তো কোনো দিকে। কোন্ রাজা পুরী বানিয়ে রেখে গেল এই বিভুঁই রাজ্যে?

অবাক চেয়ে চেয়ে মেয়ে বলে ওঠে—না, তেষ্টার কথা নয়, বলে ওঠে, কেউ আছে ভিতরে? দেখে আসব মা?

যা, দেখে আয়।



ভয় পায়ে এগিয়ে যায় মেয়ে ফটকের গোড়ায়। উঁকি দিয়ে দেখে ভিতরটা। পেছন ফিরে বলে, কেউ নেই।

একটু পর ফের বলে, ঢুকব? যাব ভিতরে?

দেখ তবে ঢুকে।

ফটক পার হয়ে পা দিয়েছে ভিতরে, অমনি চোখের পলকে মা-মেয়ের মাঝখানে দ্রুত আওয়াজ তুলে ফটক বন্ধ হয়ে গেল।

এ কী হল? মা ঠেলা দিয়ে পড়ল দরোজায়, ঘা দিচ্ছে দু-হাতে যত শক্তি—

ও মা—ডুকরে চেঁচিয়ে উঠল বুঝি মেয়ে ভিতর থেকে—

হায় খোদা ভগবান। এ কী করলে তুমি?

কে জানে কতক্ষণ মা বসে কাঁদল বাইরে। মা—মা— করে মেয়ে কতক্ষণ কাঁদল ভিতরে পড়ে। শেষে একসময় কান্নার ভিতরেই মনে হয় বুকের তেষ্টা তো তার নেই। তারপর ফের মনে হয় যেন আনচান লাগছে সারা দেহ। তারপর মনে হয় গোটা বাড়িখানা যেন তাকে টানছে ভিতরে। উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়ে। কে জানে কখন চলতে শুরু করেছে তারপর। মহলের পর মহল পার হয়ে যায় যেন ঘোরের ভিতর, সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরতলায়—বারান্দা, ঘর, একটার পর একটা—সব যেন নরম সাত রং ঢেলে সাজানো—ঝাড়বাতি, ফুলের কলশি, দেয়ালে দেয়ালে কত ছবি মোহর অস্ত্র—হঠাৎ খেয়াল হয় তার, তাই তো! এত যে পাখি পতঙ্গ ওড়াউড়ি করছে, হাওয়া খেলছে চারধার ধরে বারান্দায়—গায়ে আঁচ লাগে, কিন্তু কোথাও তো সাড় নেই তার।

কেউ কি নেই সারা বাড়ি। এমনি বিশাল বাড়ি, তার কেউ লোক নেই কোনোখানে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখে কোনার ঘরখানা যেন বন্ধ, এগিয়ে গিয়ে আলতো একটু ঠেলা দিতেই দোর খুলে গেল। আর ভিতরে চেয়েই—

ও মা! বুক চমকে যায়। দোর দিয়ে দেখা যায় উঁচু পালঙ্কের দুধসায়র শয্যেয় পড়ে অকাতরে ঘুমিয়ে একজন। কে? চিকন সুঠাম দেহ, মাথার চুলে ছায়া হয়ে আধখানা মুখ। বুক উঠছে পড়ছে নিশ্বাসে নিশ্বাসে। শিয়রে একখানা আগুনবর্ণ তরোয়াল ধাঁধা দিয়ে উঠছে—খোলা—

মেয়ের মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে যায়, রা-জ-পু-ত্র!

কিন্তু আশ্চর্য! সে যে বলে ফেলল মুখ ফুটে, শব্দ উঠল না তো তার কথাতে।

ঘুমোচ্ছে রাজপুত্র। যদি জেগে যায় হঠাৎ। ত্রস্ত হয়ে দোর ভেজিয়ে দিয়ে মেয়ে বেরিয়ে এল।

ফের এ-ঘর সে-ঘর ও-মহল আরেক মহল করছে সারাদিন ধরে—গাছপালার ভিতরে ভিতরে চলে যায় উঁচু বাইরে-পাঁচিল বরাবর, নহর কাটা ফুল পাখি ভরা ভরা গাছের নীচ দিয়ে ঘুরছে, একলা সে—না, আর কেউ নেই কোনোখানে। আর তার চেয়েও আশ্চর্য, এক ফোঁটা শব্দও উঠছে না কোথাও। ফড়িং উড়ছে, কাঠবেড়ালি ঘুর ঘুর করছে, হাওয়ার ঘায়ে

জল চলেছে নহরে—কান পাতলে মনে হয় ডোবা আওয়াজ একটুখানি, বাইরে টের পাওয়া যায় না। চলতে চলতে চার মুখে চার ফটক ঘুরে এল। কোন্ পথে ঢুকেছিল? মনে হতেই আকুল হয়ে যায় মনটা। কিন্তু কোন্‌টা যে সামনে সে আর হদিস হয় না। ফের উপরে গিয়ে দোর খুলে দেখে তেমনি অকাতরে ঘুমিয়ে আছে রাজপুত্র।

কী করবে এখন? ঘরদোর ঘষে মাজে, নতুন পর্দা টাঙায়, ফুলদানে ফুল বদলে দেয়, ধূপ ধরিয়ে দীপ জ্বালিয়ে রাখে, আর ফল-মূল ধুয়ে কেটে এনে রাজপুত্রকে খাওয়ায় আপন হাতে—ঘুমের মধ্যেই খেয়ে নেন রাজপুত্র, ছুঁয়ে দেখে পায়ের আঙুল মাথার চুল—আগুন তরোয়ালখানা ধাঁধা দিয়ে ওঠে চোখের ওপর।

কে জানে ঘুমন্ত রাজপুত্র কিছু টের পায় কি না।

কিন্তু সারাদিন ধরে আর কী সে করবে।

একদিন শোনে ফটকের ওপিঠে কে যেন ঘা দিচ্ছে। কে ঘা দেয়? ও মা! শব্দ উঠছে যে হাতের ঘায়ে ঘায়ে। শব্দ! শব্দ! কত কাল পরে শুনছে—সেই শব্দ! কে ওদিকে? কে? চেঁচিয়ে ওঠে সে, তারও গলার আওয়াজ বাজতে থাকে তার দুটো কান ভরে। তার নিজের বলা শব্দ। কে তুমি?

ওপিঠ থেকে জবাব আসে, মানুষ গো, মানুষ। পথ হারিয়ে চলে এসেছি। খোলো না দোরটা।

কী করে খুলব? মেয়ে ভাবে পাষাণ ফটক কি নড়বে মানুষের হাতের জোরে?

ওপিঠের মানুষ বলে, তো এক কাজ করো। একগাছা দড়ি ছুঁড়ে দাও পাঁচিলের উপর দিয়ে, দেখি পারি কি না।

দড়ি কোথায় পায়। ও মা। দেখে সামনেই গাছে পেঁচ দেয়া এতখানিটা দড়ি। তাড়াতাড়ি গিয়ে এক মুড়ো শক্ত করে বাঁধল সে গাছের ডালে, আর-এক মুড়ো ছুঁড়ে দিল বাইরে। আর দড়ি ধরে অল্পক্ষণেই পাঁচিলে উঠে বেয়ে নেমে এল—

মেয়ে একজন। তারই বয়সি, বা কিছু বড়ো। ময়লা রং, ময়লা বেশ, এসে গড় হয়ে বলে, প্রেণাম হই রানিমা।

কে তুমি?

অনাথ দুঃখী গো রানিমা। ঘর ছেড়ে পালিয়েছিলুম কী জানি কী ভয়ে, তারপর ঘুরছি আজ সে কত দিন। শেষে দেখি এই বাড়ি। তো ঢুকি কোথা দিয়ে? ঢুকলুম যদি, পায়ে ঠেলো না গো মা, দাসী করে রাখো, সমস্ত কিছু করব কম্মাব, বিশ্বাসী লোক হয়ে থাকব তোমার কাছে।

থেকে গেল সে। কেবল কি দাসী? সারাদিনের সহচরী। কত কথা, কত কাহিনি জানে। যা জানে না সেও জানতে-বা কতক্ষণ!

এখন দিন যায় কথায় গল্পে, তার আওয়াজ, তার সুরে। পাখির পতঙ্গের গাছপালার কুঁড়িফুলের নহরের জলের আর হাওয়ার আর ছাওয়ার আর আলোর আর আঁধারের আর

তাদের চলাবলার কত রকম আওয়াজ সারাদিন। খালি রাজপুত্রের ঘরখানার সামনে এলে আওয়াজ হারিয়ে যায়।

একদিন মেয়ে বসে আছে আনমনে বাগানে গাছতলায়, দাসী একা চলে গেছে রাজপুত্রের ঘরে, হঠাৎ দেখে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসেছেন রাজপুত্র। দেখামাত্র—জেগেছেন রাজপুত্র? বলে সে ঢুকে এল—

কে তুমি?

আমি? কী বলবে! বলে ফেলে, আমি রাজার মেয়ে।

কী করে এলে এখানে? কবে এলে?

কথা বলে না আর।

এমনি করে সাজিয়ে রাখো ঘর? এমনি সেবা করলে এত কাল ধরে?

কথা বলে না সে।

রাজপুত্র বলেন, সাত বচ্ছর ঘুমিয়েছি শাপঘুম। শুনেছিলুম শাপ কাটলে দেখা পাব অচিন মেয়ের, সাত বচ্ছর সেবা করে জীইয়ে রাখবে সে আমায়। তা হলে সেই তুমি?

সে কথা বলে না।

ততক্ষণে বাগান ছেড়ে মেয়ে উঠে এসেছে সে ঘরে, রাজপুত্র তাকে দেখিয়ে বলেন, এ তা হলে কে?

মুখ ফুটল তার, ও আমার দাসী।

দাসী কেন ঢুকে আসে আমার ঘরে?

বে-শরম! চোখ রাঙিয়ে উঠেছে দাসী। যা, আপন ঘরে যা—

পেছন ঘুরতে গিয়ে চোখ ফেটে জল এসে যায়। মেয়ে ভাবে, তিন-তিনটে সাত বছর তার পুরল তা হলে এতদিনে। এইভাবে? নীচে দাসীর ঘরে মুখ গুঁজে সে কাঁদতে বসল নিঃসাড়ায়।

পরদিনে যেন ভোজবাজির বলে রাজপুরী গমগম করে উঠেছে ফের লোক জন দাসদাসী মন্ত্রীসান্ত্রীর কলরবে। মেয়ে ঝরকা দিয়ে দেখে, ও মা! কোথায় ছিল সব। একটা লোকও তো দেখিনি কখনও এতদিনে। একটা সাড়াও তো শুনিনি কখনও এতদিনে। গোটা পুরীখানা নাকি শাপঘুমে ঘুমিয়েছিল সাত বচ্ছর।

বলাকওয়া কানাঘুষো উঠছে ভরদিন, এবারে বিয়ে হবে রাজপুত্রের, রাজকন্যা আপনি বয়ে এসেছেন ঘরে। বোঝো তবে পিরবাবার মহিমা।

কবে হবে বিয়ে?

এই তো। রাজপুত্র যাবেন এখন বিদিশি শহরে সওদা করতে। ফিরে এলে পরে সাজ বাজা রোশনি বসে যাবে রাজ্যি জোড়া। ভোজ পড়বে চোপহর। আতশবাজি পুড়বে সমস্ত রাত। যে যেথা আছে সব্বাই এসে জুটবে উৎসবে। রাজপুত্র সব্বাইকে হাত ভরে আশ মিটিয়ে দেবেন দান।

মেয়ে দেখে শোনে সব দাসীর ঘরে বসে। সে বেরোয় না। কেউ তাকে বলেও না বেরোতে। কে-বা তাকে জানে, এক তার সে দাসী মেয়েটা ছাড়া। সে তো এখন ঢোকেও না দেখেও না এ ঘর।

না, রাজপুত্রও দেখেছেন তাকে বটে। দেখেছেন, কিন্তু কী দেখেছেন? নাই-বা দেখতেন অমন দেখা! এমনি ভাবতে ভাবতে—হঠাৎ কী আশ্চর্য, রাজপুত্র আপনি এসে উঁকি দিয়েছেন একদিন তার কুঠুরিতে! ও মা! রাজপুত্র যে!

কোথায় যায়, কোথায় লুকোয়—

রাজপুত্র বলেন, বিদেশে যাচ্ছি, বলো কী আনব তোমার জন্যে।

আমার জন্যে? আমার জন্যে কেন?

একা তোমার জন্যে কেন হবে? সবার জন্যে। আজকের এমনি দিনে বলো তোমার কী চাই? কী পেলে খুশি হও।

আমার? আমার কিছু চাইনে রাজপুত্র।

তা কি হয়? এমনি সুখের দিনে সবাইকে কিছু দিতে হয় আমার, যার যা মনের ইচ্ছা। একা তোমায় বাদ দিতে পারি?

রাজার কথা। সে কি ফেলা যায়? বেশ। তাহলে আমার জন্যে আনবেন একটা দুখপাথরা।

দুখপাথরা? সে আবার কী?

একটা পাথর মালিক। ঠিক লোককে শুধোবেন, মিলবে।

রাজপুত্র চলে গেলেন।

তারপর মাসভর কিনছেন এটা-সেটা। কত কী, কত বিপুল জিনিস যে কিনে কিনে বোঝা বানিয়ে ফেললেন। ফিরে আসার মুখে ভাবেন, তবু বাধা লাগে কেন ফেরার কালে? কী বাকি রয়ে গেল তা হলে নেওয়া? কী বলো তো?

না, সবই তো নেওয়া হয়েছে সবার নামে নামে। তা হলে? তাও বাধা হয় কেন? কী নিইনি বলো তো? দেখ, মিলিয়ে দেখ ফের।

মিলোতে বসে মনে পড়ল তখন। দাসীর সেই দুখপাথরা। সে তো নেওয়া হয়নি! দেখ্, দেখ্ এখন কোথায় মেলে সে এখানে।

নাঃ। লোকজন ঘুরে এল। কেউ জানেই-না কী সে সামিগ্রি।

তা হলে উপায়?

যা মেলে না তার আর কী উপায় হয়? তবু দশবার করে ফের খুঁজতে যায় সব। নাঃ! কেউ জানেই না কী সে সামিগ্রি।

কী করা আর। দিনও বয়ে চলেছে শুধু শুধু, ফিরতেই হয় এবারে। ফেরার একেবারে মুখটাতে একজন বললে, দামি পাথর নিয়াসে শুনি বিদেশি সদাগরেরা। যাবেন একবার জাহাজঘাটায়?

চলো দেখে আসি তবে শেষবারের বার।

ঘুরতে ঘুরতে মিলে গেল শেষ অবধি। কিন্তু দূরদেশি সে সদাগর বলে, দুখপাথর দিয়ে কী করবেন জনাব। না নিলেই নয়?

সে আমার দাসীর আবদার। নিতেই হবে।

নিন তা হলে। কিন্তু বলে দি, এ বড়ো ভয়ানক পাথর। যদি কেউ গোপন দুঃখু বলে শোনায় পাথরকে, পাথর জ্যান্ত হয়ে উঠে একগ্রাসে তাকে গিলে খাবে।

তাই? তা হোক যা হোক। কথা তো রক্ষে হল। অনেক দাম দিয়ে তখন মিলল পাথরখানা। তবু ফেরা পথে, ফিরে পরেও মনে হয় এক-একবার—

নগণ্য সামান্য দাসী, সে কেন চাইল অমনি একটা পাথর? দুখ-পাথরা? খটকা লেগে রইল রাজপুত্রের মনে। সবাই ঘুমোলে পরে রাত অন্ধকারে দাসীর ঝরকার বাইরে গিয়ে আড়ি পেতে বসলেন রাজপুত্র। একটু না-যেতে শোনেন, কী যেন সে বলছে আপন মনে। কী বলছে একা একা? একটানা গুনগুন করে কী যেন সে বলছে বিনিয়ে, বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে এক-একবার। কান করে শোনেন সে একটা ভাঙা ভাঙা ছড়ার মতন, কান্না চেপে কান্নায় জড়িয়ে বলছে থেকে থেকে : শোন্-রে পাথর, শোন্-রে পাথর শোন্-রে পাথর...কী শুনবে? শোন্-রে পাথর সাত বচ্ছর হা খাই যো খাই কাটল আমার—কাটল তো কাটল; কী হল তাতে? না, ঘর খেলুম না আগুন খেলুম, আগুন না মোর বাপকে খেলুম—খিদের ঝালে কী যে খেলুম মনে নেই সে—তারপর? একটু দম নিয়ে ফের বলছে সে : শোন্-রে পাথর, তারপরে ফের সাত বচ্ছর কী তেষ্টা কী তেষ্টা গো মা—বুকের খোলটা গনগনিয়ে ফেটে পড়ছে—পুড়ছে, ফেটে পড়ছে গো মা—উঃ! নালা নহর দিঘি ডোবার পাঁক তলানি শুষে খেয়েও তেষ্টা যায় না—কিছুতেই তেষ্টা যায় না গো। মা বলছে, ও লক্ষ্মীছাড়ি, সব খেলি, ফের আমাকে খা। মর, এবারে জ্বালা জুড়ুক। মরব? তা কী করে মরি? বলো না গো কী করে মরি? মরলুম তো না—আটকা হলুম রাজকুমারের ঘুমপুরীতে—এই সে ঘুমপুরী গো মা। একলা জাগি একলা ঘুমুই দিন বয়ে যায় দিনের মনে—হঠাৎ শুনি—সে কি সুখ মা শব্দ শুনছি—শব্দ গো শব্দ, আর, একটা মানুষের গলার আওয়াজ—হঠাৎ শুনি। আবার শুনি...

একটানা—একটানা—শুনতে শুনতে নেশা লেগে যায় যেন। তার ভেতরেই চটকা দিয়ে ঘোর কেটে গেল হঠাৎ আচম্বিত—মনে হয় যেন গলা বুজে গেছে আচমকা ভেতরে, দম আটকে যাওয়া একটা অস্বাভাবিক চাপা আওয়াজ উঠছে—রাজপুত্র ত্বরিত দোর ভেঙে ঢুকে পড়লেন ঘরে।

দেখেন, অতিকায় মানুষ আকৃতি একটা পাথর, তার বিপুল হাঁয়ের ভেতরে মেয়ের মাথাটা ঢুকছে বেরিয়ে আসছে বারবার করে, আর পাথর তার দুটো হাত বেড়ি দিয়ে চেপে ধরেছে মেয়েকে প্রবল চাপে, তার আর নিস্তার নেই—রাজপুত্র আপ্রাণ শক্তিতে ঘা দিয়ে পড়লেন পাথরের ওপর। তারপর আর তাঁর মনে নেই।

নতুন করে বাজি রোশনি পুড়তে শুরু হল সারা রাজ্যে। বিয়ের রাতে মেয়ের হাত দুটো ধরে রাজপুত্র বলেন, আগে বলোনি কেন সব?

কী আর বলবে মেয়ে। তার মাকে খোঁজ করে আনা হয়েছে দেশ ঢুঁড়ে। সারা দেশের লোক সওগাত নিয়ে এসেছে নতুন রানির জন্যে।

দাসীর কী হল?

কে জানে কী হল। পাথরের গ্রাস থেকে বের হয়ে আসার পরে মেয়ে আর তার দাসীকে দেখতে পায়নি রাজপুরীর কোনোখানে।

ছবি। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

দক্ষিণ এশিয়া



আফগানিস্তান পাকিস্তান ভূটান নেপাল
মালদ্বীপ বাংলাদেশ



নিমকুনি ভাই

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাত রানি, একটা ছেলের মুখ দেখা গেল না— রাজার মনে সুখ নেই। সবাই বলে অতিথ ফকিরকে খাওয়াও, দানধ্যান করো, তো যে যা বলে রাজা তাই করেন, কিছুতেই কিছু না। এরই ভেতর একদিন এক বুড়ো ফকির এল মাগন নিতে। মাগন থাক, রাজাকে দেখে বলে, মুখখানা কালো কেন রে তোর?

বাবা, সাত রানি ঘরে, অপুত্রু রাজার দুঃখ কি তুমি বুঝবে পিরবাবা?

ও এই কথা। তা আমায় মানিস তো আয় আমার সঙ্গে। লোকজন না, একা—

একা? সভার সবার মুখচাওয়াচাওয়ি করে শেষমেষ সিংহআসন ছেড়ে উঠে একলাই রাজা পিছু ধরলেন ফকিরসাহেবের।

ঝটপট চল ঝটপট চল—পুরীশহর পেছনে রেখে গাঁ-আবাদ পার হয়ে শেষ অবধি পথও ফুরিয়ে গেল। আর কত দূর বাবা?

চল চল, ঝটপট চল— বেলা দু পহরের হাঁপ ওঠা তেপান্তর মাঠের কিনারাতে ডালপাতা-বোঝাই এক মহীরুহগাছের নীচে থেমে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস পড়ছে তখন রয়ে রয়ে—ফকির বললেন, যা আর কষ্ট দোবো না, ওই নিচু ডালের সাত-গোটা পাতা ছিঁড়ে নে, যা কাল ঘুম

ভেঙে ভোরে সাত রানি যেন সাত-গোটা পাতা খায় জলস্পর্শ করবার আগে। অন্যথা না হয়।

রাজা ফিরলেন। সাত রানির সাত মহলায় তখুনি পৌঁছে গেল সাত গোটা পাতা. উষা-সকালে শয্যা ছেড়ে পাতা হাতে নিতে গিয়ে ছোটোরানি কেবল দেখেন পাতার আধখানা ইঁদুরে খেয়ে গেছে—ও মা গো— চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও মুখের আওয়াজ মুখে রয়ে যায়—রাজা জানলে রক্ষে নেই। সেই ইঁদুরে-খাওয়া আধখানা পাতাই ভক্তি করে পাঁচ পিরের নাম করে খেলেন রানি।

সময় পুরলে সাত ছেলে হল সাত রানির। ফুটফুটে রাজপুত্তুর সব। ছোটোরানির ছেলেটা শুধু এই এক ফোঁট্রা। নিমকুনি।

হোক, তবু তো ছেলে।

বছর যায়। তরতরিয়ে বাড়তে থাকে রাজপুত্রেরা। তবকতরোয়াল খুলে ঘোড়া দাপিয়ে ছুটে বেড়ায়। নিমকুনিকে রাজা এনে দিলেন তাগড়া-তোগড়া এক কাবলি বেড়াল, চড়ে বেড়াবার, তাতেই খুশি। দাদাদের পিছু পিছু ঘুরছে সব সময়, মন জোগাতে—কিছুতে তুষ্টি হয় না, এমনি সব দাদা। তা হোক। সবাই চলেছে বনশিকারে। ও-ও যাবে না কি আমাদের সঙ্গে? ওই নিমকুনিটা? বড়োদাদা ধমক দিয়ে ওঠে, এই, তুই যে এলি বড়ো? দিব্যি দেখি ঘুরঘুরোস যে পায়ে পায়ে? ওরে নিমকুনিটার রকম দেখ।

চড়িভাতি হবে বনের ভেতর। কানাত খাটাতে কেউ নেই—ওরে নিমকুনি, অকম্মার ধাড়ি, তাঁবুর খুঁটোগুনো পোঁত না বসে না-থেকে। তোকে দিয়ে কি কিচ্ছু হবে না? তাই সই। যদ্দুর পারে গুছিয়ে-সাজিয়ে খুঁটো গাড়তে বসে যায় নিমকুনি, আর পেছন থেকে হাততালি বাজিয়ে ঠাট্টা হাসি হাসতে থাকে দুটো দুটো বড়ো ভাই দাদা— নিমকুনি মিমকুনি ঝিমকুনি নিমকুনি— চোখে জল এসে যায় নিমকুনির।

যাক গে যাক। ওখানকারটা সেখানে এখানকারটা ওখানে গুছিয়ে-সাজিয়ে তাঁবুর ঝিলিমিলি সরিয়ে বের হয়ে এসে দেখে দাদারা চলে গেছে।

খরা বালির ঝড় দিচ্ছে চোখেমুখে। দিক গে। কাবলি বেড়ালে চেপে নিমকুনি চলতে থাকে ঘোড়াখুরের দাগ ছাপা রাস্তায়।

কী তাত। তাকে ছেড়ে চড়াই-নিচাই ভেঙে ছ ভাই চলে ঝিমিয়ে টিমিয়ে—আহা, নিমকুনিটা যদি থাকত, বললেই যেমনি পারুক ঠিক এনে দিত সর্দা-খরবুজ—

খরবুজ খাবে দাদা? উঁচু ঘোড়ার চার পা-র তলা দিয়ে অভয় পেয়ে বের হয়ে এসেছে নিমকুনি। ও মা! অবাক বড়োদাদা মেজোদাদা সব্বাই—তা চাস তো আন—

কে জানে কোত্থেকে, দু দন্ড না যেতে ঠান্ডা ফলের বোঝা চাপিয়ে ঠমকে ঠমকে ফিরছে দেখে নিমকুনি—কোথায় পেলি তরতাজা ফল অত? হুমড়ি দিয়ে পড়ে ছ ভাই। আঃ! কী ফল রে, খেয়ে প্রাণটা শীতল হয়।

তো যা এবারে ফিরে যা। কোথায় যাবি মিছিমিছি পায়ে জড়িয়ে।

দেখিছিস রে, নিমকুনির বেড়াল-ঘোড়া? টগবগ টগবগ—নিমকুনিকে পাল্লা ছুটে নিয়েসেছে আমাদের পক্ষীরাজের বরাবর। বাব্বা! ওরে নিমকুনি—

এক দাদা হাততালি বাজাতে শুরু করেছে এর ভেতরে জিরিয়ে সুতর হয়ে—নিমকুনি মিমকুনি ঝিমকুনি....

চোখ ছলছল করে ওঠে নিমকুনির।

ছ ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা চলে গেল। ধুলোর ঘোর তুলে চোখের আড়াল হয়ে যেতে নিমকুনি আবার চাপলে তার বেড়াল-ঘোড়ায়। কাবলি ঘোড়া, বল দিকি যাব, কি, না—

যাবে না কেন, আমি আছি।

ততক্ষণে ওরা চলে গেছে অনেক রাস্তা। নিমকুনি লাগ পেলে না।

সন্ধের ঝোঁকে খরা মাঠের ভেতর দেখে একা একখানা বাড়ি, যেন ভুঁইফোঁড়া ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়ে। এমনিখানে বাড়ি, তো এ বাড়ি তবে অন্য কারও, নির্ঘাত। দেখে দোরগোড়ায় আলো ছম ছম করছে—বুকটা ধক্ করে ওঠে চাইলে—

ভোর হয়ে এসেছে। এক দিকে অদিশ-বিদিশ ধুলোপাথরের রুখু মাঠ, আর এই বাড়িখানা। ঢুকব, কি, না—

ঢোকো না, যাও।

বাড়িমুখো এগিয়ে গেল নিমকুনি।

এদিকে দাদারা তার তখন সেই বাড়িরই এক ঘরে সব বশ হয়ে বসে আছে একত্তরে, ডাইনির মায়ায়। বাড়িখানা দেখে কুক্ষণে দোরগোড়ায় মুখ বাড়িয়েছিল, শোনে মেয়ে গলায় বলছে কে ভেতর থেকে, আহা বাছারা মুখ শুকিয়ে গেছিস, কে রে তোরা?

তো ঘরে আয়। এ দেশে সাঁঝের পরে কেউ বাইরে থাকে আলগা? জানিস নে তোরা কিচ্ছু? কোন্ দেশে ঘর?

ঘরে ঢুকে দেখে, দিব্বি ঘর। আইমার ধারা মেয়েমানুষ একজন, এগিয়ে এসে তাদের বসতে দিলে। যত্ন করে খেতে দিলে অবজোশ-খেজুর—

ওই বেশ।

বেশ না হোক, এই অজন পুরীতে আর কী পাব রে। যা বাছা এবারে একটু গড়াগড়ি দিয়ে নে ওই ঘরটায়। কত বড়ো রাত—

ঘরে ঢুকে— যেন পাথর-বাড়ি পড়ল বুকে। ও মা গো—ছালমাস ছাড়ানো সুদ্ধ কঙ্কালের দুখানা হাতে পাটি মেলেছে ও কার হাত। চেঁচাতে গিয়েও গলায় সাড় নেই—

ততক্ষণে সব্বাইকে ঝটিৎ ঘরে পুরে বাইরে থেকে সে কুলুপ দিয়ে দিয়েছে— ভেতরে চেঁচাতে গিয়েও কারও গলায় রা ওঠে না। আহা, এমনি কালে যদি থাকত নিমকুনি ভাইটা। ও ঠিক একটা উপায় করত। ঠিক— ভাবতে ভাবতে শোনে— ওরে, ওই না নিমকুনির গলা—

আইমা গো—

কে রে বাছা!

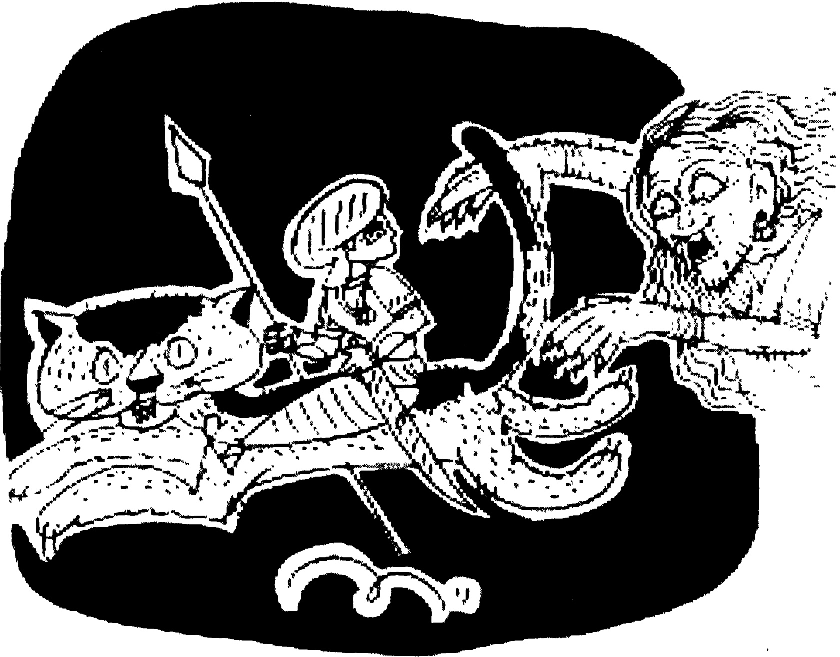
বিদেশি। ঠাঁই দেবে? থাকব রাতটুকু?

আয়, আয়। থাক না। এই রাতে কেউ বাইরে কাটায় হেথা আলগা! জানিস নে কিছু? কোন্ দেশে ঘর?

তো নে, দুটো খেজুর-মেজুর গালে ফেলে রাতটুকু কাটিয়ে যা, আর কী করবি।

খাব তো, কিন্তু একটুখানি নদীর জল না খেলে যে আমার খেতে নেই কিছু।

নদীর জল পাব কোথা বাছা এই রাতে!



কেন, ওই যে দেখে এলুম হোথায়!

রাতের বেলায় আর দিক করিস নে, দুটো কিছু গালে ফেলে শো গিয়ে রাতটুকুর মতন—

না গো আই, নদীর জল না খেয়ে আমার খাওয়াও নেই, শোয়াও নাই গো, এই আমার নিয়ম।

তবে র' দিকি নিয়্যাসি— বলে ঘড়াটা নিয়েছে টান দিয়ে, সে তো আর জানে না তার নীচে কখন ঝাঁঝরা ফুটো করে রেখেছে নিমকুনি !

ডাইনি যেতেই এক টানে হুড়কো-কুলুপ খুলে ফেলে ডাক দিয়ে উঠেছে নিমকুনি— পালাও দাদারা পালাও, একখুনি পালাও—

ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে চড়ে নিমিষের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে ছ ভাইয়ে।

নিমকুনির সহায় বলতে তো সেই কাবলি বেড়াল। টগবগ টগবগ— যত পারে সেও যায় পেছন ধরে, কিন্তু সে আর কতই বা।

এদিকে ডাইনির আর জল ভরা হয় না ঘড়াতে। ভরবে কি, সে তো শত ছিদ্রি ঘড়া। দুত্তোরি ছাই! বলে সে শূন্য ঘড়া বয়েই ফিরে এসেছে ধন্দ মনে— ও মা! ভোঁ ভাঁ সব এদিকে। তাই বলি— মুখের গরাস আমার—কেড়ে নিয়ে পালাবি কে রে! লাল জিভটা বের হয়ে আসে মুখ দিয়ে, উঃ! আমার সঙ্গে চালাকি? বাঁচবি পালিয়ে? কষ-কালো ঝড়ের বেগে তখুনি সে ছুটল ধাওয়া করে—

ছ ভাই ছুটেছে আগে আগে। মাঝামাঝি আপ্রাণ ছুটেছে নিমকুনির বেড়াল— খানিক না যেতে ডাইনি ধরে ফেলল বেড়ালের পাল্লা— ওরে নিমকুনি— পালিয়ে বাঁচবি আমার হাত থেকে—

গাছতলার এক গর্তগুহা পেয়ে তারই ভেতর ঝটিৎ নেবে পড়েছে বেড়াল সেই মুহূর্তে, ডাইনি আগলে গর্ত—ওরে নিমকুনি! গর্তে সেঁদিয়ে বাঁচবি আমার হাত থেকে—

নিমকুনি গর্তের মুখ দিয়ে বের করে দিয়েছে কাঠি-খোঁচার মতো তার সে সোয়ার চাবুক ছপটি চাবুক—হাতে ধরতেই আগুনপোড়া—উ হু হু হু হু হু আগুন জ্বেলেছিস? তাইতে বাঁচবি?

নিমকুনি গর্তের মুখ দিয়ে বের করে দিয়েছে খোলা-শমশেরখানা—হাতে ধরতে হাত কেটে দুখানা—উ হু হু হু হু হু হাত কাটলি? তাইতে বাঁচবি?

নিমকুনি গর্তের মুখ দিয়ে বের করে দিয়েছে খেলা-তরোয়ালের এইটুকু সে বেঁকা চোখা খাপ, কামড় দিয়ে ধরতে অমনি মাথা ফুঁড়ে গেল সোজা—উ হু হু রে—পুরো চিৎকার ডাকার আগেই ডাইনি মরে পড়ল গর্তগুহার মুখে।

তখন ওপরে উঠে, দু দণ্ড জিরিয়ে, তারপর ঠমকে ঠমকে ফের চলল নিমকুনি।

ও মা! দেখে ছ ভাই সার দিয়ে দাঁড়িয়ে সিংফটকের গোড়ায়, সে যেতেই তাকে জড়িয়ে কাঁধে তুলে নিল বড়োদাদা, তারপর পালা করে মেজোদাদা সেজোদাদা রাঙাদাদা সব দাদারা— ওরে নিমকুনি, নিমকুনি ভাই, তুই আমাদের জান বাঁচিয়েছিস—

রাজা এসে বুকে নিয়েছেন নিমকুনিকে।

রাজ্যের লোকে কাতার দিয়ে এসেছে—ও মা, ওই অতটুকু এক রত্তি ছেলে— ও নাকি একা একা চলে গেছে কূ-পাহাড় পার হয়ে আরো আরো দূরে—না কি ডাইনি-রাক্ষস নিপাত করে এসেছে একা হাতে—

সে কথা আজও বলে রাজ্যের লোক মিলে।

ছবি। সুব্রত মাজী



আদাম এবং দারখানে

উজ্জ্বল সিংহ

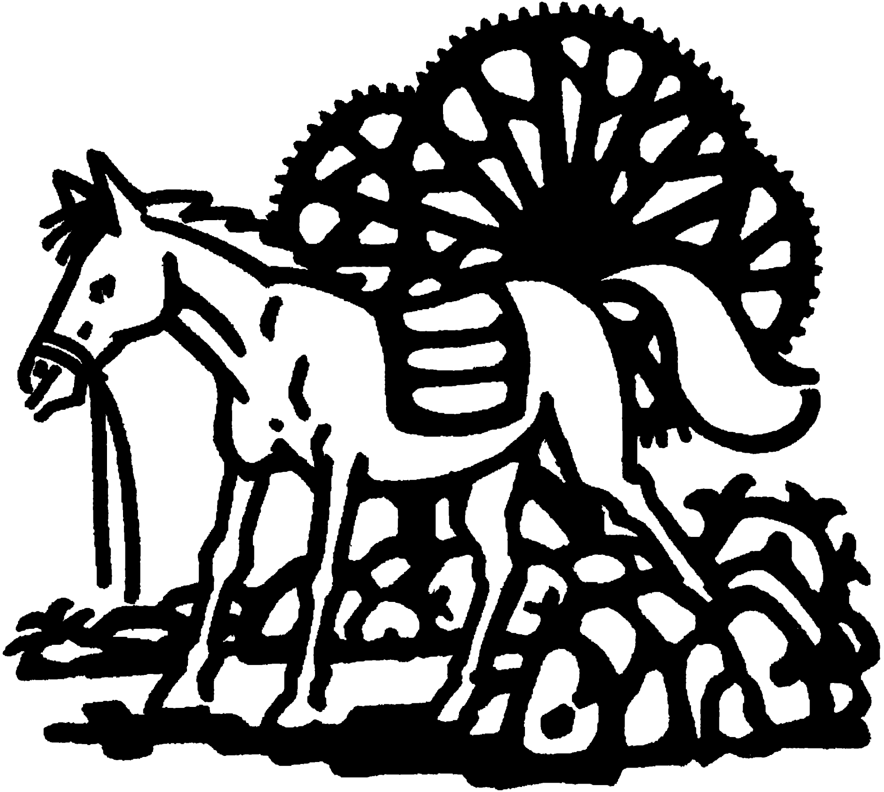
উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তান জুড়ে বিস্তৃত হিন্দুকুশ পর্বতমালাব শৈলশিরার মধ্যেই একস্থানে সোয়াট উপত্যকা। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও বিরল প্রজাতির ফুলের সমাবেশ সেখানে। বসন্তকালে দূরের পর্বতচূড়ার উজ্জ্বল বরফের পটভূমিকায় ফুলের ঝলমলে রঙের বন্যায় প্রকৃতি যেন ভেসে যায়। বুনো নার্সিসাসের উগ্র সুগন্ধে বাতাস ভারী হয়ে থাকে। লাল লাল পপিফুলের উপর উড়ে বেড়ায় রং-বেরঙের প্রাণচঞ্চল প্রজাপতি। গাছে গাছে নতুন পাতা। পাখিদের কলরব। জঙ্গল অধ্যুষিত পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে এঁকেবেঁকে বয়ে যায় নদী। তার নীল জলে পাহাড়ের ছায়া। প্রকৃতির উচ্ছ্বাস যেন ফেটে পড়ছে চারদিকে।

বহুযুগ ধরে সেখানে ইয়ুসুফজাই নামে এক শ্রেণির পাঠানদের বসবাস। যেমন তাদের বীরত্ব ও লড়াকু মনোভাব, তেমনই তাদের হৃদয়ের উষ্ণতা। সেখানকারই এক গ্রামে ওই জাতের পাঠানবংশীয় এক অভিজাত ব্যক্তি হাসান খানের বাড়ি। তাঁরই ছেলে আদাম খান। কুড়ি বছর বয়সেই সে এমন রবাব (একরকম বীণা) বাজাত, লোকে মুগ্ধ হয়ে যেত তা শুনে। বুদ্ধিমান ও সুদর্শন আদামের রক্তে ছিল পূর্বকদের সব গুণ। ওরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে বড়ো হওয়ার ফলে তার রক্তে ছিল প্রকৃতির প্রতি গাঢ় অনুরাগ। পাঠানদের প্রচলিত নানা গানের সুরে ঝংকৃত হত

তার রবাব, বিষাদ ও বেদনা যেন ঝরে পড়ত তার তারে তারে। আদাম ছিল একজন নিপুণ অশ্বারোহীও। হাসান খান তাই পুত্রগর্বে গর্বিত ছিলেন।

ঘোড়ায় চড়ে উপত্যকার দূর-দূরান্তে ঘুরে বেড়াত আদাম। সঙ্গে থাকত প্রিয় রবাব। ঘোড়া দাঁড় করিয়ে নির্জনে কোথাও তার পিঠে বসে একমনে সে বাজিয়ে যেত তার প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। দূরে কারও কানে সে সুরের মায়াবী অনুরণন পৌঁছে গেলে সব কাজ ফেলে তারা শুনত সেই সুর।

একদিন পাহাড়ি পথে দুপুরবেলা আদামের প্রিয় ঘোড়াটির একটি পা পাথরের খাঁজে আটকে গেল। আদাম ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটির পা বহু কষ্টে খাঁজের গর্ত থেকে বের করে দেখল, খুরের নালটা নেই। নাল ছাড়া তো চলবে না। এদিকে তার বাড়ি তখন সেখান থেকে বহু ক্রোশ



দূরে। সে কোনোক্রমে হেঁটে হেঁটে ঘোড়াটিকে সযত্নে ধরে ধরে কাছাকাছি একটা গ্রামে নিয়ে গেল খুব কষ্ট করে। প্রতিটি গ্রামেই থাকত একটি করে কামারশালা। কারণ, ঘোড়াই সেখানে একমাত্র বাহন। তার খুরে নাল লাগানোর জীবিকায় যুক্ত থাকত বহু লোক। আদামও জিজ্ঞেস করে করে কামায়শালায় পৌঁছোল। কামার জানাল, একটু দেরি হবে, সে একটা কাজে হাত দিয়েছে। সেটা

শেষ করেই নালটা লাগিয়ে দেবে'খন। আদাম কী আর করবে, একটা গাছের ছায়ায় খাটিয়ায় বসে হাতে তুলে নিল রবাবখানা। পাঠানদের জনপ্রিয় একটা লোকগানের সুর ছিল তার খুব প্রিয়। বড়ো বেদনার সেই গান। আদাম ভাবল, যতক্ষণ না তার কাজ শেষ হচ্ছে, সে তার প্রিয় গান বাজিয়ে যাবে। ব্যাস, দুটি চোখ বন্ধ করে শুরু হল তার রবাববাদন। যেই-না চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল সেই সুরের মায়া, চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যত লোকজন ছিল, সব একে-একে জড়ো হতে থাকল সেখানে। কারও চোখে জল, কেউ-বা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আদামের সেসবে খেয়াল নেই, সে একমনে বাজিয়েই চলেছে। গাছের পাখিরাও যেন গান ভুলে শুনছে সেই সুর।

সে-গ্রামে ছিলেন তায়ুশ খান নামে এক পাঠান, ধনী ও প্রতিপত্তিশালী। তাঁর একটি মেয়ে ছিল, দারখানে তার নাম। মেয়েকে তিনি প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতেন। মেয়েকে শিক্ষায়, দীক্ষায় গৃহকর্মে সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। ষোলো-বছর বয়সেই সে-মেয়ের রূপ চোখে-পড়ার মতো। দারখানেও তখন কামারশালায় আসছিল তার চরকার টাকুতে শান দিতে। তারও কানে পৌঁছেছিল এই বিষাদের গান। ভিড়ের এক কোণে দাঁড়িয়ে সে-ও মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে থাকল ওই বাজনা। খাটিয়ায় বসা যুবকটিকে দেখে তার মনে হল, সে-বুঝি এই দুনিয়ার কেউ নয়, দেবদূত হয়তো।

নাল লাগানো শেষ করে আলতো করে আদামের পিঠে হাত রাখল কামারশালের মিস্ত্রি। ঘুম থেকে যেন জেগে উঠল আদাম। রবাব গুছিয়ে উঠতে যাবে সে, হঠাৎ কালো বোরখা-পরা একটি মেয়ের দিকে চোখ পড়ল তার। মেয়েটিকে খুব দুঃখী মনে হল তার, দুটি কাজল কালো চোখে কী বিষাদ। চোখাচোখি হতেই মেয়েটি দ্রুতপায়ে কামারশালে ঢুকে পড়ল। আদামও উঠে পড়ল, মিস্ত্রিকে আশাতীত পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় নিল।

এক নজরেই তার মনে হল, মেয়েটি যেন রূপকথার রাজকন্যা। আদাম মনে মনে ঠিক করল, ওকেই সে বিয়ে করবে। বাড়ি ফিরে একদিন বাবাকে সে জানাল সে-কথা। ছেলের উপর খুব ভরসা ছিল হাসান খানের। তিনি জানতেন, ছেলের পছন্দ ভুল হওয়ার নয়। তাই তিনি দুই বিশ্বস্ত বন্ধু মীরো ও বালো-কে খোঁজখবর করতে বললেন। মীরো আবার আদামের বাবার বন্ধু হলে কী হবে, আদামকেও তিনি বন্ধুর মতোই ভালোবাসতেন। কারণ, তিনিও ছিলেন রবাবের ওস্তাদ। আদামের রবাব বাজানো শুনে তিনি ছেলেটির গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

মীরো আর বালো খুঁজে-খুঁজে সেই গ্রামে গিয়ে আয়ুশ খানের সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানালেন। আয়ুশ খান খুব খাতির করলেন তাঁদের। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানালেন, তাঁর মেয়ে দারখানের তো বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। পাত্র খুব ধনী, তার নাম পায়াও।

আদামের কানে যেই পৌঁছোল এই খবর, সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওদিকে, দারখানে ভাবল, যে-লোকটার সঙ্গে তার আগামী মাসে বিয়ে, তার একমাত্র যোগ্যতা সে ধনী। অথচ, এই দেবদূতের মতো গুণী ছেলেটিকে সে দেখেছে, তার বাজনা শুনেছে। তার সঙ্গে বিয়ে না-হলে বেঁচে থেকে আর কী লাভ!

নির্দিষ্ট দিনে বিয়ে হয়ে গেল দারখানের। খুব জাঁকজমক করে দারখানেকে বিয়ে করে বাড়ি

নিয়ে গেল পায়াও, তার ভাবখানা এমন, যেন টাকা থাকলে সব কিছু কেনা যায়। কিন্তু, দারখানের ইচ্ছা, আদামের সঙ্গেই তার বিয়ে হোক। তা তো হল না। আশাভঙ্গের বেদনায় বেচারা মেয়েটিও অসুস্থ হয়ে পড়ল।

হাসান খান তাঁর এক পুরনো বন্ধুকে গিয়ে জানালেন সব কথা। সে-লোকটি আবার এমনিতে ভয়ংকর প্রকৃতির। একটি উপজাতি গোষ্ঠীর দলনেতা তিনি, নাম মীরমাই। তাঁর ছিল নিজস্ব বাহিনী। হাসানের কাছে সব শুনে তিনি খুব রেগে গেলেন। বাহিনী নিয়ে পায়াও-এর বাড়ি গিয়ে জোর করে তুলে আনলেন দারখানেকে। এনে রাখলেন নিজের বাড়ির মহিলামহলে। পায়াও দেখল, গায়ের জোরে সে পারবে না। মীরামাইকে সে প্রচুর টাকা দিতে চাইল। অত টাকার লোভ মীরমাই সামলাতে পারল না। সে পায়াও-এর হাতে তুলে দিল দারখানেকে ফের।

ওদিকে, আদাম কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী শুনে দারখানেও অসুখে পড়ল। ডাক্তার বদ্যি সবাই বলল, আর বাঁচার আশা নেই। দারখানে তার স্বামী পায়াও-কে বলল, মরার আগে সে আর-একবার শুধু আদামের রবাবে সেদিনকার গানের সুরটি শুনে যেতে চায়। ভেতরে ভেতরে রাগ ও ঈর্ষা হলেও স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পায়াও খবর পাঠাল আদামের কাছে। আদাম তখন মৃত্যুশয্যায়। তার অনুরোধে মীরোকে পাঠানো হল দারখানেকে সেই বাজনা শোনাতে।

গভীর দরদ দিয়ে মীরো রবাবের সুর তুলল দারখানের বিছানার পাশে বসে। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে থাকল দারখানের। একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল সে। ওদিকে সেই মুহূর্তে আদামও যাত্রা করেছে পরলোকের পথে।

আজও আফগানিস্তানের রবাব-বাজিয়েরা সেই গানের সুর বাজিয়ে-বাজিয়ে স্মরণ করে দুই তরুণ-তরুণীর ভালোবাসাকে। তারা জানে, সেই ভালোবাসা তো আসলে ছিল সংগীতের প্রতি নিবেদিত।

গল্পটি পস্তু বা পাস্তো ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন জয়নাব গুলাম আব্বে। সেখান থেকে বাংলায়। পাস্তু বা পাস্তো হল গিয়ে আফগানিস্তানের প্রধান ভাষা, উচ্চারণ পুস্তু বা পুস্তো নয় কিন্তু। আমাদের যেমন রাজপুত্র- রাজকন্যার ভালোবাসা কিংবা বিচ্ছেদের গল্প নিয়ে রূপকথা, এ-গল্পটিও সেই ঘরানার।

ছবি। শঙ্কর বসাক



দিব্যজ্যোতি মজুমদার

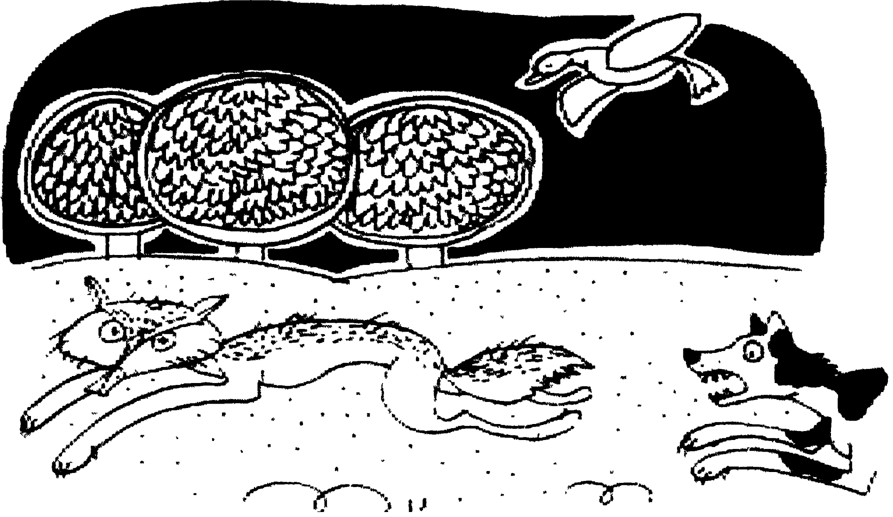
এক গাঁয়ের পাশে ছিল এক বন। ছোটো বন। সেই বনে থাকত একটা চকা আর একটা শেয়াল। তারা খুব বন্ধু। চকা হাঁসের মতো পাখি। গাছে গাছে থাকে। শেয়াল থাকে মাটিতে। গাছের নীচে বসে তারা গল্প করে। দুজন এধার ওধার গিয়ে খাবার খেয়ে দুপুরের রোদে ও সন্ধেবেলা বিশ্রাম নেয়। গল্পগুজব করে। সুখে তাদের দিন কাটে।

চকা সাদাসিধে পাখি। সবসময় আনন্দে থাকে। খারাপ চিন্তা করে না। কারও ক্ষতি করে না। আর শেয়ালের খালি দুষ্টুবুদ্ধি। সবসময় ফন্দি করে। অন্যকে ঠকিয়ে কী করে ভালো ভালো জিনিস খাবে তার জন্য ভাবে।

শেয়াল বলল, এমন কিছু করবে যাতে আমার হাসি পায়। বন্ধু হয়ে বন্ধুকে হাসাতে না পারলে আর ভাব-ভালোবাসা কীসের।

চারজন চাষি সরু পথে সার দিয়ে চলেছে। একজনের পেছনে অন্যজন। তারা গল্প করছে আর পথ হাঁটছে।

চকাকে কী করতে হবে শেয়াল বলে দিল। চকা ভালোমানুষ, অতশত বোঝে না। শেয়ালের পরামর্শে চকা পেছনের চাষির মাথায় এক টুকরো গরম কাঠ ফেলে দিল। চাষি



ভয় পেয়ে হাত নেড়ে চকার ডানায় আঘাত করল। চকার খুব লাগল। চকা লাফ দিয়ে উড়তে যাবে, পড়ল আর একজন চাষির মাথায়। চাষি হুমড়ি খেয়ে সামনের চাষির ওপরে পড়ল, সেও পড়ল আর এক চাষির ওপরে। চারজনেই পড়ে গিয়ে রেগে গেল। এ ওর দোষ দেয়, ঝগড়া বেধে গেল। ঝগড়া আর থামে না।

শেয়াল ঝোপে ঢুকে খুব হাসতে লাগল। —শাবাশ বন্ধু, বেশ কেমন মজা হল। চকা বন্ধুর কথায় এই কাজ করল, কিন্তু মনে মনে রেগে। তার এ কাজ পছন্দ নয়। খুব খারাপ লাগল। কিন্তু হাজার হলেও বন্ধু তো। কিছু বলল না। সেদিন শেয়াল চকাকে ভালোমন্দ খাওয়াল।

একটা ছোটো ছেলে আসছে। তার মাথায় একটা পুঁটলি। তাতে রয়েছে সবজি আর রুটি। বাবা মাঠে চাষ করছে, ছেলে বাবার জন্য দুপুরের খাবার নিয়ে যাচ্ছে।

শেয়াল তাড়াতাড়ি বন্ধু চকাকে ডাকল। কী করতে হবে শিখিয়ে দিল। চকা বোকা, কিছু না বুঝে শেয়ালের কথামতো কাজ করতে গেল।

ছেলেটি যে পথে আসছে কিছু দূরে রাস্তার ওপরে চকা শুয়ে পড়ল। ডানাদুটো দুপাশে ছড়িয়ে এমনভাবে উপুড় হয়ে পড়ে আছে যেন তার আঘাত লেগেছে। ডানাদুটো অল্প নড়ছে।

ছেলেটি কাছে এল। ভাবল, পাখিটা আহত হয়ে পড়ে আছে। সবজি-রুটির পুঁটলি পথে নামিয়ে এগিয়ে গেল। কাছে যেতেই চকা উড়ে গাছের ডালে বসল। ছেলে অবাক হয়ে সেই দিকে চেয়ে আছে।

চকা দেখল, শেয়াল ঝোপ থেকে বেরিয়ে পুঁটলি নিয়ে ঝোপে ঢুকে খেতে লাগল। চকার চোখে জল এল। আহা! ছেলেটি কাঁদছে। তার বাবা সেই সকাল থেকে মাঠে কাজ করছে। কতই না খিদে পেয়েছে! তারও খাওয়া হবে না। চকা এবার খুব রেগে গেল। বুঝল, বোকা পেয়ে শেয়াল তাকে যত আজেবাজে কাজ করাচ্ছে। একে কি বন্ধু বলে?

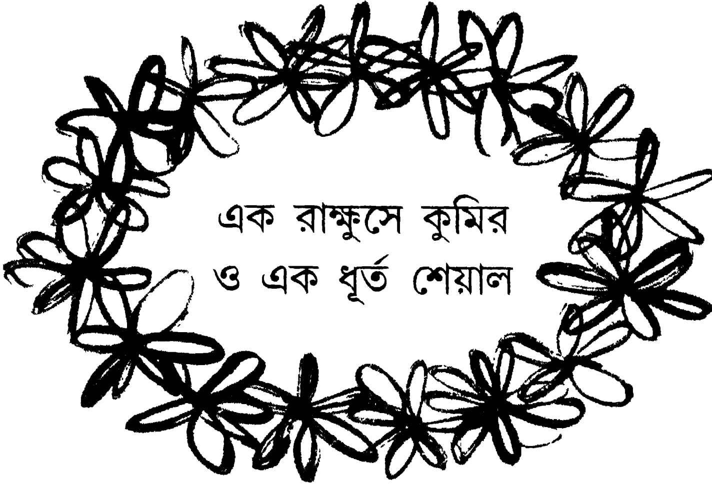
একদিন শেয়াল গিয়েছে দূরের বনে। শিকার ধরতে। চকা দেখে রাস্তা দিয়ে একটা কুকুর যাচ্ছে। তাকে সে ডেকে আনল। বাড়িতে যা ছিল পেট পুরে খাওয়াল। এরপরে কী করতে হবে বলে দিল।

কুকুর একটা ঘন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইল। ওই তো শেয়াল আসছে। মুখে একটা বুনো মুরগি। গুহার কাছে আসতেই কুকুর চিৎকার করে তেড়ে গেল। শেয়াল মুখ থেকে মুরগি ফেলে পালাতে গেল। কুকুরের দাঁত এসে পড়ল শেয়ালের পেছনের পায়ে। তারপরে কামড়ে তাকে প্রায় আধমরা করে ফেলল। আর না। চকা মেরে ফেলতে মানা করেছে।

শেয়াল শুয়ে শুয়ে আধমরা অবস্থায় কুঁই কুঁই করতে লাগল। নড়াচড়ার শক্তি নেই। বুনো মুরগিকে দাঁতে চেপে কুকুর যে পথে এসেছিল সেই পথে চলে গেল।

চকা উড়ে উড়ে অন্য বনে চলে গেল। এমন নিষ্ঠুর বন্ধুর কাছে আর সে থাকতে চায় না।

ছবি। সুব্রত মাজী



এক রাক্ষুসে কুমির ও এক ধূর্ত শেয়াল

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

এক দেশে ছিল এক রাক্ষুসে কুমির। গ্রামের পাশে এক জলাশয়ে সে দাপিয়ে বেড়াত। বড়ো বড়ো রুই কাতলা গপাৎ গপাৎ গিলে খেত। পশুপাখিরা তার ভয়ে জলাশয়ের ধারেকাছে আসত না। এমনকি ছোটো ছেলেমেয়েরা তো বটেই বড়োরাও সেই জলাশয়ের জলে পা রাখত না। গ্রামবাসীদের কাছে সে হয়ে উঠেছিল সাক্ষাৎ যম।

একবার খুব খরা দেখা দিল। কাঠফাটা রোদ্দুর, ছিটেফোঁটা বৃষ্টির দেখা নেই। দিনের পর দিন এমন চলতে চলতে জলাশয়ের জল শুকিয়ে যেতে লাগল। একদিন সব জল শুকিয়ে মাটি ফুটিফাটা হল। কুমির পথের ধারে মড়ার মতো শুয়ে থাকে। দিবারাত্র তার কান্নাভেজা গলা শোনা যায়, 'জল, একটু জল......।'

ওর এই করুণ অবস্থা দেখে গ্রামের লোকরা বেশ খুশিই হল। দূরে দাঁড়িয়ে তারা মজা দেখত, বাচ্চারা হাততালি দিয়ে হাসাহাসি করত। কুমির মিনতি করে বলত, 'ওহে গ্রামের দয়ালু মানুষেরা, তোমরা আমার কষ্ট দেখে হাসছ? তোমাদের একটু দয়ামায়া নেই? এই গরমে জল বিনা আমি মরতে বসেছি, দোহাই তোমাদের, —আমি আর তোমাদের ধরে খাব না, আমাকে একটা নতুন দিঘির খোঁজ দাও—দয়া করো।'

—'না, না, পাগল নাকি আমরা?' —একসুরে বলে উঠল সবাই, 'বরং আমরা বেজায় খুশি তোমার এই দশা দেখে। যখন আমাদের গোরু-বাছুর, হাঁস-মুরগি—এমনকি ছোটো ছেলেপুলেদের ধরে জলের নীচে নিয়ে গিয়েছ তখন একথা মনে ছিল না? গুড বাই কুমিরভায়া তোমাকে কোনওভাবেই সাহায্য করতে পারব না।'

একথা বলে গ্রামের মানুষেরা নিশ্চিন্ত হয়ে যে যার কাজে চলে গেল।

কুমির আর কী করবে, চুপচাপ শুয়ে রইল। একটু পরে দুপুর রোদে ঘেমেনেয়ে এক বুড়োমানুষ সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে নিরীহ কুমিরকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

কুমির কাতর হয়ে বলল, 'ওহে দরবেশবাবা আমাকে রক্ষা করুন, আমি যে আর থাকতে পারছি না। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। পেটে দানাপানি পড়েনি অনেকদিন। আমাকে যদি আপনি একটা নতুন দিঘির সন্ধান দিতে পারেন তো প্রাণটা বাঁচে। এমন একটা ভালো কাজ করলে আপনার মঙ্গল হবে।'

কুমিরের কথা শুনে বুড়ো বলল, 'না বাপু, তোমায় বিশ্বাস নেই। যেমন কর্ম তেমন ফল তোমাকে ভোগ করতে তো হবেই ভায়া।'

কুমির অনুনয়-বিনয় করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। হাতজোড় করে বলল, 'আর আমি গোরুবাছুর ধরব না, ছেলেমেয়েরা জলে চান করতে নামলেও কিছু করব না—ওদের পিঠে নিয়ে সাঁতার কাটব—এই আমার বাবার দিব্যি দিলাম।'

বুড়োর দয়ার শরীর, কান্নাকাটি করতে দেখলে মন গলে যায়। সে বলল, 'বেশ বেশ, এবার কান্না থামাও—আমার পিছন পিছন এসো, আমি তোমাকে একটা ঝিলে নিয়ে যাব যেখানকার জল কোনও দিন শুকোবে না।'

বুড়োর পিছনে পিছনে কুমির চলতে চলতে একটা বেশ বড়োসড়ো দিঘির পাড়ে পৌঁছে গেল। কাছেই এমন একটা জলাশয় আছে কুমির জানত না। আনন্দে সে প্রায় চিৎকার করতে যাচ্ছিল, কোনও মতে নিজেকে সামলে সে ধীরে ধীরে দিঘির জলে নেমে পড়ল। আঃ কী ঠান্ডা জল। কয়েকটা ডুব দিয়ে শরীরটা জুড়োল, ভুস করে ভেসে উঠে বুড়োকে বলল, 'দরবেশবাবা, জলে নেমে একটু মুখ হাত ধুয়ে নিন, ভালো লাগবে।'

কুমিরের কথায় বুড়ো খুশি হল। তাই তো গরমে বড্ড কষ্ট হচ্ছে, একটু ঘাড়ে-পিঠে জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলে মন্দ হয় না। বুড়ো যে-ই জলে পা দিয়েছে অমনি দুষ্টু কুমির এক থাবা দিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরল।

—'এ কী, এ কী, কী করছ কুমিরভায়া, ছিঃ পায়ে হাত দেয় না।' অবাক হয়ে বুড়ো বলল।

—'সে কী!' বলল কুমির, 'জলে নেমে আমার শরীরটা ঠান্ডা হল; অনেকদিন পেটে কিছু পড়েনি, বাগে পেয়ে আপনাকে ছেড়ে দিই কী করে? আপনাকে দিয়ে দারুণ একটা ভূরিভোজ হবে—'

—'তুমি একটা ভয়ংকর বাজে লোক, অকৃতজ্ঞ, জংলি ব্রুট। এভাবেই কি তুমি আমার

উপকারের প্রতিদান দিতে চাও?'

কুমির কোনও কথা বলল না, শুধু চকচকে লোভী চোখে বুড়োর দিকে তাকিয়ে থাকল।

দূরে শেয়ালকে আসতে দেখে সে বলল, 'বেশ ওই যে শেয়ালপণ্ডিত আসছেন, তিনি যদি তোমার কথায় সায় দেন তবে আমি আর আপত্তি করব না।'

কুমির ভাবল, খাদ্য ধরেছি আমি, শেয়াল নিশ্চয় তাকে ছেড়ে দিতে বলবে না। কুমির বলল, 'বেশ তাই হবে, ডাকো তোমার পণ্ডিতকে।'

ততক্ষণে শেয়াল সেখানে এসেছে। বুড়োর মুখে সব কথা শুনে শেয়াল বুঝেছে কুমির বড়োই অন্যায় করতে চলেছে। তাই সে মাথা নাড়িয়ে বিজ্ঞের মতো বলল, 'সবাই জানে আমি কাজি হিসেবে খুবই নিরপেক্ষ। তবে রায় দেবার আগে আমাকে সব দিক খতিয়ে দেখতে হবে। সেজন্য কোন্ জায়গা থেকে তুমি কুমিরকে এখানে নিয়ে এসেছ, তাও নিজের চোখে দেখা দরকার।'

শেয়ালের কথা কুমিরের খুব মনে ধরেছে। সে বুড়োর পা ছেড়ে ডাঙায় উঠে এল। তারপর ওরা তিনজনে ফিরে গেল শুকিয়ে ফুটিফাটা জলাশয়ের কাছে।

শেয়াল বলল, 'এবার আমাকে সঠিক জায়গাটা দেখাও যেখানে তুমি কুমিরকে প্রথম দেখেছিলে।'

কুমির বলল, 'আমি নিজে সেখানে গিয়ে দেখাচ্ছি।' এই বলে কুমির জলাশয়ের ধারে পৌঁছে বলল, 'ঠিক এইখানে।'

শেয়াল বলল, 'এবার আমি সব দিক ভেবে বিচার করে আমার হুকুম জানাব।'

কুমিরের জিভে তখন জল এসে গেছে, সে লোভী চোখদুটো মেলে বুড়োর শরীর দেখতে লেগেছে।

শেয়াল বুড়োর কানে কানে ফিস ফিস করে বলল, 'জনাব, তুমি আস্ত একটা আকাট মূর্খ, কীসের জন্য তুমি একটা রাক্ষুসে ধূর্ত কুমিরকে সাহায্য করতে গেলে? যদি বাঁচতে চাও তো তুমি উত্তর দিকে দৌড় লাগাও, আর আমি দক্ষিণে.....।'

কথা শেষ না করেই শেয়ালভায়া নিমেষে চোখের বাইরে চলে গেল। আর বুড়ো মানুষটা? সে হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে দৌড়োতে দৌড়োতে গ্রামের সীমানা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুমির নিজেকে খুব চালাক-চতুর মনে করে, এভাবে তাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে পাজি শেয়ালটা? সে নিজের মনে বলল, 'আমি তো ওই দিঘিতে পথ চিনে ফিরে যেতে পারব। একদিন-না-একদিন শয়তান শেয়ালটাকে বাগে পেয়ে যাব। তখন ওকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।'

দুপুর গড়িয়ে সন্ধে নেমেছে। কুমির ততক্ষণে হামাগুড়ি দিতে দিতে দিঘির ধারে এসেছে। দিঘির চারধারে বড়ো বড়ো গাছপালা আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। তাদের মোটাসোটা শিকড়বাকড় জলের ভিতর নরম মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে কুমির বাসা বানিয়ে

সুখেই দিন কাটাতে লাগল। শিকড়বাকড়ের সঙ্গে সেখানে সে এমনভাবে মিশে থাকে যে ডাঙা থেকে তাকে দেখা যায় না।

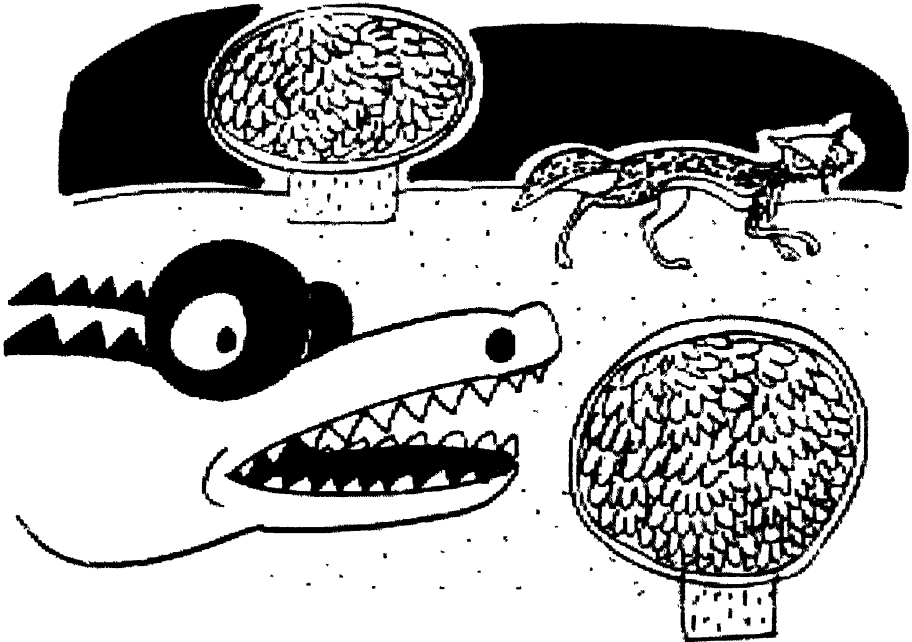
একদিন অবশেষে শেয়াল এসেছে দিঘির ধারে। জলে ডুবে থাকা গাছের গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে যেই সে একটা কাঁকড়া ধরতে গিয়েছে অমনি কুমির তার পা ধরে ফেলেছে। ধূর্ত শেয়াল তখনই বুঝতে পারল কুমির তাকে ধরেছে। সে হেসে বলে উঠল, 'হায় রে বোকা কুমির, নিজেকে কি খুব চালাক ভেবেছ তুমি? আমার পা ভেবে একটা গাছের শেকড় ধরলে শেষে?'

তাই তো, সে কী না শেয়ালের পা না ধরে একটা শেকড় আঁকড়ে ধরেছে? তখনই সে তার মুঠো আলগা করল, আর দেরি না করে শেয়াল এক লাফে ডাঙায়।

আবার শেয়াল কুমিরকে বোকা বানাল? কুমির আর কী করে, শুধু ভাবছে কীভাবে শেয়ালকে জব্দ করা যায়। একটা উপায় খুঁজে বের করতেই হবে তাকে।

হঠাৎ তার চোখে পড়ল এক রাশ পাকা ফল জলে ভাসছে। এই ফল শেয়ালের খুব প্রিয়। শেয়াল নিশ্চয় আবার আসবে এই ফলের লোভে।

একদিন রাত্রে কুমির ফলগুলো জড়ো করে একটা ঢিবি বানাল। তার ভিতর সে লুকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে শেয়াল ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসেছে। এতগুলো পাকা ফল একসঙ্গে



দেখে শেয়ালের জিভে জল এল। চোখ আনন্দে চকচক করে উঠল। খুব সাবধানে এগোতে গিয়ে শেয়াল দেখল জলে ভাসছে দুটি চোখ, চাঁদের আলো পড়ে ঝকমক করছে। ওদুটি চোখ নিশ্চয় কুমিরের। সে মুচকি হেসে বলল, 'ওহে ফন্দিবাজ কুমির, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। বিদায় বন্ধু।' বলেই সে ছুটে পালাল।

কুমির বুঝল, এভাবে শেয়ালকে ঠকানো যাবে না। সে মনে মনে বলল, 'শেয়ালটা খুবই চতুর। সহজে ওকে বাগে আনা যাবে না। অন্য কোনও একজনকে দিয়ে ফাঁদ পাততে হবে।'

একদিন এক চাষাভুষো লোককে যেতে দেখে কুমির নরম নরম গলায় বলল, 'তোমাকে আমি অনেক সোনাদানা দেব, বছরের পর বছর কত মানুষ আল্লার নামে দিঘির জলে সোনার গয়না, হিরের নেকলেস বিসর্জন দিয়ে আসছে। তার কিছু তোমাকে আমি উপহার দেব যদি তুমি শেয়ালব্যাটাকে ধরে দিতে পার।'

চাষাভুষো লোকটা ভাবল, বাঃ এত সহজেই বড়োলোক হওয়া যায়। আনন্দে হাততালি দিতে যাচ্ছিল, নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'এ আর এমন কী কঠিন কাজ। আমি এখনই যাচ্ছি শেয়ালকে ধরে আনতে।'

একথা বলে চাষি সেই রাত্রেই চলে গেল জঙ্গলের ধারে যেখানে শেয়াল থাকে। তারপর মড়ার মতো নিথর শুয়ে রইল সেখানে।

ঘোরাফেরা করতে করতে শেয়াল এসেছে। একটা লোককে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে সে খুশি হল খুব, ভাবল, আহা, বেশ কয়েকদিনের খাবারের জোগাড় হয়ে গেল দেখছি। আবার হঠাৎ মনে সন্দেহ উঁকি দিল, এটা আবার কুমিরের নতুন কোনো ফন্দি নয় তো। তাই সে বুদ্ধি করে বলল, 'আরে একটা জ্যান্ত মানুষ এভাবে পড়ে আছে কেন? এটা সত্যি সত্যি একটা মড়ামানুষ হলে তো ওর পা নড়ত।'

শেয়াল কৌশল করে তাড়াতাড়ি এমন ভাবে কথাগুলো বলল যে চাষাভুষো লোকটা ভাবার সময় পেল না। সে মরে গেছে—এটা প্রমাণ করতে বোকা লোকটা তার পা-দুটো নাড়তে লাগল।

শেয়াল তখন মজা পেয়েছে খুব, হেসে বলল, 'বাঃ চমৎকার, আমাকে বন্দি করবার আর একটা ফন্দি মাঠে মারা গেল দেখছি। বিদায়।' বলেই সে দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল।

চাষাভুষো লোকটা আর কী করবে, গা হাত-পা ঝাড়া দিয়ে বাড়ির পথ ধরল। যেতে যেতে ভাবল, শেয়ালটার দারুণ বুদ্ধি, ওকে সহজে জব্দ করা যাবে না। একটা নতুন কোনো উপায় বের করতে হবে।

বাড়িতে এসে ভাবতে ভাবতে সে একটা উপায় খুঁজে পেয়েছে। মোম দিয়ে একটা পুতুল তৈরি করল। বনের ধারে গিয়ে একটা গর্ত খুঁড়ল, সেখানে পুতুলটা রেখে লতাপাতা দিয়ে গর্তটা ঢেকে দিল। তারপর লোকটা একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল।

প্রতিদিনের মতো আজও সন্ধ্যা নেমে এলে শেয়াল খাবারের খোঁজে বন থেকে বেরিয়ে এসেছে। গর্তের দিকে চোখ পড়তেই সে ভাবল, সদ্য কেউ কিছু একটা মড়া পুঁতে রেখেছে।

দেখি ভোজটা কেমন হয়।

শেয়াল তার সামনের দুটি পা দিয়ে গর্তের উপর আঁচড়াতে লেগেছে, হঠাৎ তার একটা থাবা মোমের পুতুলের গায়ে আটকে গেছে। শত চেষ্টা করেও পা-টা ছাড়াতে পারল না। বরং তার চারটে পা জড়িয়ে গেল মোমের পুতুলে।

তখনই গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাষাভুষো লোকটা। খুশি খুশি মুখ, চোখে উজ্জ্বল আলো তার। বলল সে, 'অবশেষে তোমাকে আমি বন্দি করতে পেরেছি হে মূর্খ শেয়াল, নিজেকে খুব বুদ্ধিমান চালাক চতুর ভাব তো।'

শেয়াল জানে এখন আর চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না, চিৎকার চ্যাঁচামেচিতেও বিশেষ সুবিধা হবে না। তাই সে বলল, 'তুমি নিশ্চয় জানো যে, আমি শেয়ালদের বাদশা। এখনই আমি হুক্কাহুয়া হাঁক দিলে বনের যত শেয়াল আছে সক্কলে এখানে হাজির হয়ে তোমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে। তুমি কি তাই চাও?'

—'আরে রেগে যাচ্ছ কেন ভায়া, আমাকে কী করতে হবে সেটা তো বললে না।'

—'এখনই যাও, নিয়ে এসো তেল, আমার সারা গায়ে তা মাখিয়ে দেবে। সঙ্গে আনবে একটা মোরগ, একটু দূরে ছোট্ট গাছের গুঁড়িতে সেটাকে বেঁধে রাখবে। সঙ্গে করে আরও আনবে দুজন লোককে। আমার দু-ধারে দুটি কুড়ুল নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে থাকবে। কেন জান? আমি পালাতে চেষ্টা করলে ওরা আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে।'

শেয়ালের কথামতো আয়োজন শেষ করে চাষাভুষো লোকটা তেলের পাত্র নিয়ে বসল। শেয়ালের সারা গায়ে ভালো করে তেল মাখিয়ে জবজবে ভিজিয়ে দিল। তবে শেয়ালের তেলে-ভেজানো ডান পাটা তার বাঁ হাত দিয়ে ধরে রাখতে ভুল করল না। সুযোগ বুঝে নিরীহ শেয়াল পালটে গেল ধূর্ত শেয়ালে। হঠাৎই সে এক লাফে চাষাভুষো লোকটার হাত ছাড়িয়ে দুই পাহারাদারের পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছলে পালিয়ে গেল। ওরা কুড়ুল দিয়ে নিজেদের পায়েই কোপ বসিয়ে দিয়েছে।

শেয়াল পিছন দিকে না তাকিয়ে গাছে বাঁধা মোরগটাকে মুখে করে নিয়ে চলে গেল বনের ভিতরে। আজ দিনটা বেশ ভালো কাটল শেয়ালের।

ছবি। সুব্রত মাজী



বিবির বুদ্ধি

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

কোনও এক সময়ে এক দেশে গরিব এক কৃষক ছিল। আর ছিল তার বিবি। এক-এক দিন তাদের দু-মুঠো খাবারও জোটে না। এমন দুঃখের দিনে বিবির কোল আলো করে এক সোনার টুকরো ছেলে এল।

বিবি বলল, 'এখন আর কুঁড়ে হয়ে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। চাষবাসে ভালো করে মন দাও।'

বিবির কথায় কৃষক বেজায় খুশি। ভোর হতে-না-হতে ছেলের চাঁদমুখ দেখে সে চলে যায় জমিতে। সারাদিন রৌদ্র-জলে আবাদের কাজ, সন্ধ্যায় ফিরে আসে নিজের কুঁড়েঘরে। তারপর দানাপানি যা থাকে খেয়েদেয়ে সে ঘুম যায়।

কী আশ্চর্য, অল্পদিনেই তাদের কষ্টের দিন শেষ হল। মাঠভরা ফসল সোনা হয়ে ফিরে এল কৃষকের ঘরে। দেখতে দেখতে কুঁড়েঘর প্রাসাদ হল। ধনদৌলত, লোকলশকর গোরু-বাছুর সব হল। আর সেই ছোট্ট সোনার চাঁদ ছেলে? সে দিনে দিনে বড়ো হয়ে উঠল।

একদিন বিবি বলল, 'ছেলে ঘরে আসার পরেই আমাদের এই বাড়বাড়ন্ত। এবার ছেলের শাদির কথা ভাববে না?'

তাই তো। একথা তো তার মনে হয়নি এতদিন। বিবির কথা কৃষকের খুব মনে ধরেছে। সে বলল, 'এখনও ছেলের শাদির বয়স হয়নি, তবু এখন থেকেই খোঁজখবর নিতে হবে। আমাদের ছেলের জন্য তো যে-সে ঘরের যেমন-তেমন দুলহন হলে চলবে না। অবশ্যই চাই জমিদার বাড়ির কন্যা।'

একটুও দেরি না করে কৃষক হুকুম জারি করল, 'যে যে-দিকে পারো এখুনি চলে যাও। ছেলের জন্য দুলহন খুঁজে আনো।'

বাড়িতে হইচই পড়ে গেল। কেউ চলল উত্তরে, কেউ দক্ষিণে, একদল ছুটল পশ্চিমে, অন্যরা পুবদিকে। অনেক খোঁজাখুজির পর এক ইমানদার জমিদারের বাড়িতে দেখা মিলল সেই কন্যার। তার গায়ের রং দুধ-আলতা, একঢাল কালো চুল তার মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, তার চোখের পল্লব যেন দুটি আধফোটা চাঁপাফুল।

খবর পেয়ে কৃষক গেল সেই জমিদারের বাড়ি। মেয়েকে দেখে সে খুব খুশি। বলল, 'আপনার মেয়েকে আমি আমার ছেলের দুলহন রূপে পেতে চাই।'

জমিদারও খুশি মনে সম্মতি জানাল। শাদির পাকা কথা হয়ে গেল।

কৃষকের বাড়িতে পানচিনির দাওয়াতে এল বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন-পাড়াপড়শি। সে কী ধুমধাম, হইহুল্লোড়-খানাপিনা। এখনই এমন উৎসব, শাদির সময় কী বিশাল আয়োজন হবে এই নিয়ে নানা আলোচনা চলল বেশ কিছুদিন।

মানুষ যা ভাবে তা সবসময় ফলে না। ছেলে যখন কৈশোর পেরিয়েছে সবে, তখন হঠাৎ কৃষক চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে। এই খবর পেয়ে জমিদার খুব দুঃখ পেল। বলল, 'আমাদের দুলহা এখন একা হয়ে গেল। ওকে এখানে এনে রাখলে কেমন হয়?'

জমিদারের বিবি বলল, 'সে কী কথা, ওর আম্মা আছে না। তা ছাড়া দুলহা আমাদের বড়ো হয়েছে, শাদি করে আমাদের মেয়েকে সে নিয়ে যাক নিজের বাড়ি।'

জমিদার বলল, 'বেশ তাই হবে। এখুনি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি ওদের বাড়ি।'

কিছুদিন পর জমিদারের বাড়ি থেকে খবর পেয়ে কৃষকের ছেলে জমকালো সাজপোশাকে তার প্রিয় ঘোড়ায় চড়ে চলল জমিদারের বাড়ি। যেতে যেতে সে এল এক নির্জন জঙ্গলের ভিতর। হঠাৎ সামনে তার চোখে পড়ল এক বেজি আর এক ভয়ংকর বড়ো সাপের লড়াই। সেই ভীষণ যুদ্ধ থামাতে সে বহুরকম চেষ্টা করল। শেষে তার তলোয়ার দিয়ে এক কোপ দিতেই বেচারা বেজি দু-টুকরো হয়ে লুটিয়ে পড়ল। সে মনে মনে বলল, 'আমি কাউকেই আঘাত করতে চাইনি, শুধু চেয়েছিলাম ওদের থামাতে।'

কী আর করা যাবে, ছেলেটি তখন আবার এগিয়ে যেতে লাগল। এমন সময় পিছন থেকে এক ঝটকায় তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিল সাপ। তারপর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল তাকে।

সে বলল, 'এ কী। তোমার প্রাণ বাঁচালাম, আর তুমি কি না আমাকে মারতে চাইছ?'

'হ্যাঁ, সত্যি সত্যি তুমি আমাকে ওই দুষ্টু বেজির হাত থেকে রক্ষা করেছ', বলল সাপ,



'তবু তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না। তোমাকে আমি খাব।'

'তাই নাকি?' অবাক হয়ে বলল সে, 'একটা ভালো কাজ করলে তার বদলে ভালো কিছু আশা করা যায়। আমি তোমার ভালো করেছি বলে কি তুমি আমাকে মেরে ফেলবে? আমাদের সমাজে এমন আজব কথা কেউ কখনও শোনেনি।'

'আমাদের এই বনে ঠিক উলটো প্রথা চলে আসছে,' বলল সাপ, 'কেউ কারোর উপকার করলে তাকে কঠিন সাজা পেতে হয়।'

এই নিয়ে দু-জনের মধ্যে তর্ক বেধে গেল। কিন্তু কোনও কিছুতেই সাপ তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হল না। তখন ছেলেটি বলল, 'বেশ, তা হলে আমার একটা অনুরোধ রাখবে? আমার সাত-আট দিন সময় চাই। একটা জরুরি কাজ আছে। সেটা শেষ করেই আমি এখানে ফিরে আসব।'

সাপ একটু ভেবে বলল, 'এ আর এমন কথা কী, তোমাকে আমি আট দিন সময় দিলাম। এর মধ্যে অবশ্যই তোমাকে ফিরে আসতে হবে।'

এ কথা বলে সাপ তার বাঁধন খুলে দিল। ছেলেটি তখন পাশে দাঁড়ানো তার প্রিয় টাট্টু ঘোড়ার পিঠে গিয়ে বসল এবং সে একসময়ে পৌঁছে গেল তার দুলহনের বাড়ি। তাকে দেখে সবাই আনন্দে নেচে উঠল। তার শাদি হল, তবে বিশেষ হইহুল্লোড় হল না। যেমন-

তেমন করে মৌলবি তাদের শাদি দিলেন।

ছেলেটির মন ভালো নেই। গোমড়া মুখে থাকে, মুখে এতটুকু হাসি নেই। প্রতিদিনই কেউ না কেউ জিজ্ঞেস করেছে এর কারণ। তবু তার মুখে একটি কথাও নেই। সপ্তম দিনে জমিদার তার আদরের মেয়েকে বলল, 'কী হয়েছে মা, ও সবসময় এমন মুখ কালো করে বসে থাকে কেন? আমাদের কি কোনো গুনাহ্ হয়েছে?'

'জানি না আব্বাজান। আমিও একই কথা বারবার জিজ্ঞেস করেছি। কোনো উত্তর পাইনি।' বলল মেয়ে।

পরদিন ভোরবেলা ছেলেটি বলল, 'আজ আমাকে চলে যেতে হবে।'

সবাই ভাবল, এজন্যই তার মুখ ভার হয়েছে। যাক, ভয়ের কিছু নেই। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল জমিদার আর তার বিবি।

দেরি না করে তখনই ওদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার সব আয়োজন করা হল। একটি গোরুর গাড়িতে দানসামগ্রী সাজিয়ে দেওয়া হল। দুলহা-দুলহনকে নিয়ে চলল গোরুর গাড়ি। পিছনে কয়েকজন নফর আর তার টাট্টু ঘোড়া। একটু দূরে গিয়ে ছেলেটি গাড়ি থামিয়ে বলল, 'আমি নেমে যাচ্ছি, তোমরা ফিরে যাও তোমাদের বাড়িতে। আমি ঘোড়ায় চড়ে বনের দিকে যাব। সেখানে আমার জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করছে।'

নফররা ভয় পেয়ে ফিরে যেতে পা বাড়াল। কিন্তু দুলহন বলল, 'আমি কোনোমতেই ফিরে যাব না, তোমার সঙ্গে যাব। তোমার যা দশা হবে, আমারও তাই হবে। তোমার যদি কিছু হয় আমি ফিরে গিয়ে একা একা কী করব!'

দুলহন কিছুতেই কৃষকের ছেলের কথা শুনল না। সে তার জেদ বজায় রাখল। ছেলেটি তখন গোরুর গাড়ি থেকে নেমে বিবিকে নিয়ে টাট্টুঘোড়ায় চেপে বনের পথে চলল। নফররা গোরুর গাড়ি নিয়ে ফিরে গেল তাদের বাড়িতে।

বনপথে যেতে যেতে সাপ আর নেউল যেখানে লড়াই করছিল সেখানে এসে ছেলেটি থামাল তার ঘোড়াকে। ঘোড়া থেকে নেমে সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'এই যে আমি এসেছি এখানে। আমার কথা রেখেছি, তুমি এসে আমাকে মেরে ফেলতে পারো।'

একথা শুনে তার বিবিও ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল তার পাশে। হিস হিস করতে করতে সাপ গাছপালার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। সাপের ভয়ংকর চেহারা দেখে বিবি ভয় পেল খুব। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'এই বেচারা ছেলেকে তুমি কোন অপরাধে মারতে চাও?'

তখন সাপ সব ঘটনা বলল। বলল, 'আমাদের এখানে ভালো কাজ করলে তাকে শাস্তি পেতে হয়।'

বিবি জিজ্ঞেস করল, 'কেন এই অদ্ভুত নিয়ম? এই নিয়মের পিছনের কাহিনি আমি জানতে চাই।'

'ওই যে পাঁচটি চন্দন বৃক্ষ দেখছ, ওদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, এখানে কেউ

কারোর ভালো করলে তার বিনিময়ে শাস্তি পায়।' বলল সাপ।

ওরা দুজন চন্দনগাছেদের কাছে গেল। বিবি চিৎকার করে জানতে চাইল, 'তোমরা কি আমাদের বলতে পারো, এখানে কেন ভালো কাজের জন্য শাস্তি পেতে হয়?'

নববধূর সাজে ছোট্ট মেয়েটির প্রশ্নের উত্তরে সবচেয়ে বুড়ো যে গাছটি সে বলল, 'দেখছ তো আমরা এখন পাঁচটি গাছ—ছিলাম ছ-জন। আমাদের মাঝে যে ফাঁকা জায়গা দেখছ সেখানে ছিল আমাদের সবচেয়ে প্রিয় গাছ। সে ছিল বেশ মোটা, নাদুসনুদুস। তবে তার গোড়াটা ছিল ফাঁপা—একটা গভীর সুড়ঙ্গ যেন। সেই সুড়ঙ্গপথে ঢোকার মতো একটা গর্তও ছিল। তোমরা দুজনে একসঙ্গে সেই সুড়ঙ্গে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারবে।' এই বলে সে একটি গল্প বলল তাদের :

অনেক অনেক দিন আগে কোনও এক সময়ে এক চোর একটা বাড়িতে ঢুকে চুরি করতে গিয়ে প্রায় ধরা পড়ে যাচ্ছিল। সেই বাড়ির লোকজনের তাড়া খেয়ে সে কোনওভাবে পালিয়ে এসে ওই গাছের সুড়ঙ্গে লুকিয়ে পড়ল। তাকে যারা ধরতে আসছিল তাদের কথাবার্তা শুনে চোর ভয়ে থরথর কাঁপতে কাঁপতে গাছকে অনুরোধ করল, 'হে বৃক্ষরাজ, তুমি আমাকে রক্ষা করো।'

চোরের করুণ প্রার্থনায় গাছের মন গলে জল তখন। সে তার ডালপালা দিয়ে সুড়ঙ্গের মুখ ঢেকে দিল। লোকগুলো অনেক খোঁজাখুজি করেও চোরকে ধরতে না পেরে ফিরে গেছে দেখে চোর সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল।

এতক্ষণ চন্দনগাছের কোটরে ছিল, সে জন্য চোরের সারা দেহ সুগন্ধে মাখামাখি হয়েছে। কাদায় গড়াগড়ি খেয়ে, সরিষার খইল মেখে স্নান করেও এই সুগন্ধ তার দেহ থেকে গেল না। যেখানে সে যায় সেখানকার বাতাস চন্দনের সুবাসে ভরে যায়। আশপাশের লোকেরা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বলে, এর ঝোলাতে নিশ্চয় অনেক রকম সুগন্ধি আছে। এই লোকটা বোধ হয় সুগন্ধির মস্ত কারবারি। লোকের মুখে মুখে তার নাম শহরে ছড়িয়ে পড়ল। একদিন বাদশার কানেও পৌঁছোল তার কথা। তখনই বাদশা হুকুম দিলেন, 'যাও এক্ষুনি ধরে নিয়ে এসো লোকটাকে।'

বাদশার হুকুম বলে কথা, তখনই তাকে ধরে নিয়ে এসে হাজির করা হল বাদশার দরবারে। দরবার তখন চন্দনের সৌরভে ভরে উঠেছে। বাদশা চমকে গেলেন, সত্যিই তো এমন সুবাস তিনি কখনও পাননি।

বাদশা বললেন, 'তোমার কাছে কী সুগন্ধি আছে আমাকে দেখাও।'

চোর বলল, 'আমার কাছে তেমন কিছুই নেই হুজুর।'

বাদশা রেগে গেলেন, তবু শান্ত গলায় বললেন, 'তুমি যদি আমায় এমন সুগন্ধি দাও তোমায় আমি অনেক ধনদৌলত দেব। তা না হলে তোমাকে শূলে চড়াব।'

চোর খুব ভয় পেয়েছে বাদশার হুকুম শুনে। সে হাতজোড় করে বলল, 'হুজুর আমার আব্বাজান, দয়া করে আমাকে শূলে দেবেন না। আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলছি।' এই

বলে সে বাদশাকে সব কথা বলল।

বাদশা বললেন, 'বেশ, চলো, আমাকে নিয়ে চলো সেই আশ্চর্য গাছের কাছে।'

চোর চলেছে, তার পিছনে বাদশা, সঙ্গে সান্ত্রির দল। চন্দনবৃক্ষের কাছে নিয়ে গেল সে বাদশাকে।

বাদশা ফরমান জারি করে বললেন সান্ত্রিদের, 'যাও এখুনি ওই গাছটিকে কেটে টুকরো টুকরো করো। তারপর নিয়ে চলো আমার প্রাসাদে।'

বাদশার ফতোয়া শুনে চিৎকার করে বলল চন্দনবৃক্ষ, 'বাঃ, এ কেমন কাজির বিচার! আমি এক বিপন্ন মানুষকে বাঁচিয়েছি, তার প্রতিদানে আমার মৃত্যুর পরোয়ানা? এরপর থেকে এই জঙ্গলে নতুন কানুন জারি থাকবে, কেউ কারোর ভালো করলে তার শাস্তি হবে মৃত্যু।'

এই কাহিনি শুনে কৃষকের ছেলের বিবি প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও সে সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। সে বলল, 'আমি মেনে নিচ্ছি, এমনই এ দেশের কানুন। তবে যদি তোমাকে এই কানুন মানতেই হয় তবে প্রথমে আমাকে দিয়ে শুরু করো। আমার খসমকে তুমি আমার সামনে কোতল করবে—এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।'

কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। তার এমন করুণ দশা দেখে সাপের মনে খুব দুঃখ হল। সে বলল, 'না বহিন, তা হবার নয়। তুমি কোনও দিন আমার এতটুকু উপকারে আসোনি। অন্যদিকে আমার কোনও ক্ষতিও করোনি। এ কখনই হতে পারে না।'

'কিন্তু যদি তুমি আমার খসমকে হত্যা করো', বলল সে, 'তবে আমার কী হবে? তুমি নিজেই কবুল করলে যে আমি তোমার কোনও উপকার করিনি, তবে কেন তুমি আমাকে এমন শাস্তি দেবে?'

সত্যিই তো, বিনা কারণে সে মেয়েটিকে দুঃখের পথে ঠেলে দেবে কী ভাবে!

'দাঁড়াও আমি আসছি—' বলেই সাপ হিস্ হিস্ করতে করতে বনের গাছপালার ভিতর ঢুকে গেল। কৃষকের ছেলের পরিণাম তো ঠিকই হয়ে আছে, সে কথা ভাবতে ভাবতে সাপ নিজের বাসায় গিয়েছে। অল্প কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল। বিবির হাতে দুটি ম্যাজিক বড়ি দিয়ে বলল, 'এই নাও দুটি বড়ি। ও দুটি খেয়ে ফেলো, তুমি দুটি ছেলের জননী হবে। বড়ো হয়ে ওরা তোমার দেখাশোনা করবে—ওদের নিয়েই তোমার সময় কেটে যাবে।'

সে বড়িদুটি হাতে নিয়ে ভাবল, এই সাপের হাত থেকে যে করেই হোক তার খসমকে বাঁচাতে হবে। ফন্দি করে বলল, 'আনন্দের কথা, এই দুটি বড়ি থেকে আমি দুই ছেলের মা হব। কিন্তু কার ভরসায় আমি ওদের বড়ো করে তুলব?'

বিবির কথায় সাপ আবার ধন্দে পড়ল। তাই তো, ছোট্ট ছোট্ট দুটি সন্তান নিয়ে সে কীভাবে সংসার চালাবে। দুষ্টু লোকেরা ওদের অনিষ্ট করতে পারে। মেয়েরা আগে থেকেই অনেক কিছুই ভাবতে পারে। মনে মনে এইসব ভাবল সাপ। তারপর আবার সে তার গর্তে

ঢুকে আরও দুটি আশ্চর্য বটিকা তুলে আনল। ততক্ষণে বিবি আগের দুটো ম্যাজিক বড়ি তার আঁচলে বেঁধে রেখেছে।

সাপ বলল, 'এই নাও আরও দুটি ম্যাজিক বটিকা। এরা শত্রুর হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করবে। কেউ যদি তোমার কোনও ক্ষতি করার জন্য আসে তুমি তখন একটা বটিকা নিয়ে দু-আঙুলে ঘষতে থাকবে, ঘষার ফলে অল্প অল্প পাউডার বের হতে থাকবে, আর পাউডারের একটি কণাও যদি দুষ্ট লোকের গায়ে উড়ে পড়ে তো সে তখুনি ছাই হয়ে যাবে।'

সাপের কথা শুনে বিবির মনে একটা ফন্দি এল। যেন সে আনমনে একটি বটিকা দু-আঙুলে ধরে ঘষছে—এমন ভাব করে সে বলল, 'ওহে দয়ালু সর্পরাজ, তুমি কি এইভাবেই আমাকে বটিকা ঘষতে হবে বলছ?'

বলতে বলতে দু-আঙুলের মাঝের বটিকা যেই ঘষেছে অমনি এককণা পাউডার উড়ে গিয়ে পড়েছে সেই সাপের গায়ে, অমনি নিমেষে অতবড়ো দৈত্যটা একটা আঁকাবাঁকা দীর্ঘ ছাইয়ের রেখায় পরিণত হল।

এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে কৃষকের ছেলে দেখছিল তার বিবির কাণ্ড। সে হঠাৎ বলে উঠল, 'উঃ যা ভয় পেয়েছিলাম, এখন ওই রাক্ষুসে দৈত্যটার হাত থেকে বাঁচা গেল।'

বিবি বলল, 'দেখলে তো ভালো কারও করলে তার প্রতিদানে তুমি ভালো ফলই পাবে। তুমি একজনের জীবন বাঁচিয়ে ভালো কাজ করেছ, তার পুরস্কারও পেলে।'

তারপর? তারপর আবার কী, ওরা বাড়ি ফিরে এল। সেখানে তারা বেশ সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে লাগল।

ছবি। সুব্রত মাজী



পবিত্র সরকার

রাজা লাম নাগসেং রেগে আগুন হয়ে আছেন। রাগ আর কারও ওপর নয়, খোদ রাজকন্যা মেতো সেদানের ওপর। এমন রাগের কারণ কী? না আজ সকালেই তাঁর কানে এসেছে যে, রাজকন্যা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি বিয়ে করবেন না। কত কত দেশ থেকে কত কত রাজপুত্র এসেছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে, কিন্তু রাজকন্যা সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

মনে একরাশ রাগ আর বিরক্তি নিয়ে রাজা রাজকন্যাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন। রাজকন্যা ধীরে ধীরে নরম পায়ে ঘরে ঢুকতেই রাজা তাঁর দিকে রাগের চোখে তাকালেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি কোমল হয়ে এল। মাত্র পনেরো বছর ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি, কিন্তু কী অসামান্য সুন্দরী হয়ে উঠেছে তাঁর মেয়ে—যেন দেবীপ্রতিমার মতো। এই একরত্তি সোনার পুতুলকে কোন্ প্রাণে বকবেন তিনি? তবু হাজার হোক, বাবা তো, বাবার কর্তব্য তো তাঁকে করতেই হবে। মেয়ের বিয়ের বয়স হয়ে যাচ্ছে, এখন যদি সে বেঁকে বসে, সেটা তো বাবার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

তাই তিনি গলা একটু কঠোর করে জিজ্ঞেস করলেন, ''কন্যা, এ কী শুনি! কত দেশ-

দেশান্তর থেকে রাজপুত্ররা এল সোনাদানা রত্নমাণিক রেশম আর জরির পোশাক নিয়ে, তোমাকে বিয়ে করবে বলে, আর তুমি নাকি সবাইকে বলেছ তুমি বিয়ে করবে না?"

মেতো সেদান তার টলটলে চোখদুটি তুলে কোমল স্বরে বললেন, "কিন্তু বাবা, আপনিই তো আমাকে পাঠিয়েছেন গুরু লামা লানাংপা-র কাছে মহামতি বুদ্ধের ধর্ম শেখার জন্যে, পাঁচ বছর ধরে মন দিয়ে আমি তা শুনেছি, পাঠ করেছি। তাই আমি ঠিক করেছি আমি সন্ন্যাসিনী হব, মহামতি তথাগতের বাণী প্রচার করব।"

এ কথা শুনে রাজা লাম নাগসেং একেবারে নীরব হয়ে গেলেন। কী উত্তর দেবেন তিনি? মেয়ে স্বয়ং বুদ্ধের বাণী প্রচার করতে চায়, তাতে তো তিনি বাধা দিতে পারেন না। পরিবারের কোনো সন্তান যদি সন্ন্যাসের দীক্ষা নেয়, ভুটানে তার চেয়ে বড়ো গৌরবের কথা আর কিছু নেই। তবু তিনি ভাবলেন, একমাত্র সন্তান তাঁর, এমন সুন্দর মেয়ে, সে বিয়ে করবে না, তাও কি হয়?

তিনি একটু থেমে বললেন, "ঠিক আছে এখন যাও, পরে কথা বলব তোমার সঙ্গে।"

সে রাত্রে রাজকন্যা একটি স্বপ্ন দেখলেন। এক উজ্জ্বল রোদ-ঝলমল দিন, তিনি যেন একটি পাহাড় বেয়ে উঠছেন। হঠাৎ কী হল, সূর্য গেল কালো হয়ে আর একটা থিকথিকে ঘন কুয়াশা এসে তাঁকে ঢেকে ফেলল। রাজকন্যা দাঁড়িয়ে পড়লেন, হঠাৎ ভয়ে তাঁর সর্বশরীর কাঁপতে লাগল। তারপরে হঠাৎই আবার কুয়াশাটা মিলিয়ে গেল, সূর্য আগের মতো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল।

রাজকন্যা আবার উঠতে শুরু করলেন। সূর্য অস্তে গেল, রুপোলি আলো ছড়িয়ে চাঁদ উঠল। হঠাৎ চাঁদ রং বদলে একটা লাল আগুনের গোলা হয়ে উঠল, আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল আগেকার রুপোলি চেহারায়। আবার হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল, রাজকন্যা ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, চারদিকে দৈত্যদানবের অট্টহাসি আর হল্লা জেগে উঠল যেন। রাজকন্যা পর্বত থেকে দৌড়ে নামতে শুরু করলেন, তাঁর মনে হল পেছন থেকে দৈত্যদানবরা তাঁকে তাড়া করছে। ওই তারা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাদের লম্বা লম্বা নখ দিয়ে তাঁর মুখ ফালাফালা করে দিতে চাইছে, চোখ উপড়ে নিতে চাইছে। এমন সময় স্বপ্ন ভেঙে গেল, রাজকন্যা জেগে উঠলেন। তাঁর শরীরে তখনও ভয়ের কাঁপুনি।

এ কী ভয়ংকর স্বপ্ন, কেন এ স্বপ্ন দেখলেন তিনি? এ স্বপ্নের অর্থ কী?

সকালে মা রানি লামো দোলমার কাছে স্বপ্নের কথা খুলে বললেন রাজকন্যা। রানি গিয়ে রাজাকে জানালেন তা। রাজা সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলেন, এর সমাধান তাঁদের নিজেদের সাধ্যে নেই, গুরু লামা লানাংপার পরামর্শ নেওয়া দরকার।

রাজা, রানি, রাজকন্যা, রাজার পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কয়েকজন মন্ত্রী—সবাই রাজার মন্ত্রণাকক্ষে গিয়ে বসলেন। গুরু লামা লানাংপাও এলেন।

সেই সভার কাছে রাজকুমারী মেতো সেদান তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন।

গুরু লামা লানাংপা একাগ্রচিত্তে সমস্তটা শুনলেন। শুনে তিনি দুচোখ বন্ধ করলেন,



তারপর যেন মন্ত্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বা ঘুমের মধ্য থেকে কথা বলছেন সেইরকম যান্ত্রিক কণ্ঠে বলতে লাগলেন,—

'আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, রাজকন্যার জীবনে গভীর দুঃখ নেমে আসবে। তিনি যোগ্য স্বামী পাবেন, কিন্তু সে রাজকন্যাকে সুখ বা সম্মান কিছুই দেবে না। রাজকন্যা শান্তি পাবেন শুধু পরম সৌগত বুদ্ধের উপদেশ চিন্তায়। কিন্তু একদিন স্বামীর রাজ্যও 'তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে, তবেই তিনি এই জীবনের দুঃখকষ্ট-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন।''

শুনে সভার সকলেই 'হায় হায়' করে উঠল। রাজা ও রানি হতবাক হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁদের একমাত্র কন্যা, এমন সোনার পুতুলের জীবন দুঃখে কষ্টে কাটবে—এ তাঁরা

সইবেন কী করে? তাঁরা গুরুর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রভু, এই দুর্দৈব থেকে মেয়েকে রক্ষা করার কি কোনো পথ নেই?"

লামা কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "আমার ধ্যানে 'আমি' যা দেখেছি তাই তোমাদের বলছি। যা ঘটতে চলেছে তা বদলাবার সাধ্য আমার নেই।"

"মন্দিরে গিয়ে দেবতার কাছে কী প্রার্থনা করব? দৈববাণী চাইব?"

"যত যাই কর, একই উত্তর পাবে।" লামা বললেন।

যত দিন যায়, মা-বাবার কষ্ট তত বেড়ে চলে। কিন্তু তাঁদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা মেয়েকে বলতে তাঁদের ভরসা হয় না, কী জানি, হয়তো তা মেয়ের দুঃখকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। মা-বাবার কষ্ট দেখে মেতো সেদানেরও চোখে জল আসে, তারই কথা ভেবে তো তাঁদের এমন দুঃখ। শেষে একদিন রাজকন্যা বলেই ফেললেন, "ঠিক আছে, আমি বিয়ে করব। তোমরা সুপাত্রের সন্ধান করো।"

রাজা ও রানি একথা শুনে প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গেলেন। তাতেও যদি মেয়ের ভালো না হয়। তারপর ভাবলেন, যা হয় হোক, মেয়ে যখন, বিয়ে তো দিতেই হবে। না হয় সারাক্ষণ প্রাসাদে বসে বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানাব, শত সন্ন্যাসীকে দিয়ে বুদ্ধের বাণী পাঠ করাব মেয়ের মঙ্গলের জন্য।

একদিন মহা ধুমধামে তিব্বতের তা ফুং-এর রাজা দাওয়া নরবু-র সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

নিজের সংসারে গিয়ে রাজকন্যা, সহজেই গুছিয়ে বসলেন। সংসারের কাজের ফাঁকে তিনি ডাকতেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের, তাঁদের কাছে নিয়মিত ধর্মকথা শুনতেন।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। রাজকন্যার নিজের মনে কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু তাঁর স্বামীর মনে অসন্তোষ, তাঁদের কোনো সন্তান হল না। স্ত্রীর ধর্মচর্চা আর পাঠে মন আর তাতেই পরম শান্তি দেখে তাঁর রাগ আরও বেড়ে যায়।

শেষে একদিন ধৈর্য রাখতে না পেরে তিনি বলেই ফেললেন, "সাত-সাতটা বছর কেটে গেল, তোমার কোনো সন্তান হল না। পুত্র না হলে আমার এ রাজত্ব কাকে দিয়ে যাব? আর তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই, কাল সকালে এই রাজ্য তুমি ছেড়ে যাবে।"

যখন রাজা কথাগুলো বলছিলেন তখন পাত্রমিত্র সভাসদরা সামনে দাঁড়িয়ে, রাজকন্যা তাতে আরও আঘাত পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা স্থির করলেন, এ রাজ্যে তিনি আর থাকবেন না।

পরদিন ভোরবেলায় সূর্য না উঠতেই রানি মেতো সেদান নিজের বিশ্বাসী দাসী ইয়াং গেনমাকে নিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। জানি না লোকমুখে কীভাবে খবরটা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, দেখলেন হাজার হাজার প্রজা প্রাসাদের প্রাঙ্গণে এসে তাঁকে বিদায় জানাবার জন্যে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। রানি আর তার দাসী যখন প্রাসাদের সীমা ছাড়িয়ে রাস্তায় পা দিলেন তখন বিশাল জনতার মধ্যে থেকে একটা চাপা কান্না উঠে আকাশ ভরিয়ে দিল।

আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে দাসীর সঙ্গে রানি এগিয়ে চললেন। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে তারা এক পর্বতের পাদদেশে ঘন জঙ্গলের ধারে এসে পৌঁছোলেন। জঙ্গলটার ধার ঘেঁষে তারা পর্বতের অন্য প্রান্তে পৌঁছোলেন, দেখলেন পর্বত থেকে প্রবল ঝরনার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে জলস্রোত, নেমে সেটি বিশাল এক নদী হয়ে নীচের গভীর খাত দিয়ে বয়ে চলেছে।

রানি মেতো সেদান এবার দাসীকে বললেন, ‘‘এখানে তোমার পথ শেষ, তুমি এবার ফিরে যাবে। প্রাসাদে ফিরে যাও। নতুন রানি যিনি আসবেন যত্ন করে আমারই মতো তাঁর সেবা কোরো, তিনিও তোমাকে আদর করবেন। পৃথিবীতে আমার আর চাইবার কিছু নেই। যা আমার শেষ চাওয়া, তা আমি এবার পেতে চলেছি।’’

ইয়াং গেনমা কাঁদছিল, সে রানির কথা শুনে কিছু বলবার আগেই দেখল স্বর্গ থেকে অজস্র ফুল এসে পড়ছে রানি মেতো সেদানের উপর, আর আকাশে ফুটে উঠেছে এক সাতরঙের বিশাল ইন্দ্রধনু। আর সেই রামধনুর ওপরে নাচছে অসংখ্য রুপোলি আবছায়ার মেঘপরির দল, তারা যেন রানি মেতো সেদানকে হাতছানি দিয়ে বলছে, ‘‘এসো এসো, আমাদের দেশে এসো, আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।’’

রানির মুখচোখ এক আনন্দের আভায় পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি দুই হাত ছড়িয়ে সেই গভীর অতল নদীতে ঝাঁপ দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মেঘপরিরা এসে তাঁকে শূন্য থেকেই তুলে নিল, আর উড়তে উড়তে আকাশের প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

ছবি। শঙ্কর বসাক



ইঁদুরের দেশ

সুজিত হালদার

অনেককাল আগেকার কথা। সেইসময় এমন একটা দেশ ছিল, যে দেশে ছিল অসংখ্য ইঁদুর। শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে, লাখো লাখো, কোটি কোটি ইঁদুর বাস করত সেই দেশে। ওই দেশে খাদ্যশস্য, শাক-সবজি, আনাজপাতির ফলন খুব ভালো। সেকারণে মানুষ ও ইঁদুর—কারোর খাবারের কোনও অভাব ছিল না, আজও নেই।

কিন্তু সবদিন তো সমান যায় না! একবার হল কী, সে-বছর ফসলের ফলন ভালো হল না। মানুষের খাদ্যে টানাটানি পড়ার আশঙ্কা দেখা দিল। চাষিরা খুব যত্ন করে সব ফসল তুলে নিয়ে গেল যে যার বাড়িতে। অন্য বছর মাঠে ঘাটে—খেতে খামারে কিছু কিছু খাদ্যশস্য ও আনাজপাতি পড়ে থাকত। আর ইঁদুররা দলে দলে সেইসব খাবার সংগ্রহ করে রাখত শীত ও বর্ষার মরশুমের জন্য। কিন্তু এবছর সেসব হল না। ইঁদুরদের তো মাথায় হাত!

অবশেষে সে দেশের সমস্ত ইঁদুর একজোট হয়ে গেল তাদের রাজার কাছে। ইঁদুরদের রাজা বলল, 'ভয় নেই, প্রয়োজনে আমি এই দেশের মানুষ-রাজার কাছে যাব। শুনেছি রাজামশাই খুব ভালোমানুষ।'

যে কথা সেই কাজ। ইঁদুরদের রাজা একটা শুভদিন দেখে ভালোমতো সাজগোজ করে,

মাথায় রঙিন পাগড়ি বেঁধে চলল রাজবাড়িতে। রাজাকে উপহার দেওয়ার জন্য একটুকরো রেশমি কাপড় নিল—এটাই এদেশের নিয়ম।

রাজপ্রাসাদের প্রহরী ইঁদুরকে এমন সাজগোজ করে আসতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবে?'

ইঁদুরদের রাজা উত্তর দিল, 'আমি ইঁদুরদের রাজা, মানুষ-রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ইঁদুর-রাজের কথায় প্রহরী অবাক হল। প্রহরী খবর পাঠাল রাজদরবারে। ইঁদুররাজের আগমনের খবর পেয়ে রাজামশাই তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলেন।

রাজদরবারে ঢুকে ইঁদুরদের রাজা প্রথমে একটু ভয় পেয়ে থমকে গেল। রাজা বসে আছেন সোনার সিংহাসনে। দু'পাশে ও সামনে মন্ত্রী, সেনাপতি, পণ্ডিত ও গণমান্য সভাসদরা বসে আছেন। ইঁদুর-রাজ দেশের রাজাকে নমস্কার জানিয়ে একটুকরো রেশমি কাপড় উপহার দিল। ইঁদুর-রাজের ব্যবহারে রাজা এবং রাজসভার সবাই খুব খুশি।

রাজামশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইঁদুর-রাজ কী কারণে আমার কাছে এসেছ?'

ইঁদুর-রাজ বিনীতভাবে উত্তর দিল, 'মহারাজ, এবছর ভালো ফসল হয়নি। শাক-সবজি, আনাজপাতির ফলনও ভালো হয়নি। আপনারা, মানুষেরা সবকিছু খুব যত্ন করে যে যার খাবার মজুত করেছেন। কিন্তু, আমরা ইঁদুরেরা কোথায় যাব? বর্ষা ও শীতের মরশুমে আমরা না খেয়ে মারা যাব। আপনাকে এর একটা বিহিত করার জন্য প্রার্থনা জানাই। আমরা আগামী বছর ফসলের মরশুমে সুদে-আসলে সব শোধ করে দেব। আমরা আপনার এই উপকারের কথা চিরদিন মনে রাখব।'

ইঁদুর-রাজের সব কথা শুনে রাজামশাই একটু হাসলেন। রাজামশাই বললেন, 'ঠিক আছে, আমার ভাণ্ডারে অনেক বার্লি গাছের মূল আছে। এক গোলা বার্লি তোমাদের জন্য বরাদ্দ করলাম। কিন্তু তোমরা এত বার্লি নিয়ে যাবে কেমন করে?'

ইঁদুর-রাজ বলল, 'সে আমাদের ব্যাপার। আমরা সব ঠিকঠাক নিয়ে যাব। আমাদের অভাবের সময় আপনার এই সাহায্য চিরদিন মনে থাকবে, ধন্যবাদ!'

রাজামশাইয়ের আদেশ পেয়েই ইঁদুর-রাজ ইঁদুর-প্রজাদের হুকুম করল রাজার গোলা থেকে বার্লি আনার জন্য। ইঁদুর-রাজের আদেশে হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি ইঁদুর এক রাতের মধ্যে সব বার্লি নিয়ে এসে নিজেদের বাসায় রেখে দিল। শীত ও বর্ষার মরশুমে খাবারের চিন্তা রইল না ইঁদুরদের।

পরের বছর ফসলের মরশুমে ভালো ফসল হল সে দেশে। ইঁদুর-রাজ কথামতো সুদে-আসলে সব বার্লি শোধ করে দিল মানুষ-রাজাকে।

তারপর হল কী, এক প্রতিবেশী দেশের রাজা এই দেশকে দখল করার জন্য আক্রমণ করল। দু'দেশের মধ্যে একটা ছোট্ট নদী। নদীর ওপারে তারা অনেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাঁবু ফেলল। এপারের রাজামশাই পড়লেন মহাবিপদে। কেননা, ওপারের রাজার অনেক বেশি সৈন্য, অনেক বেশি তির-ধনুক, অনেক বেশি অস্ত্রশস্ত্র।

রাজামশাইয়ের চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না। তিনি ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করছেন না। কী করবেন বা করবেন না তা ঠিক করতে পারছেন না, এমন সময় এগিয়ে এল ইঁদুরদের রাজা। ইঁদুর-রাজ বলল, 'রাজামশাই আমাদের একবার সুযোগ দিন। আমরাও যুদ্ধ করব, এই যুদ্ধে আপনার জয় নিশ্চিত।'

ইঁদুর-রাজের কথা শুনে এমন বিপদের দিনেও রাজামশাই হেসে ফেললেন। বললেন, 'তাই কি কখনো হয়? ওদের হাতে এত অস্ত্র—এত সৈন্য, এত খাদ্য—তোমরা পারবে কেন?'

ইঁদুর-রাজ বলল, 'মহারাজ আমাদের একটা সুযোগ দিয়ে দেখুন। প্রথমে আমরা আমাদের ক্ষমতা দেখাব—তারপর আপনার সৈন্যরা খুব সহজেই ওদের হারিয়ে দেবে। তবে, আমাদের একটা শর্ত আছে।'

—'কী শর্ত?'

—'এই যুদ্ধে জয়লাভ করার পর এই রাজ্যে যাতে কেউ বিড়াল না পোষে তার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, নদীর পাড় পাথর দিয়ে উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে। তাহলে বানের জল আমাদের বাসাগুলো ডুবিয়ে দিতে পারবে না, খেতের ফসলও নষ্ট হবে না।'



রাজামশাই ইঁদুর-রাজের শর্ত মেনে নিলেন। কথা দিলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করলে এদেশের বিড়ালের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে এবং নদীর বাঁধ উঁচু ও শক্ত করা হবে।

এবার ইঁদুর-রাজ বলল, 'আমার দু'হাজার হালকা লাঠি দরকার। লাঠিগুলো লম্বায় যেন ফুট দুয়েকের বেশি না হয়। আর ওগুলো রেখে আসতে হবে নদীর ধারে।

রাজামশাইয়ের কথামতো দু'হাজার লাঠি রেখে আসা হল নদীর ধারে। ইঁদুর-রাজার আদেশে দেশের সব ইঁদুর সেই রাতে জড়ো হল সেখানে। নদীর ওপারে শত্রুসৈন্যরা তখন তাঁবুর ভিতরে।

সাহসী ইঁদুররা লাঠিগুলো নৌকোর মতো ভাসিয়ে দিল নদীর জলে। আর সেই লাঠির নৌকোয় ভাসতে ভাসতে প্রায় দশ পনেরো হাজার কী তারও বেশি ইঁদুর চলে গেল ওপারে, শত্রুসৈন্যের শিবিরে, তাঁবুর ভিতরে। তখন শত্রুসৈন্যরা খাওয়া দাওয়া সেরে গভীর ঘুমে অচেতন। একদল ইঁদুর ধনুকের ছিলাগুলো কেটে দিল, অন্যেরা খাদ্যভাণ্ডারের খাবারগুলো নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে শুরু করল, একদল ইঁদুর বন্দুকের কার্তুজগুলো নিয়ে গেল, আগুন জালানোর সাজসরঞ্জামগুলো জলে ফেলে দিল, পানীয় জলের জালাগুলো ফুটো করে দিল, বাকিরা ভোরের দিকে তাঁবুর কাপড়গুলো ফুটো করে দিল, তাঁবুর দড়ি কেটে দিল। তারপর ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই লাঠির ভেলায় চড়ে ফিরে এল নিজেদের দেশে।

ব্যাস! সকাল হতেই গোলযোগ বেঁধে গেল শত্রুশিবিরে। একে অপরকে দোষ দিচ্ছে। নিজেদের মধ্যে প্রথমে ঝগড়াঝাঁটি, তারপর মারপিট লেগে গেল।

এমন এক সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন এপারের রাজামশাই। তিনি সেনাপতিকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুদের উপর। দিশেহারা শত্রুসৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। আর তাদের রাজা? সেও পালিয়ে গেল নিজের রাজ্যে।

যুদ্ধে জয়লাভ করলেন এপারের রাজামশাই। ইঁদুর-রাজের বুদ্ধি ও ইঁদুর সৈন্যদের কাজে ভীষণ খুশি হলেন রাজামশাই। তিনি হুকুম দিলেন; 'আজ থেকে আমার রাজ্যে ইঁদুররা নিরাপদে থাকবে। কোনও গৃহস্থের বিড়াল যেন ইঁদুরদের বিরক্ত না করে।'

রাজামশাইয়ের আদেশে নদীর বাঁধ উঁচু করা হল, পাথর দিয়ে বাঁধানো হল। শুধু তাই নয়, ইঁদুর-রাজের পরামর্শে ইঁদুরসহ বনের পশু ও পাখিরা সবাই এখন রাজার বন্ধু হয়ে গেল। রাজার বিপদে আপদে তারা রাজার পাশে দাঁড়ায়। এই না দেখে, পাশের দেশের সেই দুষ্টু রাজা ভালো রাজামশাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। এখন দুই দেশের মধ্যে কোনও হিংসা নেই, যুদ্ধ নেই। সবাই মিলে মিশে বেশ সুখে শান্তিতে আছে।

ছবি। শঙ্কর বসাক



হরেন ঘোষ

এক দেশে এক রাজকুমার তাঁর মন্ত্রীকে নিয়ে বিদেশভ্রমণে বেরোলেন। যেতে যেতে পথে রাত হয়ে গেল। সেখানে রাত কাটাবার মতো কোনো জায়গা ছিল না। ওঁরা এক পুকুরপাড়ের একটা গাছে চড়লেন। গাছের নীচে ঘোড়া বেঁধে রাখলেন। ওঁরা যখন কথায় মগ্ন তখন পুকুর থেকে একটা কালীনাগ বেরিয়ে এল। তার মাথায় জ্বলন্ত মণি। সেই মণির আলোয় চারপাশের জঙ্গল আলোকিত হল। ওঁরা ঠিক করলেন, যেমন করেই হোক ওই মণিটা নিতে হবে। শুরু হল পরামর্শ। ওই মণি নিতে পারলে সাপটি মরে যাবে। মন্ত্রী বললেন, ঘোড়ার বিষ্ঠা দিয়ে ঢেকে মণিটা নিতে হবে। তাঁর কথায় রাজকুমার রাজি হলেন। মন্ত্রী ঘোড়ার বিষ্ঠা দিয়ে মণি ঢাকা দিলেন। সাপের মৃত্যু হল। ওঁরা মণি নিয়ে নিলেন।

ওই পুকুরের কাছে এক বৃদ্ধা বাস করতেন। তাঁর কাছে ওঁরা শুনলেন, পুকুরের ভেতরে একটা প্রাসাদ আছে। মণি না-থাকলে পুকুরে কেউ যেতে পারে না। ওঁদের সঙ্গে মণি থাকায় দু-জনেই পুকুরে প্রবেশ করতে পারলেন। দরবারের দোতলায় ওঁরা একজন সুন্দরী রাজকুমারীকে দেখলেন। রাজকুমারীর কাছে গিয়ে ওঁরা সব বৃত্তান্ত জানালেন। ওঁরা খুশি মনে ওখানেই

বসবাস করতে লাগলেন।

রাজকুমারীর সঙ্গে রাজকুমারের বন্ধুত্ব হল। তাই দেখে মন্ত্রী বললেন, আপনার এখন বিয়ে করা উচিত। আজ থেকে ঠিক এক মাস পরে রাজারানি লোকলস্কর নিয়ে এখানে আসবেন। সেই সময় কেউ যেন মণি নিয়ে বাইরে যায়।

এই কথায় রাজকুমার রাজি হলেন। মন্ত্রী হৃষ্টচিত্তে ফিরে গেলেন।

একদিন রাজকুমারী মণি নিয়ে বাইরে এলেন। সেখানে অন্যদেশের এক রাজকুমার তখন ভ্রমণে এসেছেন। রাজকুমারীকে দেখামাত্র রাজকুমার মূর্চ্ছা গেলেন। এই অবস্থা দেখে রাজকুমারী প্রাসাদে ফিরে গেলেন। এই সময় রাজকুমারের জ্ঞান ফিরে এল। তিনি পুকুরপাড়ের বৃদ্ধার কাছে নানা কথা জানতে চাইলেন। দু-জনের গোপনে নানা শলাপরামর্শ হল। বুড়ি বলল যে-কোনো ভাবে সে রাজকুমারীকে পাইয়ে দেবে।

একদিন জঙ্গলের চারদিকে সিপাইদের পাহারা রেখে বুড়ি বসে ছিল। সেই সময় রাজকুমারী মণি নিয়ে বাইরে এলেন। এই সুযোগে বুড়ি বলল, আজ চুল আঁচড়াওনি কেন? এসো আমি চিরুনি দিচ্ছি।

রাজকুমারী মণিটা পাশে রেখে বসলেন। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বুড়ি মণিটা ঢেকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল অন্ধকার হয়ে গেল। সিপাইরা রাজকুমারীকে ধরে নিয়ে গেল। বুড়ি মণিটা নিজের কাছে রাখল। এবার এই নতুন রাজকুমারের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল বুড়ি।

এই কথা জানতে পেরে রাজকুমারী বললেন, আমি ছয় মাসের জন্য ব্রত পালন করছি। সেই ব্রত শেষ হলে বিয়ে করব।

এই কথা শোনার পর একটা আলাদা ঘরে রাজকুমারীকে রেখে চারদিকে সিপাই পাহারার ব্যবস্থা করা হল। ভেতরে বুড়ি ছাড়া আর কারও যাওয়ার অনুমতি থাকল না।

ওদিকে, প্রথম রাজকুমার একাই দরবারে রয়েছেন। এক মাস পূর্ণ হতে কথামতো মন্ত্রী রাজারানি লোকলস্কর নিয়ে উপস্থিত। বাইরে কাউকে দেখতে না-পেয়ে সবাইকে ফেরত পাঠানো হল। মন্ত্রী একাই রয়ে গেলেন।

বুড়ির এক ছেলে ছিল। সে মুখোশ পরে চিৎকার করতে করতে পথ চলত। আধা পাগল গোছের। কখনো সখনো বাড়ি আসত। মন্ত্রী একদিন গলা নকল করে চিৎকার করতে করতে পথে হাঁটতে লাগলেন। মন্ত্রীর মুখে মুখোশ। বুড়ি ভাবল ছেলে এসেছে। তাকে যত্ন করে খেতে দিল। বলল, তার কাছে থাকতে। ও মাথা নাড়ে।

এবার বুড়ি বলল, বাছা, এই মণিটা নিবি?

ও নিতে রাজি হল। এবার ছেলেকে বুড়ি রাজকুমারীর কাছে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে রাজকুমারীকে দেখামাত্র মন্ত্রী চিনে ফেললেন।

এবার ফিরে যেতে হবে। চল। বেলা হয়ে গেল। ছেলে রাজি হল না। ওকে ওখানে রেখে রাজকুমারীকে সব কথা বলে বুড়ি ফিরে গেল। সিপাইদের বলল, যেন তার ছেলেকে

ঠিকমতো দেখাশোনা করে।

রাতে মুখোশ খুলে মন্ত্রী রাজকুমারীর সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। এক-দুবার মন্ত্রী বাইরেও এলেন। এবার ভেতরে গিয়ে রাজকুমারীকে কাঁধে নিয়ে একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে বাইরে এলেন। সব সিপাই ঘুমিয়ে থাকায় কেউ ওঁদেব আটকাল না।

মন্ত্রী রাজকুমারীকে দরবারে নিয়ে এলেন। ওঁদের দু-জনকে দেখে প্রথম রাজকুমার দারুণ খুশি। রাজকুমার, রাজকুমারী ও মন্ত্রী তিনজনই বাড়ি ফেরার জন্যে তৈরি। তাঁরা যাত্রা করলেন। রাত হয়ে যাওয়ায় একটা গাছের নীচে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে থামলেন। রাজকুমার ও রাজকুমারী ঘুমিয়ে পড়লেন। মন্ত্রী জেগে রইলেন।

সেই গাছের কোটরে এক শকুন শকুনি নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। মন্ত্রী ওদের ভাষা জানতেন। শকুন বলল, রাজকুমার আর রাজকুমারী কত ভালো। কিন্তু কী করা যাবে। ওরা যেতে যেতেই দরজা ভেঙে মারা যাবে।

এই কথা শুনে শকুনি বলল, কোনো উপায়ে ওরা যাওয়ার আগেই যদি দরজা ভেঙে ফেলা যায় তাহলে তো বেঁচে যাবে। কিন্তু আর একটা ব্যাপার আছে। ওরা দরবারে পৌঁছোলে ভোজসভার ব্যবস্থা করা হবে। সকলের ভাগে মাছের মাথা পড়বে, কিন্তু ওদের



পাতে পড়বে সাপের মাথা। ওই মাথা খেলে ওরা মারা যাবে।

—খাবার আগে সাপের মাথা ফেলে দিলেই হয়।

শকুন বলল, তা করতে পারলে বেঁচে যাবে।

মন্ত্রী মন দিয়ে ওদের কথা শুনে নিলেন। এরপর ওরা অন্য কথা শুরু করল। আবার ওদের প্রসঙ্গ উঠল—রাজকুমার, রাজকুমারীর বিবাহ হলে প্রথম রাতে ঘরে এক কালনাগিনি ঢুকবে। ওদের মৃত্যু হবে।

এই কথা শুনে শকুনি বলল, কালনাগিনিকে যদি আগেই মেরে ফেলা যায়?

—তাহলে ওরা মরবে না, শকুন বলল। কিন্তু একটা কথা, এইসব কথা জেনে অন্য কাউকে বললে সে পাথর হয়ে যাবে। পাথর হতে নিজের রূপ ফিরে পেতে হলে রাজকুমারের প্রথম সন্তানকে কেটে তার রক্ত ছিটিয়ে দিতে হবে।

সকাল হল। ওঁরা পথ চলা শুরু করলেন। অবশেষে নিজেদের রাজত্বে পৌঁছোলেন। ওখানে পৌঁছেই মন্ত্রী প্রথমে সিংহদুয়ার ভাঙার হুকুম দিলেন। কেন যে ভাঙা হল তা কেউ জানল না। সবাই দরবারে পৌঁছোলেন। ওখানে ভোজের আয়োজন হল। খেতে খেতে মন্ত্রী রাজকুমার ও রাজকুমারীর পাত থেকে সাপের মাথা বের করে ফেলে দিলেন। ওঁদের কিছু হল না।

কদিন পর ওঁদের বিয়ে হল। ওঁদের শয়নগৃহে একটা বড়ো লাঠি হাতে মন্ত্রী পাহারায় রইলেন। ওঁরা শোবার পর একটা কালনাগিনী ওঁদের ঘরে গেল। মন্ত্রী লাঠির আঘাতে সেটা মেরে ফেললেন। সাপের একটা দাঁত রাজকুমারীর কপালে বিঁধে গেল। মন্ত্রী গিয়ে নিজের দাঁত দিয়ে সেই দাঁত তুলে নিলেন। তারপর ওঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজকুমার কোনোকিছুই জানেন না। সকালে মন্ত্রীকে দেখে তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে মন্ত্রীর কাছে এলেন। হাতে খোলা তরোয়াল নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, তুই তিনবার এইরকম অদ্ভুত কাজ করলি কেন? জবাব দে কেন করলি! নাহলে তোকে কেটে ফেলব।

—সেসব কথা প্রকাশ করলে সঙ্গে সঙ্গে আমি পাথরের মূর্তি হয়ে যাব।

—না, তা হতেই পারে না। এইসব বাজে কথা।

এবার মন্ত্রী বলতে শুরু করলেন, আমরা আসবার সময় যে গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম সেই গাছের কোটরে এক শকুন শকুনি ছিল। ওরা দুজন কথা বলছিল। আমি সব শুনলাম। আমি ওদের ভাষা বুঝি। কথা বলতে বলতে মন্ত্রী পাথর হতে শুরু করলেন। পা থেকে গলা পর্যন্ত পাথর হবার পর মন্ত্রী বললেন, একটু পরেই আমি পুরোপুরি পাথর হয়ে যাব। যদি কোনোভাবে আমাকে আবার মানুষ হিসেবে বাঁচাতে চান তাহলে আপনাদের প্রথম পুত্রকে কেটে তার রক্ত এই পাথরে ছিটিয়ে দেবেন। তাহলে আমি বেঁচে উঠব। —এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুরোটা পাথর হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

রাজকুমার নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপে জ্বলতে থাকলেন। তাঁদের জন্যে যে মন্ত্রী

এতসব করেছেন, তাঁকেই তিনি অবিশ্বাস করেছেন, সন্দেহ করেছেন। তাঁর জন্যেই মন্ত্রী আজ পাথরের মূর্তি হয়ে গেলেন।

প্রথম পুত্র জন্মাবার পর তাঁরা দু-জন আলোচনায় বসলেন। রাজকুমারী রাজি হলেন। ওঁরা প্রথম পুত্রকে কেটে তার রক্ত পাথরে ছিটিয়ে দিলেন।

—মহারাজের জয় হোক। নতুন জীবন পেয়ে মন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন। দু-হাত জোড় করলেন।

রাজকুমার এখন মহারাজ। তাঁদের দ্বিতীয় পুত্রসন্তান জন্মাল বৎসরান্তে।

এরপর তাঁরা মন্ত্রী ও সন্তানসহ হৃষ্টচিত্তে প্রাসাদে দিন কাটাতে লাগলেন।

ছবি। শঙ্কর বসাক



সাধুর উপদেশ

অশোককুমার মিত্র

এক যে ছিল দেশ। সে দেশের ছিলেন এক রাজামশাই। আর রাজামশাইয়ের এক রাজপুত্র। রাজপুত্র বড়ো হলেন। আরও বড়ো হলেন। তখন রাজামশাই বললেন, শোনো কুমার, এবারে পৃথিবীর অন্যদের কাছ থেকে পাঠগ্রহণ করো, তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হোক।

রাজামশাইয়ের কথায় রাজপুত্র রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বের হলেন। নগর ছেড়ে গেলেন গাঁয়ে। গাঁ ছেড়ে এলেন গভীর বনে। বনের মাঝে এক কুটির। সেখানে সাধনভজন করেন এক সাধু। তখন তিনি সাধনায় বসেছেন। তাঁর দীর্ঘ চুল দাড়ি। সব সাদা। তাঁর বর্ণ গৌর। একটা পবিত্র জ্যোতি তাঁকে ঘিরে প্রকাশ পাচ্ছে।

রাজপুত্র সেই কুটিরের দাওয়ায় বসলেন। দিন গড়িয়ে রাত এল। রাত ফুরিয়ে দিন। সাধুর সাধনায় ছেদ পড়ল না। রাজপুত্র ঠায় বসে আছেন তাঁর সামনে। তাঁর ধ্যান ভাঙলে কিছু উপদেশ চেয়ে নেবেন, এই তাঁর বাসনা। তাঁর জীবনের চলার পথে সে-উপদেশ হবে যথার্থ পথনির্দেশ।

দিনের পর দিন কাটল। ধ্যান ভাঙলে সাধু দেখেন, তাঁর সামনে বসে এক রাজপুত্র। তাঁর

দু-চোখে ভক্তির প্রাবল্য। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তিনি বললেন, সাধুমহারাজ, গৃহে শাস্ত্রপাঠ শাস্ত্রশিক্ষা হয়েছে। জীবনে চলার পথে কিছু উপদেশ নিতে আপনার কাছে এসেছি।

সাধু বললেন, কুমার, যখন জীবনে চলার পথের উপদেশ চাইছ, তখন তোমায় চারটে কথা বলি। মন দিয়ে শুনে রাখো। এই চারটে কথা মনে রাখলে তোমার অনেক উপকার হবে—বিপদ তোমাকে ছুঁতে পারবে না।

রাজপুত্র বললেন, বলুন মহারাজ। আপনার উপদেশ আমি সারাজীবন মেনে চলব।

সাধু বললেন, প্রথম কথা হচ্ছে—অচেনা দেশে কখনও একা একা ঘুরবে না।



কথা হল—কোনো অজানা খাবার নিজেই প্রথমে খাবে না। তৃতীয় কথা হল—নতুন কোনো বিছানায় পরখ না-করে শোবে না। আর শেষকথা হল—যাদের চেনো না, তাদের সঙ্গে ভদ্র ও বিনয়ী ব্যবহার করবে।

উপদেশের পালা শেষ হলে রাজপুত্র সাধুকে প্রণাম করে পথে বেরোলেন। বনপথে যেতে যেতে এসে পৌঁছোলেন এক পুকুরপাড়ে। দুপুরের রোদে সে-পুকুরপাড়ে একপাল বেজি খেলে বেড়াচ্ছিল। সেখান থেকে একটি বেজিকে তিনি তুলে নিলেন। তার মাথায় হাত

বুলিয়ে আদর করতে করতে সে তার প্রিয় হয়ে উঠল। তার সঙ্গীও। সাধুমহারাজ বলেছেন, অচেনা দেশে একা চলা উচিত নয়—এই বেজিই আমার সঙ্গী।

বনপথে রাজপুত্র চলতে লাগলেন।

ক্লান্ত রাজপুত্র একদিন এক গাছের তলায় শুয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তখন হয়েছে কী, একটা বিষাক্ত কেউটে ফণা তুলে তাকে ছোবল মারতে গেছে। আর তা দেখতে পেয়ে বেজি ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউটেকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে। ঘুম ভেঙে তা দেখে রাজপুত্র সব বুঝলেন এবং সাধুমহারাজের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রণতি জানালেন। সত্যিই, বিদেশবিভুঁয়ে একা থাকলে কী কান্ডটাই না হত। মরণের খবরটাও কেউ পেত না।

হাঁটতে হাঁটতে সপ্তাহশেষে তিনি এসে পড়লেন আরও গভীর জঙ্গলে। এখানে দানো আর অপদেবতার রাজত্ব। একদিন এক দানো রাজপুত্রকে পাকড়ে আনার জন্য তার চার রাখাল ছেলেকে পাঠাল। তার ইচ্ছে, রাজপুত্রকে ধরে এনে ঝলসে তার কলজে খাবে। রাজপুত্র তখন ঘুমোচ্ছিলেন। ধরে আনতে গিয়ে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। দানোর চার ছেলে ভাবল, একে জোর করে ধরে না-নিয়ে বরং বুদ্ধি দিয়ে শেষ করি। তাই ওরা রাজপুত্রকে রাতের খাবারের নেমন্তন্ন করল। মনে মনে ফন্দি আঁটল যে, খাবারে বিষ দিয়ে ওকে মেরে ফেলবে।

রাতের খাবারের নেমন্তন্ন। রাজপুত্র তৈরি হয়ে চললেন নেমন্তন্ন রাখতে। বাব্বা, কত পদের রান্না, গন্ধে বাতাস ম-ম করছে। রাজপুত্র বসেছেন খেতে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল সাধুর দ্বিতীয় উপদেশ। তিনি এদিক-ওদিক চেয়ে দেখেন, তাঁর পাতের কাছেই ওঁত পেতে এক বেড়াল বসে আছে। পোলাও থেকে ভারী সুগন্ধ বেরিয়েছিল। তিনি এক গরাস পোলাও তুলে বেড়ালকে দিলেন। বেড়ালটাও হুসহুস করে পোলাও খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়ল। বিষের জ্বালায় তার শরীরটা নীল হয়ে গেল। এবারেও সাধুর উপদেশে ওদের ছল বিফল হল। ওরা তখন আর-এক ফন্দি আঁটল।

মসলিনের সরু সুতোয় বোনা এক বিছানার চাদর ছিল দানোর বাড়িতে। মাটির নীচে জ্বলন্ত উনুনে ফুটন্ত তেলের কড়াই। তার ওপর বিছানার চাদর পাতা। খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা সেই বিছানায় শোবার জন্যে তারা রাজপুত্রকে সেখানে নিয়ে এল। বলল, রাজকুমার, আপনি এখন খুব ক্লান্ত, বরং এই বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

রাজপুত্রের তখন সাধুর তিন নম্বর উপদেশ মনে পড়েছে। তিনি একটানে চাদরখানা তুলে নিলেন। অমনি ফুটন্ত তেলের কড়াই নজরে এল। সাধুর উপদেশে এবারেও ওদের ছল বিফল হল।

দানো এবার ছেলেদের সরিয়ে তার দুই মেয়েকে কাজে লাগাল, যাতে রাজপুত্রের নরম কলজেখানা ঝলসে খেতে পারে। রাজপুত্রের অমন চমৎকার চেহারা আর নরম স্বভাব ও ভদ্র কথাবার্তায় মুগ্ধ বড়োমেয়ে কিছুতেই রাজপুত্রকে মারার কাজে অংশ নিতে চাইল না। বাবাকে পরিষ্কার সে-কথা জানিয়ে দিল।

ছোটোমেয়েরও খুব পছন্দ হল রাজপুত্রকে। সে ঠিক করে ফেলল, এর সঙ্গে গোপনে পালিয়ে গিয়ে পরে বিয়ে করে নেব। রাতের আঁধার নামলে রাজপুত্রের হাত ধরে সে বলল, রাজকুমার চলো আমাদের আস্তাবলে। ওখানে দুটো পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে, তার একটা বাতাসের বেগে ছোটে, আর-একটা ছোটে তার চেয়েও জোরে। আমরা ওই ঘোড়াটায় চেপে এই রাতেই পালাব। বলে আস্তাবলে ঢুকে একটা ঘোড়ায় উঠে ওরা ছুট লাগাল, আর তখনি ভুল করে বাতাসের চেয়ে জোরে ছোটা ঘোড়াটা বাছতে অন্য ঘোড়ায় উঠে পড়ল। ওরা তো ছুটে চলেছে। নগর পেরুল, নদী পেরুল, বনে ঢুকেছে—ততক্ষণে তার বাপ জেনে গেছে সব। তড়িঘড়ি উঠে সে আস্তাবলে গিয়ে অন্য পক্ষীরাজের সওয়ার হল। এ ঘোড়া ছোটে বাতাসের চেয়ে আগে। তাই ক্রমেই দু-ঘোড়ার তফাত কম হতে থাকল। তা দেখে ছোটোমেয়েকে কিছু শিখিয়ে রাজপুত্র এক গাছের গোড়ায় ঘোড়া থামিয়ে গাছের ডালে পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল।

একটু বাদেই দানো এসে হাজির। সে তো ছোটোমেয়ের ওপর ভারী খাপ্পা—রাজপুত্রকে কবজা করার বদলে তাকে নিয়ে পালাচ্ছে? মেয়েকে কোতল করার জন্য দানো তার তলোয়ার তুলল। ছোটোমেয়ে বলল, বাবা, তুমি কী পাগল হলে? দেখো, আমি রাজপুত্রকে ভুলিয়েভালিয়ে এখানে এনেছি। যেই তাকে সাজা দিতে গেছি, অমনি এই এখানে এই গাছের মাথায় উঠে লুকিয়েছে। আমি পাহারা দিচ্ছি, যাতে কোনো ট্যাফোঁ করতে না-পারে—আর তুমি আমাকে সাজা দিতে চাইছ?

তার কথায় দানো ভারী খুশি হল। শুধোল, কোনখানে উঠেছে বদমাশটা?

মেয়ে গাছটা দেখিয়ে বলল, এই গাছেরই মাথায় উঠে গেছে। শুনে দানো তরতরিয়ে গাছের মাথায় উঠে গেল। সেই ফাঁকে পাতার আড়াল থেকে নেমে এসে রাজপুত্র মেয়ের হাত ধরে দানোর আনা পক্ষীরাজে চেপে ছুট লাগাল। এবার কোনো ভুল করল না।

কিছু পরে গাছ থেকে নেমে এসে দানো ওদের তাড়া করতে গিয়ে দেখে, আসল ঘোড়াটা নিয়েই ওরা সটকেছে। আর কিছু করার নেই।

সাধুমহারাজের শেষ উপদেশটাও কাজে লেগে গেল। ভদ্র নম্র ব্যবহার নতুন মানুষকে মুগ্ধ করে।

রাজপুত্র পক্ষীরাজের মুখ ঘোরাল এবার নিজের দেশের দিকে।

ছবি। শঙ্কর বসাক



রাজকুমারী সানকেশরী

সুনির্মল চক্রবর্তী

রাজকুমারী সানকেশরীর ছিল মাথাভরতি সোনার চুল। এত দামি চুল রোজই গুনে রাখত ওর ঠাকুরমা।

একদিন সানকেশরী নদী থেকে চান করে ঘরে ফিরছে, ঠাকুরমার চোখ পড়ল তার মাথায়। তার মনে হল মেয়ের মাথায় একটা চুল নেই। অমনি সে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলল। চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠল। একদল লোক গেল নদীর দিকে। সোনার চুল খুঁজতে।

কিন্তু গেলে হবে কী, কেউ তা পেল না। এমনিতেই চুল খসে পড়লে তা অশুভ বলেই মনে করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম, কারণ চুলটা ছিল খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি।

রাজার কানে খবর গেল। রাজসভায় বসে রাজা বললেন, যে তার মেয়ের মাথার হারানো চুল খুঁজে দেবে তার সঙ্গেই রাজকুমারীর বিয়ে দেবেন।

চারদিকে তখন হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সবাই চারদিকে সোনালি চুল খুঁজে বেড়াতে লাগল। এমনকি রাজার সাত ছেলেও নদীর জলে নেমে হারিয়ে যাওয়া চুল খুঁজতে লাগল। শেষপর্যন্ত সানকেশরীর সেজোভাই বোনের হারিয়ে যাওয়া চুল খুঁজে পেল।



রাজার কানে এ খবর পৌঁছোতেই রাজা পড়লেন বিপদে। ভাইবোনের মধ্যে তো আর বিয়ে হয় না। তবুও রাজাকে তো কথা রাখতে হবে তাই অনেক আলোচনার পর রাজা ঠিক করলেন তার কথা রাখবেন।

এদিকে সানকেশরী নিজের ভাইকে কী করে বিয়ে করে? সে কোনোওদিনই এমন বিয়ের কথা শোনেনি। তাই সে ঠিক করল রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

শেষপর্যন্ত রাজপ্রাসাদ ছেড়ে জঙ্গলে এসে এক বড়ো গাছের ডালে চড়ে বসল রাজকুমারী। ডালপালা আর পাতার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখল।

এদিকে রাজকুমারীকে না-পেয়ে চারদিকে খোঁজ খোঁজ আওয়াজ উঠল। রাজপেয়াদারা রাজ্যের চারদিকে খবর পাঠাল। অবশেষে তার সন্ধান পাওয়া গেল। রাজার কানে খবর পৌঁছোতেই রাজা ছুটে এলেন রাজকুমারীর কাছে। রাজকুমারী তবুও গাছ থেকে নামে না। রাজা বললেন,

মেয়ে আমার লক্ষ্মী মেয়ে
আয় রে নেমে আয়,
সময় হল,—বিয়ের লগন
কেমন বয়ে যায়।

রাজকুমারী পাতার আড়াল থেকে বলল :

বাবা তোমার ডাকে আমি
নেমে আসতে পারি,
কিন্তু তোমার কথা রাখতে
কষ্ট হবে ভারী।

রাজা আর কী করেন। রাজপ্রাসাদে ফিরে চললেন। মনে খুব দুঃখ পেলেন। মেয়ের কাছে তাঁকে হেরে যেতে হল। দুঃখে অপমানে রাজা রাজপ্রাসাদের দরজায় এসে পা রেখেছেন, অমনি কী অসহ্য যন্ত্রণা তার শরীর-মনকে ছুঁয়ে গেল। রাজা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন আর তখনই মারা গেলেন।

এবারে সানকেশরীর ভাবী স্বামী গাছের সামনে এসে দাঁড়াল। সে-ও কতভাবে রাজকুমারীকে নীচে নেমে আসতে বলল। রাজকুমারী তবুও গাছ থেকে নামে না। একখানা কুড়ুল জোগাড় করল সে। তারপর গাছের গোড়া কাটতে লাগল। কী আশ্চর্য, গাছের কোনোই ক্ষতি হল না। বরং গাছটা লতায়পাতায় ডালে ডালে আরও ঘন, পুরু, মোটা হয়ে উঠল। সারাদিনের ধকল সহ্য করতে না-পেরে তার ভাবী স্বামী সেখানেই শেষবারের মতো শুয়ে পড়ল।

সানকেশরীর সবচেয়ে ছোটোভাই, যার বয়স তখনও পাঁচ পেরোয়নি, সেখানে এল। দিদিকে কান্নাভেজা গলায় বলল, আমি তোমার সঙ্গে থাকব দিদি।

সানকেশরীর দয়া হল। সে তার ভাইকে গাছের ওপরে উঠিয়ে নিয়ে এল। কিছুক্ষণ পরে আবার ছোটোভাইয়ের চোখে জল এল। এবার অবশ্য খিদেয় কষ্টে ও কাঁদছিল। দিদির কাছে

কোনো খাবারই ছিল না। তার হাতে ছিল কিছু শস্যদানা। ভাইয়ের হাতে দিয়ে বলল, এককণাও এদিক-ওদিক ফেলবি না।

এদিকে ভাই অতশত বোঝে না। তার হাতের মুঠি খুলে বেশ কয়েকটা দানা পড়ল মাটিতে। কী আশ্চর্য, তখনই মাঠজুড়ে দেখা গেল একপাল গোরুবাছুর চরে বেড়াচ্ছে।

সানকেশরী দেখল এখন আর কেউ এসে তাকে বিরক্ত করছে না।

সে ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে এল। সঙ্গে তার ভাই। ছোটোভাইকে নিয়ে সে এক ছোট্ট কুঁড়েঘর বানাল। সেখানে গোরুবাছুরের দেখাশোনা করতে লাগল।

একদিন সানকেশরী জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল কয়েকজন শিকারি তার ঘরের চারদিকে শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরই মধ্যে একজন শিকারি তার দরজায় এসে দাঁড়াল। বলল, কে আছো, খুব-পিপাসা পেয়েছে।

যখন সানকেশরী একপাত্র জল নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, শিকারিকে দেখে তার চোখের পাতা নড়ে না। শিকারিও অবাক চোখে তার দিকে চেয়ে রইল। তার মনে হল, মেয়েটা সত্যিই খুব সুন্দর।

সেই যুবক আসলে ছিল পাশের রাজ্যের এক রাজা। সে এগিয়ে এসে সানকেশরীর হাত দু-হাতে চেপে ধরল।

তারপর?

তারপর ধুমধাম করে সানকেশরীর বিয়ে হল সেই রাজার সঙ্গে।

ছবি। সুব্রত চৌধুরী



রাক্ষসীর মুলুক

শ্রীসরনংকর বৌদ্ধভিক্ষু

অনেকদিন আগে লঙ্কাদ্বীপে সমুদ্রের ধারে রাক্ষসীদের একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে পাঁচ শত রাক্ষসী বাস করিত। কিন্তু একটাও রাক্ষস ছিল না। জাহাজ বা নৌকা ডুবিয়া গেলে যে সকল লোক সাঁতরাইয়া ডাঙায় উঠিত, রাক্ষসীরা তাহাদের কাছে ছদ্মবেশে যাইত এবং তাহাদিগকে গ্রামে আনিয়া খাইয়া ফেলিত।

এক সময়ে পাঁচশত বণিক বাণিজ্য করিবার জন্য সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল। পথে জাহাজ ডুবিয়া গেল। বণিকেরা বিপদে পড়িয়া কোনো রকমে লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হইল।

রাক্ষসীর দল খবর পাইয়া ছদ্মবেশে আসিয়া বণিকদিগকে বলিল, 'আপনাদের এই বিপদ দেখিয়া আমরা আপনাদিগকে সেবা করিতে আসিয়াছি। লোকের সেবা করাই আমাদের ব্রত। আমরা এই প্রকার শত শত লোকের সেবা করিয়া আসিতেছি।'

বণিকেরা এ সুবিধা ছাড়িল না। তাহারা রাক্ষসীদের সঙ্গে তাহাদের গ্রামে গেল। রাক্ষসীরা অনেকদিন মানুষ খায় নাই। এতগুলি মানুষকে হাতে পাইয়া তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। বণিকেরাও এই অজানাদেশে আশ্রয় পাইয়া খুব খুশি হইল। ছদ্মবেশিনী রাক্ষসীরা খুব ধূমধামে নানা মিষ্টান্ন ও ফলমূলাদি দিয়া বণিকদের আহার করাইল। আহারের পর রাক্ষসীরা

আসিয়া বণিকদের সঙ্গে দেশবিদেশ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিল। তাহাদের ভূ-পরিচয়ের বিদ্যা দেখিয়া বণিকেরা আশ্চর্য হইয়া গেল। এতবড়ো গ্রামে সকলেই স্ত্রীলোক একটিও পুরুষ নাই দেখিয়া বণিকেরা রাক্ষসীদের কাছে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

রাক্ষসীরা কাঁদিতে কাঁদিতে বণিকদিগকে বলিতে লাগিল, 'আমাদের গ্রামে পাঁচশতজন পুরুষ ছিল। তাহারা আপনাদের মতো বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল। আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইল তাহাদের কোনো খবর পাওয়া যায় নাই। হয়তো আপনাদের মতো তাহাদেরও জাহাজ সমুদ্রে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।' এই বলিয়া রাক্ষসীরা জোরে কাঁদিতে লাগিল। কান্না আর থামে না।

এই মায়াকান্নায় বণিকেরা দুঃখিত হইয়াছে দেখিয়া এক বৃদ্ধা রাক্ষসী বণিকদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিল, 'আপনারা আমাদের গ্রামে থাকুন এবং এই গ্রামেই বিবাহ করুন।'

বণিকেরা বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। মাঝে সমুদ্রের ব্যবধান, জাহাজও নাই যে, পার হইয়া দেশে যাইবে, তাই তাহারা রাক্ষসীদের কথায় সম্মত হইল। সেই রাত্রেই রাক্ষসীদের সঙ্গে বণিকদের বিবাহ হইয়া গেল। বণিকদের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারাই এখন দেশের রাজা। রাক্ষসীদেরও কম আনন্দ হইল না এখন মনে মনে।

তাহারা ভাবিতে লাগিল, 'রোজ এক-একটা মানুষ খাইলেও তাহাদের অনেকদিন সুখে



কাটিয়া যাইবে।'

একরাত্রে একজন বণিক, হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া তাহার স্ত্রীকে দেখিতে পাইল না। সে চুপ করিয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখিল তাহার স্ত্রী রাক্ষসীর মূর্তি গ্রহণ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে রক্ত মাখা। সে একটা মানুষের মুণ্ডু কড়্কড়্ করিয়া চিবাইতেছে। বণিক তখন বুঝিতে পারিল তাহারা যে গ্রামে আছে সেখানকার সকলেই রাক্ষসী। কেবল ছদ্মবেশে তাহাদিগকে ভুলাইয়াছে।

পরদিন প্রাতে এই বণিক অন্যদের কাছে বলিল, 'এই দেশে আর থাকা চলিবে না। এখানকার সকলেই রাক্ষসী। চলো আমরা পলাইয়া যাই। না-পলাইলে ইহারা একে-একে, আমাদের সকলকে খাইয়া ফেলিবে।'

তাহার কথা অনেকে বিশ্বাস করিল না। যাহারা বিশ্বাস করিল, তাহারা পলায়ন করিল।

সমস্তদিন চলিতে চলিতে সন্ধ্যার সময় তাহারা একটি পাহাড়ের কাছে ক্লান্ত হইয়া বসিল। তখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। সব নিস্তব্ধ। এমন সময় আকাশ ফাটাইয়া কে যেন বলিল, 'কে লোকালয়ে যাইতে চাও, এসো।'

এই শব্দ তিনবার মাত্র শুনা গেল। তখন বণিকের দল 'আমরা যাইতে চাই' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে আকাশজোড়া পক্ষীরাজ-ঘোড়া আসিয়া সেই বণিকদিগকে পিঠে লইয়া চলিয়া গেল। পথে কত সমুদ্র, কত বন, কত পাহাড় তাহারা দেখিতে পাইল। শেষে পক্ষীরাজ তাহাদিগকে ঝুপ করিয়া তাহাদের গ্রামে নামাইয়া দিল।

যাহারা রাক্ষসীদের মুলুক হইতে পালায় নাই, তাহাদের অবস্থা যে কী হইল তোমরা বোধহয় তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। রাক্ষসীরা মনের আনন্দে প্রতিদিনই তাহাদের এক-একজনকে খাইতে আরম্ভ করিল।

লেখক শ্রীলঙ্কা-নিবাসী। বাংলায় এসে বাংলা ভাষা শিখে এই উপকথাটি লিখেছেন—'বার্ষিক শিশুসাথী' আশ্বিন ১৩৩৪।

ছবি। শঙ্কর বসাক



টিকটিকির জিৎ

দীননাথ সেন

হুম! তাহলে পেয়ে গেলাম তোকে।

আমাকে? আমাকে তোমার কী দরকার চিতাবাঘ? আমি তো সামান্য একটা টিকটিকি। আর তুমি কি না—

সে তো একশোবার। কোথায় তুই আর কোথায় আমি। তবে কথাটা কী জানিস?

না তো? কী কথা?

আজ সারাদিন ধরে বনটা চষে বেড়িয়েছি।

কেন?

কেন আবার কী? শিকারের খোঁজে।

ও। তা কী কী পেলে?

কিছুই পাইনি রে। সেই সকালে বেরিয়েছি। এখন তো সাঁঝ গড়িয়ে যাচ্ছে। খিদেয় পেট জ্বলছে। তোকে পেলাম, তাই তুই হবি আজ আমার খাবার।

ভয়ে হাতপা সিঁধিয়ে গেল টিকটিকির।

দাদা, তুমি আমি এক বনে থাকি। বলতে গেলে তুমি আমার পড়শি।

পড়শিটরশি রেখে দে। বেজায় খিদে।

দাদাগো। আমি এটুকু একটা জীব। আমাকে খেলে তোমার পেটের এক কোণও ভরবে না। দোহাই দাদা, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও।

ছেড়ে তো দিতে পারি। এরপর যদি আর কিছুই জোটাতে না-পারি? তাহলে আজ উপোস করে কাটাতে হবে।

না না। আর একটু খুঁজে দেখো। খাবার ঠিক মিলে যাবেই দেখো।

না। তোর কোনো কথা শুনছি না। তোকেই খাব আজ।

দেখো চিতাদাদা। তুমি তো ভালোলোক।

তা অবশ্য সে-কথা বনের সবাই বলে।

ধর্মকথা কিছুই তোমার অজানা নেই।

তা বলতে পারিস। অনেক কিছুই জানি আমি। কিন্তু তাতে কী হল?

ধর্মে আছে বড়োরা ছোটোদের মারে না। ঠিক কি না বলো।

সেটা ঠিক বটে।

আমি অতি ছোটো। তোমার তুলনায় কিছুই নয়। তাহলে আমাকে খাওয়া কি তোমার অধর্ম হবে না?

দেখ্ পেটে খিদে থাকলে ওসব ধর্মটর্ম কিছু মানা যায় না।

দাদা, তুমি শেষে একটা অধর্মের কাজ করবে? তা ছাড়া—

তা ছাড়া কী?

আমাকে খেলে তোমার পেটও ভরবে না, আবার সবার কাছেও তুমি ছোটো হয়ে যাবে। তারচেয়ে

তুই কী বলতে চাস?

তুমি আমার সাথে লড়াই করো। আমি যদি হেরে যাই তাহলে তুমি বলতে পারবে লড়াইতে জিতেছি, তাই মেরেছি। তোমার আর বদনাম হবে না।

লড়াই! এ বলে কী! চিতার সঙ্গে টিকটিকির লড়াই? লড়াইয়ের ফল কী হবে তা তো জানাই আছে।

টিকটিকিকে বলল, কথাটা তুই খারাপ বলিসনি টিকটিকি।

বেশ। তাহলে এসো লড়াই শুরু করি তোমার সাথে।

চিতাবাঘ বেশ করে গা-ঝাড়া দিয়ে, নখগুলো বের করে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হচ্ছে। অমনি টিকটিকি তার ল্যাজটাকে আঁকিয়েবাঁকিয়ে অন্য কথা পাড়ল।

কী কথা বলল?

চিতাদাদা, তুমি মোটাসোটা আর আমি রোগাপটকা।

তাতে কী হল?

লড়াই তো হয় সমানে সমানে। দুজনে সমান জোরালো না-হলে লড়াই তো হয়ে যায় যাকে বলে ছেলেখেলা।

সে তো ঠিক।

সেজন্য আমি বলি কী—

কী বলছিস তুই?

আমাকে তুমি তিনমাস সময় দাও।

কেন? কী হবে তাতে?

আমি এই কয়েকদিন খুব করে খাব। শরীর মোটা হবে। এইবার ভাবো—

কী আবার ভাবব?

তোমার সঙ্গে যে লড়ছে সে একটা মোটা নাদুসনুদুস টিকটিকি।

তারপর?

তারপর তুমি জিতে গেলে লড়াইয়ে।

তারপর?

তারপর তুমি যাকে খাচ্ছ সে তো আর একটু টিকটিকি নয়।

তবে কী?

সে তো প্রায় গোসাপের মতো। নরম চামড়াটা ছিঁড়ে পাবে একতাল তুলতুলে মাংস। খেতে খেতে তোমার মনে হবে—এতদিনে একটা মনের মতো খাবার পেলাম।

নরম মাংসের কথা ভেবে চিতার মুখে লালা ঝরতে লাগল।

বেশ। তাই হোক।

তাই হবে। তিনমাস পরে আমরা দুজনে ঠিক এখানে আসব। এখানেই হবে আমাদের লড়াই।

ঠিক তো?

ঠিক। কথার নড়চড় হবে না।

তারপর কী হল?

টিকটিকি রেহাই পেয়ে গেল কোনোমতে।

বাড়ি ফিরে সে ভাবতে লাগল কী করা যায়?.

যুদ্ধ তো করতে হবে। চিতাবাঘ তাকে ছাড়বে না।

সেই বা কেন ছাড়বে?

হোক না সে রোগা আর চিতাবাঘ মোটা। তার সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠবে না।

কিন্তু চিতাবাঘের চেয়ে·সে বেশি চালাক।

চালাকিতে সে হারিয়ে দেবে চিতাবাঘকে।

অনেক ভেবে টিকটিকি একটা ফন্দি বের করল।

কী করল টিকটিকি?

টিকটিকি রোজ ধানের খেতে যেতে লাগল।

সেখানে কী?

সেখানে গিয়ে কাদায় গড়াগড়ি খেতে লাগল। সারা গায়ে কাদা মাখে। তারপর গা-টা রোদে শুকিয়ে নেয়। রোজ এমনি করতে থাকে। আর শরীরটা মোটা হতে থাকে।

এমনি করে তিনটি মাস কেটে গেল।

টিকটিকি আর আগের মতো নেই। তার শরীর বেশ মোটা হয়ে গেছে। দেখলে মনে হবে তার গায়ে অনেক মাংস।

তিনমাস পরে চিতাবাঘ আর টিকটিকি আগের সেই জায়গায় এসে হাজির।

বাঃ। তোকে দেখতে বেশ লাগছে। কত মোটা হয়েছিস। খুব খাওয়াদাওয়া করেছিস বুঝি?

করব না? তোমাকে যে কথা দিয়েছি। আমি কথা দিয়ে কথা রাখি।

এরপর দুজনের লড়াই শুরু হল?

হ্যাঁ। তুমুল লড়াই।

চিতাবাঘ লাফিয়ে উঠে টিকটিকির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। টিকটিকিও তাকে থাবা মারতে থাকে।

চিতাবাঘের থাবায় টিকটিকির গায়ের শুকনো মাটি ঝরে পড়তে থাকে। তবে তার শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। আঘাত তার গায়ে লাগেই না। অনেকক্ষণ ধরে চলল লড়াই।

চিতা হয়রান হয়ে পড়ে।

উঃ। এত করেও টিকটিকিটাকে কাবু করা যাচ্ছে না। আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল তো। এদিকে আমার দম যে ফুরিয়ে আসছে।

চিতা জিরোচ্ছে।

এমন সময় টিকটিকি লাফিয়ে উঠে পড়ল চিতার পিঠে।

কামড়াতে লাগল চিতার নাকে-মুখে-চোখে।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে চিতার সারা গা।

ছটফট করতে করতে চিতা শেষে ছুটে পালাল।

লড়াইতে হার হল তার।

তারপর—

চিতা-টিকটিকির লড়াই দেখছিল এক কাঠুরে।

সে ভাবছে, এটুকু একটা টিকটিকি। চিতাটাকে নাজেহাল করে দিচ্ছে। শেষকালে হারিয়ে দিল তাকে!

বেজায় হাসি পেয়ে গেল কাঠুরের।

সে হেসে ওঠে।

চিতা চমকে ওঠে।

ওপরে তাকিয়ে দেখে গাছের ডালে এক কাঠুরে।

ফিকফিক করে হাসছে তার দশা দেখে।

চুপ্। হাসবি না বলছি। বেশি হাসলে তোকেই খাব।

ওরে বাবারে! চিতা বলে কী?

না না। আর হাসব না।

হেঁ। মনে থাকে যেন। আমি যে হেরেছি এ কথা কখনও কাউকে বলবি না। তোর বউকেও বলবি না।

আমি দিব্যি করছি চিতাদাদা। কাউকে বলব না, তুমি দেখো।

তাহলে নীচে নাম। নেমে চলে যা।

চিতা ভাবল, নাঃ! ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই। নিশ্চয় ও বউকে বলবে। বউ বলে দেবে পাঁচজনকে। মেয়েদের পেটে তো কথা থাকে না। তখন টিকটিকির কাছে আমার হারের কথা



জানাজানি হয়ে যাবে। কাঠুরের বাড়ি গিয়ে আড়ি পেতে থাকব। দেখব ব্যাটা তার বউকে বলে কি না।

চিতাবাঘ তাই করল। কান পেতে রইল কাঠুরের বাড়ির পেছনের দেয়ালে। কাঠুরে তার বউকে কী বলছে?

জানো, আজ বনে এক মজার কাণ্ড।

কী কাণ্ড? কী হয়েছে বলো।

এক টিকটিকি আর চিতাবাঘের লড়াই—

লড়াই বেঁধেছিল? তারপর?

না, আর কিছু বলা যাবে না।

সে কী? কেন?

চিতাবাঘকে কথা দিয়েছি সে কথাটি কাউকে বলব না।

কোন্ কথাটি?

সেই যে—না। না। না।

চিতাবাঘ তোমার কাছে বড়ো হল? আমি বুঝি কিছু নই? লোকে তো বউয়ের কাছে কিছু লুকোয় না।

বলোই না কী হয়েছে?

কাঠুরে আর করে কী?

এদিক-ওদিক ভালো করে দেখে নেয় কেউ কোথাও আছে নাকি?

শোনো। কাছে এসো বলছি।

বলো। আমি কাউকে বলব না।

খবরদার, কাউকে নয়।

তিন সত্যি করছি, বলব না।

লড়াই খুব জমেছিল।

জিতল কে?

আরে শোনোই না। টিকটিকিটা শেষ-অবধি চিতাবাঘকে আঁচড়েকামড়ে একশা করে দিয়েছে। জানো, চিতাবাঘটা টিকটিকির সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে গেছে?

হেরে গেছে, টিকটিকির কাছে?

হ্যাঁগো, হেরে ভূত হয়ে শেষকালে পালিয়ে গেল।

বাঘ কী করে টিকটিকির কাছে হারে? তাহলে বোধহয় অনেকদিন কিছু খেতে পায়নি। আহা রে।

ওদিকে চিতা তো রেগে টং।

ব্যাটা কাঠুরে। আমাকে কথা দিয়ে কথা রাখল না? দাঁড়া। দেখাচ্ছি তোকে মজা।

চিতা ঘরের ভেতর উঁকি দিতে থাকে।

কাঠুরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

চিতাটা তখন পা টিপেটিপে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল।

কাঠুরে শুয়েছিল একটা চৌকির ওপর।

চিতাবাঘ ওটিকে পিঠে নিয়ে বেরিয়ে এল। বনের পথে ছুট লাগাল। কাঠুরের ঘুম ভেঙে গেল।

এ কী। চৌকিটা কি নড়ছে? হ্যাঁ। সত্যিই তো নড়ছে।

চৌকি নড়ে কেন?

চৌকিটা হাঁটছে।

চৌকি হাঁটে কেন?

কাঠুরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। কী কাণ্ড! এদিক-ওদিক তাকায়।

আরে! চারপাশে এত গাছ কেন? ঝোপঝাড় কেন?

তবে কি বনের ভেতর এসে পড়ল? চৌকির ফাঁকে দেখে চমকে ওঠে। একটা জানোয়ার। পিঠে কালো কালো দাগ।

সর্বনাশ। এ তো চিতাবাঘ।

এবার সব মনে পড়ে গেল। বুঝল, চিতাবাঘ তার কথা সব শুনেছে। তাই খাবে বলে তাকে বনের মধ্যে নিয়ে এসেছে।

ভয়ে কাঠুরের প্রাণ উড়ে গেল।

হঠাৎ দেখে একটু দূরে একটা মোটা ডাল নুয়ে পড়েছে। চিতা সেদিকে এগোচ্ছে। ডালটার কাছে আসতেই কাঠুরে ডালটাকে দু-হাতে চেপে ধরল। খানিকটা কসরত করে গাছের ওপর উঠে গেল। চিতাবাঘ কিছুই টের পেল না।

সে তো ভাবছে পিঠের চৌকিটা আছে। চৌকির ওপর মানুষটাও আছে। ডেরায় গিয়ে সে ধপাস করে চৌকিটা পিঠ থেকে নামিয়ে রাখল। কিন্তু এ কী! কাঠুরিয়া কই?

শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। রেগেমেগে গজরাতে থাকে সে। এদিকে ছুটছে, ওদিকে ছুটছে। কাঠুরিয়াকে খুঁজছে।

চাঁদের আলোয় হঠাৎ চোখে পড়ল গাছের সেই ডালটা। ওই তো কাঠুরে গাছের ওপর বসে আছে।

সে-ও উঠে এল গাছের ওপর।

চিতাকে দেখে কাঠুরের চোখ চড়কগাছ।

নাঃ। বাঁচার আর আশা নেই। চিতা আমাকে খাবেই।

এখন উপায়?

উপায় একটা মাথায় এল তার। সে চ্যাঁচাতে লাগল—

খবরদার চিতাবাঘ। আর এক পা-ও এগিয়ো না বলছি। ভালো চাও তো নেমে যাও।

নেমে যাব? তোকে না নিয়ে চলে যাব ভেবেছিস?

ওই দেখো মগডালে তাকিয়ে দেখো।

চিতা তাকায় মগডালের দিকে।

দেখেছ?

কী দেখব?

আর কী? তোমার যম। টিকটিকি।

কোথায়? কোথায়?

চিতাবাঘ ভড়কে গেছে। সেই টিকটিকিটা!

আর দেখছ কী? শিগগির পালাও। এবার তোমাকে পেলে আর ছাড়বে ভেবেছ?

ভয়ে চিতাবাঘের আর এগোনো হল না।

ওরে বাবারে! টিকটিকির হাতে পড়লে গেছি।

এই বলে সে পালিয়ে বাঁচল।

কাঠুরে চিতাবাঘের পালানো দেখে হেসে কুটিকুটি হয়।

গাছ থেকে নেমে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

ছবি। সমীর সরকার



শেয়াল ও খরগোশ

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

পাহাড়ি ঘন বন। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে তিরতিরে নদী। পাহাড়ের নীচের দিকে ঢালুতে থাকে এক শেয়াল ও এক খরগোশ। তাদের আলাদা আলাদা জমি। দুজনেই চাষ করে।

তারা খায় লাউ। দুজনেই খুব ভালোবাসে। নিজের খেতে চাষ করে, বীজ বোনে, গাছ বেড়ে ওঠে, মাচা বেঁধে দেয়। অনেক অনেক লাউ হয়। খিদের ভাবনা নেই। পাহাড়ি গুহায় থাকে। বড়ো শান্তি।

কিন্তু শেয়ালের বড়ো বিপদ। এতদিন গাছে লাউ হচ্ছিল, এখন গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে, পাতাগুলো শুকনো হয়ে ঝরে পড়ছে। আসলে এ বছর বৃষ্টি হয়নি, গাছের তলার মাটি শুকিয়ে গিয়েছে। জল না-পেয়ে তাই লাউগাছ শুকিয়ে যাচ্ছে, ফল হচ্ছে না।

ওদিকে খরগোশের খুব বুদ্ধি। সে বুঝতে পারল, বৃষ্টির জল নেই, গাছ শুকিয়ে যাবে। তাই শুকনো লাউয়ের খোলা নিয়ে নদীতে যায়, খোল ভরতি করে জল এনে গাছের নীচে দেয়। বারবার দেয়। খুব খাটুনি, কিন্তু গাছকে তো বাঁচাতে হবে। দিনে দুবার করে জল দেয়। একবার খুব সকালে, আর-একবার বিকেলের দিকে, রোদ পড়ে গেলে।

দুজনে তো বন্ধু। শেয়াল এসে খরগোশকে দুঃখের কথা বলল। খরগোশ বলল, এসব আগে বলতে হয়। বন্ধু কেন না-খেয়ে থাকবে। আমরা দুজনে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করব। আমার গাছে অনেক লাউ, অভাব নেই। শেয়ালও খুশি হল।

একসঙ্গে থাকে। খরগোশের খুব আনন্দ। একা একা থাকতে হচ্ছে না। শেয়ালেরও ফুর্তি, কাজ না-করে দিব্যি খাওয়াদাওয়া চলছে।

কিন্তু শেয়াল ছিল দুষ্টু আর পাজি। সব সময় অন্যের ক্ষতি করার কথা ভাবে। শেয়ালের স্বভাবই ওই রকম।

শেয়াল খরগোশ যেখানে থাকে সেখানে তেমন পড়শি নেই। আর ওরা দুজন খুব গরিব। কোনোরকমে দিন চলে। তাই কোনো ফেরিওয়ালা ওই পথ দিয়ে যেত না। এখন হয়েছে কী, পাহাড়ের যে পথ দিয়ে তারা যেত সে পথ বন্ধ হয়ে গেল, ধস নেমেছে। তাই তারা খরগোশের গুহার সামনে দিয়ে যাওয়াআসা করে। বুনো গোরু, বাঁদর, শুয়োর ফেরিওয়ালারা নানা জিনিস বিক্রি করতে যায়। নুন, তেল, মশলা, দুধ বিক্রি করতে যায়।

খরগোশ গিয়েছে নদীর ধারে গাছ থেকে লাউ কেটে আনতে। এমন সময় বাঁদর মশলা নিয়ে চলেছে। শেয়াল তাকে ডাকল, বাঁদর মাথার বোঝা নামিয়ে বসল। ভাবল, শেয়াল বোধহয় কিছু কিনবে।

শেয়াল বলল, এই পথ হল আমার। এই পথ দিয়ে যেতে হলে আমার অনুমতি নিতে হয়। বনে থাকো আর নিয়মকানুন কিছু জানো না। ধারালো দাঁত দিয়ে পেট ফাটিয়ে দেব। বেয়াদব কোথাকার।

বাঁদর কাঁপতে লাগল। সত্যিই সে এই নিয়ম জানত না। সে-ও গরিব। কোনোরকমে দিন চলে। ঘরে বউ-ছেলেমেয়ে আছে। কাঁপতে কাঁপতে বলল, প্রভু, তাহলে কী করব। এই পথ ছাড়া তো অন্য উপায় নেই।

শেয়াল বলল, ঠিক আছে। যাবে, এই রাস্তা দিয়েই যাবে। কিন্তু প্রতিদিন মশলা দিয়ে যাবে। কর দিতে হবে না?

শেয়াল ভালো ভালো মশলা বেছে নিল। বাঁদর চলে গেল। বলল, যেদিনই এই পথে যাব, মশলা দিয়ে যাব।

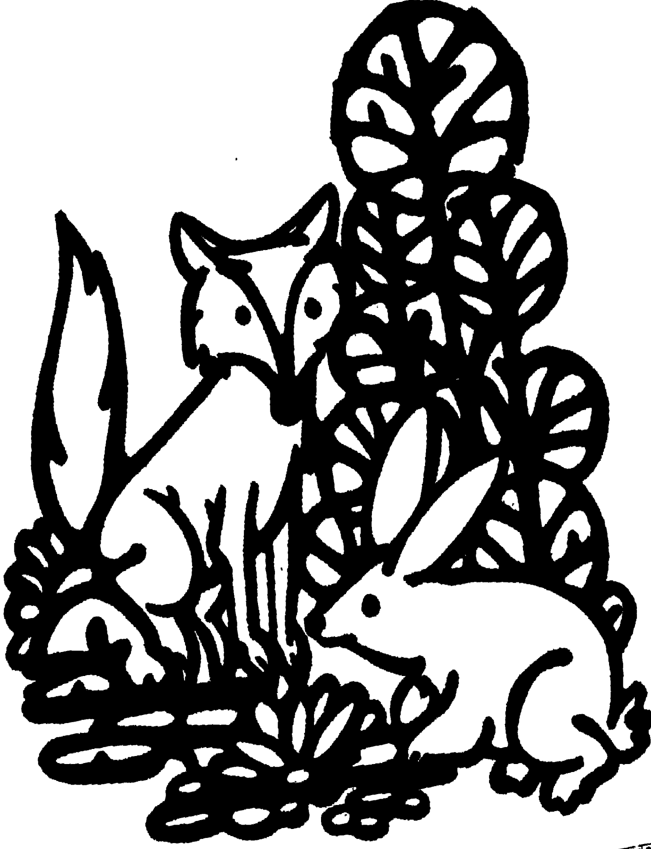
সেদিন রান্না করল শেয়াল। খেতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল খরগোশ। এত সুস্বাদু লাউ সে আগে খায়নি। এসব তো মশলা-দেওয়া খাবার। শেয়াল মশলাপাতি পেল কোথায়।

খরগোশ জিজ্ঞেস করল। শেয়াল শুধু হাসল। —আরে বাবা, ওসব ফন্দি আমি জানি, জোগাড় করতে বুদ্ধি লাগে।

খরগোশ কিছু বলল না। শেয়ালের দাঁতগুলো দেখে চুপ করে গেল। পরের দিন নদীতে চান করতে যাচ্ছে বলে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

বাঁদর এল, শেয়াল এগিয়ে গেল, বাঁদর শেয়ালকে মশলা দিল, শেয়াল পয়সা দিল না। বাঁদর প্রণাম করে চলে গেল।

শ্রীলঙ্কা



খরগোশ বেরিয়ে এল। তাকে কোনো কিছু বলার সুযোগ না-দিয়েই শেয়াল বলল, মিথ্যে কথা বলে ঠকিয়ে আমি মশলা পাই। অন্যায় কী আছে। খাওয়া ভালো হচ্ছে।

খরগোশ কাঁপতে লাগল। বলল, শেয়াল, এ তুমি কী করছ? ছিঃ ছিঃ, কাউকে ঠকাতে আছে? আমরা গরিব, নাই বা থাকল মশলা, না-খেয়ে মরে তো যাচ্ছি না। ঠকিয়ে সুস্বাদু খাবার চাই না। ওরাও তো এই বনে আমাদের পড়শি, পড়শি তো ভাই। এটা তুমি ঠিক করছ না।

শেয়ালের দেহ জ্বলতে লাগল। রাগে চোখের রং লালচে হয়ে গেল, থাবার নখ বেরিয়ে এল। কিন্তু কিছু বলল না। মনে মনে ভাবল, দেখাচ্ছি মজা।

রান্নাবান্না হয়ে গিয়েছে। খরগোশ চান করতে গেল। শেয়াল তো কোনোকালে চানটান করে না। সব লাউ নিজে খেয়ে ফেলল, বন্ধুর জন্য কিছুই রাখল না। খেয়েদেয়ে কাঠকয়লার

ছাইগাদায় শুয়ে পড়ল। আঃ, কী আরাম।

খরগোশ এসে দেখে শেয়াল ছাইগাদায় শুয়ে আছে। বন্ধুর কি শরীর খারাপ। খরগোশ বন্ধুর কাছে গেল।

শেয়াল বলল, অন্যায় করেছি ঠকিয়ে। ওই বাঁদর আরও বন্ধু জুটিয়ে এনে সব লাউ খেয়ে নিল। তারপর বেদম পেটাল আমাকে। হাতপায়ে ব্যথা।

এই বলেই উঠে এসে খরগোশের গায়ে বমি করে দিল। খরগোশ মাথা নীচু করে পাহাড়ি পথে নেমে নদীতে এল। অনেকক্ষণ ধরে চান করল। গাছের নরম কচিপাতা দিয়ে দেহের লোম ভালোভাবে পরিষ্কার করল। আবার আগের মতো সুন্দর হল।

শেয়াল তাকে দেখে বলল, এত চকচকে হলে কী করে? বাঃ, সুন্দর লাগছে।

খরগোশ বলল, ওই ডানদিকের রাস্তা দিয়ে নদীতে নামলে দেখা যাবে অনেক ধোপা কাপড় কাচছে। তাদের বললাম, ওরা কাঠের পাটাতনে কয়েকবার আছাড় দিল। ব্যস পরিষ্কার হয়ে গেলাম।

শেয়াল মুচকি হেসে রওনা দিল। ধোপাদের দেখতে পেয়ে বলল, ওই পাটাতনে আমাকে কয়েকবার আছাড় দাও তো, আমি পরিষ্কার হয়ে যাব।

একজন ধোপা তার পেছনের দুই পা ধরে খুব জোরে পাটাতনে কয়েকবার আছাড় মারল। শেয়ালের হাড়গোড় ভেঙে গেল। আধমরা অবস্থা। ধোপা এক টানে নদীর তীরের নুড়িপাথরের ওপরে ফেলে দিল।

সেইদিন থেকে শেয়াল আর খরগোশ শত্রু হয়ে গেল। তাই খরগোশকে দেখলেই শেয়ালরা তেড়ে মারতে যায়।

ছবি। শঙ্কর বসাক



নেংটির পৃথিবী

সুখেন্দু মজুমদার

এক ছিল নেংটি ইঁদুর। ভারী চটপটে আর ছটফটে সে।

শুধু কি তাই?

না না। হাবেভাবে খুউব বাউন্ডুলে। তাকে নিয়ে মা-নেংটি হিমশিম খায়। বাবা-নেংটি হিমশিম খায়। সেদিকে নেংটির কোনো খেয়াল নেই। তার ভীষণ দেখার ইচ্ছে পৃথিবীটা দেখতে কেমন।

যেই না ভোর হওয়া অমনি শুরু তার ছটফটানি। সুযোগ পেলেই বাসা থেকে উধাও। কখনও ভাবে পুবের পাহাড়ের দিকে যাবে। কখনও ভাবে পশ্চিমে যাবে। মার কাছে শোনা দক্ষিণ দিকে নদী আছে।

ছোটো ছোটো পায়ে দৌড়ে হঠাৎ ফিরে আসে নেংটি। বেলা বাড়ে। সকাল গড়িয়ে দুপুর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। যাওয়া আর হয়ে ওঠে না।

কখনও মা খুঁজে বেড়ায়। নেংটি তখন বাসায় নেই। বাবা ছোটাছুটি শুরু করে। হঠাৎ-ই ফিরে এসে সবাইকে চমকে দেয়।

মা নিশ্চিন্ত হয়ে কাছে ডাকে। কী রে কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ভারী গলায় বাবা বলে, কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

নেংটির মুখে কোনো কথা নেই। চুপচাপ বাসায় বসে থাকে আর ভাবে।

এক দিন। দুই দিন। তিন দিন। এমনি করে দিন কাটে। মনে মনে ঠিক করে, বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়। নিজেই দেখতে গেলে হয় পৃথিবীটা কেমন।

না। থাক। আবার ভাবে নেংটি। আগেভাগে জেনে নেওয়া ভালো। পথে যাকে দেখে তাকেই জিগ্যেস করে, পৃথিবীটা দেখতে কেমন। জান?

নেংটির কথা শুনে কেউ ভুরু কোঁচকায়। মুখ বেঁকিয়ে কেউ কেউ আবার ফিরে যায়। কিছুই জানা হয় না।

গোটাদিন ঘোরাঘুরির পর মা বাসায় ফেরে।

পৃথিবীটা দেখতে কেমন। মার কাছে জানতে চায় নেংটি।

নেংটির কথা শুনে মা অবাক। ঘাবড়ে গিয়ে গাছের ফোঁকরের বাসা থেকে পড়ে যায়-যায় অবস্থা। নিজেকে খানিকটা সামলে ঘুমোতে যাবার আগে মা বলল, কেমন আবার। এই ধর না চ্যাপটা মতো বড়োসড়ো একটা জায়গা।

বাবা এখনও ঘুমোয়নি। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলে, না না। ওসব বাজে কথা। পৃথিবীটা আসলে একটা চৌকোমতো জায়গা।

মা বলে, না না পৃথিবী মোটেই চৌকো নয়। ওটা চ্যাপটামতন।

বাবা বলে, হতেই পারে না। পৃথিবী এক্কেবারে চৌকো।

এই করে গোটা রাতটাই পার। দুজনের দুই মত। নেংটির মাথা বনবন করে ঘুরতে থাকে। গোটারাত চোখে ঘুম নেই।

মন খারাপ হয়ে গেল নেংটির। যার কাছে জানতে চায় সে নতুন কিছু বলে। কেউই একমত হতে পারে না। নেংটির হল বড়ো জ্বালা।

একদিন ঘুরেফিরে বাসায় ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল নেংটির। একটু-আধটু ভয় করছিল না যে তা নয়। কিন্তু ছেড়ে দেবার পাত্র নয় নেংটি। তাকে জানতেই হবে, পৃথিবীটা কেমন দেখতে।

হঠাৎ দেখে বটগাছের ডালে এক বুড়ো প্যাঁচা বসে। নেংটি এগিয়ে গেল তার কাছে। মুখটা উঁচু করে চিঁচিঁ শব্দে নেংটি জানতে চাইল, তুমি তো অনেক কিছুই জানো। ওহে প্যাঁচামশাই, আমাকে বলতে পারো পৃথিবীটা কেমন দেখতে?

প্যাঁচা তখন চোখদুটো বুজে বসা। নেংটির প্রশ্ন শুনে আরও খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর সবজান্তার মতো বলল, এটাও জান না। পৃথিবীটা দেখতে অনেকটাই গোলমতো।

উত্তরটা বেশ পছন্দ হয়েছে নেংটির। খুশিতে লাফাতে লাফাতে ফিরে আসে বাসায়।

তারপর গোটারাত একটার-পর-আর-একটা স্বপ্ন দেখে নেংটি। বারবার চোখের পাতায় পৃথিবীর ছবিটা ভেসে ওঠে। গোলমতন।

চোখে ঘুম নেই। রাত ফুরিয়ে এল বলে। নেংটির সে কী ছটফটানি। এবার নিজের চোখে



ব্যাপারটা দেখতে হবে। সত্যি, পৃথিবী গোল কি না।

যেই না ভোর হওয়া, সূর্য তখন সবে উঠব উঠব করছে। গাছপালা বনবাদাড় পেরিয়ে পাহাড়ের মাথায় একটু-আধটু আলো। আর অপেক্ষা করতে নারাজ নেংটি। বাসায় সবাইকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

লাফাতে লাফাতে চলল নেংটি। কোথায় যাবে। ভাবতে ভাবতে এক-পা দু-পা করে এগোয়। খুউব বেশি দূর তখনও যায়নি। সামনেই চোখে পড়ল বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগান। এদিক-সেদিক দেখে একটা ছোট্ট ফোঁকর দিয়ে টুক্ করে ঢুকে পড়ল বাগানে। বাগানে ঢুকেই চটপটে ছটফটে নেংটি অবাক। বাব্বা! এ যে সবজিবাগান। কত্তো বড়ো।

একছুটে এক্কেবারে বাগানের মধ্যিখানে। চারপাশ ভালো করে দেখে নিয়ে কুটকুট করে ছোটোছোটো দাঁতে বাঁধাকপি খেতে শুরু করল। একটু করে খায় আর চারপাশ দেখে। চারপাশ দেখে নিয়ে আবার কুটকুট করে খায়।

হঠাৎ নেংটির নজরে পড়ল একটা বড়োসড়ো গোল কুমড়ো। বাঁধাকপিখেতের পাশেই ছিল সেটা। দেখামাত্রই কিচকিচ শব্দ করে কথা বলতে বলতে আনন্দে লাফাতে শুরু করল নেংটি।

বাঁধাকপির ওপর লাফায় আর বলে ওটাই পৃথিবী। বুড়ো প্যাঁচা ঠিকই বলেছে।

আর খেয়ে কাজ নেই। চটপটের ছটফটানি আরও বেড়ে গেল। সেই কবে থেকে বসে আছে পৃথিবীটা দেখবে বলে।

বাঁধাকপির ওপর বসে বসে ছোট্ট ছোট্ট পা বাড়িয়ে দেয় নেংটি। ছোট্ট পায়ে নাগাল পাবে কেন। কুমড়োটা যে একটু দূরে।

নেংটির মন খারাপ হয়ে গেল। হাতের কাছে পেয়েও পৃথিবীর নাগাল পাবে তার জো নেই। তবে তো...

তবে তো কী হল আবার?

কী আর হবে। নেংটি মনে মনে ভাবতে শুরু করে। তবে তো পৃথিবী খুব কঠিন জায়গা।

কচি কচি বাঁধাকপির পাতাগুলো খেতে আর ইচ্ছে করে না। চটপটের ছটফটানি সব শেষ। বাঁধাকপির ওপর থেকে নেমে চুপচাপ বসে থাকে। কুমড়োটার কাছে এসে বসে। সত্যি দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

যেমনি বড়োসড়ো দেখতে, তেমনি তার রূপের বাহার। এক্কেবারে স্বপ্নের পৃথিবী।

বাগানজুড়ে ঝলমল করছে রোদ। আকাশটা কেমন নীলচেমতন। ইশ্‌ কী মিষ্টিমতন। বাঁধাকপির একটা বড়োসড়ো পাতার ছায়ায় বসে বসে নেংটি কত কী ভাবে। ভাবতে ভাবতে ছোট্ট পুঁতির মতো চোখদুটো বুজে আসে তার।

তারমানে ঘুম এল আর-কি!

নেংটি ঝটপট করে গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। কয়েকটা পা পিছিয়ে গিয়ে দিল এক লাফ। কুমড়োটা তাক করে।

তরপর?

তারপর বড়োসড়ো কুমড়োর গায়ে। যেমন খাড়াই তেমনি পিছল। একটু করে ওপরে উঠতে চায়। আবার নেমে আসে।

ছেড়ে দেবার ইচ্ছে মোটেই নেই নেংটির। কুমড়োর খাড়াই গা বেয়ে বেয়ে উঠে পড়ল কুমড়োটার ওপর। উঠে এপাশে তাকায়। ওপাশে তাকায়। ঘুরে ঘুরে বারবার।

দেখে আর অবাক হয় নেংটি। অবাক চোখে চারপাশ দেখতে থাকে। রোদে রোদে ঝলমল করছে। যতদূর চোখ যায়। সবুজ আর সবুজে ভরা। আনন্দে লাফাতে যাবে এমন সময়...

আবার কী হল?

বাগানের মালিক হঠাৎ এসে হাজির। বাগানে ঢুকে চোখে পড়ে গেল নেংটিকে। কুমড়োর ওপর নাচানাচি করছে। সে কী বিকট চিৎকার। কে ওখানে? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা।

নেংটির তখন ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। চুলোয় যাক দেখাশোনা।

পালা...পালা...পালা। কোনোরকমে হড়কাতে হড়কাতে অন্যদিকের গা বেয়ে কুমড়ো থেকে নেমে পড়ে নেংটি।

নেমেই চোঁ চাঁ করে একছুট। যতই চটপটে আর ছটফটে হোক, আসলে খুব ভয়

পেয়েছিল যে নেংটি।

তারপর আর কী? ছুটতে ছুটতে ফিরে এল সোজা গাছের ফোঁকরে ছোট্ট বাসাটায়। মা তখন নেংটির জন্যে হাঁ-করে বসে আছে। কখন ফিরবে।

বাসায় ঢুকে সোজা মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নেংটি। ভয় তখনও কাটেনি। এমন চিৎকার কখনও শোনেনি যে।

জান মা, বুড়ো প্যাঁচাটা ঠিকই বলেছে। খানিকটা দম নিয়ে মার কোলে মুখ রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নেংটি।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ মা। বুড়ো অনেক কিছু জানে। পৃথিবীটা সত্যি সত্যি গোল।

মা বলে, প্যাঁচাবুড়ো যখন বলেছে, তাই হবে। ও যে সবজান্তা।

আরও কী বলেছে প্যাঁচাবুড়ো, জান?

সে-সব আর-এক দিন শোনা যাবে, আজ থাক।

ছবি। শঙ্কর বসাক



সৈয়দ রেজাউল করিম

সে অনেক বছর আগের কথা। সে সময় মালদ্বীপের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করত দুই বুড়োবুড়ি। জমিজমা, টাকাপয়সা, ঘরবাড়ি, চাকর বাকর কোনও কিছুরই অভাব ছিল না তাদের। অভাব ছিল একটা সন্তানের। এজন্য মনে তাদের খুব দুঃখ ছিল। খোদাতালার দরবারে দু'হাত তুলে মোনাজাত করে বলেছে, 'হে দিন দুনিয়ার মালিক, হে রহমানের রহিম, তুমি আমাদের ঐশ্বর্য দিয়েছ, বৈভব দিয়েছ, দান ধ্যান করার তৌফিক দিয়েছ, এরজন্য তোমার দরবারে হাজার সুকরিয়া। শুধু যদি একটা....।'

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সালমা বিবির কোল আলো করে জন্ম নিল এক সন্তান। সে সন্তানের খবর পেয়ে মুখের হাসি মিলিয়ে গেল জাহিরসাহেবের। থেমে গেল কোলাহল। নিভে গেল আশার চেরাগ। আলোর রোশনাই।

ব্যাপার কি! কেন এই অভিমান? মেয়ে বলে কি সে সন্তান নয়? ছেলের থেকে মেয়ে কম কীসে? এরকম প্রশ্ন জেগেছে অনেকের মনে। কিন্তু ব্যাপারটা জেনে স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে।

আসলে নবজাতকের আকৃতি ছিল একটু অন্য ধরনের। আর পাঁচটা সাধারণ মানুষজনের মতো নয়। কতকটা ব্যাঙের মতো দেখতে ছিল সে। সে কথা শুনে বিমর্ষ হয়ে পড়ল সকলে।

পাড়াপড়শি, আত্মীয় স্বজন অনেকে অনেক কথা বলল। অনেক যুক্তি দিল। কিন্তু বেঁকে বসল সালমা বিবি। গলা লম্বা করে বলল, 'এ দুনিয়ায় হরেক কিসিমের জীব আছে। তারা যদি এ জগতে বাস করতে পারে, তাহলে আমার সন্তান বাস করতে পারবে না কেন? তারও তো বাঁচার অধিকার আছে।'

এ কথার প্রতিবাদ করার সাহস কারোর হল না। সালমা বিবির ছত্রছায়ায় তরতর করে বেড়ে উঠতে থাকল তার মেয়ে। তার রূপ দেখে অনেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেও অধিকাংশ লোকজন তাকে ভালোবাসত। কারণ সে দেখতে যতই কুৎসিত হোক, তার আচার আচরণ ছিল অতুলনীয়। তার বচন ছিল সুমধুর। মানুষজনের প্রতি তার ছিল সমধুর ব্যবহার। তাই সবার কাছে সে একদিন হয়ে উঠল অনন্যা।

বেশ ভালোই কাটছিল অনন্যার দিনগুলো। একদিন হঠাৎ বিপর্যয় ঘটে গেল। মাত্র কয়েকদিনের জ্বরে মারা গেল সালমা বিবি। আর সেটাই কাল হয়ে দাঁড়াল অনন্যার কাছে। সে যেন কেমন একাকী হয়ে গেল।

দুটো মাস যেতে না যেতেই জাহিরসাহেব বিয়ে করে নিয়ে এলেন এক স্বামী-হারা মহিলাকে, তার নাম মালেকা বিবি। তার সঙ্গে এল তার দুই মেয়ে। রুমা আর ঝুমা। তারা দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু মন ছিল অত্যন্ত কদাকার। তারা অনন্যাকে বড়োবোন বলে মানত না। চাকরানি বলে ভাবত। তাকে দিয়ে সংসারের সব কাজ করাত। নিজেরা ভালোমন্দ খেত, আর অনন্যার কপালে জুটত পোড়া রুটি। তবুও অনন্যা প্রতিবাদ করত না শুধু জাহিরসাহেবেরে মুখের দিকে চেয়ে।

সেদিন সকালে ঘাটে বসে বাসনকোশন মাজছিল অনন্যা। এমন সময় শুনতে পেল ঢেঁড়া পেটানোর আওয়াজ। শুনতে পেল ঢেঁড়াওলার গলা, 'এবারেও চুল ধোওয়া উৎসব হবে পয়লা ফাল্গুন। দেশ বিদেশের সুন্দরী যুবতীদের এই উৎসবে অংশ নিতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। ছোটো শাহজাদা ওই দিনেই খুঁজে নেবেন ছোটো শাহজাদিকে।'

খবর শুনে রুমা আর ঝুমার মনে খুব আনন্দ। তারা ওই উৎসবে যাবে। ছোটো রাজকুমার নিশ্চয়ই তাদের একজনকে পছন্দ করবে। দুই বোন উৎসাহ ভরে সাজসজ্জার দিকে খুব নজর দিল। তা দেখে অনন্যা বলল, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।'

অনন্যার কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল দুই বোন।

মালেকা বিবি ঠোঁট উলটে বলল, 'কুঁজোর আবার চিত হয়ে শোবার শখ।'

ঝুমা বলল, 'এই উৎসব সুন্দরীদের জন্য। তোমার মতো কালো ব্যাঙের জন্য নয়।'

অনন্যা বলল, 'আমাকে তোমরা নিয়ে যেয়ো, আমি না হয় বাইরে থাকব।'

দেখতে দেখতে উৎসবের দিন এল। সকাল সকাল সাজগোজ করে অনন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রুমা ঝুমা। অনেক আগেই পৌঁছে গেল তারা। রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকের কাছে অনন্যাকে রেখে ভিতরে ঢুকল রুমা ঝুমা। সেখানে অসংখ্য মানুষজনের ভিড়। একশোরও বেশি প্রতিযোগী। প্রতিযোগীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। কিছুক্ষণ পরে রাজকুমার আসবে।

ঝুমা ঝুমা তাড়াতাড়ি দাঁড়াল সেখানে।

এতদূরে এসে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে অনন্যাকে? সে না হয় দেখতে কালো কুৎসিত। ব্যাঙের মতো তার চেহারা। তা বলে তার অনুমতি মিলবে না ভিতরে ঢোকার? এরকম সাত পাঁচ ভেবে রাজবাড়ির প্রধান ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল অনন্যা। মিষ্টি সুরে দ্বাররক্ষীদের বলল তার মনের কথা। তার কথাবার্তা আচার আচরণে খুব খুশি হল তারা। তাকে ভিতরে ঢোকার অনুমতি দিল।

ভিতরে ঢুকে একপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অনন্যা। আর তার ঠিক পরেই শাহজাদা হাজির হল সেখানে। এক এক করে সব প্রতিযোগী দেখল। তাদের 'চুল ধোওয়া', 'চুল বাঁধা' লক্ষ করল। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলল, শাহজাদা 'আপনারা সকলেই সুন্দরী। তাই আমার পক্ষে কোনও একজনকে বেছে নেওয়া বড়ো কঠিন। কিন্তু বেছে আমাকে নিতেই হবে। কারণ আমার আব্বা কথা দিয়েছেন আজই আমার বিয়ে দেবেন। তাই আমি নির্ভর করতে চাই আমার ভাগ্যের উপর। জানি না আমার ভাগ্যে কী লেখা আছে! শুধু জানি আমার হাতের মুঠোয় আছে এক গুচ্ছ জুঁই পাপড়ি। এগুলো আমি ভাসিয়ে দেব আকাশের দিকে। ভাসতে ভাসতে সেই পাপড়ি যার মাথায় গিয়ে পড়বে সে হবে আমার বিবি।' একথা বলে মুঠোভরা ফুলের পাঁপড়ি ছুড়ে দিলেন আকাশে। আর সেই ফুল ভাসতে ভাসতে এখানে সেখানে পড়ল। শুধু একটা পাপড়ি পড়ল অনন্যার এক রাশ কালো চুলে।

তা দেখে সকলেই হায় হায় করে উঠল। গুঞ্জন শুরু হল সুন্দরীদের মধ্যে। ঝুমা ঝুমা রেগে গেল। মনে মনে খুব দুঃখ পেল ছোটো শাহাজাদা। কিন্তু উপায় কি? কথা রাখতে হবে তাকে। তাই বিয়ে করল অনন্যাকে।

বাড়িতে ফিরে মায়ের মুখ ঝামটা খেতে হল ঝুমা ঝুমাকে। জাহিরসাহেব অনেক কষ্টে শান্ত করল মালেকা বিবিকে। মালেকা বিবি মানতে চাইল না অনন্যা তাদের বড়ো মেয়ে।

এর পর অনেকদিন কেটে গেছে। দরবারে সেদিন বসেছিলেন নবাব নাসিরউদ্দিন। হঠাৎ তার কী মনে হল, তিনি ডেকে পাঠালেন তার চারপুত্রকে। সমন পেয়ে বড়ো, মেজো, সেজো এবং ছোটোপুত্র হাজির হল দরবারে। নবাব বললেন, 'অনেকদিন হল আমি এই রাজ্যের নবাব। প্রজাদের সুখে শান্তিতে রাখার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছি। বয়স আমার অনেক হয়েছে। এখন আর শরীর বয় না। তাই আমি ঠিক করেছি, তোমাদের মধ্যে যে যোগ্য, তার হাতে শাসনভার তুলে দিয়ে আমি বিশ্রাম নেব।'

মেজো, সেজো, ছোটো সকলেই বিস্মিত হল। ভাবল, তাদের আব্বা এখনও বেশ শক্তসমর্থ। তাঁর এখনই শাসনভার পরিত্যাগ করার প্রয়োজন কি? তাছাড়া কে জানে, সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে নবাব তাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন কি না।

বড়োপুত্র ছিল একটু সাধাসিধে। সে কোনও ভাবনা চিন্তা না করে বলল, 'বলুন জাহাঁপনা! কীভাবে আমরা আমাদের যোগ্যতার পরিচয় দেব?'

বড়োপুত্রের কথা শুনে মনে মনে হাসলেন নবাব। তারপর একসময় হাসি থামিয়ে বললেন,



'পরীক্ষাটা খুব সোজা নয়। তবে অসম্ভব কিছু নয়। সাতটা দিন সময় পাবে তোমরা। এর মধ্যে আমাকে একটা সোনার হরিণ এনে দিতে হবে। যে এনে দিতে পারবে তার হাতে তুলে দেব এই রাজ্য।

নবাবের কথা শুনে চারজনেই হতবাক। সোনার হরিণ কখনো হয় না কি? কিন্তু সে-কথা জিজ্ঞেস করার মতো সাহস হল না কারও। মাথা নত করে তারা দরবার ছেড়ে যে যার মহলে গিয়ে ঢুকল। তাদের ম্লান মুখ দেখে এক বৃদ্ধা শুধাল, 'তোমাদের কী হয়েছে বাছা? তোমাদের মুখ এত ভার কেন?'

মেজোপুত্র এক এক করে বলল সব কথা। সে-কথা শুনে বৃদ্ধা বলল, 'কে বলল সোনার হরিণ নেই? রামায়ণে সীতা বায়না ধরেছিল না, সোনার হরিণ এনে দাও। তোমরা বাছারা বনে যাও, নিশ্চয়ই সোনার হরিণ পাবে। নবাব হবে, কষ্ট করবে না, তা কি হয়?

ভরসা পেয়ে বড়ো মেজো, সেজো তিনজনেই লোকলস্কর নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। যে-করেই হোক, সোনার হরিণ ধরে আনতেই হবে।

এদিকে ছোটো কুমারের কাছে যখন ছোটো শাহজাদি ব্যাপারটা শুনল, তখনই সে বলল,

'তোমাকে আর জঙ্গলে যেতে হবে না। এ নিয়ে কোনো চিন্তাও করতে হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে খাওয়াদাওয়া কর। ঘুমাও। সাত দিনের দিন তুমি পেয়ে যাবে সোনার হরিণ।'

এ কথা শুনে অবাক হল ছোটো শাহজাদা। তবে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিল না তার কথা। শাহজাদির নানা কাজে তার পরিচয় সে পেয়েছে।

সাত দিনের দিন ভোরে তখনও ঘুম ভাঙেনি ছোটো শাহজাদার। তার ঘুম ভাঙল শাহজাদির ডাকে। চোখ মেলে দেখল তার কোলে একটা সোনার হরিণ।

সাত দিনের দিন এক এক করে দরবারে হাজির হল তিন ভাই। তাদের ছিল জঙ্গলের তিন-তিনটে হরিণ। সে হরিণগুলো ছিল খুব সাধারণ। সোনার লেশমাত্র ছিল না তাদের গায়ে। কিন্তু ছোটো শাহজাদা যখন দরবারে তার সোনার হরিণ নিয়ে এল তখন বিস্ময়ে অভিভূত নবাব। ভাবলেন, এ কী করে সম্ভব! সোনার হরিণ কি হয়? কিন্তু পরখ করে দেখলেন, সত্যিই হরিণের বন্ধল সোনার। নবাব কিছু বলার আগেই বড়ো শাহজাদা বলল, 'যোগ্যতার এই পরীক্ষা যথার্থ নয়। আবার নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হোক।'

অন্য দু ভাই বলল, 'বেশ, তাই হোক।'

নবাব বললেন, 'তোমরা তিনজনে যখন চাইছ, তখন তাই হোক, তবে এর পরে আর কেউ না করতে পারবে না।'

তিন পুত্র সমস্বরে বলল, 'ঠিক আছে তাই হবে।'

'—এবারে যে কাজটা করতে দেব তুলনায় তা অনেক সহজ। আশা করি তোমাদের অসুবিধা হবে না। এর জন্যও তোমরা সাতটা দিন সময় পাবে। আমাকে রান্না করা মাংস ভাত এনে খাওয়াবে। সে মাংস ভাত যেন তরতাজা থাকে। কোনও কারণেই তা যেন বাসি না হয়।'

আব্বাজানের কথা কেমন যেন ধাঁধার মতো মনে হল ছোটো শাহজাদার। বড়ো মেজো সেজো এমন ভাব দেখাল যেন এ খুব সহজ কাজ। কিন্তু টাটকা বাসির গোলকধাঁধা মাথায় ঢুকল না ছোটোর। বিষণ্ণ মনে সে নিজের মহলে ফিরে এল।

ছোটো শাহজাদি সব শুনে বলল, 'এতে এত চিন্তা করার কী আছে? দিনের দিন তোমাকে আমি মাংসভাত রান্না করে দেব। সেটা নিয়ে যাবে দরবারে।'

শাহজাদির আশ্বাস পেয়ে নিশ্চিন্ত হল সে। তাই আনন্দ ফূর্তিতে দিন কাটাতে থাকল সে।

সাত দিনের দিন ছোটো শাহজাদি রান্নাবান্না করে ঘুম থেকে জাগাল ছোটো শাহজাদাকে। হাসিমুখে বলল, 'দরবারে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। মাংসভাত আমি রান্না করে রেখেছি।'

হাঁড়িসমেত মাংসভাত দেখে ছোটো শাহজাদা অবাক হল।

'হাঁড়ির নীচে আবার ওটা কী?' জিজ্ঞেস করতেই হাসিমুখে বলল সে, 'ওটা আগুনের চুল্লি। এটা সমেত তুমি নিয়ে যাবে। আগুনের আঁচে মাংস ভাত কখনই বাসি হবে না।'

যথারীতি সেবারেও ছোটোর জয় হল। নবাব ঘোষণা করতে গেলেন তাঁর উত্তরসূরির নাম, ঠিক সেই সময় আবার বাধা। আবার অনুনয়-বিনয়। বাধ্য হয়ে নবাব বললেন, 'ঠিক আছে, এবারেই শেষ। এরপরে আর আমি কোনও কথা শুনব না।'

একথা বলে তিনি একটু দম নিলেন। তারপর একসময় বললেন, 'বুঝতে পারছি আগের দুটো পরীক্ষা খুব কষ্টের হয়েছিল। এবারে আর কোনও কঠিন পরীক্ষা নয়। একেবারে সোজা প্রশ্ন। সোজা কাজ। সময় ওই সাতটা দিন। সাতদিনের মধ্যে এই দরবারে হাজির করতে হবে পৃথিবীর সেরা সুন্দরীকে। যে সেরা সুন্দরীকে হাজির করতে পারবে সে হবে আমার এই মসনদের অধিকারী।'

এই কথা শুনে বড়ো, মেজো, সেজো শাহজাদাদের সে কী আনন্দ, যাক এবার বাঁচা গেল। দু-দুবার তাদের টপকে জিতে গিয়েছিল ছোটো ভাই। এবার আর তা হবে না, এবারে নির্ঘাত সে হেরে যাবে। কারণ তাদের বিবিরা বিশ্বসুন্দরী। 'চুল ধোওয়া', 'চুল বাঁধা' অনুষ্ঠানে তারা নির্বাচিত। তাদের হাজির করবে দরবারে। কিন্তু ছোটো বিবি দেখতে কদাকার। এখন ছোটো শাহজাদা কী করবে? লজ্জায় সে হয়তো হাজির হবে না দরবারে।

মনে মনে ওরা যাই ভাবুক, ছোটো শাহজাদা কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিল। বিবির প্রতি তার অগাধ ভরসা। যে মেয়ে সোনার হরিণ জোগাড় করে দিতে পারে, যে এত ভালো মাংসভাত রান্না করতে পারে, সে নিশ্চয়ই নিজেকে পরমা সুন্দরী করে তুলতে পারে। তাই বেশ হাসিখুশি মুখে বাড়ি ফিরল সে।

তার মুখ দেখে ছোটো শাহাজাদি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি নবাব হয়ে গেলে না কি? এত আনন্দ, এত উৎসাহ, ব্যাপার কী?

ছোটো রাজকুমার গড়গড় করে বলে গেল সব ঘটনা।

শাহজাদি বলল, 'এর জন্য তুমি চিন্তা করো না। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

দিন গড়াতে গড়াতে সপ্তম দিনে এল।

খুব সকালে উঠে পড়ল ছোটো শাহাজাদি। বলল, 'তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। দরজা বন্ধ করে আমি সাজগোজ করে নিই। দেখতে দেখতে সময় হয়ে যাবে। না হলে সময়মতো দরবারে পৌছোন যাবে না।'

ছোটো শাহজাদা আর দেরি করল না। পদ্মপুকুরে গিয়ে স্নান করল। বাড়ি ফিরে ভালো পোশাক পরিচ্ছদ পরল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াল, গায়ে সুগন্ধী আতর মাখল। তারপর ঘরের দরজায় টোকা মারল।

দরজায় টোকা মারতেই শাহজাদি বার হয়ে এল, তাকে দেখে অবাক শাহজাদা। মনের মধ্যে যে বিশ্বাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তা ধুলোয় মিশে গেল এক মুহূর্তে। তাকে নিয়ে দরবারে কী করে যাবে সেটাই বড়ো প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। তার বিবি একটুও সাজেনি।

শাহজাদার বিষণ্ণ মুখ দেখে শাহজাদি বলল, 'তোমার অত ভাবতে হবে না, তাড়াতাড়ি দরবারে চলো।'

কী আর করা, অগত্যা দুজনে হাত ধরাধরি করে দরবারের পথে রওনা হল।

দরবারে তখন হাজির ছিল নবাব, তার বেগম, তিন ছেলে ও তিন বউমা। তারা অপেক্ষা করছিল ছোটো শাহজাদা আর তার বিবির জন্য। এমন সময় ওরা দুজনে প্রবেশ করল। ওদের দেখে বড়ো, মেজো, সেজো হো হো করে হেসে উঠল, একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ল সবার চোখে

মুখে, শেষ পর্যন্ত নিজের বিবিকে নিয়ে এল এত বড়ো মুর্খ সে? খুব গোঁসা হল নবাবের। নিজেকে সামলাতে না পেরে তিনি শুধালেন, 'কোথায় তোমার বিশ্বসুন্দরী? এ তুমি কাকে নিয়ে এসেছ?'

প্রশ্ন শুনে ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে গেল ছোটো শাহজাদা। গলা দিয়ে কোনও স্বর বার হল না তার। অবস্থা সামাল দিতে উঠে দাঁড়াল তার বিবি। বেশ গম্ভীর গলায় সকলকে শুনিয়ে বলল, 'মহারাজ! আমি সেই বিশ্বসুন্দরী।'

একথা বলে ব্যাঙের চামড়াটা খুলে ফেলল শরীর থেকে। আর তার ঝলমলে রূপের ছটা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তার রূপ দেখে চোখ ফেরাতে পারল না কেউ। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল সকলে।

সম্বিত ফিরে এল নবাবের। তিনি সানন্দে ঘোষণা করলেন তাঁর উত্তরসূরির নাম।

কে?

কে আবার, সেই ছোটো শাহজাদা!

ছবি। শঙ্কর বসাক



বানর বাদশাহ

মযহারুল ইসলাম

এক দেশে আজম নামে এক শহর ছিল। এই শহরের রাজা ছিল বলবান। একের পর এক বলবান রাজা ছয়টি বিয়ে করলেন। ছয় রানিই রাজাকে হরিণের মাংস খাওয়ার অনুবোধ জানাল।

রাজা প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে শিকারের আয়োজন করতে আদেশ দিলেন এবং সৈন্যসামন্তসহ শিকারে বেরিয়ে পড়লেন। বহু জঙ্গল ঘুরে চেষ্টা করলেন—হরিণের দেখা পেলেন না। অবশেষে এক ভাঙা মসজিদ দেখে রাজা সেখানে বিশ্রামের আয়োজন করলেন। মসজিদে প্রবেশ করে রাজা এক সুন্দরী যুবতীকে দেখে তাকে ধরে রাজধানীতে নিয়ে এলেন এবং সমারোহের সঙ্গে তাকে বিয়ে করলেন। কিছুদিন পর সাত রানির সাত সন্তান জন্মগ্রহণ করল। ছয় রানির ছয়টি ফুটফুটে ছেলে আর ছোটোরানির একটি বানর হল। রাজা রাগে অস্থির হয়ে ছোটোরানিকে বানর-সন্তানসহ দূরে একটি গ্রামে নির্বাসন দিলেন এবং রানির বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখলেন। বানর একটু বড়ো হয়েই স্কুলে পড়তে যাবার জন্য মায়ের কাছে আবদার শুরু করল। বন্দিনী রানি বানরকে স্কুলে শিক্ষকের কাছে পাঠালেন—যদি শিক্ষক বিনা বেতনে তাকে পড়াতে রাজি হয়, উত্তম। অন্যথা তাকে এ বাসনা ত্যাগ করতে

হবে। বানর স্কুলে গিয়ে শিক্ষকের সম্মুখে গানের সুরে সবিনয়ে প্রস্তাব পেশ করল—

শোনো শোনো ও নারে শিক্ষক, শিক্ষক বলি যে তোমারে
দেহ আজ্ঞা তোমার স্কুলে পড়িবারে, হে।

শিক্ষক বানরের গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে অগত্যা তাকে স্কুলে ভরতি করে নিল। অল্পদিনের মধ্যেই বানরের মেধা প্রকাশ পেতে লাগল। রাজার ছয় পুত্র যেখানে একটি বই শেষ করতে পারল না সেখানে বানর একশোটি বই শেষ করে ফেলল। রাজার ছয় পুত্র যখন মাত্র চারটি বই শেষ করল, বানর ততদিনে দশ গোরুর গাড়ি বোঝাই গ্রন্থ পড়ে শেষ করল। ছয় পুত্র ষড়যন্ত্র করে নিজেরাই নিজেদের পুস্তক ছিঁড়ে রাজার নিকট বানরের বিরুদ্ধে নালিশ করল। রাজা বানরকে কেটে ফেলতে হুকুম দিলেন। জল্লাদ যখন জঙ্গলে নিয়ে বানরকে হত্যার জন্য উদ্যত হল, বানর সুবিচারের প্রার্থনা জানাল। রাজার নিকট নিয়ে এলে রাজা স্কুলের শিক্ষককে ডাকলেন। শিক্ষক বানরকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করলেন। বানর মুক্তি পেল। ছয় পুত্র রাগে ও অভিমানে বানরের দৃষ্টি থেকে দূরে যাবার জন্য বাণিজ্য-গমনের প্রস্তাব জানাল। রাজা আয়োজন করলেন এবং ঘোষণা করলেন, যে ছেলে সোনার পাখির বাসাসহ সোনার গাছ আনতে পারবে সে-ই রাজা হবে। বানর এই আয়োজন দেখে নিজেও বাণিজ্য যাত্রার জন্য রাজার নিকট আবেদন জানাল :

শোনো শোনো ও নারে রাজা, রাজা বলি যে তোমারে
তুমি আমার পিতা এ কথা পারো কি ঢাকিবারে
আমি বানর, কুৎসিত জানোর, আজ্ঞা দেহ বাণিজ্যেতে যাই
যেখানে যায় আমার প্রাণের দোসর ছয় ভাই ও হে।

রাজা বিরক্ত হয়ে বানরকে দূর করে দিলেন। তবে বললেন যে, কালিদহে পনেরো বিশ বছর হল একটি ভাঙা নৌকো পড়ে আছে। সম্ভব হলে সেইটি নিয়ে বানর বাণিজ্যে যেতে পারে এবং এতে তার কোনও আপত্তি নেই।

বানর কালিদহে গিয়ে পানির নিকট গানের সুরে অনুরূপ আবেদন জানাল। পানির পরি কৃপাপরবশ হয়ে অনুমতি দিল—যদিও নৌকোটি দিলে তার ঘুমানোর অসুবিধা হবে, কেন না গত পনেরো বিশ বছর সে ওই নৌকাতেই ঘুমোয়। যা হোক, পানির পরি ভরসা দিল, যাত্রার দিন কালিদহের কূলে এলেই সাজানো নৌকো ঘাটে ভিড়বে। সুতরাং বানর গ্রামের সেরা মাঝি কলিমুদ্দিন ও সাথী মজিদকে নিয়ে নির্ধারিত দিনে মায়ের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে কালিদহের কূলে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সাজানো নৌকো এসে কূলে ভিড়ল। মাঝি কুলিমুদ্দিন হুকা ও মজিদ আগুনের ডিব্বাসহ নৌকোয় উঠল। বানর নৌকোয় উঠে গানের সুরেই তার জবাব দিয়ে আশীর্বাদ করল। বানর নৌকোকে প্রশ্ন করল : নৌকো তুমি প্রথমে কার ছিলে?

নৌকো জবাব দিল : রাজার!
বানর : তারপর কার ছিলে?

নৌকো : পানির পরির।

বানর : এখন কার?

নৌকো : তোমার।

বানর : এখন যদি আমার হও তবে বিনা বাওয়ায় পবনের গতিতে উজানপথে চলো।

নৌকো ছুটল এবং দুই দিনেই রাজার ছয় পুত্র যেখানে ছয় ডিঙাসহ বিশ্রাম করছিল সেখানে পৌছোল। কিছুক্ষণ পর রাজপুত্রগণ নৌকো ছাড়ল। সেখানে দুই নদীর মোহনা। এক নদীতে রক্ত আর অন্য নদীতে দুগ্ধ। ছয় ভাই বানরকে রক্ত-নদীতে প্রবেশ করতে আদেশ করে নিজেরা দুগ্ধ-নদীতে নৌকো চালিয়ে দিল। বানর তাই করল। ছয় ভাই নদীর মোহনায় একটি কলাগাছ পুতে প্রতিজ্ঞা করল, যে নৌকো আগে ফিরে আসবে সে সকলের জন্য এখানে অপেক্ষা করবে। বানরও প্রতিজ্ঞায় অংশ নিল।

বানরের নৌকো চলতে চলতে একদিন এমন একস্থানে পৌঁছোল যেখানে নদীর ঠিক মাঝে কটি ছোট্ট জমির উপর একটি বেলগাছ দাঁড়িয়ে ছিল এবং মনে হচ্ছিল নদীর প্রবল স্রোতে এখনি বেলগাছটি পড়ে যাবে। বানর কলিমুদ্দিন মাঝিকে নৌকো ধরিয়ে ওই জমির কিনারে মাটিতে শক্ত করে বাঁধতে বলল। দুপুরবেলা বেশ পেট ভরে খেয়ে একটি লম্বা মজবুত রশির এক প্রান্ত কোমরে বেঁধে অপর প্রান্ত কলিমুদ্দিনের হাতে দিয়ে বানর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যাবার সময় উপদেশ দিল নীচে থেকে রশিতে যখন সে ঝাঁকি দিতে থাকবে তখন যেন কলিমুদ্দিন ও মজিদ রশি টেনে ওপরের দিকে তুলতে তাকে। বানর পানির নীচে গিয়ে দেখল এক বিরাট রাজপ্রাসাদ। তার দরজায় ঢুকতেই বানর বুঝতে পারল এ একটি জাদুর দেশ। কেননা সঙ্গে সঙ্গে তার বানরের খোলস খুলে গেল এবং সুন্দর সুপুরুষ এক যুবক হিসেবে নিজেকে দেখতে পেল। এই প্রথম বানর বুঝতে পারল সে মানুষ, বানর নয়। বানরের খোলস তার বাইরের আবরণ মাত্র। সে তখন আবরণটি হাতে করে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকল এবং বহু সন্ধানের পর এক ঘরে এক সুন্দরী যুবতিকে মৃতা শায়িতা অবস্থায় দেখতে পেল; অন্য কোথাও একটি মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। যুবতির শিথানের কাঠি পৈথানে ও পৈথানের কাঠি শিথানে নিতেই সে জেগে উঠে বসে যুবক (বানর)-কে দেখে অবাক হয়ে গেল। সে বলল, এ হচ্ছে রাক্ষসের পুরী। সন্ধ্যা হলেই সব রাক্ষস চলে আসবে এবং খেয়ে ফেলবে।

যুবতি যুবককে বাঁচানোর জন্য উৎকণ্ঠিতা হয়ে উঠল। যুবক প্রশ্ন করে জানতে পারল, যুবতি কোনো এক রাজকন্যা। তার মা বাবা বা আত্মীয়-স্বজন সবাইকে রাক্ষসরা খেয়ে ফেলেছে। রাক্ষসদের বৃদ্ধা মাতার গা টিপে দেবার জন্য বা উকুন মারবার জন্য শুধুমাত্র তাকেই বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। যুবক তখন যুবতিকে অনুরোধ করল সন্ধ্যায় রাক্ষসরা ফিরে এলে তাদের মায়ের নিকট জিজ্ঞেস করে সে যেন জানতে চেষ্টা করে যে, কী করে রাক্ষসদের

মৃত্যু হবে। যুবতি রাজি হয়ে যুবককে একটি অন্ধকূপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে উপদেশ দিল। যুবক আবার দুই কাঠির স্থান পরিবর্তন করে যুবতিকে মৃতা অবস্থায় রেখে অন্ধকূপে গিয়ে পালাল।

সন্ধে বেলা রাক্ষসরা এসেই বলল, মানুষের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। যুবতীকে জাগালে, যুবতি বলল, আসলে এ গন্ধ যুবতির শরীরের। এখানে মানুষ আসবে কী করে।

রাক্ষসরা অতঃপর যে যার স্থানে ঘুমোতে গেল।

বুড়ির গা টিপে দিতে দিতে যুবতি বলল, আচ্ছা বুড়িমা. তোমার ছেলেরা যে রকম মানুষের গন্ধ পেয়েই খাই খাই করে, তুমি মরে গেলে ওরা যে আমাকে খেয়েই ফেলবে। তুমি আমার একটা বিহিত কর না মা।

বুড়ি শুনে খিল খিল করে হেসে বলল, আমাদের মরণ কী অত সহজ রে। রানির পেটে হবে এক বানর সেই বানর এখানে এসে সাত তাল জমির নীচে এক পুকুরে ঢুকবে। সেই পুকুরের তলায় একশো মন ভারী লোহার কলসির নীচে আছে এক ভ্রমর। সেই ভ্রমর মারলে তবেই আমরা মরব। আরে রানির পেটে বানরও জন্মাবে না, আর জন্মালেও সে আসতে পারবে না, এলেও ওই ভ্রমরের কাছে সে যেতে পারবে না। তুই নিশ্চিন্ত থাক। আমাদের মৃত্যু নেই।

পরদিন সকালে রাক্ষসরা চলে গেলে যুবতির নিকট সব জানতে পেল এবং বানরের খোলস দেখিয়ে নিজের আত্মপরিচয় দিল। মেয়েটিও নিজের নাম বলল—তার নাম ফুলমতী কন্যা।

অতঃপর যুবক সাত তাল জমির নীচে চলে গেল এবং যথানিয়মে পুকুরের তলায় কলসি সরিয়ে ভ্রমরটিকে ধরে মেরে ফেলল। রাক্ষসগণ মরে গেল। যুবক ফুলমতীকে বিয়ে করল।

ফুলমতী বলল সে যেন দক্ষিণে যায়, পূর্বে যায়, কিন্তু উত্তর দিকে না যায়।

যুবকের কৌতূহল হল। উত্তর দিকে যেতেই সে একটি সুন্দর কুল গাছ দেখতে পেল যার বীজ মাটিতে পড়ছে, গাছ হচ্ছে, ফল ধরছে আবার ঝরে পড়ছে। সে একটি কুল নিয়ে মুখে দিতেই জাদুবলে সে গাছের ডালের সাথে পা রেখে মাথা নীচের দিকে দিয়ে ঝুলতে থাকল। তখন গানের সুরেই ফুলমতীর নিকট সে আবেদন জানাল। ফুলমতী এসে জাদুশক্তির নিকট প্রার্থনা করতেই যুবক মুক্তি পেল। যুবক তখন কয়েকটি কুলের বীজ নিয়ে নিজের নিকট রাখল। অনুরূপভাবে পশ্চিম দিকে গিয়ে সে আমের গাছের কবলে পড়ে এবং ফুলমতির প্রার্থনায় মুক্তি পায় ও আমের কয়েকটি আঁটি নিজের নিকট রাখে।

আর একদিন সে রাজপ্রাসাদের ওপরে ছাদে একটি ছিদ্র দেখল যা একবার খুলছে আর একবার বন্ধ হচ্ছে। সে ছিদ্রপথে ভেতরে গিয়ে দেখতে পেল একটি সোনার গাছে সোনার পাখির বাসা। সে বুঝতে পারল, এই গাছ নিয়ে গেলে তবেই তার পিতার প্রতিশ্রুতি অনুসারে সে রাজ্য পাবে। সুতরাং সে গাছটি আনবার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে গাছের



সঙ্গে সে জাদুবলে আটকা পড়ে গেল। আবার ফুলমতির প্রার্থনায় সে ওই সোনার গাছসহ মুক্তি পেল।

অতঃপর সোনার গাছ ও ফুলমতীসহ্ যুবক দেশে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করল। প্রস্থানের প্রাক্কালে সে ফুলমতিকে জীবনের সব কথা বলল এবং বানরের পোশাক পরেই তাকে দেশে ফিরতে হবে এ কথাও জানাল। ফুলমতী যেন কারও কাছে প্রকাশ না করে যে সে বানর নয়, মানুষ। ফুলমতী স্বামীর অনুরোধে রাজি হল। রসিতে টান দিতেই কলিমুদ্দিন ও মজিদ সোনার গাছ ও ফুলমতি কন্যাসহ বানরকে নৌকোর ওপর তুলে ফেলল। ফুলমতী বানরকে বলল, বেলগাছে একটি মাত্র বেল রেখে, আর সব বেল গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে যেতে হবে। বানর গাছে উঠে একটি বেল ভেঙে দেখল বেলের মধ্যে শুধু সোনা। সে ফুলমতীর উপদেশ অনুসরণ করে নৌকোর একটি অংশ বেল দিয়ে বোঝাই করল।

অতঃপর নৌকো ভাটির পথে ছুটল এবং সেই মোহনায় কলাগাছ পোতা স্থানে এসে বানর দেখল তার ছয় ভাই বহু পূর্বে সেখানে এসে অপেক্ষা করছে। তারা শূন্যহাতে ফিরে এসেছে।

এদিকে এই সময়েই খবর এল, ওই দেশের রাজকন্যা পণ করেছে, জাদু দেখিয়ে যে

তাকে মুগ্ধ করতে পারবে সে তাকে বিয়ে করবে, যে ব্যর্থ হবে তাকে কারাগারে বন্দি করা হবে। বানরের ছয় ভাই সাগ্রহে রাজকন্যার সম্মুখে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে কারাগারে বন্দি হয়ে পড়ল। বানর ফুলমতী কন্যার অনুমতি নিয়ে বানরের আবরণ রাজপ্রাসাদের কোথাও লুকিয়ে রেখে রাজপ্রাসাদে উপনীত হল এবং তার নিকট রক্ষিত কূল ও আমের বীজ মাটিতে ফেলে অপূর্ব যাদু দেখাল। বীজ মাটিতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে গাছ হল, ফল ধরল, পাকল এবং ঝরে পড়ল।

রাজকন্যা খুশি হয়ে যুবক (বানর)কে বিয়ে করল। যুবক সমস্ত বন্দিকে কারাগার থেকে মুক্তি দিল, কিন্তু তার ছয় ভাইকে মুক্তি দেবার পূর্বে পিঠে একটি করে কল্কি পোড়ানো সিল দিয়ে দিল। অতঃপর রাজকন্যাসহ সে বানরের পোশাক পরে নৌকোতে এসে উঠল এবং তার জীবনের সমস্ত ঘটনা নববিবাহিতা স্ত্রীকে বলল। দুই স্ত্রীর মধ্যে সখ্যতা সে একান্তভাবে কামনা করে নৌকো ছেড়ে দিল।

এদিকে ছয় ভাই বানরের দুই সুন্দরী স্ত্রী দেখে হিংসায় জ্বলতে থাকল এবং একদিন বানরকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করে নিজেদের নৌকোয় নিমন্ত্রণ করল। নৌকোতে তাস খেলতে খেলতে সবাই মিলে বানরকে পানিতে ফেলে দিল এবং বানরের নৌকোসহ রাজধানী আজম শহরে ফিরে এল। রাজা সমাদরে পুত্রদের গ্রহণ করল।

এদিকে বানর পানিতে পড়ে একজন জেলের সাহায্যে কূলে উঠে হাঁটতে হাঁটতে আজম শহরে ফিরে এল। সে রাজসমীপে নিজের নৌকো ও দুই স্ত্রীর দাবি জানাল।

বানর না-ফেরা পর্যন্ত তার দুই স্ত্রী আহার বিহার বন্ধ করে শুধু কেঁদে সময় অতিবাহিত করছিল। রাজা কিন্তু এসব কথার কিছুই বিশ্বাস করল না। বানর তখন রাজ্যের সমস্ত লোক ডেকে বিচারের দাবি জানাল। নির্ধারিত দিনে বিচার বসল। বানর সমস্ত ঘটনা বলল এবং তার ছয় ভাইয়ের পিঠে সিলের কথাও ঘোষণা করল। সমস্ত লোক দেখল ঘটনা সত্য। তখন বানর তার সোনার পাখির বাসাসহ সোনার গাছ নিয়ে সবার সম্মুখে উপস্থাপিত করল। রাজা প্রতিশ্রুতি অনুসারে বানরকেই তার রাজ্যের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করল। দুই একদিন পর বানর যখন রাতে দুই স্ত্রীসহ বানরের আবরণ দূরে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল, সেই সময় ফুলমতী কন্যা তার আবরণটি পুড়িয়ে ফেলল। রাজা সুপুরুষ সন্তানকে পেয়ে খুশি হল ও তার বন্দিনী ছোটো রানিকে নিয়ে এসে মহাসমারোহে উৎসব করল এবং বানরকে রাজ্যের বাদশাহ হিসেবে অভিষিক্ত করল। সেই থেকে নতুন রাজার নাম হলো বানর বাদশাহ।

ছবি। সুব্রত মাজী



পঞ্চানন মালাকর

এক ছিল রাজা, তার ছিল সাতরানি। বিশাল তার রাজ্য। হাতিশালায় হাতি ঘোড়াশালায় ঘোড়া আর রাজভাণ্ডার ভরা মণিমুক্তায়। কিন্তু তবুও রাজার মনে সুখ নেই। তার মনে বড়ো দুঃখ সাত-সাতটা রানির কোনো সন্তান নেই। আটকুঁড়ে নাম বুঝি তার ঘুচল না।

একদিন রাজবাড়িতে এক সন্ন্যাসী এসে রাজার সঙ্গে দেখা করলেন। রাজার দুঃখের কথা শুনে তিনি তার হাতে একটা গাছের শিকড় দিলেন। বললেন, এই শিকড় বেঁটে সব রানিকে খেতে দিলেই তাদের একটি করে পুত্র হবে।

রাজা খুশি হয়ে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে অন্দরমহলে গিয়ে উপস্থিত হল। বড়রানির হাতে গাছের শিকড় দিয়ে বলল, এই শিকড় বেঁটে সকলে ভাগ করে খাও। সবারই একটি করে ছেলে হবে।

শিকড় পেয়ে রানিরা খুব খুশি হল। সাত রানি নিজেদের মধ্যে স্থির করল আজ সবাই তাড়াতাড়ি সব কাজ সেরে, স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ওষুধ বেঁটে খাবে। বড়োরানির কাজ সবার আগে শেষ হল। সে সেজোরানিকে শিকডটা বাঁটতে বলল। সেজোরানি শিলনোড়ায় বাঁটতে

গিয়ে কিছুটা নিজে খেয়ে ফেলল। বাকিটা বড়োরানিকে এসে দিল।

সবার ছোট দুই রানি তখনো তাদের হাতের কাজ শেষ করতে পারেনি। বড়োরানি চারজনা মিলে শিকড়টা ভাগ করে খেয়ে নিল। ছোট-দুই রানির কথা তাদের খেয়াল হল না। তারা যখন কাজ সেরে এসে বড়োরানিকে বলল, দিদি আমাদের শিকড়ের ভাগ কোথায়।

বড়োরানি বলল, এই যাঃ। একদম ভুল হয়ে গেছে। তোদের কথা তো মনেই ছিল না। এখন কী করি।

মেজোরানি বলল, কী আর করবি। তোরা একজনে শিল আর একজনে নোড়াটা ধুয়ে খা। ছেলে যদি হয় তবে তাতেই হবে।

ছোটো দুই রানি আর কী করে। একজন শিল ধুয়ে খেল, একজন নোড়াটা ধুয়ে খেল।

এরপর দশমাস দশদিন পরে বড়ো পাঁচ রানির পাঁচটি ফুটফুটে ছেলে হল। আর যে রানি শিল ধুয়ে খেয়েছিল তার হল একটি প্যাঁচা-সন্তান। নোড়া ধুয়ে খেয়েছিল বলে ছোটরানির হল একটা বাঁদর।

পাঁচ রানির ছেলে দেখে রাজা খুব খুশি। রাজবাড়িতে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। আর ছোট দুই রানির ঘরে কান্নায় রোল উঠল। রাজাও বড়ো পাঁচ রানিকে রত্নখচিত হার উপহার দিলেন, আর প্যাঁচা আর বাঁদরের জন্ম দেওয়ার জন্য ছোট দুই রানিকে রাজবাড়ি থেকে বের করে দিলেন। রাজবাড়ি থেকে দূরে এক জঙ্গলের মধ্যে তাদের জন্যে দুটি কুঁড়ে ঘর করে দিলেন।

দিন যায়। রাজপ্রাসাদে পাঁচ রাজপুত্র আনন্দের সঙ্গে বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। আর ওদিকে প্যাঁচা আর বাঁদর জঙ্গলের মধ্যে মায়ের কাছে বড়ো হতে লাগল। পাঁচ রাজপুত্রের নাম রাখা হল,—হীরাকুমার, মানিককুমার, মোতিকুমার, পান্নাকুমার আর কাঞ্চনকুমার। প্যাঁচার নাম রাখা হল ভুতো। আর বাঁদরের নাম হল বুধো।

পাঁচ রাজপুত্রকে রাজা পাঁচটা সেরা পক্ষীরাজ ঘোড়া দিলেন। তাতে চড়ে তারা ঘুরে বেড়ায়। আর ভুতো আর বুধো থাকে একটা বকুল গাছে।

পাঁচ রাজপুত্র খুব ডানপিটে হয়েছে। তাদের অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাজার ভয়ে প্রতিবাদ করতে পারে না।

এদিকে ভুতো আর বুধো তাদের দুখিনি মায়ের কাজে সাহায্য করত।

একদিন পাঁচ রাজকুমার ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। জঙ্গলের পথে ঘুরতে ঘুরতে তারা একটা গাছে ভুতো আর বুধোকে দেখতে পেল। প্যাঁচা আর বাঁদর দেখে ভাবল এ দুটোকে ধরে নিয়ে গেলে বেশ মজা হবে। তারা তো আর জানত না ভুতো আর বুধো আসলে দুই দুয়ো রানির ছেলে। রাজা পেয়াদাকে হুকুম দিল ওদের ধরে আনতে। পেয়াদারা জাল নিয়ে ছুটল ভুতো আর বুধোকে ধরতে। জালে ধরা পড়ল দুজনে। তাদের নিয়ে যাওয়া হল রাজবাড়িতে। ভুতো আর বুধো কোনোদিন তো রাজবাড়ি দেখেনি। মণিমুক্তো বসানো রাজমহল ঝলমল করছে। সুন্দর সুন্দর ঘরে সাজানো রয়েছে খাটপালঙ্ক। তারা তখন

রাজপুত্রদের বলল, তোমরা আমাদের যখন ধরে আনলে, তখন আমাদের মায়েদেরও নিয়ে এসো।

রাজপুত্ররা বলল, তোদের মায়েরা কোথায়?

ভুতো আর বুধো তাদের মায়েদের কথা বলল। রাজকুমারেরা শুনে তো অবাক। প্যাঁচা আর বাঁদরের মা কি না মানুষ!

বড়ো রাজকুমার বলল, মজার কথা তো, তোদের মায়েরা মানুষ?

তার কথা শুনে একজন রাজকর্মচারী ভুতো আর বুধোর জন্মের গল্প বলল। তারা তখন জানতে পারল যে ভুতো আর বুধো আসলে তাদেরই ভাই। শুনে তো লজ্জায় তাদের চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। রেগে উঠে বলল, এই কে আছিস এ দুটোকে রাজবাড়ি থেকে বের করে দে।

আদেশ মাত্র রাজপেয়াদারা ভুতো আর বুধোকে রাজমহল থেকে তাড়িয়ে দিল। তারা আর কী করে, মায়েদের কাছে ফিরে গেল।

একদিন হয়েছে কি—সোনার খাটে বসে রূপার খাটে পা রেখে পাঁচ রানি পান খেতে খেতে গল্প করছে। এমন সময় এক দাসী এসে খবর দিল যে, রাজপ্রাসাদের সামনে নদীর ঘাটে একখানা তোতাপঙ্খি এসে ভিড়েছে। তাতে রূপোর বোট আর সোনার হাল ঝকমক করছে। সেই তোতাপঙ্খিতে বসে আছে এক অপরূপা সুন্দরী কন্যা, সোনার বরন কন্যার মেঘের বরন কেশ। কেশবতী কন্যা এক সোনার তোতাপাখির সঙ্গে গল্প করছে। শুনেই সব রানি ছুটে নদীর ঘাটে এসে দাঁড়াল।

রানিরা এসে ঘাটে দাঁড়াতেই তোতাপঙ্খি পাল তুলে চলতে আরম্ভ করল।

রানিরা বলল,

সোনার বরন কন্যা তোমার
মেঘবরন কেশ,
কোথায় যাইবা কন্যা তুমি,
কোথায় তোমার দেশ?

তোতাপঙ্খি থেকে কেশবতী কন্যা বলল, যে দেশের গাছে মুক্তোর ফুল আর ফল ধরে সেখানে আমি থাকি। সেখানে যদি কেউ গিয়ে মুক্তোর ফুল আনতে পারে, তবে আমি তারই দাসী হব।

এই বলে বাতাসের বেগে পলকের মধ্যে তোতাপঙ্খি নাও চলে গেল। বড়ো পাঁচ রানি তাদের পাঁচ কুমারকে ডেকে সব কথা বলল। রাজাও শুনলেন কেশবতী কন্যার কাহিনি। রাজপুত্রেরা যাবে সেখানে। তাই তিনি এক ময়ূরপঙ্খি নৌকা তৈরি করতে দিলেন। রাজা সকলকে ডেকে দরবারে বসলেন। রাজপুত্রেরা কীভাবে যাবে তার আলোচনা চলল। ভুতো আর বুধোও খবর পেয়ে দরবারে এসে উপস্থিত হল। বুধো এক লাফে গিয়ে রাজার কোলে গিয়ে বসল, ভুতো গিয়ে বসল রাজার কাঁধের উপর। দরবারে হুল্লোড় পড়ে গেল। দরবারের

সবাই ভয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেল।

ভুতো তখন রাজাকে বলল, বাবা আমরাও যাব মুক্তো ফলের দেশে।

রাজা তার প্যাঁচা আর বাঁদর পুত্রকে দেখে চোখের জল রাখতে পারলেন না। পুত্রস্নেহে তাদের দুজনকে কোলে নিয়ে প্রাসাদের মধ্যে চলে গেছেন।

এদিকে রাজকুমারদের যাত্রার আয়োজন সব শেষ। রানিরা তাদের নিজের নিজের পুত্রকে মনের মতো করে সাজিয়ে আনলেন। সবাই এক এক করে তাদের ময়ূরপঙ্খিতে চড়ে বসল। রাজাও এলেন ভুতো আর বুধোকে সঙ্গে নিয়ে। ভুতো আর বুধো রাজার কাছে আবদার করল, আমাদের ময়ূরপঙ্খি দাও। আমরাও দাদাদের সঙ্গে যাব।

শুনে তো রানিরা হেসেই বাঁচে না। প্যাঁচা আর বাঁদর যাবে মুক্তোর ফুল আনতে। রানিরা তাদের ধরে রাজার কোল থেকে নামিয়ে তাড়িয়ে দিল। রাজাও রানিদের ভয়ে কিছু বলতে পারলেন না।

রাজা ও রানিরা চলে গেলে বুধো বলল, ভাই ভুতু, এখন আমরা কী করি?

ভুতো বলল, কিছু তো বুঝতে পারছি না।

বুধো বলল, চল মায়েদের কাছে যাই।

এদিকে হয়েছে কী—ভুতো আর বুধোর মায়ের কাঁদতে কাঁদতেই দিন কাটে। তারা যখন শুনল যে পাঁচ রাজকুমার ময়ূরপঙ্খি নিয়ে মুক্তো ফুলের দেশে রওনা হয়েছে, তাদের ভুতো বুধোকে রাজা কিছুই দেননি শুনে তারা আরও কাঁদতে লাগল। কী আর করে। কাঁদতে কাঁদতে দুটো সুপারিগাছের খোলা নিয়ে ডোঙা তৈরি করে তা-ই নদীতে ভাসিয়ে দিল। মায়েদের কাছে যেতে যেতে সেই সুপারির খোলার ডিঙা দেখে বুধো বলল, ভাই ভুতু। এই সুপারির ডিঙা তো বেশ ভালোই। চল আমরা এতে চড়েই রওনা হই।

তারা দুজন সুপারির ডিঙায় চড়ে বসল।

রাজকুমারদের ময়ূরপঙ্খি তো ভেসে চলেছে। ভাসতে ভাসতে তারা এসে হাজির হল তিন ডাইনিবুড়ির দেশে। সেখানে যেতেই কিছু বুড়ো পেয়াদা এসে তাদের ময়ূরপঙ্খি আটক করল। রাজপুত্র আর তাদের লোকজন মাঝিমাল্লাদের ধরে নিয়ে গেল ডাইনিবুড়িদের কাছে। বুড়িরা তাদের ধরে জল ছাড়াই গিলে খেয়ে ফেলল। তারপর তারা শুয়ে পড়ল। রাত্রিতে রাজপুত্রদের চোখে ঘুম নেই। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, হায় হায়। চিরদিনের জন্যে এখানে বন্দি হয়ে থাকতে হবে। দেশেও ফিরতে পারব না। বাবা মায়ের মুখও আর দেখতে পাব না।

যখন তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, তখন বাইরে থেকে বুধোর ডাক শোনা গেল। দাদাভাইসব—তোমরা কোথায়?

ভিতর থেকে রাজপুত্ররা বলল, আমরা বুড়িদের পেটের মধ্যে আটকা পড়েছি।

বুধো বলল, ঠিক আছে, ভয় নেই। আমি বুড়ির নাক দিয়ে লেজ ঢুকিয়ে দিচ্ছি। তোমরা লেজ ধরে এক এক করে বাইরে এসো।

তারা বাইরে এসে দেখল ভুতো আর বুধো তাদের উদ্ধার করতে এসেছে। তারা বাইরে আসতেই ভুতো আর বুধো বলল, কথা না বলে আগে তরবারি দিয়ে বুড়িদের গলা কেটে ফেল।

রাজপুত্রেরা বুড়িদের গলা কেটে ফেলল। তারপর তাদের ময়ূরপঙ্খিতে গিয়ে উঠে বসল। ভুতো আর বুধোকে কেউ ডাকলও না। ময়ূরপঙ্খি সারারাত চলতে চলতে রক্তনদীর স্রোতে এসে পড়ল।

রক্তনদীর কোনো কুলকিনারা নেই। চারিদিকে সাগরের মত অথৈ জল আর জল। সেই অকূল জলের ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলল পাঁচ রাজপুত্রের ময়ূরপঙ্খি। কিন্তু কূল না থাকায় মাঝিমাল্লারা দিক ভুল করল। ভাসতে ভাসতে পথ ভুল করে ময়ূরপঙ্খি সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। মাঝিমাল্লারা হায় হায় করে কপালে হাত দিয়ে বসল। সাত দিন সাত রাত ধরে সমুদ্রে ভেসে চলল ময়ূরপঙ্খি। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে পড়ে ময়ূরপঙ্খি প্রায় ডোবে আর কী। এই বিপদে পড়ে রাজকুমারদের ভুতো আর বুধোর কথা মনে পড়ল। ওদের যদি সঙ্গে আনত, হয়তো এই বিপদে ওরা এবারও রক্ষা করতে পারত। কিন্তু এবার আর বুঝি জীবনের কোনও আশা নেই। এইসব ভাবতে ভাবতে দেখতে পেল সুপারিগাছের খোলার ডিঙা ভাসিয়ে ভুতো আর বুধো এসে হাজির। ময়ূরপঙ্খির সঙ্গে ডিঙা বেঁধে ভুতো আর বুধো রাজকুমারদের কাছে এসে বলল, মাল্লারা ময়ূরপঙ্খি উত্তর দিকে চালাও।

দেখতে দেখতে ময়ূরপঙ্খি একটা নদীর মোহনায় এসে পড়ল। সেই নদীপথে চলতে চলতে দেখতে পেল নদীর দুই তীরে নানারঙের ফুল আর ফলের গাছ। ফুলে ফলে গাছে গাছে রঙের মেলা বসে গেছে। কয়েকদিন ধরে কুমারেরা কিছুই খায়নি। সেই সব ফল পেট ভরে খেয়ে সবাই তৃপ্ত হল। খেয়েদেয়ে সুস্থ হয়ে রাজকুমারেরা বলল, প্যাঁচা আর বাঁদরকে আর সঙ্গে নেবার দরকার নেই। ওদের জলে ফেলে দাও। ওদের ডিঙিও ময়ূরপঙ্খি থেকে খুলে ভাসিয়ে দাও।

যেই কথা সেই কাজ। ভুতো আর বুধোকে জলে ফেলে দিয়ে ময়ূরপঙ্খি এগিয়ে চলল। কিছুদূর যেতেই হঠাৎ বিনা কারণে তাদের ময়ূরপঙ্খি ডুবে গেল। সবাই জলে তলিয়ে গেল। এর কিছুক্ষণ পরেই ভুতো আর বুধোর ডিঙি সেখানে এসে পড়ল।

বুধো বলল, ভাই ভুতু, আমার মনে হচ্ছে এখানে আমাদের দাদারা কোনো বিপদে পড়েছে। দাঁড়া আমি জলে ডুব দিয়ে দেখছি, কী ব্যাপার।

ভুতো বলল, মরুক। আমাদের কী।

বুধো বলল, এমন কথা বোলো না। আমি কোমরে দড়ি বেঁধে জলে ডুব দিচ্ছি। তুমি দড়ি ধরে বসে থাক। আমি দড়ি ধরে টান দিলেই আমাকে টেনে তুলবে।

এই কথা বলে বুধো জলে ডুব দিল, ভুতো দড়ি ধরে বসে থাকল।

বুধো জলের নীচে গিয়ে দেখল সেখানে এক বিরাট সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গ পাতালের দিকে চলে গেছে। বুধো সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেখানে দেখল এক বিশাল রাজপুরী। ধনদৌলত



মণিমাণিক্যে ভরা রাজপুরীতে, কিন্তু কোনও মানুষ দেখতে পেল না সে। ঘুরতে ঘুরতে দেখল এক খনখনে বুড়ি বসে কাঁথা সেলাই করছে। বুড়ি বুধোকে দেখতে পেয়ে হাতের কাঁথা ছুড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে হাজার পেয়াদা এসে বুধোকে বেঁধে রাজপুরীতে নিয়ে গেল। সেখানে সে দেখতে পেল পাঁচ রাজপুত্র বন্দি হয়ে পড়ে আছে। বুধো এবার সব রহস্য বুঝতে পারল।

পরের দিন সকালবেলা দাসীরা এসে দেখল বাঁদরটি মরে পড়ে আছে। তারা আর কী করে, বুধোকে মরা ভেবে বাইরে ফেলে দিল। আসলে তো বুধো মরেনি। মরার ভান করে পড়ে ছিল। ছাড়া পেতেই সে লাফ মেরে একটা গাছে উঠে বসল। সেখান থেকে সে দেখতে পেল রাজপুরীর শিশমহলে মেঘের বরন কেশ এক কন্যা বসে সোনার তোতাপাখির সঙ্গে গল্প করছে। বুধো গাছের ডাল থেকে প্রাসাদের ছাদের উপর গিয়ে উঠল। সে লুকিয়ে পিছন থেকে শুনতে পেল কেশবতী রাজকন্যা সোনার তোতাপাখিকে বলছে,

'রূপোর দাঁড়ে সোনার তোতা,
কেউ এল না, জীবন বৃথা।'

রাজকুমারীর মেঘবরন চুলে গোঁজা ছিল এক মুক্তোর ফুল। পিছন থেকে বুধো টুক করে সেই মুক্তোর ফুল নিয়ে নিল। সোনার তোতা বলল, দেখ তো তোমার ফুল কোথায়?

কেশবতী রাজকন্যা চুলে হাত দিয়ে দেখল তার মুক্তোর ফুল নেই। তখন সোনার তোতা বলল, তোমার পথ চাওয়া শেষ হল। যার জন্যে বসে আছ, সে এসে গেছে।

রাজকুমারী কেশবতী পিছন ফিরে দেখল, মুক্তোর ফুল হাতে একটা বাঁদর দাঁড়িয়ে আছে। দেখে তো সে দুঃখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু কী আর করে, শর্তমতো যে মুক্তোর ফুল নিতে পারবে রাজকন্যা তাকেই বিয়ে করবে। তাই সে তার হাতের বরমালা বুধোর গলায় পরিয়ে দিল। তখন বুধো হেসে জিজ্ঞাসা করল, রাজকন্যা তুমি কার?

—আগে ছিলাম বাবা-মার, পরে হলাম নিজের, এখন আমি তোমার।

—তাই যদি হয়, তবে তুমি আমার দাদাদের মুক্তি দাও, আর আমার সঙ্গে চলো। আমার মায়ের কাছে যাই।

রাজকন্যা কেশবতী বলল, তুমি তো আমাকে এভাবে নিয়ে যেতে পারবে না। একটা কাজ কর। তোমাকে একটা কৌটো দিচ্ছি। তুমি তার মধ্যে ভরে আমাকে নিয়ে চলো।

এই বলে রাজকন্যা কেশবতী বুধোকে একটা ছোট্ট কৌটো দিল। বুধো রাজকন্যাকে সেই কৌটোর মধ্যে ভরে নিল। এমন সময় সোনার তোতা করল কী—সামনে একটা ঢোলক ছিল তাতে ছোট করে একটা বাড়ি দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দোকানপাট নিয়ে বাজার বসে গেল। আর রাজকুমারীকে যে কৌটোর মধ্যে ভরেছে তা দোকানদারদের কৌটোর সঙ্গে মিশে গেল।

বুধো দেখল মুশকিল হয়ে গেল। এখন আসল কৌটো সে কী করে চিনবে। তখন সে ঢোলকটা নিয়ে তাতে বাড়ি দিল। অমনি বাজার মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। এ তো বেশ মজা। ঢোলকের ডানদিকে বাড়ি দিলে আবার বাজার বসল। বাঁদিকে মারলে বাজার মিলিয়ে যায়। বুধোর বেশ মজা লাগল। সে ঢোলকে একবার ডানদিকে একবার বাঁদিকে বাড়ি দিতে লাগল। বাজারের দোকানদারেরা একবার মাল সাজাতে আর একবার মাল গোটাতে গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে গেল। তারা বুধোর কাছে হাত জোড় করে বলল, আর আমাদের কষ্ট দেবেন না।

বুধো বলল, দেব না, যদি আমার আসল কৌটো ফেরত দাও।

—বেশ তাই দিচ্ছি। এই বলে তারা তার কৌটো ফেরত দিল।

বুধো কৌটো আর ঢোলক নিয়ে নিজের কাছে রাখল। কৌটো থেকে কেশবতী বেরিয়ে এসে বলল, আমার খুব খিদে পেয়েছে, গাছের থেকে ফল পেড়ে দাও।

বুধো ফল পাড়তে গেল। গাছে সুন্দর ফল পেকে আছে, কিন্তু সে দেখল গাছের গোড়ায় এক বিরাট অজগর সাপ গর্জন করছে। বুধো আর কী করে একটা দড়ি জোগাড় করে গাছের সঙ্গে বেঁধে অজগরের গলায় ফাঁস লাগিয়ে দিল টান। অজগর সাপ দু-টুকরো হয়ে গেল। বুধো ফল পেড়ে আনল।

এরপর বুধো কেশবতী রাজকুমারীকে কৌটোয় পুরে নিল। বুড়ির হাতের কাঁথা কেড়ে নিয়ে দাদাদের মুক্ত করে নিয়ে কোমরের দড়িতে টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভুতো তাদের টেনে তুলল। উপরে উঠে মাল্লারা ময়ূরপঙ্খি চালিয়ে দিল।

বুধো ময়ূরপঙ্খির ছাদে গিয়ে বসল। আর ভূতো গিয়ে বসল মাস্তুলের উপর। সেখানে

হাতের কৌটো খুলে বুধো রাজকন্যার সঙ্গে কথা বলে। হালে বসে থাকা মাঝি সে কথা অন্য রাজপুত্রদের বলে দিল। এই খবর শুনে পাঁচ রাজপুত্র বলল, ও এই ব্যাপার। ঠিক আছে।

তখন রাত্রিতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, নিঃশব্দে পাঁচ রাজপুত্র গিয়ে বুধোর কৌটো চুরি করে নিল। তারপর তার কাঁথা আর ঢোলকসহ তাকে নদীতে ফেলে দিল।

সকালবেলা কৌটো থেকে রাজকুমারীকে বের করে রাজপুত্ররা বলল, রাজকন্যা তুমি কার?

রাজকন্যা বলল, ঢোলক যার, আমি তার।

রাজপুত্ররা কেশবতীকে একটা ঘরে আটক করে রাখল। সাত দিন সাত রাত চলার পর ময়ূরপঙ্খি তাদের রাজবাড়ির ঘাটে এসে লাগল। খবর শুনে সবাই ছুটে এল, রাজা রানিরা সারা দেশের প্রজারা দেখতে এল রাজপুত্ররা কেশবতী কন্যাকে নিয়ে এসেছে। রানিমা যথারীতি ধান-দুর্বা দিয়ে রাজকন্যাকে বরণ করে ঘরে তুলল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, কন্যা তুমি কার?

কন্যা বলল, ঢোলক যার, আমি তার।

রানিরা একে একে তাদের পুত্রদের নাম করে বলল, তুমি এই কুমারের? পাঁচবারই কন্যা না বলল। তখন রানিরা রেগে বলল, তুমি যদি আমাদের কুমারদের কারো না হও তা হলে তোমাকে কেটে ফেলব।

কেশবতী কন্যা বলল, এক মাস আমার ব্রত চলছে। এই একমাস পরে যা বলবেন, করব। এই একটা মাস আমি ব্রত করব।

সবাই তাতেই রাজি হল।

এদিকে হয়েছে কী—ভুতো আর বুধোর মা, দুই দুয়োরানি দুঃখে নদীতে ডুবে মরতে এসেছে।

এমন সময় ভুতো আর বুধো মা মা বলে ডাকতে ডাকতে এসে হাজির হল। ছেলেদের দেখে দুই রানি খুব খুশি হল। পরের দিন সকালে বুধো ঢোলক বাজিয়ে বিরাট বাজার বসিয়ে দিল। গাছে গাছে সুমিষ্ট ফল পেকে উঠল। কাঁথা ছুড়ে মেরে সেখানে হাজার সৈন্যকে পাহারায় বসিয়ে দিল বুধো। রাজাকে সবাই এসে সে খবর দিল। এদিকে কেশবতী সে খবর শুনে বলল, এবার আমার ব্রত শেষ হয়েছে।

রাজা সব কিছুই বুঝতে পারলেন। তিনি আদেশ দিলেন নহবত বসিয়ে দুই দুয়োরানিকে রাজবাড়িতে নিয়ে আসতে। পাঁচ বড়ো রানি এই কথা শুনে ঘরে দোর বন্ধ করে পড়ে রইল। কেশবতী দুই ছোটো রানিকে বরণ করে ঘরে তুলল।

পরের দিন মহা ধুমধাম করে কেশবতীর সঙ্গে বুধোর বিয়ে হয়ে গেল। ভুতোর সঙ্গেও এক কলাবতী কন্যার বিয়ে দিলেন তিনি। কিন্তু বড়ো পাঁচ রানি সেই যে দরজা বন্ধ করেছে, একবারও তারা দরজা খুলে বাইরে এল না। পাঁচ রাজকুমারও তাদের মায়েদের মতো ঘরে

দোর দিয়ে পড়ে রইল। রাজা লোক ডেকে তাদের ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন।

এরপর একদিন বৃষ্টিভেজা রাতে কেশবতী ও কলাবতী ঘুম ভেঙে দেখল যে তাদের পালঙ্কের উপরে প্যাঁচা আর বাঁদরের খোলস পড়ে আছে। তখন তারা বাইরে উঁকি মেরে দেখল, অপরূপ দুই রাজকুমার রাজমহলে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। তখন তারা বুঝতে পারল তাদের স্বামীরা আসলে প্যাঁচা ও বানর নয়। প্যাঁচা আর বানরের খোলস পরা দুই সুন্দর রাজকুমার। তখন দুজনে যুক্তি করে খোলস দুটিতে আগুন ধরিয়ে দিল। খোলস পোড়া কটু গন্ধে যখন চারিদিক ভরে উঠেছে তখন দুই রাজপুত্র ছুটে এল ঘরের মধ্যে। কিন্তু ততক্ষণে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তারা বলে উঠল, তোমরা এ কী করলে?

দুই রাজকুমারী বলল, খোলস পুড়িয়েছি তো বেশ করেছি।

পরের দিন সকালে উঠে সকলে তো অবাক। রাজা খুব খুশি হলেন। তখন ভুতোর নাম হল রূপকুমার আর বুধোর নাম হল বুদ্ধকুমার। সবাই সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

ছবি। সুব্রত মাজী



এক ছিল জোলা

রুহুল আমিন বাবুল

জঙ্গালবাড়ি নামে এক রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের এক পাশে বাস করত এক জোলা আর তার বউ। জোলা ছিল বোকার হদ্দ আর কুঁড়ের একশেষ। রাতে ঘুম আর দিনের বেলায় টো-টো করে ঘুরে বেড়ানোই ছিল তার কাজ। এ ছাড়া আর কোনো কাজই সে করত না।

সংসার চলত জোলার বউয়ের রোজগারে। একদিন খাবার খেতে বসে জোলার বউ বলল, তুমি রাজার কাছে যাও, একটা কাজ চাও। তিনি তো কত লোককে চাকরি দেন। কত লোক তাঁকে কিস্‌সা-কাহিনি শুনিয়ে টাকাকড়ি পায়। খালি হাতে তাঁর কাছ থেকে কেউ ফিরে আসে না। তুমিও যাও, একটা কিছু চাও তাঁর কাছে। তুমিও পাবে।

জোলা তার বউয়ের কথা শুনে যায় ঠিকই। কিন্তু এক কান দিয়ে শোনে, আর এক কান দিয়ে বের করে দেয়। কারণ, রাজা কাজ দিলে কী হবে, সে তো কোনো কাজই জানে না। খামোকা লাভ কি রাজার কাছে গিয়ে।

জোলা-বউয়ের তাগাদা কিন্তু শেষ হয় না। রোজ রোজ একই কথা বলে। তাতে বিরক্ত হয় না জোলা। নানা ছুতাছাতায় বউকে ভুলিয়ে সে খাবার সময় খায়। খায়-দায় আর

রাজবাড়ি যাবার নাম করে ঘর থেকে বের হয়। সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে ঘরে আসে রাতে।

এভাবে তো দিন আর চলে না। জোলা-বউ খুব রেগে যায়। একদিন বলল, ঘরে বসে বসে তুমি রাক্ষসের মতো আর কতদিন খাবে? রাজবাড়ি গিয়ে কিছু পয়সাকড়ি কামাই করো না।

জোলা বলল, আমি তো কিছুই জানি না, রাজার কাছে কী কাজ চাইব? আমি কী কাহিনি শোনাব তাকে?

জোলা-বউ বলল, তুমি যা জানো তাই শোনাবে রাজাকে।

কিন্তু তাতেও কাজ হল না। বউয়ের যাবতীয় গালমন্দ ধৈর্যের সঙ্গে হজম করে সে। কুঁড়ের মতো বসে বসে খায়, ঘুমায় আর ঘুরে ফিরে বাকি সময় কাটায়। বউ বুঝল সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।

একদিন জোলা খাবার খেতে এলে বউ ঝাড়ু হাতে চোখ রাঙিয়ে বলল, অকর্মার সর্দার। আজ আমি তোমাকে রাজবাড়ি না পাঠিয়ে ছাড়ছি না। কামাই করার মুরোদ নেই, বিড়ালের মতো খেতে পারো শুধু। আজ ঝাড়ুর বাড়ি খাওয়াব তোমাকে।

জোলা ভাবল এ তো ভারী বিপদ। নিরুপায় হয়ে ছুটতে থাকে রাজবাড়ির দিকে। ছুটতে ছুটতে ভাবে, বউ বলে দিয়েছিল, তুমি পথে যা দেখবে তাই বলবে রাজাকে। কিন্তু রাজবাড়ির পথ আর ফুরায় না। ফুরাবেই বা কীভাবে? জোলা তিন পা এগোয় আর এক পা পিছোয়। আসলে রাজবাড়ি জোলার বাড়ি থেকে মাত্র এক মাইল পথ।

চলার পথে জোলার একটাই ভাবনা, সে কিছুই জানে না, রাজাকে কী বলবে, কী শোনাবে কিসসা? কিছু দূর গিয়ে জোলা দেখতে পায় একটা ব্যাং। ব্যাংটি লাফ দিয়ে বসে, আবার লাফ দেয়, আবার বসে। বিষয়টি দেখে বউয়ের কথা মনে পড়ে জোলার। তার মুখ থেকে একবার উচ্চারিত হয়—'ফাল্‌দা বইসা যায়'।

তারপর জোলা কথাটি বার বার আওড়ায় আর রাজবাড়ির দিকে যায়। আর কতটুকু পথ এগিয়ে দেখতে পায় একটা বেজি। কিছু দূর ছুটে গিয়ে জোলা পেছন ফিরে তাকায়। দেখতে পায় বেজি উঁকিঝুঁকি দিয়ে পালিয়েছে জঙ্গলে। জোলা তখন প্রথম কথাটির সঙ্গে আরো কিছু কথা জুড়ে দিয়ে বলতে থাকে—

ফাল্‌দা বইসা যায়
দৌড়ে ফিরা চায়
উঁকি দিয়া লুকায়।

কথাগুলো বলে আর পথ চলে জোলা। এসব কথাই আজ সে রাজাকে শোনাবে। কিন্তু পা যে তার চলতে চায় না আর। এক মাইল পথ, অথচ এক দুপুর হেঁটেও শেষ করতে পারে না।

রাজ-দরবারে হাজির হয়ে জোলা দেখল, লোকজনের অভাব নেই। একেবারে জমজমাট দরবার। কেউ গান গেয়ে, কেউ কিসসা শুনিয়ে, কেউ হাসি-তামাশা করে আনন্দ দিচ্ছে

রাজাকে। রাজা বেশ খুশি-খুশি মুখ করে বসে আছেন।

জোলা মনমরা হয়ে বসে থাকল দরবারের এক কোণে। এত বড়ো রাজার সামনে সে কেমন করে কথা বলবে, এ ভাবনায় সে অস্থির। একবার মনে করে বাড়ি ফিরে যাবে। আবার ভাবে, হয়তো তার বউ ঝাড়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এখন গেলেই ঝাড়ুপেটা করবে।

এদিকে যার যার কাজের পর রাজা নানাজনকে নানা পুরস্কার দিলেন। টাকাকড়ি, হীরা জহরত পেয়ে রাজাকে ধন্য ধন্য করে চলে গেল তারা। জোলার দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না। সে বসে বসে ঠোঁট কামড়াচ্ছিল আর ভাবছিল পথের কথাগুলো বলবে কি না।

মুহূর্তের মধ্যে দরবার লোকশূন্য হয়ে গেল। জোলা আগের মতোই বসে রয়েছে চুপচাপ। হঠাৎ রাজার চোখ পড়ল জোলার দিকে। তিনি জানতে চাইলেন, তুই বসে আছিস কেন? কোনো কাজে এসেছিলি?

জোলার বুকটা কেঁপে উঠল। বুকের ভেতর কেমন যেন ধুপুড় ধুপুড় শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সে। দু'তিনবার গলা খাকারি দিয়ে নিজেকে হালকা করতে চাইল। সাহস করে বলল, মহারাজ! আমি আপনাকে কিছু কথা শোনাতে এসেছি।

জোলার কথা শেষ হতে না হতেই নরসুন্দর হাজির হল রাজার ক্ষৌরকর্মের জন্যে। রাজা বসলেন। নরসুন্দর তার কাজ শুরু করল। রাজা শুনতে চাইলেন জোলার কথাগুলো। জোলা সাহস করে বলতে থাকে—

ফাল্‌দা বইসা যায়
দৌড়ে ফিরা চায়
উঁকি দিয়া লুকায়।

জোলার কথা শুনে রাজা খুব অবাক হলেন। এতক্ষণ তিনি তাকে নিরেট বোকা মনে করেছিলেন। আসলে সে অনেক বড়ো পণ্ডিত। রাজাকে কথায় ঠকাবার জন্যে সে ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। যে সব কথা সে বলেছে, মস্তবড়ো গণক ছাড়া অন্য কেউ এর অর্থ বুঝতে পারবে না।

জোলার কথাগুলো নিয়ে কেবল রাজা ভাবছেন তা নয়, সাত-ছালা বুদ্ধির নরসুন্দরও জোলার কথা শুনে থ হয়ে গেল। তখন রাজবাড়ির প্রধান গেটের পাশ দিয়ে একটা শেয়াল দৌড়ে পাচ্ছিল। তা দেখে জোলা বলল—

ফাল্‌দা বইসা যায়
দৌড়ে ফিরা চায়
উঁকি দিয়া লুকায়।
ওই তো শিবা যায়।

যে নরসুন্দর রাজার ক্ষৌরকর্ম করছিল তার নাম ছিল শিবা। কিন্তু জোলা তা জানত না। তার মুখে শিবা নাম শোনামাত্র নরসুন্দর শিবার হাত থেকে ক্ষুর পড়ে গেল। সে কাঁপতে কাঁপতে রাজার পায়ে পড়ে বলল, মহারাজ! আমাকে ক্ষমা করবেন—আমার কোনো দোষ নেই। সব দোষ উজিরের। তিনি আমাকে বলে দিয়েছিলেন, ক্ষৌর করবার সময় ক্ষুর দিয়ে যেন আপনার গলা কেটে ফেলি। আমাকে রেহাই দিন মহারাজ।



রাজা তো বিস্ময়ে হতবাক! আর দেরি করলেন না তিনি। সঙ্গে সঙ্গে উজির আর নরসুন্দরকে হাত-পা বেঁধে বন্দিশালায় নিয়ে যাওয়া হল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলেন রাজা।

আনন্দে ডগমগ-করা চোখে রাজা তাকালেন জোলার দিকে। মুহূর্তের মধ্যে জোলাকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে গণকঠাকুর, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ। তুমি না এলে শিবা ব্যাটা এতক্ষণে আমাকে কোতল করে ফেলত।

জোলা বুঝল এই তো বড়ো সুযোগ। বোকা জোলা সাহস করে দুটি টাকা চাইল রাজার কাছে। তার ধারণা, দুই টাকার চালডাল কিনে নিয়ে বাড়ি গেলে আজ আর বউয়ের ঝাড়ুপেটা খেতে হবে না।

রাজা ভাবলেন অন্যকথা। গণকঠাকুর লোভহীন উদার প্রকৃতির লোক। এ জন্যে সে দুটাকার বেশি চাইল না। রাজা অভিভূত হলেন। অনেক ধন-সম্পদ দিলেন তাকে। রাজার পুরস্কার পেয়ে বোকা জোলাও ধনী হয়ে গেল।

ছবি। সুব্রত মাজী

দেশ-পরিচয়

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

ইন্দোনেশিয়া

জাভা সমুদ্রের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এই দেশ। তেরো হাজার ছয় শো সাতাত্তরটি দ্বীপ নিয়ে এই প্রজাতন্ত্রী দেশ। এর মধ্যে প্রায় সাত হাজার দ্বীপে জনবসতি নেই। সেখানে প্রায় দুশোটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে। আয়তন ১৯ লক্ষ ২২ হাজার ৫৭০ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা প্রায় চব্বিশ কোটি। বৈচিত্র্যপূর্ণ এই দেশে তিনশোর বেশি জনজাতি বসবাস করে। প্রায় আড়াইশো ভাষা রয়েছে এখানে। মূলত মুসলমান-প্রধান দেশ হলেও ভারতীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাব রয়েছে। এই দেশও দীর্ঘদিন অন্য দেশের অধীন ছিল। রাজধানী জাকার্তা। বারিটো দিগুয়াল ও কাপুয়াস প্রধান নদী। সবচেয়ে উঁচু পাহাড় নগা পুলু। কৃষিপ্রধান দেশ, সবচেয়ে বেশি হয় ধান।

পূর্ব তিমোর

এই দেশ তিমোর দ্বীপের পূর্বাংশ নিয়ে গঠিত। এখানে পোর্তুগিজ উপনিবেশ ছিল। পশ্চিম অংশ ছিল নেদারল্যান্ডের দখলে। ১৯৭৬ সালে সমগ্র দ্বীপটি ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রদেশ রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ২০০১ সালে পূর্ব অংশটি 'পূর্ব তিমোর গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করেছে। রাজধানী দিলি। আয়তন ১৪ হাজার ৬০৪ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ ৯৭ হাজার। পর্বতময় এই দেশের উপকূলভাগই শুধু সমতলভূমি। জলাভূমি ও ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। অসংখ্য পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে গায়ে চন্দনবৃক্ষের বনাঞ্চল। সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ তাতামাইলো। কৃষি-নির্ভর দেশটিতে উৎপন্ন হয় ধান, গম, ভুট্টা, আলু, তামাক, কফি, তুলা ইত্যাদি। বস্ত্র শিল্পেও উন্নত। কাঠ ও হাতির দাঁতের কাজ, নারকোল দড়ি, মাটির বাসন, পশুচর্মের নানাধরনের সামগ্রী খুবই উচ্চমানের।

সিঙ্গাপুর

মালয় উপদ্বীপে মালয়েশিয়ার দক্ষিণে, সুমাত্রার পুবে ও বোর্নিওর পশ্চিমে এই দেশ। একটি বড়ো ও পঞ্চাশটিরও বেশি দ্বীপ রয়েছে দেশে। ১৯৬৫ সালে দেশটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়। রাজধানী সিঙ্গাপুর সিটি। লোকসংখ্যা প্রায়

ছেচল্লিশ লক্ষ। আয়তন ৬৮২.৭ বর্গ কি.মি.। কৃষিজাত দ্রব্য হলেও মূল আয় বহির্বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব, এশিয়ার বৃহত্তম তেল শোধনাগার, ব্যাংকিং, পর্যটন। তাই বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ। সানগেই-সেলেটার প্রধান নদী, টিমা সবচেয়ে উঁচু পাহাড়।

মালয়েশিয়া

চিন সাগরে সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরে ও থাইল্যান্ডের দক্ষিণে এই দেশ। দুটি ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত, তাদের দূরত্ব প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার। মাঝখানে দক্ষিণ চিন সমুদ্র। লোকসংখ্যা প্রায় তিন কোটি। আয়তন ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৪৫ বর্গ কি.মি.। কৃষিপ্রধান দেশ, শিল্পেও উন্নত। ঘন অরণ্যে ঢাকা দেশের প্রায় সর্বত্র। রাজধানী কুয়ালালামপুর। এই দেশ দীর্ঘদিন ব্রিটিশ, জাপানেরও অধীনে ছিল। ১৯৫৭ সালের ১ আগস্ট ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। কেলান্টান ও পাহাং বড়ো নদী। পাহাড়ও রয়েছে, সবচেয়ে উঁচু পাহাড় কিনাবালু। এই দেশে আদি বাসিন্দা মালয়ি ছাড়াও অনেক সংখ্যায় চিনা ও ভারতীয়রা বসবাস করে।

ব্রুনেই

দক্ষিণ চিনা সাগর ও জাভা সাগরের মধ্যে বোর্নিও দ্বীপের উত্তরে ছোট্ট এই দেশ। পুরো নাম ব্রুনেই দার-উস-সালাম রাষ্ট্র। ১৯৮৪ সালে স্বাধীন হয়। রাজধানী বান্দের-সেরি-বেগাওয়াল, পুরনো নাম ব্রুনেই শহর। আয়তন ৫ হাজার ৭৬৫ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা প্রায় চার লক্ষ। কৃষিজাত দ্রব্য কলা চাল সবজি রাবার উৎপাদিত হলেও আয়ের মূল উৎস পেট্রোল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। প্রধান নদী ব্রুনেই। সবচেয়ে উঁচু পাহাড় বুকিট-প্যাগন। মালয়েশিয়া-সলগ্ন এই দেশের রূপকথা-উপকথা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়নি।

থাইল্যান্ড

মায়ানমারের দক্ষিণে লাওস-এর পশ্চিমে এই দেশ। এই দেশের আগের নাম ছিল শ্যাম। জনসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি সাড়ে ৩৪ লক্ষ। আয়তন ৫ লক্ষ ১৪ হাজার বর্গ কি.মি.। কৃষিনির্ভর দেশ, ধান হয় পর্যাপ্ত। এই দেশ থেকেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ধান বিদেশে রপ্তানি করে। রাজধানী ব্যাংকক। প্রধান নদী হল চাও-ফ্রায়া মেকনতা, সে-নাম-মুন। পাহাড়ও রয়েছে। একসময় এই দেশ আর্থিক দিক দিয়ে সবচেয়ে উন্নত ছিল। গণতন্ত্র বারবার পদদলিত হওয়ার কারণে আর্থিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটছে দ্রুত।

কাম্পুচিয়া

লাওস-এর দক্ষিণে ভিয়েতনামের পশ্চিমে ছোট্ট এই দেশ। আগে নাম ছিল কম্বোডিয়া। লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ। আয়তন ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৫ বর্গ কি.মি.। আংকোর ভাটের বিষ্ণুমন্দির বিখ্যাত। ইন্দো-চিন উপদ্বীপের এই দেশ বছর তিরিশেক আগে খমের প্রজাতন্ত্র হিসেবে পরিচিত ছিল। কৃষির ওপরে নির্ভরশীল এই দেশ, এ ছাড়া পশুপালন ও মাছ ধরা প্রধান জীবিকা। রাজধানী নম পেন। এ দেশের জমি খুব উর্বর, কেননা মেকং নদী ও টনল স্যাপ হ্রদ জমিকে পুষ্ট করে চলেছে। দেশে নুম আওরাল পাহাড়ও রয়েছে।

ভিয়েতনাম

কাম্পুচিয়া ও লাওস-এর সীমানা বরাবর ওপর-নীচে লম্বা ছোটো দেশ ভিয়েতনাম। এক সময় এই দেশ উত্তর ও দক্ষিণ দুটি স্বাধীন দেশ ছিল। পরে এক দেশ হয়। আয়তন ৩ লক্ষ ৩১ হাজার ৪১ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা ৮ কোটি ৪০ লক্ষ। দেশে অনেক নদী ও পর্বতময় এলাকা রয়েছে। আন্নামাইট পাহাড় এবং মেকং সংকই সংবো হংগা প্রভৃতি নদী। মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। ধান প্রধান ফসল। রাজধানী হ্যানয়। লোকসংখ্যা সাড়ে আট কোটির মতো। খ্রিস্ট-পূর্ব যুগ থেকেই চিন ফ্রান্স জাপান আমেরিকার অধীন ছিল এই দেশ। ভিয়েতনামের জনগণের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রাম ইতিহাস খ্যাত। ১৯৭৬ সালে উভয় ভিয়েতনাম যুক্ত হয়ে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠিত হয়।

মায়ানমার

বাংলাদেশের পূর্বে, চিনের একেবারে দক্ষিণ অংশের পশ্চিমে এই দেশ। আগে নাম ছিল ব্রহ্মদেশ বা বার্মা। এই দেশকে বলা হয় 'সুদূর প্রাচ্যের চালের ভান্ডার'। এই নাম থেকেই বোঝা যায় এ দেশ শুধু কৃষিনির্ভর নয়, ফসলের প্রাচুর্যও দেশকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। প্রধান নদী ইরাবতী, সিতাং, সালুইন। রাজধানী ইয়াংগন, আগে নাম ছিল রেংগুন। লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। আয়তন ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫৭৭ বর্গ কি.মি.। এই দেশ বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। সেগুন কাঠ যা বর্মা টিক নামে খ্যাত তার পৃথিবীজোড়া সমাদর। এই ছোটো দেশের দেশপ্রেমিক নারী আউং সান সু কি সামরিক শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শান্তির দূত হিসেবে ১৯৯১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন।

লাওস

ভিয়েতনাম ও কামপুচিয়ার গা ঘেঁষে ছোট্ট এই দেশ। আয়তন ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮ শত বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা প্রায় ষাট লক্ষ। এই দেশে অসংখ্য আদিবাসী মানুষের বাস। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হল লাও সম্প্রদায়। সেই থেকেই দেশের নাম। দেশের উত্তর ও পুব দিকে পাহাড়ি এলাকা। এসব এলাকা খুব অনুর্বর। কৃষিপ্রধান দেশ, শিল্প তেমন নেই। খুবই গরিব দেশ। ধান প্রধান ফসল। রাজধানী ভিয়েনতিয়েন। প্রধান নদী মেকং। সবচেয়ে উঁচু পাহাড় ফউ বিয়া। ফরাসি উপনিবেশ ছিল, ১৯৫৪ সালে স্বাধীন হয়।

ফিলিপিনস্

এ এক দ্বীপময় দেশ। সাত হাজারের বেশি দ্বীপ নিয়ে এই দেশ। অধিকাংশ দ্বীপ পর্বতময়। দক্ষিণ চিন সাগরে রয়েছে এই দেশ। প্রায় হাজারটি দ্বীপে বসতি রয়েছে। এটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আয়তন ৩ লক্ষ ৭৬ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা প্রায় নয় কোটি। রাজধানী ম্যানিলা। প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ হলেও বেশ কিছুকাল আগে থেকেই শিল্পে প্রভূত উন্নতি করেছে। মাগাট, কাগায়ান, পাম্‌পাঙ্গাও আগুসান প্রধান নদী। সবচেয়ে উঁচু পাহাড় আপো। ষোড়শ শতকে এই দেশ স্পেনের উপনিবেশে পরিণত হয়। তারপরে আমেরিকা ও জাপানের অধীনে ছিল। ১৯৪৬ সালে দেশ স্বাধীন হয়।

পূর্ব এশিয়া

চিন

পৃথিবীর অন্যতম বিশাল দেশ চিন। নেপালের উত্তরে মঙ্গোলিয়ার দক্ষিণে এই দেশ। সবচেয়ে জনবহুল দেশ, ভৌগোলিক আয়তনে তৃতীয়। লোকসংখ্যা প্রায় ১৩২ কোটি ২০ লক্ষ ৪৪ হাজার। আয়তন ৯৫ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯৬০ বর্গ কি.মি.। মাও জেদঙের নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর এই দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই বিরাট দেশের প্রকৃতি বিচিত্র,—পার্বত্য মরুভূমি, বনময় প্রকৃতি রয়েছে এখানে। পূর্বাংশেই সবচেয়ে বেশি মানুষ বাস করেন। শিল্পে অসাধারণ অগ্রগতি ঘটলেও কৃষিকাজই অধিকাংশের জীবিকা। রাজধানী বেজিং। বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মধ্যে চিন অন্যতম। চিনে অসংখ্য আদিবাসী রয়েছে, তাদের লোককথা সংগীত নাচ খুব সমৃদ্ধ।

তিব্বত ঃ নেপালের উত্তরে ভুটানের পশ্চিমে ও চিনের দক্ষিণ অংশে এই ভূখণ্ড। এখানেই রয়েছে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র মানসসরোবর। একসময় স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও

রাজনৈতিক পরিচয় থাকলেও ১৯৫৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চিন নিজেদের দেশের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তখন থেকে তিব্বতিদের বৌদ্ধধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু দলাই লামা থাকেন ভারতে। ১৯৬৫ সাল থেকে চিনদেশের অধীনে একটি স্বশাসিত এলাকা। রাজধানী লাসা। এত উঁচু দেশে তাপমাত্রা এত কম যে গাছগাছালি তেমন নেই। কৃষিও তেমন হয় না। পশুপালন প্রধান জীবিকা। প্রায় একশো শতাংশ বৌদ্ধ। তিব্বতি সংস্কৃতি যেমন পুরনো তেমনি তাদের শিল্প অতি উন্নতমানের।

তাইওয়ান

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল থেকে প্রায় একশো ষাট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছোট্ট দ্বীপ তাইওয়ান। আয়তন ৩৬ হাজার ১৮৮ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ২৫ লক্ষ। এদেশের আগের নাম ছিল ফরমোসা। একসময় এই এলাকা বৃহত্তর চিনের অংশ ছিল, এখন স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। কৃষি ও শিল্পে সমান উন্নত এই দেশ। জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-গবেষণায় চরম শীর্ষে পৌঁছেছে। রাজধানী তাইপে। জনসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি। চোসুই-চি-সিয়া-তান-সুই-চি প্রধান নদী। সবচেয়ে উঁচু পাহাড় ইউ সান। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই ছোট্ট দেশ এতটাই এগিয়ে গিয়েছে যে এই দেশকে বলা হয় 'এশিয়ার বাঘ।'

জাপান

উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক দ্বীপের সমাহারে গড়ে উঠেছে এই দেশ। কাছাকাছি দেশ কোরিয়া। এই দেশ হল নিপ্পন অর্থাৎ সূর্যোদয়ের দেশ। অনেক পাহাড়ে-ঘেরা এই দেশে বিস্তৃত উপত্যকাও রয়েছে। রাজধানী তোকিও। আয়তন ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮৩৭ বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা প্রায় তেরো কোটি। এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উন্নত দেশ, —কৃষি মৎস্যচাষ শিল্প বহির্বাণিজ্য বিস্তৃত। দ্বিতীয় ধনী দেশ। ধান, আলু, গম, বার্লি তামাক প্রধান কৃষি উৎপাদন। মোটর গাড়ি, বৈদ্যুতিন সামগ্রী, খেলনা, রেশম, পশম, সার উৎপাদনে বিশ্বে অগ্রগণ্য। কিটাকামিটোন সিনানো প্রধান নদী। ফুজিয়ামা সবচেয়ে উঁচু পাহাড়।

মঙ্গোলিয়া

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের উত্তরে এবং রাশিয়ার দক্ষিণে এই দেশ। অধিকাংশ এলাকায় পাহাড়ি কাঁকুরে জমি, ফসল হয় না। আবার দক্ষিণে গোবি মরুভূমি। বৃষ্টিপাত কম। মূল জীবিকা পশুপালন। উট ভেড়া ছাগল গোরু ও ঘোড়া পালন করে। ফসল হয় অপ্রতুল। সামান্য শিল্প রয়েছে। তাই দেশটি খুব গরিব। রাজধানী উলানবাতোর। জনসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। আয়তন ১৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৬০ বর্গ কি.মি.। অনেক

আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছে। হেরেলেং সেলেন্‌জে অরহন প্রধান নদী। সবচেয়ে উঁচু পাহাড় হেরহান উল।

কোরিয়া (উত্তর ও দক্ষিণ)

জাপান সাগর ও পীত সাগরের মাঝখানে কোরিয়া। একই সংস্কৃতির দেশ হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক কারণে দেশটি উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া নামে মানচিত্রে রয়েছে। এ এক যুক্তিহীন বিভাজন। উত্তরের রাজধানী পিয়ং ইয়ং। আয়তন ১ লক্ষ ২২ হাজার ৭৬২ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা আড়াই কোটির মতো। দক্ষিণের জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। আয়তন ৯৯ হাজার ৪৬১ বর্গ কি.মি.। দক্ষিণ অংশ শিল্প-বাণিজ্য কৃষিতে অনেক উন্নত। উত্তর তুলনামূলকভাবে অনেক পেছনে। দুই অংশের প্রধান ফসল ধান ভুট্টা আলু সবজি বার্লি। মৎস্যচাষ ব্যাপক। শিল্পে দক্ষিণ অংশ অনেক উন্নত, উত্তর অনেক পিছিয়ে। ইয়ালু ইমজিন হান সোমাজিন ইয়ংসান প্রধান নদী। পাক-টু ও হাল্লা-সান সবচেয়ে উঁচু পাহাড়।

মধ্য এশিয়া

কিরঘিজস্তান

চিনের পশ্চিমে, তাজিকিস্তানের উত্তরে এই দেশ। এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীন ছিল। ১৯৯১ সালে স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়। রাজধানী বিসকেক। আয়তন ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯০০ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ। তিয়েনশান পর্বতমালা রয়েছে দেশের বিস্তৃত এলাকায়। কৃষিপ্রধান দেশ,—তুলো ফল দুধ আলু চিনি পশম তামাক প্রচুর হয়। শিল্পেও উন্নত। কিজিলসু সাবিরহাজ নারিন প্রধান নদী। পিক পোবেডি উচ্চতম পাহাড়।

তাজিকিস্তান

পূর্বে চিন, দক্ষিণে আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিমে উজবেকিস্তান ও উত্তরে কিরঘিজস্তান-মধ্যবর্তী একটি ছোটো রাষ্ট্র। রাজধানী দুশানবে। পূর্ব নাম স্তালিনবাদ। আয়তন ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ১ শত বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা ৭২ লক্ষ ১১ হাজার ৮৮৪। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা ৩ হাজার মিটার। কমিউনিজম শৃঙ্গ পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ারও উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ ছিল। এই দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশ পামির মালভূমির অংশ। কারাকুল হ্রদ এখানেই। প্রধান নদী আমুদরিয়া ও সিরদরিয়া, বড়ো ও খরস্রোতা। বনাঞ্চলে প্রায় ৫ হাজার রকমের ফুলের সমাহার। আর আছে বাঘ, শিয়াল, পার্বত্য ছাগল, বনবেড়াল, হরিণ, সোনালি হরিণ। তুলো, ধান, গম ও বিভিন্ন প্রকার ফল এখানকার প্রধান

কৃষিজাত সম্পদ। বস্ত্র ও খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ অন্যতম প্রধান শিল্প। অল্প-বিস্তর খনিজ সম্পদও ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়।

কাজাখস্তান

চিনের পশ্চিমে, রাশিয়ার দক্ষিণে, উজবেকিস্তান কিরঘিজস্তানের উত্তরে বিশাল এই দেশ। সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে ছিল। ১৯৯১ সালে স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই দেশে শতাধিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস। বিচিত্র সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। রাজধানী আকমোলা, আসটানা নামেও পরিচিত। আয়তন ২৭ লক্ষ ২৪ হাজার ৯ শত বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা দেড় কোটির বেশি। সিরদরিয়া প্রধান নদী। খান টেনগ্রি উচ্চতম পাহাড়। কৃষিপ্রধান দেশ,—সবজি আলু বিট দুধ প্রচুর হয়। খনিজ সম্পদ ও শিল্পেও খুব উন্নত।

উজবেকিস্তান

কাজাখস্তানের দক্ষিণে, তুর্কমেনিস্তানের উত্তরে, আফগানিস্তানের পশ্চিমে এই দেশ। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায় ১৯৯১ সালে। রাজধানী তাসখন্দ। আয়তন ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪ শত বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা আড়াই কোটির বেশি। অনুর্বর জমি তাই কৃত্রিম জলসেচের মাধ্যমে চাষ হয়। সোভিয়েত দেশের অধীনে থেকে ধান আলু ফল চা চাষ ব্যাপ্ত হয়। তুলো উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়। শিল্পেও উন্নত। সিরদরিয়া ও আমুদরিয়া প্রধান নদী। বান্নোভকা সবচেয়ে উঁচু পাহাড়।

তুর্কমেনিস্তান

এই দেশের সীমান্ত ঘিরে রেখেছে উত্তর-পূর্বে উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, দক্ষিণে ইরাক ও পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর! বালুকাময় মরু অঞ্চল কারাকুম আর নবীন পর্বতমালার দেশ। সেকারণে প্রায়ই ভূমিকম্প দেশটিকে আতঙ্কিত করে রাখে। দূরে দূরে অবস্থিত মরূদ্যান শহর। রাজধানী আশগাবাত। আয়তন ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ১ শত বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা ৫১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৭৩। তুলা ও গম চাষে উন্নত। প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে পৃথিবীতে পঞ্চম স্থানে। খনিজ তৈল শোধনাগার ও রাসায়নিক দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। বস্ত্র তৈরিতেও দক্ষতা আছে। বনাঞ্চলে গজলা হরিণ, বনবেড়াল, শিয়াল, শজারু, চিতা পাওয়া যায়। কচ্ছপও প্রচুর জন্মে। রেশমগুটি উৎপাদন ও পশুপালন অন্যতম জীবিকা। প্রধান নদী আমুদরিয়া, মোর্গব, আত্রেক ও তেজেন। ১৯৯১ সালে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আজারবাইজান

এই দেশের উত্তরে জর্জিয়া ও রাশিয়া, পূর্বে কাস্পিয়ান সাগর, পশ্চিমে আর্মেনিয়া, কুয়েত ও দক্ষিণে ইরান। রাজধানী বাকু। আয়তন ৮৬ হাজার ৮৯০ বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা প্রায় ৮২ লক্ষ। গম, তুলা, তামাক, চা, আলু, আঙুর প্রভৃতির চাষ প্রভূত পরিমাণে হয়। খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। কাস্পিয়ান সাগরে প্রাকৃতিক তৈল উত্তোলন কেন্দ্র আছে। এর ফলে অনুসারী শিল্পও গড়ে উঠেছে বাকুতে। সেখানে পাতাল রেল ও ট্রাম পরিবহন গড়ে উঠেছে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আলাদা হয়ে সাধারণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

জর্জিয়া

উত্তরে রাশিয়া, পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর, দক্ষিণে তুরস্ক, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান-এর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে জর্জিয়ার অবস্থান। রাজধানী টিফলিস। লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। এই দেশের উত্তরে ককেসাস পর্বতমালা। জর্জিয়ার জনজীবনে এই পর্বতমালার প্রভাব অপরিসীম। উত্তরের হিমশীতল বায়ুপ্রবাহের তীব্রতা থেকে যেমন জর্জিয়াকে রক্ষা করে, তেমনি এখান থেকে উৎপন্ন হয়ে ইংগুরি, রাইয়োনি ও কোড়োরি প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান নদী কৃষ্ণসাগরে পড়েছে। সৃষ্টি করেছে বিস্তৃত অরণ্যাঞ্চল। দেশের মোট আয়তন ৬৯ হাজার ৭ শত বর্গ কিলোমিটারের প্রায় ৪৩ শতাংশ বনভূমি। চা ও আঙুর প্রধান ফসল। ওক, পাইন, বিচ, ফার, আপেল ও নাশপাতি গাছ দেশটিকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করেছে। খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। একসময় রোম সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। মঙ্গোল ও তুর্কি আক্রমণে বিধ্বস্ত। পরে সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভূত হয়। সে সময় শিল্পে প্রভূত উন্নত হয়েছে। ১৯৯১ সালের ৯ এপ্রিল বহুদলীয় সাধারণতন্ত্র হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করে।

আর্মেনিয়া

এই দেশের উত্তরে ক্ষুদ্র ককেসাস, পূর্ব-মধ্যাংশে সেভান হ্রদ। তুরস্ক, জর্জিয়া, আজারবাইজান, ইরান এই দেশের প্রতিবেশি রাষ্ট্র। দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আরারাত মরুভূমি। ভূমিকম্প-প্রধান অঞ্চল। রাজধানী ইয়েরিভান। আয়তন ২৯ হাজার ৭৪৩ বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা ৩৮ লক্ষ। সমতলভূমিতে ও পর্বতময় অরণ্য অঞ্চলে আঙুর ও নানা রকমের শস্য উৎপন্ন হয়। জঙ্গলে বনবেড়াল, লিংক্স, সিরীয় ভালুক ও নানা ধরনের পাখির সমাবেশ। একদা রোমসম্রাজ্যের অধীনে ছিল। আরব ও মিশরীয়রা হানা দিয়েছে এই দেশে। সোভিয়েত আমলে কৃষি-নির্ভর

এই দেশ শিল্পেও যথেষ্ট উন্নতি করেছে। ১৯৯১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া

তুরস্ক

সিরিয়ার উত্তরে ইরানের পশ্চিমে বুলগেরিয়া, পূর্বে কৃষ্ণসাগর-তীরে এই দেশ। এই দেশ এশিয়া ও ইউরোপকে যুক্ত করেছে। এশীয় অংশ প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্য বহন করছে। বাইজানটিয়ান সভ্যতা এখানেই বিকশিত হয়। রাজধানী আংকারা। আয়তন ৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৪৫২ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা সাত কোটির কিছু বেশি। এই দেশে প্রায় এক কোটির ওপরে কুর্দ আদিবাসী বাস করে। কৃষিনির্ভর দেশ,—গম তুলো তামাক চিনি অলিভ তেল প্রচুর হয়। ব্যাপক পশুপালন হয় বলে পশুর চামড়া থেকে দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যাপক। কিজিলিমাক, ডিকল, ফিরাত, সাকারিয়া প্রধান নদী। আরারাট সবচেয়ে উঁচু পাহাড়।

সাইপ্রাস

এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ। খ্রিস্টের জন্মের দেড়শো বছর আগে এখানে মাইসিনীয় গ্রিকরা একটি নগর-রাজ্য গড়ে তোলে। তারপর অন্যান্য নানা বিদেশি উপনিবেশ এই দেশে স্থাপন হয়। ১৯২৫-এ ব্রিটিশদের দখলে চলে যায় সাইপ্রাস। ১৯৬০ সালে ইংরেজ-শাসনের অবসান হলে গ্রিক ও তুর্কিরা ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্রসংঘের শান্তিবাহিনী এই দ্বীপটিতে পাঠানো হয়। ১৯৭৫-এ তুর্কিরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৮৩-তে তুর্কি অধিকৃত অঞ্চলের নাম হয় উত্তর সাইপ্রাসের তুর্কি সাধারণতন্ত্র। আয়তন ৩৩৫৫ বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা ২ লক্ষ ১৫ হাজার। রাজধানী লেখকোমা। তুর্কি অধিকৃত অংশের বাইরে দক্ষিণাংশের ভূখণ্ড পরিচিত হয় সাইপ্রাস সাধারণতন্ত্র রূপে। আয়তন ৫৮৯৬ বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা ৬ লক্ষ ৯২ হাজার। রাজধানী লেফাকাসিয়া। দুই অংশের দুটি রাজধানী গঠিত হয় নিকোসিয়াকে ভাগ করে। তুরস্ক ব্যতীত অন্য কোনো রাষ্ট্র তুর্কি অধিকৃত সাধারণ তন্ত্রকে স্বীকৃতি দেয়নি। সমগ্র দ্বীপটিকেই সাইপ্রাস হিসেবে গণ্য করা হয়।

লেবানন

সৌদি আরব-সিরিয়ার পশ্চিমে, ইজরায়েলের উত্তরে এই দেশ। ১৯৪৩ সালে স্বাধীন হয়। রাজধানী বেইরুট। জনসংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষ। আয়তন ১০ লক্ষ ৪ শত বর্গ

কি.মি.। একসময় বিমানবন্দর বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বিচিত্র বিষয়ের কেন্দ্র। কিন্তু ইজরায়েলের আক্রমণে ও জাতিদাঙ্গায় পর্যুদস্ত হয়। এককালের সমৃদ্ধ দেশ আজ হতশ্রী। কৃষিপ্রধান দেশ,—ফল শস্য অলিভ তেল প্রচুর হয়। শিল্পেও উন্নত,—তেল পরিশোধন, বস্ত্র, সিমেন্ট প্রভৃতির উৎপাদন হয়।

ইজরায়েল

সিরিয়ার পশ্চিমে, তুরস্কের দক্ষিণে এই দেশ। ইহুদিদের কোনো রাষ্ট্র ছিল না। ১৯৪৮ সালে ইহুদি মানুষের জন্য এই রাষ্ট্র স্বীকৃতি পায়। রাজধানী তেল আভিভ। লোকসংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ। দেশটি সব দিক দিয়েই খুব উন্নত। যেমন কৃষিতে, তেমনি শিল্পে। মাত্র তেইশ হাজার সাতশো বর্গ কিলোমিটারের অপ্রতুল জলের দেশে কৃষির উন্নতি সকলকে বিস্মিত করে। বিশ্বে ফল রপ্তানি করে প্রভূত উপার্জন করে। হিরে উৎপাদনে অগ্রগণ্য। জর্ডন প্রধান নদী। আজমন সবচেয়ে উঁচু পাহাড়।

সিরিয়া

ছোটো দেশ সিরিয়া ইরাকের পশ্চিমে, তুরস্কের দক্ষিণে। ভূমধ্য সাগরের তীরে এই দেশের প্রাচীনতম সভ্যতার ঐতিহ্য রয়েছে। রাজধানী দামাস্কাস। আয়তন ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ১৮০ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা দুকোটির অল্প বেশি। এক সময় ফরাসি উপনিবেশ ছিল, ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে। কৃষিকাজ ও পশুপালন প্রধান জীবিকা। গম তামাক তুলোর উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। পশুপালনের সুবাদে চামড়া শিল্প যথেষ্ট উন্নত। পেট্রোল পাওয়া যায় যথেষ্ট। আসি ও আল ফুরাত প্রধান নদী। হারমন সবচেয়ে উঁচু পাহাড়।

জর্ডন

ইজরায়েলের পশ্চিমে, সৌদি আরবের উত্তরে ছোট্ট দেশ। এই দেশে পাহাড় মরুভূমি বিশাল সমতল রয়েছে। অত্যন্ত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে। ১৯৪৬ সালে দেশ স্বাধীন হয়। দেশটির পুরো নাম জর্ডন হাশেমি রাজতন্ত্র। রাজধানী আম্মান। আয়তন ৮৯ হাজার ৩৪২ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা যাট লক্ষের কিছু বেশি। মরুভূমি থাকলেও পশ্চিম এলাকা খুব উর্বর। ডাল বার্লি তরমুজ গম লেবু প্রচুর হয়। শিল্পে খুব উন্নত। লোহা সার সিমেন্ট বস্ত্র উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার হার প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ। সব দিক থেকেই উন্নত দেশ। জর্ডন নদী ও জাবিল-রাম পাহাড় রয়েছে। আরব অঞ্চলের এই দেশের কোনও রূপকথা বা উপকথা এই গ্রন্থে দেওয়া গেল না।

ইরাক

ইরানের পশ্চিমে ও সিরিয়ার পুবে এই দেশ। মানবসমাজে যে কয়েকটি প্রাচীনতম সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ইরাক তার একটি। মেসোপটেমিয়া সভ্যতার আদি ভূমি। পারসিক, আলেকজান্ডার, মোঙ্গল প্রভৃতি এই দেশ দখল করে। ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে ১৯৩২ সালে দেশ স্বাধীন হয়। রাজধানী বাগদাদ। লোকসংখ্যা প্রায় সাতাশ কোটি। আয়তন ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫২ বর্গ কি.মি.। গম খেজুর তুলো ধান প্রচুর হয়। পশুপালন অন্যতম জীবিকা। পেট্রোল উৎপাদনে পৃথিবীর পঞ্চম দেশ। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস প্রধান নদী। রাওয়ানডুজ উচ্চতম পাহাড়।

ইরান

আফগানিস্তানের পশ্চিমে ও ইরাকের পূর্বে এই দেশ। এই দেশের পূর্ব নাম পারস্য। প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান। চারিদিকে পর্বত-বেষ্টিত বিশাল মালভূমির দেশ। দেশটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র। রাজধানী তেহরান। আয়তন ১৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৯১৮ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা প্রায় সাত কোটি। কৃষিতে উন্নত দেশ,—গম ধান বার্লি পশম ও ফল জন্মায় প্রচুর। হস্তশিল্পের বাজার রয়েছে। পেট্রোল প্রচুর। কারখে আত্রাক কারুন সাফিদ প্রধান নদী। ডেমাভেল্ভ উচ্চতম পাহাড়।

সৌদি আরব

বিশাল দেশ সৌদি আরব। ইরাক-সিরিয়ার দক্ষিণে ওমানের পশ্চিমে ইয়েমেনের উত্তরে লোহিত সাগরের তীরে এই দেশ। এই দেশেই রয়েছে মুসলমান ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র স্থান মক্কা ও মদিনা। এই দেশ রাজতন্ত্রের অধীন। রাজধানী রিয়াধ ও জেড্ডা। আয়তন ২২ লক্ষ ৪৮ হাজার বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৩৪ লক্ষ। গম বার্লি ফল খেজুর উৎপন্ন হলেও মূল আয় পেট্রোল। পেট্রোলজাত পণ্যের সবচেয়ে বেশি রপ্তানি এই দেশ থেকে। ইদানীং কিছু শিল্পও গড়ে উঠেছে। মরূদ্যান ছাড়া তেমন কোনো নদী নেই। মরুভূমির মতো প্রকৃতি। জেরেল-রাজিখ সবচেয়ে উঁচু পাহাড়।

কুয়েত

ইরাক-ইরানের দক্ষিণে, সৌদি আরবের পশ্চিমে ছোট্ট আরব-রাষ্ট্র। ছোট্ট দেশ হলেও পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ, কেননা এখানে মজুত রয়েছে বিপুল পেট্রোল। ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। স্বাধীন হয় ১৯৬১ সালে। রাজধানী কুয়েত সিটি। আয়তন ১৭ হাজার ৮১৮ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা প্রায় বত্রিশ লক্ষ। ফসল তেমন হয় না। তবে চিংড়ি চাষে উন্নত। প্রকৃত আয় পেট্রোল থেকে, প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ। সার ও

রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনও ভালো। নদনদী তেমন নেই। আশ সাকায়া সবচেয়ে উঁচু পাহাড়।

বাহরিন

পারস্য উপসাগরে অবস্থিত ৩০টি ছোটো ছোটো দ্বীপের সমষ্টি এই দেশ। আয়তন ৬৯৪ বর্গ কি.মি.। বাহরিন, মুহারবাক ও সিত্রা দ্বীপেই জনবসতি আছে। জনসংখ্যা ৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৩০৬। কয়েকটি দ্বীপ সেতু দিয়ে যুক্ত। খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন করা হয়। সামান্য কৃষিযোগ্য ভূমিতে খেজুর, লেবু, কলা, আম, বেদানা প্রভৃতি ফলের চাষ হয়। পানীয় জলের জন্য ভরসা আর্তেজীয় কূপ ও শোধিত লবণাক্ত জল। ১৭৮৩ থেকে আমিরশাহির শাসন। ১৯৭১-এ স্বাধীন এই দেশে সংসদীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘদিন আমিরশাহির অধীন থাকায় এই দেশের কোনও উপকথা বা রূপকথা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা যায়নি।

কাতার

পারস্য উপসাগরে একটি ছোটো উপদ্বীপ। ইরানের পশ্চিমে, সৌদি আরবের পূর্বে এই দেশ। ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল, স্বাধীন হয় ১৯৭১ সালে। রাজধানী দোহা। আয়তন ১১ হাজার ৪২৭ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ। ফল সবজি খেজুর হলেও দেশটি আর্থিকভাবে নির্ভরশীল পেট্রোলের ওপর। প্রায় পঁচাশি শতাংশ জাতীয় আয় এই পেট্রোল থেকে। অবশ্য সম্প্রতি সার ইস্পাত সিমেন্ট ও পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পও গড়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানিতে কাতার রয়েছে প্রথম স্থানে। সবচেয়ে উঁচু পাহাড় দুখান।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহি

ওমানের পশ্চিমে, সৌদি আরবের পূর্বে, কাতারের দক্ষিণে এই দেশ। পারস্য উপসাগর এলাকার সাতটি ছোটো ছোটো স্বশাসিত অঞ্চল নিয়ে এই সংযুক্ত রাষ্ট্র। রাজধানী আবু ধাবি। আয়তন ৮৩ হাজার ৬ শত বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ। গত শতকের মাঝামাঝি নাগাদও দেশটি ছিল খুবই গরিব। কিন্তু ১৯৫০ সালে খনিজ পেট্রোল আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। খেজুর সবজি কিছু পরিমাণে হলেও পেট্রোল অর্থনীতিতে জোয়ার আনে। মাথাপিছু আয়ের নিরিখে বিশ্বে অগ্রগণ্য এই দেশ। নদী তেমন নেই। আল হাজার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়।

প্যালেস্টাইন

জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা ভূখণ্ড নিয়ে এই ছোট্ট দেশ। দীর্ঘ দিন ধরে ইজরায়েল রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধরত থাকার ফলে বারবার বিধ্বস্ত হয়েছে এই দেশ। জনসংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ। ছয় হাজার বর্গ কিলোমিটারের এই দেশে ব্যাপক দারিদ্র্য। বারবার যুদ্ধে পর্যুদস্ত এই দেশ উন্নয়নের সুযোগ পায়নি।

ওমান

সৌদি আরবের পূর্বে আরব সাগরের তীরে এই ছোট্ট দেশ। দেশের পুরো নাম সুলতানেট অব ওমান। আগে নাম ছিল মাসকট। ব্রিটিশের প্রভাব থাকলেও দেশটি কোনোদিন উপনিবেশ ছিল না। সুলতানরাই শাসন করত এবং এখনও সেই ব্যবস্থা রয়েছে। রাজধানী মাসকট। আয়তন ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৫ শত বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ ৭৭ হাজার। কৃষির ওপরে দেশ নির্ভরশীল নয়, যদিও খেজুর ফল ও কিছু শস্য হয়। পেট্রোল হল অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তি। প্রচুর উৎপাদন। ইদানীং মৎস্যচাষের সঙ্গে অনেকে যুক্ত রয়েছে। নদী বলতে যা বোঝায় দেশে তা নেই। জবাল-আস-নাম উচ্চতম শিখর।

ইয়েমেন

সৌদি আরবের দক্ষিণে এডেন উপসাগরের তীরে এই দেশ। ওমানের সঙ্গে সীমান্তে যোগ রয়েছে। দেশটি প্রজাতন্ত্রী। দেশে দুটি রাজধানী—সানা এবং বাণিজ্যিক রাজধানী এডেন। আয়তন ৪ লক্ষ ৭২ হাজার ৯৯ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা দু কোটির সামান্য বেশি। পেট্রোল মজুত থাকলেও বেশির ভাগ মানুষের জীবিকা কৃষি ও হস্তশিল্প। এখানে গম বাজরা কফি খেজুর ভুট্টা ফল প্রচুর পরিমাণে হয়। চামড়া ও লোহার কাজে দেশের পৃথিবীজোড়া খ্যাতি। জাবেল-হাজার উচ্চতম পর্বত।

দক্ষিণ এশিয়া

আফগানিস্তান

পাকিস্তানের পশ্চিমে ইরানের পূর্বে এই দেশ। তুর্কমেনিস্তান ও তাজিকিস্তানের সঙ্গে সীমান্তে যুক্ত হয়েছে। প্রাচীনকালে এই দেশের নাম ছিল ব্যাকট্রিয়া। এই দেশে প্রায় পঁচিশটি জনজাতি বসবাস করে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বিশিষ্ট ভাষা রয়েছে। রাজধানী কাবুল। লোকসংখ্যা প্রায় তিন কোটি। আয়তন ৬ লক্ষ ৫২ হাজার ২৫ বর্গ কি.মি.। পাহাড়ি অনুর্বর এলাকা। বৃষ্টিপাত কম। ফসল তেমন জন্মায় না। তবে সাম্প্রতিক কালে কিছু এলাকায় কৃষিকাজ ভালো হচ্ছে। গম তুলো ফল রেশম চাষ হচ্ছে। বিরাট সংখ্যক মানুষ পশুপালক। বিশ্বের চার-পাঁচটি সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশের একটি। আমুদরিয়া হেলমাদ প্রধান নদী। নশাক সবচেয়ে উঁচু পাহাড়।

পাকিস্তান

ভারতের পশ্চিমে আফগানিস্তানের পূর্বে এই দেশ। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে এই দেশের জন্ম। ভাষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যে এই দেশ ভারতীয় ঐতিহ্য বহন করছে। কৃষিপ্রধান দেশ হলেও শিল্পে প্রভূত অগ্রগতি ঘটেছে। উত্তর ও পশ্চিম এলাকা পর্বতময়, বাকি অংশের জমি খুবই উর্বর। রাজধানী ইসলামাবাদ। জনসংখ্যা প্রায় ষোলো কোটি। আয়তন ৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯৫ বর্গ কি.মি.। সিন্ধু শতদ্রু ঝিলম রবি দেশকে শস্যশ্যামলা করেছে। সবচেয়ে উঁচু পর্বতচূড়া কে-2। পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র।

ভারত

আয়তন ও লোকসংখ্যার (আনুমানিক ১১৪ কোটি) নিরিখে ভারত এশিয়ার দ্বিতীয় দেশ। 'সারা পৃথিবীর রূপকথা' গ্রন্থমালা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে সমগ্র ভারতের রূপকথা নিয়ে। সেজন্য বর্তমান খণ্ডে ভারতের কোনও গল্প দেওয়া হয়নি।

ভুটান

ভারতের উত্তরে এবং তিব্বতের লাগোয়া ছোটো দেশ ভুটান। আয়তন ৪৭ হাজার বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ। ভুটানে রয়েছে রাজতন্ত্র। পূর্ব হিমালয়ের এই দেশকে বলা হয় 'দ্য ল্যান্ড অব থান্ডার ড্রাগন।' বৌদ্ধধর্মের দেশ, তিব্বতি সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপক। কৃষিকাজই প্রধান জীবিকা, কিন্তু পাহাড়ি জমিতে শস্য তেমন ফলে না। বনজ সম্পদের ওপরে নির্ভর করতে হয়। খুবই দরিদ্র দেশ। রাজধানী থিম্পু। মাচু ওয়াং-চু ও আমো-চু প্রধান নদী। এ ছাড়াও অসংখ্য পার্বত্য ঝরনা দেশের সর্বত্র রয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভুটানকে বর্ণময় করে রেখেছে। ভুটানের লোকসংগীত, লোককথা নাচ খুব সমৃদ্ধ।

নেপাল

একটি ছোটো রাষ্ট্র। ভারতের উত্তরে ও তিব্বতের দক্ষিণে নেপাল। উত্তরে হিমালয়। আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ১৮১ বর্গ কি.মি। এই দেশেই রয়েছে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশিখর মাউন্ট এভারেস্ট। অরণ্য—পার্বত্য নদী—বিশাল উপত্যকায় ঘেরা এই দেশের প্রধান সম্পদ কৃষি ও বনভূমি। কুটির শিল্পের জন্য খ্যাতি রয়েছে। রাজধানী কাঠমান্ডু। জনসংখ্যা ২ কোটি ৯৫ লক্ষ ১৯ হাজার ১১৪। বর্ণালি কোশী ও নারায়ণী সবচেয়ে বড়ো নদী। এই দেশের সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। একসময় সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচিত হত। পরে নেপালি ও নেওয়ারি ভাষায় সাহিত্য লেখা শুরু হয়। তাদের লেখার লিপি দেবনাগরী। বীরের জাতি হিসেবে নেপালের গোর্খাদের দুনিয়াজোড়া খ্যাতি।

শ্রীলঙ্কা

ভারতের সর্ব দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের মধ্যে এই দ্বীপ। আগের নাম ছিল সিংহল বা সিলোন। এই দেশ আগে পর্তুগিজ ডাচ শাসকরা অধিকার করে। কিন্তু ভারতের মতোই অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশের শাসনাধীন হয়। ১৯৪৮ সালে দেশ স্বাধীন হয়। এই দেশে খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ কাল থেকে দক্ষিণ ভারতের তামিল মানুষ যেতে শুরু করে। দেশের আদি বাসিন্দাদের সংখ্যা বিশাল হলেও তামিল ভাষীরাও কম নেই। রাজধানী কলম্বো। জনসংখ্যা প্রায় দুই কোটি। আয়তন ৬৫ হাজার ৬১০ বর্গ কি.মি.। কৃষিপ্রধান দেশ। মৎস্যচাষও ব্যাপক। প্রধান সম্পদ সামুদ্রিক পাথর যা জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

মালদ্বীপ

শ্রীলঙ্কার পশ্চিমে ভারত মহাসাগরের মধ্যে একটি ছোট্ট দেশ। বারোশোর মতো ছোটো ছোটো দ্বীপ নিয়ে এই প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। প্রায় দুশো দ্বীপে বসতি আছে। রাজধানী মালে। লোকসংখ্যা তিন লক্ষের সামান্য বেশি। পূর্ণ স্বাধীনতা পায় ১৯৫৬ সালে। মাত্র ২৯৮ বর্গ কিলোমিটারের এই দেশে চাষযোগ্য ভূমি দশ শতাংশ। তাই খাদ্যশস্য বাইরের দেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আয়ের উৎস, সমুদ্রে মাছ ধরা ও নারকেল। নারকেলের মতো বিচিত্রমুখী উপকারী ফল খুব কম আছে। নদীও নেই পাহাড়ও নেই। সম্প্রতি পর্যটন শিল্পে দেশটি প্রভূত উন্নতি করেছে।

বাংলাদেশ

ভারতীয় উপমহাদেশে সবচেয়ে নবীন রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা অসম মিজোরাম মেঘালয় ও মায়ানমারের সঙ্গে এই দেশের সীমানা যুক্ত। এই দেশ পুরোপুরি নদীমাতৃক ও কৃষিপ্রধান। অসংখ্য নদী এই দেশকে ঘিরে রয়েছে। ভারত ভাগ হয় ধর্মের ভিত্তিতে। তখন এই ভূখণ্ড পাকিস্তানের অংশ ছিল। পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল। সেই কারণে এই দেশে প্রায় পঁচাশি শতাংশ মুসলমান। রাজধানী ঢাকা। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে পনেরো কোটি। আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কি.মি.। পদ্মা যমুনা কর্ণফুলী সুরমা মেঘনা প্রধান নদী। সে দেশের অর্থনীতি নদীর ওপরে নির্ভরশীল। কৃষিই প্রধান জীবিকা। শিল্পের তেমন অগ্রগতি হয়নি।

জনসংখ্যা ১ জুলাই ২০০৮ পর্যন্ত বার্ষিক গড় জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অনুযায়ী নির্ধারিত।